প্রথম প্রকাশঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশকঃ শ্রীপ্রেমময় মজুমদার, ৭৮/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রকঃ এস. বি. চৌধুরী এণ্ড কোং, ১০৩/১বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদঃ পূষন গুপ্ত

নিবেদন

ভাষান্তরে মূলের রূপ ঝরে যায়, যদিও উপন্যাসে গল্পে অনেকটা বজায় থেকেও যায় অনুবাদক সতর্ক ও সমর্থ হলে।

এবং বিশ্বসাহিত্যে পৌঁছতে গেলে অনুবাদের দরজা ছাড়া উপায়ও নেই। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য দরিদ্র নয়। কিন্তু সামগ্রিক একটা পরিকল্পনা নিয়ে বাঙালি পাঠকদের সামনে এসে দাঁড়াবার এ-জাতীয় চেষ্টা প্রথম করতে পারছি বলে আমরা গর্ব অনুভব করছি। প্রকাশককে ধন্যবাদ, ব্যবসায়ী-বুদ্ধিকে সংযত রেখে বাংলা সাহিত্যের একটা ভালো কাজ করার পরিকল্পনায় নেমেছেন—এত কম মূল্যে এত বড় বই দেবার কথা আজকাল ভাবা যায় না।

খুব ঠাস বুনট ছাপা আর ছ'শ পৃষ্ঠার বিপুল আয়তন হলেও পঁচিশ খণ্ডে পৃথিবীর যাবতীয় ভালো উপন্যাস আর ছোটগল্প ধরানো যায় না, এ হিসেবটা আমাদের প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু একটা সীমানা থাকা চাই, সাধারণ বাঙালি পাঠকের আয়ত্তেও বইগুলি রাখতে হবে। তাই নির্বাচনের কাজটা হল বিরাট কঠিন, জটিলও বটে। শ্রেষ্ঠ শব্দটা নিয়ে পণ্ডিতেরা কখনও একমত হন না, সাধারণ পাঠকও তর্ক করেন। বিশেষ করে সাময়িক জনপ্রিয়তা যে-লেখার ভাগ্যে জোটে, কালের দরবারে তাকে ঢুকতে হলে অন্য পরিচয়পত্রে খুশি করতে হয়। আমরা অনেক ভেবে একটি তালিকা করেছি—তাতে মতান্তরের ফাঁক থাকবে, সেটা না মেনে উপায় নেই। যে-নীতিকে মনে রেখেছি তা হল—

এক. সেকাল-একালের কোন বড় লেখক যাতে বাদ না যান।

দুই. কোন দেশ যাতে এড়িয়ে না যায়—যার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আছে।

তিন. নির্বাচিত লেখকের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লেখা গ্রহণ করা।

চার. যে বড় লেখকের একের বেশি প্রধান রচনা আছে তার মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেওয়া (তাদের মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে ভালো তা প্রায়ই ঠিক করা যায় না)।

পাঁচ. বিষয় ও রচনারীতির বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখা—যাতে মানব-অস্তিত্বের রকমারি স্বাদ পাঠক পেতে পারেন।

অবশ্য বহুপঠিত ও সুলভ কোন অনুবাদ বই, বা এমন কিছু লেখা যার অনুবাদস্বত্ব প্রাপ্তব্য নয়, তা আমাদের বাদ দিতেই হয়েছে। কিন্তু সম্ভবমতো সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ উপন্যাস আর গল্পের ভাণ্ডার আমরা গড়ে তুলতে যাচ্ছি, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যে-নীতি মেনে চলেছি তারও কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

প্রথমত, ভাবানুবাদ বা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ একেবারেই আমাদের লক্ষ্য নয়। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদই মাত্র মূলের সৌন্দর্যের ও বিশিষ্টতার কাছে পাঠককে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে সর্বত্র প্রতি শব্দের বা বাক্যের আভিধানিক অর্থ থাকে না, থাকতে পারে না। প্রতি ভাষার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে-ভাষা বাঙালি শিক্ষিতসমাজের, তার মধ্যে হয়ত ঊনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার বা এই শতকের জার্মানির ভাষা ও জীবন-রূপকে নিয়ে আসতে হবে। মূলের ঠিক আস্বাদটি বহন করার জন্যই যদি কোন শব্দ, বাক্য বা ইডিয়ম যোগ হয়, বাদ যায়, সংকুচিত হয়, বা প্রসারিত হয়, অথবা কিঞ্চিৎ সরলীকৃত হয়, কিছুটা বেঁকে যায়, তাকে মেনে নিতেই হবে। যে-অনুবাদে

মূলের রূপ আর উপভোগ সবচেয়ে বেশি (যতখানি সম্ভব) না মিলবে, তাকে অনুবাদ হিসেবে গ্রাহ্যই করা চলে না। অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যের রস বাংলাভাষার স্বভাব রক্ষা করেই পরিবেশন করা আমাদের অভিপ্রায়।

দ্বিতীয়ত, প্রধানত ইংরেজি থেকে, কিছু ফরাসি, জর্মন, স্প্যানিশ ও রুশ থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে। কোথাও ইংরেজি থেকে অনুবাদের পরে মূল ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের দেশের অনুবাদ-সাহিত্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নীতিই সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

অনুবাদের কাজে আমরা সাহায্য নিচ্ছি প্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণ লেখকদের এবং সমভাবে উজ্জ্বল তরুণদেরও।

প্রথম খণ্ডের প্রকাশে শ্রীদীপঙ্কর মজুমদার, শ্রীঅনিল দাস ও শ্রীদিলীপ ঘোষের উদ্যম ও উৎসাহ বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

সম্পাদকমণ্ডলী

সূচী

অনুবাদক

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
কুমারেশ ঘোষ ও সুকুমার গুপ্ত
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সিদ্ধার্থ ঘোষ ও রমা ভট্টাচার্য * অনীতা গুপ্ত

চার্লস ডিকেন্স

দুই নগরের গল্প

(এ টেল অফ টু সিটিজ)

অনুবাদক

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

লেখক এবং রচনা প্রসঙ্গে

ইংল্যাণ্ডের পোর্টস মাউথ-এর কাছে ১৮১২ সালে চার্লস ডিকেন্সের জন্ম। পিতা ছিলেন সামান্য কেরানী। কিশোর চার্লস স্কুলের শিক্ষা পেয়েছিলেন এলোমেলো। তাঁর দিন কাটত শহরের পথে ঘুরে বেড়িয়ে। দেনার দায়ে বাবা গেলেন জেলে। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী মা আর ছ-টি সন্তানকে নিয়ে জেলে স্বামীর সঙ্গিনী হলেন। এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে চার্লস হলেন সঙ্গীহীন। কিছুদিন পরে উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি লাভে ডিকেন্স-পরিবারের কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ঘটেছিল। যৌবনের আরম্ভে কিছুটা লেখাপড়ায় অগ্রসর হয়ে চার্লস কিছুদিন 'ল' অফিসে কেরানীর কাজ করলেন—শিখলেন শর্টহ্যাণ্ড। তার পর লণ্ডনের একটি পত্রিকায় সংবাদদাতার কাজ পেলেন। তাঁর প্রথম লিখিত গল্প প্রকাশিত হল একুশ বছর বয়সে। লণ্ডন শহর ও তার শহরতলিতে যে-জীবনকে তিনি দেখেছিলেন অপূর্ব নিপুণতায় ব্যঞ্জনায় তিনি তাকে প্রকাশ করতে লাগলেন। চার্লস ডিকেন্সের বিপুল সাহিত্যকর্মের সূচনা হল। 'পিকউইক পেপার্স' তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিল। তার পর থেকে এই উপন্যাস এ টেল অফ টু সিটিজ পর্যন্ত ডিকেন্স লিখেছিলেন দু'টি নাটক, দশখানি উপন্যাস, কয়েক গ্রন্থ প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, ছোটগল্প।

ডিকেন্সের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা বাইশ বছর বিবাহিত জীবনযাপনের পরে বিবাহ বিচ্ছেদ। নিজের বিবাহিত জীবনের যন্ত্রণা তাঁকে শেষ দিকে অপরিসীম নৈরাশ্যে পীড়িত করেছে। নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলার চেষ্টায় ডিকেন্স অতি পরিশ্রমে ফুরিয়ে গেলেন। ক্লান্তিহীন সাহিত্যকর্ম—সেই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ জীবন, এখানে-ওখানে এ-আসরে সে-আসরে নিজের রচনা পাঠ করে শোনানো—এইভাবে শরীর ও মনের অপচয় করে ফেললেন ডিকেন্স। ১৮৭০ সালে মাত্র আটান্ন বছর বয়সে ডিকেন্স লোকান্তরিত হলেন।

ডিকেন্সের প্রধান উপন্যাস হ'ল—'স্কেচেস বাই বজ্' (১৮৩৬), 'পিকুইক পেপারস্' (১৮৩৭), 'ওলিভার টুইস্ট' (১৮৩৮), 'নিকোলাস নিকলবি' (১৮৩৯) 'দি ওল্ড কিউরিওসিটি সপ' (১৮৪১), 'ডেভিড কপারফিল্ড' (১৮৫০), 'ব্লিক হাউস' (১৮৫৩), 'এ টেল অফ টু সিটিজ' (১৮৫৯)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কটি বছর যথার্থই ফ্রান্সের ক্রান্তিকাল। বিপ্লবের ঝড়ে উৎপাটিত হয়েছিল ফ্রান্সের রাজতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্র। সম্রাট ষোড়শ লুই গিলোটিনে প্রাণ দিলেন সতের শ তিরানব্বই সালের একুশে জানুয়ারি। ঐতিহাসিকদের অনেকেরই ধারণা যে আমেরিকান বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ফ্রান্সের জনমানসে আগুন ধরিয়েছিল। দীর্ঘকালের রিক্ত বঞ্চিত নির্যাতিত ক্ষুধার্ত মানুষ শাসকগোষ্ঠির অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সতের শ বিরানব্বই সালে ফরাসি রিপাবলিকের অভ্যুদয়। চৌদ্দই আগস্ট রাজপ্রাসাদ দখল। ফরাসি বিপ্লবের রক্তাক্ত ইতিহাসের সাক্ষী বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও জয়। ইতিহাসের বিধাতা সেই রক্তক্ষয়ী যুগে মানবমুক্তির যে বীজ বপন করেছিলেন দূরতর কালে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। এই উপন্যাসের বহু বিচিত্র চরিত্র-অভিব্যক্তির মধ্যে সমাজ-জীবনের সর্বস্তরের নরনারী উপস্থিত। তাদের দুঃখ-বেদনা, আশা-নিরাশা, ক্ষোভ, হিংসা, জিঘাংসার যে নিবিড় গভীর উদ্ঘাটন আমাদের চোখে পড়ে তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে চার্লস ডিকেন্সের সাহিত্যকার্যে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর চিরকালীন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত এই উপন্যাসখানি জীবনের ব্যাপ্তিও গভীরতায় অনন্য।

ভূমিকায় ডিকেন্স লিখেছিলেন—'সাহিত্যিক মিঃ উইলকি কলিন্সের 'দি ফ্রোজেন ডীপ' নাটকে আমার সন্তান ও বন্ধুদের সঙ্গে মহড়া দেবার সময় এই উপন্যাসের মূল আইডিয়াটি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। আমার ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে এটিকে একাত্ম করে গড়ে তুলব এমনি একটা সংকল্প গ্রহণ করি। জীবনপ্রবাহের একজন সত্যকার দ্রষ্টার কাছে এটিকে যথার্থ ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য যে ব্যক্তিমানসের প্রয়োজন—তা আমার ভাবনায় আমি রূপায়িত করেছিলাম। উপন্যাসের মূল উপজীব্যটি দিনে দিনে যতই আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ততই সেটি বর্তমান রূপ ধারণ করল। বস্তুতপক্ষে এই উপন্যাস রচনাকালে আমার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেছিল এর প্রভাব। আমার জীবনে যত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে—যত যন্ত্রণা ভোগ করেছি আমি—সব এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় বিবৃত হয়ে আছে।'

প্রত্যাবর্তন

১ ক্রান্তিকাল

সে এক আশ্চর্য ক্রান্তিকাল। সময়ের আলো-আঁধারিতে ইতিহাসের গোধূলি। আশ্বাসে-নৈরাশ্যে খণ্ডিত। জ্ঞানের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল অবিদ্যার। বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিধার। মনে হত, ভবিতব্য উপহার সাজিয়ে বসে আছে মানব-যাত্রীদের জন্য। যেন ভবিষ্যতের তিমিরান্ধকার সূচীভেদ্য। স্বর্গ-নরকের কিনারা নেই। অথচ সেকালে-একালে পার্থক্য ছিল না কণামাত্র। কেবল যুগধর্মী সমালোচকেরা সে যুগের আতিশয্যকে বোঝাতে বিশেষণ জুড়তেন সবিস্তারে।

তখন ইংলন্ডের মসনদে এক চওড়া-চোয়াল রাজা আর তাঁর সাদামাটা রানী। ফ্রান্সের সিংহাসনেও তেমনি এক চওড়া-চোয়াল রাজা। কিন্তু তাঁর রানীটি পরমাসুন্দরী। দুই দেশেই সমাজের বড়বাবুরা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতেন। কোন ভাবনা নেই। সব ঠিক হ্যায়।

সতের শ পঁচাত্তর সালের কথা। তখন ইংলন্ডের লোকের বিশ্বাস ছিল দৈববাণীতে। বিশ্বাস ছিল ভূত প্রেত দৈত্য দানোতে। তারা মানত অপদেবতার ভর। ক্রীশ্চান পুরোহিতেরা বুজরুকি আর ভেলকি দেখিয়ে লোককে ইহলোকের না হোক পরলোকের খবর দিত। আর পৃথিবীর খবরের মধ্যে একটি ছিল সামান্য জরুরী। আমেরিকায় বসতি-করা ইংরেজ প্রজাদের খবর। অপদেবতা আর ভেলকি ছাপিয়ে সেই নগণ্য সংবাদটুকু শুধু সপারিষদ রাজা নয় আপামর প্রজাদেরও দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

ফরাসিরা ধর্মাধর্ম নিয়ে তত মাথা ঘামাত না। রাজা কাগজের নোট ছাপিয়ে দরাজ হাতে ছড়িয়ে দিতেন। আর প্রজারা মহানন্দে উচ্ছন্নে যাবার রাস্তা দেখত। এখানেও লোকের আত্মার মঙ্গলের ভার ছিল পুরোহিতদের উপর। এক শ হাত দূরে এক পুরোহিতের মিছিল দেখেও বৃষ্টির মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসেনি—এই অপরাধের শাস্তিতে হাত কেটে জিব টেনে উপড়ে নেওয়া হত। গির্জার এই শাস্তি লোকে নির্বিবাদে মেনেও নিত। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা ছিল পুরোহিতদের অসম্মানের সাজা। হয়ত-বা এই সব অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবাদেই ইতিহাসের কাঠুরে ভাগ্যবিধাতা ফ্রান্স-নরওয়ের অরণ্যে বৃহৎ বনস্পতিদের কঙ্কালে গড়ে তুলেছিল এমন এক ভবিতব্যের কাঠামো যা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। হয়ত-বা সুন্দরী প্যারিসের গা-লাগা কোন চাষার জমিতে মুরগি-শুয়োরের খামারের ধারে রোদে-জলে পোড়া একখানা দু-চাকা গাড়িকে কিষাণ মৃত্যুর এক মহা-দুর্দিনের জন্য জিইয়ে রাখছিল। কিন্তু সেই কাঠুরে ও চাষার নিঃশব্দ অবিরাম কাজের হদিস রাখেনি কেউ। সে মহাবিপ্লবের পদধ্বনিতে যারা জেগে সচকিত হচ্ছিল তারা কেউ সাড়া দিত না। যে সাড়া দেবে তাকে তো লোকে বলবে পাষণ্ড ধর্মবিদ্রোহী বেইমান।

আইন-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না ইংলন্ডে। খাস রাজধানীতে সশস্ত্র গুণ্ডার দল প্রতি রাতে রাহাজানি করত। পথে লুটপাটের বিরাম ছিল না। বাড়িতে আসবাবপত্র রেখে বাইরে যাবার উপায় ছিল না। দোকানে সব-কিছু জমা রেখে তবে নিশ্চিন্তে লোকে বিদেশ যেত। দিনে যিনি শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী বন্ধু, রাতের আঁধারে তিনি এক কুখ্যাত গুণ্ডা। তাঁর এক পরিচিত ব্যবসায়ী তাঁকে গা-আঁধারী

আলোয় চিনে ফেলার অপরাধে, গুলি খেয়ে মরে পড়ে রইল রাস্তায়। সাতজনে এক প্রহরীকে ঘিরে ফেলায়, প্রহরী তিনজনকে গুলি করে মারে। তার পর বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় বাকি চারজনে প্রহরীকে মেরে নিশ্চিন্তে মেল-ব্যাগ লুঠ করে নিয়ে পালায়। জেলের ভিতর কয়েদীদের নিত্য খুনোখুনি। বড় বড় অভিজাত আসরে লোকের গলা থেকে হীরে-মুক্তো টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় বাটপাড়দের দল। গির্জার শান্ত-পবিত্র আবহাওয়ায় লুঠের মালের বখরা নিয়ে বচসা শেষে খুনে নিষ্পত্তি হয়। পুলিশ গুলি করে ডাকাতদের। তারা পালটা জবাব দেয়। এমনি চলে দিনের পর দিন। এই সব নোংরা জঘন্যতা নিয়ে কেউ-ই মাথা ঘামায় না। শুধু একজনের কাজের বিরাম থাকে না—সে জল্লাদ। লম্বা সারিতে ফাঁসির দড়ি সাজিয়ে সে নানা শ্রেণীর অপরাধীকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দেয়। মঙ্গলবারে ধরা-পড়া সিঁদেল চোরের ফাঁসি হয় শনিবারে। নিউ গেটের মুখে মানুষ পোড়ে। ওয়েস্টমিনিস্টার হলের বাইরে পোড়ে নানা পুস্তিকা ইস্তাহার। আজ যেখানে এক সাংঘাতিক খুনীর ফাঁসি হল, কাল সেখানে ফাঁসিতে মরল এক সিঁদেল চোর।

এ সব সতেরো শ পঁচাত্তর সালের শেষাশেষির ঘটনা। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে ইতিহাসের কারিগর অস্ত্রে শান দিয়ে কাঠামো তৈরি করে। বিপ্লবীর মৃত্যু করে সর্বনাশের উদ্যোগপর্ব। আর দুই দেশের দুই চওড়া-চোয়াল রাজা আর তাদের বউরা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করে যায় বিধিদত্ত ক্ষমতার আত্মপ্রবঞ্চনায়। এমনি করে বৃহৎ-ক্ষুদ্র মিলিয়ে এক বিরাট মানব-পরিবার অমোঘ নিয়তির টানে এগিয়ে চলে ইতিহাসের ক্রান্তিকালে।

২ ডাকগাড়ি

শেষ নভেম্বরের শুক্রবার রাতে যে লোকটি ডোভার রোড ধরে পদব্রজে পাহাড়ের চড়াই পার হচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এই ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সামনে ডাকগাড়ি ধীর-গতিতে পাহাড়ের পথ বেয়ে উপরে উঠছিল। অন্য দু'জন যাত্রীর সঙ্গে তিনিও যে কর্দমাক্ত পার্বত্যপথে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সে হাঁটার আনন্দে নয়। এই পার্বত্য চড়াই পথ, এই কাদা ভাঙ্গা আর ডাকগাড়ির গুরুভারে ঘোড়ারা ইতিপূর্বে তিনবার বিদ্রোহী হয়ে গতি বন্ধ করেছিল। একবার ফেরার জন্য রুখেও উঠেছিল। কিন্তু বল্‌গা আর চাবুকে তারা আবার শাসন মানতে শিখেছে। কোন কোন পশুদের মধ্যেও যে হিসেবী বুদ্ধি আছে এই ঘটনায় তা আর একবার বোঝা গেল যেন।

ভারী কাদা ঠেলে ডাকগাড়ি এগোচ্ছে শম্বুকগতিতে। ঘোড়ার দল মাথা নামিয়ে লেজ ঝাপটে কাদা ভাঙ্গছে কঠিন পরিশ্রমে। এক একবার যখন হোঁচট লাগছে, বোধ হচ্ছে যেন তাদের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেল। যতবার গাড়োয়ান রাশ টেনে গাড়ি থামাচ্ছে, তারা মাথা ঝাঁকিয়ে এমন উচ্চ হ্রেষা তুলছে যে যাত্রীরা চকিত হয়ে উঠছে আশঙ্কায়। ঘোড়ারা যেন প্রতিবাদের আওয়াজ তুলছে—এই দুর্গম পথে আমরা আর ভারী ডাকগাড়ি বইতে পারব না।

গিরিকন্দরে সঞ্চিত উষ্ণ বাষ্প অরণ্যপথ আবৃত করে উপরে উঠে আসছে। যেন কোন নিঃসঙ্গ প্রেত-সত্তা কাউকে আশ্রয় করে বিশ্রাম নেবার আশায় ঘুরে মরছে এলো-মেলো। রাতের হিমেল কুয়াশা ছোট ছোট ঘূর্ণিতে আবর্তিত হয়ে চারদিক ব্যাপ্ত করে লুপ্ত করে এগিয়ে আসছে। যেন কোন অমঙ্গলের সমুদ্রজলে মগ্ন হচ্ছে দিগ্‌দিগন্ত। সেই কুয়াশায় ডাকগাড়ির আলো নিষ্প্রভ। আশে-পাশে সম্মুখে পশ্চাতে

শুধু রাশি রাশি অন্ধকার। পরিশ্রান্ত অশ্বদের নাসা থেকে নির্গত প্রশ্বাস উষ্ণ বাষ্পাকারে উপরে উঠছে।

তিনজন যাত্রীরই সর্বাঙ্গ ভারী পোশাকে ঢাকা। পায়ে বুট আর শরীরই শুধু নয়, মনও তাদের সম্পূর্ণ আড়াল করা। কেউ কারুর পরিচয় জানে না। প্ররে দেখলেও পরস্পরকে চিনে নেবে এমন উপায় ছিল না। এর কারণ, সেকালে পথচারীদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হত। পথের যে-কোন সহযাত্রী আচম্বিতে দস্যু বা দস্যুর সাগরেদরূপে আত্মপ্রকাশ করলে বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। পথের যে-কোন সরাইখানায় কি পানশালায় সেই সব কাপ্তেনদের মস্তানরা আড্ডা করে থাকত। তাদের ভিতর আস্তাবলের সহিস থেকে জমিদারবাবু কে যে নেই তা বোঝার উপায় থাকে না। সেই এক হাজার সাত শ প'চাত্তর সালের নভেম্বরের এক শুক্রবার রাতে সুটার পাহাড়ের উপর-ওঠা ডাকগাড়ির আসনটিতে দাঁড়িয়ে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রেখে ডাকগাড়ির পাহারাদারও সেদিন এই কথাই ভাবছিল। তার হাত ছিল অস্ত্রের পেটিকার উপর।

ডাকগাড়ির যা রীতি এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রহরীর সন্দেহ যাত্রীদের। যাত্রীর আতঙ্ক সহযাত্রী ও প্রহরী। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না কেউ। শুধু জানোয়ারগুলোকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত নয় গাড়োয়ান।

'ওঃ হো'—গাড়োয়ানের চিৎকার শোনা যায়—আর একটা দৌড় বাপধনরা, তা হলেই পাহড়ের টঙে উঠে পড়ব আমরা। কি যন্ত্রণায় যে পেঁাছে দিচ্ছ সে আমিই জানি।'

'কে হে?' পাহারাদারের গলা।

'কটার ঘড়িতে ঘা দিল?'

'এগারটা বেজে গেছে।'

'হা কপাল। এখনও চড়াই শেষ করতে পারলাম না। এঃ এঃ। চ বাবারা চ চ।' চাবুক খেয়ে ক-টা ঘোড়া চাঙ্গা হয়ে ছুটতেই বাকি ক-জন হুড়মুড় করে ছুটতে লাগল।

ডাকগাড়ি আবার সেই পার্বত্য-পথ ভেঙে কাদা ঠেলে এগোতে লাগল। যাত্রীরা এতক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিল, এবার গাড়ির পাশে পাশে চলতে লাগল। সব যাত্রী চলেছে পাশাপাশি—কেউ আগে পিছে নয়। একজন যদি অপর কাউকে এগিয়ে চলতে অনুরোধ করে এ অন্ধকার আর কুয়াশার মধ্যে, তবে ডাকাত সন্দেহে তার গুলি খেয়ে মরা আছে কপালে।

শেষ দৌড়ে ডাকগাড়ি গিয়ে পেঁছল মাথায়। ঘোড়ারা আবার বিশ্রাম পেল। পাহারাদার নেমে উতরাইএর জন্য গাড়ির চাকাগুলি সাফ করে নিল। যাত্রীরা বসবেন বলে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

'হুঁশিয়ার হো'—এমন সময় গাড়োয়ান সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

'কি হল?'

'এই পথে ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে।'

'ঘোড়ার খুরের আওয়াজই বটে।' উঠে দাঁড়িয়ে পাহারাদার যাত্রীদের সতর্ক করে দিল। তার পর বন্দুক বাগিয়ে নিয়ে দাঁড়াল।

আমাদের পরিচিত লোকটি সেই মাত্র পাদানিতে পা দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুক-ছিলেন। বাকি দুজন এখনও পথে দাঁড়িয়ে। সেই অবস্থায় তিন জনেই স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রহরী গাড়োয়ান যাত্রী সবাই উৎকীর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সেই অশ্বখুরধ্বনি। একবার গাড়োয়ান—তার পর পাহারাদার, আবার পাহারাদার থেকে গাড়োয়ান—চোখ ফিরতে লাগল সন্দেহে। গাড়োয়ান পাহারাদারও মুখ ফিরিয়ে দেখল। সেই পার্বত্য-পথে এতক্ষণ অবধি কেবল ডাকগাড়ির ঘড়ঘড়ানি নৈশ বাতাসকে প্রকম্পিত

করছিল। এখন গাড়ি থামতে হঠাৎ সব নিঝুম। ঘোড়াদের শরীরের কাঁপুনিতে গাড়িটা যেন উৎকণ্ঠায় থরথর করছে। অজানিত আশঙ্কায় যাত্রীদের হৃদ্‌স্পন্দন যেন দুমদুম করে বাজছে। কণ্টকিত নিস্তব্ধতা, হিমেল রাত্রির রহস্য আর শ্রান্ত যাত্রীদের উদ্বিগ্নতা, সব মিলে যেন শঙ্কা মূর্তিমান হয়ে উঠল।

পাহাড়ের ঊর্ধ্বমুখী পথে বেগে ধাবমান অশ্বখুরধ্বনি মুহূর্তে মুহূর্তে নিকটবর্তী হচ্ছে।

'রো—খো'—বুক ফাটিয়ে চিৎকার করল প্রহরী। 'রো-খো। নয় তো গুলি করব।'

চকিতে সেই ধ্বনি থামল। তার পর ঘন কুয়াশার অন্তরাল থেকে প্রশ্ন এল—ডোভারের ডাকগাড়ি নাকি?'

'কে তুমি?'

'এ কি ডোভারের ডাকগাড়ি?'

'কি তোমার দরকার?'

'এক জন যাত্রীর খবর চাইছি।'

'কি নাম?'

'মি. জার্ভিস লরি।'

আমাদের পরিচিত যাত্রীটির আচরণে সবাই তাঁর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানল।

'যেখানে আছ সেখান থেকে নড়বে না।' প্রহরী অদৃশ্য অতিথিকে উদ্দেশ করে বলল—'একবার ভুল হলে সারা জীবনে তা আর শুধরে নেওয়া চলবে না। মি. লরি, আপনি সাড়া দিন।'

ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে লরি বললেন—'কি দরকার? জেরির গলা মনে হচ্ছে।'

'আপনার জন্যে টি এ্যান্ড কোম্পানি থেকে খবর এনেছি। আমি জেরি।'

'লোকটি আমার পরিচিত'—বলে লরি পাদানি থেকে নামলেন। বাকি দুজন রূঢ় হাতে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে গাড়ির ভিতর গিয়ে বসল। দরজা বন্ধ করে জানালা তুলে তারা নিশ্চিন্ত হল। কাছে আসতেও পারে। সাবধানের বিনাশ নেই।

'পা ফেলে এগিয়ে এস'—ভারী গলায় বলল পাহারাদার—'হাতে যদি কিছু থাকে, হাত মাথার ওপর তুলে এগোবে। নইলে এই সীসের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।'

সেই তরঙ্গময় কুয়াশা-সমুদ্রের অভ্যন্তর হতে অশ্বারোহী এগিয়ে এসে ডাকগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে লরির হাতে একখানি কাগজ দিল। বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসার চিহ্ন অশ্বটির স্বেদসিক্ত দেহে। ঘোড়ার খুর থেকে অশ্বারোহীর টুপির প্রান্ত অবধি পদোৎক্ষিপ্ত কর্দম।

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে লরি বললেন—'প্রহরী।'

সতর্ক প্রহরীর দুই হাত বন্দুক-বারুদে উন্মুখ। সে কাটা জবাব দিল,—'বলুন, স্যর।'

'ভয়ের কিছু নেই। টেলসন ব্যাঙ্কে কাজ করি আমি। লন্ডনের টেলসন ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই জান তুমি। এখন প্যারিস যাচ্ছি ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে। এই নাও তোমার জলখাবার। চিঠিটা পড়ে নিই?'

'চটপট সেরে নেবেন কিন্তু।'

গাড়ির বাতির কাছে গিয়ে কাগজটি খুলে ফেললেন তিনি। প্রথমে মনে মনে পড়ে নিয়ে তার পর সরবে পড়লেন—'শ্রীমতীর জন্য অপেক্ষা করবে ডোভারে।'

'দেখলে তো ভাই, মোটেই দেরি হল না। আচ্ছা জেরি, তুমি গিয়ে আমার এই জবাব জানাবে—বেঁচে উঠেছে।'

ঘোড়ার পিঠের উপর নড়ে বসল জেরি। 'এ কি অদ্ভুত জবাব!'

'যা বললাম তাই গিয়ে জানাবে। তা হলেই তারা জানবে যে আমি ঠিক ঠিক পেয়েছিলাম চিঠি। সাবধানে যাবে। আচ্ছা, তুমি এস।'

লরি ডাকগাড়ির ভিতর গিয়ে বসলেন। বাকি দু'জন আরোহী ইতিমধ্যে তাদের দামী ঘড়ি, আঙটি ও টাকার থলে ভারী বুটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল। এখন তারা ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

এতক্ষণে গাড়ি উতরাই-পথে নামতে লাগল। কুয়াশা আরও ভারী হয়ে জড়িয়ে ধরছে ডাকগাড়ি। প্রহরী এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে তার বন্দুক-বারুদ রাখল। পরীক্ষা করে দেখল তার জরুরী কাজের মালগুলি যথাস্থানে আছে কি না।

তার পর মৃদু স্বরে গাড়োয়ান ডাকল,—'টম।'

'হ্যালো—জো!'

'জবাবটা শুনেছিলে?'

'শুনলাম বই কি।'

'কিছু বুঝলে?'

'মোটেই না।'

'কি আশ্চর্য! আমিও মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারিনি।'

সেই জগৎজোড়া কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্যে জেরি ততক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। ক্লান্ত ঘোড়াকে হাঁপ ছাড়তে দিয়ে সে নিজের মুখ জামা-কাপড় যথাসাধ্য পরিষ্কার করে নিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগল তীব্র বেগে গড়িয়ে যাওয়া ডাকগাড়ির চক্রধ্বনি। এক সময় সে শব্দও মন্দীভূত হয়ে এল। তখন নির্জন নিস্তব্ধ পার্বত্য-পথে জেরি অশ্ব-সঙ্গী নিয়ে ধীর পায়ে নামতে লাগল।

বেঁচে উঠেছে। আচ্ছা জবাব তো! কিন্তু তুমি জান না জেরি, এ মামুলী উত্তর নয়। যদি কোনদিন এমনি বেঁচে-ওঠা ঘন ঘন ঘটতে থাকে তবে পরিস্থিতি ঘোরালো আর সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে তোমার বিপদও কমবে না।

৩ তিমির রাত্রির ছায়া

দুনিয়ার প্রত্যেকটি লোক আপন খোলসের মধ্যে কি গভীর গোপন,—কি গূঢ় রহস্যময়, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। রাতের অন্ধকারে নগরীর ভিড়-করা প্রতিটি গৃহের ছায়াবৃত গোপনীয়তা কত গভীর! শুধু গৃহ কেন, প্রতিটি কক্ষের নিজের রহস্য! প্রতিটি স্পন্দিত হৃদয়ের গভীরে কত অন্তর্মূল গোপন কামনা-বাসনা। হয়ত-বা ভয়, হয়ত-বা সে বিভীষিকা মৃত্যুর। এ প্রিয় গ্রন্থের পৃষ্ঠা আর ওলটাতে চাই না। কোন দিন এ-গ্রন্থের বস্তু-সম্ভার সব জানব, সে আশাও সুদূরপরাহত মনে হয়। একদা ক্বচিৎ আলোকপাতে যে অতল জলরাশির মধ্যে দেখেছিলাম গুপ্ত কত রত্নরাজি, কত উপাদান সামগ্রী, চিরকালের মতো সে-সকল আমার নয়নের অগোচর হয়ে গেছে। একটি পৃষ্ঠা পাঠের পর এক বসন্ত দিনে সে গ্রন্থ চিররুদ্ধ হয়ে যাবে এই বুঝি ছিল নিয়তির নির্দেশ। আলোকিত জলাভ্যন্তরে যে-রহস্য আমি নিরীক্ষণ করেছিলাম, সহসা কার ইঙ্গিতে তা অগাধ তুষারে রূপান্তরিত হল। নির্বোধের মতো আমি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বন্ধু নিয়েছে, প্রতিবেশী নিয়েছে, প্রাণপ্রিয় যে ভালোবাসার ধন তাও ছিনিয়ে নিয়েছে মৃত্যু। আমার সত্তার যে নিগূঢ় গোপনীয়তা তার ভার আমি একাই বইব সারা জীবন।

ডাকগাড়ির ছোট্ট পরিসরের মধ্যে তেমনি তিনজন আরোহী আপন আপন রহস্য নিয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে আছে। গাড়ি চলেছে শব্দ ক'রে। মনে হচ্ছে যেন প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা গাড়ির সওয়ার—যেন এক এক মহাদেশের ব্যবধান মাঝখানে।

ঢিলে মেজাজে চলছিল অশ্বারোহী জেরি। অনেকবার পানশালায় সে থামল, সামলে রইল—কথা বলল না। মাথার টুপিটি সযত্নে চাপিয়ে মুখ রাখল অন্তরালে, দুটি চোখের ভাব রইল অপ্রকাশ। গলার মাফলার ঢাকা দিয়ে রাখল তার সম্পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয়।

'না—না'—আপনমনে বিড়বিড় করল সে—'এ সব তোমার পোষাবে না বাপু। তুমি ভালো মানুষ। কাজ-কারবার করে তোমার চলে। তোমার কি এ সব পোষায়! বেঁচে উঠেছে। লোকটা নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায় জবাব দিয়েছে।'

যত বার উত্তরটা মনে পড়ল বুদ্ধি যেন ঘুলিয়ে যেতে লাগল তার। মাথাটা চুলকে নেবার ইচ্ছা হতে লাগল—যে মাথার মাঝখানে একটি টাক ঘিরে পাহাড়ের ঢালুর মতো কালো খাড়া খাড়া চুলের বন।

টেলসন ব্যাংকের প্রহরীকে সে জানাবে এই জবাব। প্রহরী জানাবে বড়কর্তাদের এদিকে রাত যত এগিয়ে চলেছে, জবাবের রহস্যময়তায় তার মনেও ঘোর লাগছে। ঘোড়াও পথের আলোছায়ায় যেন শঙ্কিত হয়ে চলেছে।

রাতের প্রহর এগিয়ে চলে। তিনজন যাত্রী নিয়ে পুরনো ডাকগাড়ি সশব্দে দুলে দুলে এগিয়ে চলে। আর আরোহীদের আধ-জাগ্রত চোখের সামনে নানা রহস্যমূর্তি ছায়ার মতো সরে সরে যায়—নানা চিন্তার ছায়ামূর্তি আনাগোনা করে।

ডাকগাড়িতে ব্যাংকের বিভ্রম ঘটল। ঝোলানো চামড়ার মধ্যে হাত আটকে আমাদের পরিচিত যাত্রীটি তন্দ্রাতুর চোখে বসেছিলেন। গাড়ির ঝাঁকুনিতে পাশের লোকের গায়ে হেলে-পড়া থেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছেন! বাতির টিমটিমে আলোয় মনে হচ্ছে যেন সামনের ঐ দুটি মনুষ্য-মূর্তি মোটা টাকাভরা থলি। বল্‌গার ঝনঝনানি যেন টাকার ঝংকার। বিরাট টাকার লেনদেন হচ্ছে জড়িত চোখের সম্মুখে। একটু পরেই সেই ভূগর্ভস্থ স্ট্রং রুমের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল মনশ্চক্ষে। মস্ত এক চাবি আর একটি বাতি নিয়ে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। কতদিনের পরিচিত সেই সব সিন্ধুক খুলে ঠিক তেমনি নিরাপদ রয়েছে। যেমন রেখে এসেছেন তেমনি।

কুয়াশা আর তিমিরান্ধকার মনে যেন নেশা লাগিয়েছে। ব্যাংকের স্বপ্নের সঙ্গে আর একটি অনুভূতি সারা রাত্রি ধরে মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। যেন কবর খুঁড়ে কা-কে বের করতে যাচ্ছেন।

রাত্রির পটভূমিকায় সেই অগণিত ছায়ামূর্তির মধ্যে কোন্‌টির সাদৃশ্য আছে সেই কবরস্থ মুখটির সঙ্গে তার হদিস্ মেলে না। সব ক-টির মুখেই সেই পঁয়তাল্লিশ বছরের ছাপ। পার্থক্য শুধু ব্যঞ্জনায় আর তার গলিত বীভৎসতায়। কিন্তু মুখ সব একই। দর্প-ঘৃণা-আত্মসমর্পণ-শোক কত ভাব প্রকাশিত সেই সব মুখে। তাদের বসা গাল, মুখ বিবর্ণ, শীর্ণ হাত পাণ্ডুর। কিন্তু সব মুখে সেই এক মুখের প্রতিচ্ছবি। শতবার তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন—'কতদিন রয়েছ কবরে?'

প্রত্যেকটি ছায়া-মুখ সেই একই উত্তর দিল—'হল বই কি আঠার বছর।'

'কবর থেকে আর উদ্ধারের আশা ছিল কি?'

'সে আশা বহু দিন ত্যাগ করেছি।'

'তুমি আবার বেঁচে উঠবে?'

'তাই তো শুনছি।'

'বাঁচার ইচ্ছে হয়?'

'তা বলতে পারি কই?'

'সে মেয়েটিকে ইচ্ছে করে দেখতে? আসবে তাকে দেখতে?'

এ-কথার কত রকম উত্তর পেলেন তিনি। একবার ভাঙ্গা গলায় জবাব পেলেন—'তাড়াতাড়ি ক'রো না। তাকে হঠাৎ দেখলে আমি মরে যাব।' একবার কান্নাঝরা মুখে শুনলেন মিনতি—'আমায় নিয়ে চল তার কাছে।' কখনো-বা সে মুখে অগাধ বিভ্রান্তি। নিষ্পলক দৃষ্টি তুলে বলল—'কে সে? আমি তাকে চিনি না। বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

একটি উত্তর শোনেন আর তাঁর স্বপ্ন-প্রমত্ত মন মৃত্তিকা খুঁড়তে থাকে। কখনও শাবল দিয়ে কখনও সেই মস্ত চাবিটা দিয়ে, কখনও-বা খালি হাতে। এক সময় সেই বীভৎস গলিত শবটাকে কবর থেকে তোলেন। শবের মুখে চুলে মাটি মাখানো। কিন্তু হঠাৎ যেন সেই মৃতদেহ ধসে গুঁড়িয়ে পড়ে মাটিতে। চমকে ওঠেন তিনি। ডাকগাড়ির জানালা নামিয়ে বাইরের কুয়াশা আর বৃষ্টির স্পর্শ নেন গালে মুখে। বাস্তবের স্পর্শে স্বপ্নের ঘোর কাটে।

আবার কখন সব একাকার হয়ে যায়। রাত্রির বাস্তব ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নের আচ্ছন্নতা মিলে-মিশে যায়। সব যেন আবছায়া অস্পষ্ট হয়ে আসে। শুধু আচ্ছন্নতার মধ্যে সেই প্রেতমূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবার।

'কত দিন রয়েছ কবরে?'

'তা হল বই কি প্রায় আঠার বছর।'

'বাঁচতে ইচ্ছে করে?'

'কি জানি।'

আবার সেই মাটি খোঁড়া। মাটি খুঁড়তে গিয়ে কখন সম্মুখের যাত্রীদের গায়ে আঘাত দেন। তারা আপত্তি করে। তখন চেতনা ফেরে। কিন্তু সে কতক্ষণ! আবার সেই ঘোর লাগে। আবার। একসময় কথাগুলো যেন বাজতে থাকে পরিপূর্ণ সজাগ চেতনায়। হঠাৎ দিনের আলোয় সচকিত হয়ে ওঠেন। দেখেন রাত্রির ছায়া কখন অপসারিত হয়েছে।

জানালা নামিয়ে দেখেন কুয়াশা কেটে গেছে। পার হয়েছে রাত্রি। দিন আসন্ন দিগন্তে। সূর্য উঠছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে। মাটি বন পর্বত এখনও হিম, তবু আকাশ নির্মল স্বচ্ছ। সূর্য উজ্জ্বল সুন্দর। চষা-মাঠে কারা লাঙ্গল ফেলে গেছে। অদূরে বনে বনস্পতিদের শাখায় আরক্তিম লাল আর সোনা হলুদ রংয়ের পাতাদের সমারোহ।

সেই নবোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আপনমনে বললেন তিনি—'আঠার বছর। হা ভগবান, আঠার বছর জীবন্ত কবরে কাটানো! আঠার বছর!'

৪ উদ্যোগ

দুপুরের আগেই ডাকগাড়ি পেঁছিল ডোভারে।

হোটেলের প্রহরী গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল বিনীত ভঙ্গিমায়। এ দুরন্ত শীতের রাতে যে-যাত্রী ডাকগাড়ি করে লণ্ডন থেকে ডোভারে এলেন, তাঁকে সমাদর করা দরকার।

একটি মাত্র আরোহী ভিতর থেকে নামলেন। বাকি দুজন ইতিমধ্যে পথের ধারে নেমে পড়েছে। গাড়ির ভিতরের নোংরা খড় আর ঠাণ্ডায় তার শরীর-মনে একটা দুর্বিষহ গ্লানি লেগেছিল। গা ঝেড়ে তা ফেললেন যেন।

লরি নেমেই প্রশ্ন করলেন—'কাল নৌকো পাওয়া যাবে?'

'আবহাওয়া যদি ভালো থাকে আর হাওয়া ওঠে, তবে বেলা দুটো নাগাদ নৌকো ছাড়বে। বিছানা দরকার হবে তো স্যর?'

'রাতের আগে নয়। এখন একটা থাকার ঘর দাও তো ব্যবস্থা ক'রে। আর একজন নাপিত।'

'আসুন স্যর। এখুনি সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এই যে স্যর। এই দিকে। কোন অসুবিধে হবে না।'

একটু পরে লরি যখন খাবার-ঘরে এলেন, দেখলেন তিনি ভিন্ন আর একটি মাত্র লোক প্রাতরাশ সামনে নিয়ে বসে আছেন। লরির সর্বাঙ্গ দামী পোশাকে ঢাকা। সেই পোশাক সুগঠিত দেহের সঙ্গে চমৎকার মানানো। চোখ দুটিতে সিক্ত উজ্জ্বল দীপ্তি। মুখে একটা সমাহিত গাম্ভীর্য যা দীর্ঘদিন ব্যাংকের গুরু দায়িত্বের সঙ্গে বর্ষে বর্ষে গভীরতর হয়েছে। নিটোল কপালে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আজও অবধি দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েনি মুখে, যদিও বয়সের রেখা কয়টি স্পষ্ট চোখে পড়ে। টেলসন ব্যাংকের অন্যান্য কর্মচারীদের মতো এরও কাজ হল পরের ঝঞ্ঝাট পোয়ানো। আর পরের ঝঞ্ঝাট পরের সজ্জার মত অনায়াসেই ঝেড়ে ফেলা যায় সমস্ত শরীর-মন থেকে। মানুষটি এমন নিথর হয়ে বসে আছে যেন কোন শিল্পীর সামনে মডেল হয়েছে।

লরিও তেমনি ভাবে বসলেন। আর বসতেই গভীর ঘুম জড়িয়ে এল দুটি চক্ষু ভরে। বেয়ারা যখন খাবার দিতে এল, সেই শব্দে তিনি জেগে উঠলেন। বললেন—'একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এসে হয়ত বলবে মি. লরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই অথবা বলতে পারে টেলসন ব্যাংকের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব। তুমি তাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে, কেমন?'

'যে আজ্ঞে। টেলসন ব্যাংকের খদ্দের আমাদের প্রচুর। হরদম লণ্ডন আর প্যারিস যাতায়াত করেন ব্যাংকের কর্মচারীরা। তা হুজুরকে তো এর আগে কখনও দেখিনি?'

'অনেকদিন আসিনি কিনা। আমরা এসেছিলাম—মানে আমি এসেছিলাম ফ্রান্স থেকে—সে প্রায় বছর পনের হল।'

খাওয়ার পর গেলেন ডোভার সমুদ্রের বালুতটে। সঙ্কীর্ণ শহরটি যেন জলক্রোড় থেকে এলোপাথাড়ি পালিয়ে উটপাখির মতো পর্বতের কানাচে মাথা গুঁজে রেখেছে। সমুদ্র-সৈকত তো নয়, যেন বালুমরু। আর সেই মরুপ্রান্তরে পাথরের নুড়ি নিয়ে সমুদ্রজলের নিরবধি ধ্বংসলীলা। রাত্রিদিন জল আক্রোশে গর্জায় উন্মত্তের মতো। শহরকে ভয় দেখায়, পাহাড়কে ভয় দেখায় আর পাড় ধসায়। শহরে নিশি-দিন ঝড়ের ঝাপটা লাগে, আর সেই প্রবল বায়ুতে লোনা জলের গন্ধ পাওয়া যায়। কেবল যখন জোয়ার আসে, কিছু লোক বালুতটে বেড়ায়। নয় তো ডোভারের উপকূল চিরনির্জন।

শীতের অপরাহ্ণ গড়িয়ে এল। আজ সারা দিনের মধ্যে অনেক বার আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছিল। এপার থেকে দৃশ্যমান হয়েছিল ওপারে ফ্রান্সের তটভাগ। এখন পড়ন্ত আলোকে আবার কুয়াশার ভার নেমে এল দিগন্ত অন্তরাল ক'রে, আর সেই সঙ্গে আচ্ছন্ন করল লরির চেতনলোক। সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্বলন্ত গনগনে আগুনের সামনে সান্ধ্য-আহারের অপেক্ষায় বসে তাঁর মন গত রাতের মতো আবার তন্দ্রাঘোরে কবর খুঁড়তে লাগল। এবার আর মাটি নয়, রক্ত-রাঙা জ্বলন্ত কয়লার কবর।

মদের পাত্রে মন দিয়েছিলেন পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে। এমন সময় গলিপথে গাড়ির ঘটাং-ঘটাং শব্দ কানে পৌঁছল।

'ঐ সে এল!' মনে মনে আবৃত্তি করলেন লরি। গ্লাসটি আর মুখে তুললেন না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেয়ারা এসে খবর দিল যে লণ্ডন থেকে মিস্ ম্যানেত এসেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

'এখুনি নিয়ে এস। থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি, চল।'

শরীর-মনের ঢিলে আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে নিয়ে লরি বেয়ারার পিছু পিছু আর একটি ঘরে এলেন। ঘনপালিশ প্রাচীন সব আসবাবপত্র। তাদের ভিড়ে কেবল দুটি বাতি জ্বলছে। ঘরের আবছা আলোয় লরির মনে হল, মেয়েটি হয়ত এখানে নয়, অন্য কোন ঘরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ঘরের মাঝামাঝি এসে দেখলেন যে, দুটি টেবিলের মাঝে আগুনের দিকে পিছন করে একটি বছর সতেরর সুকুমারী মেয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পরনে তার রাইডিং ক্লোক আর হাতে ধরা হালকা টুপির প্রান্ত। সোনালি চুল আর সমুদ্রনীল চোখ দেখে এক ঝলক স্মৃতি লরির মনের আকাশে বিদ্যুদ্বেগে উড়ে গেল। এমনি এক শীতের দিনে বিরামহীন তুষার-ঝটিকায় যখন সমুদ্র অস্থির উদ্বেল, তখন একটি স্বর্ণকেশী নীলনয়না শিশু-কন্যাকে বুকে করে তিনি চ্যানেল পার হয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্য সেই স্মৃতির পরিবেশে তিনি বেঁচে উঠলেন। কিন্তু সে ক্ষণিকের বুদ্বুদ্, যেমন আচম্বিতে উঠেছিল তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

'বসুন', মেয়েটির জিহ্বার ঈষৎ বিদেশী টান কানে বাজল। কিন্তু গলাটি মিষ্টি।

পুরনো রীতিতে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন লরি—'বস তুমি।'

'গতকাল ব্যাংক থেকে খবর পেলাম—কি যেন একটা আশ্চর্য সংবাদ মানে অভিনব আবিষ্কারই—'

'বর্ণনাটা একান্তই অবান্তর। যা হোক বললেই চলে।'

'আমার পিতা—স্বর্গত পিতা যাঁকে জীবনে দেখিনি আমি, তাঁর সম্পত্তির ব্যাপারে প্যারিসে যেতে হবে শুনে, এই দূর পথের যাত্রায় একজন অভিভাবক-সঙ্গীর জন্য আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাই।'

লরি বললেন—'তোমার ভার নিতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।'

'আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন। কিন্তু ব্যাংক থেকে শুনলাম যে, বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে আপনার মুখে বিস্ময়কর কোন খবর শোনার জন্য যেন আমি প্রস্তুত থাকি। আপনি আমায় বলুন—কি সে খবর! আমি খুবই উৎকণ্ঠিত।'

'তাই ভাবছি। কি বলে শুরু করব ভেবে ঠিক করতে পারছি না।' মেয়েটির চোখে চোখ পড়তেই দেখলেন কপাল তুলে একটি সুন্দর ভঙ্গিমায় উদ্গ্রীব আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'বিদেশে তোমায় যদি ইংরেজ তরুণী বলে পরিচয় দিই, যদি মিস ম্যানেত বলে সম্ভাষণ করি, ভালোই হবে, কি বল?'

'আপনার ইচ্ছেয় আমি বাধা দেব না।'

'তবে শোন! তোমার কাছে আমাদের ব্যাংকের একজন খরিদ্দারের কাহিনী বলব। ব্যবসায়ী মানুষ আমরা। ব্যবসা ছাড়া কথা বলতে পারি না, বোঝ তো!'

'খদ্দেরের গল্প?'

'হ্যাঁ, ব্যাংকের লোক কি না। মানুষের চেয়ে খদ্দের বলাই আমাদের অভ্যেস। তিনি ছিলেন একজন ফরাসি ডাক্তার—বৈজ্ঞানিক মানুষ—।

'তোমার বাবার মতো তিনিও ছিলেন প্যারিসের এক বিখ্যাত লোক। আর মানুষটির সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল—ব্যবসা-সংক্রান্ত গোপনীয় জানা-শোনা। সে প্রায় বিশ বছর আগে। তখন আমি ছিলাম ফরাসি ব্র্যাঞ্চে—'

'সে কত দিনের কথা?'

'বললাম তো বিশ বছর হয়ে গেল। তিনি বিয়ে করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে। আমি ছিলাম তার সম্পত্তির একজন অছি। ব্যাংক-সংক্রান্ত কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। কোন বন্ধুত্ব বা মনের ব্যাপার নয়। রোজ যেমন ব্যাংকের খরিদ্দারের সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে আলাপ-পরিচয় হয় তেমনি ধারা আর কি। আসলে আমরা ব্যবসায়ী মানুষ তো, মনের কারবারী তো নই।'

মেয়েটির কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে দেখলেন লরি। 'আপনি আমার বাবার কথা বলছেন। বাবা মারা যাওয়ার দুবছরের মধ্যে আমার মা-ও মারা যান। তখন আপনিই আমাকে ইংলণ্ডে নিয়ে আসেন। বলুন না, নিশ্চয়ই আপনি নিয়ে আসেন।'

'হ্যাঁ মা! আমিই নিয়ে আসি। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ী লোক। আমাদের হৃদয় বলে কিছু নেই। থাকত যদি—এত বৎসরে একবারও কি তোমায় দেখতে যেতাম না? কিন্তু তুমি তো আমার কেউ নও! তুমি আমার ব্যাংকের খরিদ্দার। আরও হাজার খরিদ্দারের একজন মাত্র। হৃদয়, অনুভূতি এ-সবের বালাই আমাদের কিছু নেই—করবার সময়ও নেই। কিন্তু এই অবধি তোমার বাবার কাহিনী। এর পর সব গরমিল। অথচ যে-সময় তিনি মারা গেলেন, ঠিক সেই সময়টিতে যদি মারা না যেতেন—তুমি ভয় পেও না মা, অমনভাবে চমকে উঠছ কেন?'

আচম্বিত আবেগে মেয়েটি দুই কম্পিত করতলে তাঁর হাত চেপে ধরল। লরি চেয়ারের পিছন থেকে বাঁ হাতটি এনে মেয়েটির হাত ধরলেন।

কোমল সান্ত্বনার স্বরে বললেন লরি—'উতলা হয়ো না মা। শোন। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার তো—'

লরি কিছুক্ষণ যেন নিজেই বিমূঢ় হয়ে রইলেন। তার পর আবার বললেন—'যা বলছিলাম মা তোমায়—'

'যদি তোমার বাবা মারা না যেতেন। যদি, মনে কর, একদিন হঠাৎ নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যেতেন এমন কোন ভয়াবহ স্থানে, যেখান থেকে তাঁকে সন্ধান করে বের করা অসম্ভব হত। যদি তাঁর কোন সমধর্মী শত্রুই এমন থাকত যে এমন কিছু করত যার উচ্চারণ অবধি করা মানে মৃত্যু। এই যেমন ধর, কারুর হয়ে দীর্ঘ কারাবাসে রাজি হওয়া। ধর, যদি তাঁর স্ত্রী রাজা রানী গির্জা আদালত সর্বত্র আবেদন করেও তাঁর কোন খবর না পান, তা হলে আমার ফরাসি ডাক্তারের কাহিনীর সঙ্গে তোমার বাবার জীবন-কাহিনীর আর কোন অমিল থাকে না মা।'

'আপনাকে মিনতি করছি, আপনি সব কথা আমায় খুলে বলুন।'

'বলব বই কি মা! কিন্তু তুমি অত উতলা হলে বলি কি ক'রে? আমরা কারবারী লোক, মাথা ঘুলিয়ে গেলে কাজও গোলমাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, শোন। তোমার মা তখন গর্ভবতী। তিনি ভাবলেন, এত বড় দুঃখ তিনি তোমায় জানতে দেবেন না। তার কোলে যে আসবে সে যেন জানে যে তার বাবা—তুমি অমন করে বসলে কেন মা—ঈশ্বরের নামে বলছি মা—আমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসছ কেন? কি হল তোমার?'

সযত্নে মেয়েটিকে তুলে নিলেন লরি। তার পর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'দুর্বল হয়ো না মা। অমন করে ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? তোমার মা যখন গেলেন তখন তোমার বয়স দু বছর। আর আজ? সেই শিশু আজ পরমাসুন্দরী তরুণী হয়ে উঠেছে। এই ক-বছরে একদিনও এ কালো মেঘ তোমার মনের আকাশকে আঁধার করেনি যে—কারাগারের অন্তরালে তোমার বাবা দেহ রেখেছেন—না কি ভাবে এই আঠার বছর আপন অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন—'

মেয়েটির নরম সোনালি চুলের দিকে একবার তাকালেন তিনি, তার পর দরদভরা

কণ্ঠে বললেন—'তোমার বাবা-মার খুব একটা সম্পত্তি ছিল না—তাঁদের কোন গুপ্ত দৌলতের সন্ধানও তোমায় দিতে পারব না মা।'

তাকিয়ে দেখলেন কপালের রেখায় কি কঠিন বেদনা আর হাহাকার জমা হয়ে উঠেছে। তাঁর হাত কত শক্ত করে ধরে রেখেছে মেয়েটি। তাকে বললেন তিনি—'তোমায় জানাচ্ছি মা, তাঁকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। তোমার বাবাকে পেয়েছি আমরা। কিন্তু আজ তিনি পুরনো মানুষটির কঙ্কাল মাত্র। তবু তাঁকে যে পাওয়া গেছে এই কি যথেষ্ট নয় মা! তাঁকে একজন পুরাতন পরিচিতের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি যাচ্ছি সেখানে, যদি পারি তাঁকে চিনে নিতে শুধু। তুমি তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবে। স্নেহে কর্তব্যে বিশ্রামে স্বাচ্ছন্দ্যে আবার পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলবে। মেয়ে ছিলে, মা হবে।'

লরি দেখলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা মৃদু শিহরণ প্রবাহিত হল। প্রেত-কণ্ঠে বলল—'আমি কি দেখতে যাচ্ছি মি. লরি? তাঁকে—না তাঁর প্রেতকে?'

'কিন্তু পুরনো মানুষটিকে পাওয়া গেলেও, তাঁকে পুরনো নামে পাওয়া যায়নি, মা। আজ আর তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা বা উল্লেখ করাও যুক্তিসঙ্গত হবে না। এখন প্রথম প্রয়োজন তাঁকে ফ্রান্স থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। আর সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা যাত্রা করেছি। তার একটি মাত্র সংকেত হল—'বেঁচে উঠেছে' এই দুটি কথায়। তুমি কি কিছুই শুনলে না মা।'

লরি দেখলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গ নিথর নিঃসাড় হয়ে গেছে। নিশ্বাস পড়ছে অতি মৃদু। এই আকস্মিকতার আঘাতে মেয়েটি বিহ্বল-বিবশ হয়ে পড়েছে ভেবে তিনি তার সঙ্গিনী মিস প্রসকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। প্রস এসে লরির উপর আগুন হয়ে উঠল—'আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশায়! এরকম ভয় না দেখালে নয়? আপনারা কি ভেবেছেন?'

'ভয় নেই। এখুনি সুস্থ হয়ে উঠবে ও'—বললেন লরি—'আমি আশা করি তুমি সঙ্গে যাবে মিস ম্যানেতের।'

'সেই তো ঠিক হবে'—মিস প্রস বলল—'সেই সব যদি নিয়তির লিখন না হবে তবে এইখানে এমন করে পড়ে থাকব কেন?'

এ-কথার জবাব দেওয়া কঠিন। লরি তখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না।

৫ পানশালা

মদের দোকানের দরজায় ঠেলা-গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে একটা বড় মদের পিপে মাটিতে বাদামের মতো ফেটে পড়েছে। পথের উপরেই দুর্ঘটনা।

কাছাকাছির যত লোক কাজ-কারবার ফেলে ছুটে এসেছে সেই মদ গেলবার লোভে। পথের এলোপাথাড়ি ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে সেই লাল মদের ছোট ছোট কুণ্ডের পাশে বিক্ষিপ্ত জনতার ভিড়। পথের কাদা-ধুলোর সঙ্গে মিশে-যাওয়া সেই রুদ্ধ বা প্রবাহিত মদ্যস্রোতকে নিঃশেষে শুষে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় মুহূর্তে সেই পথ কলরব-মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু সে বেশিক্ষণ নয়।

হাসি-উল্লাসে গালাগালি আর হৈ-চৈ শেষ হল তেমনি হঠাৎ, যেমন আচম্বিতে শুরু হয়েছিল। যে-লোকটি করাত দিয়ে কাঠ চিরছিল সে আবার কাজে ফিরে গেল। যে মেয়েটি গরম উনুনের ছাইয়ে অনাহারী দেহের কৃশ হাত-পায়ের আঙুলগুলি সেঁকছিল সে আবার ফিরে গিয়ে বসল দরজায় নিজের জায়গাটিতে। অন্ধকার গহ্বর

থেকে যে লোকগুলো হঠাৎ পথের উপর উঠে এসেছিল, তাদের কদাকার মুখগুলো আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। রৌদ্র-ঝলকিত পথে আবার একটা বিষণ্ণ নৈঃশব্দ্য নেমে এল।

প্যারিসের এক সঙ্কীর্ণ গলিপথে সেদিন মাটি-পাথর ভিজেছিল লাল মদে। সেই রং লেগেছিল নানা বয়সের নারী শিশু বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে। কারুর মুখে, কারুর হাতে, কারুর কপালে, কারুর সারা গায়ে। ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে গড়িয়ে-পড়া মদের রক্তধারায় একজন মানুষকে দেখাচ্ছিল যেন রক্তলোভী পিশাচ! একজন পথের পাগল সেই মদের ধারা দিয়ে দেওয়ালে রক্তাক্ষরে লিখেছিল—রক্ত!

এ পথের পাথর রক্তস্রোতে একদিন এমনি লাল হয়ে উঠবে। লাল হয়ে যাবে মানুষের শরীর, তারও বুঝি আর দেরি নেই। একি তার সঙ্কেত!

কোথা থেকে বুঝি খানিকটা জীবন উছলে পড়েছিল এই পথে। সেটুকু শুষে নিতেই আবার সেন্ট আঁতয়ানের এই অঞ্চলে সব ঝিমিয়ে গেল। আবার সেই বিষণ্ণ তরঙ্গহীন অন্ধকার। এই তিমির-রাজ্যের পাঁচ জন দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রভু। শীত, আবর্জনা, ব্যাধি, অশিক্ষা আর অভাব। এই পঞ্চরথীর সভায় অভাব হল মহারথী। বিলাস-নগরী প্যারিসের শহরতলিতে এই পথের আশে-পাশে সেই রাজ্যের এক মূর্তি প্রজা দেখতে পাবে তুমি। দেখতে পাবে সেই অভাবের চেহারা এখানকার প্রত্যেকটি দরজায় জানালায়—দেখতে পাবে পথের কোণে-কোণে। পণ্ড শোষণে এখানকার শিশুর অকাল বার্ধক্য। শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের মুখেই একটি মাত্র ছাপ—সে-ছাপ ক্ষুধার। ক্ষুধার রাজ্যই যেন। বড় বড় অট্টালিকা থেকে নির্বাসিত হয়ে ক্ষুধা যেন এই সব পথের আশে-পাশে হিংস্র লোভে ঘোরে। এখানকার বাসার বাইরে যে নোংরা কাপড় আর চট ঝোলে—পথের আবর্জনা-স্তূপে যে-ময়লা জমে, সে-সব ক্ষুধারই রূপ। সস্তা রুটির দোকানে, নোংরা মাংসের দোকানে, পচা তেলে-ভাজা খাবারের দোকানে এ পল্লীর আনাচে-কানাচে, অণুপরমাণুতে—দারিদ্র্য আর ক্ষুধা নিত্যপ্রহরী।

আর যেমন দেবতা তেমনি তার পীঠস্থান! একটা সরু নোংরা গলিপথ থেকে বেরিয়েছে আরও সরু ঘোরানো গলি সব। পচা দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে সব সময়। সে-পথে যারা বাস করে তাদের গায়েও যেমন দুর্গন্ধ পরনেও তেমনি। মুখে দিনরাত্রি হাজার ভাবনার বাসা। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ উদাস।

কিন্তু মরবার আগে পশু যেমন একবার মরিয়া হয়ে শিকারীর দিকে ফেরে, তেমনি এই সব চিন্তাক্লিষ্ট পরাজিত চোখের দৃষ্টিতে কখনও কখনও সেই মরিয়া ভাব চোখে পড়ে। চোখে পড়ে অনাহারী সাদা ঠোঁটের নিরুদ্ধ আক্রোশ। কপালের বলিরেখায় ফাঁসির পাকানো দড়ির মিল দেখা যায়।

দোকানেও সেই অভাবের স্বাক্ষর। এখানে সবই যেন নেই নেই—সর্বত্র যেন নিত্য লক্ষ্মীছাড়া ভাব। কেবল যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্রের দোকানে ভাণ্ডার পর্যাপ্ত। ছুরি আর কাস্তে এখানে যেমন ধারালো তেমনি উজ্জ্বল। একটি হাতুড়িও হালকা নয়। বন্দুকের দোকান যেন বিপ্লবের ভাণ্ডার। এ-পথে পথচারীর জন্য ফুটপাত নেই। জল-কাদা ভরা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা একেবারে বাড়ির দরজার ধারে হাজির। বৃষ্টি-পুলি দিয়ে টাঙানো এক-একটি গ্যাস বাতি। সন্ধ্যায় যখন বাতিওয়ালা সেই গ্যাস বাদলে পথের নোংরা জল গিয়ে দাঁড়ায় উঠোনে বা ঘরে। দীর্ঘ গলির মাঝেমাঝে দড়ি-জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, অল্প-অল্প হাওয়ায় সেই টিমটিমে আলোর বাতি শূন্যে দোল খায়, মনে হয় যেন আঁধার-সমুদ্রে ঝড়ের ঝাপটে উঠছে-নামছে জাহাজ। আসলে এরা সমুদ্রযাত্রীই। ঝড়ের তাড়নায় আর ঢেউয়ের ঝাপটে এরা বিপর্যস্ত নৌকারোহী।

হয়ত এমন দিনও আসতে বিলম্ব নেই যেদিন ঐ বাতিওয়ালার মতো টিমটিমে গ্যাসের বাতি নামিয়ে লোকে ঐ পুলি আর দড়ি দিয়ে টেনে তুলবে মানুষকে। ঐ

বাতির মতোই সারি-বাঁধা মানুষ ফাঁসিতে লটকে দোল খাবে। সারা ফ্রান্স জুড়ে সেই হাওয়া উঠতে আরও বুঝি কিছু বিলম্ব আছে।

পথের কোণের এই মদের দোকানটি এখানকার মধ্যে সম্ভ্রান্ত। এতক্ষণ ধরে দোকানের মালিক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল। মানুষটি রুক্ষ প্রকৃতির। বছর তিরিশ বয়স, পুরন্ত ভারী গড়ন। ছোট ছোট কোঁকড়ানো কালো চুলে সারা মাথাটি ভরা। মুখটিতে শিল্পীর হাতের ছাপ আছে। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় যে মানুষটি জেদী একরোখা প্রকৃতির।

পাগলের কীর্তি দেখে মালিক চেঁচিয়ে বলল—'কি ব্যাপার? একেবারে পাগলা গারদের খ্যাপা! কি যা-তা লেখা হচ্ছে?'

রাস্তা পার হয়ে গিয়ে কাদা লেপে মালিক রক্তলেখাটি মুছে দিল নিজের হাতে। 'রাস্তায় এ-সব লেখা কেন? আর কোথাও জায়গা পাও না লেখবার?'

যখন দোকানে ফিরে এল দেখল মাদাম কাউণ্টারের পিছনে তেমনি বসে আছে। তার বয়স স্বামীরই সমান। চোখের দৃষ্টি সজাগ। কিন্তু লোক দেখে মেয়েটি কদাচিৎ চোখ তুলে তাকায়। মুখের ভাবে শান্ত দৃঢ়তা। এ মেয়েকে দেখলেই বোঝা যায় যে বুদ্ধিতে তার কুয়াশা নেই, জীবনে ভুল করে না সহজে। সহজে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে মেয়েটি গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে হাতের সেলাই পাশে রেখে একটা ছোট কাঠি দিয়ে দাঁত খুটছিল বসে বসে।

স্বামী ঘরে ঢুকতেই ছোট্ট একটু কাশল সে। বাক্যহীন এই সঙ্কেতেই স্বামী বুঝল যে, স্ত্রীর ইচ্ছা দোকানের ওপাশে নতুন কোন খরিদ্দারের তদারক করে সে। মেয়েটি যখন কাশে ভুরু দুটি ঈষৎ উন্নীত হয় কপালে, সেটি প্রথমেই চোখে পড়ে।

মালিক এতক্ষণে দোকানের চারপাশে তাকিয়ে দেখল। ঘরের এক কোণে দুটি চেয়ারে নিরিবিলি এসে বসেছেন একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একটি কমবয়সী মেয়ে। অন্য খরিদ্দারদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যখন সে নিকটবর্তী হল আগন্তুকদের, শুধু চোখের ভাষায় ভদ্রলোকটি সঙ্গিনীকে জানালেন—এই সেই লোক। একেই খুঁজছি আমরা।

মনে মনে বলল দ্যফর্জ—'এখানে কোণ ঘেঁষে বসে কি করছেন আপনারা? আপনাদের চিনিই না আমি।'

অন্য খদ্দেররা বিদায় নেওয়া মাত্রই প্রৌঢ় লোকটি এগিয়ে এলেন। স্ত্রীর সেলাইয়ের দিকে নজর ছিল মালিকের, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন তিনি—'একটু কথা বলতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে—' দ্যফর্জ তার সঙ্গে নিঃশব্দে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোকটির প্রথম বাক্যস্ফূর্তিতেই দ্যফর্জ যেন চমকে উঠল। তার পর দু'জনে মিনিটখানেক গূঢ় আলাপ হল। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বাইরে যেতেই ভদ্রলোকটি সঙ্গিনী মেয়েটিকে ডাকলেন। তার পর তারাও বাইরে গেলেন। মাদাম নিবিষ্ট মনে সেলাই করছিল, এ সবই তার দৃষ্টির অগোচর রইল।

দরজা থেকে বেরিয়ে লরি ও মিস ম্যানেত দোকানের মালিকের পিছু-পিছু এগোলেন। ছোট উঠোনের চারপাশেই মস্ত মস্ত পিঁজরাপোলের মতো বাসা। তারই একখানির অন্ধকার টালি-বাঁধানো সিঁড়ির কাছ-বরাবর এসে দ্যফর্জ নিচু হয়ে পুরনো কর্তার মেয়েকে প্রণাম জানাল। ভাবটুকু কোমল, কিন্তু ভঙ্গিটি মোটেই মনোহর বোধ হল না লরির। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটির যেন গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে। মুখে বিন্দুমাত্র স্নিগ্ধতা অবশিষ্ট নেই, ব্যবহারে নেই শিষ্টতা। আচম্বিতে যেন গূঢ় ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর জীব হয়ে উঠেছে মনে হল।

সিঁড়ি ভাঙ্গা শুরু করেই কঠিন কণ্ঠে জানাল সে—'অনেক উঁচু। পথও দুর্গম। ধীর পায়ে চলুন।'

'একলা আছেন?'

'একলা? একলা ছাড়া তাঁর সঙ্গে থাকবে কে?'

'একলাই থাকেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'একলা থাকার ইচ্ছে বুঝি ওঁর?'

'ইচ্ছেতে নয়। দরকারে। ওরা যখন প্রথম আমায় খুঁজে পেয়ে দাবি করে যে ওঁকে আমি রাখবো কি না—এমন কি নিজের ঝুঁকিতে—সেই তখন যেমন দেখেছিলাম এখনও ঠিক তেমনি আছেন।'

'অনেক বদলে গেছেন—না?'

'বদলে?'—দেওয়ালে ঘুসি মেরে দোকানের মালিক কি-যেন একটা গালিবর্ষণ করল আপনমনে।

যত উঠছেন বুকে হাঁপ ধরছে লরির।

প্যারিসের ঘিঞ্জি রাস্তায় এই ধরনের বাড়ির সিঁড়ি ভাঙ্গা যেন পাহাড়ে ওঠা। শুধু অন্ধকার নয়, নোংরা। দু পাশের ভাড়াটেরা সিঁড়ির ধারেই নোংরা ফেলে রাখে দিন-রাত্তির। একটা পচা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ যেন বাতাসের টুঁটি চেপে আছে সব সময়। লরি দুবার থেমে হাঁপ ছাড়লেন। মাঝেমাঝে পথের দৃশ্য চোখে পড়ে জানালা দিয়ে। চারপাশেই সেই নোংরামি আর লক্ষ্মীছাড়া রূপ। শুধু অনেক উঁচুতে উঠে একবার চোখে পড়ল নোতরদম গির্জার দুটি উন্নত শীর্ষ। এই বুক-চাপা ছোটত্বের মধ্যে গির্জার ঐ দুটি চূড়া যেন মহৎ জীবনের স্বপ্ন-স্বর্গ!

অবশেষে শেষ সিঁড়ি ভাঙ্গা প্রায় শেষ হল। কোটের পকেট থেকে চাবি বের করতে দেখে লরি তাকে প্রশ্ন করলেন—'দরজায় তালা দেওয়া কেন?'

দ্যফর্জ রুক্ষ গলায় শুধু হুঁ বলে সাড়া দিল।

'দরজা বন্ধ কেন?'

'কেন? এতকাল বন্ধ দরজার অন্তরালে কাল কাটিয়েছেন। এখন সব খোলা পেলে জানি না কি সর্বনাশ করে বসবেন। হয়ত নিজেকেই টুকরো করে ফেলবেন আক্রোশে।'

'তাও কি সম্ভব?'

'সম্ভব? সম্ভব কেন নয় শুনি? এ পৃথিবীতে কি সম্ভব নয়? কি হচ্ছে না এ দুনিয়ায়? শয়তানের পৃথিবী—হয় না আবার কি?'

পুরুষ দু'জনের নিম্নকণ্ঠের আলাপ কানে না পৌঁছলেও, আপনমনের গভীর ভাব-সংঘাতে মেয়েটির মুখ এতক্ষণে ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছিল। একটা আতঙ্কের ধাক্কায় মুখের সব রক্ত সরে গিয়ে গোলাপী গাল পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে দেখে লরি তার গায়ে হাত দিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'সাহসী হও মা! এখুনি দেখ না সব চিরকালের মতো মিটে যাবে। একবার তাকে দেখলেই সব ভয় ঘুচে যাবে তোমার। তখন তোমার কত কাজ পড়বে। তাকে ভালো করে তুলবে তুমি—স্নেহ দেবে, যত্ন দেবে—তাকে সুখী করবে —তিনি তোমার—'

শেষ ধাপে যখন পৌঁছলেন, লরি দেখলেন—তিনজন লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘরের ভিতর দেখছে। কেউ দরজার ফুটো দিয়ে, কেউ দেওয়ালের ফাটা দিয়ে।

'এরা কারা?'

'তাড়াতাড়িতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, তোমরা এস ভাই। আমাদের একটু কাজ আছে।'

তিনজন নেমে যেতেই লরি রাগতকণ্ঠে দোকানের মালিককে বললেন—'এরা কারা? তুমি কি ওঁকে চিড়িয়াখানার জন্তু পেয়েছ?'

'না—দু'-একজন চেনা লোককে মাত্র দেখাই। যেমন এই আপনারা এসেছেন।'

'এ অন্যায়।'

ততক্ষণে দরজায় চাবি ঘুরিয়েছে সে। দুম-দুম করে ধাক্কা দিয়ে ভিতরের মানুষটির সাড়া জাগিয়েছে। তারপর দরজার এক পাল্লা ঈষৎ উন্মুক্ত করে কি যেন বলল। অস্ফুট এক বর্ণ প্রত্যুত্তর কানে এল অন্ধকার থেকে।

তাদের হাত নেড়ে আহ্বান করতেই লরি মেয়েটিকে সবলে বাহু দিয়ে জড়িয়ে নিলেন। দেখলেন, সে যেন সংজ্ঞা হারাবার প্রাক্-মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে।

চোখ থেকে ঝরে লরির গালে কি যেন চক-চক করতে লাগল। তিনি স্নিগ্ধ-সিক্ত কণ্ঠে বললেন—'এস মা, এস।'

'বড় ভয় করছে আমার!'

'ভয়? ভয় কিসের? কার ভয় মা?'

লরি মেয়েটিকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে নিলেন। তার পর যেন কোলে করেই ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন।

এ ঘরটি বহু কালের কাঠ-কাঠরার গুদাম। দরজা একটি। জানালাও একটি—পথের দিকে। সেই জানালায় চাকা-লাগানো দড়ি। সোজা পথ থেকে এই উঁচু অবধি মাল তোলার ব্যবস্থা। এত অন্ধকার যে প্রথমে কিছুই ঠাহর হল না লরির। তার পর চোখ একটু অভ্যস্ত হতে তিনি মেয়েটিকে নিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন।

এক সময় দেখলেন, জানালার দিকে মুখ করে একটি পক্ককেশ বৃদ্ধ একখানি বেঞ্চির উপর ঝুঁকে আপনমনে কি নিয়ে পরম ব্যস্ত। লরি নত হয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ যা তৈরি করেছেন তা মেয়েদের এক পাটি জুতো।

৬ জুতো তৈরির কারিগর

'কেমন আছেন?'—মঁসিয়ে দ্যফর্জ সেই জুতো তৈরির কাজে ব্যস্ত শুভ্র-শির মানুষটিকে বললেন।

উত্তরে সেই নত শির একবার ঈষৎ আন্দোলিত হল। দূরাগত ধ্বনির মতো শোনা গেল—'ভালো।'

'এখনও কাজ করছেন?'

কতক্ষণ পরে সেই মুখ দেখতে পেলেন লরি। দেখলেন, দুটি জ্যোতিহারা চোখ। 'কাজ করছি।' এই দুটি মাত্র কথায় যে-দুর্বলতা প্রকাশ পেল তাতে লরির হৃদয় গভীর দুঃখে ভরে উঠল। দীর্ঘদিন বন্দীজীবন যাপন করার ফলে যে দুর্বলতা শরীরে বাসা বেঁধেছে এ তারই ফল। কত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলেননি। কাল কাটিয়েছেন নিঃসঙ্গ নির্জন মূক। যেন কত কাল পূর্বের উচ্চারিত একটি ধ্বনির মৃদুতম প্রতিধ্বনি মাত্র। মনুষ্য-কণ্ঠের সজীবতা ও ব্যঞ্জনার লেশ নেই সেই ধ্বনিতে। যেন রঙ জ্বলে-যাওয়া কোন চিত্রপট। চোখের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠে মনে হল যেন মানুষটি কত কাল ধরে একাকী দিশাহারা হয়ে ফিরেছেন বনে-বনান্তরে, এতদিনে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে বন্ধু-পরিজনের স্মৃতিতে ভর দিয়ে গভীর মৃত্যু-ঘুমে অচেতন হবেন।

কতক্ষণ মৌন কাল কাটল। তার পর সেই দুটি দীপ্তিহীন চোখের দৃষ্টি তুলে আবার তাকালেন বৃদ্ধ। কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, উদ্দীপনা নেই, শুধু যান্ত্রিক অভ্যাস যেন।

দ্যফর্জ তাঁকে বলল—'আর-একটু আলো বাড়ালে কষ্ট হবে কি?'

ইতস্তত দৃষ্টি দিয়ে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বললেন—'কি যেন বলছিলে তুমি?'

'আর একটু আলো বাড়ালে কষ্ট হবে?'

'আলো এলে সহ্য করতেই তো হবে।'

আধ-ভেজানো দরজাটি খুলে দিল দ্যফর্জ। এক ঝলক আলো এসে পড়ল বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে। লরি দেখলেন মানুষটিকে। কোলের উপর আধা-তৈরি একটি মেয়েলি জুতো। আর কিছু যন্ত্রপাতি আর চামড়া। শ্বেত শ্মশ্রুতে ভরা মুখখানি। গাল দুটি বসা। দীর্ঘ চিকণ মুখের মধ্যে চোখ দুটি কেবল বড় বড়। আলো লেগে সে দুটি যেন ঝক-ঝক করতে লাগল এতক্ষণে। গায়ে একটি হলুদ রঙের ছিন্ন শার্ট। খোলা বুকটি দেখা যাচ্ছে যেন শীতের পাতার মতো শুষ্ক বিবর্ণ। কতদিন আলো হাওয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে তাঁর গায়ের রঙ আর পরিধেয় আর সব-কিছু একটা বিশীর্ণ জীর্ণতায় যেন একাকার।

আলোর জন্য হাত দিয়ে চোখ ঢেকেছিলেন। সেই হাতের দিকে তাকিয়ে লরির মনে হল যেন হাড় অবধি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মানুষটি যখনই কথার উত্তর দিচ্ছেন, এলোমেলো ভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন, যেন কথার সঙ্গে স্থানের মিল করতে পারছেন না দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে।

মেয়েটিকে দ্বারপ্রান্তে রেখে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন লরি। এক মুহূর্ত মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ—তার পর জুতোর দিকে চলে গেল তাঁর দৃষ্টি।

নত-শির বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্যফর্জ বলল—'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

'কি বলছ?'

'একজন ভদ্রলোক আপনাকে দেখতে এসেছেন। কি জুতো তৈরি করছেন এঁকে দেখান তো। আর কারিগরের নামটিও বলুন।'

কতক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। বৃদ্ধ বললেন—'কি জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো, আমি ভুলেই গেছি।' অনেকক্ষণ ধরে এক হাতের আঙুল আর এক হাতে জড়াতে লাগলেন বৃদ্ধ। মাঝেমাঝে চিবুকে হাত বুলোতে লাগলেন। এমনি ধারা করলেন কত বার। যেন বার বার শূন্যতার মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন। সেই অন্যমনস্কতাকে ভাঙতে যাওয়া যেন মূর্ছা-যাওয়া মানুষের চেতনা আনার মতো—যেন মুমূর্ষুর সাড়া জাগানো।

'কি যেন বলছিলে?'

'আপনার নাম বলুন।'

'আমার?—এক শ পাঁচ। নর্থ টাওয়ার।'

'ব্যস। আর-কিছু নয়!'

'হ্যাঁ—এক শ পাঁচ। নর্থ টাওয়ার।'

আবার সেই নৈঃশব্দ্যে ডুবে যাওয়া। সেই ক্লান্ত অবলুপ্তি।

'আপনি তো আর মুচি নন পেশায়?'

সেই দুটি জ্যোতিহীন চোখ পলকের জন্য দ্যফর্জের মুখের উপর ন্যস্ত হল। যেন প্রতিপ্রশ্ন করতে চাইলেন। তার পর ধীরকণ্ঠে বললেন—'মুচি? না না, মুচি নই আমি। কোনকালে ছিলাম না। তবে শিখেছি—শিখে নিয়েছি নিজে নিজে।' চোখের দৃষ্টি যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। আবার নিজেকে ফিরে পেয়ে বললেন—'শিখেছি—শিখে নিয়েছি—'

লরির হাত থেকে সেই সৌখিন মেয়েলি জুতোটি নেবার জন্য কম্পিত হাত প্রসারিত করলেন তিনি। সেই অবসরে দুজনের দৃষ্টি-বিনিময় হল। লরি প্রশ্ন করলেন তাঁকে, —'আমায় মনে পড়ে, ডাঃ ম্যানেত?'

হাত থেকে স্খলিত হয়ে জুতোটি পড়ল মাটিতে। প্রশ্নকারীর মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ।

'ম'সিয়ে ম্যানেত'—দ্যফর্জের দিকে দেখিয়ে লরি বললেন—'দেখুন তো ভালো করে লোকটির দিকে। আমার দিকে তাকান। কিছুই কি মনে পড়ে না আপনার? কোন পুরনো ব্যাংকার, পুরনো ব্যবসা, পুরনো চাকর-বাকর, কোন-কিছু পুরনো কি মনের ভিতর জাগে না? দেখুন না চেয়ে। ভাবুন না একটু।'

এই দুটি লোকের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখতে লাগলেন বৃদ্ধ পালটে পালটে। ধীরে ধীরে তাঁর কপালে একটি অবলুপ্ত কুঞ্চন-রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে হল বুঝি চৈতন্যোদয় ঘটছে। কিন্তু ক্ষণিকের সেই চেতন-মানস আবার এক সময় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আবার সেই বিস্মৃতির সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হলেন। স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গভঙ্গে ক্লান্ত হলেন। আবার নেমে এল অন্ধকার দু চোখ ভরে। তখন মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বৃদ্ধ আবার জুতো সেলাই-এ মন দিলেন।

'চিনতে পেরেছেন?'

দ্যফর্জের প্রশ্নের উত্তরে লরি বললেন—'পলকের জন্য চিনেছে। ভেবেছিলাম বুঝি হবে না। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য ঐ মুখে আমি বহুদিনের বিস্মৃত পরিচয় স্পষ্ট দেখেছি। চুপ। এস, আমরা সরে দাঁড়াই।'

দ্বারপ্রান্ত থেকে মেয়েটি এগিয়ে এসে বৃদ্ধের পাশে বেঞ্চির ধারে দাঁড়িয়েছে কখন। কোন সাড়া নয় শব্দ নয়, যেন একটি বিদেহী আত্মার মতো বৃদ্ধের নত মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি।

কখন বুঝি হাতের যন্ত্র বদলাতে গিয়ে মেয়েটির জামার প্রান্ত চোখে পড়ল বৃদ্ধের। চকিতে মুখ তুলে দেখলেন মেয়েটিকে। দুই দর্শক লরি আর দ্যফর্জ এগিয়ে আসছিলেন পাছে ছুরির আঘাত আসে মেয়েটির উপর। কিন্তু সে হাত তুলে থামাল।

একটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ভরে উঠল বৃদ্ধের দুটি চোখ। একটু পরে দুটি ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে যেন কি বাক্য রচনা করতে লাগল নিঃশব্দে। অনেকক্ষণ পরে সেই শব্দ ক-টি হৃৎপিণ্ডের গতির সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হল—'এ কি?'

কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মেয়েটি। সেই অবস্থায় সে বৃদ্ধের দুটি হাত নিয়ে একবার অধরে ছুঁইয়ে বুকের উপর চেপে ধরল। লরি ভাবলেন বুঝি-বা বৃদ্ধ পিতার ধ্বংসস্তূপই কন্যা বুকে আঁকড়ে নিল।

'তুমি জেলারের মেয়ে নও?'

'না।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মেয়েটি।

'তবে কে তুমি?'

তাঁর পাশে বসল মেয়েটি বেঞ্চির উপর। একবার যেন বৃদ্ধ ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। তখন পিতার বাহুতে হাত দিল সে। একটা বিদ্যুৎতরঙ্গে শিহরিত হল বৃদ্ধের দেহ। হাতের তীক্ষ্ম ছুরিকাটি রেখে বৃদ্ধ এই অজানা মেয়েটির মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

একরাশ সোনালী চুল কাঁধের উপর ভেঙে পড়েছে। সেই চুলের কয়েকটি গোছা নিয়ে আনমনে খেললেন তিনি। তার পর আবার সেই অন্ধকার।

একটু পরে নিজের গলা থেকে একটা দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন বৃদ্ধ। নোংরা কাপড়ের একটা টুকরো খুলে ভিতর থেকে দু-তিনটি সোনালী চুল বের করলেন, কত বার করে মিলিয়ে দেখলেন। বিড়-বিড় করে বললেন—'এও কি হয়? এ-ও সে-ই কি করে হয়? এ কি করে হয়?'

চেতনার সূর্যালোক এল। পরিপূর্ণ করে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। বললেন,

'সে-রাতে আমার কাঁধে মাথা রেখেছিল সে-ও—যখন আমার ডাক এল। বুঝি ভয় পেয়েছিল যে আমি চলে যাব। কিন্তু ভয় তো ছিল না কিছু। তবু ওরা যখন আমায় নিয়ে গেল জেলখানায় এই ক-টি চুল আমার জামার হাতায় জড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম জেলারকে,—'ঐ ক-টি আমায় রাখতে দিন। ওরা তো আমার শরীরকে পালাতে সাহায্য করবে না, কিন্তু আমার মনকে মুক্তি দেবে। মনে পড়ছে—সব মনে পড়ছে আমার। এই সব কথা আমি বলেছিলাম তাকে।'

কথাগুলো কল্লোলের মতো ঠোঁটের কাঁপুনিতে কতবার জড়াতে লাগল। আবার বললেন তিনি—'এও কি হয়? তবে তুমিই কি আমার সে-ই?'

মেয়েটি ফিরে তাকিয়ে শুধু মিনতি করল—'আপনারা কথা কইবেন না—নড়বেন না—দয়া করুন।'

বৃদ্ধ মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। সেই সোনালী চুল ক-টি কত বার করে বুকে চেপে ধরে অসহায় বিষণ্নকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'না—না। তুমি এত ছোট—এত সুন্দর। তুমি কি করে হবে? এই আমি। জেলখানার কয়েদী। এই হাত তুমি তো কখনো দেখনি। এই মুখ তুমি তো চিনবে না। এই গলা কখনও শোননি। না, না। সে ছিল আমাদের একদিন। আমি ছিলাম তার। কিন্তু সে কত যুগ হয়ে গেল—কত যুগ—জেলের নর্থ টাওয়ারে অন্তহীন যুগ কেটে যাবার বহু আগে—তোমার নামটি কি লক্ষ্মী মেয়ে?'

তাঁর কণ্ঠের স্নিগ্ধতায় অধীর হয়ে মেয়ে বাপের পায়ের তলায় বসল। বুকের উপর হাত দুটি জড়ো করে বলল—'আমার কি নাম। মা কে, বাবা কে, সব আমি বলব আপনাকে। কিন্তু সে এখন নয়। সব বলব আপনাকে। শুধু আমায় আপনি আশীর্বাদ করুন। আমায় একবার বুকে জড়িয়ে নিন—শুধু একটিবার।'

নিচু হয়ে বৃদ্ধ মেয়ের সোনালী চুলে মুখ রাখলেন। সেই হিমশুভ্রতার উপর যেন মুক্তির সোনালী রোদ্দুর ঝলকিত হল।

'যদি কোন মিল থাকে কোথাও—আমার কণ্ঠে, আমার শরীরে—তবে একবার দু-ফোঁটা চোখের জল ফেল তার জন্যে। সব স্মৃতি! সব চোখের জলে ভিজিয়ে দাও।'

বৃদ্ধের শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানি বুকের মধ্যে নিয়ে মেয়ে তাঁকে যেন শিশুর মতো ভোলাতে লাগল।

'যত কান্না আছে সব কেঁদে নাও। কান্নার শেষ করে দাও। আমি এসেছি তোমায় নিয়ে যেতে। এইবার তোমায় নিয়ে আমি চলে যাব ইংল্যান্ডে। পিছনে পড়ে থাকবে তোমার অপচয় হয়ে-যাওয়া জীবনের স্মৃতি—নীড় বাঁধব আমি তোমায় নিয়ে সযত্নে। তোমার কাছে বাবার কথা শুনব। মা চলে গেছেন—আমি দুঃখ পাব বলে কোনদিন আমার বাবার কষ্টের কথা আমায় জানাননি। সেই দুঃখিনী মায়ের জন্যে আর আমার জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেল। একবার ঈশ্বরের করুণা চাও—'

মেয়ের বুকে মুখ গুঁজে বৃদ্ধ যেন কত নিশ্চিন্তে শরীর এলিয়ে দিলেন। যে অপরিসীম যন্ত্রণা ও অন্যায় শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে সেই কথা ভেবে বাকি দুজনের চোখ ফেটে জল এল।

লরি এগিয়ে এসে পিতা-পুত্রীকে পরম স্নেহে তুলে ধরলেন। ঝড়ের শেষে এখন সব শান্ত হয়ে এসেছে। জীবনের ঝটিকা অবসানে এখন বিরতি।

'এখনই কি নিয়ে যেতে পারা যাবে প্যারিস থেকে সরিয়ে?'—মেয়েটি বলল।

'কিন্তু ওর পক্ষে কষ্ট কি সহ্য হবে?'

'এ বীভৎস রাজ্য থেকে পালাতে পারলে উনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন'—বলল মেয়ে জিদ করে।

লরি বললেন—'তবে তাই হোক মা। আমি নিজে ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা কাজকর্মের লোক, ও কাজ আমাদেরই পোষাবে।'

পিতা-পুত্রীকে সেই আধা-অন্ধকার চিলেকোঠায় তেমনি ভাবে রেখে লরি ও দ্যফর্জ দুজনে যাত্রার আয়োজন করতে গেলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল প্যারিসের এই শহরতলিতে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল কখন নিঃশব্দ পায়ে। তারও কতক্ষণ পরে দুজনে ফিরে এলেন যাত্রা ও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে।

শূন্য বিহ্বল বিস্মিত দৃষ্টির অন্তরালে সেই বন্দীর মনে কি ভাবতরঙ্গ উঠছিল তা এরা কেউ-ই ধারণা করতে পারল না। কি যে ঘটল তার গভীর মর্মার্থ কি তিনি বুঝলেন? আপন মুক্তজীবনের অনুভূতি কি হৃদয়তন্ত্রীতে নবজীবনের রাগিণী বাজাল? মানুষটির গূঢ় বিহ্বলতায় এক-একবার ছেদ পড়ছে তখন—যখন কন্যার কণ্ঠধ্বনিতে সচকিত হয়ে উন্মনা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তার মুখখানির দিকে।

আহারপর্ব সমাপ্ত হল মন্থর গতিতে। পোশাক-পরিচ্ছদ বদল হল। তার পর চারজনে ধীর পায়ে নামতে লাগলেন সেই দীর্ঘোন্নত বন্ধুর সিঁড়ি দিয়ে। মাঝে একবার থেমে তিনি তাকিয়ে দেখলেন উপরে।

'কিছু মনে পড়ে? কবে এসেছিলে?'

'কি বলছ?'—তার পর আবার বললেন বৃদ্ধ—'কিছু না। কত দিন হয়ে গেল।'

উঠোনে নেমে বৃদ্ধ যেন একটি পরিচিত টানা সেতুর আশায় তাকালেন। কিন্তু না দেখে যেন নিরাশ হলেন।

পথ নির্জন। কোন বাতায়নে কৌতূহলী দর্শক নেই। সেই জনহীন পথে কেবল নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দ্য এদের সাক্ষী হয়ে রইল। আর মদের দোকানের দরজায় হেলান দিয়ে মালিকের স্ত্রী গভীর মনোযোগে সেলাই করতে লাগল। তার দৃষ্টি যেন পড়ল না এদিকে।

বৃদ্ধের পিছনে-পিছনে কন্যাও গাড়িতে উঠল।

লরি উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধ তাকে মিনতি করলেন তাঁর যন্ত্রপাতি আর অর্ধসমাপ্ত জুতোটি নিয়ে আসার জন্য। মাদাম সে-কথা শুনে নিজে নিয়ে এল সেগুলো। তার পর আবার দরজায় হেলান দিয়ে তেমনি ভাবে আপনমনে সেলাই করতে লাগল। যেন কিছু দেখেও দেখেনি।

গাড়োয়ানের চাবুক খেয়ে ঘোড়ারা লাফিয়ে ছুট দিল। অর্ধস্তিমিত পথের আলোয় গাড়ির লণ্ঠনগুলো আলোছায়ায় দুলতে লাগল।

তারা-ভরা আকাশের নিচে কম্পিত এই আলোক-দ্যুতি। কত নক্ষত্র, যাদের আলোক, আজও এসে পৌঁছায়নি এই ধরিত্রীর বুকে। যারা আজও জানে না এই অপার অসীম বিশ্বভুবনে একটি মৃত্তিকাকণা এই পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে কত ন্যায়-অন্যায়, কত স্নেহ-নিষ্ঠুরতা।

রাত্রির অন্ধকারের কি দুর্ভেদ্য গূঢ়তা! কি অগোচর ব্যাপ্তি! মনকে আচ্ছন্ন করে। শীতল রাত্রি, ঘোড়ার লাগামের ঝনঝন, সম্মুখে-বসা একটি নিথর ঘুমন্ত বৃদ্ধ। আবার সেই স্বপ্নকে লরি প্রত্যাবৃত্ত করল মনে।

এই মাত্র তাকে উদ্ধার করেছেন। মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে মুক্ত বাতাসে তুলে এনেছেন।

'বেঁচে উঠতে ভালো লাগছে?'

কানে সেই পরিচিত উত্তরটি এল।

'ঠিক বলতে পারি না। কি জানি।'

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বর্ণ – সূত্র

১ পাঁচ বছর পর

ব্যাংক তো নয় যেন আদিম গুহা। যেমন ছোট তেমনি নোংরা। খদ্দেরের অসুবিধার অন্ত নেই। আর এই অসুবিধাগুলোই মালিকদের গর্ব। তাদের ধারণা, ঝক্‌ঝকে সম্ভ্রান্ত চেহারা হলে টেলসন ব্যাংকের ইজ্জত কমবে। ব্যবসা কমবে। খদ্দেরের যত অসুবিধাই ঘটুক না কেন টেলসন ব্যাংকের মালিকরা বরং ছেলেদের ত্যাজ্যপুত্র করবে, তবু ব্যাংকের শ্রী ফেরাবে না কিছুতেই।

বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। কিন্তু যে-কেউ সেই গহ্বরে প্রবেশ করে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। কাউণ্টার পেরিয়ে ভিতরের ঘরটিতে ঢুকলে চোখে আর-কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন জীর্ণ আসবাবের গন্ধে ভারী পচা বাতাস যেন বুকের উপর জগদ্দলের মতো চেপে বসে।

আর এখানকার নিয়মও অদ্ভুত। বাইরের কাউণ্টারে যারা বসে তারা পৃথিবীর মতোই প্রাচীন। ভাবলেশহীন তাদের মুখ পাথরের তৈরি মনে হয়। টেলসন ব্যাংকে অল্পবয়সী কেউ ঢুকলে দীর্ঘদিন তাকে লোক-লোচনের অন্তরালে ভিতরে বসে কাজ করতে হয়। দিনে-দিনে সেই মৃত্যুর মতো নিঝুম-পুরীতে রুদ্ধ বাতাসের আবহাওয়ায় তার ভিতরকার মানুষটি কখন বদলে যায়। টাকা গহনা আর পরের দলিলপত্র নেড়ে চেড়ে পাথর হয়ে যায় তারও মুখ-চোখ। তখন সে বাইরে আসে।

এমনি করে টেলসন ব্যাংকের ট্র্যাডিশান বরাবর চলে।

সে-যুগে মৃত্যুদণ্ড ছিল স্নানাহারের মতোই নিত্য ঘটনা। টেলসন ব্যাংকের কৃতিত্বও সে-ব্যাপারে কম ছিল না। প্রকৃতি মৃত্যুর পথে সব কিছু সমাধান করে। আইনেরই বা অপরাধ কি? যে জালিয়াত তার কপালে মৃত্যুদণ্ড। মিথ্যা দলিল করার অপরাধে মৃত্যু। টাকা-পয়সার দলিলের সামান্যতম জোচ্চুরি যে করবে তার আর বাঁচবার উপায় নেই। এই সব কারণে একা টেলসন ব্যাংকই যে কত লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবে তাতে সমাজের উপকার কিছু হয়নি—শুধু একটি কেস চিরকালের মতো খতম হয়ে গেছে।

ব্যাংকের ভিতরের আবহাওয়ার মতো মানুষগুলিও অনড়। শুধু বার-দরজার বাইরে যে-লোকটি ফাই-ফরমাস খাটে সেই কিছু নড়া-চড়া করে। বাকি সময় বসে থাকে চুপচাপ! যখন কোথাও কাজে যায়, ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে যায় নিজের জায়গায়। চেহারায় হাবভাবে ছেলেটিও যেন বাপের ছায়া।

এমনি এক মার্চের ঝড়ো সকালে বাপ ছেলেতে ঘাঁটি আগলে বসেছিল। ফ্লীট স্ট্রীটে লোক-চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে রীতিমতো। ছেলেটি চোখ পিটপিট করতে করতে সেই দিকে তাকিয়ে সব দেখছিল।

এমন সময় ভিতর থেকে সাড়া এল—'জেরি!'

ছেলেটি বাপের দিকে তাকিয়ে বলল—'যাও বাবা। আজ সকালবেলাই ডাক পড়েছে।'

বাপ যেতেই ছেলে টুলের উপর জমিয়ে বসল।

২ দৃশ্যান্তর

ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই ব্যাংকের এক বুড়ো কর্মচারী বলল—'পুরনো বেলির জেল চেন তো জেরি?'

বেশ ভারিক্কি চালে জেরি জবাব দিল—'চিনি বই কি।'

'বাঃ! আর মি. লরিকে?'

'তাকে চিনি না আবার? খুব চিনি। বেলি-বাড়িরই বরং সব চিনি না বলতে পারি। ও-সবের অত খবর কে রাখছে—বলুন না!'

'তা বেশ। এখন এক কাজ কর দিকিনি। যেখান দিয়ে সাক্ষীরা আদালতে ঢোকে সেখানকার প্রহরীকে এই চিঠিটুকু দেখাবে। মি. লরির চিঠি। তাকে দেখালেই প্রহরী তোমায় ভেতরে ঢুকতে দেবে।'

'আদালতের ভেতরে?'

'হ্যাঁ। আদালতের ভেতরে বই কি?'

বারেকের জন্য জেরির দুটি চোখের মণি যেন কাছ-বরাবর হয়ে এল। কি যেন বলাবলি করল সে-দুটিতে।

'আদালতে অপেক্ষা করব, না, চলে আসব?'

'আগে সবটুকু শোন। চিঠি দেখাবার পর ভেতরে ঢুকে তুমি তাঁর নজরে পড়ার চেষ্টা করবে। তিনি তোমায় দেখলে, সেখানে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না তোমায় ডেকে কিছু জানিয়ে দেন।'

'এই তো?'

'একজন লোক তাঁর হাতের কাছে থাকা দরকার। তুমি তাঁকে জানিয়ে দেবে যে, তুমি রইলে তাঁর দরকারে।'

চিঠিটা নিয়ে জেরি আর একবার বলল—'আজ সকালের দিকেই বোধ হয় জালিয়াতির মামলা উঠবে?'

'জালিয়াতি নয়, বিশ্বাসঘাতকতা!'

'তার শাস্তিও বড় বিশ্রী। বড় বিশ্রী দেখতে শুনতে।'

সেই প্রাচীন মুখে চশমার অন্তরালবর্তী দুটি তীক্ষ্ন চোখে যেন রাজ্যের বিস্ময় উদ্যত হয়ে উঠতে দেখল জেরি।

'তা বললে কি হয়? আইন যা, তা তো হবেই।'

'লোক মারা ব্যাপারটাই তো জঘন্য। তার ওপর আইনের নামে মানুষকে কেটে কুটিকুটি করা—ভাবলে যেন কি রকম হয়।'

'মোটেই জঘন্য নয়'—জবাব দিল বৃদ্ধ—'আইনের নিন্দে করো না, বুঝলে। নিজের সাবধান নিজে হও। নিজের বুক আর মুখ সামলে চল।'

জেরি জবাবে বলল—'বুকে আর গলায় অনেক সব জমে ভারী হয়ে আছে, স্যার। কি কষ্টে যে রুটি রোজগার করি তা তো আপনার অজানা নয়?'

'জানি সবই। তার আর কি করা যাবে বল? নানা লোক নানা রকমে করে খাচ্ছে। কারুর বা কষ্টে কারুর বা কিছু আরামে।'

চিঠি হাতে নিয়ে জেরি বিদায় নিল।

সেকালে ফাঁসি হত টাইবার্ণে। নিউগেটের বার-রাস্তার তাই কোন দুর্নাম রটেনি তখনও। কিন্তু জেলখানা ছিল নরক। যত রকম নোংরামি ব্যভিচার রোগের আড্ডা এই সব জেলখানা। কয়েদীদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব রোগ ছড়িয়ে পড়ত আদালত অবধি। কতবার এমন হয়েছে যে, কয়েদীদের ছড়ানো রোগে তাদের ফাঁসির আগেই বিচারকের নিজের

পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে গেছে। ওল্ড বেলি-জেলকে লোকে পরলোকের ফটক বলেই জানে। এখান থেকে যে কতজন ওপারে চলে গেছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। কত রকম গাড়ি করে কয়েদীরা যায় এখান থেকে। সেখানকার ফাঁসি-কাঠেরই বা কত ঘটা! চাবুক মারার ব্যবস্থারই বা কত রকম-ফের!

সেই জেলখানা আর আদালতের উঠোন পেরিয়ে অভ্যস্ত পায়ে জেরি নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে গেল ভিড় ঠেলে-ঠেলে। শেষ অবধি সাক্ষীদের কাঠগড়ার দরজার প্রহরীর হাতে পৌঁছে দিল চিঠিখানি। আদালতে আজ ঠাসাঠাসি মানুষের ভিড়। যত লোক থিয়েটারে বা সঙ-এর আড্ডায় ভিড় করে, তার চেয়ে বোধ করি এখানে ভিড় কম নয়। বেলি-বাড়ির সব ক-টি দরজাতেই তাই নিয়ত প্রহরী। কেবল একটি সদর দরজা নিত্য খোলা থাকে। সে-পথ দিয়ে চোর-জোচ্চোর-খুনীরা সমাজ থেকে সোজা এখানে এসে ওঠে। তার পর বিচার হয়। তার পর সোজা ফাঁসিতে—না হয় অন্য কোন সাজায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজা ঈষৎ ফাঁক হল। সেই স্বল্প-উদ্ঘাটিত পথে কায়ক্লেশে ভিতরে প্রবেশ করল জেরি।

স্থির হয়ে বসে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করল সে,—'এখন কি চলছে?'

'এখনও আরম্ভ হয়নি।'

'আগে কি হবে?'

'সেই রাজদ্রোহের মামলা।'

'অর্থাৎ সেই পোড়ানো, চোখ ঝলসানো, কিমা-করা তো?'

লোকটি যেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিল—'হ্যাঁ গো। প্রথমে ফাঁসিতে লটকিয়ে দেবে। জিভ বেরোবার আগেই নামিয়ে নিয়ে তার চোখের সামনেই তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটবে। তার পর পেটের মাল-মসলা বের করে ঝলসিয়ে পোড়াবে। সব দেখবে লোকটা তোয়াজ ক'রে। তার পর শেষ অঙ্কে কুচ করে গলাটা কেটে নেবে। শাস্তিটা মন্দ বাতলায়নি, কি বল?'

'আগে অপরাধী সাব্যস্ত হলে তবে তো?'

'সে ভাবনা নেই বন্ধু। অপরাধী হয়েই আছে।'

এতক্ষণে মি. লরি তাকে দেখেছেন। মাথা নেড়ে তাকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করে আবার বসলেন। লরির বিপরীতে এক ভদ্রলোক মাথায় পরচুলার রাশ পরে রাশভারী হয়ে বসে আছেন। তাঁর চালচলন লক্ষ্য করতে লাগল জেরি। লোকটি অবিরত কি যেন খুঁজছেন আদালত-ঘরের ছাদের দিকে। দুটি হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। যেন নিরালম্ব ভাব।

এতক্ষণে জজ এলেন। মুহূর্তে উদ্বেল-মুখর জনসমুদ্র নিস্তরঙ্গ বোবা হয়ে গেল। দুজন প্রহরী এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল আসামীকে।

যে-লোকটি নিরন্তর আদালতের ছাদে কি যেন অন্বেষণ করছিলেন, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আসামীর দিকে তাকাল। যেন এক দমক ঝড়ের মতো, এক ঝলক আগুনের মতো, যেন এক রাশ জলোচ্ছ্বাসের মতো সমস্ত জনতার নিশ্বাস গিয়ে পড়ল তার উপর। থামের অন্তরাল থেকে, ঘরের কোণ থেকে, তীক্ষ্ম কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। মানুষটির শরীরের প্রত্যেকটি বিন্দু চিনে নেবার জন্য যেন মুহূর্তে একটা সাজসাজ রব পড়ে গেল চারদিকে।

বছর পঁচিশ বয়স। কালো চোখ। সুশ্রী সুঠাম তরুণ যুবা। দুটি গালে রৌদ্রের তাম্রাভা। সমস্ত অবয়বে নিখুঁত সজ্জনতা। গাঢ় ধূসর বর্ণের সাজ সর্বাঙ্গে। আসামীর কাঠগড়ায় এসে যথাসাধ্য সৌজন্যের সঙ্গে লোকটি জজকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। আজকের পরিবেশে তার মনের ভিতর যত ঝড়ই উঠুক না কেন, তার কপোলের তাম্রাভার ভিতর দিয়ে

এমন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল, যা দেখে একটুকু বুঝতে বিলম্ব ঘটে না যে মানুষটির ভিতরে একটি হার-না-মানা সূর্য-আত্মা সদা জাগরূক হয়ে আছে।

যে দৃষ্টিতে আজ জনতা তাকে গিলছিল, তার মধ্যে করুণা ছিল না। বরং লোকটির অপরাধের গুরুত্ব যদি কম হত, যদি শাস্তির পরিমাণ হ্রাস হবার কোন কারণ ঘটত, তবেই সমবেত জনতার আশাভঙ্গের অন্ত থাকত না। এমন সুন্দর একটি নবীন যুবক-দেহ কি ভাবে অস্ত্রে চাবুকে দড়িতে আগুনে মুহূর্তে বিদলিত বিগলিত হবে, তারই উজ্জ্বল প্রত্যাশায় লোকে ধৈর্য ধারণ করে রয়েছে। মানুষের মধ্যে যে আদিম পিশাচ আজও মরেনি, তারই সুস্পষ্ট সদম্ভ আবির্ভাব যেন আজকের এই উত্তেজিত জনতার মধ্যে।

চুপ চুপ! ফালতু আদমি একদম চুপ!

আসামী চার্লস ডার্নে। গত কাল রাজদ্রোহের অপরাধ অস্বীকার করেছে আসামী চার্লস ডার্নে। আমাদের মহামান্য ইংরেজ সরকারের সৈন্য-সামন্ত ও সামরিক প্রস্তুতির খবর বিশ্বাসঘাতক আসামী নানা ছলে-কৌশলে বিদেশি ফরাসি-রাজ্যের গোপন দপ্তরে পৌঁছে দিয়েছেন বহুদিন ধরে। এই কাজের জন্য নানা ভাবে নানা সময়ে সে এদেশ থেকে ফরাসি দেশে পাড়ি দিয়েছে। সেই গুরুতর রাজদ্রোহিতার অপরাধে ধৃত আসামী ডার্নে আজ তার চরম বিচারের সম্মুখীন হয়েছে।

আইনের শত-সহস্র কূট জালের বিস্তারের মধ্যে মূল কথাটি এইটুকুই উদ্ধার করতে পারল জেরি। এবার অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তৃতা।

যে মানুষটির দেহের সদগতির কত মধুর কল্পনা লোকের মনে-মনে ফিরছিল, সেই আসামী চার্লস ডার্নে কিন্তু আদালতের কার্যধারা নীরব প্রশান্তির সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল। তার চারপাশে আদালতের মেঝেতে নানা ওষধি-ভিনিগার ছড়ানো, যাতে আসামীর রোগ কোনভাবে চারদিকে না সংক্রামিত হতে পারে।

একবার মুখ ঘোরাতেই আসামীর দুটি চক্ষু স্থির নিবদ্ধ হয়ে গেল। তার সেই ভাবান্তর লক্ষ্য করা মাত্রই সমস্ত আদালতের চোখ ঠিকরে পড়ল আসামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে দুটি নারী-পুরুষের উপর।

দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে একটি বছর কুড়ির মেয়ে তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে বসেছিল। লোকটির চুল যেন ধবল গিরি। সমস্ত মুখে কি-এক প্রগাঢ়তা যা অনির্বচনীয়। সে-প্রগাঢ়তা কর্মে নয়, মর্মে। যতক্ষণ মানুষটি মৌন হয়ে বসেছিলেন, তাঁর সব-কিছুর মধ্যে জীর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এখন কন্যার সঙ্গে কথা বলছেন, মুখের সেই নিস্তরঙ্গ গাঢ়তা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এখন দেখে মনে হয়, যেন মানুষটির জীবনের অপরাহ্ণ বেলা এখনও অনেক দূর—সায়াহ্নের প্রশ্নই ওঠে না।

পিতার একখানি হাতের উপর নিজের কোমল করতল রেখে মেয়েটি অবাঙ্‌ময়ী হয়ে বসে আছে। অপরাধীর প্রতি গভীর করুণায় যেন তার মন আর্দ্র হয়ে উঠেছে, সারা মুখে সেই স্নিগ্ধতা। আসামীর ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে সে বাপের খুব কাছ ঘেঁষে বসে আছে। এই দুটি পিতা-পুত্রীর দিকে তাকিয়ে জনতার মুখে একটি মাত্র প্রশ্ন—'কারা ওরা?'

এক মুখ থেকে আর-এক মুখে। এমনি করে জেরি অবধি সেই প্রশ্ন ও উত্তর কানাকানি হয়ে এল।

'কারা?'

'সাক্ষী?'

'কোন্ পক্ষে।'

'বিপক্ষে।'

'কার বিপক্ষে?'

'আসামীর।'

এতক্ষণ পরে জজ স্থির হয়ে আসনে বসলেন। তাকালেন আসামীর দিকে।

এ্যাটর্নি জেনারেল বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন আসামীর দিকে—যাকে নির্বিঘ্নে ফাঁসিতে লটকিয়ে কুড়ুলে কুচিয়ে পেরেক দিয়ে সাঁটিয়ে তবে তাঁর দায়িত্ব শেষ।

৩ নিরাশা

বয়স কম হলেও লোকটি যে রাজবিরোধী চক্রান্তে পাকা, সে-কথা জুরিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ্যাটর্নি জেনারেল বললেন যে, মৃত্যুই এই গুরুতর অপরাধের শাস্তি। এই অপরাধী ধরনের লোকটি বহুদিন ধরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যাতায়াত করে আসছে। অথচ সে অপরাধ অস্বীকার করে তার গতিবিধির কোন সদ্যুক্তিও দেখাতে পারেনি। কেবল জীবন-ধারণের প্রয়োজনে লোকটি যদি এই দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত থাকত (যা বাস্তব নয়) তবে কোনদিনই এই গোপন চক্রান্ত হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়ত না। ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী পরম কৃপাভরে একজন নির্ভীক সত্যবাদী প্রজার মারফত আসামীর এই জঘন্য গুপ্ত চক্রান্তকে চীফ সেক্রেটারির কাছে প্রকাশিত করে দিয়েছেন। সেই পরম দেশভক্তকে আমরা এখুনি দেখতে পাব। মানুষটি তার কর্তব্য পালনে যে মহান্ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। আসামীর বন্ধু ছিলেন তিনি। কোন-এক দুর্লভ মুহূর্তে বন্ধুর এই নোংরা কাজ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন। তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। দেশজননীর পবিত্র বেদিমূলে তিনি বন্ধুত্বকে বলিদান দিয়ে এই হীন রাষ্ট্রদ্রোহিতার চরম সমাপ্তি ঘটাতে মনস্থ করেন। প্রাচীন গ্রীক বা রোমের মতো সৎ নাগরিকত্বের যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত আমাদের দেশে, তবে এই সজ্জন সেই পুরস্কারের অধিকারী হতেন সন্দেহ নেই। কবিরা যথার্থই বলেন যে, ধর্মাচার সংক্রামক। একজন অন্য জনকে উদ্বুদ্ধ করে। একথা আরও সত্য দেশ-ধর্ম সম্বন্ধে। সেই দেশভক্ত এই বিষয়ে আসামীর ভৃত্যকেও অনুপ্রাণিত করেন এবং তারই সাহায্যে আসামীর যাবতীয় কাগজপত্র তল্লাসী করেন। এ্যাটর্নি জেনারেল ব্যক্তিগত ভাবে এই ভৃত্যটিকে নিজের পিতা-মাতার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাভাজন বিবেচনা করেন এবং তাঁর বিশ্বাস যে, মাননীয় জুরিরাও তাকে সেই প্রকার শ্রদ্ধার্হ বিবেচনা করবেন। এই দুই সত্যবাদী নির্ভীক দেশভক্তের সাক্ষ্য এবং তল্লাসীতে প্রাপ্ত কাগজ-পত্র—যা কোর্টে এখুনি দাখিল করা হবে—তা দেখে মাননীয় জুরিদের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না যে, আসামী মহামান্য সম্রাটের সামরিক গুপ্ত তথ্যের যাবতীয় সংবাদ বিদেশি শত্রু-রাষ্ট্রদপ্তরে পৌঁছে দিত। এটাই প্রথম বার নয়। ইতিপূর্বে কতদিন ধরে যে আসামী এই বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে তা ঈশ্বরই জানেন। যদিও এই দলিলগুলি আসামীর নিজের হাতের লেখা কি না, তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তার দ্বারা আসামীর অপরাধের গুরুত্বের কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, আসামী আপন হীন ষড়যন্ত্রের কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করত। ষড়যন্ত্রের কৌশলে সে পাকা শিল্পী। আমেরিকানদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ লাগার পনের দিনের মধ্যেই আসামী এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সে আজ পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। এই সকল ঘটনা ও তথ্য বিবেচনা করে জ্ঞানী ও দেশভক্ত জুরি মহোদয়গণ অবশ্যই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে দ্বিধা করবেন না। যত দিন না ঐ দেশদ্রোহীর মাথা নিতে পারছি, আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব না। আমরা

পারব না, আমাদের স্ত্রী-পুত্রেরা পারবে না, আমাদের নিম্নতম চতুর্দশ পুরুষ পারবে না। ঈশ্বরের নামে, দেশের নামে এবং সংসারের যাবতীয় পবিত্র বস্তুর নামে এ্যাটর্নি জেনারেল দিব্যি করলেন।

এ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তৃতার পর আদালতে যেন এক ঝাঁক নীল মাছি ভন্‌ভন্‌ করতে লাগল। যাবতীয় লোক আসামীর কি পরিণতি ঘটবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

এমন সময় সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন দেশভক্ত। আবার সব চুপচাপ।

সাক্ষীর জেরা শুরু হল। ভদ্রলোক। নাম জন বারসাদ। বক্তব্য শেষ করে সাক্ষী আদালত থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন সদম্ভে, এমন সময় লরির পাশের পরচুলা-পরা লোকটি সাক্ষীকে জেরা করার জন্য জজের কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

'আপনি নিজে কোনদিন গুপ্তচরের কাজ করেছেন?'

'কখনও না। ও-রকম হীন কাজ করাকে আমি ঘৃণা করি।'

'তবে চলে কিসে?'

'সম্পত্তির আয় আছে।'

'সম্পত্তি কোথায়?'

'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কিসের সম্পত্তি? ব্যবসা জাতীয় কোন জিনিস? কার কাছ থেকে পেয়েছেন?'

'দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সম্পত্তি।'

'দূর মানে কত দূর?'

'তা দূর হবে বই কি, বেশ দূর।'

'কোন দিন জেলে ছিলেন?'

'কখনও না।'

'ধার করেও কখনও না?'

'সে কথা উঠছে কেন?'

'ধার করে কখনও জেলে গেছেন কিনা স্পষ্ট স্বীকার করুন। বলুন কখনও যাননি জেলে?'

'হ্যাঁ গিয়েছি।'

'ক-বার?'

'দু-তিন বার হবে বোধ হয়।'

'পাঁচ-ছ বার নয় তো?'

'তাও হতে পারে।'

'সামাজিক পরিচয় কি আপনার?'

'সাধারণ ভদ্রলোক।'

'কখনও কারুর বুটের লাথি খেয়েছেন?'

'হতেও পারে।'

'প্রায়ই লাথি খান?'

'না।'

'কখনও কেউ লাথি মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছিল?'

'কখনও না। একবার সিঁড়ির মাথায় এক জন লাথি মেরেছিল বটে, কিন্তু নিচে গড়িয়ে পড়েছিলাম নিজের ইচ্ছেতেই।'

'জুয়ায় জোচ্চুরি করার জন্যই কি লাথি খেয়েছিলেন?'

'মাতাল বজ্জাতটা তাই বলেছিল বটে, কিন্তু সে বেবাক মিথ্যে।'

'তাহা মিথ্যে কথা?'

'মিথ্যে বই কি।'

'জুয়ায় কখনও জোচ্চুরি করেননি?'

'ভদ্রলোক যা করে তার বেশি কোনদিন করিনি, শপথ করছি।'

'আসামীর কাছে কখনও টাকা ধার করেছিলেন?'

'করেছিলাম।'

'কখনও ধার শোধ করেছেন?'

'না।'

'আসামীর সঙ্গে আপনি যে বন্ধুত্ব করেছিলেন সে কি তার পয়সায় পানাহারের বাসনায়?'

'না।'

'ঐ কাগজপত্রগুলোই আসামীর কাছে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ও সম্বন্ধে আর কিছু জানেন?'

'না।'

'যদি কেউ বলে ওগুলো আপনিই যোগাড় করেছিলেন?'

'আমি? আমি নয়।'

'সাক্ষী দিয়ে কিছু পাবার আশা আছে?'

'না।'

'লোককে জালে ফেলবার জন্যে সরকারের কাছে মাস-মাহিনা বা ঐ রকম কিছু পান নাকি?'

'কখনও না।'

'অন্য-কিছু মতলব আছে এর পেছনে?'

'না।'

'শপথ করছেন তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'নিছক দেশপ্রেমের তাগিদেই সাক্ষী দিতে এসেছেন? অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?'

'কিছু মাত্র না।'

তার পর আসামীর ভৃত্যের সাক্ষ্য।

বছর চারেক আগে সে আসামীর কাছে কাজ নিয়েছিল। একবার জাহাজে যখন দেখা হয় তখন আসামী তাকে একজন কাজের লোকের সন্ধান দিতে বলে। তার ফলেই সে আসামীর কাছে চাকরি নেয়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আসামীর চাল-চলনে তার সন্দেহ হতে থাকে। তখন থেকে সে তার কাগজপত্র কাপড়-চোপড় সব-কিছুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করে। এই ধরনের কাগজ ইতিপূর্বে বহু বার সে আসামীর কাছে দেখেছে। আসামীর টেবিলের ড্রয়ার থেকে এগুলোকে উদ্ধার করেছিল সে। টেবিলে আগে সে রাখেনি। এই ধরনের খসড়াও ফরাসিদের কাছে দেখাতে বহুবার দেখেছে সে আসামীকে। ইংল্যান্ডকে সে ভালোবাসে। স্বদেশের এই অহিত প্রাণ ধরে করতে পারবে না বলেই সে আসামীর গুপ্ত চক্রান্ত সব ফাঁস করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী সাক্ষীকে গত সাত বছর ধরে সে চেনে। তার মধ্যে কোন আচম্বিতের প্রশ্নই ওঠে না। সব পরিচয়ের মধ্যেই খানিকটা আচম্বিত থেকেই যায়। নিছক দেশপ্রেমের তাগিদে সে-ও সাক্ষ্য দিতে এসেছে। অন্য কোন অভিসন্ধি তার নেই।

সাক্ষী থামতেই সারা আদালতে আবার জনতার ভনভনানি শুরু হল।

তার পর লরির সাক্ষ্য।

'আপনি টেলসন ব্যাংকের কেরানী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অমুক তারিখ শুক্রবার রাতে ব্যাংকের কাজে আপনাকে লণ্ডন থেকে ডোভার অবধি ডাকগাড়িতে যেতে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ডাকগাড়িতে আর-কোন যাত্রী ছিল?'

'আরও দুজন ছিলেন।'

'তাঁরা রাতে পথেই নেমে পড়েছিলেন মনে আছে?'

'তা আছে।'

'মি. লরি, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন তো। সেই দুজনের একজন উনি কিনা?'

'সে আমি হলফ করে বলতে পারব না।'

'সেই দুজন যাত্রীর কারুর সঙ্গে আসামীর মিল আছে কি?'

'দুজনেই মুড়িশুড়ি দিয়েছিলেন। রাত ছিল অন্ধকার। সকলেই আমরা এত আত্মমগ্ন ছিলাম যে, সেকথাও আমি হলফ করে বলতে পারব না।'

'মি. লরি, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধরুন, আসামী সেই দুজন যাত্রীর মতো মুড়িশুড়ি দিয়েছে, তাহলে অন্ধকারে তাকে কি তাদের একজনের মতো মনে হতেও পারে?'

'না।'

'কিছুতেই তাকে এদের একজন মনে করতে পারেন না?'

'না।'

'হলেও হতে পারে অন্তত এ-কথা বলতে আপনি রাজি আছেন?'

'হতেও পারে। শুধু এ-কথা আমি আদালতকে জানিয়ে দিতে চাই যে ডাকাতদের ভয়ে সে রাতে আমরা সবাই যে-রকম ভয়কাতর হয়ে পড়েছিলাম, আসামীর মুখে-চোখে তেমন কোন সন্ত্রাসের লক্ষণও আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

মি. লরি, আপনি কখনও মেকি ভীরুতা দেখেছেন?'

'দেখেছি বই কি।'

'মি. লরি, আবার আসামীর দিকে চেয়ে দেখুন। আপনার জ্ঞানে একে আগে কখনও দেখেছেন কি?'

'দেখেছি।'

'কখন?'

'কয়েকদিন বাদে আমি যখন ফ্রান্স থেকে ফিরছিলাম, আমি যে জাহাজে ফিরি আসামীও সেই জাহাজে ওঠে। আমরা একসঙ্গেই আসি।'

'আসামী কখন জাহাজে উঠেছিল?'

'মাঝ-রাতের একটু পরে।'

'নিশীথে? এমন অসময়ে জাহাজে বুঝি আসামী একাই ওঠে?'

'ঘটনাচক্রে তাই বটে।'

'ঘটনাচক্রের কথা ছেড়ে দিন। সেই মাঝ-রাতে আসামীই একমাত্র যাত্রী ছিল কি না বলুন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি একা ভ্রমণ করছিলেন, না সঙ্গে কেউ ছিল?'

'দুজন সহযাত্রী ছিলেন। একজন পুরুষ আর একজন নারী। তাঁরাও এখানে উপস্থিত আছেন।'

'বটে? আসামীর সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়েছিল?'

'ঝড়ো রাত। তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ দীর্ঘ সমুদ্রপথ আমি সোফায় শুয়েই কাটিয়েছিলাম।'

'মিস্ লুসি ম্যানেত?'

যে মেয়েটির দিকে পূর্বেই একবার সকলের দৃষ্টি পড়েছিল, সেই মেয়েটি আসন থেকে উঠে দাঁড়াতেই সকলের নজর ফিরে গিয়ে পড়ল তার উপর। মেয়ের হাত নিজের বাহুলগ্ন করে বৃদ্ধ পিতাও তাঁর আসনে উঠে দাঁড়ালেন।

'মিস্ ম্যানেত, আসামীর দিকে চেয়ে দেখুন।'

একরাশ জনতার কৌতূহলী চোখের সামনে যা হয়নি এতক্ষণে তাই হল। ঐ অপূর্ব লাবণ্য-মমতা-ভরা দুটি স্নিগ্ধ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আসামীর ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইল না। সে আর এ মেয়েটি। মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান। তবু আদালতভরা লোকের সামনে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টায় ছেলেটির দ্রুত নিশ্বাসের সঙ্গে ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল থর-থর করে। মুখ থেকে রক্তের জোয়ার নেমে গেল।

আবার জনতার গুঞ্জন উঠল।

'দেখুন তো, আসামীকে আগে কখনও দেখেছেন কি না?'

'দেখেছি।'

'কোথায়?'

'এইমাত্র যে-জাহাজের কথা হচ্ছিল সেই জাহাজে।'

'আপনিই তবে?'

'আমার দুর্ভাগ্য!'

জজ ধমক দিলেন।

'যা প্রশ্ন করা হচ্ছে ঠিক ঠিক তার উত্তর দেবেন। বাচালতার দরকার নেই।'

'আসামীর সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কি কথা হয়েছিল আদালতকে বলুন।'

'ভদ্রলোক যখন জাহাজে এলেন—'

'আপনি আসামীর কথা বলছেন তো?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তাহলে বলুন—আসামী।'

'আসামী যখন জাহাজের ডেকে এলেন'—বাপের দিকে মমতার দৃষ্টি মেলে মেয়েটি বলল, 'তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেন যে আমার বাবা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল। সে-রাতে আমরা চারজন ছাড়া আর-কোন যাত্রী ছিল না জাহাজে। সেই ঝড়-বাদলের হাত থেকে বাবাকে কিভাবে নিরাপদে রাখব সে-কথা ভেবে আমি অত্যন্ত কাতর হয়েছিলাম। উনি সে-সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনিই সে-রাতে অযাচিতভাবে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এইভাবেই সূত্রপাত হয় আমাদের আলাপের।'

'এক মিনিট। আসামী কি একা জাহাজে এসেছিল?'

'না।'

'আর কে তার সঙ্গে ছিল?'

'দুজন ফরাসী ভদ্রলোক।'

'তারা কি কিছু আলোচনা করেছিল নিজেদের মধ্যে?'

'জাহাজ ছাড়া অবধি ওরা কথাবার্তা বলেন।'

'এই কাগজপত্রের মতো কিছু দিতে দেখেছিলেন আপনি?'

'দেখেছিলাম বটে কতকগুলি কাগজপত্র। কিন্তু কি কাগজপত্র আমি জানি না।'

'এই রকম?'

'হলেও হতে পারে। আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন বটে, তবে কি বলছিলেন কিছুই শুনতে পাইনি আমি। তা ছাড়া আলো ছিল খুব কম আর কথাবার্তা হচ্ছিল নিচু গলায়। শুধু লক্ষ্য করেছিলাম তাঁরা কাগজপত্রগুলি দেখছিলেন।'

'আসামীর সঙ্গে আর কি কথা হয়েছিল?'

'আসামী আমাদের সঙ্গে প্রাণখোলা কথা বলেছিলেন। হয়ত আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে ওঁর মনে দয়া হয়েছিল। তিনি আমাদের সঙ্গে যে রকম স্নিগ্ধ-সদয় ব্যবহার করেছিলেন, আশা করি—' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি—'আজকে তাঁর ক্ষতি করে সে দয়ার প্রতিদান যেন না দিতে হয় আমাকে।'

আবার গুনগুনানি।

'আসামী আমাকে জানান যে ভারি একটি বিপজ্জনক গোপনীয় কাজে তিনি যাচ্ছেন। এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকায় তিনি নাম ভাঁড়িয়েই চলেছেন। সেই কাজের তাগিদে তিনি কয়েকদিনের জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, হয়ত কিছু কাল ধরে কয়েকদিন অন্তর-অন্তর তাঁকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পাড়ি দিতে হতে পারে।'

'আমেরিকা সম্বন্ধে আসামী আপনাকে কোন কথা বলেছিল কি? ঠিক ঠিক বলবেন।'

'কিভাবে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় সেটাই তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এ-কলহে নামা অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা। ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন যে, জর্জ ওয়াশিংটন হয়ত-বা ইতিহাসে তৃতীয় জর্জের মতোই প্রাধান্য লাভ করবেন। অবশ্য এ-সব কথা সময় কাটানোর জন্য ঠাট্টার ছলেই তিনি বলেছিলেন। কোন দুরভিসন্ধি ছিল না তাঁর।'

যে গভীর আবেগ নিয়ে মেয়েটি সাক্ষ্য দিল, তার আলোড়ন আদালতের বিচারক থেকে দর্শকসাধারণ অবধি সকলের মনেই সাড়া জাগাল। বিশেষ করে ওয়াশিংটন সম্বন্ধে আসামীর মন্তব্য শুনে বিচারক একবার চকিত হয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে।

এ্যাটর্নি-জেনারেল এবার বৃদ্ধকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করলেন।

'ডাঃ ম্যানেত, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন তো! একে আগে আর কখনও দেখেছেন?'

'মাত্র একবার। তিন কি সাড়ে তিন বছর আগে লণ্ডনে যখন সে আমার বাসায় এসেছিল।'

'ডাক-জাহাজে ওই কি আপনার সহযাত্রী ছিল যার সঙ্গে আপনার মেয়ের আলাপ হয়েছিল?'

'না।'

'লোকটিকে সনাক্ত করতে না পারার আপনার বিশেষ কোন কারণ আছে?'

'আছে'—নিচু গলায় বললেন তিনি।

'বিনা বিচারে বিনা অভিযোগে নিজের দেশে দীর্ঘ-কারাবাসের দুর্ভাগ্য হয়েছিল কি আপনার, ডাক্তার?'

'দী-র্ঘ কা-রা-বা-স!'—কথাটা এমন বিলম্বিত উচ্চারণ করলেন তিনি যে, সবার হৃদয় স্পর্শ করল।

'ঐ ঘটনার দিনই কি আপনি মুক্তি পেয়েছিলেন?'

'এরা তাই বলেছে আমাকে।'

'আপনার কি কোন কথাই স্মরণ নেই?'

'না। আমার মন শূন্য সাহারা। নিজের মেয়ের সঙ্গে আমার কিভাবে পরিচয় ঘটে, কি করে সে আমায় লণ্ডনে নিয়ে আসে, কিছুই আমার মনে পড়ে না। মেয়েকে চিনতে পারার স্মৃতিশক্তি যে ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেও তাঁর অসীম দয়া। নইলে আর-কিছুই আমার মনে পড়ে না—সব-কিছুরই খেই হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

এ্যাটর্নি-জেনারেল আসন নিতেই পিতা-পুত্রীও আসন নিল।

পাঁচ বছর আগে নভেম্বরের এক রাতে আসামী কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে—যাদের কোনই পাত্তা পাওয়া যায়নি—ডোভারগামী জাহাজে উঠেছিল। সেই রাতেই সে এক জায়গায় নামে এবং সেখান থেকে বার মাইল পথ অতিক্রম করে একটি জাহাজঘাটা ও সেনা-ছাউনির খবরাদি সংগ্রহ করে। সেই সেনা-নগরীর একটি হোটেলের কফিখানায় আর-একজন লোকের জন্য অপেক্ষা করছিল আসামী ঐ সময়ে। সে-কথা প্রমাণ করার জন্য একজন সাক্ষীকে ডাকা হল আসামীকে সনাক্ত করতে।

আসামীপক্ষের উকিল সাক্ষীকে জেরা করতে শুরু করলেন। জেরায় এইটুকু মাত্র জানা গেল, সাক্ষী সেইদিন ভিন্ন আর কখনও আসামীকে দেখেনি। এই সময় পরচুলা-পরা যে-ভদ্রলোকটি মি. লরির সামনে বসে এতক্ষণ আদালতের কড়িকাঠের দিকে চেয়েছিলেন, তিনি ছোট্ট একটি কাগজে কি-একটি কথা লিখে কাগজটি পাকিয়ে উকিলের কাছে ছুঁড়ে দিলেন। কাগজটি খুলে পড়তেই উকিলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবাক বিস্ময়ে তিনি তাকালেন আসামীর দিকে।

'আপনি ঠিক বলছেন আসামীই সেই লোক?'

সাক্ষী স্থির-নিশ্চিত এ সম্বন্ধে।

'আসামীর মতো দেখতে আর কখনও কাউকে দেখেছেন কি?'

'গরমিল হবার মতো কাউকে দেখিনি।'

'ভালো করে ঐ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে দেখুন তো।'

যে-ভদ্রলোক কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাঁকে দেখিয়ে উকিল বললেন, 'তারপর আসামীকেও দেখুন। দুজনে কি একই-রকম দেখতে?'

ভদ্রলোকের দিকে চোখ ফেরাতেই কেবল সাক্ষীই নয়, আদালতসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। মহামান্য বিচারকের আদেশে ভদ্রলোক মাথার পরচুলা খুলে ফেলতে সবাই দেখল আসামী আর কার্টনে কোন পার্থক্য নেই চেহারায়। জজ তখন সাক্ষীর উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এই ভদ্রলোক অর্থাৎ মি. কার্টনকে জেরা করবেন কি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে?'

'না, তার দরকার নেই।'

'তাহলে সাক্ষী কাকে সনাক্ত করতে চান আসামী ব'লে?'

এই নাটকীয় পরিণতিতে সাক্ষী, মামলা, ষড়যন্ত্র—সব যেন এক ধাক্কায় মৃৎপাত্রের মতো গুঁড়িয়ে গেল।

আসামীপক্ষের উকিল এবার জুরিদের কাছে মামলার সওয়াল আরম্ভ করলেন। ঐ বারসাদ লোকটা ভাড়াটে গোয়েন্দা আর বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কিছুই নয়। আসামীর ধার্মিক ভৃত্যটিও এর বন্ধু ও সহযোগী হয়েছে, আর এই দুই জালিয়াতে মিলে আসামীকে শিকার হিসেবে বেছে নিয়েছে। আসামী ফরাসি। পারিবারিক কারণে তাকে মাঝে মাঝে এদেশে আসতে হয়। সে-পারিবারিক কারণ জীবনবিনিময়েও সে বলতে

নারাজ। নির্মম জেরায় ঐ মেয়েটির মুখ থেকে আদালত যা খবর পেলেন তাতেও আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। জাতীয় স্বার্থের এই ধরনের জঘন্য ধুয়া তুলে এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করে সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা যে-কোন গভর্ন-মেন্টেরই দুর্বলতার পরিচায়ক। এ্যাটর্নি-জেনারেল এ নিয়ে আতিশয্যের চূড়ান্ত করেছেন। এই মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ হয়নি।

এর পর এ্যাটর্নি-জেনারেল ও স্বয়ং বিচারক অবতীর্ণ হলেন আসরে এবং আইনের ভাষায় আসামীর শোক-গাথা শোনালেন।

তার পর জুরিরা উঠে গেলেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে।

কার্টন এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে কড়িকাঠ গুনছিলেন বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত দেখালেও আদালতের প্রতিটি খুঁটিনাটির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল তাঁর। মেয়েটির মাথা বৃদ্ধ বাপের বুকে টলে পড়ল—তিনিই প্রথম দেখতে পেলেন। উচ্চ কণ্ঠে তখন চেঁচিয়ে উঠলেন—'অফিসার, ধরুন। ওকে ধরাধরি করে বাইরে হাওয়ায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। দেখতে পাচ্ছেন না মেয়েটি পড়ে যাবে?'

বৃদ্ধ ও তাঁর কন্যা আদালত-গৃহ ত্যাগ করলেন।

সন্ধ্যা আসন্ন। জুরিরা এখনও একমত হতে পারেননি। আরও দেরি হবে জেনে আদালত-কক্ষে আলো জেবলে দেওয়া হল। দর্শকেরা যে যার মতো ঘুরে আসতে গেল। আসামীও এতক্ষণে কাঠগড়ার পিছনের ঘরে গিয়ে বসল।

বাপ ও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে লরিও বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জেরিকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

'জেরি, তুমি বরং এই বেলা কিছু খেয়ে এস। আর কাছেই থেক। জুরিরা এলে রায় শুনতে পাবে। তার-পর কিন্তু এক মুহূর্ত দেরি করো না। যত তাড়াতাড়ি পারবে মামলার রায় ব্যাঙ্কে পেঁাছে দিতে হবে। আর এ-কাজ তোমার চেয়ে তাড়াতাড়ি কেউ করতে পারবে না জানি। আমার অনেক আগেই পেঁাছে যাবে তুমি।'

কার্টন লরির বাহু স্পর্শ করে বললেন, 'এখন কেমন আছে?'

'ভারি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আদালতের বাইরে গিয়ে এখন অনেক সুস্থ বোধ করছে।'

'আসামীকেও তাই বলেছি আমি। আপনার মতো ব্যাঙ্কের কর্মচারীর পক্ষে সকলের সামনে আসামীর সঙ্গে কথা বলা সমীচীন হবে না।'

একথা শুনে লরির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

আসামীর কাঠগড়ার সামনে এসে কার্টন ডাকলেন, 'মি. ডার্নে?'

আসামী সোজাসুজি এগিয়ে এল।

'মিস্ ম্যানেত কেমন আছেন জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক আপনার পক্ষে। ভালোই আছে সে।'

'আমিই এর কারণ জেনে খুবই দুঃখিত। আমার হয়ে একথা বলবেন তাকে।'

'বলব।'

কতক্ষণ ঘোরাঘুরির পর জেরি যখন ফিরল, দরজার কাছে পেঁাছতেই শুনতে পেল লরি তাকে ডাকছেন।

'এই যে স্যর।'

ভিড়ের মধ্য দিয়ে লরি জেরির হাতে একখানি কাগজ গুঁজে দিলেন।

'খুব তাড়াতাড়ি।'

কাগজের উপর দ্রুতহস্তে লেখা—'বেকসুর খালাস।'

জেরি মনে মনে ভাবল—'যদি লিখতেন আবার জীবনে প্রত্যাবর্তন' তবে এবার আর বুঝতে ভুল হত না।

তবে আর দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। ওল্ড বেলি থেকে নোংরা লোভী মাছিরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে। আজ তাদের আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। তারা আবার অন্য কোন সন্ধানে ফিরছে।

৪ অভিনন্দন

আদালতের প্রাঙ্গণ নির্জন হয়ে এসেছে। অর্ধালোকিত বারান্দায় ডাক্তার ম্যানেত ও লুসি, মি. লরি ও আসামীপক্ষের কৌঁসুলী ষ্ট্রিভার সদ্যমুক্ত চার্লস ডার্নেকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে সে।

একদিন স্তিমিত আলোয় দেখা প্যারিসের পাঁচ তলার গুদাম-ঘরের জুতো তৈরির কারিগর ডাক্তারকে আজ আর চেনাই যায় না। মুখে পাণ্ডিত্যের ছাপ—সর্ব অবয়বে একটা ঋজু আত্মমর্যাদা। কেবল এক-এক সময় মর্মান্তিক স্মৃতি মনের ভিতরে অতীত বেদনাকে জাগিয়ে তোলে, যখন বহু দূরের এক পাষাণ কারা-প্রাচীরের নির্মম ছায়া পড়ে সেই মুখে। মানুষটিকে তখন একান্ত অসহায় মনে হয়।

শুধু লুসি সেই যাদু জানে। মাঝের এই ক-টি বৎসরের মর্মান্তিকতাকে ছাপিয়ে দূর অতীতের মাধুরীর সঙ্গে বর্তমানের স্নিগ্ধতাকে এক স্বর্ণসূত্রে সে যেন গেঁথে রেখেছে। তার কণ্ঠের মধু তার মুখের অনির্বচনীয় যাদু, তার হাতের মায়া পিতার অন্তরে নব জীবনের সঞ্চার করেছে।

লুসির হাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে ডার্নে তার কৃতজ্ঞতা জানাল। তার পর উকিল ষ্ট্রিভারের দিকে ফিরে তাঁকেও ধন্যবাদ দিল। ষ্ট্রিভারের বয়স ত্রিশের কিছু উপরে, কিন্তু ইতিমধ্যেই পসার জমিয়েছেন চমৎকার। ওকালতী চালে আসামীর পরামর্শদাতা হিসেবে লরিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন—'আপনাকে এই রকম জঘন্য মামলা থেকে সসম্মানে খালাস করে আনতে পেরেছি—'

'আপনি আমাকে চিরজীবনের মতো কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করলেন।'

'আপনার জন্য যথাসাধ্য করেছি। মানে অনেকেই যা করে থাকে।'

'অনেকের চেয়ে বেশিই বলুন'—মন্তব্য করলেন লরি।

'আপনিও তাই বলেন? আপনি সারাক্ষণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন, আপনি জানবেন বই কি। তা ছাড়া আপনি ব্যবসাদার লোক।'

'সে যাই হোক, আমার আবেদন আজকের মতো সভা ভঙ্গ হোক। লুসিকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে। মি. ডার্নের পক্ষেও সাংঘাতিক দিন গেছে। আমরাও ক্লান্ত।'

'আপনি নিজের কথা বলুন। আমার এখনও হাতের কাজ বাকি। সারা রাত কাজ করতে হবে।'

ডার্নের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ডাঃ ম্যানেত যেন নিথর হয়ে আছেন। অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণার ভ্রূকুটি-কুটিল সে-মুখের চাহনি অন্তর্ভেদী। মনের ভাবনাগুলোও দিশেহারা।

তার হাতে হাত রেখে ডাকল লুসি—'বাবা!'

তিনি যেন ধীরে-ধীরে ভাবনা সরিয়ে দিলেন দূরে। তার পর মেয়ের দিকে তাকালেন।

'বাড়ি যাবে?'

'যাব, মা।'

গলির প্রান্ত সবগুলো আলোই নিবেছে। এবার আদালতের গেটও সশব্দে বন্ধ হল।

নিরানন্দ আদালত-প্রাঙ্গণ জনশূন্য। ঘোড়ার গাড়ি ডেকে বাপ ও মেয়ে বিদায় নিল।
ষ্ট্রিভারও চলে গেলেন।

যে-লোকটি এতক্ষণ এই দলে যোগ দেননি, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলেননি, যিনি ছায়া-ঘন দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিঃশব্দে সবার পিছনে—এতক্ষণে তিনি এগিয়ে এলেন এবং যতক্ষণ না ঘোড়ার গাড়িটি অদৃশ্য হল তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। তার পর ডার্নে ও লরি রাস্তায় যেখানে দাঁড়িয়েছিল এগিয়ে এলেন সেখানে।

'মি. লরি, ব্যবসাদার লোকেরা এবার মি. ডার্নের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।'

আদালতে আজকের সওয়াল জবাবে কার্টনের ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়নি কেউ। জানেও না তাকে কেউ। তা ছাড়া সে আদালতের পোশাকেও ছিল না।

'ব্যবসাদারের মন যখন ব্যবসা আর হৃদয়াবেগের মধ্যে দোল খায়, তখন সেখানে যে কি লড়াই চলে জানলে আপনি আশ্চর্য হবেন, মি. ডার্নে।'

লরির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

'সে কথা তো একবার বললেন। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে মন আমাদের নিজেদের নয়। নিজের চেয়ে অফিসের ভালো-মন্দের কথাই তো বেশি ভাবতে হয় আমাদের।'

'তা জানি। ও তো জানা কথা'—উদাসীন ভাবে বললেন কার্টন—'মিছে বিব্রত হবেন না। সবার মতো আপনিও যে সজ্জন লোক সন্দেহ নেই। বরং অনেকের চেয়েই ভালো, আমি বলব।'

কার্টনের মন্তব্যে কিছু মনে না করে বললেন লরি—'আমি জানি না এ ব্যাপারে আপনার কেন এত মাথাব্যথা! ব্যবসা-সংক্রান্ত কোন যোগসূত্র আছে বুঝি?'

'ব্যবসা? ব্যবসা-ট্যাবসার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।'

'থাকত যদি নিশ্চয় মাথা ঘামাতেন?'

'না-না। কখনো না'—বলল কার্টন। লোকটির এই ঔদাসীন্যে লরি রীতিমত তপ্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'ব্যবসা অতি সম্মানজনক পেশা। মি. ডার্নে আপনি তো জানেন ব্যবসার প্রয়োজনে আমাদের কত সংযম গোপনীয়তা মেনে চলতে হয়। শুভরাত্রি মি. ডার্নে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আজ যখন বেঁচে গেলেন কামনা করি আগামী জীবন আপনার সুখে-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।'

ব্যারিস্টারের প্রতি এবং নিজের প্রতিও একটু ক্রুদ্ধ হয়েছেন লরি। ঝটিতি এসে তিনি গাড়ির চেয়ারে বসে পড়লেন।

গাড়ি ছুটল টেলসন ব্যাংকের দিকে।

কার্টনের মুখে মদের গন্ধ—খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন না তিনি। ডার্নেকে বললেন, 'এক অদ্ভুত দৈব বিড়ম্বনায় আমরা আজ দুজন মুখোমুখি হয়েছি। আজকের এই রাত নিশ্চয়ই অদ্ভুত ঠেকছে আপনার কাছে। নিজেরই প্রতিচ্ছায়া শান-বাঁধানো রাস্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। নিজেকে এ-জগতের যেন এখনও ভাবতেই পারছি না।'

'আশ্চর্য নয়। ওপারের অনেকদূর নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে। কিন্তু আপনি কি দুর্বল?'

'দুর্বল। হ্যাঁ, দুর্বল বোধ করছি বড্ড।'

'কিছু খেয়ে শরীরটা তাজা করে নিন না কেন? ওই লোকগুলো যখন আপনাকে ইহলোক না পরলোক, কোন্ লোকের বাসিন্দা করবে ভেবে মাথা ফাটিয়ে ফেলছিল, সেই ফাঁকে আমি কিছু খেয়ে নিয়েছি। চলুন কাছে-পিঠের একটা সরাইখানা দেখিয়ে দিই।'

ডার্নের হাত ধরে ফ্লীট ষ্ট্রীটে নিয়ে এলেন কার্টন। সেখান থেকে গলিপথে হোটেলে। একটি ছোট ঘরে আস্তানা নিলেন দুজনে। সামান্য কিছু আহার ও সুরাপানে তৃপ্ত

শক্তি ফিরে পেল ডার্নে। কার্টন একই টেবিলে পোর্টের বোতল খুলে তার মুখোমুখি বসলেন। আজ সারা দিন ঝড় বয়ে গেছে শরীর-মনের উপর দিয়ে। এখন আশ্চর্য এক রকম দেখতে তারই প্রতিচ্ছায়ার সামনে বসে—মনে একটা স্বপ্নের কুহেলি সৃষ্টি হল যেন। 'নিজেকে এতক্ষণে এই পৃথিবীরই লোক মনে হচ্ছে তো? আহা, সে চিন্তাও কত আনন্দের!'—কেমন যেন তিক্ত কণ্ঠে বললেন কার্টন। তার পর বড় এক গ্লাসে মদ ঢেলে বললেন—'আর আমি—এ সংসারকে ভুলতে পারলেই আমি বাঁচি। এ জগতে মদ ভিন্ন আর-কোন কিছুতেই কোন আস্থা নেই, আসক্তি নেই আমার। সে সব আমি চাই না। দরকারও নেই। আপনাতে-আমাতে, সত্যি বলতে কি, দেহে যতই সাদৃশ্য থাক, মনের দিকে কোন মিলই নেই।'

'খাওয়া তো হল। আসুন, এবার কোন মনের মানুষের প্রীতি-কামনায় তার স্বাস্থ্য পান করা যাক।'

'মনের মানুষ? কিন্তু কাউকেই তো মনে পড়ছে না।'

'তার নাম তো আপনার ঠোঁটের গোড়ায় লেগে আছে।'

'লুসি ম্যানেতের কথা বলছেন?'

'তারই কথা বলছি'—

সঙ্গীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কার্টন সুরার পাত্র তুললেন। তার পর গ্লাসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তার পিছনে। দেয়ালে আঘাত খেয়ে গ্লাসটা খান-খান হয়ে গেল। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে আর একটা পাত্র আনতে বললেন।

'অন্ধকার গাড়িতে তুলে দেওয়ার পক্ষে মেয়েটি খাসা সুন্দরী বলতে হবে'—নূতন পানপাত্রে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন কার্টন।'

ডার্নের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

'লুসি ম্যানেতের মতো মেয়ে করুণা করবে, কাঁদবে—ভাবতে মন্দ লাগে না। ওর করুণা-মমতার জন্যে বুঝি-বা প্রাণ-বিপর্যয়ও সহ্য হয়। কি বলেন আপনি? সত্যি নয়?'

ডার্নে একটি কথারও উত্তর দিল না।

'আপনার মুখের কথায় কি যে খুশি হয়েছিল সে। অবশ্য ভাবে না দেখালেও, বুঝতে দেরি হয়নি আমার।'

এই ইংগিতে ডার্নের মনে পড়ে গেল যে এই অপ্রিয় লোকটিই আজ স্বেচ্ছায় তাঁর সাহায্যেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—স্মরণ হতেই ডার্নে তাঁকে ধন্যবাদ দিল পরম কৃতজ্ঞতা ভ'রে।

'আমি না ধন্যবাদের প্রত্যাশী না কৃতিত্বের'—উদাসীন উত্তর দিলেন কার্টন—'কিছুই করবার ছিল না প্রথমত, আর কেন যে করলাম তা নিজেও জানি না। মি. ডার্নে, একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।'

'সানন্দে'—

'বলুন তো, আপনাকে খুব একটা পছন্দ করে ফেলেছি এই কথাই কি বিশ্বাস করেন?'

'সে কথা এখনও ভাবিনি'—একটু অপ্রসন্ন কণ্ঠে উত্তর দিল ডার্নে।

'ভেবে দেখুন না একবার।'

'আপনার আচরণে তারই প্রকাশ বটে—'

'আপনার বুদ্ধিবৃত্তির তারিফ করতে হয়—'

দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল ডার্নে। শুভরাত্রি বিদায় চাইতেই কার্টন কেমন যেন বেপরোয়া কণ্ঠে বললেন—'একটা কথা। আপনি কি আমাকে মাতাল ভেবেছেন?'

'মনে তো হয় আপনি খুবই মদ খাচ্ছেন।'

'মদ? তা খাচ্ছি বই কি?'

'খুব বেশি পরিমাণেই খাচ্ছেন না কি?'

'কিন্তু কারণটাও জানা উচিত। আমি এক সৃষ্টিছাড়া জীব, বন্ধু! সংসার আমায় স্নেহ করে না—আমিও কারুর স্নেহ চাই না।'

'এ ভালো নয়। এমন করে নিজেকে নষ্ট করবেন না।'

'কি জানি। হয়ত আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু নিজেকে একটু সাবধানে রাখবেন বন্ধু। বিদায়, শুভরাত্রি।'

নির্জন ঘরে সিডনি কার্টন একটা বাতি নিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজেকে চুলচেরা করে বিচার করলেন। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে বললেন—'লোকটিকে সত্যই কি ভালোবেসেছ? নিজের চেহারার সঙ্গে যার এত মিল তাকেই কেন ভালোবাসলে? নিজেকে ভালোবাসার কি আছে তোমার? কি আছে বল? কিছু যে নেই সে তো তোমার জানা। কি করেছ তুমি নিজের? কি হতে পারতে আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ তাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলেই কি এত ভালোবাসা? লোকটার সঙ্গে জায়গা বদল করবে? বল না! খুলে বল না তোমার মনের কথা। লোকটাকে ঘৃণাই তো কর?'

ঝড়-লাগা মন মদে শান্ত হল। তার পর এল প্রশান্ত ঘুম। হাতে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল মানুষটি। শুধু মাথার রাশীকৃত চুল টেবিলের উপর বিন্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বাতির মোম গলে গলে সেই চুলে জড়াতে লাগল।

৫ শৃগাল

মদ খাওয়া আর মাতাল হওয়ার রেওয়াজ ছিল সেই যুগে। তখনকার দিনে একজন সাধারণ ভদ্রলোক কতখানি মদ আর পানচ গলায় ঢালত অথচ সমাজে মাতাল বলে তার নিন্দা রটত না সে-কথা আজ বললে লোকে বাড়াবাড়ি বলে উড়িয়ে দেবে। আইনজীবীদের জগতে ষ্ট্রিভারও এগোচ্ছিলেন খ্যাতি ও সচ্ছলতার চূড়োয়। তারও এই অভ্যাসে কমতি ছিল না কিছু।

কোর্টের লোকে জানত যে ষ্ট্রিভার হচ্ছেন সাহসী উকিল—তার কোন লোকলজ্জা নেই—যে-কোন কেস হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে তার সমকক্ষ মানুষ কম—কিন্তু নানা দলিল-দস্তাবেজের ভিতর থেকে আসল জিনিষটি জাল ছেঁকে বের করার দক্ষতা তার তত নেই। অথচ যে-কোন আইনজ্ঞের এইটিই তো আসল কুশলতা। কিন্তু দিনে দিনে তার উন্নতি ঘটেছে। এখন দেখা যায় সারা রাত কাজ-কর্ম আর মদের বোতল নিয়ে যতই না সিডনি কার্টনের সঙ্গে তার সময় কাটুক—সকাল বেলা কোর্টে তার মামলার সূত্র আঙুলের ডগায়।

একই কাজে একেবারে অলস মানুষ হল সিডনি কার্টন। কোন-কিছুর সঙ্গে রফা করা তার চরিত্রে নেই। তবু যারা জানত তারা বলাবলি করত যে কার্টন কোনদিনই সিংহ হবে না—সে আশ্চর্যবুদ্ধি শৃগাল। আর সেই কুশলতায় ষ্ট্রিভারকে সে যথেষ্ট সাহায্য করে যাচ্ছে।

'দশটা বাজে স্যর'—হোটেলের লোক তার নির্দেশমতো তাকে জানিয়ে দিয়ে বলল, 'দশটা বাজল স্যর।'

'কি হয়েছে?'

'দশটা বাজে।'

'রাত দশটা?'

'আপনি আমায় ডেকে দিতে বলেছিলেন—'

এপাশ-ওপাশ করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে বিফল হল কার্টন। উঠে মাথায় টুপি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ফুটপাথে খানিক পায়চারি করে অবশেষে গিয়ে উঠল স্ট্রিভারের চেম্বারে।

'তোমার একটু দেরি হল'—দুজনে লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বসলেন। চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। কাগজপত্রের স্তূপাকারের মধ্যে একটা টেবিলে প্রচুর মদ আর পানুচের উপকরণ।

'আজ রাতে ক-বোতল হয়েছে, সিডনি?'

'আজকের ক্লায়েন্টের সঙ্গে বোতল দুই।'

'এস, বসা যাক। একটা বড় পানুচ তৈরি কর। আজ কোর্টে সরকারি সাক্ষীদের সঙ্গে তোমার সওয়াল খুবই ভালো হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব—'

'আমি সব সময়েই ভালো—নয় বল?'

'আমি তো না বলছি না। আজ মেজাজ এত চড়া সুরে বাঁধা কেন? মেজাজ একটু পানচ ঢেলে নরম করে নাও।'

সিডনি হেসে পানুচের গেলাস তৈরি করল।

'আমাদের ইস্কুলের পুরোনো সেই সিডনি কার্টন—'

সিডনির দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে স্ট্রিভার এই মানুষটির অতীত আর বর্তমানকে যেন একসঙ্গে দেখতে লাগল—'সেই সিডনি কার্টন, হঠাৎ গরম হঠাৎ নরম, এই উদ্দাম, এই বিমর্ষ—'

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে জবাব দিল সিডনি—'হ্যাঁ, তোমার মনে আছে বটে। সেই সিডনি—তবু দেখ, আমি তো অন্য ছেলেদের ইস্কুলের কাজ করে দিতাম, নিজের করেছি কদাচিৎ।'

'কেন করতে না বল তো।'

'ঈশ্বর জানেন আমার চরিত্রই ঐ রকম—'

স্ট্রিভার যেন কত বয়োবৃদ্ধের মতো উপদেশের ছলে বলল—'কার্টন তুমি যা কর সে তো দুর্বলের পথ। তোমার জীবনে না আছে উদ্যম, না কোন উদ্দেশ্য। দেখ আমাকে।'

'জ্বালালে'—একটা হালকা হাসির ঢেউ তুলে কার্টন বলল—'তুমি মাস্টারি করছ স্ট্রিভার।'

'আমি কেমন করে করি তুমি চোখ চেয়ে দেখ না।'

'আমার সাহায্য নাও' অবশ্য টাকাও দাও—কিন্তু আমি তো দেখছি তুমি যা করতে চাও তাই কর। তুমি তো চিরকালই সামনের সারির লোক, আমি পেছনের বেঞ্চির।'

'আমি তো চিরকাল সামনের সারির ছিলাম না, সামনের সারিতে আমাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সামনের সারিতে আমি জন্মাইনি।'

'তোমার জন্মের উৎসবে আমি তো উপস্থিত ছিলাম না ভাই।'

দুজনেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

'তোমার মনে পড়ে'—বলল কার্টন,—'যখন প্যারিসে স্টুডেন্ট কোয়ার্টারে ছাত্র ছিলাম আমরা, তুমি তো সর্বদাই ডিগ্রি নেবার জন্যে, পড়াশুনার জন্যে অশ্রান্ত ছুটোছুটি করেছ! আর আমি—আমি ছিলাম অলস—আলস্যে আমার জীবনে জং ধরে গেছে। যাক, নিজের অন্ধকার অতীতের দিকে আর আমায় ঠেলে দিও না ভাই। ভোর হয়ে এল, যাবার আগে আনন্দদায়ক কিছু বল।'

'তাহলে সুন্দরী সাক্ষীর কথায় আসা যাক। এ আলোচনা নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক লাগবে?'

বাহ্যত বোঝা না গেলেও আবার বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল কার্টন।

'কে তোমার সুন্দরী সাক্ষী?'

'ডাক্তারের সুন্দরী তনয়া মিস ম্যানেত।'

'তাকে সুন্দরী বলছ?'

'সুন্দরী নয়?'

'একটুও নয়।'

'সারা আদালতের মধ্যমণি ছিল সে।'

'আদালত আবার কবে সৌন্দর্যের বিচারক হল! সে ত সোনালী চুলের পুতুল।'

কার্টনের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করে বলল ষ্ট্রিভার—'অথচ ঐ সোনালী চুল পুতুলের জন্যই আমার ধারণা তুমিই বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলে। সবার আগে তুমিই তার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়েছ।'

'দেখাব না, বল কি? ঘটনাটা কি হয়েছিল ভেবে দেখ। মেয়ে হোক আর পুতুল হোক, সে যদি তোমার সামনে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে আমি অন্তত অস্থির না হয়ে পারি না। কিন্তু আর নয়, এবার আমি যাব।'

হাতে বাতি নিয়ে ষ্ট্রিভার তাকে যখন সিঁড়িতে এগিয়ে দিল তখন জানালার পর্দার ভিতর দিয়ে ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে। বাইরে এসে দেখল বাতাসে হিমের আভাস, আকাশে মেঘেদের ভিড়, নদীর জলে নিষ্প্রভ ঝিলিক। সমস্ত দৃশ্যপট যেন প্রাণহীন মরুভূমির মতো। আর ভোরের বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি মালার মতো পাক খাচ্ছে—যেন একটু একটু করে সারা শহরকে ঢেকে দেবে। তার ভিতরকার অপচয় হয়ে যাওয়া সব শক্তি আর বাইরের এই প্রাণহীন মরু-দৃশ্য, যেন তার সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। একটি নিঃশব্দ অট্টালিকার নিচে দাঁড়িয়ে নিজের দূর ভবিতব্যের দিকে তাকিয়ে দেখল কার্টন। একবার মরীচিকার মতো তার সামনে ভেসে উঠল এক আশ্চর্য স্বপ্ন-প্রাসাদ—ফুলে ফলে প্রেমে মমতায়, উজ্জ্বল আশার আনন্দে ঝলমল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র—আবার যে-কে সেই।

বিরাট বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে কার্টন নিজের ঘরে গেলেন। বিবর্ণ বিছানায় নিজেকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তার পর কেউ দেখল না চোখের জলে তাঁর বালিস ভিজে গেল।

সূর্য উঠল—বিষণ্ণ সূর্য। চরিত্রবান প্রতিভাবান সেই সব মানুষ যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যে, সুখের জন্যে সর্বস্ব পণ করল না, তাদের অপচয় হয়ে যাওয়া জীবনের উপর সূর্যের করুণ রশ্মি বিকিরিত হতে লাগল।

৬. জনতার পদধ্বনি

সোহো স্কোয়ার থেকে খুব দূরে নয়—রাস্তার এক কোণে ডাক্তার ম্যানেতের নিরিবিলি বাড়িটি। মামলার পর চার মাস কাটল। স্মৃতির অতলে অবলুপ্ত হয়েছে সব। এখন ডাক্তারের সঙ্গে পরম হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে লরির। শহরের নির্জন পথপ্রান্তের গৃহটি হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের প্রিয় আনন্দধাম!

রবিবারের এক প্রসন্ন বিকেলে লরি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ডাক্তারের বাড়ির দিকে। সেই বিশেষ সুন্দর বিকেলটিতে লরি হাঁটিতে হাঁটিতে এলেন। মধুর অপরাহ্ণ-আলোয় খাওয়ার আগে ডাক্তার ও লুসির সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ান তিনি। যেদিন বেড়াতে ভালো

লাগে না, ডাক্তারের ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প করেন, বই পড়ে শোনান। এমনি ভাবে সারা দিন কাটে ওঁদের সাহচর্যে। আজ অবশ্য তার কোনটিই নয়। আজ নিজের মনে চিন্তার জট ছাড়াচ্ছিলেন তিনি। তাই হাঁটতে ভালো লাগছিল।

ডাক্তার যেখানে বাস করেন তার মতো নিভৃত-নিরালা পরিবেশ লণ্ডনে আর দুটি নেই। একটি বড় নির্জন বাড়ির তিনটি ঘর নিয়ে থাকেন তাঁরা। পথের এই দিকটিতে রোদ আসে সকালের দিকে। নরম সোনালী মিষ্টি রোদ। দিন যত এগোয় ছায়া পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে। তখন এই অঞ্চলটিকে মনে হয় যেন রৌদ্র-সমুদ্রের নিভৃত বন্দর। যেমন শান্ত তেমনি নির্ভরশীল আশ্রয়।

পুরোনো দিনের মতো আবার রুগী দেখতে শুরু করেছেন ডাক্তার। যা অর্থাগম হয় তাতে পিতা পুত্রীর বেশ চলে যায়। আপন চিন্তায় মশগুল হয়ে চলতে-চলতে লরি এক সময় দেখলেন ডাক্তারের সদর দরজায় কখন পেঁাছে গেছেন।

'এ বাড়িতে আমি ঘরের লোকের মতোই' ভাবলেন লরি। 'নিজেই উঠে যাই।'

বিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও প্রতিটি ঘরের সামান্য আসবাব-পত্রকে সুন্দর করে রচনা করে রেখেছে লুসি। নিজের ঘরটি ভরে আছে পাখি, ফুল, বই, ডেস্ক, টেবিল, রঙের বাক্সে। দ্বিতীয় ঘরখানি রুগী দেখবার জন্য এবং খাওয়ার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করেন ডাক্তার। তৃতীয় ঘরখানি ডাক্তারের নিজের। ঘরের এক কোণে সেই পাঁচতলার গুদাম-ঘরের উপকরণ। একদিন যেখান থেকে লরি উদ্ধার করে এনেছিলেন তাঁকে মৃত্যু-লোক থেকে প্রাণলোকে। সঙ্গের সেই বেঞ্চি ও জুতো তৈরির যন্ত্রপাতি সব যত্নে রাখা।

সরবে যেন ভাবলেন লরি, 'ও সব মর্মান্তিক স্মৃতি আঁকড়ে থেকে আর লাভ কি?'

'আশ্চর্যের কি আছে এতে?' অপ্রত্যাশিত পালটা প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠলেন লরি।

তাকিয়ে দেখলেন সামনে মিস প্রস। ডোভারের হোটেলে একদা পরিচয় ঘটেছিল। তার পর দিনে-দিনে পরিচয় গাঢ় হয়েছে এই মহিলার সঙ্গে।

''কেমন আছেন?'

'ভালোই। তুমি আছ কেমন?'

'ভালো আর কই? মেয়েটিকে নিয়েই বড্ড মুশকিলে পড়েছি।'

'কিসের মুশকিল?'

'দিন-রাত লোক আসছে লুসির ভালো-মন্দের খবর নিতে।'

'তাই নাকি।'

'আমি আছি ওর সঙ্গে—মানে, ও আছে আমার সঙ্গে সেই দশ বছর থেকে। খরচা-পত্তর দেয়। সবই সত্যি। কিন্তু তাই বলে এ ধরনের অবাঞ্ছিত লোক-জনের রাত-দিন হামলা আমি সহ্য করতে পারব না। ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে দেব না আমি যাকে-তাকে। একজনকেও দেখলাম না যে ওর যোগ্য।'

সব মেয়ের মতোই প্রসও যে অসূয়া-পরবশ তা জানেন লরি। কিন্তু তার হৃদয়ের গোপনে একটি নিষ্পাপ নিঃস্বার্থ নারীপ্রাণ আছে, যে ভালোবাসার ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে চায়। সৌন্দর্যের, সুরুচির, যৌবনের সৌভাগ্য নিয়ে যে-মেয়ে জন্মায়নি, সে তার প্রিয়-পাত্রটির মধ্যেই চায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিছুতেই সে ভালোবাসায় অংশীদার সহ্য করতে পারে না।

আবার বলল মিস প্রস, 'আপনিই তো এর সূত্রপাত করেছিলেন।'

'আমি—' অবাক হয়ে বললেন লরি, 'আমি সূত্রপাত করেছি?'

'নয়ত কে? ওর বাবাকে কে ফিরিয়ে এনেছে?'

'ও—সেই সূত্রপাতের কথা বলছ—'

'সূত্রপাত নয়ত কি শেষ নাকি—' প্রস কপট ক্রোধ দেখাল।

তার পর আবার বলল, 'যখন শুরু হয় তখন হয়ত-বা একটু কঠিন ছিল। অবশ্য তাই বলে ডাক্তারের কোন দোষ ধরছি না। তবে এও বলি যে অমন মেয়ের বাপ হওয়ার যোগ্যতা ওঁর নেই। কোন কলঙ্ক আরোপ করছি না—কেউ সেরকম আপত্তি করে না—কিন্তু এরকম হবার কথা ত নয়। আর সত্যি কথা বলতে কি ওঁর কাছে সর্বদা এ রকম প্রচণ্ড লোকজনের ভিড় আমার একদম পছন্দ নয়। কেউ যে আমার কাছ থেকে লুসিকে সরিয়ে নেবে এ আমি সহ্য করতে পারব না।'

এ মেয়েটিকে তাঁর অনেকখানি শ্রদ্ধা দিলেন তিনি।

টেলসন ব্যাংকের খাতায় যাদের অনেক টাকার ব্যালেন্স আছে সেইসব মহিলাদের চেয়ে এই একটি সামান্য মেয়ে সব দিক থেকে কত অনন্য।

'এ পর্যন্ত যত লোক এসেছে, কাউকেই আমি ওর যুগ্যি মনে করিনি', বলল প্রস, 'তবে একজনের কথা বলতে পারি সে আমার ভাই সলোমন, জীবনে যদি না একটা ভুল করে ফেলত—'

আবার সেই পুরোনো ঘরোয়া কথা।

মিস প্রসের ব্যক্তিগত কাহিনীর খোঁজ-খবর করতে করতে লরি জানতে পারলেন যে তার ভাই সলোমন একটি পয়লা নম্বরের পাষণ্ড, জুয়ো খেলতে গিয়ে বোনের সর্বস্ব খুইয়ে দিয়েছে। তার পর তাকে অনিবার্য দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছে। একটা খবর অবধি নেওয়ার দরকার মনে করে না।

তবু সেই ভাই সম্বন্ধে প্রসের স্নেহ লরির কাছে একটা নতুন জিনিস বলে মনে হল। এ মেয়েটির চরিত্রের আর-একটা সুন্দর দিক দেখতে পেলেন তিনি।

লরি বসার ঘরে আসন নিয়েই বললেন, 'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব? আচ্ছা বল তো, ডাক্তার কি কখনও গল্পচ্ছলে তাঁর কারা-জীবনের স্মৃতির উল্লেখ করেন?'

'না।'

'তবুও ঐ বেঞ্চ যন্ত্রপাতি রেখে দিয়েছেন?'

'মনে-মনে যে ভাবেন না একেবারে বলা যায় না।'

'বেশি ভাবেন?'

'খুব বেশি।'

লরির দৃষ্টিতে চকিতে যেন লঘু বিদ্যুৎ খেলে গেল, 'বল তো মিস প্রস, নিজের কারা-জীবন সম্বন্ধে ডাক্তারের নিজের ধারণা কি? কার জন্য তাঁর এই নির্যাতন, কে তাঁর নির্যাতনকারী, এ সব কি তিনি জেনেছেন, না জানেন?'

'লুসির কাছে যা শুনেছি—'

'অর্থাৎ—'

'তার ধারণা, ডাক্তার জানেন।'

'এ-সব কথা জিজ্ঞেস করলাম বলে রাগ করো না। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু ব্যবসাদার লোক—আদার ব্যাপারি।'

'তাই নাকি!'

এ কথায় মিস প্রসের মন অনেকটা নরম হয়ে এল। বলল, 'আমি যতটা বুঝি—ডাক্তারের মনে সদা আতঙ্ক।'

'আতঙ্ক?'

'তা নয়। সেই মর্মান্তিক স্মৃতির আতঙ্ক। একবার এক দারুণ দুর্যোগে নিজেকে হারিয়েছিলেন। কেমন করে ভুললেন—আবার কিভাবে ফিরে এলেন—সেই অনিশ্চয়তায় সব সময় তাঁর ভয় আবার হয়ত স্মৃতি হারাবেন। তাই বোধ হয় ওকথা তোলেন না পারতপক্ষে।'

প্রসের কথার ইঙ্গিতে খুবই বিচলিত হলেন লরি। বললেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু সে-সব নিজের মনে চেপে রাখাও তো ভালো নয় তাঁর পক্ষে। এই দুশ্চিন্তাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলছে।'

'কিন্তু উপায় নেই', মাথা নেড়ে বলল মিস প্রস—'সে কথা মনে হলেই কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে যান। মাঝেমাঝে গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তিনি ঘরময় পায়চারি করেন। যেন নিজের মনে সেই জেলখানায় পায়চারি করেন। সাড়া পেয়ে উঠে মেয়ে বাপের কাছে যায়। বাপের পাশে-পাশে থাকে। তাঁর সঙ্গে নিঃশব্দে পায়চারি করতে থাকে। ঘুণাক্ষরেও কোন কথা তোলে না। এক সময় ডাক্তারের মনে উত্তেজনা কমে আসে। মেয়ের সঙ্গ ও ভালোবাসার যাদুতে আবার যে-মানুষ সে-মানুষ হয়ে যান।'

মিস প্রসের এটা নিছক কল্পনা নয়, একথা মেনে নিলেও স্বীকার করতেই হবে একটা বিষণ্ণ চিন্তা দিনরাত্রি সর্বক্ষণ মনকে শ্বাপদিত করবার তীব্র বেদনানুভূতি থেকেই তাঁর এই অশান্ত পদচারণা।

প্রতিধ্বনির পক্ষে অপূর্ব এই গৃহকোণ। সেই পথপ্রান্ত আগামী পদাতিকদের পদধ্বনিতে শব্দময় হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। এই উদ্দেশ্যহীন পদচারণা যেন তারই অনাগত প্রতিধ্বনিতে মুখর।

কথাবার্তায় ছেদ পড়ল।

'ওঁরা আসছেন,' বলে প্রস উঠে দাঁড়াল—'এইবার মানুষের ভিড় দেখবেন।'

লরিও জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাপ-মেয়ের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে সিঁড়িতে। এইখানটায় পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে যায়। আবার যেন নতুন করে বাজতে থাকে। মনে হয় কত জনের পায়ের শব্দ ক্ষণে ক্ষণে উঠছে, পড়ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

খুশিমনে এগিয়ে এল প্রস। লুসির হাত থেকে বনেটটা নিয়ে নিল। তার পর রুমাল দিয়ে তার ধারগুলি ঝেড়ে দিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মেয়ে নিজের চুল যতখানি যত্নে পরিপাটি করে সাজায় তার চেয়ে বেশি আদরে লুসির চুলগুলি গুছিয়ে দিল।

এই মেয়েটির কাছে লুসি যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। আদর করে তাকে জড়িয়ে ধরল লুসি, অনুযোগ করল কেন তার জন্যে অত কষ্ট করে প্রস। লুসি ভালোরকমই জানে বেশি বললে প্রসের রাগ হয়ে যায়, তখন নিজের ঘরে গিয়ে সে কাঁদতে বসে। আজ ডাক্তারকেও দেখতে ভালো লাগছে। আদর দিয়ে দিয়ে এই মেয়েটিকে নষ্ট করে ফেলছে প্রস। সেই নিয়ে ডাক্তার প্রসকে নিত্য অনুযোগ করেন।

এই সংসারের গৃহস্থালির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আছে প্রস। কোনদিকে কোন অসুবিধার কারণ নেই। খাওয়ার টেবিলে সে এদের জন্যে যে আহার পরিবেশন করে তার কিছুটা ফরাসি। সেই খাদ্যের স্বাদে এরা খুবই তৃপ্তি পায়। আহার্য প্রস্তুতের ব্যাপারে প্রসের গবেষণার অন্ত নেই। সে এখানে-ওখানে সামান্য দক্ষিণা দিয়ে নতুন নতুন রান্না শিখে আসে।

রবিবার দিনটি প্রস ডাক্তারের টেবিলেই খেতে বসে। অন্য দিনগুলিতে সে একলা খায়। কখন খায় কেউ জানে না। তার নিজের যে-ঘর সেখানে লুসি ছাড়া আর সকলেরই প্রবেশ নিষেধ। আর যেদিন লুসি সেই ঘরে গিয়েছিল সেদিনের মতো খাওয়ার আনন্দ আর কোনদিন পায়নি প্রস।

আজ গরম পড়েছে দুঃসহ। খাওয়ার পর লুসির প্রস্তাবমতো সবাই গিয়ে বসল খোলা বাতাসে গাছের ছায়ায়। মৃদু স্বরে গল্প শুরু হল। আজ লুসি সকলের জন্য

পানীয় পরিবেশন করল নিজে। মাথার উপরে নিরালা গাছের মর্মর-ধ্বনি ডালেপাতায় বাজতে লাগল।

আজ মিস প্রসের এক শ' লোকের ভিড় মোটেই হ'ল না।

বাইরের মানুষ-জনের মধ্যে কেবল ডার্নে এল।

ডাক্তার সাদরে স্বাগতম জানালেন তাকে। লুসিও। শুধু তাকে দেখামাত্রই প্রসের হঠাৎ গা ও মাথা ব্যথা শুরু হল। সে বিদায় নিয়ে সরে পড়ল।

ডাক্তারকে ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। এই সব সময় তাঁকে এত অল্পবয়সী দেখায় যে, বাপ ও মেয়ের চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। বাপের কাঁধে মাথা রেখে মেয়ে বসে আছে—দুজনে আশ্চর্য মিল। ডাক্তার আজকে সারা দিন নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। অস্বাভাবিক সজীবতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে লণ্ডনের পুরানো অট্টালিকা সম্বন্ধে কথা বলতে তিনি ভারি ভালবাসেন।

'আচ্ছা ডাঃ ম্যানেত,' ডার্নে বলল—'টাওয়ারের সব কি দেখেছেন আপনি?'

'লুসি আর আমি ওখানে গিয়েছি বটে তবে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। তবে ওখানে দেখার জিনিস আছে যথেষ্ট।'

'আমি ওখানে গিয়েছি। অবশ্য আমার দেখার সুযোগ ছিল কম। তবু লোকমুখে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম ওখানকার।'

'কি কাহিনী?'

'মিস্ত্রিরা কাজ করতে করতে একটা পাতাল ঘরের সন্ধান পায় যেটি বহুদিন আগে তৈরি হয়েছিল। লোকে তার কথা ভুলেও গিয়েছিল। ঘরটির ভেতরের দেয়ালটি কয়েদী-দের লেখায় লেখায় কলঙ্কিত। তারিখ, নাম, অনুযোগ, অভিযোগ, প্রার্থনা, বাণী কত কি লেখা তাতে। দেওয়ালের এক কোণের পাথরে একজন কয়েদী—যে হয়ত পরে ফাঁসি গিয়েছে—তিনটি অক্ষর খোদাই করে গিয়েছিল। কোন দুর্বল যন্ত্রে কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি করে করা তিনটি বর্ণ। প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল শব্দ তিনটি বুঝি ডি-আই-সি। কিন্তু পরে সতর্ক পরীক্ষায় প্রমাণ হয় শেষ শব্দটি 'সি' নয় 'জি'। কিন্তু ঐ তিনটি আদ্য অক্ষরযুক্ত কোন বন্দীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে বহু গবেষণার পর স্থির হল, ওগুলো কোন নামের আদ্যক্ষর নয়। পুরো কথা—'ডিগ' মানে খোঁড়া। মেঝে খুঁড়ে একটি পাথরের নিচে ছোট চামড়ার ব্যাগে পোড়া ছাই পাওয়া যায়। সেই অজানা বন্দী কি লিখেছিল কোনদিনই তার মর্মোদ্ধার হয়নি।'

'তোমার কি হল বাবা?' উৎকণ্ঠিত মুখে মেয়ে বাপের দিকে তাকাল।

ডাঃ ম্যানেত হঠাৎ হাত মাথায় রেখে চমকে উঠলেন। তাঁর মুখের চেহারা দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়ল।

'না না, ঠিক অসুস্থ নয়। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে তাই চমকে উঠেছিলাম। চল, ভেতরে যাওয়া যাক।'

প্রায় তখনই সামলে নিলেন নিজেকে। সত্যি সত্যিই, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ডাক্তার ম্যানেত হাত দেখালেন। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। কিন্তু তিনি এই গল্প সম্বন্ধে কোন মন্তব্য বা ইঙ্গিত কিছুই করলেন না। ঘরে যেতে যেতে আদালতের প্রাঙ্গণে যেমন দেখেছিলেন ডার্নের উপর স্তম্ভিত দৃষ্টি—ঠিক সেই বিশেষ দৃষ্টির চমক যেন আবার দেখতে পেলেন লরি ডাঃ ম্যানেতের চোখে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডাঃ ম্যানেত শুধরে নিলেন নিজেকে যে, সত্যই চোখে কিছু দেখেছেন কিনা সংশয় উপস্থিত হল লরির।

চায়ের সময় সিডনি কার্টন এসে দেখা দিলেন।

চা-পান শেষ করে সবাই জানালার কাছে সরে এল। বাইরে রাত গাঢ় হয়ে এসেছে।

লুসি বাবার পাশে বসল। ডার্নে লুসির পাশে। কার্টন জানালায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালেন।

'এখনও বৃষ্টি পড়ছে বড় বড় ফোঁটায় কিন্তু তেজ কমেছে বর্ষার', বললেন ডাঃ ম্যানেত—'টিপ—টিপ ঝরছে। ধীরে ধীরে—'

'ধীরে বটে কিন্তু বিরাম নেই—'

তাঁরা খুব নিচু গলায় কথা বলতে লাগলেন। যেন একটা-কিছুর অপেক্ষা করছেন। যেমন বিদ্যুৎ ঝলক দেখার অপেক্ষায় লোক করে।

রাস্তায় হুড়োহুড়ি ব্যস্ততা—সবাই ঝড়-জলের আগে নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁছনোর জন্য ছুটোছুটি করছে। পদধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠছে সেই আশ্চর্য কোণটিতে—কিন্তু পদশব্দ তো নেই সেখানে!

ডার্নে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনে বলল, 'শত শত লোক রাস্তায়, কিন্তু কি নির্জনতা।'

পদধ্বনি অবিশ্রান্ত বাজতে থাকে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। সেই গৃহকোণ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—কখনও মনে হয় জানালার নিচে—আবার কখনও ঘরের ভিতরেই। সামনের দৃশ্যমান পথে কোন লোক দেখা যায় না, কিন্তু দূর প্রতিধ্বনির বিরাম থাকে না।

'আপনি কি মনে করেন মিস ম্যানেত—এই সব মানুষরা একদিন আমাদের জীবনে উন্মত্ত হয়ে আছড়ে পড়বে, না আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাব?'

'আমি জানি না মি. ডার্নে। হয়ত-বা এ আমার কল্পনামাত্র। তবু যখন আমি একা থাকি তখন যেন মনে হয় এই সব পদশব্দ আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করবে, হয়ত-বা আমার বাবার জীবনকেও।'

'আমি কোন প্রশ্নও করব না, আগাম কিছু বলতেও চাই না। তবে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই জনতা আমাদের উপর পড়ল বলে—ঐ বিদ্যুৎ আলোকে আমি স্পষ্ট দেখছি।'

আকাশে বিদ্যুৎ-প্রভায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা সিডনি কার্টনকে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোকে দেখতে পাওয়া যায়।

'আমি তো তাদের আসার আওয়াজ পাচ্ছি।'

হঠাৎ তুমুল ঝড়-জল ভেঙ্গে পড়ল। কড়কড় বাজের গর্জনের সঙ্গে শুরু হল চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ-চমকানি। বজ্রনির্ঘোষ, অগ্নিবর্ষণ আর ধারাপাতের বিরাম রইল না। এমনি চলল মাঝরাত পর্যন্ত—তার পর চাঁদ দেখা দিল আকাশে।

সেণ্ট পলস্ গির্জায় রাত একটার ঘণ্টা বাজল। লরিকে নিয়ে যাবার জন্য জেরি হাতে লণ্ঠন নিয়ে এসেছে। সকলে পথে নেমে এলেন।

'কি বিশ্রী রাত! এ রকম রাতে কবর থেকে মৃতেরা উঠে আসে,' পথ চলতে চলতে মন্তব্য করলেন লরি।

'এমন রাত আমি কখনও দেখিনি স্যার—দেখতেও চাইনে', উত্তর দিল জেরি।

'শুভরাত্রি মি. ডার্নে। এই রকম রাতে আবার কখনও একত্র মিলিত হব, এ সৌভাগ্য আর হবে কিনা জানি না।'

হয়ত হবে। হয়ত চলবে আবার এমনি ধারা জনতার ছুটোছুটি—গর্জন। জনস্রোত ভেঙ্গে পড়বে তাদের উপর দুর্বার মত্ততায়।

৭ **শহরে**

রাজদরবারের অন্যতম প্রতাপশালী ম'সে'নার তাঁর প্যারিসের গ্র্যান্ড হোটেলে প্রতি পনের দিনে একবার ভোজসভার অনুষ্ঠান করেন।

তাঁর নিভৃত কক্ষে তিনি একলা ছিলেন। এটি যেন মন্দিরের গর্ভগৃহ। বাইরের ঘরে যেখানে তাঁর ভক্তমণ্ডলী ভিড় করে আছেন—তাঁদের কাছে এটি পবিত্রতম কক্ষ।

ম'সে'নার সেইমাত্র চকোলেট পান করতে যাচ্ছিলেন।

ম'সে'নার আরও বহু বহু সামগ্রী খুব সহজেই গলাধঃকরণ করতে পারেন। তাই এ-দেশের কিছু সন্দেহবাতিক দুষ্টুলোক বলাবলি করে যে ঐ দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটি সারা ফ্রান্স গিলে ফেলবে শীগগির।

কিন্তু সকালবেলার এই চকোলেট তাঁর গলা দিয়ে নামাতে রাঁধার লোক ছাড়া আরও চারজন জোয়ান লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আর শুধু সাধারণ চারজন লোক নয়। রীতিমতো সোনারুপোর তকমা দেওয়া সরকারী লোক। তাদের প্রধান যে তার পকেটে অন্তত দুটো সোনার ঘড়ি না থাকলে তার কাজ চলে না—এ সব ম'সে'নারের রুচি আর সম্ভ্রমের সঙ্গে তাল রেখে করা—নইলে ঐ অভিজাত মানুষটির ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চকোলেট স্বচ্ছন্দে নেমে যেতে পারে না।

একজন বেয়ারা চকোলেটের পাত্র নিয়ে মহামহিম ম'সে'নারের সম্মুখে এনে সযত্নে স্থাপন করে।

একটি ছোট যন্ত্র দিয়ে আর একজন সেই চকোলেটের পানীয়কে ফেনায়িত করে তোলে যাতে মহামহিম হুজুরের আহারে তৃপ্তি হয়।

একজন বেয়ারা আনে তোয়ালে যা মসে'নারের অঙ্গের শোভা বর্ধন করবে।

যার পকেটে দুটি সোনার ঘড়ি—সেই ভাগ্যবান তখন চকোলেট ধীরে ধীরে ঢেলে দেন।

এদের কোন-একজনকে বাদ দিয়ে তাঁর চকোলেট পানের পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন আর সেই সঙ্গে ভগবানের রাজত্বে তাঁর ঈশ্বরদত্ত মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে কালযাপন ও রাজকার্য সমাধা করবেন—সে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মহিমায় কলঙ্কের দাগ গভীর হয়ে পড়বে যদি তাঁর এই অনুষ্ঠান তিনি তিনজন লোককে দিয়ে নিতান্ত নিন্দনীয় ভাবে সমাধা করতে চান। দুজন হওয়া তো তাঁর মৃত্যুর সামিল।

গতরাত্রে ম'সে'নার একটি ছোট ভোজসভায় আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। সেখানে কমেডি আর গ্র্যান্ড অপেরা অতি নিখুঁত গাম্ভীর্যে পরিবেশিত হয়েছিল।

প্রায় প্রতি রাতেই এমনি ছোট ছোট আমন্ত্রণ রক্ষা করেন তিনি। সপার্ষদ যান। প্রমোদের অভাব হয় না।

ম'সে'নার মানুষটি এত বড়ো সজ্জন, এমন প্রমোদরসিক যে রাজকার্য আর রাষ্ট্রের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে—সারা ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের চেয়ে এই সব কমেডি আর গ্র্যান্ড অপেরা তাঁর মনকে অধিক প্রভাবান্বিত করে রাখে।

যে-সব দেশ এমনি ধারা নিয়তির নিয়ন্ত্রণে চলে তাদের মতোই ভাগ্য এখন ফ্রান্সের —এমনি চলেছিল ইংল্যান্ডে একসময় (উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়)—ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নিন্দিত সেই সব দিন যখন দ্বিতীয় জেমস—যাকে সবাই মেরী-স্টুয়ার্ট বলে জানে—ইংলণ্ডকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন।

ম'সে'নারদের জীবনের সর্বাপেক্ষা মহৎ আদর্শ হল সরকারী কাজে আর জনসাধারণের ব্যাপারে যেমন চলেছে তেমনি চলুক ধরনের একটি মানসিকতা। বিশেষ করে যেখানে সাধারণ মানুষের সমস্যা জড়িত হয়ে আছে। তাঁর জীবনের আর একটি মহৎ ইচ্ছা—রাষ্ট্র

বল ব্যক্তিজীবন বল সব এমন ধারায় চলা প্রয়োজন—যা তাঁর ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলবে, ফাঁপিয়ে তুলবে তাঁর অর্থ-তহবিল।

ব্যক্তিগত প্রমোদের দিক থেকে তিনি আর-একটি সুন্দর ভাব পোষণ করে আসছেন —এ জগতের যত কিছু আমোদ আহ্লাদ—যত কিছু আনন্দের উপকরণ সে-সব তাঁর মতো মানুষের একচ্ছত্র ভোগের জন্য।

ম'সে'নার বলে থাকেন, 'এ পৃথিবী আর তার যত ভোগ্য উপকরণ সব আমার—সব আমার।'

তবু এটা ম'সে'নার দেখছেন যে তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কিছু কিছু নোংরা ঘটনা প্রবেশ করছে। আর সেই সব কারণে একজন ফার্মার জেনারেলের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

যে-কারণে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যাপারে ম'সে'নারের নিজের কোন কিছু করার যোগ্যতা নেই—তাই অন্য কাউকে দায়িত্ব তাঁর দিতেই হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি কেন না ফার্মার জেনারেলরা প্রভূত ধনী হয়ে উঠছে আর বংশপরম্পরায় আমোদ-প্রমোদ আর বাবুগিরিতে অপচয় করে করে ম'সে'নার দিনে দিনে গরীব হয়ে পড়েছেন।

সেই সব ভেবে, সময় থাকতে থাকতেই অর্থাৎ তার গায়ে সন্ন্যাসিনীর উত্তরীয় ওঠবার আগে নিজের ভগ্নীকে কনভেণ্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ম'সে'নার। তার পর একটি ধনী ফার্মার জেনারেলের হাতে তাকে অর্পণ করেছেন পারিতোষিক হিসাবে, যদিও জানেন যে বংশ-মর্যাদায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নয়।

হোটেলের বাইরের ঘরে আজ যে সব পার্ষদ ও ভক্তমণ্ডলী সমাগত তাদের মধ্যে সেই বিশেষ ফার্মার জেনারেলও আছেন। তার হাতে একটি বেতের ছড়ি—তার মাথায় সোনার আপেল বসানো। এই মানুষটি এখন আর সাধারণ নন। তিনিও সমাজে হয়েছেন সমাদৃত।

অবশ্য ম'সে'নারের মতো বংশ-কৌলীন্যে উ'চু নীল রক্তের অভিজাত মানুষেরা এই সব অনভিজাত পরিবারের তাবৎ ধনীদের ঘৃণার চোখে দেখেন। যদিও তার হাতে দিয়েছেন নিজের বোনকে।

ফার্মার জেনারেল জাঁদরেল ধনী লোক। তার আস্তাবলে ত্রিশটি ঘোড়া। তার সংসারে চব্বিশজন পুরুষ কর্মচারী। তার স্ত্রীর পরিচর্যা করে ছ'জন স্ত্রীলোক।

যার কাজের মধ্যে লুটপাট আর জবরদস্তি দখল—বৈবাহিক সম্বন্ধে যিনি সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন সম্প্রতি—সেই ভগ্নিপতিই আজকের ভোজসভার সমাগত সম্ভ্রান্তদের মুকুটমণি।

সেকালের ফ্যাশান আর বড়লোকদের রুচির অনুকরণে হোটেলের কক্ষগুলি সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে সজ্জিত। কিন্তু আসল সৌন্দর্য কি শ্রী তার মধ্যে কণামাত্রও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।

এখান থেকে একদিকে নতরদম গির্জা যতদূর—অপরপ্রান্তে প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত সেই সব ঘর যেখানে বাস করে সমাজের নিচুতলার জীব। সেই সব ছিন্নকন্থা আর টুপি পরা কাকতাড়ুয়ার মতো মানুষের চিন্তা এখানে এই ম'সে'নারদের আলোকজ্জ্বল প্রমোদকক্ষে বড় অস্বস্তিকর।

এখানে সেনাবাহিনীর অফিসার যুদ্ধকৌশলে অনভিজ্ঞ।

নেভি অফিসার নির্বোধ।

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে অক্ষম অসামরিক অফিসাররা।

যারা গির্জার পুরোহিত—তারা সংসারীদের চেয়েও বেশি সংসারী। তাদের চোখে

লোভ। কথায় অশ্রাব্য অশ্লীলতা। তাদের জীবনযাপনে গ্লানির চূড়ান্ত।

এ সমাজ আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন মেটাতে এরা অপারগ। এরা যার যোগ্য নয়—নিজেদের তারই ভান করে। বড় ছোট সব মঁসেঁনারেরা এক গোত্রের। এঁরা যেখানকার সমাজের কর্ণধার—রাষ্ট্রের চালক, সেখান থেকে জনসাধারণ কিছু পাবারই প্রত্যাশা করতে পারে না। এমনি ধারা লোক শয়ে শয়ে—হাজারে হাজারে।

আর রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত নয়—মঁসেঁনারের মত অভিজাতের সংস্রবহীন—যারা সমাজ-জীবনের বাস্তবতার কোন সংবাদ রাখে না—সেই সব মানুষ যারা সংসারে তাদের প্রত্যাশা-পূরণের জন্য জীবনের কোন সরল রাস্তায় হাঁটে না—তেমন মানুষও এখানে সংখ্যায় অল্প নয়।

সেই সব ডাক্তার আছে যারা রোগীদের কাল্পনিক অসুখের চিকিৎসার ছলে ঔষধ পথ্য প্রয়োগ করে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েছে। মঁসেঁনারদের প্রাসাদের কক্ষাভ্যন্তরে সম্ভ্রান্ত রোগিণীদের সঙ্গে চলে তাদের লীলা। যারা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রূপায়ণ করার দায়িত্ব নিয়েছে—তারা রাষ্ট্রকে সামান্যতম কলঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্যে যত রকমের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে। কিন্তু একটি দোষও মুক্ত করার জন্য যথাযথ ভাবে আত্মনিয়োগ করার দায়িত্ব দেয় না। সেই সব লোক মঁসেঁনারের সংবর্ধনা-সভায় যত রকমের গুজব রটাতে থাকে।

অবিশ্বাসী দার্শনিকেরা বাক্যচ্ছটায় জগতের চেহারা পালটে দেবার মহা দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁরা তাসের দুর্গ-চূড়ার আকাশে পেঁছে যাবার কল্পনায় বিভোর। অবিশ্বাসী রাসায়নিক, যারা ধাতু রূপান্তরের স্বপ্ন দেখে—তারা এই সব দার্শনিকের সঙ্গে খোস গল্পে সময় অতিবাহিত করতে ভালোবাসে।

বড় বড় বংশ মর্যাদার তিলক নিয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই আসরে উপস্থিত। সংসারের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সব রকম ব্যাপারে যাদের অনীহা—সেই সব লোক এখানে এমনভাবে বিচরণ করেন যেন তাঁরা মানুষের মঙ্গল-চিন্তায় নিদারুণ ক্লান্ত।

এখানে সমাগত অভিজাত মানুষেরা প্যারিসের প্রাসাদে প্রাসাদে যেসব বিবাহিত নারীদের রেখে এসেছেন—মঁসেঁনারের ব্যক্তিগত গুপ্তচর যারা আজকের অতিথিমণ্ডলের অর্ধেক সংখ্যায়—তারাও সেই সব বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে একটিকেও যথার্থ মাতৃরূপে স্বীকার করে না—না আচরণে, না চেহারায়। সেকালের অভিজাত ঘরের ফ্যাশানে মাতৃমহিমা অর্জনের কোন বাসনা ছিল না কোন মহিলার। সংসারে দু-একটি অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুকে জন্ম দেবার প্রচেষ্টা ছাড়া তাদের জননীত্বের আর-কিছুই নেই।

আর মা সব চাষীর ঘরে। ফ্রান্সের অনভিজাত দরিদ্র চাষীদের ঘরে গরীব চাষী মায়ের কোলে জন্মায় যে শিশু—সে মাকে পায় আপনার করে। আর জননী বুকে করে মানুষ করে তার আদরের ধনকে। ফ্রান্সের ভাবীকাল বড় হচ্ছে দরিদ্র চাষীদের ঘরে।

শহরের অভিজাত আসরে ষাট বছরের বুড়ী ঠাকুমা রঙে জৌলুষে বিশ বছরের মেয়ের মতো আমোদে গা ঢেলে দেয়।

মঁসেঁনারের ভোজসভায় আগত সর্বশ্রেণীর মানুষ, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যাদের যোগসূত্র কম—যেন মনুষ্যত্বের গায়ে কুষ্ঠের দাগ।

এই হোটেলের বাইরের দিকের ঘরে জনা ছয়েক অন্য ধরনের মানুষ একত্রিত হয়েছিল—গত কয়েক বছর ধরে এদের নিশ্চিত ধারণা জন্মেছে যে রাষ্ট্রের ধারা ভুলপথে চলেছে। আর সেই তাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য হয়ত-বা মঁসেঁনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশে এদের অর্ধেক স্থির করেছে যে এরা একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী গঠন করবে। তারা নানা ভাবে তাদের অসন্তোষের প্রকাশ করবে। ভবিষ্যতের দিকে তাদের নিশানা দেখাবে। সাবধান করে দেবে সবাইকে। সচেতন করে দেবে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের। এরা

ছাড়া আর তিনজন অন্য একটি গোষ্ঠী গঠন করেছে। তারা মানুষের চেতনার উদ্বোধন প্রয়াসে 'সত্যের কেন্দ্র' নামে একটি সাংকেতিক ভাষা সৃষ্টি করেছে।

আজকের সংবর্ধনা সভায় যারা উপস্থিত তাদের সজ্জায় কোন খুঁত নেই। শেষ বিচারের দিনের রায় যদি সাজ-পোশাকের উপর নির্ভর করত তবে তাদের সৌভাগ্যের অন্ত থাকত না। এখানে পাউডারের সুরভি, চুলের কেয়ারি, গায়ের রঙ ঠিক রাখার বিবিধ প্রক্রিয়া। ঝকঝকে তরবারি। কেতাদুরস্ত ব্যবহার। এ সবই চিরকাল সমান-ভাবে চলে আসছে। যেন চলবে চিরকাল। এখানে বিরলকেশ মাথায় পরচুলের চাতুরী। স্বর্ণালঙ্কারের ধ্বনি। রেশমে পশমে সোনায় জরিতে সুরে সুরভিতে যেন সুর-সভা। আর তারই রেশ গিয়ে লাগল ঈষৎ দূরে সেণ্ট আঁতোয়ানে যেখানে ক্ষুধা আর দারিদ্র্য একসঙ্গে নিঃশব্দ জীবনযাপন করে।

এ সমাজে পোশাকের বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশি। সারা দেশ জুড়ে যেন ফ্যান্সি নাচের আসর বসেছে এমনি জাঁকজমক। প্রাসাদে গির্জায় কোর্টে—সমাজের সর্বস্তরে। এমন কি যে লোক আসামীকে ফাঁসিতে লটকায় সে-ও পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে সাজ-পোশাক করে।

সেই সতের শ' আশী সালের একদিন, যারা সেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিল—তাদের কারুর এ সংশয় হয়নি যে-সমাজব্যবস্থায় ফাঁসি-দেওয়া ঘাতকও এমনি ভাবে সাজগোজ করে, তারও প্রলয়কাল সমাসন্ন।

চকোলেট পান করে মহামহিম মঁসেঁনার দ্বার খুলে দিতে হুকুম দিলেন। তার পর আবির্ভূত হলেন হলে।

তখন সমারোহ পড়ে গেল। আভূমি নত হয়ে নিবেদন—আত্ম-অবমাননা। কৃপার মুষ্টি ভিক্ষা।

আর তার মধ্যে মঁসেঁনার মৃদুপদে হেঁটে যাচ্ছেন। ঈষৎ স্ফুরিত অধরে মৃদু মানুষীহাসি বিতরণ করছেন। দুটি-একটি কথা বলছেন কোন ভাগ্যবানের সঙ্গে: আশ্বাস দিচ্ছেন। কাউকে শুধু মৃদু হাস্যে পুলকিত করছেন। সর্বাঙ্গের সুবাস ছাপিয়ে সন্ধ্যায় পান করা বহুমূল্য সুরার সুরভি জড়িয়ে আছে মানুষটির রসনায় রচনায়।

মানুষ তো নন। যেন দেবতা। অমৃত-পাত্র এনেছেন অভাজনদের কৃপা করতে। এমনি অভিবাদন আর বিনয়ের ঘটা। যত পূজা পেলেন, দেখে দেবতাদের ঈর্ষা ঘটে। পর্যটন শেষ হলে মঁসেঁনার নিজের কামরায় অন্তর্হিত হলেন। তখন সভা ভঙ্গ হল। একে একে অতিথিরা বিদায় নিলেন। শুধু সেই উজ্জ্বল আলোকিত সভায় বিচিত্র শব্দ গন্ধের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে একটি পরিণত-বয়স্ক পুরুষ কতক্ষণ কি ভাবলেন। তার পর হাতে টুপি নিয়ে দর্পণ-খচিত প্রাচীরের পাশ দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে একবার মাত্র পিছন ফিরে তাকালেন সেই কক্ষটির দিকে। তার পর কাকে যেন উদ্দেশ করে বললেন—'নরকস্থ হও তুমি।'

তার পর সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এলেন নিচে।

ষাট বছরেও মানুষটি রূপবান। বেশ-বিন্যাসে রূপদৃপ্ত। মুখ যেন মুখোশ। পৃথিবীর দাম্ভিকতা মাখানো সেই মুখ। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলে চোখের ব্যঞ্জনায় নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ নজরে পড়ে। আভিজাত্যের কৃত্রিম হাসি সেটুকু ঢাকতে পারে না।

বাগানে গাড়ি অপেক্ষায় ছিল। উঠে বসতেই গাড়ি ছুটল।

আজকের সভায় যথাযোগ্য সমাদর পাননি। তার জন্য মনটা বিরক্ত হয়ে আছে। মারকুইস আজ কারুর সঙ্গে আলাপে প্রসন্নতা দেখালেন না। কি জানি সকলের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ কাটালেন সময়।

গাড়ি ছুটছে—যেন শত্রুব্যূহ ভেদ করছে। প্যারিসের সরু সরু রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালানো মারাত্মক। ফুটপাত নেই যে ছেলেগুলো সতর্ক সাবধান হয়ে পথ চলবে। কিন্তু সে কথা কে ভাবে? যেমন চলে আসছে তেমন চলে।

তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে গাড়ি ছুটছে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে। মানুষের জীবনের উপর কোন দয়া-মায়া নেই এদের। এতটুকু অসাবধানে কি বিপদ ঘটে যেতে পারে, ভেবে দেখে না এরা। ডুকরে কেঁদে উঠে গাড়ির সামনে থেকে ছুটে পালায় মেয়েরা। ছোট ছেলেদের পাখির ছানার মতো ছোঁ মেরে সরিয়ে নেয় মা-বাপ। এমনি চলে পথ থেকে পথে একই রকম।

হঠাৎ বাঁক নিতেই গাড়ির চাকা লাফিয়ে উঠল সশব্দে। আর সেই আর্ত চিৎকার উঠল বাতাস বিদীর্ণ করে।

এমন ঘটনা নতুন নয়। কোচোয়ান ক্বচিৎ এরূপ ক্ষেত্রে গাড়ি থামায়। হত হোক, আহত হোক, তা বলে তো মারকুইস ম'সেঁনারদের গাড়ি নোংরা রাস্তায় দাঁড়াতে পারে না।

এখানেও তাই হত। কিন্তু ঘোড়ার লাগামে দশ জোড়া হাত উদ্যত প্রতিরোধে দৃঢ় হয়েছে দেখে সহিস ভয়ে ভয়ে নেমে এল রাস্তায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন মারকুইস, 'কি হয়েছে?'

মাথায়-টুপি একটি লম্বা লোক ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে এক দলা রক্ত মাংস তুলে নিয়ে পথের ধারে রাখল। তার পর সেই কাদার মধ্যে বসে বন্য জন্তুর মতো আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদতে লাগল।

'একটা ছেলে মরেছে, হুজুর!'

'তাতে এত চেঁচামেচি কিসের। ওর ছেলে?'

'হ্যাঁ, হুজুর—'

সেই কাদা-রক্ত-মাখা লোকটি হঠাৎ উঠে দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই মারকুইস একবার তরবারির হাতলে হাত দিলেন।

বাতাসে দুটি হাত ছুঁড়ে দিয়ে লোকটি কান্না-ভাঙ্গা গলায় বলল, 'মেরে ফেলেছে। একেবারে পাথর হয়ে গেছে।'

পথের ভিড় জমেছে মারকুইসের গাড়ির কাছে। চোখে-চোখে কৌতূহল। রাগ-বিদ্বেষ তখনও জ্বলেনি সে-সব দৃষ্টিতে। বাপের তীব্র আর্ত চিৎকারের পর সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

গর্ত থেকে আসা এক দল ইঁদুর যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—ভাবলেন মারকুইস। পকেট থেকে মোহরের থলি বের করলেন। তার পর মানুষগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আশ্চর্য লাগে আমার যে, নিজেদের আর ছেলেপিলেদের কোন যত্ন নিতে অবধি তোমরা শেখনি। একটা-না-একটা সব সময় পথে আছেই আছে। আমার ঘোড়াগুলোর কি করেছ তোমরা জান না। যাও, এই মোহরটা ছোঁড়ার বাপটাকে দিয়ে দাও।'

সহিসকে লক্ষ্য করে মারকুইস একটা মোহর ছুঁড়ে দিলেন পথে। অনেক জোড়া চোখ কৌতূহলে নত হয়ে দেখল।

লোকটা আর একবার প্রেত-কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'মরে গেছে!' আর-একটি লোক এসে তাকে সবলে ওঠাতেই লোকটি তার কাঁধে মাথা রেখে অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শুধু একটি বার পথিপার্শ্বে সেই নিশ্চল রক্ত-মাংসের ডেলাটুকু দেখতেই তার পিতৃহৃদয়ের শোক বিগলিত ধারায় ঝরতে লাগল।

'কেঁদ না—অমন করে ভেঙ্গে প'ড়ো না ভাই। ছেলে তোমার সুখেই গেল। বেঁচে তার কি সুখ ছিল? মরে শান্তি পেল চিরজন্মের মতো।'

'তুমি দেখছি দার্শনিক। এই যে ওহে—,' হেসে বললেন মারকুইস। 'তোমার নামটি কি?'

'আমার নাম দ্যফর্জ।'

'কি কাজ কর?'

'মদ বেচি।'

'মোহরটা তুলে নাও দার্শনিক। যেমন খুশি খরচ ক'রো। কোচোয়ান গাড়ি ছাড়।'

গাড়ি ছাড়ার উদ্যোগ হতেই মারকুইস সিটের পিছনে আরাম করে বসলেন। কি যেন একটা জিনিষ ভেঙে ফেলেছেন অসাবধানে। তার বাবদ মূল্যও ধরে দিয়েছেন। সুতরাং আর মাথা ঘামাবার কিছু রইল না।

এমন সময় একটা মোহর টুং করে গাড়ির ভিতরে ছিটকে এসে পড়ল।

'রাখো। কে ছুঁড়েছে মোহর?'

এই মাত্র যেখানে দ্যফর্জ দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাকালেন মারকুইস। দেখলেন, পথের উপরে কেঁদে-কেঁদে মুখ ঘষছে বাপ। আর তার পাশে একটি বলিষ্ঠাঙ্গী মেয়ে দাঁড়িয়ে উল বুনছে।

'নোংরা কুকুরের দল। তোমাদের বুকের উপর দিয়ে এই গাড়ির চাকা পিষে দিয়ে যেতে পারলে তবে আমার আক্রোশ মেটে। যে রাস্কেল মোহর ছুঁড়েছে—'

এই মানুষটা মুখে যা বলছে তার চেয়ে ঢের বেশি হিংস্র হতে পারে এ কথা জানে না কে? আইনের বাইরেও তার অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা নেই। সে-কথা ভেবে জনতার মুখে একটা রা উঠল না। পুরুষরা কেউ একটা রা কাড়ল না। শুধু সেই একজন—সেই উল-বোনা মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মারকুইসের দিকে। তবে ঘৃণার দৃষ্টিতে তিনি তাকে অবহেলা করলেন।

কতক্ষণ পরে আবার হুকুম দিলেন—'ছোড়ো গাড়ি।'

মারকুইসের গাড়ির পিছনে আরও কত গাড়ি ছুটে গেল। পথের ধারের কুকুরের দল অবাক চোখে দেখতে লাগল এই ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের ছেদহীন মিছিল। তাও এক সময় শেষ হল।

শুধু সেই উল-বোনা মেয়েটির কাজের বিরতি ঘটল না। উদাসিনী নিয়তির মতো সে ভাগ্য-সূত্র গেঁথে যেতে লাগল। ঝরনার জল বয়ে গেল, নদী চঞ্চলা, দিন নিমজ্জিত হল রাতে, কত জীবন নিয়তির নিয়মে মৃত্যুর সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ল। সময় আর জোয়ার কারুর প্রতীক্ষায় রইল না চিরদিনের মতো। অন্ধকার গর্তে নোংরা ইঁদুরের দল ঠাসাঠাসি ঘুমোয়। সান্ধ্য-ভোজনের আসরে ফ্যান্সি বলের রোশনাই জ্বলে ওঠে। জীবন চলে যথারীতি।

৮ গ্রামে

এপাশে-ওপাশে যত দূর দৃষ্টি চলে, ফসলের ফলন চোখে পড়ে। তাও একটানা নয়। ছাড়া-ছাড়া। কোথাও কয়েক ফালি যব, কয়েক ফালি কড়াই মটর। কোথাও গমজাতীয় শস্য। এখানকার মানুষের চেহারার মতোই ফসলের অবস্থা। না আছে দীপ্তি, না পুষ্টি।

চার ঘোড়ায় টানা বিহার-শকটে চলেছেন মারকুইস। গাড়ি খাড়াই ভেঙে উপরে উঠছে। মারকুইসের মুখে পড়েছে রক্তের আভা। আভিজাত্যের রঙে রাঙা নয়, অস্তগামী সূর্যের আলোয় রক্তিম। খাড়াই পার হয়ে পিছনে ধূলির ঝড় তুলে গাড়ি উৎরাইতে নামতে-না-নামতেই পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে গেল সেদিনের মতো। সূর্যের

সঙ্গে মারকুইসও নেমে গেলেন দৃষ্টির আড়ালে। মুখের আভাও আর রইল না মুখে। সূর্য নেমে যাবার পর, মারকুইস নেমে যাবার পর, শুধু জেগে পড়ে রইল পাহাড়ের পায়ের কাছে একটি ভগ্ন জীর্ণ দেউলে হয়ে-যাওয়া গ্রাম্যজীবন। পড়ে রইল গ্রামের সেই বিশাল উদার মাঠ। মাঠের শেষে আকাশমুখী গির্জা। জেগে রইল শুধু বন আর টিলা। আর সেই টিলার উপর প্রহরীর মতো দুর্গ-কারাগার।

দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন করে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার যেন কালো আবরণে ঢেকে নিতে এল গৃহ-ফেরা যাত্রীকে।

যেমন গ্রাম তেমনি লক্ষ্মীছাড়া লোক-জন। কোথাও শ্রী নেই, ছাঁদ নেই—সব কিছুতেই দারিদ্র্যের ছাপ। সন্ধ্যাবেলা। অনেকেই বেকার—দরজার সামনে বসে। কেউ কেউ রাতের খাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। কেউ বা ঝরনার ধারে গেছে শিকড় ও ঘাস-পাতা ধুতে। মাটিতে ফসল যা কিছু জন্মায় সবেতেই পেট ভরে, ক্ষুধা মরে। মাটির ভরসাতেই বেঁচে আছে। নইলে এখানকার মানুষ ফুরিয়ে-যাওয়া জীব।

রাস্তায় কদাচিৎ শিশুদের মুখ দেখা যায়—কুকুরদের তো দেখাই যায় না।

পৃথিবীতে এরা দুটি ভবিষ্যৎ নিয়ে এসেছে। কায়ক্লেশে টিঁকে থাকা, নয় কারাগারে মরণ।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর সহিসের চিৎকারের সঙ্গে উদ্যত ফণা চাবুকের তীক্ষ্ণ শব্দ বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠল। মারকুইসের গাড়ি এসে ফোয়ারার কাছ-বরাবর ডাকগাড়ির আস্তায় থামল। চাষীরা কাজ-কর্ম ফেলে তাকাল তাঁর দিকে। জমিদারও তাকালেন তাদের দিকে। সে দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সবাই চোখ নামাল।

হুকুম দিলেন মারকুইস—'ঐ লোকটাকে ধরে নিয়ে আয়।'

হাতে-টুপি লোকটিকে নিয়ে আসা হল। বাকি সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল চারদিক থেকে।

'রাস্তায় তোমার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'একবার নয় দুবার। তা অত জ্বল্-জ্বল্ করে কি দেখছিলে?'

একটু নত হয়ে লোকটা হাতের নীল টুপি বাড়িয়ে গাড়ির তলার দিকে দেখল। সমবেত জনতাও কুঁজো হয়ে গাড়ির তলার দিকে তাকাল।

'কে? ওখানে কি দেখছ?'

'একটা লোক শেকলে ঝুলছে।'

'কে?'

'লোক একটা।'

'হারামজাদা সব। নাম নেই লোকটার? এই গ্রামের সকলকে চেন। কে ও?'

'হুজুর, ও এ গ্রামের নয়। জীবনে আমি কখনও ওর মুখ দেখিনি।

'শেকলে ঝুলছে? দম আটকে মরার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি?'

'সেইটাই আশ্চর্য ঠেকছে হুজুর। মাথাটা ঝুলছে—ঠিক এই ভাবে?'

'কিসের মতো দেখতে?'

'কি দেখাব হুজুর? সব সাদা। সারা গা ধুলোয় ঢাকা—ভূতের মতো লম্বা দেখতে। ভূতের মত সাদা।'

কথা শুনে সবাই হতভম্ব।

'আমার গাড়ির তলায় চোর আর তুমি হতভাগা মুখটি বুজে আছ নির্বিকার। পাকড়াও লোকটাকে.' গর্জন করে উঠলেন মারকুইস।

পোস্ট মাস্টার গ্যাবেল এগিয়ে এসে লোকটার জামার আস্তিন চেপে ধরল সরকারী কায়দায়।

'লোকটা যদি আজ রাতে এই গ্রামে থাকে ওর ওপর নজর রেখ। চুরি-টুরি করে না যেন।'

'জো হুকুম হুজুর। আপনার জন্য সব করতে পারি'—বলল পোস্ট মাস্টার।

'সেই হতভাগাটা আছে না পালিয়েছে?'

কয়েকজন লোক মিলে গাড়ির তলা থেকে টুপি-পরা লোকটাকে টেনে বের করে মারকুইসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

'হুজুর, আমরা যখন একে টেনে বার করছিলাম সে-লোকটা পালিয়ে গেছে।'

'পাহাড়ের মাথায় উঠে নদীতে ঝাঁপ খাবার মতো লাফিয়ে পড়েছে হুজুর।'

'গ্যাবেল, দেখ সব। চালাও গাড়ি—'

হুড়মুড় করে গাড়ি আবার ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে লাগল। খাড়া পাহাড়ে উঠতেই গতি শ্লথ হয়ে এল গাড়ির। গ্রীষ্ম রাতের নানা সুরভির হাট বসেছে চারদিকে। ডাঁশ-মশারা ঘোড়াদের মুখের চারদিকে সানাই ধরেছে।

পাহাড়ের মাথার কাছে ছোট্ট কবর। কবরের উপর একটি ক্রুশ-চিহ্ন আর ক্রুশে-আঁটা বিশ্ব-পরিত্রাতার চেহারা। কাঠে খোদাই-করা অনিপুণ হাতের নিরাভরণ মূর্তি। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। যেমন শিল্পী তেমনি সৃষ্টি।

সেই মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল একটি মেয়ে। গাড়ি কাছে আসতেই পলকে উঠে দাঁড়াল। তার পর গাড়ির কাছে সরে এল।

'হুজুর, একটা আর্জি ছিল।'

'কি? সব সময় শুধু তোমাদের আবেদন আর আর্জি।' পাথরের মতো মুখ। অধৈর্যের সঙ্গে বললেন মারকুইস।

'হুজুর, মা-বাপ। আমার স্বামী হুজুর—'

'কি হয়েছে তোমার স্বামীর? তোমাদের স্বভাবই ঐ রকম। সরকারকে কিছু দেবে না?'

'তার আর দিতে কিছু বাকি নেই হুজুর! সব দিয়ে একেবারে মরে গেছে।'

'মরে গেছে! আমাকে কি তার প্রাণটা ফিরিয়ে দিতে হবে?'

'না, হুজুর। সে ঐখানে শুয়ে আছে—ঐ আগাছার নিচে।'

'কি হয়েছে তাতে?'

'এত আগাছা, হুজুর, সেখানে—'

'তাতে কি?'

অল্প বয়সে জীর্ণ হয়ে পড়েছে মেয়েটি। যেন মূর্তিমতী শোক। কথা বলতে বলতে মাঝেমাঝে নীল শির বের-করা একটি হাত সে গাড়ির দরজার উপর রাখছিল।

'হুজুর, শুনুন আমার নিবেদন। আমার স্বামী না খেতে পেয়ে মারা গেছে। না খেতে পেয়ে অনেকেই মরেছে, আরও কত মরবে, হুজুর।'

'আমি কি সকলকে খাওয়াব?'

'হুজুরের কাছে সে দাবি আমি করি না। আমার আবেদন, হুজুর, শুধু এক টুকরো কাঠ-পাথর—তাতে আমার স্বামীর নাম খোদাই করে তার কবরের ওপর রাখা হোক। না হলে তার কথা যে ভুলে যাবে লোকে। আমি যখন ঐ একই রোগে মারা যাব তারা খুঁজে পাবে না কোথায় তার কবর ছিল। আমাকেও তো সবাই অমনি কোন আগাছার নিচে গোর দেবে। আর তো চেনা যাবে না। এত আগাছা, হুজুর—এত বাড়ন তাদের, অথচ এত অভাব চারদিকে।'

মেয়েটির হাতখানি ঘৃণায় সরিয়ে দিল পার্শ্বচর—গাড়ির দরজা থেকে। গাড়ি আবার ছুটতে লাগল হাওয়ার বেগে।

গ্রীষ্ম-রাতের সুমধুর সুরভি চারপাশে আবার মায়াজাল রচনা করে। বনস্পতির ডালপালা-বাহু-বিজড়িত নিজ প্রাসাদের ছায়ায় প্রবেশ করলেন মারকুইস। ছায়া অপসারিত করে বাড়ি দেখা দিল। গাড়ি থামল। অবারিত হল বিরাট প্রাসাদের বিরাট দরজা।

'মঁসিয়ে চার্লস—ইংল্যান্ড থেকে যার আসার কথা, এসেছে কি?'

'না, হুজুর।'

৯ গর্গনের শির

বিপুল প্রাসাদটি আগাগোড়া পাথরের তৈরি। সামনের শান-বাঁধান চত্বরটি প্রস্তরশিল্পের আভরণে সজ্জিত।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই খানসামা সিঁড়ি ভেঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাইরে কালো রাত পেঁচার ডানা-ঝাপটায় একবার যেন সচকিত হয়ে উঠল। তার পর আবার সব নীরব-নিঝুম। যেন হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে রাত আবার নিরুদ্ধ নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল।

বিরাট দরজা বন্ধ করার ভারী আওয়াজ হল। মারকুইস প্রবেশ করলেন অস্ত্রঘরে। এ ঘরের থরে-থরে সাজানো চাবুক আর লোহার ডান্ডার পরিচয় জানে চাষী প্রজারা। জমিদারের রাগের মুখে পড়ে কতজন ওর ঘায়ে সাবাড় হয়েছে। নয় তো ঘায়েল হয়েছে রীতিমতো।

আরও সিঁড়ি ভেঙ্গে মারকুইস নিজের মহলে এসে পড়লেন। তিনখানা ঘর নিয়ে এ মহল—তাঁর নিজস্ব নিরিবিলি। ফ্রান্সের রাজবংশের অনেক ধারারক্ষীর চিত্রপট আর আসবাবে সাজানো তাঁর নিজের শয়ন-কক্ষ—অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খাওয়ার টেবিলে দুজনের ব্যবস্থা তৈরি। সেদিকে নজর পড়তেই মারকুইস বললেন 'ভাইপো এখনও এসে পেঁছয়নি শুনলাম। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। খাবারের ব্যবস্থা যেমন আছে থাক। পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে আসছি আমি।'

অল্প পরেই আহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন তিনি। একলাই খেতে বসলেন। ঝোল মুখে দিয়ে আর একটিতে হাত দিতে যাবেন, যেন কিসের আওয়াজ পেয়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। খানসামাকে বললেন, 'দেখ তো, কি ওখানে?'

জানালার পর্দা তুলে রাতের কালো আঁধার মসৃণ করল সে। কান পেতে শুনল। তার পর নিবেদন করল—'কিছু নয়, হুজুর—'

'ঠিক হ্যায়—'

অর্ধেক খাওয়া সারা হয়ে এসেছে এমন সময় শুনলেন বাইরে গাড়ির ঘড়-ঘড় শব্দ। সে-শব্দ প্রাসাদের ফটকের সামনে এসে থামল।

'কে এল?'

ভাইপো এসে পড়েছে। তখনই তার কাছে সংবাদ গেল—আহার্য প্রস্তুত। মারকুইস অপেক্ষা করছেন তার জন্য। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভোজের টেবিলে এসে উপস্থিত হল সে। ইংল্যান্ডে চার্লস ডার্নে এরই নাম।

মারকুইস ভাইপোকে সংযত সৌজন্যে অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু করমর্দন করলেন না। আসনে বসে প্রশ্ন করল ডার্নে,—'কালই প্যারিস ছেড়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমি সোজা আসছি।'

'লণ্ডন থেকে?'

'হ্যাঁ—'

'আসতে বেশ সময় লেগেছে তো?'

'না, সোজাই তো আসছি—'

'আসতে দেরি হয়নি, দেরি হয়েছে মনস্থির করতে?'

'নানা কারণে কাজের ঝঞ্ঝাটে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম—' উত্তর দিতে গিয়ে ডার্নে মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল।

'তা বটে—'

ঘরে চাকর যতক্ষণ ছিল এ ছাড়া আর অন্য-কোন কথাবার্তা হল না। কফি পরিবেশনের পর দুজনে একলা হলেন। কাকার মুখের দিকে চেয়ে ডার্নে বলল, 'যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম তাতে নানা ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য যে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম তাতে মৃত্যু হলেও আমি আপসোস করতাম না।'

'ও কথা বলছ কেন?'

'সত্যিই যদি আমার বিপদ ঘটত, আপনি আমাকে বিরত হতে দিতেন কিনা সন্দেহ।'

মুখের রেখায়-রেখায় ভাইপোর প্রতি স্নিগ্ধ মমতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন মারকুইস, কিন্তু তাতে আন্তরিকতা এল না।

সেদিকে তাকিয়ে ডার্নে স্পষ্টই বলল, 'আপনি আমার চারপাশের সন্দেহজনক পরিবেশকে আরও সন্দেহভাজন করে দেবার চেষ্টা করতেন নিশ্চয়ই।'

'না, না, সে কি?'

অল্প একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'দেখ, যে-ঘরে তুমি জন্মেছ, যে বংশ-মর্যাদা তোমার রক্তে, তার সৌভাগ্য মাথা খুঁড়ে মানুষ পায় না।'

'কিন্তু ফ্রান্সের ইতিহাসে আমাদের কৌলীন্য বিন্দুমাত্র গরিমা পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সেকালে তো বটেই, একালেও আমরা আমাদের অধিকার এমন জবরদস্ত জাহির করছি যে, আজকে সারা ফ্রান্সে আমাদের মতো এমন ঘৃণার পাত্র আর দ্বিতীয় কাউকে চোখে পড়ে না।'

'এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। নিচের তলায় যারা থাকে ওপরওয়ালাদের প্রতি তাদের এই ঘৃণা পূজারই নামান্তর।'

'ওকথা সত্যি নয়। এই জমিদারির মালিকদের সমীহ করে লোক নিছক ভয়ে। কোন ভক্তি নেই তার মধ্যে।'

'আমাদের পারিবারিক আভিজাত্যের দিক থেকে তাতে অন্তত লজ্জার কারণ নেই।'

মারকুইস একটিপ সুগন্ধ নস্য নাসারন্ধ্রে দিয়ে আরাম করে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসলেন। বললেন, 'চাবুকের চেয়ে বড় শাসনও নেই, শিক্ষাও নেই। যতদিন মাথার উপর এই ছাদ থাকবে, কুকুরগুলোকে চাবুকের ভয়ে বশে রাখব। তোমার ভাবনা নেই। যতদিন এ-পরিবারের শান্তি-সম্ভ্রম বজায় রাখার দায়িত্ব আমার, ততদিন তোমাদের কারুরই মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু তুমি খুব পরিশ্রান্ত। যাও, বিশ্রাম নাও গে।'

'আর-একটা কথা।'

'একটা কেন। যত খুশি কথা আছে বল।'

'আমরা যে-অন্যায় করেছি তার ফসল ফলতে শুরু করেছে।'

'অন্যায় করেছি?'

'অন্যায় নয়? আপনারা সবাই অন্যায় করেছেন। অত্যাচার করে এসেছেন, এখনও করতে কসুর করছেন না। কিন্তু আমি কি করে ভুলব মায়ের শেষ অনুরোধ, তাঁর অন্তিম দৃষ্টির কাতর মিনতি—'লোকের প্রতি স্নেহশীল হবে, লোকের দুঃখ মোচন করবে'—সে আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু সে শক্তি-সামর্থ্য কোথায় পাব আমি?'

'আমার কাছ থেকে যদি সেরকম কিছু পাবার আশা করে থাক, সে তোমার দুরাশা।'

একটু থেমে বললেন মারকুইস, 'যে-সমাজ-ব্যবস্থায় আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, তাকে ভাঙ্গতে দেব না আমি বেঁচে থাকতে।'

'এই সম্ভ্রম-সম্পত্তি আমার জীবনে মূল্যহীন। ফ্রান্সেও আমি থাকতে চাই না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল ডার্নে, 'আমি স্বেচ্ছায় আমার অধিকার ত্যাগ করছি।'

'এ দুটোই কি তোমার নিজস্ব? ফ্রান্স হয়ত হতে পারে, কিন্তু এই সম্পত্তি?'

'এ-সম্পত্তি আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা নেই আমার। যদি আগামীকাল এ-সম্পত্তি আমাতে বর্তায়—'

'সে-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।'

'কুড়ি বছর পরেও তো হতে পারে—'

মারকুইস পরিহাস-বিজড়িত কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন।

'বাইরে থেকে দেখলে সব কত মজবুত, মনোহর। কিন্তু দিনের আলোয় উন্মুক্ত আকাশের নিচে দেখলে এ শুধু ঋণ আর অপচয়, অত্যাচার আর নিপীড়ন, বুভুক্ষা আর নগ্নতার ধসে-পড়া দুর্গ ছাড়া কিছু নয়।'

মারকুইস আবার শ্লেষোক্তি করলেন।

'যদি কোনদিন এ সম্পত্তি আমার হাতে আসে,' বলল ডার্নে, 'আমি উপযুক্ত লোকের হাতেই তুলে দেব একে। তুলে দিয়ে বাঁচব। এ-সম্পত্তি আমার জন্য নয়—এর উপর ভগবানের অভিশাপ উদ্যত হয়ে আছে।'

'তারপর?'

'আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে বাস করব। সাধারণ সজ্জন ভদ্রলোকের মতো বাঁচতে চাই আমি।'

'ইংল্যান্ড দেখছি তোমার মনে রঙ ধরিয়েছে—' স্মিত-প্রশান্ত দৃষ্টিতে মারকুইস তাকালেন ভাইপোর দিকে।

'ইংল্যান্ড আমার আশ্রয়।'

'দাম্ভিক ইংরেজরা বলে বটে ইংল্যান্ড সবার আশ্রয়-স্থল। জান বোধ হয়, এ-দেশের একজন সম্প্রতি সেখানে আশ্রয় পেয়েছে। একজন ডাক্তার!'

'জানি।'

'তার একটি মেয়েও আছে শুনেছি।'

'হ্যাঁ—'

'হুঁ! তুমি শ্রান্ত। শুভরাত্রি।'

বলে মারকুইস মৃদু হাসি হাসলেন। সে-হাসির আড়ালে একটা রহস্যের ইঙ্গিত। এমন একটা ভঙ্গিতে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন তিনি, তাতে রহস্য যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠল। তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন—'একজন ডাক্তার আর তার একটি মনোরমা মেয়ে। বসন্তের প্রথম রঙ। জীবন-দর্শনের নূতন ঢং।'

আজকের রাত নিস্তব্ধ, নির্বাত। হালকা শ্লিপার-পায়ে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মারকুইস। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন হিংস্র বাঘের মতো।

সারাদিনের টুকরো-টুকরো স্মৃতি মনের পর্দায় আসছে-যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য শেষ পাড়ি দিচ্ছেন। পাহাড়ের কোলে গ্রাম—পুকুর-পাড়ে চাষীদের জটলা। টুপি-পরা একটা মজুর। পথের মাঝে তালগোল-পাকানো একটা রক্তের ডেলা। একটা মেয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে। একজন ঢ্যাঙা লোক আকাশের দিকে হাত দুখানা তুলে চেঁচিয়ে উঠল—'মরে গেছে। একেবারে শেষ করেছে।'

অগ্নিকুণ্ডে একটিমাত্র বাতি পুড়ছে। পাতলা মশারি টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লেন মারকুইস।

প্রাসাদের বাইরের প্রাচীরের মূর্তিগুলি অন্ধকার রাত্রির এক প্রহর ধরে অন্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আস্তাবলে ঘোড়াদের হ্রেষাধ্বনি, কুকুরদের অবিরাম ঘেউ ঘেউ, পেঁচার চিৎকার একটা অশুভ ভবিতব্যকে যেন ইঙ্গিত করতে লাগল। গ্রাম অন্ধকার—সব ঘুমে অচেতন। যারা অনাহারে রাত কাটায় তারা আজও অভ্যাসমতো বড় বড় ভোজসভার খাদ্য-পানীয়ের স্বপ্ন দেখছে। ক্রীতদাসরা স্বপ্ন দেখছে আরাম ও বিশ্রামের। গ্রামের সেই ঝরনা-তলায় অবিশ্রান্ত জল ঝরে যাচ্ছে—অদৃশ্য অশ্রুত—যেন সময়ের ঝরনা থেকে মুহূর্তগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে অন্ধকার রাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে, পাষাণ-মূর্তিগুলি সেই ধূসর আলোয় চোখ খুলছে।

তারপর পাহাড় আর নিস্তব্ধ বনস্পতিদের মাথায় সূর্যের প্রথম আলোর স্পর্শ লাগল। সেই রক্তিম আলোয় ঝরনায় জল যেন রক্তের মতো লাল হয়ে উঠল। পাথরের মূর্তিগুলিতে লাগল রক্তের আভা। পাখিদের কাকলিতে মুখর হল বাতাস। কালের ছাপ-লাগা মারকুইসের শয়নকক্ষের বিরাট জানালার ধারে বসে একটা ছোট্ট পাখি অবিশ্রান্ত মিষ্টি সুরে গান গাইছিল। একটু পরে গ্রাম উঠল জেগে—জানালার হুড়কো খুলে গেল, নড়-বড়ে দরজার অর্গল মুক্ত হল—নবীন মিষ্টি বাতাসে জমে-যাওয়া মানুষগুলো কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শুরু হল গ্রামের একঘেঁয়ে ব্যস্ততা। কেউ চলেছে ঝরনার দিকে, মাঠে চলেছে চাষীরা, মেয়ে-পুরুষেরা মাটি খুঁড়ছে, হাড়-জিরজিরে গোরু-বাছুরদের রাস্তার ধারে ঘাসের জমিতে নিয়ে যাচ্ছে। গির্জায় বেদিমূলে দু-একজন হাঁটু গেড়ে বসে গেছে—সঙ্গে সঙ্গী—আগাছার ঝোপে গোরুগুলো খাবারের ধান্দায় ঘুরে মরছে।

জমিদার-বাড়ির ঘুম ভাঙে দেরি করে। তারও একটা নিয়ম আছে। রোজকার একটা রুটিন চলে। কিন্তু আজ যেন তার ব্যতিক্রম হল। আজ হঠাৎ বেজে উঠেছে বড় ঘণ্টা। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটোছুটি চলছে। প্রাসাদের ছাতে লোকজনের ভিড়। ঘোড়ার পিঠে সওয়ারদের যাত্রার উদ্যোগ।

রাস্তার মিস্ত্রি-লোকটা সেই সকালবেলাই যেন প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে এল—পাহাড় থেকে নেমে এল একহাঁটু ধুলো নিয়ে। ঝরনাতলায় এসে তবে দাঁড়াল। তারপর জনা পঞ্চাশেক বন্ধুর ভিড়ে মিশে গেল। নিজের বুকে ঠুকতে লাগল তার নীল টুপি।

যেন কোন-কিছুই বোঝা গেল না। শুধু কথার ফিসফিসানি। যেন ত্রাস—হঠাৎ ভয়ে-থমকে-যাওয়া জীবনযাত্রা।

মঁসিয়ে গ্যাবেল ঘোড়ার পিঠে উঠল একজন চাকরের সঙ্গে—তারপর উধাও হয়ে গেল চকিতে।

সেই ত্রাস গত রাতে যেন দেখা দিয়ে গেছে এই প্রাসাদে। যোগ করে দিয়ে গেছে আর-একখানি শিলা। গত দুশ বছর যার প্রতীক্ষায় ছিল সেই শিলামুখ।

মারকুইসের বালিশে সেই মুখ। যেন হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুতে শুষ্ক হয়ে গেছে। আর সেই পাথরের বুকে একটি ছুরি সমূলে গাঁথা। তার গোড়ায় একখানি কাগজে লেখা—'কবরে নিয়ে যাও একে। জ্যাকুজ।'

১০ দুটি প্রতিশ্রুতি

প্রহরের পায়ে পায়ে বছর কেটে গেল। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের মাস্টার হিসেবে ততদিনে ইংল্যাণ্ডে ডার্নে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজকের যুগ হলে তিনি হতেন ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপক। কিন্তু সেইকালে সামান্য শিক্ষক হয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। সেইসব তরুণ—যারা একটি জীবন্ত ভাষার চর্চায় অবসর দিতে পারে, যাদের আগ্রহ আছে প্রবল, তাদের সঙ্গে বিদ্যাচর্চায় কালযাপন করে সে। সেই ভাষার ঐশ্বর্য-মাধুর্য অনুশীলন করে সময় কেটে যায়। ইংরেজিতে লেখায় তার মুন্সিয়ানা এল। ফরাসী সাহিত্য থেকে তর্জমা করত সে ইংরেজি ভাষায়। সেকালে এই ধরনের মনীষী-শিক্ষক খুব সুলভ ছিল না। সেকালের যুবরাজ আর ভাবী সম্রাটরা তখনও এই সব শিক্ষকের কাছে এসে পোঁছায়নি। তেমনি টেলসন ব্যাঙ্কের খাতা থেকে তখনও কেউ-কোন অভিজাত সমাজে রাঁধুনি কি ছুতোরের কাজ নেয়নি। তাছাড়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকায় ডার্নের সুবিধাও হল প্রচুর।

লণ্ডনে সোনার পালঙ্কে আরাম করার বাসনা নিয়ে আসেনি ডার্নে। গোলাপের পাপড়িতে পা দিয়ে সংসারে বাঁচতে চায়নি বলেই সে পরিশ্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চাইল নূতন ক'রে। আর সে-মধুর শ্রমের সুযোগ পেতেও তার বিলম্ব হল না। সেই সঙ্গে কিছু আর্থিক সংযোগের।

ডার্নের সময়ের কিছুটা কাটত কেমব্রিজের ছাত্রমহলে, আর অনেকটা কাটত লণ্ডনে।

যেদিন সংকট ঘনিয়ে এসেছিল জীবনে, সেইদিন থেকে লুসির প্রেমমুগ্ধ হয়েছিল সে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে সমস্ত পুরুষ যে-পথে প্রেরণা পেয়েছে, সৌভাগ্য পেয়েছে, রমণীয় রমণীর ভালবাসায় আতুর হয়েছে, সেই এক পথে ডার্নেও শাশ্বত পুরুষ-সমাজের সহযাত্রী হল। অমন মধু-সংলাপ, কণ্ঠে অত মাধুরী, কোন মেয়ের থাকে তা আগে জানেনি সে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে চারু মুখখানি দেখেছিল সে, তেমন স্নিগ্ধ লাবণ্য আর-কোন মুখে ঝরতে দেখেনি জীবনে। কিন্তু ডার্নে তার মনের কথা মনেই রেখে এসেছে এতদিন। ফেনিল নীলাম্বুরাশির পরপারে বহু ধূলি-ধূসরিত পথ পেরিয়ে সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদ-সৌধ—যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল—আজ তা স্বপ্নময় কুহেলিকায় পরিণত। তারপর প্রায় একটি বছর গড়িয়ে গেছে। ডার্নে মুখের একটি কথাতেও কোনদিন হৃদয়ের দ্বার অবারিত করেনি লুসির কাছে।

কেন করেনি তা সে-ই ভালো জানে।

এমনি গ্রীষ্মের এক বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে ডার্নে ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হল সোহোর সেই নির্জন পরিবেশে। ডাক্তার ম্যানেতের কাছে আজ মনের গোপন ইচ্ছাটি প্রকাশ করবে সে। ডার্নে জানে, এই সময় লুসি মিস প্রসের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যায়।

জানালার ধারে আর্ম-চেয়ারে বই নিয়ে বসেছিলেন ডাক্তার। পুরনো কর্মশক্তি আবার ফিরে পেয়েছেন। ফিরে এসেছে তাঁর উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা, স্থৈর্য আর কর্মোদ্যম।

ডাক্তার পড়েন বড্ড বেশি। ঘুমোন কম, তবে শ্রান্তিকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মেনে নেন। মন প্রসন্নতায় ভরে থাকে।

ডার্নে আসতেই বই বন্ধ করে তাকে অভ্যর্থনার জন্য হাত বাড়ালেন তিনি।

'তোমায় দেখে ভারি খুশি হলাম ডার্নে। গত তিন-চার দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় আছি। স্ট্রাইভার আর সিডনি কার্টন গতকাল এখানে এসেছিল। তারাও জিজ্ঞাসা করেছিল তোমার কথা—'

'তাদের আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। মিস ম্যানেত—?'

'ভালোই আছে। তোমায় দেখলে সবাই খুশি হবে। সংসারের কোন-কিছু কেনা-কাটির প্রয়োজনে বাইরে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।'

'মিস ম্যানেত নেই। এই অবসরে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

এক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল। তারপর যেন চিন্তা-কণ্টকিত সংযত কণ্ঠেই বললেন ডাক্তার, 'চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস এইখানে। বল—কি বলবে!'

ডাক্তারের নির্দেশমতো চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ডার্নে। কিন্তু কথা বলা তত সহজ হল না।

'প্রায় দেড় বছর আপনাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। যা নিয়ে কথা বলতে চাই আশা করি তা—'

ডাক্তার হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তার বলা। অল্পপরে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন—'লুসির সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও তো?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ তার সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন আমার পক্ষে। আর তুমি যে-সুরে কথা কইছ, তা শোনা আরও কঠিন আমার পক্ষে।'

'আমি যা বলতে চাই, আপনার কন্যার প্রতি অকপট প্রীতিভরেই বলতে সাহস পাচ্ছি,' সসম্ভ্রমে বলল ডার্নে।

'তুমি যা বলছ বিশ্বাস করি,' বললেন ডাক্তার।

মনের প্রবল আবেগ কেমন করে দমন করবে ভেবে না পেয়ে ডার্নে ভূমিকা রচনা করতে চাইল। বলল, 'আপনার ভরসা পেলে বলতে পারি।'

'বেশ, বল।'

'আপনি হয়ত অনুমান করতে পেরেছেন, কি আমার কথা। কিন্তু যে-আশা-নিরাশায় আমি নিত্য পীড়িত হচ্ছি তা আপনি হয়ত অনুমান করতে পারবেন না। আমার নিভৃত সত্তার বেদনার ভার কেমন করে বোঝাব আমি অপরকে! ডাক্তার, আমি তাকে ভালোবাসি—আমার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। জগৎ-সংসারে এমন ভালোবাসা কেউ বাসেনি কোনদিন। একদিন আপনিও একজনকে ভালোবেসেছেন। সেই স্মৃতির আলোকে আপনি আমার মনটিকে দেখুন।'

ডাক্তার মাটির দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। ডার্নের শেষ কথায় সচকিত হয়ে বললেন, 'না, না। ওকথা থাক। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে চাই না আমি।'

ডাক্তারের আকুলতা বেদনাহত প্রাণীর আর্ত কান্নার মতোই ডার্নের কানে বাজতে লাগল বহুক্ষণ ধ'রে। তাঁর সেই মিনতির ভঙ্গি দেখে ডার্নে চুপ করে রইল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ডাক্তার আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'লুসির প্রতি তোমার ভালো-বাসায় আমি সন্দেহ করছি না। এ-বিষয়ে তুমি নিঃসংশয় হতে পার।'

ডাক্তার চেয়ারটা ডার্নের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু তার দিকে তাকালেন না বা মাটি থেকেও মুখ তুললেন না। হাতের তালুর মধ্যে মুখখানি চেপে নিচের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন চুপ ক'রে।

'লুসিকে বলেছ তুমি?'

'না।'

'কোন চিঠি দিয়েছ?'

'না।'

'আমার প্রতি মমতাবশেই সে আজও নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে—এর জন্য পিতৃহৃদয়ের ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য,' তেমনি নীরবে নতমুখে বসে তিনি শুধু একটি সস্নেহ হাত বাড়িয়ে দিলেন ডার্নের দিকে।

'আমি তো জানি ডাক্তার, আপনাদের দুটি প্রাণীতে কি অপরিসীম মমত্ব।' শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমমিশ্রিত কণ্ঠে ডার্নে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'একদিন বিপরীত ভাগ্য বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল দুজনকে, আবার এক আশ্চর্য মুহূর্তে মিলিয়ে দিয়েছে। তাই সে স্নেহ এত গভীর, এমন অনির্বচনীয়। কন্যার সঙ্গে পিতার এমন একপ্রাণ কেউ কখনও শুনেছে কিনা, জানি না বটে। কিন্তু আমি তো দেখছি ডাক্তার, যখন সে আপনার গলা জড়িয়ে আদর করে, মুহূর্তে যেন সে মায়াবী শিশু হয়ে ওঠে। সেই নিষ্পাপ প্রাণ, সেই সহজ স্নিগ্ধতা! কেনই-বা না হবে! অতি শিশুকাল থেকে মা-বাপ হারিয়ে সে স্নেহ-ভিক্ষু হয়ে বড় হয়েছে। এতদিনে পিতার কাছে সে মাতা-পিতার স্নেহ পাচ্ছে। স্নেহ দিচ্ছে।'

ডাক্তার তেমনিভাবে নতমুখে নিঃশব্দে বসে রইলেন। তাঁর দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে এল ডার্নের। কিন্তু নির্বাক হয়ে তিনি মনের ভাব সংযত করে রাখলেন।

'ডাক্তার ম্যানেত,' ডার্নে আবার বলল, 'এসব কথা ভেবে যতদিন পেরেছি নিজেকে নিরস্ত রেখেছি। আপনাদের দুজনের সেই স্বর্গীয় স্নেহ-দ্যুতির পটভূমিকায় আমার ভালোবাসাকে টেনে আনলে কেমন হবে, তা আমি কিছুতেই স্থির করতে পারিনি। একথা আমি বহুদিন ভেবেছি—এখনও ভাবি। কিন্তু লুসিকে আমি ভালোবাসি। ঈশ্বর সাক্ষী, লুসির প্রতি আমার প্রেম—'

'আমি বিশ্বাস করি,' কাতর কণ্ঠে বললেন ডাক্তার, 'এর আগেও আমি ভেবেছি সেকথা। আমি বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু একথা কখনও মনে স্থান দেবেন না,' বলল ডার্নে—ডাক্তারের কাতর কণ্ঠ তখনও যেন তার কানে তিরস্কারের মতো বাজতে লাগল—'যদি কোনদিন তাকে সহধর্মিণী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়, আমি তাকে কখনই আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব না। যদি অতীতে কোনদিন সেকথা ভেবেই থাকি কোন আত্মসুখের আশায়—সে-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েই আমি আজ এসে দাঁড়িয়েছি। আপনাকে স্পর্শ করে আমি মিথ্যাবাদী হতে পারব না!'

ডার্নে নিজের হাত ডাক্তারের হাতের উপর রাখল।

'ডাক্তার ম্যানেত, আমিও স্বেচ্ছায় ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত, অত্যাচারে দুঃখে হতাশায় তাড়িত হয়ে এসেছি এখানে—আপনার মতো আমিও নিজের পরিশ্রমে বাঁচার চেষ্টায় এসেছি এখানে—আপনার মতো আমিও এক প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। আমি শুধু চাই আপনার সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে—আপনার সঙ্গ, আপনার গৃহের ছায়া-তলে একটুখানি আশ্রয় পেতে চাই। আমি চিরজীবন বিশ্বস্ত থাকব আপনার প্রতি। আপনার কন্যা, বন্ধু, সঙ্গী লুসিকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাই না, বরং আপনাদের দুজনকে আরও এক নিবিড়তর স্নেহপাশে বন্ধ করতে চাই।'

ডাক্তারের হাত ছিল ডার্নের মুঠির মধ্যে। এতক্ষণ কথা বলার পর এই প্রথম মুখ তুলে তাকালেন ডাক্তার তার দিকে। মনের ভিতরে যে প্রবল সংগ্রাম চলছে তার স্পষ্ট ছাপ মুখে।

'তোমার দরদী মনের পরিচয় দিয়ে তুমি আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ করেছ ডার্নে। তোমার কাছে কিছুই আমি গোপন করব না। লুসি যে তোমায় ভালোবাসে এমন কোন প্রমাণ পেয়েছ কি?'

'না, তেমন কিছু পাইনি এখনও।'

'এখন তাই কি জানাবার সম্মতি চাইছ আমার কাছে?'

'এখন নয়। হয়ত কয়েক সপ্তাহেও সেরকম আশা পোষণের কোন কারণ না-ও ঘটতে পারে। আবার হয়ত আগামী কালই ঘটতে পারে।'

'আমার কাছ থেকে কি কোন প্রতিশ্রুতি চাও?'

'চাই না। তবে আপনি যদি উচিত মনে করেন এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'তুমি প্রতিশ্রুতি চাও?'

'চাই।'

'কিসের প্রতিশ্রুতি?'

'আমি ভালো করেই জানি আপনার সাহায্য না পেলে কোন আশাই নেই আমার। যদি-বা তার নারী-হৃদয়ের একটি কোণে কোন দুর্লভ আসন পাই, তার স্নেহময়ী কন্যা-হৃদয়ে কোন প্রতিষ্ঠা পাব না। পিতৃ-সর্বস্ব তার হৃদয়। সেখানে অন্য সবই গৌণ।'

'বৈরিতার মতোই প্রেমের রহস্য অপার। অবাঙ্‌মানস-গোচর। জান ডার্নে, মেয়ে আমার সেদিক দিয়ে এমন রহস্যময়ী যে, তার হৃদয়ের কোন হদিস পাই না আমি। তার অনুভূতি এত সূক্ষ্ম যে আমি নিজে তা ধরতে-ছুঁতে পাই না।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সে অন্য—?'

এইটুকু বলে ডার্নে ইতস্তত করছে দেখে ডাক্তার বললেন, 'অর্থাৎ কারুর প্রেমে পড়েছে কিনা?'

'সে-কথাটাই আমি জানতে চাই।'

উত্তর দেবার আগে একটু ভাবলেন ডাক্তার।

'কার্টনকে তুমি নিজেই দেখেছ। স্ট্রিভারও এখানে আসে মাঝে-মাঝে। এই দুজন ছাড়া আর কারুর কথা তো আমার মনে পড়ে না। যদি হয় এদের দুজনের একজন-কেউ হতে পারে।'

একটু পরে ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু সেকথা থাক। তুমি আমার কাছে কি চাও, বল?'

'আমি যা-যা বললাম, আপনি তার সাক্ষী হয়ে রইলেন। আমার মতো সেও যদি কোনদিন আপনার কাছে তার মনের দুয়ার খুলে দেয়, আশা করি, সেদিন আমার আবেদন আপনি তার কাছে পৌঁছে দেবেন। এই আমার মিনতি রইল। আর-কিছু নয়।'

'সে-প্রতিশ্রুতি আমি তোমায় দিলাম, ডার্নে। কোন শর্ত-সাপেক্ষ নয়। তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই। তার আর আমার মধ্যে স্নেহের বন্ধন শিথিল না করে আরও দৃঢ় করাই যে তোমার ইচ্ছা—এ আমি বিশ্বাস করি। যদি সে কোনদিন বলে তার সুখের পথে তুমি অপরিহার্য, আমি খুশিমনেই তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করব, মতান্তর থাকলেও—'

ডার্নে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বৃদ্ধের করতল নিজের মুঠোয় চেপে ধরল। বৃদ্ধ আপনমনে বললেন, 'যাকে সে সারা মন দিয়ে চাইবে তার বিরুদ্ধে কোন ভয়, কোন আশঙ্কা নতুন-পুরনো কোনরকম বিদ্বেষের কারণ যদি কোনদিকে থেকে থাকে—যার জন্য সে নিজে দায়ী নয়—লুসির মুখ চেয়ে আমি সে সব-কিছুই চিরদিনের মতো মুছে ফেলব মন থেকে। লুসি আমার সব। তার সুখই সর্বাগ্রে। আমার জীবনের সব অত্যাচার অনাচার দুঃখ-ভোগের ওপরে সে। কিন্তু সেকথা থাক। ওসব চিন্তা—'

কথা বলতে-বলতে কখন আবার মানুষটি নৈঃশব্দ্যের অতলে তলিয়ে গেলেন। অপলক দৃষ্টিতে কি এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল। অবাক চোখে তাই দেখতে লাগল ডার্নে।

হঠাৎ তাকে সচকিত করে দিয়ে ডাক্তার হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, 'কি যেন বলছিলে তুমি আমাকে?'

একথার কি জবাব দেবে ভেবে দিশাহারা বোধ করল ডার্নে। তারপর মনে পড়ল তার সব কথা। তখন আশ্বস্তচিত্তে বলল, 'আপনি আমায় পূর্ণ বিশ্বাস করলেন।

আমারও উচিত আপনার বিশ্বাসভাজন হওয়া। আপনার মনে আছে হয়ত আমার বর্তমান নাম আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নাম এবং কেন আমি ইংল্যান্ডে এসেছি সেই কথাই আপনাকে ভেঙে বলতে চাই।'

'না, না,' ডাক্তার বাধা দিলেন ডার্নেকে।

'কিন্তু নিজেকে আমি গোপন করে রাখতে চাই না আপনার কাছে।'

'দরকার নেই, কোন দরকার নেই।'

মুহূর্তের জন্য ডাক্তার হাত দিয়ে নিজের কান ঢাকলেন। তারপর ডার্নের মুখে হাত দিয়ে বললেন, 'আজ নয়। এখন নয়। যেদিন জানতে চাইব সেদিন বলো। যদি কোনদিন লুসি তোমার কণ্ঠে বরমাল্য দেয়, যদি তাই হয়, তবে বিয়ের দিন সকালে আমায় সব জানিও। বল, জানাবে তো!'

'সানন্দে সব বলব।'

'তবে আজ এস। এখনি লুসি এসে পড়বে। আজ রাতে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে তার না দেখাই ভাল। আজ এস। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

ডার্নে যখন বিদায় নিল তখনই অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। তারও এক ঘণ্টা পরে লুসি যখন ফিরল অন্ধকার তখন আরও ঘন হয়ে উঠেছে। বসার ঘরে কাউকে না দেখে সে ভিতরের ঘরে এল দ্রুত পায়ে।

'বাবা। তুমি কোথায় বাবা?' উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে ডাকল লুসি।

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কেবল কানে এল শোবার ঘর থেকে মৃদু হাতুড়ি পেটার শব্দ। পা টিপে-টিপে মাঝের ঘর পেরিয়ে বাবার ঘরের দরজায় উঁকি মারল লুসি। আর তার রক্তের স্রোত যেন হিম হয়ে এল। ভয়ে ছুটে বাইরে এসে আপনমনে বলতে লাগল লুসি—'এখন আমি কি করব? কি করব এখন?'

মনের বিহ্বলতা তখুনি ঝেড়ে ফেলে দিল লুসি। ফিরে এল বাবার ঘরে। দরজায় টোকা দিয়ে কোমল স্নিগ্ধ গলায় ডাক দিল তাঁকে। মেয়ের গলা পেয়ে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ বন্ধ হল। ডাক্তার বাইরে এলেন। দুজনে অনেকক্ষণ একসঙ্গে ঘরময় পায়চারি করলেন।

সেদিন রাতে কতবার বাবাকে দেখে গেল লুসি। দেখে গেল গভীর নিদ্রায় মগ্ন তিনি। তাঁর সেই জুতো-তৈরির যন্ত্রপাতি আর অসমাপ্ত কাজ যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল।

১১ অন্যপটে

'সিডনি,' সেই ভোর রাতে সিডনি কার্টনকে বলল স্ট্রিভার, 'আর-এক পাত্র পান্‌চ মেশাও। তোমায় একটা কথা বলব।'

সামনে ছুটি পড়বে। আদালত ঘরের কুজ্ঝটিকা আর নভেম্বরের কুয়াশা শুরু হবার আগে স্ট্রিভারের পর্বতপ্রমাণ কাগজ-পত্রের বকেয়া মেটাবার তাগাদায় গত কয়েকদিন ধরে দিন-রাত উপরি-পরিশ্রম করছিল সিডনি কার্টন। অবশ্য সিডনির অবস্থা আদৌ সুখাবহ নয়। এই পরিশ্রমের পরে সুস্থ থাকাও সম্ভব নয় তার পক্ষে। রাতভোর কাজ করতে করতে বারবার ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে হয়েছে, আর বারবার আশ্রয় নিতে হয়েছে সুরার—ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। আজ অনেকদিন পরে কাজ হালকা হওয়ায় দুজনে প্রফুল্ল মনে বসেছিল।

কাজের ভার লঘু হওয়ায় নিশুতি রাতের যাদু লেগেছিল মনে। তার উপর মদ্যপানে মন পুলকিত। সোফায় আরাম করে বসে ষ্ট্রিভার বলল, 'আজ একটা নতুন খবর দিয়ে তোমায় অবাক করে দেব ভাবছি, সিডনি। আমি বিয়ে করছি।'

'সত্যি?'

'হ্যা। তবে আগেই বলে রাখছি—বিয়ে করছি কিন্তু টাকার জন্য নয়।'

'কিন্তু ভাগ্যবতীটি কে?'

'আন্দাজ কর না!'

'আমি তাকে চিনি?'

'আন্দাজ কর।'

'সে আমার দ্বারা হবে না। এই রাত্রি শেষে দুর্বল মাথায় আমি বসে-বসে পৃথিবীর সমস্ত মেয়েদের নিয়ে তোলপাড় করতে রাজি নই। তবে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করলে আন্দাজ করতে রাজি আছি।'

ষ্ট্রিভার তেমনি ঔদাসীন্য দেখিয়ে বলল, 'আমি মানুষটা কেমন তুমি নিশ্চয়ই মনে-মনে জান। আমাকে লোকে জানে খুবই সংসারী, হিসেবী বলে। কেন তাও তুমি জান। আদালতে বল আর সমাজেই বল, ওরকম একটা ভাব আমাকে রাখতেই হয়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে আর-একটি মানুষ বাস করে, যে কাউকে দুঃখ দিতে চায় না। সকলকে আপন করে নিতে চায়। আর বিশেষ করে মেয়েদের মহলে—'

আরাম করে বসল ষ্ট্রিভার, বলল, 'তবে শোন। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার একেবারে আস্থা নেই। তবু আমায় চেষ্টা করতে দাও।'

'আর তুমি—' মদের পান্চ তৈরি করা থেকে মুখ তুলে সিডনি কার্টন বলল, 'তুমি একে কবি-কবি মানুষ—নিতান্ত অনুভূতি-প্রবণ—'

'যথেষ্ট হয়েছে—' হাসতে হাসতে বলল ষ্ট্রিভার, 'জীবনের রোমান্সের নায়ক হবার সাধ আমার নেই। তবু বলতে পারি তোমার চেয়ে ঢের নরম প্রকৃতির মানুষ আমি।'

'সেদিক দিয়ে তুমি ভাগ্যবান—যদি সেই কথাই তুমি বলতে চাও।'

'আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি—মানে একটু বেশি শিষ্ট সজ্জন—এই আর কি!'

'গ্যালান্ট্রির কথা বলছ!'

'ঠিক তাই। আমি বলতে চাই যে আমি শুধু পুরুষ নই—আমি মানুষ।'

বন্ধুর দিকে একটু এগিয়ে আবার বলল ষ্ট্রিভার, 'মানুষ—মানে সকলের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ পাতাতে চাই—অন্যের আনন্দের অংশীদার হতে চেষ্টার কার্পণ্য করি না—বিশেষ করে মেয়েদের সমাজে কি করে সহজ হতে হয়—সে-চেষ্টা তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশি করি।'

'বলে যাও—'

'না, আর বেশি এগোবার আগে—' ষ্ট্রিভার মাথা আন্দোলিত করল।

তারপর আবার বলল, 'ডাঃ ম্যানেতের বাড়িতে তুমি বোধ করি আমার চেয়ে কমবার যাওয়া-আসা করনি। কিন্তু প্রতিবারই একটি কারণে আমি দুঃখ পেয়েছি। কেন তুমি অমন বিরস মুখে থাক বলতো? তোমাকে দেখে যেন মনে হয় বিষন্ন, অপরাধী। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার জন্যে আমার লজ্জা বোধ হয়—'

সিডনি কার্টন তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলল, 'এ-সংসারে কোন বিষয়ের জন্য লজ্জিত হওয়া তোমার মতো আইনজ্ঞের পক্ষে হিতকর, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। এর জন্যে তোমার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।'

'ওভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না, বন্ধু। শোন, সিডনি—তোমায় আমি খোলাখুলি

বলছি। তোমার ভালোর জন্যেই আমার বলা। ঐরকম একটি সজ্জন-সঙ্গে তুমি নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষ। তোমার উপস্থিতি ওখানে বড় বেসুরো বাজে।'

সিডনি একসঙ্গে অনেকখানি মদ গলায় ঢেলে দিল। তারপর প্রবলভাবে হাসতে লাগল।

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ,' বলল ষ্ট্রিভার, 'দেখ না—ওবাড়িতে নিজেকে বিশেষ ভাবে উপস্থাপিত করার ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার কোন-কিছুরই অভাব নেই। তবু কেন করি বলতে পার?'

'কোনদিন তোমার সে-চেষ্টা চোখে পড়েনি আমার।'

'করি—কেন না তার নাম রাজনীতি। করি—কেন না সেটা আমার জীবনের নীতি।'

'কিন্তু তোমার বিয়ের ব্যাপারটার কি হল—?'

যেন হালকা সুরে বলল কার্টন—'তোমার বিয়ের কথাটাই বল। আমার কথা বাদ দাও। আমায় তুমি কোনদিনই সায়েস্তা করতে পারবে না।'

'অত একগুঁয়ে হবার কোন অর্থ আছে?' কঠিন শ্লেষের সঙ্গে বলল ষ্ট্রিভার।

'তা আমি জানি। কিন্তু আত্মকাহিনী রেখে বিবাহের ব্যাপারটার—? মেয়েটি কে?'

মুখে বিরাট গাম্ভীর্য নিয়ে ষ্ট্রিভার সেই বিরাট রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রস্তুত হল। বন্ধুর দিকে ঈষৎ অনুকম্পাভরে চেয়ে বলল, 'শুনে আশা করি ঘাবড়ে যাবে না। তোমার কাছে এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু করা এই জন্য যে একদিন তুমিই তার সম্বন্ধে আমার কাছে কৃপা করে হালকা কথা বলেছিলে।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'নিশ্চয়ই বলেছ। আর এই ঘরে বসে।'

সিডনি কার্টন একবার বন্ধুর প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাল। তারপর মদের পাত্র নিঃশেষ করে দিল।

ষ্ট্রিভার বলল, 'যাকে তুমি একবার সোনালী চুল-বসানো পুতুল বলেছিলে সেই মিস ম্যানেতের কথা বলছি আমি। যদি আমি না জানতাম যে তোমার কথার কোন রাখ-ঢাক নেই, কোন বাঁধন-বাধ্যতা নেই তবে সেইদিনই আমি বিশ্রীভাবে আপত্তি করতাম তোমার কথায়। কিন্তু তোমার কথায় আমি রাগ করিনি। রাগ করব কি ক'রে? যার দৃষ্টি নেই সে যদি আমার ছবির মর্ম না বোঝে তার ওপর রাগ করব কি ক'রে? যার সুরেলা কান নেই সে সুরের বুঝবে কি বল?'

সিডনি কার্টনকে কথা কইবার অবকাশ না দিয়ে ষ্ট্রিভার আবার বলল, 'তাছাড়া তুমি জান, কারুর সম্পত্তির ওপর লোভ আমার নেই। সে-প্রত্যাশাও আমি করি না। মেয়েটি ভালো। তাকে নিয়ে সুখী হতে পারলেই আমি খুশি হব। আর খুশি হবার যথেষ্ট কারণ আছে আমার। আমার অবস্থা মোটামুটি ভালোই। পসার এখন আমার বাড়তির মুখে। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও কিছু পেয়েছি তুমি জান। আমার না হোক, এসব তার তো লোভের জিনিস। কিন্তু সে-মেয়ে এ সবের যোগ্য, তা আমি স্বীকার করবই। তুমি যেন কেমন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ, মনে হচ্ছে!'

'আমি কেন আশ্চর্য হতে যাব।'

'কিন্তু এ-প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমার রায় কি?'

'আপত্তি করার যুক্তি পাচ্ছি কই?'

ষ্ট্রিভার এতক্ষণে হালকা কণ্ঠে বলল, 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম এত সহজে তোমার সায় পাব না। তুমি তো জান, আমি মানুষটা জেদী। কিন্তু এই ধরনের জীবন

কাটানোর একটা বদল চাইছে মন। ভাবছি একটি ঘর-সংসার নিয়ে মুখবদল করি। তুমি তো জান লুসি ম্যানেতের মতো মেয়ে সংসারে যে-কোন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে। তাই আমি আর ফেলে রাখতে চাইলাম না। মন স্থির করে ফেললাম। আর তোমাকেও বলি সিডনি, তুমি যেভাবে চলেছ তাতে তোমার ভবিষ্যৎ ভালো নয়। টাকা-পয়সার কোন মূল্য বোঝ না তুমি, যেমন তেমন করে দিন কাটাও। অতি-পরিশ্রমের সঙ্গে এইরকম অমিতব্যয়—কোনদিন দেখবে রোগে পড়বে। বিপদ ঘটবে। তাই বলছি, তুমি কোন স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করতে শেখ।'

সিডনি কার্টন বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখল যে বাক্যচ্ছটায় মানুষটি যেন আকারে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। বসে-বসে আরও শুনল।

'তাই বলছিলাম আমার উপদেশ মতো চল। বৈরাগ্য ছেড়ে গার্হস্থ্যে এসে উপস্থিত হও। ভদ্র দেখে এমন একটি মেয়ে খুঁজে বের কর, যার কিছু পয়সাকড়ি আছে। তারপর তাকে বিয়ে করে নিশ্চিন্ত হও। জানবে—সে তোমার বিপদের দিনের বন্দর। কথাটা ফেলো না। ভালো করে ভেবে দেখো।'

সিডনি কার্টন স্বচ্ছ গলায় বলল, 'ভেবে দেখব বন্ধু—নিশ্চয়ই ভেবে দেখব।'

১২ মহাজন

তার ঘরে বধূ হয়ে কত বড় ভাগ্যবতী হবে ডাক্তার-দুহিতা, সে-কথা মেয়েটিকে জানাবার জন্য ব্যগ্র হল স্ট্রিভার। সামনেই দীর্ঘ অবকাশ আসছে। ভাবল, বড়দিনের উৎসব-বরাবর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করবে। কিন্তু তার আগে কথাটা তাকে জানিয়ে খুঁটি-নাটি আয়োজন শুরু করা দরকার।

কতভাবে বহুমূল্য কথাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করল মনে মনে। কোথায় গিয়ে জানাবে সেই শুভ সংবাদ? অনেক চিন্তার পর ঠিক করল যে সোহোতে তাদের বাড়িতেই কথাটা পাড়বে। এ-ধরনের পবিত্র প্রস্তাব গৃহ-পরিবেশেই ভালো।

সকালে পথে বেরিয়েই স্ট্রিভার যখন সোহোর দিকে পা বাড়াল, তখনও মনের দিগন্তে তরুণ স্বপ্নের মায়া। মস্ত মজবুত মানুষটি পথ দিয়ে যখন যায়, লোকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। প্রবল ভঙ্গির বলিষ্ঠতা দেখে লোকে বোঝে যে মানুষটির কাছে সবই নিশ্চিন্ত, নিরাপদ।

টেলসন ব্যাঙ্কের পাশ দিয়েই যাবার পথ। টেলসন ব্যাঙ্কে কাজে-কারবারে লরির সঙ্গে তার পরিচয়—তাছাড়া ম্যানেত-পরিবারের একজন বিশেষ বন্ধু হিসেবেও জানে লরিকে। কাজেই স্ট্রিভারের হঠাৎ খেয়াল হল, এ সুখ সংবাদটি লরিকেই পরিবেশন করে যাবে।

ব্যাঙ্কের দরজা ঠেলে গুহার ভিতরে প্রবেশ করল স্ট্রিভার। হোঁচট খেয়ে দুধাপ নিচে নেমে দুজন মান্ধাতার আমলের ক্যাশিয়ারকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল সেই অন্ধকার নিরিবিলি জায়গাটিতে, যেখানে লাইন-কাটা বিরাট জাবদা খাতা সামনে খুলে লরি ব্যস্ত নিজের কাজে।

'কেমন আছেন? সব কুশল তো?'

লরি করমর্দন করলেন স্ট্রিভারের সঙ্গে।

'কি করতে পারি আপনার জন্য?' ব্যবসায়ী চালে প্রশ্ন করলেন লরি।

'কোন প্রয়োজন নেই, ধন্যবাদ। ব্যবসার কাজে নয়, একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছি আপনার কাছে। একটা গোপন কথা আছে।'

'তাই নাকি!' আরও কাছে কান এনে বললেন লরি। কিন্তু দৃষ্টি রইল সামনে সজাগ।

ডেস্কের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে নিজেকে বেশ করে গুছিয়ে নিয়ে বলল ষ্ট্রিভার, 'মিস ম্যানেতের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে যাচ্ছি।'

'সত্যি?' থুতনিতে হাত বুলোতে বুলোতে ষ্ট্রিভারের দিকে সংশয়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন লরি।

'হ্যাঁ। আপনি কি বলেন?'

'আমি? আমি—আমি আপনার দরদী বন্ধু, খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী। এ-প্রস্তাব আপনার কৃতিত্বের কথা বই কি! তবে কি জানেন—' বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন লরি। তারপর যেন অনিচ্ছাভরেই বললেন জোর ক'রে, 'আসলে বলতে গেলে জিনিসটা আপনার পক্ষে একটু বেশি—মানে আপনি খুব বেশি—'

'দেখুন মি. লরি,' বেশ বড় করে নিশ্বাস টেনে ডেস্কের উপর একটা চাপড় মারল ষ্ট্রিভার সশব্দে। তারপর চোখ বিস্ফারিত করে বলল, 'আপনার কথা একটুও বোধগম্য হল না।'

লরি কলমের পালক দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলেন।

ষ্ট্রিভার সেদিকে তাকিয়ে কথার জের টেনে আবার বলল, 'আপনার কি ধারণা—আমি তার যোগ্য নই?'

'সে কি কথা! আপনি যদি নিজেকে ভাবেন যোগ্য, তার চেয়ে বড় কথা আর কি আছে?'

'আমার ঐশ্বর্যের অভাব নেই।'

'তা তো বটেই!'

'আর আমার রোজগার এখন বাড়তির মুখে।'

'তার চেয়ে আর সত্য কি আছে!'

'তবে?' দাবি করল বটে ষ্ট্রিভার। কিন্তু মনে নিরুৎসাহের ভাব চাপা রইল না।

'এখন চলেছেন কোথায়?' প্রশ্ন করলেন লরি।

'সোজা সেখানে।' বলে ষ্ট্রিভার সজোরে ঘুষি মারল টেবিলের উপর।

'আমি হলে যেতাম না।'

'কেন?' যেন সাক্ষীর উপর হামলা করছে, এমনি ভঙ্গিতে তর্জনী উঁচিয়ে পালটা প্রশ্ন করল ষ্ট্রিভার, 'আপনি ব্যবসাদার লোক। যেতেন না যখন, নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে তার। কারণটা খুলে বলুন—কেন যেতেন না?'

'সাফল্যের প্রত্যাশা যেখানে নেই সেখানে বেফায়দা আসা-যাওয়ায় লাভ কি বলুন?'

'উঃ! এ একেবারে চরম হল!'

লরি একবার দূরের দিকে, আর-একবার ক্রুদ্ধ ষ্ট্রিভারের দিকে তাকালেন। আর ষ্ট্রিভার আপনমনে বিড়-বিড় করতে লাগল, 'এই লোক! এই লোক ব্যবসাদার—বয়স হয়েছে—অভিজ্ঞতা আছে। দাম্পত্য-সৌভাগ্যের তিন-তিনটি জলজ্যান্ত প্রমাণ সত্ত্বেও বলেন কিনা কোন কারণ নেই? আর বলছেন সুস্থ মাথায়?'

'আমি যে-সাফল্যের কথা বলছি তা মেয়েটি সম্পর্কেই—' ষ্ট্রিভারের কনুইতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন লরি, 'মেয়েটিই হল সূত্র। তার জন্যই তো সব। কার্য-কারণ যা-ই বলুন সবই তাকে ঘিরে—'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, মেয়েটির সাংসারিক বুদ্ধি কিছু নেই।'

'না, সেরকম কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়,' লরির মুখ লাল হয়ে উঠল, 'তার সম্পর্কে ওরকম অসম্মানসূচক মন্তব্য কারুর মুখ থেকে শুনতে আমি রাজি নই। যার

রুচি এত বিকৃত, মেজাজ এমন কটু যে আমার সামনে এইখানে দাঁড়িয়ে তার সম্বন্ধে অসংযত ভাষা প্রয়োগ করে—তাকে আমি কোনমতেই ক্ষমা করতে পারি না। তাকে উচিতমতো শিক্ষা দিতে আমি পিছপা নই, একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই।'

লরির কথায় ষ্ট্রিভারের রক্তে আগুন ধরে গেল। আর সেই উত্তেজনা কিভাবে প্রকাশ করবে তা ভেবে ষ্ট্রিভার অন্তরে গুমরে উঠতে লাগল।

'আমার উপর রাগ করবেন না—আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি,' বললেন লরি।

'আপনি আমাকে নতুন কথা শোনাচ্ছেন মি. লরি। আমি কিংস-বেঞ্চ বারের ষ্ট্রিভার, আমাকে আপনি তার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব না করতে উপদেশ দিচ্ছেন?'

'আপনি কি আমার উপদেশ চান?'

'চাই।'

'তা দিতে আমারও আপত্তি নেই মি. ষ্ট্রিভার। আমার উপদেশ আপনি নিজে উচ্চারণ করলেন এইমাত্র।'

মুখে বিরক্তির হাসি টেনে ষ্ট্রিভার বলল, 'চমৎকার! আপনার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না মি. লরি।'

লরি সেকথা কানে তুললেন না। বললেন, 'দেখুন, ও-সব কথায় আমার না থাকাই ভালো। তবে তাকে আমি শিশুকাল থেকে কোলেপিঠে করেছি, তাদের পরিবারের আমি অনেককালের বন্ধু—তাদের বিশেষ স্নেহ করি বলেই একথা বললাম। অবশ্য বিচারের ভার আপনার।'

'আমায় মাপ করবেন, মি. লরি।'

'ধন্যবাদ। দেখুন মি. ষ্ট্রিভার, আমি নিজে বলতে চাই না, তাতে আপনি হয়ত ভুল বুঝবেন। সেটা বেদনাদায়ক হবে আপনার পক্ষে—বাপ ও মেয়ের পক্ষেও। আপনি যদি আমার উপদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, আপনি স্বচ্ছন্দে এ নিয়ে একটু বাজিয়ে দেখতে পারেন। আর যদি মনে করেন, আমার উপদেশের কোন সার আছে, তা হলে বলব আর অগ্রসর না হওয়াই সর্বদিক থেকে সমীচীন হবে।'

'আমাকে কতক্ষণ শহরে আটকে রাখবেন?'

'মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আমি বিকেলে সোহোতে যাব—সেখানে থেকে পরে আপনার চেম্বারে গিয়ে খবর দিতে পারি।'

'বেশ, তাই হোক। আমি সেখানে যাব না। অবশ্য যাওয়ার মতো জরুরী তাগিদ আমারও নেই। আজ রাতে আপনাকে আশা করতে পারি? আচ্ছা, চলি—'

যেমন এসেছিল তেমনি সশব্দে বিদায় নিল ষ্ট্রিভার।

যথারীতি রাত দশটায় লরি ষ্ট্রিভারের সঙ্গে দেখা করলেন তার চেম্বারে। চারিদিকে ছড়ানো স্তূপাকার কাগজ-পত্তরের ভিড়ে বসে আছে ষ্ট্রিভার। সকালের ব্যাপারটা যেন সে ভুলেই গেছে এমন ভাব দেখাল—এমন কি লরিকে দেখে বিস্ময়প্রকাশও করল।

আধ ঘণ্টা রীতিমতো চেষ্টার পর সকালের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন লরি।

'সোহোতে গিয়েছিলাম।'

'সোহো? ও—আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।' সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বলল ষ্ট্রিভার।

'কথাবার্তায় যা বুঝলাম, আমি সকালে যা বলেছিলাম তাই ঠিক। আমি আমার উপদেশের পুনরাবৃত্তি করছি।'

'আমি আপনার মেয়েটির বাবার জন্য দুঃখিত। জানি, সে-পরিবারে এটা চিরকাল একটা গভীর ক্ষত হয়ে থাকবে। এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা না করাই ভালো।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'একেবারে না বলতে সাহস হচ্ছে না—যাক গে, তার আর প্রয়োজন নেই।'

'আছে বই কি।'

'না, প্রয়োজন নেই। ভুল করতে যাচ্ছিলাম, ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। তাতে কারুর ক্ষতি হয়নি। মেয়েরা এরকম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আগেও দিয়েছে। জিনিসটার এইভাবে যবনিকাপাত হওয়ায় আমি দুঃখিত, কিন্তু স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে আমি সুখীই হয়েছি। সংসারের দিক থেকে খতিয়ে দেখতে গেলে এ-বিয়েতে আমার যে কোন লাভই হত না সেটা বলাই বাহুল্য। যাক, কোন ক্ষতি হল না কোন পক্ষেরই। মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করিনি, ভালোই করেছি। এখন ভেবে দেখেছি, অত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারতাম কি না সন্দেহ। মি. লরি, আপনি এই সমস্ত শূন্য-মস্তিষ্ক দেমাকী মেয়েদের বাগে আনতে পারবেন না। যাক ও কথা। ওদের জন্য দুঃখ হয় যখন ভাবি—তবে নিজের তরফে আমি খুশিই হয়েছি। আপনার সঙ্গে আলোচনার জন্য—আপনার অমূল্য উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আমি কৃতজ্ঞ। আপনি ওদের ভালো জানেন। আপনি ঠিকই বলেছেন—এ বিয়ে হত না।'

ষ্ট্রিভারের হঠাৎ শুভ বুদ্ধি-উদয়ে এবং অকৃপণ শুভেচ্ছা-বর্ষণে লরি এত বিস্মিত হলেন যে রীতিমতো বোকা বনে গেলেন।

ষ্ট্রিভার আবার বলল, 'আর একটিও কথা নয়। আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি।'

সম্পূর্ণ ধাতস্থ হবার আগেই লরি এসে রাস্তায় নামলেন। আর ষ্ট্রিভার সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে কড়িকাঠ গুণতে লাগল।

১৩ অভাজন

ডাক্তার ম্যানেতের বাড়িতে গত এক বছর ধরে সিডনি কার্টনের ভূমিকা নিছক দর্শকের। প্রায়ই আসেন যান। কিন্তু থাকেন আপন মেজাজের আড়ালে। যখন কথা বলেন, মানুষটি আলাপে ঝকঝক করে ওঠেন। কিন্তু সে মেজাজ আসে ক্বচিৎ কদাচিৎ। একটা বেপরোয়া নির্লোভ ভাব অন্ধকারের মতো তার ভিতরকার আবেগকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু এই বাড়ির আশে-পাশে যত পথ যত পাথর সব কিছুতেই তাঁর নেশা। কত রাতে সেই পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ান। মদ যখন শান্তি দিতে পারে না মনে, এই সব পথে ঘুরে বেড়ান অতৃপ্ত প্রেতের মতো। ভোরের আলোয় তাঁর সঙ্গীহীন ভ্রাম্যমাণ দেহটি চোখে পড়ে। তার পর যখন রোদে ঝলকিত হয়ে ওঠে চারদিক, তখন তাঁর ঘোর কাটে। আবার সব মনে পড়ে। যা ভুলেছিলেন সব—যা তাঁর পাওয়ার অতীত তাও।

আজকাল আর রাতে ঘুমোতে পারেন না। যেদিন-বা বিছানায় আশ্রয় নেন, তখুনি উঠে পড়েন। সেই একখানি বাড়ির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

এমনি একদিন আগস্ট মাসে যখন প্রকৃতি যৌবন আর সজীবতায় প্রাণময়ী—বিহ্বলের মতো ঘুরতে ঘুরতে সিডনি কার্টন এসে দাঁড়ালেন ডাক্তারের দরজায়। উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট অথচ কি এক রুদ্ধ আবেগে যন্ত্রচালিতের মতোই এসে পড়লেন যেন।

বাড়িতে লুসি একা সংসারের কাজ করছিল। এই মানুষটিকে নিয়ে সে বড় বিব্রত

বোধ করে। আজও একে একলা পেয়ে তার মনে অস্বস্তির অন্ত রইল না। কিন্তু কার্টনের মুখের দিকে চেয়ে লুসি আজ অবাক হল।

'আপনার শরীর বোধ হয় সুস্থ নেই মি. কার্টন?'

'সত্যিই ভালো নেই। কিন্তু আমার জীবনধারণ এর চেয়ে ভালো রাখার কথাও নয়, মিস ম্যানেত।'

'কেন নয়? কেন ভালো ভাবে থাকেন না?'

কোমল দৃষ্টি তুলে মানুষটির দিকে তাকাতেই লুসির সারা অন্তর ব্যথায় ভরে গেল। দেখল তাঁর দুটি চোখই অশ্রুসিক্ত। লুসি শুনল তাঁর অশ্রুরুদ্ধ কথা 'বড় দেরি হয়ে গেছে। আর ফেরবার পথ নেই আমার। এখন কেবল নেমে যাওয়া। ধাপে-ধাপে নিচে নামা।'

টেবিলের উপর কনুই রেখে করতল দিয়ে মুখ ঢেকে বসলেন সিডনি কার্টন। আর লুসি দেখল, সেই অপার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে টেবিলটি থরথর করে কাঁপছে।

এমন করে তার নারী-হৃদয় কোনদিন কারুর জন্য কাঁদেনি। সে কথা যেন মুখ না তুলে বুঝতে পারলেন কার্টন। তেমনি ভাবেই বললেন, 'আমি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছি, মিস ম্যানেত। আমায় মাপ করবেন। আমি কিছু বলতে চাই আপনাকে। দয়া করে শুনবেন?'

'বলে যদি আপনার মন হালকা হয়, মি. কার্টন, আপনি বলুন। আমি নিশ্চয়ই শুনব।'

'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, মিস ম্যানেত। আপনার এ মমতা আমি ভুলব না।'

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললেন কার্টন। তারপর সংযত কণ্ঠে বললেন, 'আমার কথা শুনে ভয় পাবেন না। মুখ ফিরিয়ে নেবেন না যেন ঘৃণায়। কত কাল আগে মরে-যাওয়া প্রেত-শরীর বয়ে বেড়াচ্ছি আজও। আমার সমস্ত জীবনটাই একটা মরীচিকা।'

'না, না, মি. কার্টন। আপনার উজ্জ্বল জীবন তো সামনে। আপনি আরও কত বড় হতে পারেন।'

'আপনি বললেন এ কথা! শুনে বড় তৃপ্তি হল। জানি সে কত মিথ্যে, কিন্তু শুনতে বড় ভালো লাগল—বড় ভালো লাগল।'

ভিতরের চাপা আবেগে পাংশুমুখে থরথর করে কাঁপছিল লুসি। কার্টন এসে তার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। আপন-আপন গভীর দুঃখে দুঃখী দুটি নর-নারী একাত্ম হয়ে দাঁড়াল।

'আপনার সামনে এই আমি দাঁড়িয়ে আছি, মিস ম্যানেত! একটা মাতাল, অমিতাচারী, সংসারের জঞ্জাল। কিন্তু আমার ভালোবাসা,—আমার ভালোবাসা যদি আপনি কোনদিন হাত পেতে নিতেন, না—না, তার যোগ্য মর্যাদা আমি দিতে পারতাম না। হয়ত আপনাকেই আমি অসম্মানে টেনে নামিয়ে আনতাম। আমার মতো লোকের ওপর আপনার কোন প্রীতি থাকতে পারে না। তা আমি চাইও না। ভগবান করুন, তা যেন কখনও না হয়।'

'আর কি করতে পারি আমি—বলুন? আর কি করলে আপনার উপকারে লাগতে পারি আমি? এ বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারি'—করুণ মমতার অশ্রুতে বিগলিত কণ্ঠে লুসি বলল—'এমন করে আপনি আর-কোন মেয়ের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন না, তা আমি জানি। আমাকে দিয়ে কি আপনার কোন উপকারই হতে পারে না, মি. কার্টন?'

কার্টন মাথা নাড়লেন। তার পর বললেন, 'না, মিস ম্যানেত। আমার নিজের অপদার্থতার কথা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে বলুন? তবু এ আমার কি দুর্বলতা —একবার আমায় জানাতেই হবে আপনাকে—কি আশ্চর্য মমতায় আপনি আমায় জাগিয়েছেন। একটা নিভন্ত ছাইয়ের স্তূপের মতো আমার সত্তাকে আপনি প্রীতি দিয়ে আবার

জ্বালিয়ে তুলেছেন। জানি, আর সে-আগুনে কারুর কোন উপকার হবে না—না আমার নিজের, না অন্য কারুর, শুধু অকারণে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।'

'এ আমার দুর্ভাগ্য, মি. কার্টন যে আমি আপনাকে আরও অসুখী করে তুললাম—'

'ও কথা উচ্চারণ করবেন না। যদি কেউ পারত সে আপনিই—আপনিই আমাকে তুলে ধরতে পারতেন। আমার দুঃখের কারণ আপনি হতে পারেন না।'

'তবে কেন আমার উপর নিজেকে ছেড়ে দিচ্ছেন না, মি. কার্টন? আমি কি আপনার কোন মঙ্গল করতে পারি না?'

'মিস ম্যানেত,' বললেন কার্টন—'আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার নিজেকে চেনা হল—এই আমার পরম লাভ। আমার এই লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের বাকি কটা দিন এই স্মৃতি আমার উজ্জ্বল হয়ে থাক যে, একদিন আপনার কাছে নিজেকে তুলে ধরেছিলাম আমি। আর এই হতভাগার ভিতরে তখনও এমন-কিছু অবশিষ্ট ছিল যা আপনি অপার মমতায় মাখিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি আমায় কিছু বলবেন না আর। শুধু এই সত্য আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক যে আপনার নিষ্পাপ সরল হৃদয়ে আমার জীবনের ব্যর্থতা আর বেদনার ভার নিভৃত আশ্রয় পেল।'

'সেই যদি আপনার সান্ত্বনা হয় তবে তাই হোক।'

'আর কেউ যেন একথা আর না জানতে পারে,' কার্টন ঠোঁটের উপর হাত রাখলেন। তার পর দরজার কাছ-বরাবর এসে আবার বললেন, 'কোন সংশয় রাখবেন না, মিস ম্যানেত। আজকের এই কথা আমার জীবনের সব থেকে গোপনীয় সত্য হয়ে রইল। যখন মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়াবে আমার এই সান্ত্বনা থাকবে যে আমার যত দুঃখ যত দুর্ভাগ্য সব পরম মমতায় আপনার মনের মণিকোঠায় জমা রইল।'

এত দিন লুসি এই মানুষটিকে যেভাবে জানত আজ যেন আরও কত নিরাবরণ চেহারায় তাকে দেখতে পেল। তার দুটি চোখ সরল অশ্রুতে ভরে উঠল।

কার্টন আবার বললেন, 'এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার জীবনের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু আজ এই কথা আমি বলে যাই, আপনার জন্যে, আর যে মানুষটি আপনার প্রিয়তম হবে তার জন্যে, আমি সর্বস্ব ত্যাগ করব—কোন ত্যাগ সে যত বড়ই হোক, আমি তা স্বীকার করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হব না। আমি জানি সে-দিন আর দূর নয়, জীবনের মধুর বাঁধনে আপনি বাঁধা পড়বেন, একটা সুখী সংসার আপনাকে ঘিরে মঞ্জুরিত হবে। তখন সেই সব দিনে আপনি একজনের কথা কোন কোন দিন ভাববেন—যে তার ব্যর্থ জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ করতে পারে। বিদায়, মিস ম্যানেত—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

১৪ সৎ ব্যবসায়ী

টেলসন ব্যাঙ্কের বাইরের এই দরজায় একটা টুলের উপর বসে থাকে জেরেমিয়া (জেরি)। পাশে থাকে তার ছেলে ছোট জেরি। পথের ধারে বসে বসে সারাদিনে বিচিত্র জিনিস তার চোখের উপর দিয়ে চলে যায়।

এইখানে সদর রাস্তার উপর বসে থাকলে সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে দুটি বিচিত্র বিশাল মিছিলের আনাগোনা চোখে পড়বেই। তার নানা শব্দে বর্ণে মনের কত ভিতরে ঘোর লেগে যায়।

একটি মিছিল চলে সূর্যকে সামনে রেখে পশ্চিম দিগন্তের দিকে। আর-একটি

সূর্যকে পিছনে রেখে ক্রমাগত পূর্বদিকে। যেখানে সূর্য অস্ত যায় তারও পরে সেই প্রান্তরের দিকে তাদের যাত্রা।

মুখে একটি কাঠি গুঁজে জেরেমিয়া এই দুই ধারাকে দেখে। মনে হয় যেন কত শতাব্দী ধরে এই দুটির একটি ধারাকে সে লক্ষ্য করে আসছে। এ ধারা যেন কোনদিনই শুষ্ক হবে না।

এইখানে বসে বসে তার কিছু রোজগারও হয়। ভিতু বয়স্ক মহিলা রাস্তা পারাপারের জন্যে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের হাত ধরে রাস্তা পার করে দেয় সে। সেই ক্ষণস্থায়ী পরিচয়ের মধ্যেই জেরেমিয়া সেই সব মেয়েদের মঙ্গল কামনায় এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে যে তারা রাস্তার অপর পারে পেঁছে তার হাতে কিছু-না-কিছু গুঁজে দেয়। আর এই সামান্য পয়সায় তার কিছুটা আর্থিক সুবিধা হয়।

কোন-এক সময় এক কবি ছিলেন। তিনি এই রকমই একটি টুলের উপর বসে মানুষের যাওয়া-আসা দেখতেন, আর আপনমনে গুনগুন করতেন। জেরেমিয়াও ঠিক তেমনি ভাবে টুলের উপর বসে থাকে। কিন্তু সে তো কবি নয়। তাই তার গলায় গান ওঠে না। সে শুধু চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

বছরের এই সময়টা পথে জনস্রোত কম। সেই রকম মহিলাদের সংখ্যাও অল্প। উপরি রোজগারের পরিমাণ কমেছে। বসে বসে ভাবছিল সে, কি করে তার বউ সংসার চালাচ্ছে।

ঠিক এমনি সময় একটা অস্বাভাবিক হৈ-চৈ দূর থেকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

জেরেমিয়া ভাবল এ বোধ হয় কোন শবযাত্রা। হয়ত লোকে কোন-রকম আপত্তি করছে, তাই একটা হল্লা উঠেছে রাস্তায়।

ছেলেকে বলল বাপ,—'ও কিছু নয়, ও একটা শবযাত্রা।'

ছেলে চেঁচিয়ে বলল—'হুর রে।'

ছেলেটা কি ভেবে যে চেঁচাল, বাপ তার কিছুই বুঝতে পারল না। রাগ করে ছেলের কান মলে দিল।

'এ রকম চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি কি ঘুমোচ্ছি যে চিৎকার করে না বললে শুনতে পাব না। আর খবরদার যেন কোনদিন না শুনি। তাহলে আবার মার খাবি। ঐখানে চুপ করে বসে থাক। বসে বসে যা দেখবার তাই দেখ।'

ছেলেটা বাপের কথায় স্থির হয়ে বসল।

ভিড় এগিয়ে আসছিল। একটা রঙ-চটা শববাহী গাড়ি আর একটা ভাড়াটে কাঁদুনেদের গাড়ি এগিয়ে আসছিল। সেই গাড়িতে একজন মাত্র কাঁদুনে। যেমন ব্যবস্থা তেমনি সাজ-পোশাক সেই লোকটার। এই পরিস্থিতি লোকটার যে একদম পছন্দ নয় সেটা তার মুখের চেহারাতেই বোঝা যাচ্ছিল।

জনতা গাড়িটাকে ঘিরে হৈ-চৈ করছিল। কেউ কেউ সেই লোকটাকে নানা ভাবে ব্যঙ্গ-উপহাস করছিল। কেউ-বা ভয় দেখাচ্ছিল। আর সব ছাপিয়ে একটা শব্দ উঠছিল—'গুপ্তচর—টিকটিকি—স্পাই।'

জেরেমিয়ার চিরকালই এই শবযাত্রার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ। টেলসন ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে যখনই শবগাড়ি যায়, তার ভিতরটা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।

তাই এই অস্বাভাবিক কোলাহল শুনে সে আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠল।

প্রথম যাকে পেল তাকেই জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ভাই। ব্যাপারটা কি?'

'তা জানি না। তবে সবাই বলছে গুপ্তচর।'

আর একজনকে জিজ্ঞাসা করল সে। 'লোকটা কে?'

'আমি ঠিক জানি না'—জবাবে বলল লোকটি। মুখে হাত চাপা দিল। তবে খুব উত্তেজিত গলায় বলল, 'গুপ্তচর—স্পাই।'

এরপর যার সঙ্গে তার কথা হল, সে-লোকটা অনেকটা ওয়াকিফহাল। তার মুখ থেকে জেরেমিয়া শুনল, যে-লোকটার কবর হবে তার নাম রোজার ক্লাই।

'সে কি গুপ্তচর ছিল?'

লোকটা বলল, 'ওল্ড বেলির স্পাই—নোংরা লোক!'

যে বিচারে জেরেমিয়া নিজে উপস্থিত ছিল—সে-বিচারের কথাটা তার মনে পড়ে গেল।

'আচ্ছা ওকে তো আমি দেখেছিলাম। লোকটা মরে গেছে?'

'পচা মাংসের মতো মরে পচেছে। ওইটাকে টেনে বের কর। টেনে বের কর পাষণ্ডটাকে।'

জনতার ভিতর আক্রোশ টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু কি করবে তারা—তার কোন পরিকল্পনা ছিল না কারুর মাথায়।

লোকটার কথা তাদের কানে পৌঁছনোমাত্র একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। 'বের কর লোকটাকে, টেনে বের কর'—বলতে বলতে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ি দুটোর উপর।

গাড়ির দরজা খুলে ফেলল সবাই মিলে। যে একজন শোককারী ছিল গাড়ির ভিতরে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

তার পর পড়ল জনতার হাতে।

কিন্তু লোকটা খুব তৎপর ছিল। সময় সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে জনতার হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। তার পর পাশের একটা গলি দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। তার গায়ের ক্লোক হ্যাট সাদা রুমাল শোকের যাবতীয় উপকরণ পথের উপর ফেলে দিয়ে চম্পট দিল।

জনতা মহা উল্লাসে সেই সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলল।

আশে-পাশে দোকানদাররা ভয়ে তাড়াতাড়ি দোকান-পাট বন্ধ করে দিতে লাগল। সে-যুগে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে লোকে দুর্দান্ত রাক্ষসের মতো ভয় করত। যে-কোন কিছু করতে তাদের মোটেই বাধত না।

একদল লোক ইতিমধ্যে শববাহী গাড়ি খুলে কফিনটা বের করে আনার চেষ্টা করছিল। আর একদলের মাথায় নতুন বুদ্ধির ঝিলিক দেখা দিল। তারা বলল, চল এটাকে কবরখানায় নিয়ে যাওয়া যাক। সেখানেই যা-কিছু করা যাবে।

যে কথা সেই কাজ। অমনি হৈ-হল্লা পড়ে গেল। চেঁচামেচি করে জনা আষ্টেক গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। এক দল বাইরে উঠে পড়ল। কিছু লোক উঠল গাড়ির মাথায়। তাদের মধ্যে জেরেমিয়াও একজন।

সরকারের লোক যারা কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছিল তারা ওজর আপত্তি তুলল। কিন্তু কাছেই নদী, সেখানে ধরে চুবিয়ে দেবার ভয় দেখাতে তারা চুপ হয়ে গেল।

লোকে সোরগোল করতে করতে সেই শবগাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

চলল বীয়ার খাওয়া। পাইপে তামাক টানা। গানের হল্লা আর নানা শ্রাব্য-অশ্রাব্য চেঁচামেচি। যত এগোয় মিছিলে নতুন নতুন লোক এসে জোটে। আর দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়।

দূরে মাঠের ধারে পুরোনো কবরখানায় নিয়ে যাওয়াই স্থির ছিল।

একটু একটু করে মিছিল গিয়ে পৌঁছল সেখানে। আস্তে আস্তে সব কাজ মিটিয়ে মৃত রজার ক্লাইকে কবরস্থ করা হল। তার যা পাওনা ছিল পরম সন্তোষের সঙ্গে তার বরাতে তা জুটে গেল।

মৃতের সৎকার হবার পরেও কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জনতার আমোদের তৃপ্তি হল না। আরো অনেক অনেক বৈচিত্র্যের প্রয়োজন পড়ল।

একজন কারুর মাথায় এল যে পথচারীদের বিরক্ত করা হোক। অমনি শুরু হল তাদের উপর হামলা।

নিরীহ মানুষগুলোকে গালাগালি করতে লাগল এরা গুপ্তচর বলে! যারা জীবনে কোনদিন ওল্ড বেলির দরজা দেখেনি তাদের উপর এরা চড়াও হ'ল। নানা ভাবে অত্যাচার করতে লাগল।

তার পর আরম্ভ হল আশেপাশের বাড়ির দোকানের জানলা ভাঙ্গা। লুটতরাজও হতে লাগল। দোকান বাড়ি ভেঙ্গে লুটপাট করল জনতা। কোথাও কোথাও রেলিং ভেঙ্গে সেগুলো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল।

এই রকম বেপরোয়া হল্লার মধ্যে হঠাৎ খবর রটে গেল সৈন্যরা আসছে। সঙ্গে সঙ্গে জনতাও পাতলা হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল।

হয়ত সৈন্যরা এসেছিল শেষ পর্যন্ত—হয়ত আসেইনি, কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতার রীতিই তো এই।

জেরেমিয়া শেষ পর্যায়ে হৈ-চৈ-এর মধ্যে ছিল না। কবরখানার ভিতরে বসে সরকারী লোকজনের সঙ্গে সে আলাপ করছিল। এখানকার শান্ত-নির্জন পরিবেশে তার উত্তেজনা ক্রমশ প্রশমিত হয়ে এল।

কাছেই একটা দোকান থেকে একটা পাইপ এনে সে বসে বসে ধূমপান করতে লাগল। আর ভাঙ্গা রেলিংগুলো দেখে এই জায়গার সঠিক হিসেবটা মনের মধ্যে গেঁথে নিল।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে ধূমপান করার পর উঠে পড়ল সে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আগেই যাতে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসতে পারে সেই উদ্দেশে পা বাড়াল।

আজকের এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে তার শরীর-মনের উপর হয়ত কিছু প্রভাব পড়েছিল—হয়ত-বা অন্য কিছু, কিন্তু ফেরার পথে তার পরিচিত এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে নিল সে। এই অঞ্চলের বেশ নামকরা ডাক্তার তিনি।

যখন টেলসন ব্যাঙ্কে এসে পৌঁছল, দেখল ছেলে ঘাঁটি ছেড়ে কোথাও যায়নি, কেউ তার খোঁজও করেনি।

ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে সেই সব প্রাচীন কেরানীর দল যে যার বাড়ি চলে গেল। বাপ ও ছেলে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ি ফিরে জেরেমিয়া বউকে বলল, 'তোমায় আমি স্পষ্ট করেই বলছি, সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে আজ রাত্তিরে যদি আমার কাজ সফল না হয়, তা হ'লে জানব যে, তুমি প্রার্থনা করে আমার কাজ ভন্ডুল করে দিলে। আর তার জন্যে কি করি দেখবে।'

স্ত্রী বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল।

'তোমার মুখ দেখেই তো বুঝতে পারছি যে তুমি কি করবে।'

'আমি কি কিছু বলেছি?'

'একদম কিছু চিন্তা করবে না। তোমার কাজই হচ্ছে যে-কোন ভাবে আমার কাজে বাগড়া দেওয়া।'

বউ তাকে রুটি মাখন দিয়েছিল। সামান্য একটু খেয়ে সে আবার বলল, 'তুমি আর তোমার ঐ ছেলে—'

বউ বলল, 'আজ রাত্তিরে তুমি আবার বেরুবে?'

'হ্যাঁ, যাব।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাবা,' বায়না ধরল ছেলে।

'না না, তুই কোথায় যাবি। তোর মা জানে আমি যাব মাছ ধরতে। তুই না ঘুমোলে আমি বেরুব না।'

'তোমার মাছ-ধরার যন্ত্রপাতিতে তো মরচে ধরে গেল।'

'সে তোমার ভাবতে হবে না।'

'মাছ নিয়ে আসবে তো, বাবা?'

'সে দেখা যাবে'খন। তুই শুয়ে পড়গে যা'

সারা সন্ধ্যেবেলাটা জেরেমিয়া বউ-এর উপর নজর রাখল। সারাক্ষণ তার সঙ্গে নানা রকম বকবক করতে লাগল, যাতে কোনভাবে সে ওর কাজের ব্যাপারে মানত-টানত করে পণ্ড না করে দেয়।

ভূত-প্রেত এ সবেতে তার বিশ্বাস নেই, তবু নিজের বউ-এর ভাবনা-চিন্তার উপরে সে সর্বক্ষণ নজর রাখে।

রাত হয়ে এল। ছেলেকে শুয়ে পড়তে বলল বাপ। তার বউও শুতে গেল। তার পর অনেকক্ষণ জেগে বসে রইল জেরেমিয়া। তার পাইপে তামাক পুরতে লাগল।

রাত একটা বাজল যখন, তখন যাত্রার উদ্যোগ করল সে। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে রাত্রির সেই ভূতুড়ে প্রহরে পকেট থেকে চাবি বের করে জেরেমিয়া একটা তালা-দেওয়া ডালা খুলে ফেলল। বের করল একটা থলে দড়ি শাবল শেকল আর সেই জাতীয় মাছ ধরবার আরও টুকিটাকি সরঞ্জাম। তার পর জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে স্ত্রীর দিকে একটা অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জেরি এতক্ষণ ঘুমের ভান করে জেগে শুয়েছিল। শোবার জন্যে পোশাকও ছাড়েনি।

বাপ বার হয়ে যাওয়া মাত্র সে উঠে বাপের পিছু নিল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে বাপের পিছু পিছু ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। ফিরে বাড়িতে ঢোকার কোন অসুবিধেই নেই। নানা ভাড়াটের বাস বাড়িটিতে।

এ বাড়ির সদর-দরজা সারা রাত হাট হয়ে খোলাই থাকে।

তার বাবা কিভাবে তার কাজ-কর্ম করে সে সম্বন্ধে তার চিরকালের কৌতূহল। পথের দু পাশের বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে সে এগিয়ে যেতে লাগল। বাপকে নজরের আড়াল হতে দিল না।

কিছু দূরে এগোবার পর জেরি দেখল তার বাবার সঙ্গে এসে জুটল আর-একজন লোক। তার পর দুজনে এগোতে লাগল।

আধ ঘণ্টা হাঁটার পর রাস্তার মিটিমিটি আলো পেরিয়ে এল তারা। পাহারা-ওয়ালাদের এলাকা ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তায় এসে পড়ল। এইখানে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে আর একটি লোক এসে যোগ দিল।

জেরির মনে হল যে সামনের লোকটাই হঠাৎ ভূতের মতো দুটো মূর্তি ধরেছে।

তিনজনে এগিয়ে চলেছে। পিছনে চলেছে জেরি। চলতে চলতে রাস্তার ধারে এক উঁচু বাঁধের গায়ে এসে গতি রুদ্ধ হল তাদের। বাঁধের পাড়ে লোহার রেলিং দেওয়া ইঁটের গাঁথুনি। বাঁধের দীর্ঘ কালো ছায়া পড়েছে রাস্তায়। তারা রাস্তা ছেড়ে একটা কানাগলিতে ঢুকল। গলির দিকটায় বাঁধের যে অংশ পড়েছে সেটা আট দশ ফুট উঁচু হবে।

আজ মেঘে-ঢাকা চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না। সেই ভৌতিক আলোয় জেরি সবিস্ময়ে দেখল তার বাবা লোহার গেট টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। তার পিছন পিছন তার সঙ্গী দুজন নেমে পড়ল।

মাটিতে পড়ে তিনজনেই কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে রইল। তার পর হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

জেরি তাদের পিছন পিছন অনুসরণ করল।

ওরা উ'চু উ'চু ঘাসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে কবরের পাথর ছড়ানো। সাদা পাথরগুলোকে এই ম্লান চাঁদের আলোয় কেমন ভৌতিক দেখাচ্ছে। গির্জার উ'চু চূড়াটাও যেন মনে হচ্ছে একটি বিরাট দৈত্য।

একটু এগিয়ে ওরা এক জায়গায় থেমে পড়ল। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা করতে লাগল।

প্রথমে মাছ ধরল কোদাল দিয়ে। তার পর শাবল দিয়ে। তার পর চলতে লাগল আরও নানা রকম যন্ত্রপাতির কাজ।

এই শ্মশান-নিস্তব্ধতায় হঠাৎ গির্জার ঘড়ি বেজে উঠল। সে-আওয়াজ শুনে জেরির চুল খাড়া হয়ে উঠল। ভয় পেয়ে জেরি ছুটে পালিয়ে এল।

কিন্তু বাবার কাজকর্মের সম্বন্ধে তার চির কৌতূহল তাকে চলে যেতে দিল না। আবার সে ফিরে এল।

গেটের ফাঁক দিয়ে উ'কি মেরে দেখল, লোকগুলো তখনও অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে।

স্ক্রু খোলার শব্দ পেল জেরি। তার পর তিনটি মূর্তি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির উপরে। বোঝা গেল খুব ভারী জিনিস ওরা মাটির ভেতর থেকে টেনে তুলছে। একটু পরেই সেই বিশাল জিনিসটা মাটির উপর উঠে এল। এতক্ষণে জেরি দেখল তার বাবা মাছ ধরার নামে কিসের সৎ ব্যবসায়ে এই রাত্রির অন্ধকারে এই নির্জন কবরখানায় এসে হানা দিয়েছে। ওরা তখন সেই কফিনের বাক্সের ডালা খুলতে উদ্যত। আর সেটি খোলা মাত্র মড়া দেখতে পাওয়া যাবে। কথাটা মনে হওয়া মাত্র জেরির গলা শুকিয়ে গেল। একটা দারুণ আতঙ্কে সে ছুট দিল বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

যখন জেরি প্রথম থামল তখন তার দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। তার মনে হল কফিনের ভিতরে মরা লোকটা তাকে পিছন পিছন তাড়া করে আসছে। তার পিঠ অবিরতই ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সেই নির্জন রাস্তায় তার চারপাশে আতঙ্ক যেন ভয়াল মূর্তি ধরে তাকে তাড়া করতে লাগল। আশে-পাশের সরু সরু অন্ধকার গলি থেকে এখনই বুঝি বেরিয়ে পড়বে সেই প্রেত-মূর্তি। দেওয়ালের অন্ধকার কোণে দরজার আড়ালে তারা সব ওত পেতে বসে আছে। পথের উপর ছায়ামূর্তি হয়ে শুয়ে আছে তাকে টপকে ফেলে দেবে বলে। জেরি যত ছুটছে সেই মৃতদেহটা তার পিছন পিছন সমানে ছুটে আসছে। জেরি যখন নিজেদের বাড়ির দরজায় পৌ'ছল তখন তার আধমরা অবস্থা। সি'ড়ি দিয়ে উঠল যখন জেরি তার পিছন পিছন সেই আতঙ্কটাও উঠল। সে যখন বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কু'কড়ে শুয়ে পড়ল সেই ভয়টা তার বুকের উপর চেপে বসল। তার পর কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল তার মনে রইল না।

খুব ভোরে যখন তার মা তার ঘুম ভাঙ্গাল, তখনও রোদ ফোটেনি। খাবার ঘরে বাবা বসে।

দেখেই জেরি বুঝল বাবার আজ মেজাজ ঠিক নেই। সে দেখল তার বাবা মায়ের কান ধরে খাটের শিয়রের দিকে কাঠের উপর তার মাথা ঠুকে দিচ্ছে।

'আমি বলেছিলাম তোমায়—তাই আমি করলাম।'

বউ মিনতি করতে লাগল।

'আমার কারবারের লাভ-লোকসানের ব্যাপারে তুমি সব সময় গোলমাল পাকিয়ে দাও। আমাদের সৎ ব্যবসায়ে লাভ হয় তুমি তা চাও না। আমার যারা অংশীদার—তাদেরও ক্ষতি হয়।'

অনেকক্ষণ ধরে দুই মানুষে এই ঝগড়া চলল। শেষকালে জেরেমিয়া রেগে বলল,

'অমন ধার্মিক বউ আমার দরকার নেই। যে-বউ তার স্বামীর ব্যবসাপত্তরের জন্যে ভালো কামনা করে না—সে রকম বউ আমার দরকার নেই।'

অবশেষে পায়ের বুট জুতো ছুঁড়ে ফেলে, মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

বাপের হাতে লোহার মরচের দাগ। সেই হাতে মাথা রেখে বাবা চিত হয়ে শুয়ে আছে দেখে জেরি আর দেরি করল না। সে-ও গিয়ে বিছানায় শুয়ে নাক ডাকতে লাগল।

সেদিন সকালের খাওয়ায় আর পাতে মাছ পড়ল না।

একটু পরে কড়া মেজাজ নিয়ে ছেলের হাত ধরে জেরেমিয়া টেলসন ব্যাঙ্কের ডিউটিতে বেরুল।

কাল রাতের আতঙ্ক এখন আর নেই। সকালবেলার পথের ভিড়। রৌদ্র ঝলমল ফ্লিট স্ট্রীট। রাতের অন্ধকার আর ভূতের ভয় এখন যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল।

'বাবা,' রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জেরি বলল বাবাকে।

'রেজারেকসান ম্যান কাকে বলে বাবা?'

'আমি কি করে জানব? আমি কি দেখেছি কখনও?'

'আমি জানি তুমি সব জান, বাবা। যারা মরা লোককে স্বর্গে নিয়ে যায়—তাই নয় —বাবা?'

'ঐ রকমই হবে। ওরা এক রকমের ব্যবসাদার।'

'কিসের ব্যবসা, বাবা?'

'ও সব ডাক্তারি জিনিসপত্তর আর কি।'

'মড়ার দেহ—'

'ঐ রকমই হবে কিছু।'

'আমি বড় হয়ে ঐ ব্যবসা করব। কবর থেকে মৃতদেহ তুলে—'

'সে দেখা যাবে।' বলল বাবা, 'আগে বড় হও। কি রকম কাজ-কর্ম শেখ দেখি। তবে ও ব্যবসায়ে কাউকে কিছু জানাতে নেই। এখনও এসব কথা কাউকে বলিসনি। কত রকম লোক কত কি ভাবতে পারে।'

হাতের টুলটা দরজার কাছে রাখার জন্যে ছেলে এগিয়ে যেতেই জেরেমিয়া মনে মনে ভাবল—

'আমার এই সৎ ব্যবসায়ে ও ছেলে একদিন আমার ডান হাত হবে। ওর মায়ের মতো আমার পথের কাঁটা হবে না।'

১৫ মাকড়সার জাল

প্যারিসের সেই মদের দোকান আজকাল খোলে সকাল সকাল। ভোর ছ-টার আগেই ভিতরে লোক ভিড় করে। শিক-লাগানো জানালার বাইরে থেকে বিবর্ণ চোয়াড়ে লোক-গুলো উঁকি-ঝুঁকি মারে ভিতরের লোকগুলোর দিকে।

সব থেকে ভালো সময়েও দ্যফর্জ সব থেকে হালকা মদ বেচে। কিন্তু অস্বাভাবিক হালকা মদ দিচ্ছে আজকাল। তেতো টক খেয়ে লোকগুলোর মেজাজ হয় অমনি বিষণ্ণ। আঙুরের রসে মদের ভিতর খুশির আগুন জ্বলে ওঠে না। বরং সেই অন্ধকারে ধিকি ধিকি জ্বলে যে আগুন তা তপ্ত হয়ে থাকে সেই মদের গেলাসের তলানিতে।

আজ নিয়ে এই তিনদিন সকাল সকাল খুলছে দোকান।

আজকাল মদের চেয়ে এখানে অন্য জিনিস বেশি চলছে। যে-সব মানুষের পকেটে দু' বেলা খাবার পয়সা জোটে না—তারাও এখানে ভিড় করছে। কানাকানি হচ্ছে।

এ-টেবিল ও-টেবিলে রহস্যময় চালাচালি হচ্ছে খবরের। সারাটা দিন তাদের কেটে যাচ্ছে এই দোকানে। মদের চেয়ে অনেক বেশি গিলছে খবর।

সবই জমজমাট চলছে। শুধু তিনদিন হল একটি লোক নেই। সে মালিক। আর এমন সব খদ্দের যে, দোকানে এত ভিড় সত্ত্বেও কেউ দোকানের মালিকের খবর জিজ্ঞেস করে না। শুধু তাই কি, একবার তাকিয়েও দেখে না কেউ সেই শূন্য আসনটির দিকে, যেখানে মাদাম দ্যফর্জ বসে একলা মদ দিচ্ছেন, গুনে নিচ্ছেন পয়সা। সেই সব পয়সার চেহারা খদ্দেরের চেহারার মতোই হতচ্ছাড়া।

কেমন যেন সব ছাড়া ছাড়া ভাব। লোকগুলো যেন নিস্পৃহ। অথচ চাপা গলায় কথা হয়—উৎকর্ণ শোনা—চকিত দৃষ্টি—একটা অদ্ভুত রহস্য জাল বোনে। রাজার গুপ্তচরেরা সর্বত্র নজর রাখে। তারা মাঝেমাঝে উঁকি মারে। কিন্তু কিছুই যেন ধরতে-ছুঁতে পারে না। এই দোকানে যে যার ইচ্ছা মতো মদ খায়—বসে বসে টেবিলে আঁক কাটে, তাসের আড্ডা ঝিমিয়ে থাকে। আর নির্জীবের মতো বসে মেয়েটি কেবল উলের প্যাটার্ন বোনে। আর মাথা নামিয়ে সতর্ক হয়ে কি যেন শোনে—বহুদূরের থেকে তরঙ্গ ওঠানো শব্দের হুঙ্কার।

এমনি করে বেলা গড়িয়ে যায়। দুপুরের দিকে মালিক আর একজন সঙ্গী নিয়ে এসে দোকানে ঢুকল। এক গা ধুলো। খিদে তেষ্টায় আকুল।

একবার চকিতে সবাই মুখ তুলল। তার পর আবার যে যার ইচ্ছা মতো বসে রইল। যারা মুখ তুলেছিল সবাই একবার এদিক-ওদিক চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'কেমন আছ ভাই সব? ভাল তো? হাওয়া বড়ই খারাপ পড়েছে!'

স্ত্রীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিল সঙ্গীর। বলল, 'এক গ্লাস মদ দাও ওকে—এর সঙ্গে প্যারিসের বাইরে দেড়দিন কাটিয়ে এলাম। রাস্তার মিস্ত্রি—জ্যাকুজ এর নাম।'

লোকটি জামার ভিতর থেকে একখানা কালো রুটি বের করল। সেই রুটি চিবুতে চিবুতে মদ খেতে লাগল। ইতিমধ্যে তিনজন উঠে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হলে দ্যফর্জ বন্ধুকে বলল, 'ঘর দেখিয়ে দিই, চল। পছন্দ হবে নিশ্চয়ই।'

মদের দোকান থেকে বেরিয়ে উঠোন। উঠোন পেরিয়ে খাড়া সিঁড়িপথে উঠে সেই ছাদ-লাগোয়া ঘর। একদিন এই ঘরেই বসে এক জন বিস্মৃত-স্মৃতি বৃদ্ধ ডাক্তার জুতো সেলাই করতেন আপনমনে। ছোট মেয়ের পায়ের জুতো। তিনজন লোক আগে এই ঘরে পাহারা দিত। এখন আর সেই বুড়ো মানুষ নেই।

সেই তিন জন আগে এসেই বসেছিল। এখন সঙ্গীকে নিয়ে এসে দ্যফর্জ সতর্ক ভাবে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এইবার বল।'

নীল টুপিটা হাতে নিয়ে কপালের ঘাম মুছে লোকটি বলল, 'কোথা থেকে শুরু করব?'

'একেবারে গোড়া থেকে।'

লোকটি শুরু করে তার কাহিনীঃ

'গত বছর গরম কালে লোকটাকে আমি মারকুইসের গাড়ির নিচে শেকলে ঝুলতে দেখেছিলাম। সন্ধ্যে হয়-হয়। সূর্য ডুবু-ডুবু। মারকুইসের গাড়ি পাহাড় ঠেলে উঠছিল। আমি হাতের কাজ রেখে সরে দাঁড়াতেই দেখলাম একটা লোক গাড়ির তলায় শেকলে ঝুলছে।'

'এর আগে তাকে দেখেছিলে কখনও?'

'না, না।'

'এতদিন পরে লোকটাকে চিনতে পারলে কি ক'রে?'

'তার লম্বা চেহারা দেখে। সেদিনও সন্ধ্যায় মারকুইস জিজ্ঞেস করেছিলেন—

কেমন দেখতে বল তো। আমি বলেছিলাম—'ভূতের মত ঢ্যাঙা।'

'তোমার বলা উচিত ছিল বেঁটে।'

'আমি কি তখন জানতাম! আর তখন তো মারকুইসকে খুন করেনি সে। তেমন কিছু বলেওনি আমাকে। আমিও নিজের কোন পরিচয় দিইনি।'

'বেশ করেছিলে। তার পর।'

মুখ চোখে একটা রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে লোকটি আবার শুরু করল, 'সেই থেকে লোকটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কত খোঁজাখুঁজি করেছি। ন—দশ—এগার মাস কেটে গেল।'

'সেদিন আমি পাহাড়ের পথে কাজে ব্যস্ত—সেদিনও সূর্য তেমনি ডুবডুবু। কাজের শেষে গাঁয়ে ফিরে আসার জন্য যন্ত্রপাতি জড় করছিলাম। অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে। হঠাৎ চোখ তুলে সামনে তাকাতেই দেখি, পাহাড়ের উপর থেকে ছ-জন সৈন্য নেমে আসছে। আর তাদের মাঝখানে তেমনি ঢ্যাঙা একটি লোক। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। আমি এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। কাছ-বরাবর আসতেই লোকটকে চিনতে পারলাম। সে-ও চিনতে পারল আমায়।

'আমি যে তাকে চিনি, কিংবা সে যে আমায় চেনে তেমন ভাব আমরা কেউ-ই দেখাইনি। চোখে-চোখে আমাদের পরিচয় হল। আমি তাদের পিছু-পিছু যেতে লাগলাম। এমন আঁট করে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল লোকটাকে যে তার হাত দুটো ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছিল। পায়ের কাঠের জুতো-জোড়া একটু বড়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল সে। সৈন্যরা বন্দুকের গুঁতো মেরে মেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল তাকে।

তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারায় পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। সৈন্যরা হেসে উঠল—টেনে তুলল তাকে। মুখ দিয়ে তার রক্ত পড়ছিল। সারা মুখ ধুলোয় মাখা হয়ে গেছে। কিন্তু মুখ মোছবার ক্ষমতা নেই। তার দুর্দশায় সৈন্যদের আমোদ দেখে কে! তারা তাকে গাঁয়ে নিয়ে এল—গাঁয়ের লোকেরা ছুটে দেখতে এল তাকে। তার পর জেলখানায় নিয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা দেখল—জেলের ফটক খুলে গেল। আর সেই রাতের গাঢ় অন্ধকারে কারাগার যেন দৈত্যের মতো বিরাট হাঁ করে গিলে ফেলল তাকে।'

এতখানি হাঁ করে লোকটা আবার শব্দ করে মুখ বন্ধ করল। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল সে।

'গাঁয়ের লোকেরা ফিরে গেল। সেখান থেকে ফিরে সব জমায়েত হল ঝরনার ধারে। কানাকানি হতে লাগল কত রকম। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সারা গাঁ। জেলের লোহার গরাদের আড়ালে তালা-বন্দী মানুষটার কথা দুঃস্বপ্ন হয়ে রইল সারা রাতের ঘুমে। জেলে যে একবার ঢোকে, জীবন্ত আর সে কখনও ফেরে না। পরের দিন সকালে রুটি খেয়ে যন্ত্রপাতি কাঁধে করে কাজে যাওয়ার আগে জেলের চারপাশটা একবার ঘুরে দেখে আসতে গেলাম। দেখলাম, ঐ উঁচুতে লোহার খাঁচায় রক্তাক্ত ধুলিমাখা লোকটা বসে আছে। হাতে তার শেকল আমার দিকে চেয়ে সে হাত নাড়তে লাগল। তাকে ডাকতেও সাহস হল না আমার।'

দ্যফর্জ আর বাকি তিন জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে প্রতি-হিংসার আগুন।

'বলে যাও—থেম না'—বলল দ্যফর্জ।

'ক-দিন লোকটা রইল খাঁচায়। গাঁয়ের লোকেরা চুরি-চামারি করে দেখা সাক্ষাৎ করত তার সঙ্গে। কিন্তু দূর থেকে। কাছে ঘেঁষত না। দিনের কাজ শেষ হলে ঝরনার ধারে জটলা চলত, কিন্তু সবার চোখ-মন পড়ে থাকত সেই বন্দীশালার দিকে। কানাকানি

হত, হয়ত-বা লোকটাকে ফাঁসিতে লটকাবে না। রাজার কাছে আপিল হয়েছে। মারকুইসের গাড়ির নিচে পড়ে রাস্তায় ছেলে মরে যেতে লোকটি রাগে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সে খুন করে। রাজার কাছে আপিল হয়েছে শুনেছি। সত্যি কিনা জানি না।'

'সে কৃতিত্ব কার জান? ঘোড়ার লাথি আর দারোয়ানের চাবুক খেয়ে দ্যফর্জ সেই আপিল পৌঁছে দিয়েছে স্বয়ং রাজার হাতে।'

লোকটি বলতে লাগল, 'ওরা সব ফোয়ারার ধারে কানাকানি করতে লাগল যে লোকটাকে গ্রামে আনা হয়েছে এইখানেই ফাঁসি দেবে বলে। ফাঁসি তো হবেই হবে।'

'তাছাড়া ও খুন করেছে কাকে? এখানকার যত প্রজা সকলের বাপের মতো ছিলেন যে-জমিদার, তাকে খুন করে ও তো বাপকেই খুন করার পাপ করেছে। একজন বুড়ো বলছিল যে, ওর হাতে একখানা ছুরি দিয়ে সেই হাত পোড়াবে সৈন্যরা ওরই চোখের সামনে। তার হাত বুক পা যেখানে ক্ষত হবে সেখানে ফেলে দেবে গরম তেল, গালা, সীসে, গরম মোম আর গন্ধক। তার পর চারটে ঘোড়ায় তার হাত পা সব টেনে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। বুড়োটা বলছিল যে রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের হত্যা-চক্রান্তের জন্যে একবার একজন বন্দীকে এমনি শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তবে আমি তো আর লেখাপড়া শিখিনি, এসব সত্যি কিনা বলতে পারব না।'

'শোন জ্যাকুজ'—যে লোকটা চঞ্চল হাত নাড়ছিল সে বলল, 'সে লোকটাকে মেরেছিল প্রকাশ্য রাস্তায় দিনের আলোয় প্যারিসে। তুমি জান, সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে শহরের বড় লোকদের বাড়ির মেয়ে বউরা দলে দলে এসে ভিড় করেছিল। তাদের আনন্দ দেবার জিনিস ছিল সে-দৃশ্য। রাত অনেক হওয়া অবধি একটা মেয়ে বাড়ি ফেরেনি সেই দৃশ্য থেকে। লোকটার দুটো পা ছিল না, একটা হাত ছিল না, তবু লোকটা নিশ্বাস নিচ্ছিল। আচ্ছা, তোমার বয়স কত হল?'

'তা হল—পঁয়ত্রিশ,' পথের মজুর লোকটা বলল।

কিন্তু তাকে দেখতে লাগে বছর ষাট।

'তখন তোমার বয়স দশ পেরিয়েছে। হয়ত তুমিও দেখে থাকবে।'

'ও কথা থাক। তুমি বল তোমার গল্প।'

'মারকুইস ছিলেন জমিদার। প্রজাদের মা-বাপ। তাদের মনিব। তাকে যে খুন করেছে তার ফাঁসি হবেই হবে। কত গুজব রটল মুখে মুখে। রবিবার রাত সারা গাঁ যখন ঘুমে অচৈতন্য তখন সৈন্যরা এল। সারা রাত চলল মজুরদের মাটি খোঁড়া—হাতুড়ি পেটা। চলল সৈন্যদের হাসি আর গানের হল্লা। সকালে সবাই দেখল ঝরনার ধারে মস্ত উঁচু এক ফাঁসি-কাঠ তৈরি হয়েছে। গাঁয়ের লোকের কাজে ছেদ পড়ল। সবাই এসে জড়ো হতে লাগল সেখানে। গোয়াল থেকে গোরু বের করল না কেউ।'

'আজ সব ছুটি। তার পর দুপুরবেলা ড্রাম বেজে উঠল। লোহার শেকলে-বাঁধা কয়েদীকে নিয়ে এল সৈন্যরা ঘিরে। মুখে একটা কাপড় গোঁজা, যাতে না কথা বলতে পারে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে, যেন হাসছে। ফাঁসিকাঠের মাথায় খুনের ছুরির ফলাখানা আকাশের দিকে তোলা। সেইখানেই ফাঁসিতে লটকে দিল ওরা লোকটাকে। চল্লিশ ফুট উঁচুতে দেহটা ঝুলতে লাগল ফাঁসিকাঠে। দুলতে লাগল হাওয়ায়।'

'সে কি বীভৎস দৃশ্য! ছেলেরা মেয়েরা জল আনতে যেতে পারে না ঝরনার ধারে। সন্ধ্যায় কে আসবে সেখানে গল্প করতে! পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ আমি চলে এসেছি। যখন আসি তখন সূর্য পাটে বসেছেন। পাহাড় থেকে একবার পেছনে তাকিয়ে দেখেছিলাম। সেই প্রেত-ছায়া দীর্ঘ হয়ে গির্জার চূড়া ঢেকে ফেলেছে—ঢেকে ফেলেছে জেলখানা। সারা পৃথিবীর গায়ে যেন লেপটে গেছে। এক রাত আধ দিন একলা হেঁটেছি।

তার পর এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গেও বাকিটা দিন আর পুরো একটি রাত কখনও ঘোড়ায় কখনও হেঁটে এসেছি।'

অনেকক্ষণ কেউ-ই কথা বলল না। অবশেষে দ্যফর্জ বলল—'একটু-বাইরে গিয়ে দাঁড়াও না ভাই। আমরা দুটো কথা কয়ে নি।'

'তাতে কি হয়েছে। এই আমি যাচ্ছি,' ঘরের বাইরে গেল লোকটি।

'তোমার কি মত? শেষ করাই ঠিক তো? খাতায় নাম থাকবে—'

'অর্থাৎ শেষ করবার কথা বলছ তো।'

'জমিদারবাড়ির গুষ্টিসুদ্ধ সব মরবে।' বলল দ্যফর্জ—'মাদাম যদি খাতায় না রেখে মনে গেঁথে রাখে একটা কথাও সে ভুলবে না। ওর হাতের বোনার কাঠি থেকে রূপায়িত সূচিশিল্পের মত গেঁথে থাকবে মনে—সূর্যের আলোর মত অম্লান স্বচ্ছ হয়ে থাকবে। মাদামের ওপর তোমরা বিশ্বাস রেখ!'

সবাই সায় দিল এ প্রস্তাবে।

'চাষাটাকে কি এখনই ফেরত পাঠিয়ে দেবে। দেওয়াই ভালো, কি বল? লোকটি খুব সরল, তাই একটু বিপজ্জনক।'

'ও কিছুই জানে না,' বলল দ্যফর্জ। 'ও থাক আমার কাছে—আমি ওর ভার নিচ্ছি। ও রাজা-রানীকে দেখতে চায়—রবিবারে ওকে দেখাব।'

লোকটা বলল, 'রাজারানী আর বড়লোকদের দেখার লোভ জিনিসটা ভালো তো?'

দ্যফর্জ জবাবে বলল, 'দুধের তেষ্টা জাগাতে হলে বেড়ালকে দুধ দেখাতে হবে। শিকার না চিনলে কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কুকুর? কাকে টুকরো করবে রাগে?'

লোকটা সিঁড়িতে বসে ঢুলছিল। তাকে বিছানায় শুয়ে আরাম করতে বলে নিচে নেমে গেল সবাই।

রবিবার সবাই গেল। সারাপথ মাদাম হাতে বোনার কাঠিটি নিয়ে কাজ করল। বিরাট জনতা রাজা-রানীর গাড়ির অপেক্ষা করছে। একটু পরেই সুন্দরী রানীকে নিয়ে রাজা সোনালী গাড়িতে করে আসছেন দেখা গেল। তাদের পিছনেই হীরা মুক্তো সিল্ক পাউডার ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের জলুসের মধ্যে দেশের সব বড় বড় জমিদার ও লর্ডরা সুন্দরী মহিলাদের নিয়ে এগিয়ে আসছেন। লোকগুলো এই জলুস দেখে যেন বিমূঢ় হয়ে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিল—'দীর্ঘজীবী হোক আমাদের রাজা, দীর্ঘজীবী হোক আমাদের রানী।'

তিন ঘণ্টা ধরে সব দেখল এই গ্রামের লোকটি। তার ভিতরকার সরলতা যেন উল্লাসে ফেটে পড়তে লাগল।

দ্যফর্জ সর্বক্ষণ লোকটার গলার কলার ধরে দাঁড়িয়েছিল। এখন পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'কেমন দেখলে সব? খুব আনন্দ হল তো। তোমার মতো লোকই আমাদের দরকার।'

'এই সব সরল মানুষের সরল চিৎকার শুনে ওরা ভাবুক যে ওদের এই জলুস চিরকাল চলতে থাকবে। তবে না ওরা আরও অত্যাচারী, আরও বেপরোয়া হবে—তবে না ওদের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসবে।'

লোকটা কি যেন ভাবল। তার পর বলল, 'সত্যি কথা, সত্যি কথা।'

'একগাদা পুতুল দিয়ে কেউ যদি কতকগুলোকে টুকরো টুকরো করতে বলে তবে যেগুলো দেখতে সুন্দর, যেগুলো সাজানো-গোছানো সেইগুলোকেই কি তুমি তুলে নেবে না?'

'সত্যি, তাই তো করব?'

'এক ঝাঁক পাখির মধ্যে যাদের ওড়ার ক্ষমতা নেই, শুধু পরের পরিশ্রমের ভাত বসে বসে খাচ্ছে আর পেখম ধরে বসে আছে, সেই ক-টাকেই কি তুমি ছিঁড়ে ফেলবে না, সেইটাই কি উচিত নয়?'

'সত্যি মাদাম তাই তো করব।'

'আজ তোমাকে রঙ-করা পুতুল দেখিয়েছি আর সাজা-পাখি দেখিয়েছি—যথা সময়ে মনে থাকবে তো? এখন ঘরে যাও।'

১৬ জালাবস্তার

রবিবার জ্যাকুজকে রাজা-রানী দেখিয়ে খুশি-মনে বিদায় দিল দ্যফর্জ। তার পর স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি করে ফিরল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক গা-ঢাকা হয়ে এসেছে। সেই অন্ধকার দিগদিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে। যে-গ্রামে হাঁটা-পথে চলেছে জ্যাকুজ, সেই গ্রামের এক ঝরনার ধারে চল্লিশ ফুট উঁচুতে একটা গলিত মৃতদেহ দুলছে। আর ঝরনার জল পচে যাচ্ছে দুর্গন্ধে। মড়ার মুখে নাকি প্রতিহিংসার তৃপ্তি দেখেছে গ্রামের লোক। যেমন দেখেছিল একদিন রাতে এক জন দাম্ভিক জমিদারের মুখে মৃত্যু-ভয়ের বীভৎসতা।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে দ্যফর্জের গাড়ি এসে থামল প্যারির উপকণ্ঠে। সীমান্ত রক্ষীদের আস্তানায় দুলে উঠল লণ্ঠনের সারি। শুরু হল পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তরের পালা। দ্যফর্জের সঙ্গে দু'এক জন পুলিশের জানা-শোনা। তাদের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে আবার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল দ্যফর্জ বাসার দিকে। গলির মুখে গাড়ি রেখে দু'জনে পায়ে হেঁটে গলির কাদা আর ময়লা ভেঙে আসতে লাগল।

'পুলিশের সঙ্গে কি কথা হ'ল?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করল মাদাম।

'বলল, আপনাদের এদিকে নতুন স্পাই এসেছে। আরও নাকি আসবে। তবে একজনকে চেনে সে।'

'লোকটি কে?'

'জাতে ইংরেজ। নাম বারসাদ।'

'চেহারা কেমন?'

'বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। লম্বায় পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি। চুল কালো—গায়ের রঙ ময়লা। চেহারাটি মোটামুটি সুন্দর। চোখের মণি কালো—মুখ সরু লম্বা। নাক বড়শির মত বাঁকা—বাঁ দিকে একটু হেলানো। অর্থাৎ মুখে শয়তানি ছাপ মাখানো।'

'যা বর্ণনা দিলে একেবারে ছবি-ছবি। কাল দেখলেই চিনতে পারব,' কথা বলতে বলতে তারা এসে মদের দোকানে ঢুকল।

'কালই ওর হিসাব হয়ে যাবে।'

তখন মধ্যরাত্রি।

ওরা মদের দোকানের ভিতরে চলে এল। নিজের পরিচিত ডেস্কে বসল মাদাম।

তার অনুপস্থিতিতে খুচরো টাকা-পয়সা যা জমা পড়েছিল তা গুনে ফেলল। স্টক মিলিয়ে নিল। বেচা-কেনার খাতার হিসেব দেখল। যে-লোকটা দোকানে কাজ করে তার সারা দিনের কাজের হিসেব নিল। তার পর তাকে শুতে যাবার হুকুম দিল।

টাকার থলি থেকে সব-কিছু সে তার রুমালে ঢেলে ফেলল। রাত্রিবেলা সাবধানে রাখার জন্যে অনেকগুলি গিঁট দিল সেই রুমালে।

মাদাম যতক্ষণ তার এই সব কাজ করতে লাগল দ্যফর্জ মুখে পাইপ পুরে সারা ঘর পায়চারি করতে লাগল। তার মুখে প্রশান্তি।

স্ত্রীর কাজে কখনই সে হস্তক্ষেপ করে না। কি ব্যবসার ব্যাপারে, কি তার গৃহস্থালিতে, জীবনের রাজপথে চিরকালই সে এমনি করেই চলে এসেছে।

আজ রাত গুমট। দোকান-ঘর বন্ধ। চারপাশের পরিবেশ এত নোংরা যে ভিতরেও একটা ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ থাকে। দাফর্জের নাকে সেই দুর্গন্ধ যায়, কিন্তু ঘরের ভিতরের নানা রকম মদের গন্ধে তা অনেকখানি চাপা পড়ে।

পাইপের আগুন নিভে গিয়েছিল। সেটি নামিয়ে রেখে দুই হাতে বাতাসের দুর্গন্ধ সরিয়ে দিতে চাইল দ্যফর্জ।

টাকা-পয়সার বাঁধাবাঁধি শেষ হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে মাদাম বলল, 'তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এই ঘরের গন্ধ তো আর নতুন কিছু নয়।'

স্বামী বলল, 'হ্যাঁ, আজ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

মাদাম যতক্ষণ হিসেব করছিল, তার ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর দিকেও লক্ষ্য রেখেছিল।

'আজ একটু যেন হতাশ হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে। ঐ লোকগুলো—'

'কিন্তু শোন—', বলল দ্যফর্জ।

মাদাম দৃঢ় প্রত্যয়ে মাথা নাড়তে লাগল। বলল, 'না না। যতই বল আজ রাতে তোমার মন ভেঙ্গে গেছে।'

দ্যফর্জ অনুভব করল যে তার অন্তরের অন্তস্তলে একটা কি ভাবনা যেন তাকে মোচড় দিচ্ছে।

'তাই ভাবছি এখনও অনেক দেরি।'

'অনেক দেরি।' স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি করল মাদাম।

'কোন্ জিনিসে দেরি হয় না? প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ—উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে। এই প্রকৃতির নিয়ম। চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশের পালা সাঙ্গ করতে সময় লাগবে বই কি।'

স্ত্রীর কথায় দাফর্জ একটু নীরব রইল।

বলল, 'বাজ পড়ে মানুষ মরতে কি সময় লাগে?'

মাদামের কণ্ঠে কোন উত্তেজনা নেই। শান্তভাবে জবাব দিল, 'বল তো, মেঘ বিদ্যুৎগর্ভ হয় কি এক দিনে?'

স্ত্রীর মুখের দিকে চিন্তান্বিত ভাবে তাকাল দাফর্জ। ভেবে দেখল এ যুক্তিতে জোর আছে।

'একটা ভূমিকম্প—একটা ভূমিকম্প একটা শহরকে গ্রাস করতে বেশিক্ষণ সময় নেয় না। কিন্তু সেই ভূমিকম্প ঘটার আগে কতদিন লাগে তার প্রস্তুত হতে।'

'অনেক দিন', জবাবে বলল দ্যফর্জ।

'কিন্তু একবার তৈরি হয়ে গেলে সেই তান্ডব যখন শুরু হয়, তার পথের সব-কিছু সে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দেয়। কিন্তু ভূমিকম্প ঘটার আগে প্রস্তুতি চলে মানুষের দেখা-শোনার অন্তরালে। দেখা যায় না, শোনা যায় না—এইটুকু যা সান্ত্বনা। আমার কথা তুমি শুনে রাখ।'

রুমালে আর একটা গিঁট দিল মাদাম। যেন একটা শত্রুর গলায় ফাঁস দিল। তার চোখে আগুন।

'আমি তোমায় বলছি', বলল মাদাম—'আমি বলছি যে—বিপ্লব বহুদিন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সে পথে নেমেছে—বহু পথ সে অতিক্রম করেছে। এগিয়ে আসছে। বিপ্লব কখনও শেষ হতে জানে না। ইতিহাসের রাজপথ দিয়ে সে শুধু এগোতেই জানে। তার চলার কোন বিরাম নেই। একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। চেয়ে দেখ মানুষের মুখে। দেখ—কি আক্রোশ, কি অসন্তোষ জমা হয়ে আছে সেখানে। সেই চাবুক খাওয়া মানুষগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ না কি নিশ্চিত পদক্ষেপে সে এগিয়ে আসছে। এ-রকম অবস্থা কখনো বেশিদিন চলতে পারে? পারে কিনা তুমি বল?'

মাথা নিচু করে স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়েছিল দ্যফর্জ। হাত দুটি পিছনে জড়ো করা। যেন শিক্ষকের সামনে পড়া দিচ্ছে এমনি ভাব তার।

'আমি তোমার কোন কথার প্রতিবাদ করছি না,' বলল সে—'কিন্তু কত কাল এমনি ধারা চলে আসছে। কি জানি গিন্নি, আর দেরি হলে তুমি আমি কি আর তা দেখতে পাব? হয়ত তার আগে আমাদের গায়ে মাটি চাপা পড়বে।'

'তাতেই বা কি?'

মাদামের গলায় নৈরাশ্যের লেশমাত্র নেই। কিন্তু যেন কত বিষণ্ণ সুরে বলল দ্যফর্জ, 'তবে তো বিপ্লবের জয়ধ্বনি শুনতে পাব না আমরা।'

মাদাম স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হোক তাই। তবু তো জানব যে, বিপ্লবকে আমরা হাতে ধরে এনেছি। বিপ্লবের আগুনে অর্ঘ্য দিয়েছি আমাদের সর্বস্ব। দেখি আর না দেখি আমরা যা করেছি, যা করছি তার কোন-কিছুই বৃথা যাবে না। তবু তোমায় আমি বলছি, মনপ্রাণ দিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে আমরা বিপ্লবের জয় দেখে যাবই। একটা জমিদার, একটা অত্যাচারী শোষক বেঁচে থাকতে আমি—'

দ্যফর্জ দেখল দাঁতে দাঁত পিষে মাদাম সেই রুমালে আর-একটা গিঁট দিল। মুখ তার ভয়াল হয়ে উঠেছে।

দ্যফর্জের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কে যেন তাকে ভিতু বলে সম্বোধন করছে।

সে চিৎকার করে বলল, 'আমিও কিছুতে নিরস্ত হব না।'

'কিন্তু তোমার ভেতরে একটা দুর্বলতা আছে আমি লক্ষ্য করেছি। বলির পশুকে হাঁড়িকাঠে দেবার সময় তোমার করুণা হয়। সে করুণা মন থেকে মুছে ফেল। যখন সময় আসবে—শয়তানকে হিংস্র বাঘের মুখে ঠেলে দিতে একটুও দয়া করবে না। কিন্তু যতদিন না সে-সময় আসছে ততদিন অত্যাচারী শয়তানকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখ আর তৈরি রাখ ক্ষুধার্ত বাঘকে শয়তানের চোখের আড়ালে।'

কাউন্টারের উপরে সেই টাকা-পয়সার বড় রুমালটি দিয়ে টেবিলের উপর আঘাত করল মাদাম।

তার পর—রাতের মত বিশ্রামের জন্য তৈরি হল।

পরের দিন দুপুরে তার সেই অভ্যস্ত আসনে মাদামকে দেখা গেল। তেমনি এক-মনে তার সেই বোনার কাজ করে চলেছে। পাশেই একটা গোলাপ ফুল। মাঝেমাঝে সেই ফুলটির দিকে তার চোখ পড়ছে। কিন্তু হাতের কাজের কোন বিরাম নেই।

আজ দোকানে খুব অল্প ভিড়। কেউ কেউ মদ খাচ্ছে। কেউ-বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

আজ খুব গরম পড়েছে। মাছিদের অবিরত ভনভন। মাদামের সামনে রাখা গেলাসগুলোতে তারা গিয়ে হামলা করছে। আর তাদের মৃতদেহ গিয়ে জমছে গেলাসের তলায়। তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় দেখেও অন্য মাছিদের জ্ঞান হচ্ছে না। তারা সেই একই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করার জন্য উড়ে উড়ে আসছে।

এমন সময় একটি নতুন আগন্তুকের ছায়া পড়ল মাদামের গায়ে।

চোখ তুলে তাকাবার আগেই মাদাম বুঝল সে নতুন লোক।

হাতের বোনা রেখে তার মাথায় গোলাপ ফুলটি লাগিয়ে নিল মাদাম। তার পর নতুন খরিদ্দারের দিকে তাকাল।

কিম্ আশ্চর্যম্। মাথায় হাত তুলেছে মাদাম আর দোকানের সরগম যেন যাদুর মত থেমে গেল। দোকান থেকে একে একে সবাই সরে পড়তে লাগল।

'সুপ্রভাত,' বলল আগন্তুক।

'সুপ্রভাত,' জবাব দিল মাদাম।

বটেই তো। সেই হিসেব। মনে মনে মিলিয়ে নিল সে। বয়স চল্লিশ। পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি লম্বা। কালো চুল। মাটো রঙ, তবে চেহারাটা সুশ্রী। চোখের মণি কালো। লম্বাটে গাল, ত্যাবড়ানো মুখ। নাকের ডগাটা ঠিক তেমনি বাঁ গালের দিকে একটু বাঁকানো। সারা মুখে শয়তানি ছাপ। সবাইকে আজ সুপ্রভাত।

'এক গ্লাস মদ আর একটু ঠান্ডা জল।'

'সানন্দে।'

সৌজন্যের সঙ্গে পরিবেশন করল মাদাম।

'চমৎকার মদ!'

এই প্রথম তার দোকানের মদের এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা করল কেউ। আর কেন করল তার কারণও আগে থেকে জানে মাদাম। আপনমনে সেলাই করে যাচ্ছে দেখে আগন্তুক একবার তার আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার পর তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সারা ঘরখানির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

'চমৎকার হাত আপনার বোনায়।'

'ঐ আমার অভ্যেস।'

'প্যাটার্নটিও করেছেন ভালো।'

সহাস্য দৃষ্টি তুলে তাকাল মাদাম, 'আপনার ভালো লাগল?'

'জিনিসটা কি হচ্ছে? কি কাজে লাগবে!'

'বিশেষ কিছু নয়, সময় কাটানোর জন্য করছি।'

হাসি মুখে তাকাল মাদাম। তার হাত চলছে অবিরাম।

দুটি লোক দোকানে এসে মদের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নতুন লোককে দোকানে দেখে থমকে গেল—বন্ধুর খোঁজে এসেছিল এমনি একটা মিথ্যা ভান করে সরে পড়ল সেখান থেকে। দোকানে যারা ছিল তারাও সরে পড়েছে কখন। তাদের লক্ষ্মী-ছাড়া চেহারা—বাউন্ডুলে ভাব—কোন কিছুই ধরা পড়ার মতো নয়। লোকটা চোখ কান খুলে রেখেছে—কিন্তু সন্দেহজনক কোন-কিছু নজরে পড়ল না।

'কিছু কাজে লাগবে নিশ্চয়ই!'

'হয়ত-বা লেগে যেতে পারে কোনদিন নিজের কাজে।' যেন একটু ঢঙ করে বলল মাদাম।

মাদাম আপনমনে কাজ করে যাচ্ছে।

এতক্ষণে 'জন' অবধি বোনা হয়ে গেছে তার। মনে মনে বলল মাদাম—তুমি থাকতে থাকতেই 'বারসাদ' অবধি আমার হয়ে যাবে।

'আপনার স্বামী আছেন, মাদাম?'

'আছেন।' বলল মাদাম।

'ছেলেমেয়ে?'

'ছেলেমেয়ে আমার নেই।'

'ব্যবসা কেমন? দেখে তো ভালো মনে হয় না?'

'বেচা-কেনা ভারি মন্দা। লোকের হাতে পয়সা নেই।'

'লোকের কথা আর বলবেন না। ওদের অভাবও যত, ওদের ওপর অত্যাচারও হয় তত। তাই বলছিলেন না আপনি?'

'ঐ রকমই বলছিলেন বটে আপনি,' ভুল শুধরে দেন মাদাম।

'মাপ করবেন—আমিই বলেছি কথাটা। কিন্তু আপনারও কি সেই মত নয়—বলুন?'

'আমি আর আমার স্বামী', চড়া-গলায় বলল মাদাম—'সারা দিন মদের দোকান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে ওসব কথা ভাববার অবসর পাই না। আমাদের একমাত্র ভাবনা

কি করে বাঁচব—সংসার চালাব। সকাল-সন্ধ্যা এই ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত যে, অন্য ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। নিজের জ্বালায় মরছি, পাঁচ জনের দিকে তাকাব কখন?'

মাদামের দোকানের ছোট কাউন্টারে কনুই রেখে মদ খেতে খেতে লোকটা সোৎসাহে গল্প করতে লাগল মাদামের সঙ্গে। যেন কত আত্মীয়, আপনজন। এইখান থেকে ছোট বড় যা-কিছু খবর পায় সেই তার লাভ। যে-কোন হদিস পেলে সে সফল হয়।

'গেসপার্ডের ফাঁসির ব্যাপারটাই ধরুন। কি মানে হয় তাকে ফাঁসি দেবার!' দরদ যেন কণ্ঠে উথলে উঠল।

'লোকে যদি খুন করতে ছুরি চালায় তার ন্যায্য মূল্য তাকে দিতে হবে বই কি'। কাউণ্টারের এপাশ থেকে নিরুত্তাপ জবাব দিল মাদাম—'কত দাম পড়বে সে কাজের, তা তো সে জানত। দিলও তাই।'

'এ পাড়ায় ওর জন্যে অনেকের মনে প্রতিহিংসা জেগেছে। লোকটা ভালো ছিল। স্বভাবতই লোকে ওর দিকে হয়ে বলবে।' নিজের ভিতরে একটা প্রতিরোধ যেন গর্জে উঠছে এমনি ভাবে বলল লোকটা। খুব গোপন কথা নিজেদের মধ্যে রাখবার জন্যে লোকটা গলার স্বর নিচু পর্দায় নামিয়ে আনল।

'তাই নাকি?'

'আপনি লক্ষ্য করেননি কিছু?'

কিন্তু সে-কথার উত্তর না দিয়ে মাদাম বলল, 'ঐ আমার স্বামী আসছেন।'

দোকানের মালিক দোকানে ঢুকতেই স্পাই টুপি খুলে তাকে নমস্কার করল, তার পর মুখে হাসি টেনে বলল, 'শুভ দিন, জ্যাকুজ।'

দ্যফর্জ মাঝপথে থেমে গেল—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'শুভ দিন, জ্যাকুজ'—স্পাই পুনরাবৃত্তি করল।

দ্যফর্জের তীব্র দৃষ্টির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

'আপনি আমাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছেন। আমার নাম জ্যাকুজ নয়—আমার নাম দ্যফর্জ।'

'তাই নাকি?' অপ্রতিভ হলেও লোকটা সামলে নিল নিজেকে।

'শুভ দিন'—

'শুভ দিন,' শুষ্ক কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করল দ্যফর্জ।

'এতক্ষণ মাদামের সঙ্গে কথা কইছিলাম। হতভাগ্য গেসপার্ডকে নিয়ে এ অঞ্চলে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সব কথাই আমাদের হচ্ছিল।'

'কই, তেমন কথা আমায় তো কেউ বলেনি,' মাথা বাঁকিয়ে বলল দ্যফর্জ—'এ রকম ব্যাপার আমার কিছুই জানা নেই।'

এ কথা বলেই দ্যফর্জ চলে এল কাউণ্টারের পিছনে। স্ত্রীর চেয়ারের পিছনে হাত রেখে তাকাল সামনের দিকে। যে লোকটিকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারলে দু'জনেই খুশি হত, সেই গুপ্তচরের দিকে তাকাল দুজনেই।

এ রকম পরিস্থিতি অনেক গা-সওয়া হয়ে গেছে তার। পারিপার্শ্বিকের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে গ্লাসের শেষ মদটুকু নিঃশেষ করে এক চুমুক জল খেয়ে আর এক গ্লাস মদের অর্ডার দিল। মাদাম মদ ঢেলে দিয়ে আবার সেলাই নিয়ে বসলেন, আর সেই সঙ্গে চলল সুরের গুনগুনানি।

'এ জায়গাটা দেখছি আপনি খুব ভালো করে চেনেন অর্থাৎ আমার চেয়ে বেশি'—বলল দ্যফর্জ।

'একটুও নয়। তবে জানার আশা আছে। এখানকার কাঙাল-মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে আমার ভারি কৌতূহল।'

দ্যফর্জ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল।

'মসি'য়ে দ্যফর্জ, কথা বলতে বলতে আপনার নামের সঙ্গে জড়িত একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ডাঃ ম্যানেত যখন ছাড়া পেলেন তাঁর পুরনো কর্মচারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আপনার হাতেই দেওয়া হয়েছিল। আপনিই তাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই রকম শুনেছি আমি।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

মাদামের কনুই-এর ইঙ্গিতে দ্যফর্জ আগেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল।

'ডাঃ ম্যানেতের মেয়ে আপনার কাছেই এসেছিল এবং আপনার হেফাজত থেকে সে তার বাপকে নিয়ে গেছে ইংল্যান্ডে। সঙ্গে ছিল আর-এক জন ভদ্রলোক—খুব ফিটফাট দেখতে—কি নাম যেন—টেলসন ব্যাঙ্কের মি. লরি।'

'যা শুনেছেন সবই সত্যি।'

'ইংল্যাণ্ডে ডাঃ ম্যানেত আর তার মেয়েকে চিনতাম।'

'তাই নাকি?'

'এখন আর তাদের কোন খবর পান না?'

'না।'

মাদাম সেলাই থেকে মুখ তুলে বলল, 'আমরা তার কোন খবরই জানি না। তাদের নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছানোর খবর পেয়েছি। তার পর একখানি কি দুখানি চিঠি। ক্রমশ তারা তদের নিজের পথ বেছে নিয়েছে—আমরা আমাদের। এর পর আমাদের মধ্যে কোন চিঠি চালাচালি হয়নি।'

'মেয়েটির শীগগির বিয়ে হবে।'

'বিয়ে হবে?' প্রতিধ্বনি করল মাদাম—'অমন রূপবতী মেয়ে, এত দিনে তার বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল? আপনারা ইংরেজরা এসব ব্যাপারে বড্ড ঠাণ্ডা।'

'আমি যে ইংরেজ জানেন দেখছি।'

'আপনার কথার ধরন দেখেই বুঝেছি। মুখের কথা থেকেই বোঝা যায় কে কোন জাতের।'

সে যে ইংরেজ একথা প্রকাশ হওয়ায় খুশি হল না সে। কিন্তু পরিবেশটা একটু হালকা করার জন্যে লোকটি হো-হো করে হেসে উঠল। তার পর মদের গ্লাস নিঃশেষ করে বলল, 'হ্যা, লুসি ম্যানেতের শীগগিরই বিয়ে হবে। বিয়ে হবে কোন ইংরেজের সঙ্গে নয়—একজন ফরাসির সঙ্গেই। সবচেয়ে আশ্চর্য হল যে, লুসি নাকি মারকুইসের ভাইপোকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই মারকুইসের খুনের জন্যই গেসপার্ডের ফাঁসি হল। মারকুইসের ভাইপো এখন ইংল্যাণ্ডে অজ্ঞাতবাস করছেন। এখন তাঁর নাম চার্লস ডার্নে। সেই তো এখন মারকুইস হল।'

মাদাম অবিচলিত ভাবে বুনে যেতে লাগল। কিন্তু এই তথ্যটুকু তার স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করল সুস্পষ্ট। পাইপ ধরাতে গিয়ে তার হাত কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে। তার এই বিচলিত ভাব স্পাই লক্ষ্য করল। তা যদি না করতে পারত তবে তো সে স্পাই-ই নয়।

বারসাদ মদের দাম চুকিয়ে বিদায় নিল। লোকটি চলে গেলে স্বামী-স্ত্রী অনেকক্ষণ

নিশ্চল হয়ে বসে রইল নিজ নিজ আসনে। যদি বারসাদ আবার ফিরে আসে। যাবার আগে বারসাদ বলে গেল যে শিগগিরই সে আবার এই দম্পতির সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

নিচু-গলায় দ্যফর্জ বলল, 'লুসি ম্যানেতের সম্বন্ধে লোকটি যা-যা বলে গেল তা কি সত্যি?'

মাদাম চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'ও যখন বলেছে খুব সম্ভব মিথ্যা। কিন্তু সত্যিও তো হতে পারে?'

'যদি সত্যি হয়—যদি বিপ্লব আসে আমাদের জীবিত কালেই, আশা করি, মেয়েটির ভাগ্য তার স্বামীকে ফ্রান্সের সীমানার বাইরে রাখবে।'

স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে মাদাম উত্তর দিল এ কথার।

'ভাগ্য তাকে যেখানে নিয়ে যাবার নিয়ে যাবেই। যা তার কপালে লেখা আছে ঘটবেই। এই তো আমি বুঝি।'

'সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমাদের দরদ মেয়েটির জন্যে, মেয়েটির বাবার জন্যে। যে ঘৃণ্য কুকুরটা এই মাত্র চলে গেল তার মতোই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রইল ওর স্বামী। সে তো অত্যাচারী অভিজাত বংশের একজন।'

'যখন ঘটবে, অদ্ভুত ঘটনাই ঘটবে। ওদের দুজনকেই আমার হিসেবের মধ্যে রেখেছি। যার যা পাওনা সে তা পাবেই।'

কথাগুলো বলে মাদাম তার বোনা গুটিয়ে নিল। মাথার রুমাল থেকে খুলে নিল গোলাপটি।

এতক্ষণে সেন্ট আঁতোয়ানের স্বাভাবিক অনুভূতি সজাগ হয়ে উঠল যে আপত্তিকর সাজটি সরে গেছে। হয়ত-বা এতক্ষণ ধরে এরই প্রতীক্ষায় ছিল এখানকার মানুষজন। এইবার সেই সব লক্ষ্মীছাড়া ধরনের মানুষজন আবার এসে প্রবেশ করতে লাগল দোকানে। সেই চিরপরিচিত ভাবটি আবার ফিরে এল।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা এল।

বছরের এই সময়টা এ অঞ্চলের লোকেরা কেউ আর বাড়ির ভিতরে থাকে না। অনেকে বসে থাকে দরজার সিঁড়িতে। কেউ কেউ জানালার বাইরের দিকে কার্নিশে। এখানকার নোংরা পথের কোণে কোণে ছোট ছোট দলে সব গল্পগুজব করে। পথের উপর লোক উপচে পড়ে।

মাদামও পথে বেরিয়ে পড়ে। হাতে থাকে বোনার জিনিস। সন্ধ্যেবেলায় হাওয়া খেতে খেতে ঘুরে ঘুরে মানুষজনের সঙ্গে গল্প করে বেড়ায়।

এরা এক রকমের মিশনারি। মাদামের মতো এ-রকম মিশনারি আরও অনেক আছে। এ রকম নরনারী যত জন্মাবে ততই তাদের অস্বস্তি—যারা দুনিয়াটাকে শাসন করছে, শোষণ করছে।

এইরকম মেয়েরা সবাই বোনার কাজ করে। যা বোনে তা সবই অকাজের। কিন্তু খাওয়ার মতোই এ-ও একটা কাজ।

কিন্তু এদের আঙুল যত চলে, চোখের দৃষ্টি যত তীক্ষ্ম হয় এদের চিন্তা তত উদগ্র হয়ে ওঠে।

এক একটা দলের সঙ্গে গল্প করে মাদাম। যখন অন্য আর-এক দলের সঙ্গে গল্প করতে যায়, পিছনে ফেলে যায় যেসব মেয়েদের তাদের ভিতরে সঞ্চারিত করে যায় সেই তীক্ষ্মবোধ—যা দিনে দিনে এইসব ক্ষুধার্ত দরিদ্র রাষ্ট্রের অত্যাচারে মার-খাওয়া মানুষের মন আক্রোশ আর প্রতিহিংসার আগুনে তীব্রতর করে তোলে।

স্বামী সর্বদাই এই মেয়েটির কথায় বার্তায় আচরণে একটা সশ্রদ্ধ প্রশংসার ভাব

বহন করে। মাদাম যখন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, দরজায় দাঁড়িয়ে দ্যফর্জ নিঃশব্দে ধূমপান করে।

অন্ধকারের পক্ষচ্ছায়ায় ধীরে ধীরে ঢেকে গেল চারদিক। দূরে গির্জার ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠল। রাজপ্রাসাদের মিলিটারি ড্রামের আওয়াজ ভেসে আসছে। মেয়েরা বুনছে, বুনে চলেছে।

অন্ধকার সব আবৃত করে দিচ্ছে।

এমনি আর এক তিমিরঘন রাত্রি অনিবার্য পদক্ষেপেই এগিয়ে আসছে। এতদিন সারা ফ্রান্সের সমস্ত গির্জায় যত ঘন্টাধ্বনি বাতাসে তরঙ্গ তুলেছে সব ডুবে যাবে কামানের গর্জনে। একটি হতভাগ্যের আর্ত চিৎকার চাপা দেবার জন্যে বাজবে সামরিক দামামা। শক্তি আর সমৃদ্ধি স্বাধীনতা আর মুক্তজীবন-বোধ সেই কণ্ঠে ঘোষিত হবে। যে-সব মেয়ে এমনি করে ভাগ্যকে বুনছে, তারাই যেন ধীরে ধীরে সমবেত হচ্ছে এমন এক এক প্রতিহিংসা চরিতার্থতার কাঠামোর চারপাশে যা আজও নির্মিত হয়ে ওঠেনি—যেখানে বসে তারা বুনবে, আর একটি একটি করে গণনা করবে অত্যাচারীর ছিন্নমুণ্ড।

১৭ একদা নিশীথে

সেদিন সূর্যাস্তের সোনায় সোনায় ভরে ছিল আকাশ। প্রথম রাতের চাঁদ অতন্দ্র জেগেছে নগরীর শিয়রে। জেগে ছিল দুটি অসমবয়সী প্রাণী পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে। আপন আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে দুজনে নিঃশব্দে বসেছিল প্রাঙ্গণের জাফরি-কাটা আলো-ছায়ার দিকে চেয়ে। সেই গাছটির ছায়ায়। রাত যখন অনেক হল, চাঁদের আলোয় আকাশ ভেসে যেতে লাগল, তখনও দুজনে নীরবে ব'সে।

কাল তার বিয়ে। তাই আজকের দিনটি লুসি বাপের সঙ্গ-ছাড়া হতে চায়নি। অন্তত এই একটি দিন সে পরিপূর্ণ নিজেদের জন্যে রেখেছিল। যে গাছটির নিচে এতদিন ধরে কত প্রিয় মুহূর্ত কাটিয়েছে সেই খানেই সে পিতার কাছে বসে রইল।

চাঁদের আলোয় বৃদ্ধের শান্ত মুখে কোমল-পাণ্ডুর আভা লেগেছে। এই অসহায় মানুষটিকে মুহূর্তও ছেড়ে যেতে চায় না লুসি। এইবার নিয়ে তাই সহস্রবার পিতাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি সুখী হয়েছ তো বাবা?'

'হ্যাঁ, মা! এমন সুখী আমি জীবনে কখনও হইনি এর আগে। বিয়ে হয়ে আমার মেয়ে সুখের ঘর বাঁধবে, আর আমি সুখী হব না মা? এ আমার কত বড় আনন্দ—'

'আজ আমি খুব সুখী বাবা। ভগবান আমাকে এত ভাগ্যবতী করেছেন—চার্লস আমাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসে। আমিও তাকে ভালোবাসি, বাবা। কিন্তু তোমার সব-কিছুর জন্যে যদি আমার এই জীবন উৎসর্গ করার দায় না থাকত—কিংবা যদি আমার এমন বিয়ে হত যাতে তোমাকে আমাকে আলাদা থাকতে হত, সে যদি এই শহরের ভেতরেও এ-অঞ্চল ও-অঞ্চল হ'ত তবে আমি খুবই অসুখী হ'তাম বাবা। তোমাকে ছেড়ে চলে যাব সে কথা ভাবতেই—'

লুসির গলা কান্নায় বুঁজে এল। আর কিছু বলার ক্ষমতা রইল না তার।

সেই বিষণ্ণ চন্দ্রালোকে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে লুসি তার বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

চাঁদের আলোয় সর্বক্ষণই বিষণ্ণতার সুর। সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ে যেমন, মানুষের জীবনেও তেমনি আসা-যাওয়ার সুরটি বড় করুণ।

'তুমি আমায় বল, এই শেষ বারের মতো বল যে, আমার এই নতুন জীবন আর

তার শত সহস্র কর্তব্য, সে সব আমাদের দুজনের মধ্যে কোন ব্যবধান গড়ে তুলবে না। আমার মন তো বলে না। তোমার কি কোন সন্দেহ হয়, বাবা?'

ডাক্তার সানন্দকণ্ঠে বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'আমি নিশ্চিত মা, কোন অসুবিধে হবে না।'

তিনি মেয়েকে আদর করে চুমু খেলেন। বললেন, 'তুমি জান না মা, তোমার বিয়ে হওয়ার ফলে আমার জীবনে নতুন আশার সঞ্চার হল। এ না হলে আমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার হয়ে যেত, মা।'

'কিন্তু—'

'বিশ্বাস কর মা, আমি যা বলছি তাই জীবনে বাস্তব সত্য। তুমি যেদিন থেকে মাতৃস্নেহে আমায় বুকে তুলে নিয়েছ সেদিন থেকে নিয়ত আমার এই দুর্ভাবনা ছিল যে, আমার ব্যর্থ জীবনের সেবায় তোমার তরুণ জীবন যেন না নষ্ট হয়ে যায়।'

বাবার ঠোঁটের ওপর হাত রেখে লুসি তাকে নিবৃত্ত করতে গেল। কিন্তু পিতা তার হাতটি ধরে নিলেন আদরে।

'নষ্ট বই কি মা। নষ্টই তো। শুধু আমার জন্যেই, সব মেয়ে যেমন করে স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখী হয়, তুমি তা হতে পারবে না—এ আমি কেমন করে হতে দেব। তুমি আমার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করছ। আমার দুর্ভাবনা কি তা ঠিক তুমি বুঝবে না মা। কিন্তু বল তো তুমি যদি নিষ্ফল হও, সার্থক না হও, তবে—বাপ আমি—আমি কি করে সার্থক হব! আমি কি করে সুখী হব!'

'চার্লস যদি আমার জীবনে না আসত, আমি তোমাকে নিয়ে দিব্যি আরামে কাল কাটাতাম বাবা।'

মেয়ের এই সহজ আত্মপ্রকাশে বৃদ্ধ খুশিই হলেন। পুলকিত কণ্ঠে বললেন, 'হতেই হবে মা। চার্লসকে যে আসতেই হবে। আর চার্লস কেন, সে না এলে অন্য কোন রূপবান ভালো ছেলে আসতই তোমার জীবনে। কিন্তু এ আমি সহ্য করতে পারতাম না মা যে, আমার অতীতের অন্ধকার বর্তমান পার হয়ে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন অবধি আঁধার করে দেবে। সে আমি কি করে সহ্য করতাম, মা?'

অতীত রোমন্থন করতে করতে পিতার সারা মুখে-চোখে একটা বিষণ্ণ বিস্মরণ আসা-যাওয়া করতে লাগল। তাঁর আত্মমগ্নতা দেখে লুসি নিঃশব্দে বসে রইল।

'কত দিন জান মা, ঐ চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে আমি কাটিয়েছি। জেলের গরাদ-দেওয়া একমুঠো ঘরে বন্দী আমি ঐ চাঁদ দেখেছি আর পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটেছি। বাইরের যে অবাধ বিশ্বভুবন অজস্র জ্যোৎস্নালোকে অবগাহন করছে তার থেকে আমি বঞ্চিত, এ চিন্তা কি দুর্বিষহ তুমি ভেবে পাবে না মা। সেই চাঁদের আলোয় জেলখানার মেঝেতে গরাদের ছায়া গুনে-গুনে আমি কাল কাটাতাম। এদিকে কুড়ি ওদিকে কুড়ি। সেই কুড়িতে এসে পেঁছিলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।'

এই মানুষটির সঙ্গে সেদিনের বন্দীর হতাশ মর্মবেদনার কোন মিল না পেলেও, লুসি আত্মসচেতন ভাবে তাঁর কথা শুনতে লাগল। তেমনি আত্মমগ্ন হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'চাঁদের দিকে চেয়ে আমি একজনের কথা নিশি-দিন ভাবতাম। জেলের ঐ ক-টি লৌহ-গরাদ আকাশের চাঁদের চেয়ে মধুর আর-একজনকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মাতৃগর্ভে অপ্রত্যক্ষ যাকে আমি বাইরে রেখে এসেছিলাম, এত দিনে সে কি এসেছে পৃথিবীতে? হয়ত মরেই গেছে! যদি সে বালক হয়, বড় হয়ে সে কি পিতার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে না? তার বাবা স্ব-ইচ্ছায় এমন আত্মনির্বাসন নিতে পারেন কিনা, সে-বিচার কি একদিন করতে বসবে না সে? তুমি বুঝতে পারবে না মা, তখন প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় আমি কেমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আবার কখনও

কল্পনা-নয়নে দেখতাম একটি মেয়ে হয়েছে আমার। সেই মেয়ে দিনে দিনে বড় হয়ে শ্বশুর-ঘর করতে চলে গেল। বছরের গোলমাল হয়ে যেত। দেখতাম, সুখে ঘরকন্না করছে সে। নিষ্ঠুর নিয়তি তার বাবাকে কোন্ অন্ধকারের গর্ভে নিক্ষেপ করেছে, সে কথা ঘুণাক্ষরেও সে জানে না। মৃতের জগতে সে মানুষ চিরনির্বাসিত।'

'এ-সব কথা তুমি কেমন করে ভাবতে বাবা? সত্যিই আমি তোমার কিছু যে জানতাম না!'

'কত দিন ভেবেছি আমার সেই মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার জানালার বাইরে। আমায় মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছে সে। এমনি চাঁদের আলোয় যখন এমনি বিষণ্নতা আর নিস্তব্ধতা আমাকে আচ্ছন্ন করত, তখন তাকে কত দিন আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমার জেলখানার গরাদের বাইরে। ঠিক এমনি ধারা, মা! শুধু সেদিন এমন করে তাকে বুকে আঁকড়ে ধরতে পারিনি। লোহার গরাদগুলো আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকত। কিছুতেই তাকে এমনি করে বুকে জড়িয়ে নিতে পারতাম না, মা। কিছুতেই পারতাম না। সে যে কি কষ্ট—তবু মা, সে তো আমায় ভোলেনি। স্বপ্নে-জাগরণে সে তো আমার কথা ভাবে। তার প্রার্থনায় সে তো দেবতার কাছে আমার কথা নিবেদন করে। এ কথা ভাবতে ভাবতে হালকা হয়ে যেত মনের অন্ধকার। একাকিত্বে জানু পেতে বসে আমিও তার প্রার্থনায় যোগ দিতাম। শতবার মাথা ঠুকে বলতাম, তাকে ভালো রেখ, ঠাকুর। সে যেন সুখী হয়!'

গভীর ভাবাবেগে মেয়ের কাঁধে মাথা রেখে বৃদ্ধ অস্ফুটে কি যেন উচ্চারণ করতে লাগলেন।

লুসি বলল, 'সে মেয়ে কি তোমার কল্পনা?'

ডাক্তার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রইলেন।

তার পর বললেন, 'না মা, সে আর-এক আলাদা অনুভূতি। আমার দৃষ্টির আচ্ছন্নতার সামনে সে এসে দাঁড়াত। তার শরীরে কোন চাঞ্চল্য নেই। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। যে-মূর্তি আমার মনকে সর্বদা চঞ্চল করত সে আর একজন। বোধ করি অনেক প্রত্যক্ষ সে। আজ একটু একটু মনে পড়ে তাকে। দেখতে অনেকটা তোমার মায়ের মতন। আর একজন যে ছিল, তোমারই মতো তার সঙ্গে তারও চেহারার মিল ছিল। কিন্তু দুজনে এক ছিল না, মা। তুমি আমার সব কথা বুঝবে না, মা। বোঝা সম্ভবও নয়। দীর্ঘকাল কোন নির্জন সেলে অমানুষিক কষ্টের মধ্যে যাকে কাল কাটাতে হয়েছে, চিন্তার এই সব বিভ্রান্তি সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।'

ডাক্তার নিজের স্মৃতিচারণ করার সময় একবারও উত্তেজিত কি বিষণ্ন হননি। তার সমস্ত মুখে শান্তভাবটি অক্ষুণ্ন রয়েছে।

কিন্তু লুসি এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। তার শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল।

'অনেকদিন মন যখন কিছুটা শান্ত থাকত, আমি কল্পনা করতাম মা, যে সেই চাঁদের আলোয় সে এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দে আমাকে সেই নির্জন সেল থেকে, সেই পাষাণ কারাগার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। নিয়ে গেছে তার সংসারে। জীবনের দুর্যোগে যে-পিতাকে সে হারিয়েছিল তাকে সে ভোলেনি। তার সংসারে সর্বত্র তার পিতার সুখ-স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমার মেয়ের ঘরে আমার ছবি জ্বলজ্বল করছে। প্রার্থনা করার সময় বার বার-তার বাবার মঙ্গল কামনায় সেই মেয়ের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠছে। আমার সেই মেয়ে বিয়ে করে সুখী হয়েছে—সার্থক হয়েছে—পরিপূর্ণ নারীত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে। কিন্তু আমি—তার বাবা—তার সব-কিছুর মধ্যে জড়িয়ে আছি।'

'বাবা,' বলল লুসি, 'আমি তোমার সেই মেয়ে বাবা। আমি তোমার তত ভালো মেয়ে নই—কিন্তু সে ভালোবাসা তো আমারই বাবা।'

ডাক্তার আপনমনে বলতে লাগলেন।

'সে মেয়ে আমাকে তার ছেলেমেয়েদের দেখাল। তারা তো সব আমার কথা শুনেছে তাদের মায়ের কাছে। তারা তো আমার দুঃখে কাঁদে, মা। সে তাদের মা শিখিয়েছে। যখন তারা কোন জেলখানার পাশ দিয়ে যায়—সেই সব দুর্গ-প্রাচীরের নিষ্করুণ চেহারার দিকে তারা তাকায়। একবার উঁচু দিকে তাকিয়ে দেখে সেই সব নির্জন সেলের নির্মম লোহার গরাদ, আর অস্ফুটে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে। কিন্তু আমায় তো সে উদ্ধার করতে পারে না। তাই জীবনের সব মধুর ছবি দেখিয়ে সে যে আবার আমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে জেলখানায়। রেখে দিয়ে যায় লোহার গরাদের পিছনে। নির্জন কষ্টের মধ্যে। কিন্তু সেই সব চিন্তা আমার মনকে কত যে শান্তি দিত মা—কান্নায় আমি নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। আর জানু পেতে বসে প্রার্থনা করতাম—সে যেন সুখী হয়—সে যেন সুখে থাকে।'

'আমিই তোমার সেই মেয়ে বাবা।' বলল লুসি কান্না-ভেজা গলায়। 'কাল তুমি আমাকে তেমনি ভাবে আশীর্বাদ ক'রো বাবা।'

'জানিস মা এই সব অতীতের কথা আজ কেন তোকে বলছি? আজ আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, অত দুঃখের পর এই একটি দিনের জন্যে তিনি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজ এই মুহূর্তে আমি যে সুখ পেলাম, মা, জীবনের কোন মুহূর্তে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনা।'

আগামী কালের বিবাহ-অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন মানুষ থাকবে না। থাকবেন লরি। কনের সঙ্গে সহচরী হয়ে যাবে মিস প্রস।

বিয়ের পর বাসা বদলের কোন কারণ রইল না। এই বাড়িরই উপরতলার কয়েকটি ঘর তারা নিয়ে নেওয়াতে স্থান সংকুলানের আর অভাব রইল না।

সে রাতে খাবার টেবিলে ডাক্তার হাসিখুশি ছিলেন। সেদিন চার্লস আসেনি। ওরা তিনজনে বসল। আজ তাদের সঙ্গে মিস প্রসও যোগ দিয়েছেন।

আহার শেষ হবার পর শুভরাত্রি জানিয়ে লুসি বাবাকে শোবার ঘরে পাঠাল।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে লুসি ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। একটা অজানা ভয় তার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

বাবার ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করল সে। ঘরে যেখানকার যেটি, সেটি ঠিক সেখানেই আছে। ঘরের ভিতরে পরিপূর্ণ শান্তি।

ডাক্তার ঘুমোচ্ছেন। বালিশের উপর শুভ্র মাথাটি ছবির মতো দেখাচ্ছে। একটি হাত বিছানার উপর ফেলা।

লুসি বাতিটি একটু দূরে রাখল। তার পর মৃদুপায়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিচু হয়ে সে তার বাবার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল। গভীর মমতায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

সেই সুন্দর মুখে দীর্ঘ বন্দী-জীবনের ঝড় ছাপ ফেলে গেছে। কিন্তু তার অমিত আত্মা সেই ঝড়ে অপরাজিত থেকে গেছে। মুখে একটি আশ্চর্য হার-না-মানা ভাব পরিস্ফুট হয়ে আছে।

খুব কোমল হাতে বাবার বুকে সে হাত রাখল। মনে মনে প্রার্থনা করল এতদিন যেমন কেটেছে তেমনি ভাবেই সে যেন তার নতুন জীবনেও তাঁর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ থাকে।

এই মানুষটির দুঃখ-জীর্ণ জীবনে তার মমতা যেন অবিচল থাকে। ধীরে ধীরে লুসি উপরে উঠে গেল।

পরদিন সূর্য উঠল। তাদের সেই প্রিয় গাছটির পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো-ছায়া ঝিকিমিকি খেলতে লাগল সেই ঘুমন্ত মুখে। লুসি যেমন নিঃশব্দে প্রার্থনা করেছিল তেমনই নিঃশব্দে সেই আলোছায়া কাঁপতে লাগল।

১৮ উৎকণ্ঠিত দিনরাত্রি

বিবাহের দিনটি রৌদ্র ঝলমল।

ঘরের ভিতরে ডাক্তার কথা বলছিলেন চার্লস ডার্নের সঙ্গে। বাইরে এরা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। গির্জায় যাবার জন্যে সবাই তৈরি।

সুন্দরী ভাবী বধূর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস প্রস আর লরি।

মিস প্রসের কাছে এ ঘটনাটি অনিবার্য বাস্তব। মেয়েমানুষ হিসেবে সে জানত যে একদিন তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই তরুণী মেয়েটি শ্বশুরঘর করতে যাবে আর সেদিন তাদের ঘটবে বিচ্ছেদ—তার জন্য নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করে রেখেছিল প্রস। কিন্তু তার সব থেকে আনন্দ হত যদি আজ তার ভাই সলোমন এই বিবাহে বর রূপে উপস্থিত হতে পারত।

লরি আজ প্রসন্ন মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিয়ের সাজে সজ্জিতা লুসিকে ঘুরে ঘুরে তিনি দেখছেন। দেখে তাঁর যেন আর তৃপ্তি হচ্ছে না।

পরম স্নেহভরে বললেন লরি, 'লুসি মা, আজকের এই দিনটির জন্যে বোধ করি ফ্রান্স থেকে চ্যানেল পার হয়ে এই দেশে এনেছিলাম তোমায়। সেদিন কি আমি জানতাম যে মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় কি পুণ্যের কাজ আমি করছি। বন্ধু চার্লসের হাতে কি সুন্দর একটি বস্তু আমি অর্পণ করছি।'

তার কথায় মিস প্রস মন্তব্য করল, 'এটা এমন কিছু বড় কাজ হচ্ছে না। বিশেষ করে ঐ লোকটির কথা ভাবলে।'

স্বভাব-স্নিগ্ধ লরি বললেন, 'ঠিকই বলেছ প্রস। কিন্তু এ শুভদিনে তুমি কাঁদছ কেন?'

'আমি কাঁদিনি,' বলল প্রস—'কাঁদছেন আপনি।'

'আমি—সে কি?'

প্রস জিদ করে বলল, 'আমি দেখলুম আপনি এখুনি কাঁদছিলেন। আর তাতে আশ্চর্য হবারই-বা কি আছে। যে সুন্দর উপহার আপনি ওদের জন্যে দিয়েছেন তা দেখলে সকলের চোখে জল এসে যাবে। আমার লুসির জন্যে আপনার এত মমতা কোথায় ছিল?'

লরি বললেন, 'তোমার কথায় আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম প্রস। উপহার বলে যে সামান্য জিনিস আমি দিয়েছি তা আমি গোপনে দিতে চাইনি। তোমরা সবাই দেখবে তাই আমি চাই। জীবনের কোন কোন ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যা পায়নি, তার জন্যে একবার হিসেব-নিকেশ করে। শোন প্রস, ভেবে দেখ দেখি, এই পঞ্চাশ বছর-প্রায় আমার জীবনে একটা মিসেস লরি এল না।'

প্রস বলল, 'দুঃখের কথাই তো।'

'কেন? আমার কি একটা বউ থাকতে পারত না?'

'ধ্যুৎ। আপনি হলেন জন্মআইবুড়ো।'

এই জবাবে মানুষটির মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

বললেন লরি, 'কথাটা নেহাত বাজে বলনি।'

'আর শুধু কি তাই, শৈশবের দোলনায় শোবার আগেই আপনার ভাগ্যে আইবুড়োর লিখন লেখা।'

লরি বললেন, 'তুমি যাই বল, আমার সঙ্গে ভাগ্য অকরুণ ব্যবহার করেছে এ-কথা আমি বলতে বাধ্য। যেখানে আমার ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল সেখানকার সেই মিটিং-এ আমাকে ডাকা উচিত ছিল।'

লুসিকে কাছে টেনে নিলেন লরি। তার কোমরে বাহু জড়িয়ে কোমল গলায় বললেন, 'মা লুসি, এখানে শুধু আমি আর প্রস রয়েছি। আর দু'জনে ঘরের ভিতর কথা বলছেন। এই অবসরে তোমার শোনা উচিত এমন কিছু কথা যা আমি তোমায় জানাব। তোমার বাবাকে ছেড়ে তুমি যাবে, কিন্তু যার তত্ত্বাবধানে তাকে দিচ্ছ সে পরম নিষ্ঠায় তা পালন করবে। তাঁর কোন অযত্ন হবে না। এক পক্ষকাল বাদে উনি এসে তোমার স্বামীর সঙ্গে আবার একত্রিত হবেন। ওরা বোধ হয় বাইরে আসছেন। তোমার এই বুড়ো সংসারহীন শুভাকাঙ্ক্ষীর আশীর্বাদ নাও মা।'

একটি মুহূর্ত লুসির সুন্দর মুখখানি তুলে ধরলেন লরি। তার কপালের সেই পরিচিত ভঙ্গিটির জন্যে তাকিয়ে রইলেন, তার পর পরম স্নেহে নিজের মাথাটি স্পর্শ করলেন লুসির সোনালী চুলে।

এই সব হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ যদি সেকেলে-ফ্যাশান হয়, তবে তা বুঝি সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই চলে আসছে।

ডাক্তারের ঘরের দরজা খুলে গেল।

চার্লস ডার্নের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার।

তার মুখে মৃত্যুর বিবর্ণতা—এতটুকু রঙ নেই সেই মুখে। কিন্তু যখন ভিতরে গিয়েছিলেন তখন এমন ছিল না। তার আচরণে খুব একটা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। কিন্তু লরির অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে মানুষটির ভিতরে একটা ভয়, একটা অসহায় ভাব যেন ভর করেছে।

মেয়ের বাহুমূলে হাত দিয়ে তিনি তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন।

আজকের বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে লরি বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। বাকি সকলে অন্য একটি গাড়িতে গেলেন।

কাছেই গির্জা। সেখানে লোকজনের ভিড় নেই।

সেই পরম শুভ লগ্নে চার্লস ডার্নে এবং লুসি ম্যানেত শুভ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

উপস্থিত ক'টি নরনারীর চোখে হাসির অন্তরালে অনেক আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ল।

লরি তার জামার ভিতর-পকেট থেকে কিছু হীরার আংটি ও অলংকার নববধূকে উপহার দিলেন।

প্রাতরাশের জন্যে সবাই বাড়ি ফিরলেন।

আজকের এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান শান্তিতে সমাপ্ত হ'ল।

একদিন প্যারিসের একটি অন্ধকার কক্ষে একটি হতভাগ্য জুতো তৈরির কারিগরের শুভ্র কেশে একটি তরুণী মেয়ের সোনার চুল একসঙ্গে মিশেছিল। আজ এই প্রসন্ন সকালের সূর্যালোকে গৃহের দ্বারপ্রান্তে বিদায়-লগ্নে অশ্রুসজল বৃদ্ধ পিতার শুভ্র কেশে তেমনিই পরম আবেগে স্পর্শ করল নববধূর সোনালী চুল।

মেয়েকে নানা ভাবে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ। শেষে তার দুটি বাহুর আকুল বেষ্টনী থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ডাক্তার কান্না-ভেজা গলায় বললেন, 'চার্লস, তুমি একে নাও। আজ থেকে ও তোমার।'

গাড়ির জানালা থেকে দুটি হাত নেড়ে বিদায় জানাল লুসি। তার পর এক সময় বর-কনেকে নিয়ে গাড়ি চোখের আড়াল হয়ে গেল।

পিছনে পড়ে রইলেন ডাক্তার, লরি আর মিস প্রস। পুরোনো পরিচিত ঘরে ফিরে লরি প্রথমে লক্ষ্য করলেন ডাক্তারের চেহারায় এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যে কোমল বাহু দুটি এতক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি, যাবার বেলায় সেই হাত বুঝি বিষাক্ত তীর মেরে গেছে তাঁকে।

হৃদয়ের যে-আবেগকে দমন করে রেখেছিলেন এতক্ষণ, এবার তার বাঁধন শিথিল হয়ে গেল। আবার ফিরে এল মুখে সেই আত্মহারা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টিকেই ভয় করেন লরি। যেন কত অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে ক্লান্ত দেহটাকে সিঁড়ি ভেঙে টেনে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। লরির মনে পড়ল পুরোনো স্মৃতি।

দ্যফর্জের মদের দোকান—আর সেই সিঁড়ি।

লরি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিস প্রসকে বললেন, 'আমার মনে হয়, এখন ওঁর সঙ্গে কথা বলা বা ওঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। এখুনি ব্যাঙ্কে যেতে হবে—শীগগির ফিরে আসব। তার পর ওঁকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া যাবে কোন গ্রামে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হবে। তাতে ওর মনটা হালকা হয়ে যাবে।'

ব্যাঙ্কে ঘণ্টা দুয়েক দেরি হল লরির। ফিরে পুরোনো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন একেবারে ডাক্তারের ঘরে। চাপা ঠুক-ঠুক শব্দ কানে আসতে চমকে উঠলেন তিনি।

'এ কি? কিসের শব্দ?'

ভয়ার্ত মুখে মিস প্রস হাত কচলাতে-কচলাতে এসে দাঁড়াল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। লুসিকে আমি কি বলব? ডাক্তার আমাকে চিনতে পারছেন না। আবার জুতো তৈরি করতে বসেছেন।'

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে লরি ডাক্তারের ঘরে ঢুকলেন। বেঞ্চিটাকে আলোর ধারে টেনে নিয়ে মাথা নিচু করে ডাক্তার কাজে মগ্ন হয়ে আছেন। সেই পুরোনো চেহারা—মুখের সেই বিবর্ণ জীর্ণ ভাব, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

'ডাক্তার ম্যানেত?'

মুহূর্তের জন্য ডাক্তার মুখ তুলে তাকালেন। ঈষৎ ক্রুদ্ধ, ঈষৎ চমকিত ভাব। গায়ে কোট নেই। শুধু শার্টটি গলার কাছে খোলা। সেই পুরোনো বিবর্ণ চেহারা। এক পাটি জুতো হাতে তুলে নিয়ে লরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কার?'

'একটি মেয়ের। বাইরে পরবার জুতো—' মুখ না তুলেই বিড়বিড় করে বলে গেলেন ডাক্তার, 'অনেক আগেই এটি তৈরি শেষ হওয়া উচিত ছিল।'

'ডাক্তার ম্যানেত, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখুন?'

কাজ না থামিয়ে ডাক্তার যন্ত্র-চালিতের মতোই মুখ তুলে তাকালেন।

'ভালো করে চেয়ে দেখুন তো। আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন না? ভাবুন না—এ তো আপনার কাজ নয়—আপনি তো ডাক্তার—'

কিন্তু কোনমতেই আর তাঁকে দিয়ে কথা বলাতে পারলেন না লরি। শুধু বার বার নির্বাক চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন ডাক্তার।

একটি মাত্র আশার আলো দেখতে পেলেন লরি। ডাক্তার যতবার মুখ তুলে তাকাচ্ছিলেন, সে-মুখে কেমন একটা হতবুদ্ধি কৌতূহলের ক্ষীণ আলোক ঝিকমিক করছিল। যেন কি-একটা বোঝাপড়া চলছে মনের সঙ্গে। যেন একরাশ সংশয় তাঁর মনে তোলপাড় করছে। কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না।

এ-কথা লুসি যেন না জানতে পারে। বড় দুঃখ পাবে সে। ডাক্তারকে যারা জানে

তাদেরও জানতে দেওয়া হবে না। মিস প্রসকে সাবধান করে দিলেন, কেউ দেখা করতে এলে যেন বলে দেওয়া হয় ডাক্তার অসুস্থ। কয়েকদিন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার তাঁর। প্রস লুসিকে লিখল ডাক্তার রুগী দেখতে বাইরে গেছেন। সেই চিঠিতেই নিজের হাতে লরি তাড়াতাড়ি দু-তিন ছত্র সেই রকম লিখে দিলেন। ডাক্তার ক্রমশ প্রকৃতিস্থ হবেন এই আশায় লরি সব দিক বাঁচিয়ে ব্যবস্থা করলেন।

লরি আশা করে রইলেন যে ডাক্তার দ্রুত নিজেকে ফিরে পাবেন। যদি তাই হয় তবে তিনি আর একটি পন্থা অবলম্বন করবেন। ডাক্তারের এই অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যেমন ভালো বুঝবেন সেই রকম একটা মতামত নেবেন।

তাঁর নিরাময়ের প্রত্যাশায় লরি স্থির করলেন যে তিনি নিজেই মনোযোগের সঙ্গে ডাক্তারের সতর্ক প্রহরায় থাকবেন। এমন ভাবে সে-দায়িত্ব পালন করবেন যাতে ডাক্তার বিরক্ত না হন।

সেই কর্তব্যের প্রয়োজনে টেলসন ব্যাঙ্ক থেকে তিনি ছুটির ব্যবস্থা করলেন। জীবনে এই প্রথম তিনি ছুটি নিলেন।

ডাক্তারের ঘরের ভিতরেই জানালার ধারে তিনি প্রহরায় বসলেন।

লরি একটি নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলেন। দেখলেন যে মানুষটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা নিরর্থক। বেশি চাপাচাপি করলে তিনি দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন।

প্রথম দিনেই লরি সে-চেষ্টায় ক্ষান্ত হলেন। ঠিক করলেন যে নিজেকে ডাক্তারের চোখের সামনেই রাখবেন। যাতে নিজের মিথ্যা বিভ্রান্তির ভিতর থেকে বাস্তবের আলো দেখতে পান তিনি।

সেইখানে জানালার ধারে বসে লরি লেখাপড়া করতে লাগলেন। আর এমন চলাফেরা করতে লাগলেন যেন কোথাও কোন গোলযোগ নেই। সব স্বাভাবিক ভাবেই চলছে।

যা খেতে দেওয়া হয় তাই মুখে তোলেন ডাক্তার। প্রথম দিন তিনি কাজ করলেন যতক্ষণ না অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে উঠে যখন দাঁড়ালেন তখন ভোরের আলো ফুটেছে।

'বাইরে যাবেন?'

পুরনো দিনের মতো মেঝের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তার—পুরনো দিনের মতোই চোখ তুলে তাকালেন—পুরনো দিনের মতই নিচু-গলায় বললেন—'বাইরে?'

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবেন? চলুন।'

সে কথার আর জবাব পেলেন না। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে জুতো তৈরির বেঞ্চিতে ঝুঁকে পড়ে, হাঁটুতে কনুই রেখে, হাতের মধ্যে মাথা চেপে নিঃশব্দে বসে রইলেন মানুষটি। তাঁর এই মোহাচ্ছন্ন আচরণে লরির মনে হল ডাক্তার যেন নিজেকে প্রশ্ন করছেন, —'কেন নয়?' লরি ভাবলেন যদি তাঁর মনের ঘোর ক্ষণিকের জন্য কাটে তবে ভয় নেই। সেই চেষ্টাই করে যাবেন তিনি।

মিস প্রস আর লরি দু'জনে ভাগাভাগি করে রাত জেগে পাশের ঘর থেকে তাঁর উপর নজর রাখবেন ঠিক করলেন। ঘুমনোর আগে ডাক্তার অনেকক্ষণ ঘরে পায়চারি করলেন বটে, কিন্তু শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার কাজ নিয়ে বসলেন নিজের।

দ্বিতীয় দিন লরি স্মিত মুখে নমস্কার করলেন ডাক্তারকে। পরিচিত বিষয় নিয়ে আলাপের সূত্রপাত করতে চেষ্টা করলেন। ডাক্তার কোন উত্তর দিলেন না বটে কিন্তু কথাগুলো যে তাঁর কানে গিয়েছে, মনের মধ্যে এলোমেলো ভাবে তা নিয়ে তোলপাড় চলছে তা স্পষ্ট বুঝলেন লরি। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লরি মিস প্রসকে অনেক বার ঘরে ডেকে এনে নানা গল্প করলেন—মাঝেমাঝে লুসি আর তার বাবাকে নিয়েও

অনেক কথা বললেন। সেই কথার টুকরো মাঝেমাঝে ডাক্তারের ধ্যান ভঙ্গ করছিল— সচকিত হয়ে ডাক্তার তাকাচ্ছিলেন তাদের দিকে। তাঁর মনে যে বিভ্রান্তি সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিলেন যেন।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে লরি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইরে যাবেন ডাক্তার?'

'বাইরে?'

'হ্যাঁ! বাইরে বেড়াতে। চলুন না?'

কোন উত্তর না পেয়ে লরি যেন তার মনে দাগ কাটবার জন্যেই এক ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন ডাক্তার জানালার ধারে বসে আছেন, তাকিয়ে দেখছেন বাগানের সেই গাছটির দিকে যার ছায়ায় তাদের নিত্য বসা হত। লরি ঘরে ঢুকতেই চকিতে সরে এলেন নিজের আসনে।

সময়ের চাকা শামুকের গতিতে এগিয়ে চলে। তৃতীয় দিনও এল গেল। দিনে দিনে ন-দিন পার হল।

দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটতে লাগল লরির। তবু এইটুকু সান্ত্বনা যে লুসি সুখে আছে। সে কিছু জানে না। শুধু লরি দেখলেন সেই দুটি হাত ন-দিনের দিন সন্ধ্যায় কত কুশলী হয়ে উঠেছে—কাজ করছেন কি গভীর আগ্রহ নিয়ে।

আশা দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। তাঁর বুকের ভিতর বেদনায় ভারী হয়ে উঠছে।

১৯ পরামর্শ

সতর্ক সৈনিকের মত অতন্দ্র প্রহরায় এ কদিন কাটাচ্ছিলেন লরি। গত ন'দিন একটানা উদ্বিগ্ন রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত শরীরে আজ ভোরের দিকে কখন লরির দুটি চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখলেন সারা ঘর রোদে ভরে গিয়েছে।

চোখ মুছে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু চোখ চেয়ে যা দেখলেন স্বপ্নের চেয়ে তা কম অবিশ্বাস্য নয়। একবার সন্দেহ হল বুঝি তিনি এখনও ঘুমোচ্ছেন। কেন না ডাক্তারের ঘরে গিয়ে দেখলেন তার জুতো তৈরির জিনিসপত্তর সব সরানো, জানালার কাছে চেয়ারে বসে ডাক্তার অভ্যাস মতো বই পড়ছেন। অলক্ষিত থেকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করলেন লরি, দেখলেন ডাক্তারের মুখে-চোখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। সারা চেহারায় আর-কোন খুঁত নেই। না পোশাকে না ভঙ্গিতে। গত কালের মানুষটিকে যেন মনেই পড়ে না। কেন এ পরিবর্তন তাও বুঝলেন না তিনি।

এতক্ষণে লরির নিজের বিভ্রম জন্মাল। তবে কি এ ক'দিনের অভিজ্ঞতা সমস্ত দুঃস্বপ্ন? এই তো কিছুক্ষণ মাত্র আগে লরি সতর্ক প্রহরায় বসেছিলেন, যেমন বসে এসেছেন গত কয়েকদিন। দেখেছেন ডাক্তারকে সেই অবিন্যস্ত চেহারায়—সেই দুর্ভাগ্য-জনক কাজে।

দুঃস্বপ্নই-বা হবে কি করে? দুঃস্বপ্ন হলে ডাক্তারের ঘরের বাইরে সোফায় রাত্রি-যাপন করতে যাবেন কেন লরি? ডাক্তারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এই সকালবেলা তার এমন হতবুদ্ধি দশা কেন হবে?

নানা কথা ভাবছেন এমন সময় মিস প্রস কাছে এসে দাঁড়াল। সে-ও ডাক্তারের এই অচিন্তানীয় পরিবর্তনের কথা জানাল বিস্মিত কণ্ঠে। শুনে লরির মনের সকল দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটল। কিন্তু ডাক্তারকে এখনও সযত্নে তদারক করতে হবে। সকালের আহারের টেবিলে বসার আগে তাঁকে বিরক্ত করবেন না মনস্থ করলেন লরি। ভাবলেন

যদি সব ভালোয় ভালোয় চলে তবে ডাক্তারের কাছেই মতামতের জন্যে তিনি তাঁর বিষয়টি উপস্থাপিত করবেন সযত্নে।

খেতে বসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই লুসির বিয়ের কথা পাড়লেন লরি। এমন ভাবে বললেন যেন মাত্র গতকাল বিয়ে হয়েছে। ডাক্তার সে কথায় যোগ দিলেন পরম আগ্রহে, কেবল দিনের গোলমাল নিয়ে তিনি যেন কিছুটা দ্বিধায় পড়েছেন—সেটুকু গোপন রইল না লরির কাছে। কিন্তু ডাক্তারের সমস্ত ব্যক্তিত্বে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতার পরিচয় নেই। সবই সহজ সরল।

মিস প্রসের সঙ্গে নিচু গলায় আলোচনা করে নিলেন লরি।

সকালবেলার আকস্মিক ঘটনাবলীর পর এখন যেন কুয়াশা অনেক কেটে গেছে। লরির মনও চিন্তামুক্ত হয়েছে। এখন সহজভাবে হয়ত অনেক কথা বলা যাবে ডাক্তারকে।

অবশ্য যথাসাধ্য সতর্কতার সঙ্গেই এগোতে হবে তাঁকে।

প্রাতরাশ শেষ হল। খাবার টেবিল পরিষ্কার করার পর দুজনে নিরালা হলেন। তখন সেই শান্তির সুযোগ নিলেন লরি।

কণ্ঠে আবেগ এনে বললেন, 'ডাক্তার ম্যানেত, একটি বিশেষ বিষয়ে আমি গোপনে আপনার মতামত জানতে চাই। ব্যাপারটায় আমার নিজের খুবই আগ্রহ—বলতে গেলে খুবই কৌতূহল। আপনার মতামত পেলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হই।'

নিজের দুটি-হাতের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন ডাক্তার। দুটি করতলই যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কি কারণ তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলে যেন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিলেন তিনি।

তবু সাগ্রহে লরির কথা শুনতে লাগলেন তিনি।

ডাক্তারের বাহুতে পরম প্রীতিতে হাত দিলেন লরি।

বললেন, 'এটা আমার এক বিশেষ বন্ধুর বিশেষ ব্যাপার। আপনি ভালো করে শুনে আমায় যা উপদেশ দেবার দিন। তাঁর জন্যে তো বটেই—তাঁর মেয়ের মঙ্গলের কথা ভেবে আপনি আমাদের সাহায্য করুন ডাক্তার।'

'আমার মনে হচ্ছে', বললেন ডাক্তার—'কোন রকম মানসিক আঘাত পেয়েছেন বোধ হয়—?'

'হ্যাঁ—'

'আপনি সব কথা খুলে বলুন আমায়—কোন-কিছুই গোপন করবেন না।'

লরি দেখলেন যে ডাক্তার পরিপূর্ণ চেতনায় অবস্থান করছেন। কোথাও কোন অসুবিধার কারণ নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে লরি আপন বক্তব্য রাখলেন।

'ডাক্তার ম্যানেত—এ কেস হল দীর্ঘকালে ব্যাপ্ত মানে খুব পুরনো। একটি স্নেহ-ভালোবাসার—তাঁর অনুভূতির ওপর কঠিন আঘাত অর্থাৎ আপনারা যেভাবে বলেন একটা মানুষের সমস্ত মনের উপর, বলতে গেলে তার চেতনার ওপর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। আমি কি বলছি ডাক্তার—মানুষের মন। সেই মনে একটা প্রচণ্ড চাপ দীর্ঘকাল তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি নিজেও জানেন না কতকাল! কেন না তাঁর জীবন থেকে সময়ের সব হিসেব মুছে গেছে, তাকে হিসেব করাও আর অন্য উপায়ে সম্ভবপর নয়। বস্তুতপক্ষে মানুষটি যখন সেই আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, কিভাবে সেটা ঘটেছিল তিনি ঠিক ভাবে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন না। একদিন নানা কথার মধ্যে তাঁকে অদ্ভুত মর্মস্পর্শী-ভাবে সেই বর্ণনা দিতে শুনেছি। আপনি জানেন না ডাক্তার, সেই ধাক্কা থেকে সুস্থ হয়ে উঠে তিনি এখন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। আজ তাঁকে দেখে লোকে বলবে সমাজের এক বিদগ্ধ মানুষ। উন্নত মানসিকতার পরিচয় তাঁর চিন্তায়। শরীর

সবল, কর্মঠ। পণ্ডিত মানুষটি তীব্র অধ্যবসায়ের দ্বারা অবিরতই তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা নয়। অসুবিধা হচ্ছে—।'

লরি একটু থামলেন। লম্বা একটি নিশ্বাস নিলেন। তার পর খুব ধীরে ধীরে আবার বললেন, 'অসুবিধা হচ্ছে ডাক্তার, সেই মানুষটির দুর্ভাগ্যক্রমে সামান্য একটু পুনরাক্রমণ হয়েছে। সেই আঘাতে আচ্ছন্নতা—'

ডাক্তার সাগ্রহে শুনছিলেন। এখন নিম্নস্বরে বললেন, 'এ পুনরাক্রমণ কতদিন ছিল?'

'ন-দিন ন-রাত্রি।'

'কিন্তু আক্রমণের লক্ষণ কি ছিল? আমার মনে হয়—' চকিতে একবার নিজের দুই করতলের দিকে যেন তাকিয়ে দেখলেন ডাক্তার। তার পর বললেন, 'অসুস্থ থাকার সময় কোন-একটা কাজের খেয়ালে ব্যস্ত ছিলেন—এখন সেই জিনিস কি আবার ফিরে এসেছিল?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তার—।'

'পুনরাক্রমণের সময় তাঁর ব্যক্তিত্বে ভঙ্গিমায় ব্যবহারে সব কি আগের মতো হয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ—ডাক্তার। ঠিক তাই হয়েছিল।'

'সেই মানুষটির এক মেয়ের কথা আপনি বলেছিলেন। তিনি কি সে-কথা জেনেছেন?'

'না। সে-কথা তাঁর কাছ থেকে গোপন করা হয়েছে। আর চিরকাল গোপন করাই থাকবে। এসব কথা শুধু আমি জানি আর একজন জানে যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়।'

লরির হাত দুটো ধরে নিলেন ডাক্তার।

ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার সহৃদয়তার শেষ নেই। বড় বিবেচনার কাজ করেছেন।'

লরি ডাক্তারের হাত নিজের করতলের মধ্যে ধরে নিলেন।

তার পর অনেকক্ষণ কাটল নিঃশব্দে।

লরি অবশ্য এইখানেই আলোচনার শেষ করতে চাইলেন না।

বললেন, 'ডাক্তার, আমি ব্যাংকের মানুষ। টাকা-কড়ি-ব্যবসা-বিষয়পত্তর বুঝি। এই সব কঠিন সমস্যার সমাধান আমার ক্ষমতার অতীত। কি ধরনের সংবাদ আপনার প্রয়োজন তা আমার জানা নেই। মানুষের মন আমার বুদ্ধির অগোচর। আমি আপনার উপদেশ ও নির্দেশ চাই।'

তার পর আবার খানিক থেমে বললেন, 'এ সংসারে এমন আর কেউ নেই যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি আমি। আপনি ছাড়া আর আমার কেউ নেই। আপনি আমায় বলুন এই পুনরাক্রমণ কেন হল? আবার কি সে ভয় আছে? আর যদি বা থাকে তবে তা প্রতিরোধ করার উপায় কি? বার বার এভাবে হলে কি প্রতিকার আমি করব? আমার এই বন্ধুটির কিছুমাত্র উপকার করতে পারলে নিজেকে আমি কৃতার্থ মনে করব। কিন্তু কি করে যে আমি সফল হব তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না। আপনার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আর বিচক্ষণতা আমাকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারবে। আমি তো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমার দ্বারা কিছুই তো করা সম্ভব নয়।'

লরি এক নিশ্বাসে অনেকখানি বলে একটু চুপ করলেন।

তার পর আবার অনুনয়ের সুরে বললেন, 'আপনি খোলাখুলি আমার সঙ্গে আলোচনা করুন। এই বিপদে আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি আমাকে পথ নির্দেশ করুন। কি করে আমি তার উপকারে লাগব আমায় শিখিয়ে দিন।'

লরির এই মিনতি-ভরা কথাগুলো শুনতে শুনতে ডাক্তার যেন আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁকে নীরব দেখে লরিও চুপ করে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে যেন কষ্ট করেই বললেন ডাক্তার, 'আমার মনে হয় যেভাবে পুনরাক্রমণ হয়েছে সে-বিষয়ে আপনার বন্ধু তাঁর মনের ভিতর আগেই সংকেত পেয়েছিলেন।'

লরি সাহস করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ভয় কি তাঁর ছিল?'

ডাক্তারের সারা শরীর ঈষৎ কম্পিত হল।

'এ-ভয় তাঁর ছিল। আপনি জানেন না, এই ধরনের আঘাতে যারা একবার ভুগেছে তাদের মনের ভিতর কিভাবে আতঙ্ক জমাট বেঁধে থাকে। যে-বিষয়ে তার মন সর্বদা যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয় সেই কথা লোকসমক্ষে আলোচনা করা তার পক্ষে খুবই কঠিন। বোধ করি অসম্ভব।'

লরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'যখন তার মনের ভিতর পুনরাক্রমণের আতঙ্ক প্রবল হয়ে উঠবে তখন যদি কোন প্রিয়জনের কাছে সে-কথা প্রকাশ করে বলে, তবে কি সে আতঙ্ক-মুক্ত হতে পারে?'

'আমার তো মনে হয় তাই। কিন্তু আমি আপনাকে তো বললাম এ প্রায় অসম্ভব। আর প্রায়ই বা বলি কেন, একেবারেই অসম্ভব।'

আবার অনেকক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে বসে রইলেন।

লরি আবার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কারণটা আপনি আমাকে এখনও বলেন নি।'

'আমি বিশ্বাস করি', বললেন ডাক্তার, 'যখন রোগের সূত্রপাত হয়েছিল তখন যেসব চিন্তা, যেসব স্মৃতি তাঁর মনকে বিচলিত করত সেই সব চিন্তা তেমনি ধারা সব স্মৃতি তাঁর মনে পুনরুত্থিত হয়েছিল। আর তারই ফলে এই রোগের প্রত্যাবর্তন। খুব দুঃখজনক কোন পরিস্থিতি তাঁর মনকে অতীতের কোন-এক ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। হতে পারে সে পুরনো দিনের দুঃখের পুনরাবৃত্তির আতঙ্ক কোন-একটা ঘটনায় পুনরায় জাগ্রত হয়েছিল। হয়ত নিজেকে সামলাবার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। হয়ত সেই চেষ্টায় মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল।'

লরি একটু ইতস্তত করলেন।

তার পর সতর্কভাবে প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর কি এ-সব মনে থাকবে?'

ডাক্তারের চোখে একটা অসহায় আর্তভাব।

সারা ঘরে একবার তাকিয়ে দেখলেন ডাক্তার। নীরবে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'কিছুই থাকবে না।'

'আর ভবিষ্যতের কথা কিছু বলুন।'

এখন তাঁর সেই চোখের ভাব কেটে গেছে। অনেকখানি প্রশান্তি এসেছে দৃষ্টিতে। 'ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে আমি বরং আশাবাদী। এত অল্প সময়ের মধ্যে যখন এই আক্রমণের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, ঈশ্বরের দয়ায় তাঁর ভবিষ্যৎ বিপদ-মুক্ত। জটিল একটা কিছু পরিস্থিতি বহুকাল ধরে একটা অস্পষ্ট অদৃশ্য ভবিতব্য তাঁর মনকে আতঙ্ক-গ্রস্ত করে তুলেছিল। যাই হোক মেঘ যখন কেটে গেছে তখন আশা করা যায় ভবিষ্যতের বিপদও কেটেছে।'

'আপনি আমায় নিশ্চিন্ত করলেন ডাক্তার। কি বলে আপনাকে আমি ধন্যবাদ যে দেব!'

ডাক্তারও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নিচু করলেন। বললেন, 'আমারও কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।'

লরি পুনরায় বললেন, 'আপনি যদি অনুমতি করেন আর দু'টি কথা আমি আপনার কাছে জেনে নিতে চাই।'

ডাক্তার সাগ্রহে আবার তার হাতটি ধরলেন।

বললেন, 'আপনার বন্ধুর যাতে উপকার হয় তার জন্য আপনি সব রকম চেষ্টাই তো করছেন।'

এবার লরি ব্যক্তিগত দিক থেকে সেই মানুষটির বর্তমান কার্যধারার একটি ছবি তুলে ধরতে চাইলেন।

'আমার সেই বন্ধু খুব পরিশ্রমী। তাঁর কর্মক্ষমতা অসীম। তাঁর ব্যবসায়িক জ্ঞান বাড়ানোর জন্যে তিনি কোন যত্নের ত্রুটি করেন না। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অবসর সময়েও প্রচুর লেখা-পড়া করেন। এত অতিরিক্ত পরিশ্রম কি তাঁর পক্ষে ভালো?'

'আমার মনে হয় এত পরিশ্রম করা তাঁর পক্ষে ভালো নয়। কিন্তু সর্বদা নিজের মনকে কাজের ভেতর ডুবিয়ে রাখাই হয়ত-বা তাঁর মানসিক বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে গেছে। নিজের অতীত জীবনকে বিস্মৃত হওয়ার চেষ্টার এ একটা স্বাভাবিক উপায়। হয়ত-বা মানসিক ক্লেশের এইটাই স্বাভাবিক পরিণতি। যতক্ষণ সুস্থ জীবনযাত্রার মধ্যে মন ব্যস্ত হয়ে থাকে ততক্ষণই মঙ্গল। না হলে সেই অস্বাভাবিক অসুস্থ চিন্তাস্রোতের মধ্যে মন আবার দিশেহারা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আমার কি মনে হয় জানেন, এই ভাবে নিজের মনকে, নিজের শরীরকে ব্যস্ত রাখা তাঁর নিজের আবিষ্কার। আত্মরক্ষা করার এ কৌশল অপর কেউ তাঁকে শেখায়নি।'

'তাহলে আপনি বলছেন যে অতি পরিশ্রমে তাঁর কোন ক্ষতি হচ্ছে না।'

'মিষ্টার লরি', বললেন ডাক্তার—'তাঁর মনের একপ্রান্তে যে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল সেটা সামলাবার জন্যে মনের আর-এক প্রান্তে একটা ভার তো দিতেই হবে। নইলে ভারসাম্য থাকবে কি ক'রে?'

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। তার পর লরির প্রশ্নের জবাবে আবার বললেন, 'পরিশ্রম ওঁর কোন ক্ষতি করবে না। আমার তো মনে হয় না কোন ক্ষতি করতে পারে। এখন থেকে একটি ধারাই মাত্র সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে। একমাত্র একটা বিরাট ধাক্কাই তাঁর মনের তন্ত্রীতে অস্বস্তির ঝনঝন তুলতে পারে। এই যা হয়ে গেছে আপনি বলছেন আর যেভাবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন—এরপর সে-তন্ত্রীতে আর প্রচণ্ড ধাক্কার কোন সম্ভাবনা নেই। জীবন এখন থেকে তার স্বচ্ছন্দ গতিতে চলবে।'

মানুষের মন এক কমনীয় সংগঠন। সামান্যমাত্র ধাক্কায় সে কেমনভাবে বিচলিত হতে পারে সে কথা ডাক্তাররা যেমন জানেন অন্য-কোন মানুষের পক্ষে অত নিপুণ ভাবে তা জানা সম্ভবপর নয়।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তার দুঃখভোগ করেছেন অপরিসীম। অবর্ণনীয় সহ্য-ক্ষমতায় ফিরে পেয়েছেন আত্মবিশ্বাস। তাই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোয় সেই হতভাগ্য রোগীর দুঃখের ছবিটি তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন।

লরি যত বেশি আশ্বস্ত হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহিত হবার ভাব প্রকাশ করলেন।

এইবার তিনি তাঁর দ্বিতীয় বিষয় উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত করলেন। যদিও লরি জানেন যে এই বিষয়টি অনেক সংকটপূর্ণ।

রবিবার সন্ধ্যাবেলা প্রসের সঙ্গে তাঁর যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল এবং গত ন'দিন যেসব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সে-সব স্মরণ করে লরি প্রস্তুত হলেন।

'এক সময় আঘাতে আচ্ছন্ন থাকার পরিস্থিতিতে মানুষটি, এই ধরুন লোকটি কামারের কাজে মেতে উঠেছিলেন। একটা হাপর নিয়ে রাতদিন কাজ করতেন। বহুদিন বাদে যখন তাঁর আবার ঐ পুনরাক্রমণ হয় আমি দেখলাম যে মানুষটি আবার সেই হাপর নিয়ে বসেছেন।'

লরি ডাক্তারের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। পুনরায় বললেন, 'ঐ সব পুরনো যন্ত্রপাতি ফেলে দেওয়াই তো ভালো, নয় কি?'

হাত দিয়ে নিজের কপাল ঢাকা দিলেন ডাক্তার। কয়েকবার মাটিতে পা দিয়ে ঠুকলেন। তাঁর সারা শরীরে একটা অস্থিরতা দেখতে পেলেন লরি।

বললেন, 'এই বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে আপনি হয়ত ইতস্তত করছেন। আমি বুঝতে পারছি ডাক্তার—'

ডাক্তার বললেন, 'দেখুন মিস্টার লরি, সেই দুর্ভাগা মানুষটির গভীরতম প্রদেশে কিভাবে সব ঘটছে তা যথাযথ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। সেই একটি কাজ যা তাঁর কাছে সেই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় ছিল, সেটিকে ফিরে পেয়ে মানুষটি যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। আসল কথা কি জানেন, মানুষের মস্তিষ্কের জটিলতা মানুষের হাতের আঙ্গুলে সঞ্চারিত হয়ে সহজ হয়। যে-মানসিক অত্যাচারে তিনি ভুগেছিলেন এই কাজের ভেতরে সেটি ভুলে যাবার পথ পেয়েছিলেন তিনি, তাই বোধ করি ঐ যন্ত্রপাতিগুলো ওঁর জীবনে দারুণ মূল্যবান। তাই এখন যদিও নিজের ওপরে তাঁর বিশ্বাস অনেক দৃঢ় হয়েছে, হয়েছেন আত্মসচেতন, পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তবু একদিন হয়ত প্রয়োজন হলে খুঁজে পাবেন না নিজেকে—এই আতঙ্কে সেই জিনিসগুলোকে ফেলে দেবার চিন্তা তিনি মনেও আনতে পারেন না। হারিয়ে-যাওয়া ছোট ছেলে বোধ করি এমনি আতঙ্কেই শিউরে ওঠে।'

লরি দেখলেন সেই বৃদ্ধের মুখে একটি হারিয়ে-যাওয়া ছোট ছেলের ছবি।

'কিন্তু জিনিসটি যদি চলে যায় তবে কি আতঙ্কও চলে যায় না? ঐ সব যন্ত্রপাতি রাখা মানেই তো আতঙ্কটা জিইয়ে রাখা।'

অনেকক্ষণ ডাক্তার কথা বললেন না।

লরিও বসে রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে।

যখন ডাক্তার কথা বললেন আবেগে তাঁর গলা কাঁপছে। 'কিন্তু ওগুলো যে অনেকদিনের সঙ্গী।'

ডাক্তারের গলার আওয়াজে লরির মনে একটা জোর এল।

তিনি মাথা নেড়ে ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ওগুলো আমি রাখতে দেব না। ও সব আমি জলাঞ্জলি দেব। আপনি আমাকে নির্দেশ দিন, ডাক্তার। তাঁর নিজের জন্যে, তাঁর মেয়ের জন্যে ওগুলো আমি চিরকালের মতো সরিয়ে ফেলতে চাই। আপনি আমায় নির্দেশ দিন।'

ডাক্তারের মনের ভিতরে যে কি সংগ্রাম চলছিল লরি তা প্রত্যক্ষ করলেন।

'তাঁর মেয়ের মঙ্গলের জন্যে আপনাকে আমি ওগুলো সরিয়ে ফেলার প্রস্তাবে সায় দিলাম। কিন্তু একটা কাজ করবেন, তিনি যখন থাকবেন না তখন সরিয়ে দেবেন: তাঁর উপস্থিতিতে সরাবার চেষ্টা করবেন না।'

লরি সে-কথায় সানন্দে সম্মত হলেন।

সেদিনের দীর্ঘ বৈঠক শেষ হল এই দুটি মানুষের মধ্যে।

একটু বেলায় ওঁরা বেরিয়ে গ্রামের দিকে গেলেন। এর ফলে ডাক্তারের শরীর-মনে একটা নবজীবন সঞ্চারিত হল।

আরও তিনটি দিন কাটল। চোদ্দ দিনের মাথায় ডাক্তার গেলেন মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে মিলিত হতে।

ডাক্তারের এই ক'দিনের নৈঃশব্দ্যের কারণ যে লুসিকে জানানো হয়নি, তা লরি তাঁকে আগেই বলেছিলেন। তাই লুসি পিতার অসুখের কোন খবর জানল না।

যেদিন ডাক্তার চলে গেলেন সেই রাতে লরি ডাক্তারের ফেলে-যাওয়া ঘরে ঢুকলেন। বাতি নিয়ে সঙ্গে রইল প্রস। সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে লরি সেই জুতো তৈরির বেঞ্চি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেললেন যন্ত্রপাতি দিয়ে।

মনে হচ্ছিল যেন প্রস বুঝি এক হত্যাকাণ্ডের সহকারিণী। তার বিশাল চেহারায় তাকে মোটেই বেমানান মনে হল না।

লরি দাঁড়িয়ে ব্যবস্থা করলেন যাতে রান্নাঘরের আগুনে কাঠের টুকরোগুলি পুড়ে ছাই হয়। জুতো তৈরির যন্ত্রপাতি চামড়া জুতো সব বাগানে মাটির নিচে কবরস্থ হল।

যখন সব কাজ শেষ হল এই দুই নরনারী এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন কি এক বীভৎস পাপ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

২০ মমতা

ক'দিন পরে স্বামীকে নিয়ে লুসি এল সোহোর বাড়িতে। সিডনি কার্টনই প্রথম মানুষ যিনি তাদের অভিনন্দিত করতে এলেন। তারা আসার কিছু পরেই কার্টন এসে উপস্থিত।

লুসি দেখল মানুষটির কোথাও বদল হয়নি। না চেহারায়, না ব্যবহারে, না তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসে। শুধু ডার্নে দেখল যে আগের সেই বেপরোয়া ভাবের পরিবর্তে একটা প্রশান্তির ভাব এসেছে তাঁর।

একান্ত হওয়া মাত্র ডার্নেকে জানালার ধারে টেনে নিয়ে গেলেন কার্টন যাতে কেউ শুনতে না পায় তাদের কথা। বললেন, 'ডার্নে, আশা করি আমাদের সম্পর্ক হবে বন্ধুর।'

'বন্ধুই তো আছি আমরা।'

'ভদ্রতার খাতিরে এ-রকম বলা উচিত মানি, কিন্তু আমি শুধু ভদ্রতার কথাই বলছি না। আমি যখন বন্ধুত্বের কথা বলি, তখন সে আর কথার কথা থাকে না। আমি সত্যিকার বন্ধু হবার কথা বলছি।'

'কি বোঝাতে চান তবে?' স্বাভাবিক স্নিগ্ধতার সঙ্গে প্রশ্ন করে ডার্নে।

'যা চাই মনে এলেও মুখে বলা সহজ নয়', হেসে উত্তর দিলেন কার্টন, 'তবুও চেষ্টা করে দেখা যাক। মনে পড়ে কি একদিন আমি একটু অস্বাভাবিক রকম মাতাল হয়ে পড়েছিলাম?'

'যেদিন আপনার আমার চেহারার সাদৃশ্যে গোটা আদালত সুদ্ধ লোক অবাক হয়েছিল। সেই দিনই ত আমি মুক্তি পেলাম। সেদিন আপনি খুব বেশি মাতাল হয়েছিলেন বটে।'

'সেই ঘটনার অভিশাপ আমার মনে দুঃসহ পাথরের মতো চেপে আছে। সব সময় কাঁটার মতো খচ-খচ করে বেঁধে। একদিন যখন আমার পৃথিবীর খেলা শেষ হবে—যেদিন বাঁচার মেয়াদ ফুরিয়ে আসবে, সেদিন আমার হিসেব-নিকেশ শেষ করতে হবে আমাকেই। ভয় পেও না। আমি উপদেশ দিতে শুরু করব না।'

'ভয় পাব কেন? আপনি বলুন। আপনার আন্তরিকতা আমার ভালোই লাগে।'

কার্টন হাতটাকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'সেদিনের সেই মাতাল-মুহূর্তে তোমাকে একটুও পছন্দ হয়নি আমার। বরং অসহ্যই মনে হয়েছিল। আশা করি, ভুলে যাবে সেদিনের কথা।'

'কবে ভুলে গেছি।'

'আবার সেই মুখের ভদ্রতা! ভুলে যাওয়া অত সহজ নয় ভাই। আমি একটুও ভুলিনি সেদিনের কথা। তুমি হালকা করে দিতে চাইলেই তো আমি ভুলে যাব না।'

'আমার উত্তর যদি হালকা মনে হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন আমায়। আমি দিব্যি

করে বলছি, বহু দিন আগেই এ ঘটনা মুছে ফেলেছি মন থেকে। সেদিন আপনি আমার যে মহা উপকার করেছিলেন তার তুলনায় এ কি অতি তুচ্ছ ঘটনা নয়?'

'তুমি যেটাকে মহা উপকার বলছ, আমি সেটাকে ব্যবসায়ে নিছক হাততালি পাওয়ার কৌশল ছাড়া কিছু মনে করিনি। তোমার কি হবে সে কথা আমি কিছুই ভাবিনি তখন। মনে রেখ ভাই, সে আজকের কথা নয়। সে হল অতীতের ঘটনা।'

'সেদিন আপনি আমায় যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করেছেন আজ এখন হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেও তা নিয়ে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব না আমি।'

'জান তো, আমার ওসব নীতিবোধের বালাই নেই। কোন ভালো কাজ আমি করিনি—করবও না। মানুষের জীবনের সব উচ্চভাব আমার ধাতে পোষায় না। ষ্ট্রিভারকে জিজ্ঞেস করলে সে ঠিক বলে দেবে।'

'করবেন কি না কে বলতে পারে?'

'এ বিষয়ে আমার কথা চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে পার। যদি এই রকম একজন অপদার্থ নির্গুণ মাতালের সময় নেই অসময় নেই বাড়িতে আসা-যাওয়া বরদাস্ত করতে পার, তা হলে আমি এখানে আসা-যাওয়ার বিশেষ অনুমতি চাইব। তোমার সংসারের একটা জীর্ণ অপ্রয়োজনের আসবাবের মতো মনে করো আমায়। মনে করো একদিন সে-জিনিস কোন কাজে লেগেছিল তোমার। তোমার অনুমতির অসম্মান করব না আমি। করলেও হয়ত-বা দু-এক দিন।'

'চেষ্টা করে দেখবেন নাকি?'

'অর্থাৎ আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ধন্যবাদ ভাই।'

সিডনি কার্টন চলে যাওয়ার পর ডার্নে কথা-প্রসঙ্গে তাঁর কথা পাড়ল।

কার্টনকে অবশ্য নিন্দা করার কোন অভিপ্রায় ছিল না তার, কিন্তু সে-সন্ধ্যার আলোচনায় কেউ কার্টনের প্রশংসা করল না। মানুষটা যে অতি বেপরোয়া অসাবধানী সে-সম্বন্ধে কারুরই দ্বিমত ছিল না।

কিন্তু কার্টন সম্বন্ধে এই রূঢ় সমালোচনা, তার সুন্দরী তরুণী বধূর মনে যে কোন রেখাপাত করতে পারে একথা একবারও মনে হয়নি ডার্নের। সবাই চলে গেলে ডার্নে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখল লুসি অপেক্ষা করছে তার জন্যে। তার কপালে চিন্তার কুঞ্চন-রেখা।

'আজ কি ভাবনার রাত নাকি?'

'তাই বটে।'

'কি ব্যাপার?'

'যদি কথা দাও যা জানবে তার অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন করবে না, তাহলে বলি।'

'আমার প্রিয়াকে কথা দিতে পারব না, এমন কি থাকতে পারে আমার?'

ডার্নে হাত দিয়ে লুসির কপোল থেকে সোনালী চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিল।

'আজ কার্টন সম্বন্ধে যা-যা বলেছ তার চেয়ে ঢের বেশি শ্রদ্ধা প্রাপ্য তাঁর।'

'তাই নাকি? কেন বল তো?'

'কেন সেই কথাটি জানতে চেও না। কিন্তু আমি জানি কেন সে-মানুষটি শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।'

'তুমি যদি জেনে থাক তাহলেই যথেষ্ট। তবে আমায় কি করতে বল?'

'আমার একমাত্র অনুরোধ, তাঁর প্রতি যেন ঔদার্যের অভাব না হয় কখনও। তাঁর অবর্তমানে তাঁর দোষ-অপরাধ লঘু করে দেখবে। আমি বলছি তাঁর মতো এত বড় মহৎ অন্তঃকরণ বিরল—সে-অন্তঃকরণের পরিচয় কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাঁর হৃদয়ের কোথাও গভীর ব্যথা লুকনো আছে। সেই ব্যথার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে দেখেছি আমি।'

'তাঁকে কোন মতে দুঃখ দেব এ চিন্তা বেদনাদায়ক আমার কাছে,' বিস্ময়াহত কণ্ঠে বলল ডার্নে, 'তাঁর সম্বন্ধে এ-রকম কোন চিন্তা কখনও আসেনি আমার মনে।'

'ওঁকে হয়ত আর ফেরানো যাবে না। ও'র চরিত্র-সংশোধন বা ও'র ভাগ্যের মোড় ফেরানোর আশা হয়ত সুদূরপরাহত। কিন্তু ঐ মানুষই একদিন সুন্দর কিছু—সত্যিকার মহৎ কিছু করতে পারেন। হয়ত-বা নিজের প্রাণটাও উৎসর্গ করতে পারেন কারুর জন্যে।'

সেই অপ্রিয় মানুষটির প্রতি বিশ্বাসের পবিত্রতায় এত সুন্দর দেখাচ্ছিল লুসিকে যে, তার দিকে চেয়ে ডার্নের মনে হল সে যেন স্বর্গীয় কিছু দেখছে। দেখে দেখে আর তৃপ্তি যেন মিটল না।

স্বামীর আরও কাছে সরে এল লুসি। স্বামীর বুকে হাত রেখে বলল, 'আমাদের কত সুখ আর তাঁর কত দুঃখ!'

স্ত্রীর এই মমতা ডার্নের হৃদয় স্পর্শ করল। বলল, 'এ কথা আমি চিরদিন মনে রাখব—মনে রাখব যত দিন বেঁচে থাকব।'

স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিল ডার্নে।

ডার্নে তার সোনালী চুলে মুখ রাখল। তার নরম রাঙা ঠোঁটে আদর করল। আদরে জড়িয়ে নিল তাকে।

সেই মুহূর্তে নিচে অন্ধকার নির্জন পথে একটি নিঃসঙ্গ পথচারী একটি তরুণী বধূর কণ্ঠের এই মমতা-ভরা কথা যদি শুনতে পেত! যদি দু চোখ ভরে দেখতে পেত কত আদরে সেই মেয়েটির নীল চোখ থেকে মমতার অশ্রু চুম্বনে মুছে দিচ্ছে তার পরম প্রিয় স্বামী, তবে সেই অসাবধানী তৃষ্ণাতুর মানুষটির চোখের জল সেই পথকে সিক্ত করত। জীবনে এই প্রথম—সেই অন্ধকারকে পবিত্র করে তাঁর কণ্ঠে বাজতে থাকত —'যার এত মমতা ঈশ্বর তুমি তাকে আশীর্বাদ করো।'

২১ প্রতিধ্বনিত পদধ্বনি

ডাক্তারের বাড়ির কোণটিতে প্রতিধ্বনি বিরামহীন বাজতে থাকে।

জীবনে বিধাতার আশীর্বাদ ক্ষান্তিহীন ঝরতে থাকে। তার স্বামী, তার বাবা, সে নিজে, মিস প্রস সকলকে নিয়ে লুসির জীবন যেন স্বর্ণ-সূত্রে গাঁথা একখানি মণিহার। যখন হাতের কাজ সারা হয়ে যায়, নিঃসঙ্গ সময় পায় লুসি, অতীত-ভবিষ্যৎ তার মনকে দোলা দেয়। কালের পদধ্বনি শুনতে পায় লুসি।

দিন যায়। নতুন অভিজ্ঞতা আসে জীবনে। শরীর ভারী হয়ে মন্থর হয়ে আসে। অল্প পরিশ্রমে আজ-কাল লুসি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক অজানা জগতের আশা-আনন্দ হাতছানি দেয় তাকে। কখনও ভয় হয় যদি সে মরে যায়। ভাবতেই দুটি ডাগর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সে না থাকলে কে দেখবে শিশুর মতো অসহায় তার বাবাকে। কে সেবা করবে অমন দেবতার মতো স্বামীকে! আবার হৃদয়ে অনাস্বাদিত এক আনন্দের সুদূর অস্ফুট ভাব জাগে।

তার পর একদিন তার মাতৃস্নেহ একটি কুসুম-কোমল শিশুকন্যাকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কন্যা হয় বধূ। বধূ হয় জননী। লুসি মা হয়।

ছোট ছোট পায়ের ধ্বনি ওঠে সারা বাড়িতে। শিশুর কল-কল বকুনিতে মুখর লুসির ভুবন।

মেয়ের পর আর একটি ছেলে হয়। লুসির জীবনে মাধুরী কানায় কানায় ভরে উঠতে

থাকে। স্বামীর কল্যাণে সংসারের কোথাও অভাব নেই। বাবার শরীর ভালো। আর কি চাইবার রইল লুসির!

কিন্তু ভগবানের ইঙ্গিত বোঝা ভার। একদিন যে স্বর্ণ-কুচিটি ভগবান লুসির কোলে দিয়েছিলেন সেই ছেলেটিকে তিনি একদিন ডাকলেন তাঁর স্বর্ণকুঠিতে। মৃত্যুর পাণ্ডুর-আভা-লাগা সেই ফুলের মতো মুখখানির দিকে চেয়ে লুসি তবু বিধাতার প্রতি অপ্রসন্ন-চিত্ত হতে পারল না। মনোহর মৃত্যুর রূপে লুসির মাতৃ-মন একান্তভাবে দেবতার চরণে বিলুণ্ঠিত হল। লুসি দেবতাকেই সমর্পণ করল দেবতার ধন।

আর সেই দিন থেকে লুসির জীবনের শত শব্দ-ঝঙ্কারের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে উঠল তার বাগানের একটি ছোট মৃত্তিকা-স্তূপের নৈঃশব্দ্য। মায়ের কোলের কাছে বসে মেয়ে যখন আবোল-তাবোল বকুনি বকে, যখন পুতুল সাজায়, মায়ের সঙ্গে কথা হয় দুই নগরের ঢঙ মিশিয়ে, তখনও লুসি তাকে ভোলে না। ভুলতে পারে না সেই সোনালী মুখখানি, মাটি যাকে চিরদিনের মতো ছিনিয়ে নিয়েছে মায়ের কোল থেকে।

বছরে বার ছয়েক এ বাড়িতে পা দেন সিডনি কার্টন। আসেন নিমন্ত্রণের কোন বালাই না রেখেই। সন্ধ্যাবেলাটুকু এদের পারিবারিক সাহচর্যে কাটিয়ে যান পুরনো দিনের মতোই। আজকাল যখন তাঁর দেখা পায় লুসি, কার্টনের মুখে মদের গন্ধ বা তপ্ততা থাকে না। তিনি এলেই অতীতের থর-থর ভূমিকার একটা অস্ফুট স্মৃতি লুসির মনকে রোমাঞ্চিত করে। এই মানুষটির জন্য একদিন তার কুমারী-চিত্ত মমতায় বিগলিত হয়েছিল, তা ভোলেনি লুসি। ভুলতে পারে না। কেমন করে জানে না, সিডনি কার্টন এলেই ছেলেমেয়ে তাকে অপরিসীম মমতায় আঁকড়ে ধরে—যেন এই মানুষটির প্রতি দরদে উথলে ওঠে। মেয়েটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ছেলেটিও কম ভালোবাসত না তাঁকে। প্রায় শেষ সময়েও ছেলে কার্টনের কথাই বলেছিল।

এই সংসারের স্বর্ণ-সূত্রে সিডনি যেন অলক্ষ্যে গ্রথিত হয়ে গেছেন একাত্ম হয়ে।

এমনি করে দিন কাটে। হাসি আনন্দে কলরবে স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলায় দোলা-লাগা লুসির মেয়ে বছর ছয়েকের ডাগর হয়ে ওঠে।

বাবার মুখের প্রসন্নতাই লুসির যথেষ্ট পুরস্কার। বিবাহিত মেয়ের কাছে এতখানি যত্ন পাবেন যেন তাঁর স্বপ্নের অতীত ছিল। সে-কথা একদিন নয় অনেকদিন বলেছেন তিনি নিজের মুখে। আর স্বামী! তিনি বলেন, 'একলা তুমি আমাদের সকলকে ঘিরে রয়েছ, তোমাতেই যেন আমাদের সব-কিছু—তুমি কি যাদু জান লুসি?'

সে-কথার আর উত্তর দেয় না লুসি। কিন্তু এই শান্ত জীবনের শত সঙ্গীতের প্রতিধ্বনির মধ্যে যেন অনাগত কালের গহ্বর থেকে ভয়াল প্রতিধ্বনি শুনতে পায় লুসি।

এমনি সময়ে লুসির অশান্তির কারণ ঘটল। নিজের নিভৃত শান্ত সংসারের শত কলরবের মধ্যে লুসি যেন ফরাসী দেশের এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের ভয়াল নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। এক রুষ্ট সমুদ্রের গভীর ক্ষোভ যেন গোঙাচ্ছে। যেন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরির অবরুদ্ধ আক্ষেপ গর্জন করছে ফেটে পড়ার উন্মত্ততায়।

সতের শ' উননব্বই সালের জুলাই মাসের এক গুমট সন্ধ্যায় লরি ব্যাঙ্ক থেকে সোজা এলেন এদের বাড়ি। বাইরে ঝড়ের সংকেত। লুসি ও ডার্নের মাঝখানে বসে লরিও স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে বাইরে তাকিয়ে রইলেন অন্ধকারের দিকে। মনে পড়ল আর একদিন এমনি ঝোড়ো হাওয়ার রাতে তিন জনে এমনি করে বসেছিলেন জানালার ধারে।

'আজ সারা দিন ব্যাঙ্কের এমন কাজের ভিড় পড়েছিল যে ভেবেছিলাম হয়ত-বা আজ আর অরুর বাড়ি ফেরা হবে না', বললেন লরি, 'প্যারিসে বড় গোলমালের সম্ভাবনা।

বহু লোক ভয়ে সব-কিছু ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে সরিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছে। টেলসন ব্যাঙ্কের ভাগ্য ভালো। দেশ-বিদেশে তার সুনামের অভাব নেই।'

'ব্যাপারটা ভালো নয়', বলল ডার্নে।

'ভালো নয়? তা বলতে পার তুমি। তবে আমরা জানি না এর কারণ কি। কিন্তু লোকেরা বড় অবিবেচক। টেলসন ব্যাঙ্কের—আমরা কয়েকজন যারা বুড়ো হয়ে পড়েছি, সঙ্গত কারণ ছাড়া সাধারণ ব্যাপার নিয়ে বিচলিত হই না।'

'তাহলেও আপনি জানেন কত ভয়াবহ-গুরুতর সেখানকার অবস্থা', বলল ডার্নে।

'জানি সে খবর। ডাক্তার ম্যানেত কোথায়?' বললেন লরি।

'এই তাঁর আবির্ভাব হল', বলে ডাক্তার স্বয়ং হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন।

'বাড়িতেই আছেন দেখে স্বস্তি পেলাম। আজ সারা দিন এমন উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে যে, বিনা কারণেই মনটা অস্থির হয়ে আছে। বাইরে যাচ্ছেন?'

'না, না, গল্প করব আপনার সঙ্গে।'

'সেই ভালো', বললেন লরি, 'কি জানি কেন আজ সারাটা দিন মন উতলা হয়ে আছে। বাড়িতে কোন ঝঞ্ঝাট নেই তো, মা লুসি?'

'না।'

'মেয়ে বুঝি ঘুমুচ্ছে!'

'হ্যাঁ। অকাতরে ঘুমুচ্ছে!'

'সেই ভালো। সব নিরাপদ। সব অকাতর। এই রকমই ভালো। নাই-বা হবে কেন বল? চা নিয়ে এসেছ, দাও মা। বস এইখানে আমাদের সঙ্গে। দু-দণ্ড গল্প করি। আর তোমার কল্পনার প্রতিধ্বনি শুনি।'

লণ্ডনের ঝোড়ো আকাশের শব্দময় প্রতিধ্বনির মধ্যে প্যারিসের শত পদধ্বনি উন্দাম বাজতে থাকে। দুই নগরের ঐকতান শুরু হয়।

কোথা দিয়ে কি হয় কেউ বলতে পারে না। একটা অন্ধকার অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে। তার পর শীতার্ত রিক্ত শাখারা যেমন শানিত তরবারির মতো আকাশ বিদ্ধ করতে চায় ঝড়ের তাণ্ডবে, তেমনি করে সেণ্ট আঁতোয়ানের সহস্র বজ্রমুষ্টি আন্দোলিত করল আকাশে। গর্জন করে উঠল জনতা।

কে এত অস্ত্র যোগাচ্ছে জনতার হাতে? এত বোমা বারুদ, এত ছুরি কৃপাণ বর্শা? এত কাঠের ও লোহার ডাণ্ডা? যে অস্ত্র পেল না সে-ও রক্ত-মাখা হাতে দেয়াল ভেঙ্গে ইট-পাথর খসিয়ে নিল। সেণ্ট আঁতোয়ানে দুরন্ত মত্ত ভয়াল জনতার পদধ্বনি উন্মাদ আক্রোশে আছড়ে পড়তে লাগল।

হত্যা ও নেশায় উন্মত্ত জনতা আচম্বিত ঝড়ের মতো ফেটে পড়ল সারা প্যারিসে। কোন্ পথ আর অবারণ রইল না। মাটির গর্জন আছড়ে পড়তে লাগল আকাশে। মৃত্যুর খেলায় দান ফেলতে গিয়ে প্রাণবলি দিতে কেউ নারাজ রইল না।

ঘূর্ণি যেমন একটি জলবিন্দুকে ঘিরে ঘুরতে থাকে ফেনিল আবর্তে, তেমনি দ্যফর্জের মদের দোকানের একটি লোককে ঘিরে এই জন-ঘূর্ণি পাক খেতে লাগল অবিরত। তার সারা গায়ে বারুদের গন্ধ। ঘামে-ভেজা শরীর। কাউকে ঠেলে, কারুর হাতে হাতিয়ার দিয়ে, কাউকে হুকুম করে, বকে, চেঁচিয়ে মানুষটা যেন একাই সর্বময়।

'জ্যাকুজ তিন, তুমি থাক আমার সঙ্গে। আর—তোমরা দুজনে এগিয়ে যাও। এক-একটা দল নিয়ে এগোও। মাদাম কোথায়?'

'আমি ঠিক আছি।' স্ত্রীর গলা পেয়ে দ্যফর্জ ফিরে তাকাল। আজ আর সেই নিঃশব্দ রমণীর হাতে বোনার কাঠি নেই। একটি ভারী কুঠার তার দৃঢ় হাতে, কোমরে পিস্তল আর ছোরা।

'তুমি কোথায় যাবে?'

'যাব? এখন যাব তোমাদের সঙ্গে। তার পর মেয়েরা বেরুলে তাদের আগে আগে।'

'তবে আর দেরী কেন?' সিংহের মতো গর্জন করে ওঠে দ্যফর্জ—'বন্ধুগণ, তবে আর বিলম্ব কিসের? চল বাস্তিল—'

ঐ একটি কুখ্যাত কথার উচ্চারণ মাত্রেই সারা ফ্রান্স যেন গর্জন করে উঠল—'ভাঙ্গ বাস্তিল।' তার পর জনসমুদ্রের ঢেউ উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ল। ঢেউয়ের পর ঢেউ। আরম্ভ হল চরম আক্রমণ।

কেল্লা-কারাগার বাস্তিল। তার চারপাশে গভীর গড়। দুটো টানা সাঁকো। পাথরের মোটা দেয়াল, আটটা বিরাট টাওয়ার। আর সেই দুর্গের অন্তরাল থেকে গোলা-বারুদের অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

তবু গড় পেরিয়ে গোলা-বারুদের ধূম্রজাল বিদীর্ণ করে গর্জনে গর্জনে এগিয়ে চলল জনস্রোত। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অবলীলাক্রমে মাড়িয়ে দিয়ে গেল মৃত্যুকে। মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্য পরিবর্তন। শুধু চোখের সামনে সেই কুখ্যাত বাস্তিল—সেই পাথরে গড়া সাঁকো—অত্যাচার মৃত্যু ক্ষুধা—

কোথা দিয়ে কি হচ্ছে কে জানে? শুধু এক তরঙ্গ আছড়ে পড়ার পর আর-এক তরঙ্গ দ্বিগুণ বেগে আছড়ে পড়ছে। অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে এক সময় পাথর ফাটল। ভিতরের কারা যেন সাদা পতাকা তুলে কি সংকেত করল।

'বন্ধুগণ—বাস্তিল!' তার পর আর কিছু শোনা গেল না। কেবল প্রলয়-পয়োধি-জলে দিগদিগন্ত আলোড়িত হতে লাগল।

টানা সাঁকো পেরিয়ে দ্যফর্জ যখন দুর্গের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল তার বুকে হাঁপ লেগে গেছে। নিঃশব্দে একবার তাকিয়ে দেখল সে চারপাশে। শত সহস্র হাতিয়ার তাকে ঘিরে জমায়েত হয়েছে ইতিমধ্যে। মাদামও আছে কিছু দূরে।

বাস্তিল দখল করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করা শুরু হল। বিদ্রোহীদের ভয়ে ত্রস্ত প্রহরীরা সমস্ত দরজা দরাজ করে খুলে দিল। আর সেই বিরাট কারাগারের শত শাখাপল্লবিত ছোট ছোট অন্ধকার গলিপথ বেয়ে জনতা জলস্রোতের মতো চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মুক্ত কয়েদীদের জয়োল্লাসের সঙ্গে জনতার হুঙ্কার বজ্রনাদের মতো বাজতে লাগল আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে অত্যাচারীদের বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে।

কোথায় বন্দীরা?

কোথায় দলিল-পত্র?

কোথায় গুপ্ত সেল?

কোথায় সেই সব অত্যাচার করার যন্ত্রপাতি?

এই তো বন্দীরা।

জনসমুদ্রের সেই বিপুল গর্জনের অসংখ্য উল্লাসধ্বনির মধ্যে একটি ধ্বনি ছিল প্রবলতম। 'কোথায় আমাদের বন্দীরা?' এরা কোন কালের নয়। অনন্তকাল অনন্ত দেশ আর অনন্ত জনসমুদ্রের প্রতিভূ এরা।

গর্জমান তরঙ্গোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ার পর সকলে মিলে জেলের অফিসার ও সরকারী কর্মচারীদের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে এই কারা-দুর্গের প্রত্যেকটি গোপনীয় সেলের সন্ধান নিল। তার মধ্যে একটি সাদাচুল প্রহরীকে আলাদা করে ধরে নিয়ে এল দ্যফর্জ। লোকটার হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল। দেয়ালের গায়ে চেপে ধরে বলল, 'এখুনি নর্থ টাওয়ারের পথ আমায় দেখিয়ে দাও। দেরী নয়—এখুনি।'

লোকটি তার কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হল। 'এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেখানে এখন তো কেউ আর থাকে না।'

'এক শ পাঁচ নর্থ টাওয়ার—একথার মানে কি?—এ কোন গোপন সেল না কয়েদীর নম্বর? জবাব দাও নইলে খুন হবে।'

লোকটা বলল, 'এটা গোপন সেল।'

'আমায় নিয়ে চল সেখানে।'

এখুনি একটা খুন করা গেল না বলে হতাশ হল জ্যাকুজ তিন। তিন মাথা এতক্ষণ কাছাকাছি ছিল বলে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। নইলে বাইরে উন্মত্ত জনতার কোলাহলে বারান্দা সিঁড়ি উঠোন সর্বত্র কান পাতা দায়। দেয়ালে তার প্রতিধ্বনি। একটানা শব্দের স্রোতে এক-একটা হুঙ্কারের তরঙ্গ-ভঙ্গ। জীবনে রোদ ঢোকেনি কখনও এমন সব অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে নোংরা বীভৎস খাঁচার মতো ঘর পেরিয়ে হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার ইঁট-পাথরের খাড়াই উঠে তিন জনে দ্রুত বেগে যেতে লাগল। ক্রমশ সেই শব্দ কমে এল। সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে করতে বিচিত্র বারান্দা পেরিয়ে একসময় তারা সেই টাওয়ারে এসে ঘন নির্জনতার মধ্যে দাঁড়াল। মোটা মোটা দেয়াল আর খিলানের মধ্যে খাঁচার মতো এই নির্জন টাওয়ারের বাইরের উত্তাল শব্দের রেশ আসছে যেন দূরাগত মেঘগর্জনের মত। লোকটা একটা নিচু দরজার চাবি ঘোরাতেই সশব্দে দরজাটা খুলে গেল।

'এই আপনার এক শ পাঁচ নর্থ টাওয়ার।'

উঁচু দেয়ালের গায়ে ঘষা-কাঁচ লাগানো মোটা গরাদ-দেওয়া ছোট্ট জানালা। ঘরের মাথার দিকে ছাদে পাথরের জাফরি। অত্যন্ত নিচু হয়ে মুখ তুলে তাকালে তবেই একফালি আকাশ চোখে পড়ে। তারই খুব কাছে একটা ছোট চিমনি। উনুনের উপর তখনও কাঠের ছাই। একটা টুল, একটা টেবিল আর একটা খড়ের বিছানা—তাই নিয়ে ঘরের আসবাব। দেয়ালগুলো দীর্ঘদিনের অসংস্কারে বিবর্ণ কালো। একটি দেয়ালে একটা মরচে-ধরা লোহার আংটা।

'টর্চটা ঘুরিয়ে দেখাও তো দেয়ালগুলো', লোকটাকে বলল দ্যফর্জ। জ্যাকুজ দেয়ালের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল—'এ. ম।'

'আলেকজান্দার ম্যানেত', বলল দ্যফর্জ, 'এক হতভাগা ডাক্তারের নাম। ডাক্তারই নিশ্চয় এই পাথরের গায়ে ক্যালেন্ডারের তারিখ খোদাই করেছিলেন। তোমার হাতে ওটা কি? শাবল? দাও তো আমায়।'

সেই শাবল দিয়ে দ্যফর্জ ঘুণ-ধরা টুল টেবিল টুকরো টুকরো করে ফেলল। জ্যাকুজকে বলল, 'ভালো করে দেখ তো। আর এই নাও ছুরিটা। কেটে ফেল বিছানা—ওয়াড়গুলো ওলট-পালট করে দেখ কিছু পাও কিনা। আলোটা উঁচু করে ধর।'

দ্যফর্জ সেই চিমনির কাছে গিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল। এদিকে ওদিকে শাবল দিয়ে ঘা দিতে লাগল। লোহার গরাদগুলোকেও নিস্তার দিল না।

একটু পরে ওপর থেকে দেয়ালের একটা চাঙড়া ভেঙে পড়ল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দ্যফর্জ তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে নিল।

ঘরের ভিতরে বহুকালের পুরনো ছাইয়ের স্তূপ—চিমনির গর্ত, সর্বত্র সে হাতড়ে বেড়াল।

'এখানে কিছুই পাওয়া গেল না। না খড়ের গাদায় না কাঠে।'

দ্যফর্জ লোকটাকে বলল, 'ঘরের মাঝখানে এনে সব জড়ো কর। তার পর দাও আগুন লাগিয়ে।'

লোকটা সেই স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

সেই নিচু খিলানওয়ালা সেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মাথা হেঁট করে ওরা এগিয়ে এল। পিছনে সেই আগুন রেখে ওরা আবার ফিরে এল প্রাঙ্গণে।

ধীরে ধীরে জনতার গর্জন তাদের কাছে প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। সবশেষে এক উন্মত্ত জয়োল্লাসের ভিতর একাকার হয়ে গেল তারা।

জনসমুদ্র যেন দোল খাচ্ছে। গর্জে গর্জে উদ্ঘাটিত করছে আপন অপরিমেয় প্রাণ-শক্তি।

সবাই আজ খুঁজছে দ্যফর্জকে।

যে গভর্নর আজ বাস্তিলের কুখ্যাত দুর্গ-কারা রক্ষার জন্য গুলি করে মেরেছে মানুষকে, সেই লোকটাকে বন্দী করে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে হোটেল দ্য ভিলে (টাউন হল)। সেই মিছিলে সকলের পুরোভাগে আজ চাই সেণ্ট আঁতোয়ানের সেই মদের দোকানের মালিক দ্যফর্জকে। জনতার দাবি তাই।

সবাই মিলে না নিয়ে গেলে গভর্নর হয়ত-বা পালাবে। তাহলে আর জনতার রক্তের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে না।

একটা উত্তাল উত্তেজনা ঘিরে রেখেছিল মানুষটিকে। তার পরনে ধূসর রঙের কোট। তার উপরে সরকারের স্বীকৃতির প্রতীক আঁটা। কঠিন ভঙ্গি তার। পাশটিতে দাঁড়িয়েছিল স্থির হয়ে একটি নারী-মূর্তি।

'ঐ আমার স্বামী', আঙুল দেখিয়ে বলল সেই নারী—'ঐ তো দ্যফর্জ।'

যতক্ষণ ওরা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রইল সেই মানুষটির পাশে রইল মাদাম। যতক্ষণ পথের উপর দিয়ে মিছিল এগিয়ে যেতে লাগল তার কাছে কাছে রইল মাদাম। যখন পেঁৗছল তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় তখনও মাদাম তার কাছে কাছে।

তার পর শুরু হল আঘাত। জনতার বেপরোয়া আঘাতে সেই শরীরটা ধুলোয় উপুড় হয়ে পড়ল। রক্তাক্ত দেহে মার খেতে খেতে লোকটা যখন মরল তখন হঠাৎ যেন জেগে উঠল মাদাম। সেই মরা মানুষটার গলায় পা দিয়ে একটা দীর্ঘ ছুরি দিয়ে তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল মাদাম।

ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকাল।

হঠাৎ যেন সেণ্ট আঁতোয়ানের মানুষগুলো কি হতে পারে, আর কি করতে পারে তাই দেখাবার জন্যে প্যারিসের পথে পথে ল্যাম্পপোস্টে মানুষকে লটকিয়ে দিতে লাগল। একটা বীভৎস পরিকল্পনা কাজে পরিণত হল। এখন রক্ত উষ্ণ, মানুষের মনে রক্ত-পিপাসা। অত্যাচার আর শোষণ ভূলুণ্ঠিত—হোটেল দ্য ভিলের সিঁড়ির নিচে বাস্তিলের ঐ গভর্নরের মৃতদেহের সঙ্গে পথের ধুলোয় অপমানে দলিত। মাদামের জুতোর তলায় নিষ্পেষিত সেই অত্যাচারীর লুণ্ঠিত শির।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বীভৎস সমুদ্রে ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। ঢেউয়ের পর ঢেউ। অন্ধকারের গহ্বর থেকে উঠে-আসা প্রচণ্ড শক্তিধর সেই তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রলয়ের হুঙ্কার।

জনতার আক্রোশ—দীর্ঘ অত্যাচারের আগুনে ঝলসে-যাওয়া মানুষের সত্তা প্রতি-হিংসায় নিষ্ঠুর—কোন ক্ষমা নয়, কোন মমতা নয়।

এই জনকল্লোলের মধ্যে সাতটি করে মানুষের দুটি দল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সাতটি মুক্ত-হওয়া বন্দী। জনতা তাদের উপরে তুলে নিয়ে চলেছে জয়োল্লাসে। উদ্ধার করেছে তাদের সমাধি-গহ্বর থেকে। লোকগুলো বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে, বোধ করি ভাবছে যে শেষ বিচারের দিনে তারা চলে এসেছে।

আর সাতটি মানুষকে জনতা তার চেয়েও উঁচুতে বয়ে নিয়ে চলেছে। সে ক'টি মৃতদেহ।

এক হাজার সাত শ' উননব্বই সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সেণ্ট আঁতোয়ানের পথে সেই প্রতিধ্বনিত পদধ্বনি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল।

ঈশ্বর করুন লুসি তার কল্পনায় যে-পদধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনে তা যেন কোন দিন তার জীবনে সত্য না হয়। এই সব পদধ্বনি থাক তার সুখী গৃহস্থালির গণ্ডির বাইরে, কেন না এ পদসঞ্চার অনিবার্য, উন্মত্ত—মানুষের জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক।

একদিন বহুকাল আগে দ্যফর্জের মদের দোকানের দরজায় ভেঙে-পড়া মদের পিপে থেকে তরল মদের স্রোত বয়েছিল। একবার লাল রঙের দাগ লাগলে সে-দাগ আর সহজে মোছে না।

২২ সমুদ্র উত্তাল

গণদেবতার রোষ স্তিমিত হয়ে এল সাত দিন বিষোদ্গারের পরে। ঝড়ের পর প্রকৃতি হল শান্ত। অন্য দিনের মতো আজও মদের দোকানে পরিচিত আসনটিতে বসেছিল মাদাম দ্যফর্জ। কোলের উপর হাত দুটি জড়ো করে চেয়ে দেখছিল নরম রোদের দিকে। আজ তার মাথায় পরিচিত গোলাপটি নেই। থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে এত দিনে। এই সাত দিনেই সারা শহরের ক্ষুধিত মানুষদের মধ্যে একটা গভীর বোঝাপড়া হয়ে গেছে। মৃত্যুর উৎসবে প্রাণে প্রাণে গড়ে উঠেছে আত্মীয়তা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের আর-কোন প্রতীকের দরকার নেই।

এই তো ক'দিন আগেও পথের লোকগুলোর দিকে তাকালে করুণা হত। তাদের মুখে-চোখে ছিল নিরুপায় আক্রোশ। শুষ্ক বিবর্ণ তোবড়ানো গালে অভাবী সংসারের গহ্বর দেখা যেত। ছেলে-মেয়েদের জীর্ণ চেহারায় অভাবের হাওয়া লাগা রিক্ততা। চোখে পড়ত বড় করুণ ক'রে। কিন্তু ঐ ক'দিনে সব যেন বদলে গেছে। আর অব-মাননার ভিতর থেকে জেগে উঠেছে পৌরুষ আর মনুষ্যত্ব। আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ বোধ।

দোকানে রাস্তায় লোক আনাগোনার বিরাম নেই। মানুষগুলোর চেহারায় কোথাও শ্রী লাগেনি বটে, কিন্তু মুখে-চোখে কিসের যেন জলুস। সে-জলুস নতুন জাগা পৌরুষের। 'এত দিন বেঁচে থাকা ছিল একটা জগদ্দল পাথর, আজ বুঝেছি সেই পাথরে তোমাদের মুখ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।' যেসব শীর্ণ হাতে বুটি রোজগারের কাজ মিলত না, সেইসব শীর্ণ হাতগুলোতে খুনের শক্তি জেগেছে। অত্যাচারের বদলা নেবার ক্ষমতা এসেছে। মেয়েদের যেসব নরম আঙ্গুলে বোনার কাঁটা চলত দ্রুত, অনেক টাটকা রক্তের দাগ লেগেছে সেগুলোতে। তারা জানে যে অত্যাচার আর শোষণের শেকল টুকরো করে ফেলা যায়।

সকালের রৌদ্রময় পথে লোক-চলাচলের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবছিল মাদাম। নেত্রী সে। তার পাশে বসে আর একটি মেয়ে, এখানকারই এক মুদির ঘরের বউ, দুটি বাচ্চার মা। মেয়ে-বিপ্লবীদের দলে সে-ও একজন নেত্রী। তার নাম দিয়েছে সবাই 'প্রতিশোধ।'

'শুনছ, কে যেন আসছে।' সহচরীর সাড়া পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল মাদাম।

যেন হঠাৎ মদের দোকান অবধি ছড়ানো বারুদের স্তূপে দাউ দাউ আগুন লাগল।

পাড়ায় দূর প্রান্ত থেকে একটা কলগুঞ্জন চকিতে এসে পৌঁছল মদের দোকান অবধি। মাদাম চেঁচিয়ে হুকুম দিল, 'চুপ করুন বন্ধুগণ! দ্যফর্জ আসছে।'

হাঁপ নিতে নিতে এসে পেঁছিল দ্যফর্জ। দোকানে ঢুকেই মাথার রক্তবর্ণ টুপিটা খুলে নিয়ে সে ঘরে-বাইরের কৌতূহলী জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু যেন জিরিয়ে নিতে লাগল। যত লোক ছিল ভিতরে আর রাস্তায় সবাই বিস্ফারিত চোখে হাঁ করে দাঁড়াল আশ্চর্য কিছু খবরের আশায়।

'কি হয়েছে?' বলল মাদাম।

'খবর আছে। ও জগতের খবর।'

'কিসের খবর?' ঘৃণাভরে বলল মাদাম—'ওদের খবর বুঝি? বল, বল।'

'তোমাদের মনে আছে বুড়ো ফুলোঁর কথা। যে-শয়তান আমাদের না-খেতে-পাওয়া মা-বোন-ছেলে-মেয়েদের বলেছিল ঘাস খেয়ে পেট ভরাতে। সেই শয়তানটা মরে হাড় জুড়িয়েছে শুনেছিলাম, কিন্তু ব্যাটা সত্যি মরেনি।'

'তবে?'

'মরেনি ব্যাটা। আমাদের ভয়ে ব্যাটা মরার গুজব রটিয়েছিল। এমন কি তার কবর অবধি হয়েছিল মিছেমিছি। সেই ব্যাটাকে তার দেশে খুঁজে বের করেছে আমাদের ভাইরা। দেশে গিয়ে সে আত্মগোপন করে বসেছিল। তাকে সবাই নিয়ে এসেছে শেকল বাঁধা করে। হোটেল দ্য ভিলের (টাউন হল) দরজায় এনে ফেলেছে। আমাদের ভয় খায় লোকটা। আমাদের ভয় খাবার কারণ ছিল কিনা বল তোমরা?'

সত্তর বছরের বুড়োর কানে জনতার সে-রায় পেঁছিল না। যদি যেত সে আওয়াজেই তার পরিত্রাণ হত। সে-রায় কি হবে সেই বুড়ো পাষণ্ড মনের ভিতরে আগেই জেনে রেখেছিল।

ঝড়ের আগে অশুভ মৌন। মাদাম আর দ্যফর্জ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। চোখে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের চমক। প্রতিশোধ নিচু হতেই তার পায়ের ঠেকায় একটা ড্রাম আর্ত-নাদ করে উঠল কাউণ্টারের পিছনে।

'বন্ধুগণ, আর দেরি কেন? তোমরা তৈরি তো?'

মাদামের কোমরে দীর্ঘ ছোরা। রাস্তায় ড্রামের আওয়াজ উঠছে। যেন যাদুমন্ত্রে সেটিকে পথে নিয়ে গেছে মেয়েটি। চকিতে মৌনের বাঁধ ফাটিয়ে কলরব উঠল রুদ্ধ প্রতিহিংসার। মাথার উপর হাত দুলিয়ে উচ্চ চিৎকারে বাড়ি বাড়ি থেকে মেয়েদের আহ্বান করল প্রতিশোধ। যেন রুদ্রাণী রূপ তার আজ।

ক্ষিপ্ত পুরুষদের চেহারায়, তাদের হাতের অস্ত্রে বিপ্লবের শৌর্য। মেয়েদের চণ্ডমূর্তিতে বিপ্লবের জিঘাংসা।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে নিচে দেখছিল লোকগুলো। তাদের চোখে রোষ। দলে দলে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে পড়ল।

এইসব মেয়েদের দিকে তাকালে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী মানুষের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে।

নিজেদের ঘর-গৃহস্থালি ফেলে তারা ছুটে নেমে এল। তাদের শ্রীহীন অভাবের সংসার ফেলে, ছেলেদের ফেলে, মাটিতে শুয়ে-থাকা রোগে জীর্ণ অভাবে শীর্ণ মানুষদের ফেলে, তারা ছুটে বেরিয়ে এল। মাথার চুল এলোমেলো। পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে তারা দ্রুতবেগে রাস্তায় এসে পড়ল।

'শয়তান ফুলোঁ আমার বোনকে মেরেছে। আমার মাকে মেরেছে। আমার মেয়ে মরেছে।'

চুল ছিঁড়ে বুক চাপড়ে তারা পাগলের মত চিৎকার করতে লাগল। ফুলোঁ এখনও জ্যান্ত আছে। সেই শয়তানটা যে না-খেতে-পাওয়া মানুষদের বলেছিল—'রুটি কোথায় পাবি, ঘাস খা তোরা।'

আমার বাবাকে যখন একখানা রুটি দিতে পারিনি সে তাকে বলেছিল ঘাস খেতে।

আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল না খেতে পেয়ে। আমার কচি বাচ্চাটাকে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারিনি। শয়তান আমাকে বলেছিল—বাচ্চার মুখে খড় দিতে। চুষে চুষে খাবে।

আজ দিন এসেছে, ভগবান! প্রতিহিংসার দিন!

আমার না-খেয়ে মরে-যাওয়া বুড়ো বাবা। আমার দুধ না-পেয়ে শুকিয়ে-মরা কচি ছেলে। আজ এখানে হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—আজ সব মৃত্যুর, সব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব।

ওর রক্ত চাই। ওর মাথাটা ছিঁড়ে দাও। ওর বুক থেকে হৃৎপিণ্ডটা টুকরো করে নাও। শরীরটা ছিঁড়ে টুকরো করে ছিটিয়ে দাও। ঢেলে দাও পথে শয়তানটার রক্ত। ওকে মাটিতে পুঁতে ফেল যাতে ওর শরীরে ঘাস গজায়।

উন্মত্ত চিৎকারে আর দারুণ উত্তেজনায় মেয়েরা সব বিবশ মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু আর সময় নষ্ট করা হবে না।

হোটেলে বন্দী হয়ে আছে ফুলোঁ। কি জানি যদি ব্যাটা পালায়! চল, চল, ছুটে চল।

সশস্ত্র নারী-পুরুষ দলে দলে ছুটে চলল। এতদিনের অত্যাচার আর অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে ওরা পাগলের মতো এগিয়ে যেতে লাগল। যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তাদেরও যেন আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে লাগল ওরা।

পনের মিনিটের মধ্যে এ অঞ্চলটা যেন জনশূন্য হয়ে পড়ল। শুধু কিছু বুড়ো পিছনে পড়ে রইল। আর ছোট ছেলেমেয়েগুলো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল বাড়িতে।

হোটেলের যে হল-ঘরে শয়তান বুড়োটাকে ধরে রেখেছিল, সেখানে গিয়ে হামলে পড়ল সবাই। ঘরের ভিতর ভর্তি হয়ে রাস্তায় ভিড় উপচে পড়ল।

দ্যফর্জরা দুজন, প্রতিশোধ আর জ্যাকুজ এরা সবাই পুরোভাগে।

ছুরির ফলা দিয়ে দেখাল মাদাম।

বলল, 'দেখ, দেখ, দড়ি দিয়ে বাঁধা পড়ে আছে। আর ওরা পিঠে খড় বেঁধে দেওয়াতে চমৎকার মানিয়েছে শয়তানটাকে। ঐ খড় ব্যাটাকে খাওয়াও।'

হাতের ছোরাটি নিয়ে অস্থির খেলা খেলতে লাগল মাদাম।

মাদামের কথায় লোকদের উল্লাসের অবধি রইল না।

সেই কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল আর একটা উন্মত্ত উল্লাস শোনা যেতে লাগল জনতার মুখে মুখে। একটু পরেই হাজার হাতের করতালিতে সেই শব্দ যেন সারা রাস্তা জুড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করল।

একদল লোক, অদ্ভুত কারিৎকর্মা সব, কি ভাবে আশেপাশের উঁচু উঁচু বাড়িতে জানালার কার্নিসে উঠে বসেছিল। মাদামের এক একটি কথা তারা শোনে আর টেলি-গ্রাফের মত রিলে করে দেয় দূর দূর নরনারীর মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে সবাই জানতে পারে এখানে কি হচ্ছে—কি কথাবার্তা চলছে।

একটা অট্টরোল সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠছে আর গর্জাচ্ছে অপরিসীম প্রতিহিংসায়।

বেলা বাড়তে লাগল।

রোদ্দুর এসে পড়ল বুড়ো শয়তানটার মাথায়।

আর মুহূর্তে যেন একটা জিঘাংসার গর্জন সাপের ফণার মতো মাথা তুলল।

একটা টেবিল আর একটা রেলিং টপকে দ্যফর্জ তাকে যেন মৃত্যু-আলিঙ্গনে বাঁধল।

মাদাম গিয়ে হাত দিল দড়িতে।

এমন সময় জনতার ভিতর থেকে আওয়াজ উঠল, 'ব্যাটাকে বাইরে আন—রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের ধারে নিয়ে চল।'

সারা শহর যেন মুহূর্তে গর্জে উঠল।

একবার নিচে একবার ওপরে আর মাথাটা সামনে—এমনি ভাবে ওকে নামাল সিঁড়ি দিয়ে। এই হাঁটু গেড়ে বসে। এই দাঁড়িয়ে। চিৎ হয়ে। শুয়ে। টেনে হিঁচড়ে ওকে নামাতে লাগল লোকে। ওর মুখে ঘাস আর শুকনো খড় গোঁজা।

মার খেতে খেতে রক্তাপ্লুত শরীরে ও সকলের কাছে কাকুতি-মিনতি করে যাচ্ছে সমানে। একবার করে ওকে ঘিরে ফেলছে সবাই। আবার দূরের লোকেদের দেখার সুবিধার জন্যে সরে দাঁড়াচ্ছে।

যেন একটা কাঠের পাটাতন—এমনি ভাবে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে এগোচ্ছে লোকটা।

এমনি করে পথের কোণে এনে ফেলল সবাই তাকে। সেইখানে এনে মাদাম তাকে ছেড়ে দিল। যেমন ভাবে ইঁদুরকে খেলতে দেয় শিকারী বিড়াল।

সবাই চিৎকার করছে শয়তানটাকে মেরে ফেল। মুখে খড় গুঁজে দাও।

দুবার দড়ি ছিঁড়ে গেলে লোকটা উঠে পালাতে চেষ্টা করল। একটু পরেই ওর মাথাটা বর্শার উপর গেঁথে রইল। মুখে খড় গোঁজা। এই দৃশ্য দেখে জনতা উল্লাসে হর্ষধ্বনি দিল—নাচতে লাগল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে ওরা যে যার ঘরে ফিরল। মনে পড়ল যে কান্নায় ডুকরে-ওঠা বাচ্চাদের তারা ফেলে এসেছিল, বুড়ো মানুষগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে। আজ সারাদিন তাদের পেটে কিছু পড়েনি।

একটু পরেই রুটির দোকানে লম্বা লাইন পড়ল। মোটা বাসি রুটি কেনার ভিড়।

আজ শরীর ক্লান্ত—পেট খালি। কিন্তু সে কষ্ট আজ আর তেমন যন্ত্রণা দিচ্ছে না। আজ গল্পের শেষ নেই। সারাদিনের যত বিজয়োল্লাস সব ভেবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কি আনন্দ!

তার পর রুটির দোকানের ভিড় পাতলা হয়ে এল।

উঁচু উঁচু জানালার ম্লান আলোগুলো জ্বলে উঠল।

রাস্তার উপর যারা এক উনুনে রান্না সারে, তারা রাঁধতে বসল। রেঁধে যে যার ঘরে নিয়ে গিয়ে খায়।

এদের খাওয়ায় মাংসের লেশ থাকে না। অন্য-কিছুও জোটে না। তবু আজ এই শক্ত রুটির ভিতর কি একটা নতুন আস্বাদ পেল ওরা—যেন নতুন একটা পুষ্টি যা তাদের ভিতরকার শুকিয়ে-যাওয়া ফোয়ারায় আবার নতুন জলধারায় সিঞ্চিত করল।

আজ সারাদিন যে মা-বাপেরা ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে গিয়েছিল—তাদের সন্তানেরা এখন মা-বাপকে খেলার সঙ্গী হিসেবে পেল।

যারা প্রেমিক-প্রেমিকা তারা আজ নতুন একটা অভিজ্ঞতা পেল। সামনে কি এক উজ্জ্বল সুখী দিনের স্বপ্ন দেখল।

রাত নিশুতি হল। তবু মদের দোকানে আজ লোক আনাগোনার শেষ রইল না। প্রায় ভোরবেলা দোকান বন্ধ করল দ্যফর্জ।

দুই মানুষে যখন একলা হল দ্যফর্জ বউকে বলল—'তবে কি সত্যি বিপ্লব এল, গিন্নি? বসলে কি মসনদে?'

মাদাম বলল, 'তা বলতে পার। প্রায় এসে গেছে।'

সে রাতে সবাই ঘুমোল। সকলের সঙ্গে ঘুমিয়ে রইল ক্ষুধার্ত স্বামীর কাছে

গ্রামের প্রহরী মেয়েটি। সে ইচ্ছা করলে জাগিয়ে তুলতে পারত সবাইকে গর্জন তুলতে পারত, যেমন করেছিল বাস্তিল পতনের আগে, কি বুড়ো ফুলোঁকে ধরবার আগে।

২৩ প্রজ্বলিত বহ্নি

যেখানে ঝরনাটা এসে নেমেছে সেইখানে গ্রামের জীবনে কিছুটা পালাবদল ঘটেছে, আজকাল।

রাস্তার মজুর লোকটা এইখানে পথের উপর পাথর ভাঙে। সেই পাথর ভাঙার খাটুনিতে জোটে তার সামান্য রুজি। তার নির্বোধ প্রাণ আর শীর্ণ শরীর তার থেকেই জীবনীশক্তি কুড়োয়।

এখানকার জেলখানার আর আগের মতো রমরমা নেই। সৈন্যদল আছে কিন্তু সংখ্যায় কম। অফিসাররা জানে না যে সৈন্যদের দিয়ে কি কাজ করিয়ে নিতে হবে। তারা তো জানে যে, এখন যা দিনকাল পড়েছে হুকুম দিলে তা তামিল হবে না হয়ত।

এখানে যেন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। এখানকার মাঠে ফসল নেই—ঘরে অন্ন নেই। লোকগুলো যেমন শীর্ণ জীর্ণ বিবর্ণ—এখানকার গাছের পাতা ঘাসের ডগা তেমনি প্রাণহীন। এখানে সব যেন নুয়ে পড়া—হতাশায় দগ্ধ—শোষিত জীর্ণ। কোথাও বাড়বাড়ন্ত নেই। গৃহপালিত জন্তু থেকে মানুষের ঘরের শিশু অবধি সব যেন শুষ্ক শূন্য, জীবনীশক্তিহীন।

ম'সে'নাররা হলেন জাতীয় চরিত্রের মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সব-কিছুতে তাঁদের শিভ্যালরির ছাপ। সৌখিন ঝলমল জীবনের প্রতিভূ তাঁরা। আরামে দিন কাটাবার জন্যে যে-সব আমোদ-প্রমোদ প্রয়োজন—তার কোন-কিছুতেই কার্পণ্য নেই তাঁদের।

শুধু একটি আফশোষ তাঁদের। এই জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব ভোগ করবার একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে জন্মেছেন তাঁরা, অথচ কি আশ্চর্য ভগবানের ভান্ডার কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

তাঁদের সন্দেহ হয় যে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির ব্যাপারে কোথাও কোন বিশৃঙ্খল অবস্থা নিশ্চয়ই আছে। নইলে তাঁদের অসুবিধা হবে এমন পরিস্থিতি হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এতদিন ধরে শেষ বিন্দু অবধি রক্ত ঝরানো হয়েছে। যেখানে যত রস ছিল সব নিঃশেষ করে নিঙড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আর কোন কিছু বাকি রইল না শোষণের। তাই এমনি একটা নোংরা অবিশ্বাস্য রকমের অবস্থা থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা।

কিন্তু এ শুধু এই গ্রামের কাহিনীই নয়। এমন কি অনেক গ্রামেরও নয়—সকল গ্রামেরই কাহিনী। বহু বছর ধরে ম'সে'নাররা শুধু শুষে নিয়েছেন গ্রামগুলির মাটি আর মানুষকে। কখনও গ্রামে বাস করে দেখতে চেষ্টা করেননি কেন এমনধারা হল। শুধু যখন শিকার করার লোভ হত আসতেন এখানে ইয়ারদের নিয়ে—কাল কাটাতেন প্রমোদে। শিকারের মজা বাড়াবার জন্যে বনবাদাড় বাড়িয়েছেন যথেচ্ছ। এখন পশু-মৃগয়া ছাড়াও চলেছে মানুষ-শিকার।

গ্রামের জনপদের চেহারাও বদলে গেছে।

নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষদের সংখ্যা বেড়েছে যেন। ম'সে'নারদের সুন্দর সুগঠিত অবয়বের উচ্চশ্রেণীর মানুষের সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে বিরল।

এখন দিন-কাল পালটেছে।

রাস্তার মজুর নির্জন পথের ধুলোয় কাজ করে অবিরাম। কখনও ভাবে না যে মৃত্তিকা থেকে এসে মৃত্তিকায় তার পরিণতি হবে। এত বড় চিন্তা করবে কখন সে? তার সর্বক্ষণের চিন্তা কেমন করে সে পেট ভরাবে একবেলা। ভালো মজুরি পেলে কেমন আরাম করে সে খেয়ে বাঁচত।

আজকাল মাঝেমাঝে চোখ তুলে সে দেখতে পায়—বহুদূর থেকে একটি দুটি রুক্ষ চেহারার মানুষ এক গা ধুলো মেখে হাঁটা-পথে এই রাস্তা দিয়ে কোথায় কোথায় চলে যায়। এত আনাগোনা আগে কখনও তার চোখে পড়ত না।

তাদের পায়ে বড় বড় কাঠের জুতো। তাদের মুখে উগ্রভাব। অনেক পথের ধুলো মাড়িয়ে—সর্বাঙ্গে মেখে—অনেক জলার শ্যাওলা আর জলগুল্মের দাগ লাগা পোশাকে—অনেক বনের কাঁটা আর পাকের চিহ্ন নিয়ে পাহাড় বন জলা গ্রাম শহর মাড়িয়ে তারা কোথায় কোথায় যাওয়া-আসা করে।

এমনি একদিন দুপুরবেলা শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল ভয়ানক। পথের ধারে পাথরের ঢিপির উপর বসেছিল সে মাথা বাঁচিয়ে। দেখল তেমনি একজন লোক বৃষ্টি-শিলা মাথায় করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। জনহীন পথে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে লোকটা আসছে যেন প্রেত। চারদিকে খুঁটিয়ে দেখল সে। তার পর এক সাংকেতিক ভাষায় যেন কি উচ্চারণ করল।

কাছে এসে লোকটা তাকে দেখে সংকেত করল। বলল, 'জ্যাকুজ।' 'জ্যাকুজ', বলে মিস্ত্রি সাড়া দিতেই আগন্তুক বলল, 'হাত দাও হাতে।' দু'জনে পাশাপাশি বসল পাথরের ঢিপির ওপর।

'খাওনি?'

'এখন যা-হোক হবে', রাস্তার মজুর ক্ষুধার্ত মুখে বলল।

'এই এখন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কেউ দুপুরের খানা খায় না।'

নলে কি একটা যেন ভর্তি করে লোকটা চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালাল। তার পর দুই আঙ্গুলে কি নিয়ে সেই আগুনে দিতেই দপ করে আগুন ফুঁসে উঠল। ধোঁয়া হল চারদিকে।

'আজ রাত্তিরে?'

'আজই?'

'কোথায়?'

'এইখানে।' দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

শিলাবৃষ্টি চলল কিছুক্ষণ। তার পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

আগন্তুক বলল, 'কোন্ পথে গেলে সুবিধে বল তো?'

চড়াই-পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল মিস্ত্রি, 'ঐ পথ ধরে সামনে চলে যাবে—কুয়োর ধার দিয়ে এগিয়ে—'

'দুত্তোর কুয়োর নিকুচি করেছে! কোথায় জায়গাটা বল না!'

'গ্রামের শেষে যে পাহাড়-ঢিবি তার থেকে দেখতে পাওয়া যায়।'

'ব্যস, ঐতেই চলবে। তোমার কাজ কতক্ষণ?'

'ধর না কেন, সন্ধ্যে অব্দি।'

'তবে যাবার আগে আমায় জাগিয়ে দেবে তুমি। দু-রাত হেঁটেছি। চোখের পাতা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। আমি একটু শুয়ে পড়ছি। তুমি আমায় জাগিয়ে দিয়ে যাবে নইলে আমার ঘুম ভাঙ্গবে না।'

'দেব। তুমি শুয়ে পড় ভাই।'

ভারী কাঠের জুতোজোড়া খুলে ফেলল সে। খানিকক্ষণ পাইপ খেল। তার পর সেই পাথরের উপর পথের ধুলোয় শুয়ে পড়ল লোকটা। একটু পরেই একেবারে অচেতন। মিস্ত্রি কতবার চেষ্টা করল ওর গোপন অস্ত্রের হদিস করতে কিন্তু সুবিধে করতে পারল না।

বৃষ্টির পর মেঘ-স্তূপের আড়ালে সূর্য দেখা দিল। তার পর শুরু হল মেঘ-রৌদ্রের খেলা। কখনও রৌদ্রস্নান কখনও বিচিত্র বর্ণালী। পাতায় শাখায় জলকণা-গুলি হীরের কুচির মতো জ্বলতে লাগল নানা রঙে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেলের ভাঁটা-স্রোতে এল সন্ধ্যা। পশ্চিম আকাশ এখন জ্বলছে যেন। মুখে তার আলোছায়ার খেলা চলছে। বৃষ্টি-ভেজা মাটিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোয় লোকটি। সারা গায়ে পোশাক ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে, তবু তার সাড়া নেই।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে গ্রামে ফিরবার উদ্যোগ করে মিস্ত্রি ডেকে দেয় লোকটিকে। ঘুম ভেঙে উঠে বসতে বসতে বলে, 'পাহাড় থেকে তিন ক্রোশ বলেছিলে না?'

'প্রায়।'

'তবে চলি।'

গ্রামে ফিরে গিয়ে কথাটা বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারল না সে। যারা ঝরনার ধারে জল নিতে এসেছিল তাদের খুব কাছে গিয়ে যেন কত গোপনীয়ভাবে চুপি চুপি জানাল পরম আত্মীয়দের। সেই কথা কানাকানি হতে হতে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। আজ রাতে আর খাওয়ার পর কেউ শুতে গেল না অন্যদিনের মতো। বাইরে এসে বসে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আকাশের এক বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে সবাই সেই ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে বসে নানা কথা নিয়ে তোলপাড় করতে লাগল নিচু গলায়।

গ্রামের মধ্যেও জানাজানি হল। এখানকার নায়েবের কানেও কথাটা পেঁছিল! রাতের গা-ঢাকা অন্ধকারে সে-ও ছাতের উপর একলা দাঁড়িয়ে রইল। কি-একটা অস্পষ্ট অস্বস্তিতে সারা গায়ে কাঁটা দিতে লাগল অমন তেজী পুরুষের। নিচের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় কূয়োর ধারে জটলা-করা এক দল নারী-পুরুষকে। তাদের নিথর দাঁড়িয়ে থাকাটাই যেন অশুভের সূচনা। খবর পাঠাল সে গির্জার প্রহরীকে যে দরকার হলে গির্জার বিপদ-ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে হতে পারে। যেন তৈরি থাকে সে।

রাত যত গভীর হয় এই প্রাসাদের চারপাশের বেড়-দেওয়া উদ্যান-কাননে একটি বনস্পতিও স্থির দাঁড়িয়ে থাকে না। ঝোড়ো হাওয়ার বেগে তারা সেই অন্ধকারকে যেন বিদীর্ণ করে দিতে চায়। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে যোগ দেয় বৃষ্টি। প্রাসাদের সোপান-শ্রেণীর উপর দাপাদাপি করতে থাকে হাওয়া। বিরাট দ্বারের উপর অবিশ্রান্ত ধাক্কা দেয় —যেন কোন দূত ভিতরের মানুষগুলিকে আহ্বান করে। অস্থির ঝড়ের হাওয়া প্রাসাদের হলঘরে ছুটোছুটি করে, অস্ত্র-ঘরে ঝনঝন করে শব্দের ঝংকার তোলে, হা হা করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। রেশমের পরদা তুলে সেই ঘর খুঁজে বেড়ায় যেখানে মারকুইস ঘুমিয়েছিলেন।

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ। বনান্তরাল থেকে চারটি রুক্ষমূর্তি প্রাসাদের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হল। উঁচু উঁচু ঘাস পা দিয়ে মাড়িয়ে, গাছের শাখাগুলো ভেঙে পথ করে ওরা নিঃশব্দে সাবধানে একত্রিত হল।

চারটি আগুন জ্বলল। তার পর তারা আবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তেমনি নিঃসাড়ে।

অন্ধকার গ্রাস করল সব। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ সেই অন্ধকার রইল না।

হঠাৎ সেই তিমির অন্ধকার বিদীর্ণ করে সারা প্রাসাদ কি এক আশ্চর্য আলোয় যেন আলোকিত হয়ে উঠল। যেন প্রাসাদ সহসা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। একটু পরে একটি লেলিহান আগুনের শিখা সম্মুখভাগের কারুকার্যের উপর খেলা করতে শুরু করল। তার পর ধীরে ধীরে বারান্দা খিলান জানালা সব আগুনে জ্বলতে লাগল।

আগুন দাউ দাউ করে আকাশস্পর্শী হতে লাগল। বিস্তৃত হতে লাগল চারদিকে। রাত্রির অন্ধকারকে দিনের আলোয় পরিণত করল।

সেই বিশাল বিশাল জানালায় আগুন জ্বলতে লাগল, আর চারপাশের সব প্রস্তর-মূর্তিগুলি নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

তখন বাড়িতে যারা ছিল তাদের মধ্যে কানাকানি হতে লাগল। কে যেন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটে চলে গেল। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দূর থেকে শোনা যেতে লাগল।

সেই ঘোড়া এসে থামল গ্যাবেলের দরজায়।

'আপনি সাহায্য করুন, আমাদের সাহায্য করুন।'

গির্জার বিপদ-ঘণ্টা অস্থির ভাবে বাজতে লাগল। কিন্তু কোন সাহায্য এগিয়ে এল না।

সেই রাস্তায় মজুর আর তার দু-শ পঞ্চাশ জন আপনার লোক সেই ফোয়ারার ধারে দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে হাত জড়ো করে। আগুনের স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হবে, চল্লিশ ফুট উঁচু হবে।'

তাদের মুখ নিষ্করুণ। ভঙ্গি নিথর।

প্রাসাদের সেই সওয়ার গ্রামের রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত উঠে গেল পাথরের উপর দিয়ে যেখানে জেলখানা। ঘোড়ার মুখে ফেনা।

জেলখানার মুখে একদল অফিসার আগুনের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তাদের থেকে একটু দূরে একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে।

'দোহাই অফিসার, প্রাসাদে আগুন লেগেছে। কত কি মূল্যবান জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখনও আপনারা একটু সাহায্য করলে অনেক কিছু রক্ষা পাবে।'

অফিসাররা তাকাল সৈন্যদের দিকে। সৈন্যরা তাকাল আগুনের দিকে। অফিসাররা কোন হুকুম দিলেন না। শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'ওটা তো পুড়বেই।'

ঘোড়সওয়ার পাহাড়ের পথে নেমে এল। গ্রামের পথ দিয়ে যখন ছুটে চলল তখন সারা গ্রাম আলোয় উদ্ভাসিত। সেই মজুর আর তার দু-শ পঞ্চাশ জন আপনার লোক যে যার বাড়িতে গিয়েছে। কাঁচের জানালায় আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যাদের বাতি ছিল না তারা গ্যাবেলের বাড়ি থেকে আদায় করে এনেছে। ভয় দেখিয়ে বলেছে, তাদের কথা না শুনলে গাড়ি-ঘোড়া সব জ্বলে যাবে। আজ আর মজুরের গলায় সেই দীন ভাব নেই।

সারা প্রাসাদ জ্বলছে যেন নরকের আগুন গ্রাস করে নিচ্ছে এর অস্তিত্ব। আগুনের কম্পমান আলোছায়ায় সেই পাথরের মূর্তিগুলোর মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠছে। যখন বড় বড় পাথর আর কাঠের বিম ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগল, জ্বলতে লাগল দাউ দাউ ক'রে—মনে হল সেই নিষ্ঠুর শয়তান মারকুইস জ্বলছে আগুনে।

প্রাসাদ জ্বলছে। বাগানের গাছে গাছে আগুন লেগে গেছে। দূরের গাছগুলোতেও তারা লাগিয়ে দিয়েছে আগুন। ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। ফোয়ারার জল শুকিয়ে গেছে। বড় বড় মোটা দেয়ালে ফাটল ধরেছে। বৃক্ষশাখা থেকে জ্বলন্ত পাখিরা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ। আগুনের আভায় পথ দেখে ওরা দূর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাদের পরবর্তী ঠিকানায় পে'ছৈ যাবার জন্য পা বাড়াল।

গ্রামের বিপদ-ঘণ্টা বাজাবার ইচ্ছা ছিল নায়েব গ্যাবেলের। কিন্তু তার আগেই লোকেরা দখল করে নিয়েছে সেই বিপদ-ঘণ্টা। আগুনের তালে তালে বাজছে সেই ঘণ্টা।

তার পর সবাই মিলে হানা দিল নায়েব গ্যাবেলের বাড়ি। নেমে এস। এত দিন যত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, যতবার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে জমিদার ঋণের ওপর সুদ চাপিয়ে বংশ বংশ ধরে উই-খাওয়া কাঠের মতো ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, সব সুদে-আসলে শেষ হবে আজ। যদিও গত কিছু কাল ধরে শুধু সুদই দিয়েছে তারা, আসল দিতেই পারেনি—তবু আজ মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন। নেমে এস।

সবাই ডাকতে লাগল—নেমে এস। কথা আছে। তার বাড়ির সামনে উ'চুতে আলো জেলেছে জনতা। ঐখানে আলোর বদলে ঝোলাবে তার মৃতদেহ।

উত্তেজিত জনতা আর উত্তেজক আগুন। গ্যাবেল মোটা কাঠ দিয়ে দরজা বন্ধ করল। তার পর ছাদে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভাঙবার জন্যে তৈরি ওরা। সেই উষ্ণ রাতে বাড়ির দরজায় মৃত্যু-হানার আতঙ্ক নিয়ে জেগে রইল সে। যদি ওরা দরজা ভাঙে, ছাদ থেকে সে লাফিয়ে পড়বে ওদের উপর।

মরবার আগে দু-এক জনকে মারবে। দূরে জ্বলন্ত প্রাসাদ আর তার নিজের দরজায় জনতার অবিরাম আক্রোশ নিয়ে গ্যাবেল সারা রাত ছাদে কাটাল। তার পর এল ভোর—ফিরে গেল জনতা সেবারের মতো। কিন্তু তারা ফিরে গেলেও গ্যাবেলের ভয় গেল না। সেই ভস্মাবশেষের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত শরীর-মনে প্রাণটা নিয়ে নেমে এল।

কিন্তু এক শ'মাইলের মধ্যে অন্যরকম আগুনে ঝলসে মরছে অন্য মানুষের দল। ভোরের আলো যাদের মৃতদেহ দেখছে একদা শান্ত পথে—যেখানে তারা জন্মেছে, ধু'কে ধু'কে বড় হয়েছে। আবার কোথাও বিদ্রোহীদের নিধন করছে সৈন্যদের অস্ত্র। কিন্তু পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে জনতার বিপুল প্রতিহিংসা বিশাল রূপ ধরে এগোতে লাগল। আর আগুন জ্বলে উঠছে দাউ দাউ ক'রে। কোথায় কখন কি ভাবে নিভবে সে আগুন, কে তা জানে! প্রলয়-কালে অত সূক্ষ্ম অঙ্কের ধার কে ধারে বল?

২৪ চুম্বকের আকর্ষণে

সেই প্রজ্বলিত আগুন আর উত্তাল সমুদ্র—সর্বংসহা পৃথিবীর উপর এক ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। সে কেবলই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। উচ্চ থেকে উচ্চতর। কেবলই জোয়ার। যারা সাগর-সৈকতে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের আতঙ্কের আশ্চর্যের অবধি ছিল না। তিন বছর ধরে দাউ দাউ করে জ্বলল সেই আগুন।

এই তিনটি বছর ছোট লুসির জীবনের মালায় আরও তিনটি জন্মদিন স্বর্ণ-সূত্রে গ্রথিত হ'ল। একটি নিভৃত সংসারের শান্তিময় দিনরাত্রির কোথাও কোন বিঘ্ন রইল না।

এদের গৃহের একটি আশ্চর্য কোণে পথের উপর অবিরত চলমান পদসঞ্চারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যখনই এ গৃহের কেউ সেই আওয়াজ শোনে তাদের মন অশুভ সংকেতে দুরু দুরু করে। কেন না, এই পদধ্বনি একটি রক্তপতাকার নিচে কোলাহল-মত্ত জনতার পদশব্দ।

ম'সেঁনার সেই অভিজাত শ্রেণীর একজন যারা ঘটনার সূত্রপাতেই এই পরিস্থিতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। ফ্রান্সে তার বিপদ যে প্রচণ্ড এমন কি তার

প্রাণসংশয় সেটুকু বুঝতে তার বিলম্ব হয়নি। তাই ফ্রান্সের মাটিতে বিপ্লবের আত্ম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত ম'সে'নার পলায়নে তৎপর হয়েছিল।

রাজসভার সেই প্রতীক অপসৃত। যে-রাজসভা, অন্তরঙ্গগোষ্ঠি থেকে বহিরঙ্গ অবধি চক্রান্ত নীতিহীনতা আর প্রবঞ্চনার জাল পেতে বসেছিল তা-ও আজ সমূলে উৎপাটিত। রাজ-মুকুট ভূলুণ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ বিপ্লবীদের দখলে। যখন শেষ সংবাদ এসেছে তখন জানা গেছে যে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হয়েছে।

সতের শ' বিরানব্বই সালের আগস্ট। ম'সে'নাররা এখন চারদিকে বিক্ষিপ্ত।

স্বাভাবিক ভাবেই ম'সে'নারের সদর-ঘাঁটি হয়েছে লণ্ডনের টেলসন ব্যাঙ্ক। যে ব্যাঙ্কে একদিন তাদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছিল, তাদের অনেকেরই প্রেতাত্মা এখন এখানে ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া এখানে ফ্রান্সের সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ আসে। টেলসন চিরকালই পুরনো খদ্দেরের দিকে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়। যাদের জীবনে এই রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বিপদ ঘনিয়েছে তাদেরও ব্যাঙ্ক বিমুখ করেনি। যে সব অভিজাত নরনারী আসন্ন ঝড়ের পূর্ব-সংকেত পেয়েছিলেন, লুটপাট আর সম্পত্তি বেদখল হবার ভয়ে যারা ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে টাকাপয়সা-সম্পত্তি সরিয়ে ফেলেছে, তারাও এখানে অর্থ-নৈতিক আশ্রয় পেয়েছে।

ফ্রান্স থেকে সদ্য আগত সব নারীপুরুষ প্রথমেই টেলসন ব্যাঙ্কে এসে দেখা করে। তাদের মুখে ফরাসী দেশের শেষ সমাচার প্রথম এখানেই পাওয়া যায়।

এই সব নানা কারণে কিছুকাল ধরে টেলসন ব্যাঙ্কই হয়ে উঠেছে সংবাদ-সংস্থা। এক রকমের সংবাদ আদান-প্রদানের ঘাঁটি। বাধ্য হয়ে অন্যান্য কৌতূহলী মানুষের জন্যে টেলসন ব্যাঙ্কের জানালায় সংবাদ লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেই সব নোটিশের সামনে সারাদিন ধরে চলে মানুষের ভিড়।

সেদিন একটি উষ্ণ কুয়াশা-ভরা বিকেলে ব্যাঙ্ক বন্ধের কিছু আগে ব্যাঙ্কে হৈ-চৈ ভিড়ের অন্ত ছিল না।

লরি নিজের ডেস্কে বসেছিলেন, তাঁর সামনে হেলান দিয়ে নিচু-গলায় কথা বলছিল ডার্নে। চারপাশের কলরবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা দুজনে গোপন কোন শলাপরামর্শ করছিল।

ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আর বেশি দেরি নেই।

টেলসন ব্যাঙ্ক আগে কেবল টাকাকড়ি-সম্পত্তির কারবার করত, কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লব বেধে ওঠবার পর থেকেই এটি হয়ে উঠেছে সংবাদ-প্রতিষ্ঠান। যারা আত্মরক্ষা করে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে এসেছেন, তাদের খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ হাতে নিয়েছে ব্যাঙ্ক। সেই কারণেই আজকাল লোক-জন থৈথৈ করে এখানে সব সময়। এখন টেলসনই আশা, টেলসনই ভরসা।

'কিন্তু আপনি যদিও চিরযুবা তবু আমি বলছিলাম কি—' একটু যেন ইতস্তত করে বলল ডার্নে।

'বুঝেছি, আমি খুব বুড়ো হয়ে পড়েছি—না?' বললেন লরি।

'আবহাওয়ার অবস্থা অনিশ্চিত। পথ দীর্ঘ। যানবাহন পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই। চারদিকে অরাজকতা—এমন কি সে শহরও হয়ত নিরাপদ নয় আপনার পক্ষে। এমন অবস্থায়— ?'

'তুমি দেখছি আমাকে থাকার চেয়ে যাওয়ারই যুক্তি দেখালে। সে দেশ আমার পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ। আমার মতো বুড়ো-হাবড়াদের নিয়ে মাথা ঘামানোর অত ফুরসত কোথায় তাদের? আর শহরের অবস্থা অরাজক যদি না হবে লণ্ডন থেকে কেনই-বা একজন পুরনো বিশ্বাসী লোককে পাঠাতে যাবে? যানবাহনের অনিশ্চয়তা, পথের দৈর্ঘ্য আর

শীত সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি যে, এত বছর কাজ করার পর আজ যদি আমি ব্যাঙ্কের হয়ে এই ঝক্কিটুকু না নিই তো আর কে নেবে?'

'আমার ইচ্ছা আমিও যাই আপনার সঙ্গে।'

আপনমনে বলল যেন ডার্নে। কিন্তু তার স্বগতোক্তি কথায় প্রকাশ পেয়ে গেল।

'তুমি যাবে? ফ্রান্সে তোমার জন্ম—তুমি যাবে সেখানে? চমৎকার বুদ্ধি তোমার!'

'ফরাসী বলেই ক-দিন ধরে ভাবছি কথাটা বেশি ক'রে। আমার দেশের গরীব দুঃখীদের প্রতি আমার দরদ আছে। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি জমিদারি তুলে দিয়ে এসেছি তাদের হাতে—আমার ভয়ের কারণ কি আছে? আমি গিয়ে দাঁড়ালে লোকে আমার কথা শুনবেই। হয়ত তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে কিছুটা সামলাতে পারব। আপনি চলে এলে কাল রাতে লুসির সঙ্গে আমার এ নিয়েই কথা হচ্ছিল।'

ডার্নে গম্ভীর মুখে যে কথা বলল তাতে লরির চিন্তার কারণ হয়ে উঠল।

'লুসির নাম উল্লেখ করতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তাকে ফেলে এই সময় ফ্রান্সে যেতে চাও?'

'অবশ্য আমি তো আর সত্যি যাচ্ছি না', মুখে হাসি টেনে উত্তর দিল ডার্নে।

'যে অসুবিধের মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ-কারবার চালাতে হয় সে-সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই তোমার', চাপা-গলায় বললেন লরি, 'কত যে সতর্ক সাবধান হয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে তা বোঝাব কি ক'রে? ভগবান না করুন, আমাদের দলিল-পত্র যদি কোন গতিকে জনতার হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, কত লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে ভাবা যায় না। আজ বা আগামী কাল প্যারিস লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত, আগুনে ভস্মীভূত হবে না, একথা কে বলতে পরে? কাজেই এ-সময় তাড়াতাড়ি অন্তত বেশি দরকারী দলিল-পত্র উদ্ধার করে তার মধ্যে মূল্যবান কাগজপত্র বাছাই করে গুছিয়ে, হয় লুকিয়ে রাখা, নয়ত সঙ্গে করে নিয়ে চলে আসার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। টেলসন ব্যাঙ্কের কর্তারা জানেন সে কথা। ষাট বছর যাঁদের নিমক খেয়েছি, আজ বিপদের দিনে তাঁদের অকূলে ভাসিয়ে দেব? বয়সের দোষে গাঁটে গাঁটে ব্যথা লাগে—তাহলেও তোমাদের চেয়েও আমার কর্মক্ষমতা কিছু কম নয়।'

'আপনার সাহসের প্রশংসা করি আমি।'

'যতই তুচ্ছ হোক না কেন এই মুহূর্তে প্যারিস থেকে কিছু বের করে নিয়ে আসা এক রকম অসম্ভব। সে-সব দলিল হয়ত মূল্যবান নয়—হয়ত ভবিষ্যতে তার দাম হবে না—তবুও। আজই বহুমূল্য জিনিস দলিল-পত্র নিয়ে একদল এসেছে এখানে। তারা যখন সীমান্ত অতিক্রম করছিল তাদের প্রাণ একটি সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছিল। ধরা পড়লে কি হত একমাত্র ঈশ্বর জানেন। অথচ একসময় ছিল, কত কিছুই সেখান থেকে এখানে আসা-যাওয়া করেছে। কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু এখন সকল পথ রুদ্ধ, বিপদ-সঙ্কুল।'

'আজ রাতেই কি রওনা হবেন?'

লরি তার উৎকণ্ঠিত ভাবটি গোপন করলেন না। নিচু গলায় বললেন, 'আজ রাতেই। এত জরুরী ব্যাপার যে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করা অসম্ভব।'

'কেউ সঙ্গে যাবে না?'

'অনেকের নামই উঠেছে কিন্তু কেউই আমার পছন্দ নয়। শুধু জেরিকে সঙ্গে নেব। আমাদের ব্যাঙ্কের প্রহরী সে। ও আমার অনেকদিনের কাজকর্মের সঙ্গী। ওকে দেখে কেউ কোন সন্দেহ করবে না। মনিবের দেখাশুনার কাজে ওস্তাদ এইটুকু বুঝবে। এবার কাজ থেকে চিরকালের মতো ছুটি নেব। যথেষ্ট বুড়ো হয়েছি।

এখন পরকালের কথা ভাববার সময় হয়েছে। এই পবিত্র কর্তব্যটুকু পালন করার পর আমি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব অবসর নেবার জন্যে।'

ডার্নে যখন লরির সঙ্গে আলাপ করছিল ব্যাঙ্কের একজন লরির কাছে এসে তার ডেস্কে একটি ময়লা মুখবন্ধ খাম রেখে প্রশ্ন করল, 'ঠিকানার কোন হদিস পেলেন?'

ডার্নের খুব কাছে পড়েছিল খামটি। সহজেই তার নজর পড়ল ঠিকানাটার উপর। তারই পূর্ব নাম চিঠিখানির উপরে দেখে কম বিস্মিত হল না ডার্নে। ঠিকানাতে লেখা ছিল তার ফ্রান্সের জমিদারির নাম। টেলসন ব্যাঙ্কের মারফত এসেছে ফ্রান্সের গ্রাম থেকে।

বিয়ের দিন সকালে ডাঃ ম্যানেত ডার্নেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন তার আসল নাম তাদের দুজনের মধ্যেই গোপন রাখতে। ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে যেন বেফাঁস না হয় বাইরে। কেউ জানে না আজ পর্যন্ত—তার স্ত্রীও না। লরির তো জানার কথাই নয়।

লরি বললেন, 'যারা ব্যাঙ্কে আসে তাদের প্রত্যেককে দেখিয়েছি চিঠিখানা। কিন্তু ঐ নামের কোন লোকের আজও পর্যন্ত হদিস পাওয়া যায়নি।

ব্যাঙ্ক বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। লরির ডেস্কের পাশ দিয়ে চলেছে নানা লোক। লরি তাদের দিকে চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কেউ চেনেন নাকি লোকটিকে।

তার সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলল। কিন্তু তাকে চিনল না কেউ।

'যে মারকুইস খুন হয়েছিলেন সেই অভিজাত মানুষটির ভাইপো শুনেছি ছোকরা', বলল একজন, 'ওরকম লোকের সঙ্গে চেনা না হওয়াই ভালো।'

'লোকটা একটা পাষণ্ড। ঐ জমিদার খড়ের গাদায় মাথা ঢুকিয়ে পা উঁচু করে প্যারিস থেকে পালিয়ে এসেছিল ক-বছর আগে', বলল অন্যজন।

'লোকটি রাজনীতির নূতন চিন্তায় বিশ্বাস করত। গণতন্ত্র আর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওর কাকা মারকুইসের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। তার পর যখন সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়, সে সব ছেড়ে চলে এসেছে। একজন গুণ্ডা বদমায়েশের হাতে সে সব সঁপে দিয়ে এসেছে।'

ষ্ট্রিভার ছিলেন কাছেই।

বললেন, 'তাই নাকি? লোকটা ঐ রকম টাইপের? দেখি, সেই কুখ্যাত নাম আর পদবী।'

ষ্ট্রিভারের কাঁধে হাত রাখল ডার্নে। নিজেকে সংযত রাখা তার পক্ষে আর সম্ভবপর হচ্ছিল না।

'আমি লোকটাকে জানি।'

'আশ্চর্য কথা! তবে আমি দুঃখিত।' বলল ষ্ট্রিভার।

'কেন? দুঃখিত কেন?'

'কেন কি, মি. ডার্নে?' বলল ষ্ট্রিভার, 'লোকটার কীর্তিকলাপ শুনলেন। এই পরিস্থিতিতে কেন—সে প্রশ্ন করবেন না।'

'কিন্তু কেন—আমি তা শুনতে চাই।'

'সে-কথা আপনাকে আমি বলতে চাই না, মি. ডার্নে। এমনধারা অদ্ভুত প্রশ্ন আপনি করতে পারেন, আমি ভাবতেই পারি না। এই লোকটা একটা শয়তান। জীবনের সব নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে লোকটা নিজের সম্পত্তি সব দুনিয়ার খুনেদের হাতে দিয়েছে —যাদের কাজ হল পাইকারী হারে খুন করা। আমার কি মনে হয় জানেন, এই ধরনের

পাষণ্ডদের সঙ্গ করাও পাপ। তাতে সংক্রমণের ভয় থাকে। শুধু সেইজন্য আমি আপনাকে বলছিলাম।'

ডার্নে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

সেই গোপনীয়তা তার জীবনের সব সুখের চাবিকাঠি।

তবু বলল, 'হয়ত সেই মানুষটিকে যথাযথ ভাবে আপনি বুঝতে চেষ্টা করেননি।'

'আপনাকে যুক্তিতে কোণঠাসা করা মোটেই শক্ত নয়, মি. ডার্নে। তাই করব আমি। ও লোকটা যদি ভদ্রলোক হয় তবে ও-রকম ভদ্রলোক আমার মাথায় আসে না। সে-কথা তাকে আপনি বলতে পারেন আমার জবানিতে। ঐ সব খুনেদের হাতে সম্পত্তি আর প্রজাদের তুলে দিয়ে লোকটা তাদের সর্দার হয়ে ওঠেনি তো?'

ষ্ট্রিভার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তার পর বলল, 'মানুষের চরিত্র আমার মোটামুটি জানা আছে। ঐ ধরনের লোকেদের ওপর বিশ্বাস করে বেহুঁশ বসে থাকার পাত্র এই সব ভদ্রলোক নয়। এরা একটা ঝগড়া-ঝাঁটি দেখলে প্রথমেই সরে পড়ার তালে থাকে।'

আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না ষ্ট্রিভার।

ডার্নের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিল। তারপর ফ্লিট ষ্ট্রিটের ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাঙ্ক একে একে খালি হয়ে গেল। রইল বাকি শুধু লরি আর ডার্নে।

ডার্নে বলল, 'আমি চিনি লোকটিকে।'

'তুমি এই চিঠির দায়িত্ব নেবে? জান তো কাকে দিতে হবে? এরকম জঘন্য মানুষের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে জেনে দুঃখিত হলাম। সে কি কুকীর্তি করেছে জান?'

'ঠিক লোকের হাতেই পৌঁছে দেব। আপনি কি এখান থেকেই যাত্রা করবেন?'

'এখান থেকেই। ঠিক আটটার সময়।'

'আপনাকে গাড়িতে তুলে দিতে আসব।'

ডার্নে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এসে একটু নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে চিঠি খুলে পড়তে লাগল—

অ্যাবে জেল, প্যারিস ২১ জুন, ১৭৯২

মসেঁনার বর্তমান মারকুইস,

'বহু দিন প্রাণ হাতে লইয়া কাটানোর পর অবশেষে প্রজাদের হাতে বন্দী হইয়াছি। তার পর চলিয়াছে নিদারুণ অত্যাচার ও অপমান। পথেও অত্যাচারের অবধি ছিল না। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তারা আমার বাড়ি-ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে। আমি মারকুইসের ভৃত্য—আপনার দাস।

যে-অপরাধে আমাকে বন্দী করা হইয়াছে, যাহার জন্য আমার বিচার হইবে—তাহা এই, আমি নাকি প্রজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছি। একজন দেশ-ত্যাগীর স্বপক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু আমি যে কখনই তাহাদের শত্রুতা করি নাই, সে কথা কে শুনিবে? যেদিন হইতে আপনার সম্পত্তি বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহার পর আমি এক কপর্দকও কর আদায় করি নাই। আমি কোনপ্রকার শঠতার আশ্রয় লই নাই। কিন্তু কে আমার কথায় কান দিবে? তাহাদের একমাত্র অভিযোগ—আমি একজন বাস্তুত্যাগীর স্বপক্ষে কাজ করিয়াছি—কিন্তু কোথায় তিনি? সেই মহানুভব মসেঁনার মারকুইস এখন কোথায় দেশত্যাগী হইয়া আছেন? ঘুমের মধ্যেও আমি কাঁদি—কোথায় তিনি? ভগবানের নিকট কাতর মিনতি জানাই, তিনি কি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন না?

টেলসন ব্যাঙ্কের মারফত সমুদ্রের পরপারে পাঠাই আমার এই কাতর ক্রন্দন, হয়ত একদিন সেই কান্না পৌঁছিবে আমার মুক্তিদাতার কানে।

আপনার বংশের সুনাম ও সম্মানের দাবিতে আমি মিনতি করিতেছি, মসেঁনার! যেখানেই থাকুন আপনি সত্বর আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমার অপরাধ আমি আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আপনি এখন আসিয়া সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করুন।

এই ভীতির রাজ্য হইতে—এই অন্ধকার কারাকক্ষ হইতে আমায় উদ্ধার করুন। আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণিতেছি।

আপনার চিরবিশ্বস্ত
হতভাগ্য গ্যাবেল।

তার ভিতরকার সুপ্ত অস্বস্তি এই একখানি পত্রে যেন দারুণ ভাবে ধাক্কা খেল।

তাদের পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী—যার একমাত্র অপরাধ সে তার ও তার পরিবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি—সে আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। তার অনুযোগ-কঠিন মুখখানি ডার্নে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল।

তাদের বংশের দুর্নাম, অত্যাচারের পরিণাম, ভীতি, পিতৃব্যের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ, ধসে-পড়া আভিজাত্যের রাশ আটকে রাখার প্রতি বিতৃষ্ণাবশত সে পাকা মুন্সিয়ানা দেখাতে পারেনি। যে আভিজাত্য ও জমিদারি তার হাতে বর্তাল তার কোন প্রকৃত ব্যবস্থা না করে সে ছেলেমানুষী কাজ করেছে।

আজ সে তো ভালো করেই জানে যে লুসির প্রতি ভালোবাসায় তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিসর্জন। হোক তা বহুদিনের সংকল্পিত—তবু তার মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্তের অপরিণামদর্শিতা জড়িয়ে আছে।

সব-কিছু গুছিয়ে ভেবে চিন্তা করা তার উচিত ছিল। হয়ত করার ইচ্ছা তার ছিল। কিন্তু করা হয়ে ওঠেনি।

এইখানে এই ইংরেজি সমাজে তার গৃহস্থালির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ-কর্মের মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকার বাসনা এবং ঘটনা-প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে নিজেকে সে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে। যতদূর দেখা যাচ্ছে এ সপ্তাহের আদেশ পরবর্তী সপ্তাহের দ্রুত পরিবর্তনে আমূল পালটে যাচ্ছে। তার পরের সপ্তাহে পরিস্থিতি এক নব কলেবর ধারণ করছে। এর ভিতর নিজেকে সে নিরঙ্কুশ বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করছিল। মনের ভিতর তার অস্বস্তি খচ খচ করে কাঁটার মত বিঁধছিল ঠিকই, কিন্তু সে কোন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেনি।

বহুদিন ধরে কর্তব্যে অগ্রসর হবার কথা ভাবছিল ডার্নে। কিন্তু যে-ভাবে সারা ফ্রান্স জুড়ে অভিজাত পরিবারগুলি হয় নিহত হচ্ছিল, নয়ত পালিয়ে আসছিল সীমান্ত ডিঙিয়ে, যে-ভাবে ধনসম্পত্তি হীরা-জহরত হয় লুটপাট নয়ত বিনষ্ট ও বাজেয়াপ্ত হচ্ছিল—যেভাবে সেই সব অভিজাত পরিবারের নাম মুছে যাচ্ছিল দেশ থেকে, তাতে সে দেশে গেলে বিপদগ্রস্ত হতে পারে—এমন সম্ভাবনা তার মনে ছিল না তা নয়।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে জীবনে কারুর উপর অত্যাচার করেনি। কাউকে কারাগারে পাঠায়নি। শোষণের টাকায় জীবনের আরাম পাবার লোভ পরিত্যাগ করে সে নিজেকে বৃহৎ জগতে নির্বাসিত করেছে স্বেচ্ছায়। আজ নিজের ক্ষুধার অন্ন সে নিজের পরিশ্রমে উপার্জন করে।

তার নির্দেশ ছিল নায়েব গ্যাবেলের উপর যে, ক্ষীয়মাণ জমিদারির যত ক্ষতিই হোক—দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে যেন জোর করে ভাড়া কি সুদ আদায় না করা হয়। শীতে

তাদের কাঠ দিয়ে সাহায্য করবে গ্যাবেল। গ্রীষ্মের দিনে যথাসম্ভব সাহায্যের হাত এগিয়ে দেবে মানুষদের। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে এ-সবই কাগজপত্রে আদেশ দিয়ে এসেছে ডার্নে। সে-সব নির্দেশ এখন লোক-সমক্ষে জানাজানি হবে। তাতে তার প্রতি বিপ্লবীদের সহানুভূতি হবেই।

এই শেষ চিন্তার জোরে ডার্নে স্থির করে ফেলল যে প্যারিসে যাবে সে।

প্রাচীন কাহিনীর নাবিকের মতো, জীবনের ঝড় তুফান তাকে সেই চুম্বক-পাহাড়ের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। মন আচ্ছন্ন করে যত চিন্তা আসা-যাওয়া করছিল, সবই সেই চুম্বকের দিকে তাকে ঠেলে দিতে লাগল।

ডার্নের মনে হতে লাগল যে তার দুর্ভাগা দেশে কিছু কিছু মন্দগতি লোক এই সব অন্যায় জুলুমের রাজত্ব কায়েম করতে চেষ্টা করছে। তাকে সবাই ভালোবাসে—সে তাদের চেয়ে অনেক ভালো। সে যদি চেষ্টা করে হয়ত-বা এ রক্তক্ষয় বন্ধ করা যাবে। হয়ত-বা মানব প্রেম ও করুণায় প্রভাবিত হয়ে এই দুর্যোগের অবসান ঘটবে।

লরির সঙ্গে তুলনা করে কত ছোট মনে হল নিজেকে। ঐ বৃদ্ধ মানুষটির কি অসীম মনোবল—কত নিষ্ঠা! তার মনে পড়ল স্ট্রাইভারের ব্যঙ্গোক্তি। তার পর গ্যাবেলের চিঠির সরল আবেদন—একটি মৃত্যুপথযাত্রীর কাতরতা তাকে স্থির থাকতে দিল না। বংশের সুনাম, ন্যায়বিচার ও কর্তব্যের আহ্বানে সে বধির থাকতে পারে না।

দৃঢ় সংকল্প করল ডার্নে। প্যারিসে সে যাবে।

সেই চুম্বক-পাহাড়ের আকর্ষণে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে যতক্ষণ না তার উপর আছড়ে পড়ে সে।

কিন্তু ডার্নে কোন পাহাড় দেখল না। কোন বিপদের সম্ভাবনা তার কল্পনাতেও ছিল না। যে-সব কাজ সে অসমাপ্ত রেখে এসেছে—যেভাবে রেখে এসেছে—যে-সব নির্দেশনামা সে দিয়েছে জমিদারি পরিচালনার ব্যাপারে—তার প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের জন্যে—সে-সব এইবার তার উপস্থিতিতে লোকে সাগ্রহে মেনে নেবে। এই সব সরল ভালো মানুষেরা যেভাবে জীবনে তাদের সাফল্যের মরীচিকা দেখে, ঠিক তেমনি ভাবেই এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ দিনের স্বপ্ন দেখতে লাগল ডার্নে।

হয়ত-বা জনতার অভিলাষে এই উন্মত্ত অভিযান থেকে বিপ্লবকে সে সঠিক পথে নিয়ে যাবার নেতৃত্ব দিতে পারবে।

কিন্তু তার যাত্রার কথা কোন ভাবে লুসি বা তার পিতাকে জানানো হবে না। এ বিচ্ছেদ-বেদনা লুসি সহ্য করতে পারবে না।

ডাক্তার ম্যানেতকে এই অসম্ভব দুর্যোগের চিন্তায় ফেলা মোটেই উচিত হবে না, ভাবল ডার্নে। বরং তাঁকে সমস্ত পরিস্থিতির সরল পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে শান্ত করা চলবে।

একদিন ডাক্তার ফ্রান্সে থাকাকালীন যে ভয়াবহ অবস্থায় কাল কাটিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বর্তমান বিপ্লবীদের যে ভাবনার যোগসূত্র আর সেই পটভূমিকায় দেশত্যাগী অভিজাত হিসেবে তার বিশেষ দায়দায়িত্বের কথা কিন্তু একবারও তার মনে হল না।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ইতস্তত পায়চারি করতে লাগল ডার্নে। ক্রমশ টেলসন ব্যাঙ্কে ফিরে আসার সময় হয়ে এল। লরির কাছে বিদায় নিতে হবে। প্যারিসে পৌঁছেই প্রথমে দেখা করবে লরির সঙ্গে। কিন্তু এখন তাঁকে সংকল্পের কথা জানতে দেওয়া হবে না।

ব্যাঙ্কের দরজায় গাড়ি তৈরি। প্রস্তুত হয়ে এসেছেন লরি।

'চিঠিখানি দিয়েছি মালিককে', বলল ডার্নে—'লিখিত উত্তর হাতে হাতে দিয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইনে। তবে তার মৌখিক-উত্তর জানতে পারেন।'

'এখুনি বল, যদি কোন বিপদ না থাকে।'

'বিপদের কিছু নেই। তবে উত্তরটা দিতে হবে একজন বন্দীকে।'
'বন্দীর নাম?'
'গ্যাবেল—'
'কি বলতে হবে হতভাগ্যকে?'
'বলতে হবে মালিক তার চিঠি পেয়েছে এবং আসবে।'
'কখন আসবে, দিন-ক্ষণ কিছু বলেছে?'
'আগামী কাল রাতে সে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করবে।'
'অন্য কারুর নাম বলেছে?'
'না।'

অনেকগুলি কোট ও ক্লোক পরলেন লরি। লরিকে পোশাক পরতে সাহায্য করল ডার্নে। তার পর ব্যাঙ্কের ভিতরের উষ্ণ পরিবেশ পরিত্যাগ করে তারা দুজনে কুয়াশা-ঢাকা ফ্লীট ষ্ট্রীটে এসে দাঁড়ালেন।

'লুসি আর তার মেয়েকে আমার ভালোবাসা দিও। যত দিন না ফিরি দেখো তাদের।'

ডার্নে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। কিন্তু মুখের হাসিতে কি মনের কপটতা ঢাকা পড়ল?

লরিকে নিয়ে গাড়ি দ্রুত বেগে চলে গেল।

সেই ২৪ আগস্ট গভীর রাত পর্যন্ত জেগে দুখানা চিঠি লিখল ডার্নে। একখানি লুসিকে—প্যারিসে যাওয়ার কর্তব্যের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা ক'রে। সেখানে তার ব্যক্তিগত বিপদের কোন সম্ভাবনাই নেই, এ কথাও উল্লেখ করতে ভুলল না। আর একখানি চিঠি লিখল সে ডাঃ ম্যানেতকে। স্ত্রী ও কন্যার ভার তাঁর উপর সে অর্পণ করল সেই চিঠিতে। নিজের নিরাপত্তার কথা তাঁকেও বিশেষ করে লিখে সে তাঁকে আশ্বস্ত করল। প্যারিসে পৌঁছেই খবর দেবে সে।

কোন দুর্ভাবনার কোন সম্ভাবনা নেই।

বিদায়ের দিনটি অতি দুর্বিষহ হয়ে উঠল ডার্নের পক্ষে। আসল উদ্দেশ্যটি গোপন রাখতে হবে লুসির কাছ থেকে। ঘুণাক্ষরেও যেন লুসির মনে কোন সন্দেহের রেখাপাত না করে। সেই মেয়েটির হাসিখুশি গৃহস্থালিতে কোথাও কোন আশঙ্কার লেশমাত্র নেই। তবু কষ্ট করে নিজেকে সম্বরণ করল ডার্নে।

দিন কেটে গেল দ্রুত পায়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে লুসিকে আর তার মেয়েকে গভীর আবেগে আলিঙ্গন করে ডার্নে কুয়াশা-ঢাকা রাস্তায় নেমে পড়ল। সে কোথায় যাচ্ছে তার কোন ইঙ্গিত দিল না।

একটা অদৃশ্য শক্তি অমোঘ আকর্ষণে তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে। এক জন বিশ্বস্ত চাকরের হাতে চিঠি দুখানি দিয়ে এসেছে। মাঝ-রাত পেরুলে দেবে। নিরপরাধ বন্দীর আকুল ক্রন্দন কানে বাজছে ডার্নের। ঈশ্বরের নামে ন্যায় সত্য আর বংশমর্যাদার নামে আমায় বাঁচান। সে-ক্রন্দনে বধির থাকতে পারে না সে। জীবনের প্রিয়তম যা-কিছু সব পিছনে ফেলে চুম্বকাকর্ষণে ছুটে চলেছে সে এক অমোঘ পরিণতির দিকে।

তৃতীয় খণ্ড

ঝড়ের পদচিহ্ন

১ নির্জন সেলে

সতের শ বিরানব্বই সাল। ইংল্যান্ড থেকে চলেছে পথিক প্যারিসের পথে। সে-পথে বিড়ম্বনার শেষ ছিল না সে-বছরে। দেশ আলো করে রাজা তখনও ছিলেন বটে, কিন্তু পথঘাটের অসুবিধাই শুধু নয়—রুগ্ন ঘোড়াদের দল—আরও অনেক আনুষঙ্গিক ঝক্কি ছিল পথে। দিন-বদলের অন্য ঝুঁকিও বড় কম ছিল না। শহর-গাঁয়ে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গাদা বন্দুক নিয়ে বিপ্লবী ফৌজের ছোট ছোট দল টহল দিত, আসাযাওয়ার পথে লোকের উপর নজর রাখত। সীমান্ত ডিঙিয়ে আসতে যেতে হলে পথিককে কাগজ-পত্র দেখাতে হত—সনাক্ত হতে হত—জাহাজ জাহাজ কৈফিয়ত দিয়েও সন্তুষ্ট করতে না পারলে বিপ্লবীদের শাস্তি নিতে হত। বিপ্লবীদের আইনে ইতিহাসের নতুন প্রত্যূষে নয়া পত্তনির বুনিয়াদ। লোকের মুখে তখন এক আওয়াজ—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু। আমাদের গণতন্ত্র এক ও অখণ্ড।

ফ্রান্সের জমিতে কিছু দূর অগ্রসর হতেই ডার্নের বুঝতে বাকি রইল না যে, এর পর ইংল্যান্ডে ফেরার পথ তার পক্ষে শানিত দুরত্যয়া দুর্গম পথ। এই সব প্রহরীদের দ্বারা কর্তা প্যারিসে তাদের কাগজ-পত্র দেখিয়ে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কয়েক পা অন্তর সে যেন হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে। সর্বত্র সতর্ক সন্দিহান দৃষ্টি, কারা যেন বেড়াজাল দিয়ে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলছে। এক এক গ্রাম উজিয়ে যাচ্ছে সে, আর পিছনে, লোহার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে কারা।

নজরে থেকে থেকে ডার্নের যেন হাঁফ ধরে যায়। এগিয়ে যাচ্ছে সে অন্য মনে, হঠাৎ দেখল কারা যেন পিছন পিছন আসছে ছায়ার মতো, কতবার তাকে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের তলবে। এক পা এগোতে বিশ পা পিছোতে হচ্ছে সন্দেহের আগুনে।

এমনি একদিন হা-ক্লান্ত হয়ে ডার্নে এক ছোট শহরের পান্থশালায় বিশ্রাম নিচ্ছিল রাতে। এখনও প্যারিস বহুদূর। এত দূর পর্যন্ত গ্যাবেলের চিঠিখানিই তাকে বাঁচিয়ে এসেছে। কিন্তু এই গ্রামে এসে বিপ্লবীদের কথাবার্তা শুনে অবধি তার মনের শান্তি ঘুচে গেল। একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা নিয়েই ঘুমোতে গিয়েছিল ডার্নে। মাঝ রাতে কাদের ডাকে উঠে ঘুম-ভাঙ্গা চোখে দারুণ অবাক হল সে।

কাদের পায়ের আওয়াজে, গাদা বন্দুকের শব্দে চকিত হয়ে তাকাল ডার্নে। দেখল মাথায় মোটা লাল টুপি, মুখে তামাকের পাইপ দিয়ে তিন জন লোক বন্দুক ঠুকে তার বিছানায় চেপে বসল।

'আমাদের একজন নাগরিকের অধীনে তোমাকে প্যারিসে চালান দেবার হুকুম দিয়েছি আমি।'

'প্যারিসে যাবারই ইচ্ছা আমার। তবে কোন সঙ্গী না হলেও চলবে।'

'সে কি? তুমি হলে জমিদার—জমিদার-নন্দন—তোমার সঙ্গে লোক না দিলে কি হয়? অবশ্য তার খরচ জমা দিতে হবে আগে।'

ডার্নে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তাতে আপত্তি করব না আমি।'

'আপত্তি! শোন আমাদের জমিদারবাবুর কথা', রুক্ষ গলায় বলল একজন।

'আমাদের হাতে পড়েছ, তাই বিচারের আশা আছে। নইলে সরাসরি ল্যাম্পপোস্টে ঝুলতে। যাক চটপট তৈরি হয়ে নাও।'

তারা পাহারাদারদের ডেরায় নিয়ে গেল তাকে। সেখানে অনেক বিপ্লবীর ভিড়। দুজন পাহারাদারের খরচা হিসেবে মোটা টাকা এখানকার ঘাঁটিতে জমা দিতে হল ডার্নেকে। তারা তাকে ভোর তিনটেয় নিয়ে বেরুল। রাতের শিশিরে কুয়াশায় তখনও আকাশ-মাটি ভিজে। একটু পরেই তীরের ফলার মতো বৃষ্টি নামল।

সারা দিন বিশ্রাম আর গা-আঁধারি সন্ধ্যে হলেই যাত্রা। সারা রাত যাওয়া আর ভোর হলেই বিশ্রাম। এমনি করে গ্রামের পর গ্রাম এগিয়ে যেতে লাগল ডার্নে। সঙ্গে দুজন পাহারাদার থাকায় অস্বস্তি হলেও, নিজের নিরাপত্তার কোন আশঙ্কা ছিল না তার। প্যারিসে গিয়ে একবার পেঁছলেই তার সমস্ত অস্বস্তি-অশান্তির অবসান ঘটবে। গ্যাবেলকে সে কারামুক্ত করবেই। মনুষ্যত্বের আবেদনে এত দূর সে ছুটে এসেছে, নিজের সামান্য অসুবিধায় কি করে এখন পিছিয়ে যাবে?

প্রথম শহরেই ডার্নে প্রথম বিভীষিকা দেখল। সন্ধ্যা হয় হয়। পথে ভিড়। দুজন পাহারাদারের সঙ্গে ঘোড়া বদলের জায়গায় নামতেই এক দল লোক তাকে ঘিরে ফেলল। তাদের মুখ-চোখের দিকে চেয়ে ডার্নের বুঝতে বাকি রইল না যে তারা কি চায়। 'দেশত্যাগীর খুন চাই।' জনতার চোখে হিংসা, মুখে হত্যার মাদকতা, কন্ঠে এক আওয়াজ —'খুন চাই, খুন চাই।'

উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচবার আশায় শান্ত কন্ঠে ডার্নে বলল, 'দেশত্যাগী? কি বলছেন আপনারা? দেখছেন না আমি স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছি দেশে।'

হাতের কুড়ুল উঁচিয়ে একটা লোক যেন তেড়ে এল তার দিকে, 'দেশত্যাগী! দেশত্যাগী নও শুধু, তুমি হলে ঘৃণ্য জমিদার। তোমায় খুন করব আমরা। জান না মিথ্যেবাদী— ডিক্রি হয়ে গেছে—।'

মারমুখী জনতার আক্রমণ থেকে ডার্নেকে বাঁচাল পোস্টমাস্টার। তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে সে সকলকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমরা উতলা হচ্ছ কেন, ভাই-বন্ধুরা? আগে প্যারিসে এর বিচার হোক—তার পর যা হবার তা তো হবেই।'

ডার্নেকে নিয়ে লোকটা ভিতরে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিল। জনতা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গেটের উপর। কাস্তে হাতুড়ি কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল লোহার দরজায়। কিন্তু তার পর কি জানি কেন সব ঝিমিয়ে গেল। জনতা পাতলা হয়ে এল।

পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞেস করল ডার্নে, 'ডিক্রির কথাটা কি বলছিল লোকটা?'

এইভাবে বিপদ-মুক্ত করার জন্যে তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিল সে। তার পর আবার বলল, 'কিসের ডিক্রি?'

'দেশত্যাগীদের সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে ডিক্রি হয়েছে।'

'কবে হয়েছে?'

চৌদ্দ তারিখে।'

'যেদিন আমি ইংল্যান্ড ত্যাগ করি সেই দিন?'

'ওটা অনেক হুকুমের একটা মাত্র। যত দেশত্যাগী আছে তাদের সব নির্বাসন হুকুম হয়েছে। যে ফিরবে এ দেশে তাকে হত্যা করা হবে। সেই হিসেবে লোকটা বলছিল যে আপনার প্রাণ এখন বিপ্লবীদের হাতে।'

'কিন্তু সে-হুকুম তো এখনও হয়নি।'

'কি জানি। কত হচ্ছে কত হবে।'

মাঝরাত অবধি ওরা খড়ের উপর শুয়ে কাটাল।

তারপর সারা শহর ঘুমোলে ওরা বেরিয়ে পড়ল পথে।

আজ ক-দিন রাতভোর পথে চলতে চলতে অনেক নতুন পরিবর্তনের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস তার চোখে বিশেষ করে পড়েছে। অনেকখানি নির্জন পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ ওরা এসে পড়েছে এক ঝাঁক কুটিরের সামনে। সেই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সব কুঁড়েতেই জ্বলছে আলো। আর লোকেরা সেই মধ্যরাতে গোল হয়ে হাতে হাত দিয়ে স্বাধীনতার প্রতীক ঘিরে বসেছে। কখনও গাইছে মুক্তির গান।

ভাগ্যক্রমে সে রাতে এই সীমান্তে তেমন কেউ জেগে ছিল না। তারা নিঃশব্দে এই শহর পার হয়ে চলে গেল। তার পর নির্জন পথে পড়ল।

বছরের এই অসময়ে ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। বৃষ্টিতে সব ভেজা। ফসলহীন মাঠের পাশ দিয়ে—অগ্নিদগ্ধ বাড়ি ঘরদোরের কোণ দিয়ে ওরা এগিয়ে যেতে লাগল। মাঝেমাঝে হঠাৎ বিপ্লবের রক্ষী-বাহিনী কোন ঝোপের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে তাদের কাগজপত্র দেখে নিচ্ছে।

প্যারিসের বাইরে গিয়ে ওরা যখন দাঁড়াল তখন দিনের আলো ফুটেছে।

রক্ষীবাহিনী দারুণ তৎপর।

'বন্দীর কাগজপত্র কই ?'

একজন অফিসারকে ডেকে আনল গার্ড। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'কাগজপত্র কই ?'

কথাটা তার কানে বড় অপ্রিয় হয়ে বাজল।

ডার্নে সেই লোকটিকে স্মরণ করিয়ে দিল যে এদেশে সে স্বেচ্ছায় এসেছে—সে নিজে ফরাসী নাগরিক। বন্দী সে নয়। দেশের এই অরাজক অবস্থার দরুন তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রাষ্ট্র তাকে এই সঙ্গীকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছে, তার খরচপত্তরও সে মিটিয়ে দিয়েছে।

তার মাতাল বিপ্লবী সঙ্গী মাথার টুপি থেকে কাগজপত্র বের করে দিল।

গ্যাবেলের চিঠিটা পড়ে লোকটা একটু যেন অবাক হল। ডার্নের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল।

কাগজপত্র নিয়ে ওরা ভিতরে চলে গেলে ডার্নে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। গেটে অনেক পাহারা। তাদের মধ্যে বিপ্লবী-রক্ষীরাই সংখ্যায় অনেক বেশি। বাকি কিছু সৈনিক চোখে পড়ল।

চাষীদের গাড়ি মালপত্র নিয়ে আনাগোনা করছে। তাদের খুব একটা অসুবিধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষদের বেলায় খুবই কড়াকড়ি রয়েছে। অজস্র পুরুষ মেয়ের সঙ্গে নানা ধরনের গাড়ি আর জন্তু-জানোয়ার ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছে। তাদের হুকুম হতে বহু দেরি হচ্ছে আর ভিড় বাড়ছে ক্রমশ।

লোকে অপেক্ষা করতে করতে গল্প-গুজব করছে। কেউ কেউ তামাক পোড়াচ্ছে। যাদের আরও দেরি হবার আশঙ্কা মাটিতে পড়ে ঘুমিয়েও নিচ্ছে তারা।

লাল টুপি আর তেরঙা পতাকা সকলের কাছেই। সারা দেশ যেন ছেয়ে গেছে এই দুই প্রতীকে।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সেই লোকটা এসে গার্ডকে গেট খুলে দিতে হুকুম দিল।

আর সেই মাতাল সঙ্গীকে একখানা রসিদ দিল। লোকটা বন্দী ডার্নেকে নিরাপদে যে পৌঁছে দিয়েছে তারই চিরকুট।

তার পর তাকে নিয়ে গেল একজন রক্ষীদের ঘরে।

সারা ঘর মদ আর তামাকের গন্ধে ভরপুর। বহু সৈন্য আর বিপ্লবী-রক্ষী সেখানে

বিশ্রাম করছে। অনেকে ঘুমোচ্ছে। কেউ কেউ বা আধো জাগরিত অবস্থায় মিটমিট করে দেখছে সব। কেউ কেউ দারুণ মত্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু-চারজন সুস্থ মেজাজের মানুষকেও দেখল ডার্নে।

ঘরের ভিতর তখনও বাতি জ্বলছে। সেই আলোর সঙ্গে মেঘলা দিনের আলো মিশে ঘরে একটা অদ্ভুত ভাব জড়িয়ে রয়েছে যেন। একটা ছন্নছাড়া এলোমেলো ভাব।

একটা টেবিলের উপর কয়েকখানা খাতা খোলা পড়ে রয়েছে।

আর সেই ঘরে একজন অফিসার সব তত্ত্বাবধান করছেন। তার পোশাকে কি চেহারায় কোন শৌখিনতা নেই। মুখের রঙ তামাটে।

ঘরের মধ্যে একজন তাকে দেখিয়ে বলল, 'কমরেড দ্যফর্জ, দেখ তো এই লোকটাই মারকুইস এভরে মঁদ কিনা?'

'হ্যাঁ—এই তো।'

'তোমার বয়স কত?'

'সাঁইত্রিশ হবে।'

'বিবাহিত?'

'হ্যাঁ—'

'কোথায় বিয়ে হয়েছিল?'

'ইংল্যান্ডে।'

'তা তো বটেই। বউ কোথায়?'

'সে ইংল্যান্ডে আছে।'

'বেশ, বেশ। লা ফোর্স জেলে চালান দাও কয়েদীকে।'

'জেলে কেন?'

একের পর এক বিস্ময়ে ডার্নে যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। বলল, 'জেলে কেন যাব? আমার অপরাধ কি? কি আইনে আমায় তোমরা জেলে পাঠাচ্ছ?'

রূঢ় কণ্ঠের জবাব পেল ডার্নে, 'আইন? তুমি চলে যাবার পর এ দেশে নতুন আইন হয়েছে। অপরাধেরও মানে পালটেছে।'

'আমি তোমাদের মিনতি করছি', বলল ডার্নে 'আমি শপথ করে বলছি যে, আপন ইচ্ছেতেই আমি ফ্রান্সে এসেছি। আমাদের গ্রামের একজন লোক বড় বিপন্ন হয়ে আমায় চিঠি লিখেছিল—সেই চিঠি রয়েছে, পড়ে দেখ। কিন্তু আমায় তোমরা দেরি করিয়ে দিও না অনর্থক—তাকে আমায় উদ্ধার করতেই হবে। সে অধিকারটুকু দাও আমায়?'

'অধিকার? দেশত্যাগীর আবার অধিকার কি? যাও।'

হুকুম লিখে দিল সে কাগজে। বলল, 'এই নাও।'

ওপরে লেখা গোপনীয়।

দ্যফর্জের অনুসরণ করল ডার্নে।

রক্ষী-গৃহের বাইরে এসে অন্য দুজন সঙ্গীর আড়ালে দ্যফর্জ নিচু গলায় বলল, 'ডাক্তার ম্যানেতের মেয়েকে তবে আপনিই বিয়ে করেছেন? যে-ডাক্তার বাস্তিল দুর্গে বন্দী ছিলেন। সেই বাস্তিল দুর্গ আর নেই জানেন!'

সচকিত হয়ে মুখ তুলল ডার্নে। অবাক কণ্ঠে সায় দিল।

তারা তখন প্যারিসের পথে পা দিয়েছে।

'আমার নাম দ্যফর্জ। প্যারিসে আমার মদের দোকান আছে। হয়ত-বা আমার নাম আপনার শোনা থাকতে পারে।'

'শুনেছি বই কি। আপনার বাড়িতেই আমার স্ত্রী তার বাবাকে ফিরে পেয়েছিল।'

'স্ত্রী' এই কথাটিতে কি যেন ছিল, দ্যফর্জ অনিশ্চিত অধীর কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু

এখন এভাবে ফিরে কেন এলেন ফ্রান্সে? এখন গিলোটিন চালু হয়েছে—এই কি আপনার দেশে আসার সুসময় হল?'

'এই তো বললাম। গ্যাবেলকে উদ্ধার করতেই হবে আমায়। সে আমাদের অনেক উপকার করেছে—সে বড় ভালো। কিন্তু আমার কথা বুঝি সত্যি মনে হল না?'

'সত্যি হয়ত, কিন্তু আপনার পক্ষে বড় মর্মান্তিক সত্যি।'

তার কপালে চিন্তার দাগ।

'আমি নিজে কিছু বুঝতে পারছি না', নিমজ্জমান ডার্নে আলাপের সূত্র ছাড়তে চাইল না। বলল, 'এবার এসে যা দেখছি এ সব আমার কল্পনার অতীত। যেন একটা ঘূর্ণিতে পড়ে আমি তলিয়ে যাচ্ছি। সব বদলে গেছে—তবু আপনি আমার পরিচিত—আপনি আমায় সাহায্য করুন। আমি সেখানে বিনা বিচারে মরব নাকি? আমার বিচারের সুবিধা করে দেবেন তো?'

'আমার দ্বারা কোন উপকার হবে না', দ্যফর্জ মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। লোকটির কপালের ক-টি কুঞ্চন-রেখাই শুধু চোখে পড়ল ডার্নের।

'আমার একটি প্রশ্নের উত্তর কি আপনি দেবেন?'

'প্রশ্নের রকম বুঝে। কি জানতে চান বলুন!'

'যে কারাগারে আমাকে অন্যায়ভাবে পাঠানো হচ্ছে, সেখান থেকে আমি কি বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব?'

'দেখুন—কি হয়।'

'আমি কি আত্মপক্ষসমর্থনের সুযোগ পাব না? আমাকে কি বিনা বিচারে জেলে পচে মরতে হবে।'

'দেখতেই পাবেন আপনার কি হয়। এর আগে বহু মানুষ এমনি বিনা বিচারে জেলে পচে মরেছে।'

'কিন্তু আমি তো এমন কাজ কখনও করিনি।'

কোন উত্তর না দিয়ে দ্যফর্জ ডার্নের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল। তার দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য ডার্নের মনে ক্ষীণ আশা জাগাল।

মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলল সে। 'আর একটি অনুনয়। টেলসন ব্যাঙ্কের কর্মচারী মি. লরি এসেছেন এখানকার শাখা-অফিসে। তাঁকে আপনি এই খবরটুকু পৌঁছে দেবেন যে, চার্লস ডার্নে বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হয়ে লা ফোর্স জেলে আটক আছে। শুধু এই খবরটুকু তাঁকে পৌঁছে দেবেন। কথা দিন, দেবেন।'

'দেব', বলে দ্যফর্জ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, 'দেশের সেবক আমরা। বিপ্লবের সৈনিক। আপনাদের বিরুদ্ধেই আমাদের জেহাদ। আপনার কোন উপকার আমার দ্বারা হবে না।'

আর-কোন অনুনয় করা মিথ্যে জেনে নিঃশব্দে দ্যফর্জের অনুসরণ করতে লাগল ডার্নে। তার মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হল এই অপমানে।

আশ্চর্য লাগে যে এই দলে দলে বন্দীদের সম্বন্ধে লোকের যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। ছেলেরাও নীরবে তাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ময়লা জামা-কাপড় পরে চাষী-মজুররা ক্ষেত-খামার কল-কারখানায় যায়, এ-দৃশ্য দেখা যেমন লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে—সুসজ্জিত ভদ্রলোকেরা আজকাল দলে দলে জেলে যাচ্ছে, ফাঁসিতে ঝুলছে,—সেও যেন লোকের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। তাই নতুনত্বের কোন কৌতূহল নেই লোকের চোখে।

একটা সরু গলি বরাবর আসতেই ডার্নের কানে গেল বক্তৃতার আওয়াজ। টুলের উপর দাঁড়িয়ে একজন লোক উত্তেজিত কণ্ঠে রাজার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিল। রাজা

ও রাজ-পরিবারের লোকেরা এত কাল ধরে দেশের লোকের কি সর্বনাশ করে এসেছে তারই হিসেব দাখিল করছিল লোকটা। বিষাক্ত তার ভাষা—কর্কশ ভঙ্গি। এই প্রথম জানতে পারল ডার্নে যে রাজা বন্দী হয়েছেন বিপ্লবীদের হাতে। সমস্ত বৈদেশিক রাজপুরুষেরা ফ্রান্স ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গেছেন।

এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে এতদিন সে অজ্ঞ ছিল। কোন খবরই পায়নি।

ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় বিপদের এতখানি গুরুত্ব বোঝেনি ডার্নে। এত দিনে বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হল সে। বুঝল যে, ক্রমাগত নতুন নতুন বিপদের জালে সে জড়িয়ে পড়ছে—তলিয়ে যাচ্ছে বিপদ-সমুদ্রের গভীরতায়, যেখান থেকে মুক্তির আশা অস্পষ্ট। ঘটনা এমন ভাবে মোড় নিয়েছে জানতে পারলে কখনই সে এই ভাবে ইংল্যান্ড থেকে এখানে বিপদ বরণ করতে আসত না। স্ত্রী-কন্যার সুখ-নীড় থেকে ছিটকে এসে এমনি করে প্রাণ বিপন্ন করত না খুনীদের হাতে। গণদেবতার রোষ যে এমন নৃশংস ভয়াল, তা কি ভাবতে পেরেছিল সে ক-টা দিন আগে?

কিন্তু একদিনে কতটুকুই বা জানতে পারল ডার্নে? দেখতে পেল এখনকার নরক-লীলা? রক্তস্রোত আর মৃতদেহের স্তূপ তখনও তো চোখে পড়েনি তার—কানে আসেনি দিন-রাত্রির সমস্ত প্রহরব্যাপী মৃত্যুর আর্তনাদ আর জল্লাদী জনতার উল্লাস। সে তখনও নিজের চিন্তায়—সে বাস্তবতা থেকে হাজার বছর দূরে। গিলোটিন কি তা সে জানে না। জনতার রূপ তার অজ্ঞাত।

আতঙ্কের কালো ছায়ায় আবৃত তার চেতনার আকাশে সবই যেন মায়াচ্ছন্ন। শুধু এই অনুভূতিটুকু স্পষ্ট যে স্ত্রী-কন্যার কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হল। নিশ্চিত নিরাপদ গার্হস্থ্য জীবনের দিন-রাত্রি ফুরিয়ে গেল তার।

এর পর কারাগারে বন্দীজীবন আর নির্যাতন—সেই কি তার নিশ্চিত ভবিতব্য! তার পর? সে কথা ভাবার আগেই দ্যফর্জ তাকে লা ফোর্স জেলের প্রাঙ্গণে পেঁৗছে দিল।

একজন প্রহরীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে দ্যফর্জ বলল—'দেশত্যাগী মাননীয়দের আর-এক জন। ইনি মারকুইস—'

'বটে! ওদের আরও কত আছে বাবা?'

লোকটার মোটা মুখখানা যেন আরও ফুলে উঠল।

জেলখানার বিষণ্ণ আধো-অন্ধকার বারান্দা সিঁড়ি পার হয়ে প্রহরীর সঙ্গে এগিয়ে গেল ডার্নে। অনেক দরজা খোলা-বন্ধের পর প্রহরী তাকে নিয়ে এসে তুলল একটা নিচু বিরাট ঘরের ভিতর। অনেক নারী-পুরুষ বন্দীকে দেখতে পেল এখানে ডার্নে। দেখল লম্বা টেবিলে বসে মেয়েরা কেউ পড়ছেন, কেউ লিখছেন, কেউ কেউ বা বোনার কাজ করছেন। পুরুষরা অধিকাংশই চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অথবা সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। জেলে নোংরা অপরাধীদের সঙ্গে থাকতে হবে—এই চিন্তায় ডার্নের সমস্ত মন বিষাক্ত হয়েছিল, কিন্তু সে অবাক চোখে দেখল যে সে ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই অন্য কয়েদীরা কি আশ্চর্য ভদ্রতায় ও ভব্যতায় উঠে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে তাকে আহ্বান করল। এই বীভৎস আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ এই আশ্চর্য পরিবেশ অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে। তবে কি সে প্রেতের রাজত্বেই এসে পড়ল? এই সব অভিজাত পুরুষ-মহিলা—এই সৌজন্য—এই ভব্যতা—এই সব কি ছায়ামূর্তি! সব প্রেত! সৌন্দর্য—আভিজাত্য—সৌজন্য—অহঙ্কার—আর চপলতা—বুদ্ধি আর দীপ্তি—যৌবন আর জরা—সব যেন প্রেতায়িত হয়ে এক নির্জন সমুদ্রতীরে শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত। এখানে আসার আগেই যারা মরেছে সেইসব প্রেত-চক্ষু যেন তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডার্নে। সারা ফ্রান্সের অভিজাত পরিবারের নারী-

পুরুষ বন্দীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হল সে। সমবেত মানুষগুলির মধ্যে থেকে একটি মানুষ—আচারে-আচরণে পরিপূর্ণ আভিজাত্য মাখা, এগিয়ে এসে তাকে বললেন—'আমরা যারা একসঙ্গে এই দুর্যোগের অংশীদার হয়েছি তারা আপনাকে আমাদের মধ্যে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা রাখি, এ দুঃসময় শীগগির শেষ হবে। অন্য সময় নাম ধাম জিজ্ঞেস করা অসৌজন্য হলেও এখন দয়া করে আপনার নামটি আমাদের জানান। আপনার কি অপরাধ—কারাগারের শর্তই বা কি? আশা করি আপনি নির্জন সেলের নন।'

'এ কথার অর্থ আমি জানি না। তবে ঐ রকম শুনেছি।'

'আহা, কি দুঃখের কথা! আপনি চিন্তা করবেন না—আমাদের অভিজাত সমাজের কেউ কেউ নির্জন সেলেরই হুকুম পেয়েছিল তবে সে স্বল্পস্থায়ী আদেশ।'

তার পর গলা তুলে সবাইকে শুনিয়ে বললেন—'এর উপর নির্জন সেলেরই হুকুম হয়েছে।'

একটি গরাদ-দেওয়া দরজার সামনে জেলার দাঁড়িয়েছিলেন। ডার্নে যখন সেই দরজা পেরিয়ে গেল পিছনে নারী পুরুষের অনেক সহৃদয় আশ্বাস সে শুনতে পেল। ক্ষণকালের জন্য মন তার কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। পিছন ফিরে ধন্যবাদ জানাবার ইচ্ছাও হয়েছিল তার। কিন্তু সেই ছায়া-রাজ্য পলকেই অদৃশ্য হল তার চোখের সামনে থেকে।

চল্লিশটি পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে একটা নিচু কালো দরজার পিছনে ছোট একটা নির্জন সেলে পেঁছে দিল তাকে জেলার। ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে সেই ঘর। তবে ততটা অন্ধকার নয়। জেলার বলল,—'এই তোমার ঘর।'

'আমি একলা থাকব?'

'তা জানি না।'

'আমি কাগজ কালি কলম কিনতে পারব?'

'সে হুকুম নেই। একটু পরে লোক আসবে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। যদি চাও এখন খাবার কিনে খেতে পার—তার বেশি নয়।'

নির্জন সেলে একটা চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা খড়ের বিছানা। প্রহরী চলে যাবার পর একবার ভাবল ডার্নে—'এই তো আমি—মৃত ভিন্ন আর কি!' বিছানার দিকে তাকিয়ে সারা শরীরটা তার অসুস্থ হয়ে উঠল। এই সব পোকারা এরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মরা অবধি কি আর এদের সবুর সইবে।' আর যে লোকটা তাকে এখানে রেখে গেল তার সারা শরীরটা এমন ফোলা তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সেও জলে-ডোবা মানুষ। এই সব নানা কথা সে ভাবতে লাগল।

'এদিকে পাঁচ পা ওদিকে সাড়ে চার পা—এদিকে পাঁচ পা ওদিকে সাড়ে চার পা—এদিকে পাঁচ পা ওদিকে সাড়ে চার পা।' সেই ঘরে পায়চারি করতে করতে ভাবল ডার্নে, পিছনের সেই ঘরে সেই প্রেতগুলো কোথায় অদৃশ্য হল? দূর থেকে শহরের চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যেন বলছে 'এখানে তিনি জুতো তৈরি করতেন—তিনি জুতো তৈরি করতেন—তিনি জুতো তৈরি করতেন।' সেই প্রেতের দলে বন্দী আবার হিসেব করতে লাগল কয় পা—দ্রুততর বেগে পায়চারি করতে লাগল এই সংখ্যা-গণনার হাত থেকে নিস্কৃতির জন্য। দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রেতের দল অদৃশ্য হয়ে গেল তার মধ্যে কালো পোশাক-পরা একটি মহিলা—জানালার ধারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—তার সোনালী চুলে আলোর ঝিকিমিকি—তাকে দেখতে যেন—ভগবানের দিব্যি—চল চল সেই আলোকিত গ্রাম দিয়ে যেখানে সব মানুষ জেগে আছে—তিনি জুতো তৈরি করতেন, তৈরি করতেন জুতো—এদিকে পাঁচ পা ওদিকে সাড়ে চার পা।' ভিতরের রুদ্ধ আবেগে মানুষটা আরও দ্রুত পায়চারি করতে লাগল—নিস্কৃতি নেই গণনার।

আর নগরের গর্জন চাপা দামামা ধ্বনির মত তার কানে এসে বাজতে লাগল। কিন্তু সব-কিছু ছাপিয়ে উঠল বহু কণ্ঠের কান্না আর বিলাপ।

২ শানপাথর

প্যারিসে যে বিরাট প্রাসাদের একাংশে টেলসন ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস, তার সামনে দেয়াল-ঘেরা মস্ত উঠোন। উঠোনের মুখে লোহার শক্ত গেট। বাড়ির যিনি মালিক ছিলেন যে মসেঁনার, বিপ্লব শুরু হবার মুখেই নিজের রাঁধবার লোকের ছদ্মবেশ পরে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডে পলাতক। একদিন যাঁর চর্ব্যচুষ্য-ভোজ্য-পানীয়ের ছিল সমারোহ—যাঁর মহিমময় চকোলেট পানের জন্য পাচক ছাড়া আর তিন জন তকমা-আটা লোক হিমসিম খেত, তিনি নিজে শিকারী কর্তৃক অনুসৃত পশুর মতো পাচকের ছদ্ম-বেশে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে বেঁচেছেন। বনে দাবাগ্নি জ্বলে উঠলে প্রাণভয়ে পশুরা যেমন পালায়, এই সব বড়লোকেরা তেমনি বিপ্লব-বহ্নির ভয়ে কে কোথায় পালিয়েছেন, তার ঠিকানা নেই।

মসেঁনার পালাবার পর, সেই তিনটি তকমা-আঁটা সেবক, এতদিনের নেওয়া সব মোটা মাইনের পাপ চুকিয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। এই রিপাবলিকের অখণ্ডত্ব আর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা নয় মৃত্যু—এই মহান নীতির বেদিতলে তাদের মহামহিম প্রভুকে বলি দিতে তারা একটুও কসুর করত না। মসেঁনারের বাড়ি-সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

আজকাল নিয়ম-কানুন পালটাচ্ছে এত দ্রুত যে, এবেলা-ওবেলা নতুন নতুন আইন পাশ হচ্ছে। সেপ্টেম্বরের এই তৃতীয় দিবসেই মসেঁনারের বাড়ি দখল নিয়ে নিয়েছে রিপাবলিক। সেই অট্টালিকার শীর্ষে উড়ছে তেরঙ্গা পতাকা। বিপ্লবী বন্ধুরা সেই সব বিশাল হলঘরে বসে দামী মদ খাচ্ছে পরমানন্দে।

এখন থেকে এই টেলসন ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা তুলবে লোকে? কত সম্পত্তি জমা পড়ে থাকবে—যার হদিস থাকবে না—হিসাব থাকবে না। টেলসনের গোপন ভাণ্ডারে রক্ষিত হীরা মণি জহরত—দামী দামী সামগ্রী মাকড়শার জালে ঢেকে যাবে আর তাদের মালিকরা কোথায় কোন অজ্ঞাত জেলখানায় পচবে নয়ত গিলোটিনের খড়্গে ছিন্নশির হয়ে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

কত জমা-খরচের হিসেব মিলবে না। বছরের পর বছর তাদের জের চলবে। হয়ত ইহলোকে মিলবে না। পরলোকে নিয়ে যেতে হবে।

এই সব দুর্ভাবনা নিয়ে বসেছিলেন লরি। তাঁর মত আর কে করতে পারে এই কঠিন সমস্যার সমাধান। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। ঘরের ভিতর আগুন জেলে একটু আরাম করছিলেন লরি। তাঁর সেই চিরপরিচিত শান্ত ভদ্র আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় মুখখানিতে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। দোলানো বাতির আলোছায়ায় সারা ঘরের আসবাবপত্রে একটা অস্বাভাবিক কি যেন কাঁপছে—হয়ত-বা একটা আতঙ্কের ছায়া।

এই ব্যাঙ্কের কয়েকখানি ঘর নিয়ে তিনি রয়েছেন। বস্তুতপক্ষে এই ব্যাঙ্কের বনস্পতির একটি অংশ তিনি। তাঁর প্রাণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এর সঙ্গে। অবিচ্ছেদ্য সে সম্বন্ধ। এই বাড়িটিতে নিরাপত্তার ব্যাপারে খানিকটা নিশ্চিন্ত কর্তৃপক্ষ—কিন্তু লরি সেদিক দিয়ে চিন্তা করেন না। এই সব পরিস্থিতির বিষয়ে কর্মচারী হিসাবে তিনি মাথা ঘামাতে রাজি নন। নিজের কর্তব্য পালনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকে গাড়ি রাখার জায়গা। এখনও মসেঁনারের কয়েকখানি

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেইখানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিশাল এক শানপাথর এনে রেখেছে ওরা। কাছাকাছি কোন কারখানা বা দোকান থেকে তাড়াতাড়ি করে এনে ওরা কোনমতে এই পাথর বসিয়েছে। সেটাকে ঘুরিয়ে অস্ত্রে শান দিচ্ছে ওরা। হত্যার নেশায় উন্মত্ত মানুষের দল।

জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাতেই সেই শানপাথরটা তাঁর চোখে পড়ল। দেখে কি এক অজ্ঞাত কারণে তার শরীরের ভিতর শিহরণ খেলে গেল।

ফিরে এসে আবার বসলেন। কিন্তু শরীরের ভিতরকার অস্বস্তি তখনও যায়নি।

উঁচু পাঁচিলের পাহারা ডিঙিয়ে নিশীথ রাতের কলরব ভেসে আসছে পথ থেকে। সে একটানা একঘেয়েমির মধ্যে এক-এক বার প্রেতকণ্ঠের অমর্ত্য আর্তনাদ উঠছে বুক কাঁপিয়ে, যেন মৃত্তিকার বুকফাটা কান্না কারা পেঁছে দিতে চাইছে আকাশে।

'ভগবানকে ধন্যবাদ। আজকের এই ভীষণ রাতে আমার কোন প্রিয়জন নেই এ শহরে। এ বিপদের দিনে ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন।'

একটু পরেই গেটের ঘণ্টা সশব্দে বেজে উঠতেই সচকিত হয়ে লরি ভাবলেন—'ঐ আবার ওরা ফিরে এল।'

কান পেতে অনেকক্ষণ শুনলেন। কিন্তু উঠোন থেকে জনতার কোন উল্লাস-ধ্বনি এল না। শুধু একবার গেটের ভারী দরজা খোলার শব্দ হল—তার পর সব নিঝুম, চুপচাপ।

একটা অস্বস্তিকর উত্তেজনা পেয়ে বসল যেন। ব্যাঙ্কের প্রহরীরা সবাই বিশ্বস্ত। চারদিকেই তাদের সশস্ত্র সতর্ক পাহারা। ভয়ের কিছু নেই। তবু এই নির্বান্ধব দেশে নিজের জীবনের চেয়ে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার কথাটাই শতবার করে লরির মনকে আলোড়িত করতে লাগল।

উঠে প্রহরীদের কাছে যাবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় তারই দরজা খুলে আচম্বিতে যে দু-জন নর-নারী ঘরে প্রবেশ করল, তাদের দেখে লরির বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ডাক্তার ম্যানেতের সঙ্গে এসেছে লুসি।

হাত বাড়িয়েই আশ্রয়-ভিক্ষা করে যেন ছুটে এল লুসি। তার সারা মুখ-চোখে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতা। এই ক-দিনের দুশ্চিন্তার ছাপ তার মুখে।

তাদের দেখে রুদ্ধ নিশ্বাসে লরি বললেন—'তোমরা এখানে কেন? এখানে কি? ডাক্তার ম্যানেত, আপনারা এসময়ে এইখানে কি প্রয়োজনে? কি হয়েছে আপনাদের? কি বিপদ হয়েছে—?'

বিপর্যস্ত বিবর্ণ মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতেই যেন জীবন-বিন্দু স্থির হয়ে আছে। আকুল কণ্ঠে কেঁদে বলল—'সে কোথায়?'

'কার কথা বলছ তুমি? কি হয়েছে চার্লসের?'

'তিনি এখানে এসেছেন।'

'প্যারিসে?'

'তিন চার—ক-দিন হয়েছে ঠিক মনে নেই—কিছুই মনে করতে পারছি না আমি। কার চিঠি পেয়ে কাকে যেন উদ্ধার করতে তিনি আসছিলেন প্যারিসে। আমরা কিছুই জানি না। সীমান্তেই নাকি তিনি ধরা পড়েছেন। ওরা তাঁকে জেলে আটকে রেখেছে।'

বৃদ্ধের অস্ফুট আর্তনাদ শুনলেন লরি। আর সেই মুহূর্তে উঠোনে উন্মত্ত জনতার কল-গর্জন এসে পড়ল।

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক্তার ম্যানেত প্রশ্ন করলেন—'বাইরে ও কিসের আওয়াজ?'

'ওদিকে তাকাবেন না, ডাক্তার ম্যানেত! দোহাই আপনার! বাইরে মুখ বের করবেন না—পর্দা ছোঁবেন না!'

লরি চিৎকার করে বললেন। ছুটে গেলেন তাঁকে নিরস্ত করতে।

এতক্ষণে ডাক্তার একবার ভয়হীন প্রসন্ন হাসি হাসলেন। তার পর পর্দার দড়িতে হাত রেখে বললেন—'ভয় নেই, বন্ধু। প্যারিসের সঙ্গে আমার অনেক আশ্চর্য মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, জানেন। আর প্যারিসই বা বলি কেন, সারা ফ্রান্সে এমন কোন বিপ্লবী আজ নেই যে আমায় বাস্তিল দুর্গের পুরোনো বন্দী জেনে আমার দেহ স্পর্শ করবে। যদি স্পর্শ করেও, সে শুধু আমাকে বুকে করে জয়োল্লাস করবার জন্যেই করবে। যে নির্যাতন এক দিন সয়েছি, সেই আমার রক্ষা-কবচ। তার জোরেই সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি। জানতে পেরেছি আমাদের চার্লসের খবর—আসতে পেরেছি এখানে। চার্লসকে আমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবই। সেই কথাই আমি বলছিলাম লুসিকে। কিন্তু আপনি বলুন এ গোলমাল কিসের?'

'কথা শুনুন ডাক্তার। দয়া করে দেখা দেবেন না। না লুসি, তুমিও বাইরে মুখ বের করো না।'

লুসিকে জাপটে নিজের কাছে টেনে নিলেন লরি। বললেন—'অত ভয়ের কি আছে? চার্লসের কোন অমঙ্গলের কথা আমি শুনিনি। ও যে এই সময়ে প্যারিসে এসেছে এ কথা ঘুণাক্ষরেও আমি জানি না। কোন্ জেলে আছে সে?'

'লা ফোর্সে।'

'শান্ত হও লুসি—এ আত্মহারা হবার সময় নয়। আমি যেমনটি বলব সেই রকম কর—দেখবে চার্লসের কোন অমঙ্গল হবে না। আমার কথা শোনার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তোমার আমার আমাদের আজ রাতে আর-কিছু করবার নেই। এখন বাইরে যাওয়া অসম্ভব। এস, তোমায় আমি পেছনের ঘরে লুকিয়ে রাখি। তোমার বাবার সঙ্গে একটু নিরিবিলি আলোচনা করতে দাও আমায়। জীবনমৃত্যুর সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এখন অধীর হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আপনার কথাই শুনব, আপনিই আমাদের রক্ষা করবেন', বলল লুসি।

লুসিকে পাশের ঘরে ঠেলে দিয়ে দরজায় চাবি দিলেন লরি। ডাক্তারের কাছে এসে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। তার পর জানালা খুলে দিলেন। পর্দা অল্প সরিয়ে দুজনে তাকালেন উঠোনের দিকে।

দেখলেন সেই রক্ত-পিপাসিত নারী-পুরুষদের দিকে। জনা চল্লিশ পঞ্চাশ হবে। এই উঠোনে বিপ্লবীরা বসিয়েছে এক শান দেওয়ার যন্ত্র।

এ-বাড়ির লোকেরাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিরিবিলিতে অস্ত্র শানিত করে নিয়ে এরা ছুটে যাচ্ছে হত্যার নেশায়। আবার এক দল আসছে। নিরন্তর এই রক্ত-মিছিলের তরঙ্গ দোল খাচ্ছে এই উঠোনে। রক্ত-মাখা অস্ত্র আর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে এক বীভৎস নারকীয় জীবন যেন পেয়ে বসেছে প্যারিসকে।

এক ঝলক দেখে দুজনে সরে এলেন জানালার কাছ থেকে। ডাক্তার একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন লরির দিকে। যেন ডুবন্ত মানুষ মুখ তুলে একবার দেখে নিচ্ছে জীবন্ত জগৎকে।

'এরা জেলের বন্দীদের হত্যা করছে। আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তবে আর দেরি করবেন না। এদের দেখা দিন—নিজের পরিচয় দিন। ওদের বলুন এখুনি আপনাকে লা ফোর্স জেলে নিয়ে যেতে। কত দেরি হয়ে গেছে জানি না।—কি সর্বনাশ

হল বুঝতে পারছি না। কিন্তু আর একটি মুহূর্ত নষ্ট হতে দেবেন না। যা করবার এখুনি করতে হবে।'

ডাক্তার মুহূর্তে লরির হাতে মৃদু চাপ দিলেন। তার পর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। লরি আবার জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন।

পলিত-কেশ বয়স্ক মানুষটি দৃঢ়প্রত্যয়-ভরা মুখে ও গভীর আত্মবিশ্বাসে জনতার মধ্যে গেলেন। লরি দেখলেন—সবাই চাপা গুঞ্জনে তাঁর কথা শুনল। তার পর সেই জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলেন ডাক্তার। লরি দেখলেন দু-সার লোক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৃদ্ধকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় তাঁর কানে এল—'বিপ্লবী ম্যানেত, জিন্দাবাদ! লা ফোর্সের বন্দীকে বাঁচাতে হবে। পথ দাও। পথ ছেড়ে দাঁড়াও।'

লরি শুনলেন উদ্বেলিত সহস্র কণ্ঠে জিগিরের প্রতিধ্বনি। ঘটনার এই আকস্মিক উত্তেজনায় কম্পিত বক্ষে লরি আবার জানালা বন্ধ করে দিলেন। পর্দা টেনে দিয়ে ছুটে গেলেন লুসির ঘরে। লুসিকে বললেন কেমন করে তার বাবা জনতার সাহায্য নিয়ে চার্লসকে খুঁজে বের করতে গেলেন।

এতক্ষণে লরি দেখলেন যে, লুসির সঙ্গে মিস প্রস ও ছোট্ট লুসিও এসেছে। কিন্তু লুসি তাঁর কথা শুনল কিনা তা বুঝতে পারলেন না লরি। স্বামীর অশুভ আশঙ্কায় মুহ্যমান নারী তাঁর হাত ধরে পায়ের কাছে বসে রইল। রাত যেন জগদ্দল পাথরের মতো বুকের উপর চেপে বসেছে।

শিশুটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার পাশে বসে থাকতে থাকতে কখন মিস প্রস নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এ-রাত কত দীর্ঘ মনে হচ্ছে। অধীর প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নেই। নিস্তব্ধ রাত্রির পটভূমিকায় লুসির চাপা কান্নার অর্ধস্ফুট গোঙানি শুনতে লাগলেন লরি বসে বসে।

বাবা ফেরেননি সে আর-এক অসহ্য দুশ্চিন্তা।

সে রাতে আরও দুবার গেটের ঘণ্টা বেজেছিল। উত্তেজিত জনতার কলস্বর ছাপিয়ে শান-কলের ঘড়-ঘড় শব্দও শোনা গেল কতক্ষণ। লুসি ভয়কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—'ও কিসের শব্দ?'

'চুপ। এটা এখন বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার। জাতীয় সম্পত্তি এ বাড়ি।'

এক সময় দিগন্তে দিনের আলো ফুটে উঠতে লাগল। লরি আস্তে আস্তে লুসির হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তার পর সাবধানে জানালা খুলে বাইরে তাকালেন।

একটি রক্তাক্ত লোক—দেখলে মনে হবে ভীষণ আহত এক সৈনিক এই হত্যাভূমি থেকে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল শানপাথরের পাশ থেকে—তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে। তার পর মসেঁনারের জমকালো গাড়ি দেখে ধুঁকতে ধুঁকতে সেই শ্রান্ত হত্যাকারী গাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে—বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল দামী কুশনে।

লরি আবার তাকালেন বাইরে। বিরাট শানপাথর এই পৃথিবী এক পাক ঘুরেছে। দেখলেন সূর্যের আলোয় পৃথিবীও রাঙা হয়ে গিয়েছে। সকালের কোমল হাওয়ায় উঠানের ঐ যন্ত্রটির সর্বাঙ্গেও দেখলেন রক্তের দাগ। কিন্তু এ লাল সূর্যের আলোয় নয়। কোনদিন এ-লাল মুছেও নেবে না সে।

৩ ছায়া

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম শুরু হল। লরি মনে মনে ভাবলেন যে চার্লস একজন দেশত্যাগী অভিজাত—তার স্ত্রী-কন্যাকে ব্যাঙ্কের আশ্রয়ে রেখে ব্যাঙ্ককে

বিপদগ্রস্ত করা ব্যাংক-কর্মচারী হিসাবে কোনমতেই সমীচীন হবে না। সে অধিকার নেই তাঁর। লুসি ও তার মেয়ের জন্য তিনি নিজের নিরাপত্তা, ধনসম্পদ—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে একটুও দ্বিধা করবেন না, কিন্তু যে বিরাট দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত, সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করার চিন্তা অসম্ভব। ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন দুর্বলতা তিনি মনে স্থান দিতে পারেন না।

প্রথমেই মদের দোকানের মালিক দ্যফর্জের কথা তাঁর মনে পড়ল। তার মদের দোকানটি খুঁজে বের করতে পারলে হত। তার পর তার সাহায্যে একটি নিরাপদ বন্দর। কিন্তু তখনই মনে পড়ল সে দোকান তো বিপ্লবের ঘাঁটির এলাকার মধ্যেই। হয়ত এই বিপ্লবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত দ্যফর্জ।

দুপুর গড়িয়ে গেল। ডাক্তারের দেখা নেই। লুসির সঙ্গে কথাবার্তায় লরি জানতে পারলেন যে, ডাক্তার ব্যাঙ্কের কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলেছিলেন। লরির কাছে কথাটা ভালো লাগল। তিনি তখনই একটা নিভৃত নিরাপদ আস্তানার খোঁজ করতে বেরুলেন। পেয়েও গেলেন সুবিধামতো একটি। পাড়াটি নির্জন, পরিত্যক্ত। বহু লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে সে-মহল্লা থেকে, কোন বাড়ির জানালা কি পর্দা খোলা দেখতে পেলেন না তিনি।

লুসি, তার মেয়ে ও মিস প্রসকে তৎক্ষণাৎ সেই বাড়িতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন লরি। বিশ্বস্ত জেরিকে রেখে এলেন তাদের পাহারায়।

তাঁর নিজের মনই দুর্ভাবনায় কণ্টকিত ছিল। তবু যতটা সম্ভব সান্ত্বনা-ভরসা তিনি দিলেন তাদের। অন্তত জানালেন যে জেরি থাকতে তাদের আশু বিপদের কোন ভয় নেই।

সারা দিনের কাজ-কর্মের মধ্যে নানা চিন্তা-আশঙ্কায় ক্লান্তিতে এক সময় বেলা গড়িয়ে গেল। ব্যাংক বন্ধ হল। একাকী নিজের ঘরে ফিরে এসে বসলেন লরি। কত কি ভাবতে ভাবতে কখন যেন অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দে চকিত হয়ে উঠলেন লরি। একটু পরেই একটি মনুষ্য-মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে লোকটি তাঁর নাম ধরে ডাকল।

'আপনি আমাকে চেনেন? কি করতে পারি বলুন?' বললেন লরি সামান্য বিব্রতভাবে।

লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি। বলিষ্ঠ গড়ন। মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল।

'আপনি আমাকে চেনেন?'—পাল্টা প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে।'

'হয়ত আমার মদের দোকানে।'

'আপনি কি ডাক্তার ম্যানেতের কাছ থেকে আসছেন?'—লরি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, তার কাছে থেকেই আসছি।'

'তিনি কিছু বলেছেন? কিছু পাঠিয়েছেন কি আমার জন্য?'

দ্যফর্জ লরির কাঁপা হাতে এক টুকরো কাগজ দিলেন। ডাক্তারের নিজের হাতে লেখা চিঠি পড়তে লাগলেন লরি।

'চার্লস নিরাপদে আছে। আমি এখনও এস্থান ত্যাগ করতে পারছি না। লুসির জন্য চার্লসের লেখা দু-এক লাইন পাঠাচ্ছি। পত্রবাহককে লুসির সঙ্গে দেখা করতে দেবেন।'

লা ফোর্স জেল থেকে লেখা।

চিঠি পড়ে লরি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল বুক থেকে। 'ম. ডার্নের স্ত্রী যেখানে আছেন সেখানে যাবেন আমার সঙ্গে?'—জিজ্ঞেস করলেন লরি।

'চলুন।'

দ্যফর্জের কথাবার্তায় অদ্ভুত সংযম ও যান্ত্রিকতা লক্ষ্য করলেন লরি। টুপি পরে তাকে নিয়ে উঠোনে নেমে এলেন তিনি। দেখলেন উঠোনে দুজন স্ত্রীলোক। তাদের মধ্যে একজনের হাতে বোনার কাঠি। দেখেই মনে পড়ল লরির।

'মাদাম দ্যফর্জ নিশ্চয়?'—সতের বছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন আজও ঠিক সেই একই মূর্তিতে দেখতে পেলেন মাদামকে।

'হ্যাঁ'—বলল তার স্বামী।

'উনিও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?' মাদামও যাচ্ছে দেখে লরি প্রতিপ্রশ্ন করলেন এবার।

'হ্যাঁ! পরে দেখলে যাতে তাঁদের চিনতে পারে। তাঁদের সাবধানের জন্যেই এটা প্রয়োজন।'

লরি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। এতক্ষণে তিনি সব বুঝলেন।

মাদামের সঙ্গে যে মেয়েটি যাচ্ছে তাকে প্রতিশোধ বলেই জানে সবাই।

নানা অলিগলি অতিক্রম করে তাঁরা লুসির বাসায় এসে পড়লেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে জেরির পাহারা পার হয়ে তারা বাসায় গিয়ে পৌঁছল। লুসি একা বসে কাঁদছিল। স্বামীর খবর পাওয়া গেছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লরির হাত জড়িয়ে ধরল। তার পর কম্পিত বুকে শতবার পড়ল সেই চিঠিঃ

'প্রিয়তমা,

সাহস হারিয়ো না। আমি ভালোই আছি। এখানকার লোকজনদের উপর তোমার বাবার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। চিঠির উত্তর দিতে হবে না। খুকুকে চুমু দিও।'

ছোট্ট চিঠি। কিন্তু চিঠি পড়ে মাদামের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় বিগলিত হল। মাদামের দুটি হাত নিয়ে গভীর প্রীতিতে চুম্বন করল অশ্রু-সজল লুসি। স্বামী-সোহাগিনী নারীর সারা অন্তরের আবেগ আর কান্না সেই চুম্বনে। কিন্তু মাদাম এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিতেই ভয়ার্ত চোখ তুলে লুসি তাকাল তার দিকে। দুটি মর্মভেদী দৃষ্টির শীতলতা সূচিবিদ্ধ করতে লাগল লুসিকে। মাদাম তার বোনার কাঠি তুলে নিল হাতে।

মাদামের রূঢ় স্পর্শে লুসি যেন সংবিৎ ফিরে পেল। বুকের ভিতর চিঠিটা রাখতে যাচ্ছিল সে—গলার কাছ-বরাবর এসে সেই হাত থেমে গেল।

এই বিশ্রী পরিস্থিতিকে একটু হালকা করার জন্য লরি আশ্বাস দিয়ে বললেন—'ভয় কি লুসি? পথে-ঘাটে এখন নির্বিচারে ভয়ানক খুন-জখম চলেছে। মাদামের যাঁরা প্রিয়জন তাদের তিনি ভালো করে চিনে রাখতে চান। যাতে দরকারের সময় সনাক্ত করতে পারেন। দরকার হলে রক্ষা করতে পারেন। আমি ঠিক বলিনি মঁসিয়ে দ্যফর্জ?'

বলতে বলতে লরি নিজেই মাঝপথে হোঁচট খেয়ে থেমে গেলেন। ঐ তিন জনের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজেরই যেন সাহস হল না।

দ্যফর্জ মুখ আঁধার করে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

লরি আবার বললেন—'তোমার মেয়েকে নিয়ে এস লুসি। মিস প্রসকেও আসতে বল। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। উনি ইংরেজ। ফরাসী ভাষা জানেন না।'

প্রসের দৃঢ় ধারণা কোন বিদেশী তার কড়ে আঙুলের যোগ্য নয়—বিপদে-আশঙ্কায়

অবিচল সে—হাত জোড় করে এসে দাঁড়াল। প্রতিশোধের উপর প্রথম চোখ পড়তেই ইংরেজিতে বলল,—'আশা করি, ভালো সব।'

আর মাদাম দ্যফর্জের দিকে চেয়ে বুকের উপর দুটি হাত জড়ো করে প্রস ইংরেজ মহিলার দীর্ঘ অভ্যাসমতো শুধু একটা নরম গলার খাঁকারি দিল। কোন কথা বলল না। অবশ্য দুজনের কেউই প্রসকে গ্রাহ্যের মধ্যে নিল না।

লুসির কচি মেয়েকে দেখে মাদাম দ্যফর্জ সেলাই বন্ধ করে এই প্রথম লুসির সঙ্গে কথা বলল—'এই বুঝি মেয়ে?' বোনার কাঁটাটি মেয়ের দিকে বাড়িয়ে দেখাল মাদাম—যেন নিয়তির তর্জনী নির্দেশ করল।

'হ্যাঁ, ওদের এই একটিই।' লরি একথা বলতেই কান্নায় গলা বুজে এল লুসির। অজানা আশঙ্কায় ভীত-ত্রস্ত মা নিচু হয়ে মেয়েকে বুকে চেপে আড়াল করে ধরল।

'যথেষ্ট হয়েছে'—স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল মাদাম—'দেখা হল—এবার চল।'

কিন্তু ওদের চাপা ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যা আতঙ্কের। লুসির শঙ্কার আর শেষ রইল না।

মাদাম চলে যাবার উপক্রম করতেই লুসি মাদামের পোশাক চেপে ধরে মিনতির সুরে বলল—'কথা দিন, আমার স্বামীর কোন অমঙ্গল হবে না। কথা দিন, তাঁর কোন অনিষ্ট করবেন না। আবার যেন তাঁর দেখা পাই।'

মাদাম তাকে থামিয়ে দিয়ে কটু কণ্ঠে বলল—'তোমার স্বামীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য এখানে আসিনি আমরা। ডাক্তার ম্যানেতের মেয়েকে দেখার জন্যেই এসেছিলাম।'

'তবে আমার মুখ চেয়ে আমার স্বামীকে রক্ষা করুন। তাঁর সন্তানের মুখ চেয়ে তাঁকে বাঁচান। এই আমার মেয়ে হাত জোড় করে তার বাপের হয়ে মিনতি করছে। আপনাকেই আমাদের ভয়, অন্য কাউকে নয়।'

'তোমার স্বামী কি যেন লিখেছেন চিঠিতে? তোমার বাবার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তিনি তাকে বাঁচাবেন, তাই না?'

এ-কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল লুসি—'দয়া করুন আপনি। প্রাণ-ভিক্ষা চাইছি। দয়া করুন আমায়। আপনিও নারী—আপনি আমার ব্যথা বুঝতে পারবেন। আমার নিরীহ স্বামীর বিরুদ্ধে আপনি কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। আপনিও তো আমার মতো মা—একজনের স্ত্রী।'

কিন্তু বেদনা-বিদ্ধ রমণীর কাতরতার প্রত্যুত্তরে মাদাম অবিচলিত শুষ্ক কণ্ঠে সঙ্গিনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—'এই কচি খুকীটার বয়স থেকে মা-বউ আমরাও কম দেখিনি, যাদের স্বামীরা বহু কাল ধরে জেলে পচেছে, যাদের কথা কেউ ভাবেনি। যারা দুঃখ-দারিদ্র্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যাচারে-অপমানে নির্যাতিত হয়েছে দিনের পর দিন। যাদের কপালে চিরদিন মিলেছে শুধু বঞ্চিতের অবহেলা, অনাহার, অসম্মান।'

'আর-কিছুই দেখিনি আমরা'—বলল প্রতিশোধ।

লুসির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—'তুমিই বিচার করে বল না। এত জনের বদলে এক জনের দুঃখে অত বিচলিত হলে কি আমাদের চলে?'

তিন জনে নিঃশব্দে ঘর থেকে বিদায় নিলে লরি হাত ধরে তুলে নিলেন লুসিকে। বললেন—'ধৈর্য ধর লুসি। এখন চাই শুধু সাহস। অনেকের তুলনায় ভাগ্য এখনও আমাদের প্রতি প্রসন্ন। এখন ভয়ে মুষড়ে পড়লে চলবে না। হয়ত একটা ছায়া পড়েছে—কিন্তু সে সত্য নয়—ছায়ামাত্র।'

কিন্তু দ্যফর্জের আচরণে একটা গভীর সংশয় তাঁর নিজের মনকেই আচ্ছন্ন করে রইল। ভিতরে শান্তি রইল না।

৪ ঝড়ের বিরতি

ডাক্তার ফিরে এলেন পুরো চার দিন পরে। এ ক-দিনে এগার শ বন্দী নারী-পুরুষ হত হয়েছে বিপ্লবী জনতার বিচারে। দিন-রাত্রি অবিরাম চলেছে মরণ-তাণ্ডব—দেখে এলেন ডাক্তার। কিন্তু সেসব কথা লুসির কাছে কিছুমাত্র ভাঙলেন না তিনি। লুসি শুধু জানল যে বন্দী-হত্যা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার ডার্নে আজও অক্ষত আছে।

লরিকে শুধু গোপনে বললেন সে-কথা। দাফর্জ বিপ্লবীদের বিচারসভায় তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আঠার বছর তিনি নিজে রাজ-কারাগারে কাটিয়েছেন সে-কথা জেনে বিপ্লবীরা তাঁকে অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে গ্রহণ করেছে নিজেদের দলে। সেই জোরে তিনি চার্লস ডার্নেকে প্রায় মুক্ত করেছিলেন, কিন্তু কি-এক অজ্ঞাত কারণে, আজও যার রহস্য পরিষ্কার হয়নি তাঁর কাছে, তাকে সদ্য মুক্ত করা সম্ভব হল না বিচারসভার রায়ে। তবে এটুকু আশ্বাস তিনি আদায় করে তবে জেল থেকে এসেছেন যে, যত দিন না মুক্তি পাবে তত দিন ডার্নে জেলেই থাকবে। তার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখবে বিপ্লবী আদালত।

আহার আর নিদ্রার বিরতির মাঝখানে যে ভয়াবহ দৃশ্য ডাক্তার দেখেছেন তা অকথিতই থাকবে। যে উন্মত্ত হিংস্রতায় হত্যা করা হয়েছে বন্দীদের তার তুলনায় বন্দীমুক্তিতেও যে উদ্ভ্রান্ত উল্লাস দেখেছেন তাও কম বিস্মিত করেনি তাঁকে। একজন মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী রাস্তায় এলে আরেকজন হত্যাকারী ভুল করে তাকে বর্শা দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। অন্যেরা তখন ছুটে এল তার সাহায্যে—তার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিতে ডেকে আনল ডাক্তারকে। তিনি এসে দেখলেন হতভাগ্য আহত একদল মহানুভব সাহায্যকারীর কোলে শায়িত—যারা নির্বিকার চিত্তে বসে আছে মৃতদেহের ওপর। কত যত্নে, কত মমতায়, উৎকণ্ঠিত আদরে সেবা করল তারা আহতকে—সাহায্য করল ডাক্তারকে তার কাজে—কত গভীর আগ্রহে। তার পর শয্যা রচনা করে তারা আহতকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করল। সেই ভয়াল রাতের পাশবিকতায় এই মহানুভবতা কতই না বেমানান! তারাই আবার ফিরে এসে নিজ নিজ হাতিয়ার তুলে নিয়ে বীভৎস হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠল দেখে ডাক্তার হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন—অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন সেখানে।

যে বীভৎস দৃশ্য সব দেখে এলেন ডাক্তার, তার ফলে আর-একবার যদি তাঁর স্মৃতি-ভ্রংশ ঘটে, এই ভয়ে লরি অন্তরে অন্তরে পীড়িত হচ্ছিলেন। ডাক্তারের চোখেও বোধ হয় তা ধরা পড়ল। বললেন—'ভয় করবেন না মি. লরি! দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ঈশ্বর আমায় যে-শক্তি দিয়েছেন, কোন কারাগারের লৌহ-গরাদ তা আটকাতে পারবে না। একদিন মেয়ে আমায় বুকে তুলে নিয়ে বাঁচিয়েছিল, আজ তার স্বামীকে সর্বনাশের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে আমি তার হাতে দিয়ে বলব, এই নাও মা, তোমার বুড়ো ছেলের প্রতিদান। ঈশ্বরের কৃপায় আমি তা করতে পারবই মি. লরি।'

ডাক্তারের শান্ত মুখ, দৃঢ় ভঙ্গি আর উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে লরি দেখলেন, দীর্ঘদিনের রুদ্ধ শক্তি যেন ডাক্তারের বৃদ্ধদেহে নব যৌবনের জোয়ার এনেছে। আর অবিশ্বাসের কারণ রইল না লরির।

ডাক্তার ম্যানেত প্যারিসে ডাক্তারী করতে শুরু করলেন। ধনী-নির্ধন, রাষ্ট্রদ্রোহী, মুক্ত, বন্দী—সমস্ত আহত রোগগ্রস্ত নর-নারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। তাঁর ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় অল্পদিনের মধ্যেই সারা প্যারিসে ডাক্তার ম্যানেতের নামে জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। তিনটি জেলখানারই ডাক্তার হলেন তিনি—বিশেষ করে লা ফোর্স কারাগারে যেখানে তাঁর জামাই ডার্নে বন্দী। সেখানে তাঁর গতিবিধি হয়ে উঠল অবাধ অবারিত। ডার্নের নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ করে তাঁর কর্তব্য করতে লাগলেন। মেয়েকে তিনি দিনের পর

দিন অন্তত এটুকু সান্ত্বনা দিতে পারলেন যে তার ডার্নে ভালোই আছে। এক দিন সে মুক্তি পেয়ে তার স্ত্রী-কন্যার কাছে ফিরে আসবেই।

কিন্তু এত চেষ্টাও তাঁর সার্থক হল না। বিপ্লবীদের বন্ধু ও হিতকামী হয়েও এই পরম প্রিয়জনের মুক্তির কোন উপায় করতে পারলেন না ডাক্তার। বিপ্লবের দুর্বার বন্যায় বার বার তাঁর চেষ্টা ভেসে যেতে লাগল।

বিপ্লবের আর-এক নবযুগ এল। রাজার বিচার করল প্রজারা। গিলোটিনে রানীর মাথা কাটা পড়ল। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু—এই ঘোষণা নিয়ে গণতন্ত্র সদম্ভে প্রতিষ্ঠা করল নিজেকে। নতরদমের উন্নত শীর্ষে দিন-রাত্রি উড়তে লাগল কৃষ্ণ পতাকা। মাটির কাছাকাছি থেকে তিন লক্ষ মানুষ যেন একসঙ্গে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল অত্যাচারের বিরুদ্ধে। দীর্ঘকাল ধরে একদল লোক যে অন্যায়ের বীজ বপন করেছিল ফ্রান্সের দিকে দিকে—ছড়িয়েছিল পাহাড়ে, অরণ্যে, কোমল জমিতে, কাঁকুরে মাটিতে—দক্ষিণের উজ্জ্বল আকাশের নিচে—উত্তরের মেঘলা ছায়াবৃত মৃত্তিকায়—তারা সব রক্তবীজের মতো অংকুরিত হয়ে পত্রে-পল্লবে-শাখায় বিশাল হয়ে দেখা দিল। হঠাৎ এক দিন এল মৃত্যুর বন্যা। এল সর্বনাশের ঢল। আকাশ থেকে নামল না—উঠল মাটি বিদীর্ণ ক'রে। আর সেই দুর্যোগময় দিন-রাত্রিতে পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল স্বর্গ।

শান্তি রইল না—ক্ষান্তি রইল না। করুণা-মমতার অবকাশ রইল না। ঝড়ের অন্ধকারে দিন-রাত্রি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। হিসেব রইল না কালের। একদিন নিরুদ্ধ নিশ্বাসে একটা গোটা জাতি দেখল তার রাজার মুণ্ডচ্ছেদ হল। আট মাস কারাগারে থেকে, নিরাভরণ বিধবার বেশে এক দিন তার সুন্দরী রানীও জনতার পৈশাচিক মত্ততার ভূমিকায় লুণ্ঠিত-শির হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল।

এক দিন পবিত্র ক্রুশ থাকত বুকে-বুকে। কিন্তু ক্রুশ যা দিতে পারেনি—গিলোটিনের ধারালো লোহা তাই পারল। তাই ক্রুশ ফেলে লোকে সাগ্রহে সানন্দে গিলোটিনের প্রতীক বইতে লাগল আদর ক'রে। গিলোটিন শুধু প্রতীক নয়—গিলোটিনই হল দেবতা!

এই আতঙ্কের রাজ্যে শুধু এক জন মানুষ নিষ্কম্প চিত্তে কাজ করতে লাগলেন। আপন শক্তিতে অসীম বিশ্বাসী মানুষটি যেন সকলের মধ্যে থেকেও রইলেন একাকী। যেন বিষাক্ত ঘূর্ণির মধ্যে একটি মাত্র অমৃতবিন্দু। তাঁর কাছে সব দুয়ার অবারিত। এমনি করে আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে আড়াল করে রাখলেন তিনি ডার্নেকে পনের মাস।

এত মৃত্যু, এত হত্যা! চতুর্দিকের এই নরক-লীলার মধ্যে তবু বিশ্বাস আঁকড়ে রইলেন ডাক্তার। মেয়েকে যে-কথা দিয়েছেন তা তিনি করবেনই। ফিরিয়ে এনে দেবেন তার ডার্নেকে। লুসির মুখে আর একবার হাসি ফোটাবেন।

সেই আতঙ্কের রাজত্বে সেই বিচিত্র দুর্জন মানুষদের মধ্যে ডাক্তার দৃঢ় শান্ত মর্যাদায় আপন কাজে মগ্ন রইলেন।

আপন শক্তিতে বিশ্বাসী, শেষ বিজয়ের গৌরবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ডাক্তার—এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে লাগলেন যে লুসির স্বামীকে তিনি রক্ষা করবেনই।

বর্তমান কালস্রোত প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। তার গভীরে সমস্ত পরিচিত জীবনের ছবি যাচ্ছে পালটে।

এমনি করে এক বছর তিন মাস কাটল। কারান্তরালে নির্জন সেলে ডার্নে দিন কাটাতে লাগল।

এমনি করে ডিসেম্বর এল, সেই রক্তাক্ত ডিসেম্বরে বিপ্লব এমন এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করল যে দক্ষিণের নদীগুলিতে মৃতের স্তূপ জমতে লাগল। সেই সব শীতের বেলায় সারিবদ্ধ করে বন্দীদের গুলি করে হত্যা করতে লাগল বিপ্লবীরা।

তবুও ডাক্তার দৃঢ়চিত্তে সেই আতঙ্কের মধ্যে একাকী বাস করতে লাগলেন। সেদিনকার প্যারিসে ডাক্তার ম্যানেতের চেয়ে অধিক পরিচিত মানুষ আর কেউ ছিল না। সেই আশ্চর্য পরিস্থিতিতে সেই মূর্তিটি উজ্জ্বল। শান্ত, মমতাময় মানুষটি জেলখানায় হাসপাতালে সর্বত্র আততায়ী আর রুগ্ন আহত সকলকে সমান ভাবে সেবা করতে লাগলেন। তাঁর নিরলস চিকিৎসায় আর কর্তব্যবোধে ডাক্তার লোক-চক্ষে এক অপূর্ব মর্যাদা লাভ করলেন। সেই মর্যাদা আরও জ্যোতিষ্মান হল তার বাস্তিল দুর্গের কারা-জীবনের কাহিনী লোকমুখে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে।

তাঁকে কেউ সন্দেহ করল না। আজ থেকে আঠার বছর আগে যদি তিনি এমনিভাবে আসতেন তবে কি এ মর্যাদার আসন তিনি পেতেন? এই মর-জগতে ডাক্তার এক অবিনশ্বর মূর্ত আত্মার প্রতীক।

৫ করাতী

দেখতে দেখতে এক বছর তিন মাস গড়িয়ে গেল। লুসি রোজই শিউরে উঠে ভাবে, আগামী কাল গিলোটিনে স্বামীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। পাথর-বাঁধানো পথ প্রতিদিন মৃত্যু-পথযাত্রী বন্দীদের নিয়ে-যাওয়া গাড়ির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। কত সুকেশা সুনয়না তরুণী, কত যুবা, প্রৌঢ় বৃদ্ধ—কেউ বড় ঘরের, কেউ-বা পর্ণকুটীরের। কিন্তু সবাই এক পথের যাত্রী। গিলোটিনের ধারালো লোহার রক্ত-তৃষ্ণা মেটাতে এখানে নিয়ে আসে তাদের জেলের অন্ধকার থেকে মৃত্যুর মুখোমুখি।

বিপ্লব জানে শুধু দুটি পথ—এক সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, আর এক মৃত্যু। মৃত্যুর সহজ পথের মুখেই এই গিলোটিন।

এই সর্বনাশা বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হলেও একটি দিনের জন্যও লুসি অন্য সবার মতো উপায়হীন নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ল না। একদিন একটি দীর্ঘকাল বন্দী পলিতকেশ বৃদ্ধের সকল দায়িত্ব নিজের ছোট্ট বুক পেতে নিয়েছিল সে—আজ নিজের দুর্দিনেও তাঁকে তেমনি সযত্নে সবলে আঁকড়ে রইল লুসি। সকল বিপদ-আপদে একনিষ্ঠ সেবা করতে লাগল তাঁকে। তার নিজের কর্তব্যে কোথাও ত্রুটি রাখল না।

আবার সংসার গুছিয়ে বসল লুসি। বাবা তাঁর কাজ করছেন। স্বামী যেন আছেন এমনিভাবে বাড়ি সাজাল। মেয়েকে পড়াতে লাগল। ঘড়ির কাঁটায় সব চলতে লাগল। স্বামীর পড়ার ঘর সাজাল। পুরোনো সব যথাযথভাবে রাখল। সে তো জানে বাবার কথা মিথ্যে হবে না। স্বামীকে সে ফিরে পাবেই। তাই তার জন্যে সব ঠিক করে-রাখা তার একটি কাজের অঙ্গ হয়ে উঠল। ঘুমের আগে বহু বন্দীর মধ্যে এক জন বিশেষ বন্দীর মুক্তি-কামনায় সে আকুল প্রার্থনা জানায় রোজ।

এ পনের মাসে চেহারার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি লুসির। আজকাল সে পরে সাদামাটা পোশাক। কিন্তু সেগুলি পরিপাটি। কোথাও নোংরামি রাখে না সে। সোনালী রঙের জুলুস হয়ত-বা একটু ফিকে হয়েছে। দুর্যোগের যে মেঘ-স্তূপ তার মনের আকাশকে নিরন্তর অন্ধকার করে রাখে, তার ছাপ হয়ত পড়েছে মুখে। কিন্তু তার শান্ত মুখশ্রী আর লাবণ্য ঠিকই আছে। কোন রাতে বাবার পায়ের কাছে বসে সে—রুদ্ধ বেদনা অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তিনি তখন মেয়েকে সান্ত্বনা দেন।

'ভয় কি মা? আমার অজান্তে চার্লসের কোন অমঙ্গল হবে না। তাকে আমি বাঁচাবই।' বাবার প্রবল আশ্বাসে মনে বড় শান্তি পায় লুসি।

এমনি এক দিন সন্ধ্যায় বাবা বাড়ি ফিরে এসে বললেন—'জেলখানার উঁচু দিকে

একটা জানালায় আমাদের চার্লসকে মাঝেমাঝে দাঁড়াতে দেয় ওরা। এই বিকেল তিনটে নাগাদ। অবশ্য সব দিনই যে দাঁড়াতে পারবে তা নয়। কিন্তু তুমি যদি মা রাস্তার একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক সে তোমায় চোখের দেখা দেখতে পাবে। কিন্তু তুমি হয়ত তাকে দেখতে পাবে না। আর দেখতে পেলেও চেনার যেন কোন সঙ্কেত করো না—করলে তার মহা বিপদ হবে।'

'কোথায় সে-জায়গা, বাবা—দেখিয়ে দাও আমায়। আমি রোজ যাব সেখানে।'

পরদিন থেকে লুসি রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুই মানে না। ঘড়ির কাঁটাতে দুটো বাজলেই লুসি ছুটে যায়। চারটে বাজার আগে আর বাড়ির দিকে পা বাড়ায় না। আবহাওয়া ভালো থাকলে মেয়েকেও নিয়ে যায়, নয়ত একাই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটি দিনও ফাঁকি দেয় না।

এইখানে আঁকা-বাঁকা গলি-পথের শেষে অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারে একটা ছুতোরের দোকান। এখানে জ্বালানির কাঠ চেরাই হয়।

তৃতীয় দিন একই ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে লুসি ছুতোরের নজরে পড়ল। পরের দিন আবার আসতেই সে জিজ্ঞেস করল—'আবার এসেছ?' লোকটা জেলখানার দিকে দেখিয়ে হাতের দশ আঙুলে জেলের গরাদ দেখাল—তার পর ব্যঙ্গ করে হাসল। বলল, 'আমার কি বাবা!'

নিজের কাজে মন দিল করাতী।

পরদিন দেখে বলল—'সঙ্গে আবার একটি খুকু রয়েছে। তোমার নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ।'

'তা হোক, বেশ বেশ। আমার কাজ কাঠ কাটা। ঐ যে করাত দেখতে পাচ্ছ ওকে বলে খোকা গিলোটিন। ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস—বেশ মুণ্ডটি কাটে।'

লোকটার কথার ধরন দেখে লুসি ভয়ে কাঁপতে লাগল। এক একটা কাঠের টুকরো কাটছে আর বলছে, এই বাপ গেল, এই মা গেল, এই কচি মেয়েটা। এখানে এলে এ-দৃশ্য ওর চোখ পড়বে না এ হতে পারে না কিছুতেই। এর পর থেকে তাই লোকটির শুভেচ্ছা পাবার উদ্দেশ্যে লুসিই আগে কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। মাঝেমাঝে মদের পয়সাও দিত। লোকটিও তা হাত পেতে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা দেখাত না।

অত্যন্ত কৌতূহলী প্রকৃতির লোকটি। লুসি যখন জেলের ছোট্ট জানালার দিকে চেয়ে আত্মহারা হয়ে থাকে, লোকটিও লুসির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকায় জেলের দিকে—আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে কি দেখে সে।

'আমার কি দরকার বাবা'—বলে করাতী নিজের কাজ করে।

শীতের তুষার কুচি, বসন্তের ঝড়ো হাওয়া, গ্রীষ্মের তপ্ত রোদ আর শরতের বাদল ধারায়—সকল ঋতুতেই লুসি প্রতিদিন দুটি ঘণ্টা কাটায় ওখানে দাঁড়িয়ে। যাবার বেলা জেলখানার দেয়ালে বার বার চুমু খায়। বাবা বলেছেন চার্লস জানতে পেরেছে যে লুসি সেখানে আসে। স্বামী মাঝেমাঝে দেখতে পায় তাকে। রোজ দেখা না পেলেও মাঝেমাঝে যে দেখতে পায় তাতেই খুশি সে। তার জন্যে নিত্য এসে দাঁড়ানো তার কিছুই নয়।

এভাবে ডিসেম্বর এল। চারিদিকে বিভীষিকা আর উন্মত্ততার রাজ্য। এর মধ্যে একজন শুধু অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন—বন্দী, বিপ্লবী, দেশদ্রোহী বিচার করছেন না। তিনি ডাক্তার ম্যানেত।

এমনি এক তুষার-ঝরা দিনে লুসি যথাসময়ে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে হাজির হয়েছে। আজ কি এক শুভ আনন্দ-উৎসবের দিন। আসার সময় লুসি লক্ষ্য করেছে

গৃহে গৃহে লাল পতাকা উড়ছে। তিন-রঙা রিবনে লেখা—রিপাবলিক এক—অখণ্ড। স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী নয় মৃত্যু।

ছুতোরের ছোট্ট দোকানটি আজ বন্ধ। দেখে খুশি হল লুসি। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র আয়তনের দোকানে শ্লোগান লিখিয়ে নিয়েছে সে। লাল পতাকা উড়িয়েছে চালের উপর। একটি দিন সে একলা কাটাতে পারবে ভেবে লুসি হালকা নিশ্বাস ফেলল।

হঠাৎ লুসি শুনতে পেল, বহু কণ্ঠের জয়োল্লাস আর উদ্দাম পদশব্দ। এক মুহূর্ত পরেই দেখতে পেল এক বিরাট মিছিল জেলের দিকে এগিয়ে আসছে। বিপুল জনতার কণ্ঠে বিপ্লবের গান। পদক্ষেপে জন-জাগরণের বলিষ্ঠ পৌরুষ। নৃত্য-ছন্দে সন্ত্রাস-জাগানো বেপরোয়া উন্দামতা।

সেই ভিড়ের সামনের দিকেই লুসি দেখল করাতী লোকটিকে। প্রতিশোধ বলে পরিচিত মেয়েটির হাত ধরে এগিয়ে আসছে দুজনে।

সেই মিছিলে কমপক্ষে পাঁচ শ নরনারী যোগ দিয়েছে। কিন্তু তার নৃত্যোল্লাসে আওয়াজ উঠছে যেন পাঁচ হাজার দৈত্যের কণ্ঠের কলরোল।

তাদের গানে কোন অর্কেস্ট্রা নেই, অন্য কোন বাজনা নেই। তাদের কণ্ঠে বিপ্লবের গান। সেই সুরে যেন নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের নির্মম প্রতিহিংসার শপথ।

মেয়েরা নাচছে একত্রে। পুরুষেরা দল বেঁধে নাচছে। নারীপুরুষে উন্মত্তের মতো এক সঙ্গে নৃত্য-ছন্দে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

লুসির সামনে ধীরে ধীরে যেন পটপরিবর্তন হতে লাগল। তার আচ্ছন্ন চোখের সামনে এতক্ষণ ছিল লাল টুপি আর মোটা পোশাকের পৃথক পৃথক নারীপুরুষ। ক্রমশ সেই বিচ্ছিন্নতার ভিতর থেকে একটা বিশাল অখণ্ড নৃত্যময়তা রূপ নিতে লাগল। এগিয়ে পিছিয়ে নাচছে তারা। পরস্পরের গায়ে মাথায় সবলে আঁকড়ে ধরেছে। নাচতে নাচতে পাক খাচ্ছে নিজেরা। তার পর এক দল আর একদলকে ঘিরে নাচছে। তার পর অনেকগুলি চক্র রচনা করে তারা এক তালে নাচছে। কণ্ঠে তাদের মুক্তির গান। মুক্ত-কণ্ঠের সেই গানে সুরের চেয়ে যেন দাঁত দিয়ে দাঁত ঘষার একটানা আওয়াজ।

এই অবিশ্রান্ত নৃত্যশ্রমে অনেকে ক্লান্ত ও সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। কিন্তু মূল মিছিলের নৃত্যে যতি পড়ছে না।

ছোট ছোট দলে চলছে নাচ। চক্রাকারে চলছে নাচ। হাতে হাত ধরে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে পায়ে পায়ে তাল দিতে দিতে তাদের অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাস উদ্বেল আকার ধারণ করছে। মাঝেমাঝে হঠাৎ মাথা নিচু করে ঊর্ধ্বে বাহু তুলে তারা হুঙ্কার দিচ্ছে যেন।

এই নৃত্যের চেয়ে বোধ করি কোন যুদ্ধের দৃশ্য বেশি ভয়াবহ নয়। যা কোমল দৃশ্যে গ্রন্থিত হয়ে মানুষের মনকে দেয় অনির্বচনীয় আনন্দ—জীবনের সেই সহজ উল্লাস আজ এক বীভৎস রূপ নিয়েছে। মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার ভয়াল মত্ততায় মেতে উঠেছে। পরিস্থিতির বদলে ভালো জিনিস কত অদ্ভুতভাবে বদলে যেতে পারে যেন তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে।

একাকী এই জনতার মুখোমুখি হয়ে ভয়ে-ত্রাসে অভিভূত লুসি এতক্ষণ করাতীর দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিল থর-থর করে। পালকের মতো সাদা তুষার পড়ছে নিঃশব্দে। সাদা আর নরম। লুসি ভয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। মিছিল সরে যেতেই চোখ থেকে হাতের আড়াল সরিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে তার বাবা ডাক্তার ম্যানেত।

'বড় ভয় করছিল বাবা। এ কি দৃশ্য।'

'ভয় কি মা! ওরা কেউ তোমার ক্ষতি করবে না—এ দৃশ্য আমি অবিরতই দেখছি।'

'আমি নিজের জন্যে ভয় করি না বাবা। কিন্তু যখন ভাবি এদের কৃপার উপরই তাঁর জীবন—'

'এদের কৃপার বাইরে শীগগিরই সরিয়ে আনব চার্লসকে। ও আজ জানালায় দাঁড়িয়েছিল। সেই কথাই তো বলতে এলাম তোমায়। আজ তোমার উপর নজর রাখতে কেউ নেই এখানে। ঐ উ'চু জানালাটার দিকে চেয়ে তুমি তোমার ভালোবাসা জানাতে পার।'

'তা-ইতো রোজ জানাই, বাবা।'

'চার্লসকে একদিনও দেখতে পাও না নিশ্চয়?'

'না বাবা'—অঝোরে কাঁদতে লাগল লুসি। তুষারে কার পায়ের শব্দ হতেই দুজনে চকিত হয়ে দাঁড়াল।

মাদাম দ্যফর্জ।

নমস্কার জানালেন ডাক্তার।

শুকনো প্রতি-নমস্কার করল মাদাম। বাপ-মেয়েতে দেখল নিষ্কলঙ্ক তুষার-জমা রাস্তার উপর দিয়ে একটা অশুভ কালো ছায়া হে'টে চলে গেল।

'আগামী কাল চার্লসের বিচার হবে।'

'আগামী কাল?'

'বৃথা সময় নষ্ট করার সময় কোথায়? আমিও প্রস্তুত। আরও সতর্ক থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ট্রাইবুন্যালের সামনে হাজির করা হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই করা যাবে না। এখনও নোটিশ পায়নি সে। আমি ভিতর থেকে জেনে এসেছি। তোমার ভয় করছে না তো, মা?'

লুসি এ কথার সঠিক উত্তর দিতে পারল না—'তোমার মুখের কথাই আমার যথেষ্ট।'

'আস্থা হারালে চলবে না, মা। ভাবনার কাল শেষ হয়েছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাকে মুক্ত করে এনে তোমার হাতে স'পে দেব। তাকে বাঁচানোর জন্য সব কিছুই করেছি। এখন একবার লরির সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

ডাক্তার ম্যানেত হঠাৎ কথা বন্ধ করলেন। ভারী চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিসের শব্দ তাঁরা ভালো করে জানেন। যাদের গিলোটিনে হত্যা করা হবে তাদের নিয়ে গাড়ি যাচ্ছে পথ দিয়ে।

'লরির সঙ্গে দেখা করতে হবে।' পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার।

টেলসন ব্যাঙ্কের প্রাচীন কর্মচারী ঐ লরির প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁদের আজও একটুও টলেনি। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্তরের সঙ্গে টাকা-জহরত বার বার দাবি করছে বিপ্লবীরা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হচ্ছে দিনের পর দিন। তবু লরি চেষ্টা করতে কসুর করছেন না। যে যা বিশ্বাস করে রেখে গেছে, তা রক্ষা করতে প্রাণপণ করছেন।

আকাশে অমঙ্গলের পিঙ্গল আভা, কুয়াশা উঠছে সিন নদী থেকে—আসন্ন রাত্রির সঙ্কেত। ব্যাঙ্কে যখন পে'ছিলেন ম্যানেত, রাত গাঢ় হয়ে এসেছে। মসে'নারের প্রাসাদ শূন্য পরিত্যক্ত পড়ে আছে।

বাড়ির উঠোনে ধুলো আর ছাইয়ের গাদার উপরে বড় বড় হরফে লেখা—জাতীয় সম্পত্তি। গণতন্ত্র এক—অখণ্ড। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—নয় মৃত্যু।

লরির সঙ্গী ঐ মানুষটি কে? চেয়ারে ঝোলানো যার ঘোড়সওয়ারের কোট—মুখ যার দেখা যাচ্ছে না? ঐ নতুন মানুষটি কে—যার কাছ থেকে উত্তেজিত ভাবে উঠে এসে তিনি প্রিয় মানুষটিকে বুকে তুলে নিলেন? সেই ঘরের দরজার বাইরে এসে আবার মুখ ঘুরিয়ে কাকে শুনিয়ে বললেন—'কাল বিচারের জন্য চালান দেবে।'

৬ জয়োল্লাস

পাঁচজন জজ, সরকারী উকিল আর জুরিদের নিয়ে জেলের ভিতর নিত্য ট্রাইবুন্যাল বসছে। বিপ্লবদ্রোহীদের বিচার চলছে অবিরাম। আগামী কাল যাদের বিচার হবে তাদের নামের তালিকা বের হয় আগের দিন সন্ধ্যায়। সব জেলখানার জেলাররা বন্দীদের পড়ে শোনায় সে-নামের তালিকা। বলে—'শোন বন্ধুরা, খবরের কাগজে তোমাদের নাম বেরিয়েছে।'

'চার্লস এভরে মঁদ ওরফে ডার্নে।' লা ফোর্সের জেল তালিকায় নতুন নাম। নাম পড়েছে আগামী কালের বিচার-সভায়। যে-তালিকায় ডার্নের নাম তাতে সব সুদ্ধ তেইশ জনের নাম পড়েছে। তাদের মধ্যে পাত্তা পাওয়া গেল সব সুদ্ধ কুড়ি জনের। একজন বন্দী ইতিমধ্যেই মরে বেঁচেছে আর দুজনের বিচারের আগেই গিলোটিনে শিরশ্ছেদ হয়ে গেছে। লোকের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে তাদের নাম। এমনি করে তার আগে বহু শত বন্দীর নাম ডাকা হয়েছে। তাই ডার্নে এই রীতি-নীতির সঙ্গে অপরিচিত নয়। যাদের ডাক পড়েছে সবাই মরেছে। কেউ ফেরেনি।

এই জেলখানার অভ্যন্তরে বিদায়বাণী আর সহৃদয়তার প্রকাশে বিলম্ব সয় না।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ডার্নে চলল তার বিচারের আদালতে। অন্ধকার এই পথটি দীর্ঘ নয়। কিন্তু যে-নির্জন সেলে জঘন্য পোকামাকড়দের সঙ্গে সে তার কারাগারের ভয়াবহ রাতগুলি কাটিয়েছে, সে রাত ছিল দীর্ঘ শীত-জর্জর।

চার্লস ডার্নের নাম ডাক পড়বার আগে অন্য পনের জন বন্দী কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। পনের জনেরই মৃত্যুদণ্ড হল। এদের বিচার-পর্ব সারতে বোধ করি ঘণ্টা দেড়েক লাগল।

অবশেষে তার ডাক এল।

'চার্লস এভরে মঁদ ওরফে চার্লস ডার্নে।'

পালক-দেওয়া টুপি মাথায় দিয়ে বসে আছেন বিচারকরা। তাঁরা ছাড়া অধিকাংশ দর্শক ও জুরিদের মাথায় লাল টুপি—তাতে তেরঙা ফুল নানাভাবে শোভা পাচ্ছে।

সেই জুরি মহোদয়গণ আর অশান্ত দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে ডার্নের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রচলিত রীতির সবই ওলট-পালট হয়ে গেছে। এখানে এই আদালতে সৎ-সজ্জন মানুষের বিচারে বসেছে দুর্জনেরা। এখানে এসে যারা চিৎকার করছে—এই আদালতের আবহাওয়াকে উত্তেজিত করে তুলেছে, তারা সমাজের নিষ্ঠুর শ্রেণীর মানুষ—তারা শুধু নিচু তলার বাসিন্দা নয়—নিকৃষ্টতমও বটে।

যা-কিছু ঘটনা ঘটছে আদালতে—যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে জেরার সময় তাতেই জনতা ফেটে পড়ছে। নানা মন্তব্য করছে সমস্বরে। কখনও সায় দিচ্ছে নয়ত বিরূপ মন্তব্যে তোলপাড় তুলছে। আবার ধিক্কারধ্বনি মুখর করে তুলছে আদালত-কক্ষ। যেন তাদের প্রতিক্রিয়াতেই আদালতের রায় পরিচালিত হতে চলেছে।

পুরুষদের সকলের হাতেই কিছু কিছু অস্ত্র।

মেয়েরাও ছুরি কি ছোরা রেখেছে সঙ্গে। অনেকে এখানেই খাওয়া-দাওয়া সারছে। কেউ কেউ বোনার কাজ করছে এই আদালতে বসে। এদের ভিতর একটি মেয়েকে দেখল ডার্নে—যার বাহুর নিচে একটা বোনা-কাজ। মেয়েটি বসে বসে বুনছিল অন্য একটি।

সামনের সারিতে বসেছিল মেয়েটি। তার পাশে একটি পুরুষ।

সীমান্ত পেরিয়ে এখানে আসার পর সেই লোকটিকে আর দেখেনি ডার্নে। কিন্তু তাকে চিনতে তার কষ্ট হল না।

সে দ্যফর্জ।

তার কানে কানে সেই মেয়েটি কি সব ফিসফিস করে বলছিল। ডার্নের মনে হল ঐ মেয়েটি নিশ্চয়ই দ্যফর্জের স্ত্রী।

শুধু একটু বিশেষত্ব তার চোখে পড়ল। দুজনেই তার খুব কাছে বসে আছে। তারা একটিবারও তার দিকে চোখ তুলে দেখল না। কি-একটা অনিবার্য পরিণতির প্রতীক্ষা করছিল তারা। আর তাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জুরিদের বেঞ্চ।

প্রেসিডেন্টের আসনের নিচেই বসেছিলেন ডাক্তার ম্যানেত। তাঁর পরিধানে পরিচ্ছন্ন পোশাক।

বন্দী ডার্নে দেখল আজকের এই ট্রাইবুন্যালের বিচার-সভায় তিনি আর লরি এই দুজনই কেবল নিরপেক্ষ মানুষ।

সরকারী উকিল ডার্নেকে দেশত্যাগের অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। আইনের বিধানে দেশত্যাগীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার যোগ্য। ফ্রান্সের সীমানায় ধৃত হয়েছে আসামী। মৃত্যুই তার শাস্তি।

'রাষ্ট্রের শত্রুর মাথা চাই। গিলোটিন'—বলে চিৎকার করে উঠল সশস্ত্র জনতা। হত্যার নেশায় উন্মত্ত জনতার মুখে ঐ আওয়াজ যেন লেগেই আছে। শান্ত করার জন্য হাতুড়ি ঠুকলেন প্রেসিডেন্ট। আবার জিজ্ঞেস করলেন বন্দীকে—দেশত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে বহুদিন বাস করেছে, এ সত্য অস্বীকার করে কি আসামী?'

ডার্নে অস্বীকার করতে পারল না সে-কথা।

আসামী নিজেই দেশত্যাগের কথা স্বীকার করেছে। আর-কিছু বলবার আছে তার?

আছে বই কি। আইনের বিধানে একে দেশত্যাগী বলে না।

'কেন নয়?' প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন।

'কারণ স্বেচ্ছায় আমি উপাধি ত্যাগ করেছি—ত্যাগ করেছি অরুচিকর আভিজাত্যের অধিকার। দেশত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম স্বাধীন জীবিকার খোঁজে। বিলাসী ধনীদের মতো অত্যাচারিত নিরীহ ফরাসী প্রজাদের শ্রমার্জিত অন্নে লোভের ভাগ বসাইনি।'

'আসামীর উক্তির কি প্রমাণ আছে?'

'ডাঃ ম্যানেত ও নায়েব গ্যাবেলকে আমি সাক্ষী মানছি।'

'কিন্তু আসামী তো বিয়ে করেছে ইংল্যাণ্ডে।' প্রেসিডেন্ট তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'বিয়ে করেছি সত্য, কিন্তু কোন ইংরেজ মহিলাকে নয়।'

'আসামীর স্ত্রী ফরাসী নাগরিক?'

'হ্যাঁ। প্রিয় ফ্রান্স তার জন্মভূমি।'

'আসামী স্ত্রীর নাম ও বংশ-পরিচয় দিক।'

'ডাক্তার ম্যানেতের কন্যা—লুসি ম্যানেত আসামীর বিবাহিতা পত্নী। ডাক্তার ম্যানেত এখানে উপস্থিত আছেন। মহান আদালত তাঁকে জেরা করতে পারেন।'

এই উত্তরে ক্ষুব্ধ জনতা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত শান্ত হল। মহান ডাক্তারের জয়-ধ্বনিতে বিচার-সভা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। লরি দেখলেন অনেক হিংস্র মুখে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে—যারা একটু আগে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল।

প্রেসিডেন্ট আবার প্রশ্ন করলেন—'কেন সে এত দিন বিদেশে বসবাস করছে? কেন বিনা অনুমতিতে ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করতে এসেছিল? এর আগে দেশে ফেরেনি কেন?'

এত দিন সে ফিরে আসেনি তার কারণ স্পষ্ট। ফ্রান্সে যে সম্পত্তির ভোগ-অধিকার স্বেচ্ছায় সে ত্যাগ করে গিয়েছিল তা ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের আর-কোন উপায় ছিল না তার এখানে। ইংল্যাণ্ডে সে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষকতা করে নিজের ও পরিবারের অন্ন উপার্জন করে। বর্তমানে সে এসেছে এক ফরাসী নাগরিকের কাতর আবেদনে—তার

অনুপস্থিতিতে লোকটির নাকি প্রাণ-সংশয় ঘটেছে। সেই হতভাগ্য নাগরিককে রক্ষা করার জন্যই নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে ফিরে এসেছে ফ্রান্সে। রাষ্ট্রের চোখে তার এই উদারতা কি অপরাধ বলে গণ্য হবে?

জনতা সমস্বরে রায় দিল—'না।'

আবার প্রেসিডেন্ট হাতুড়ি ঠুকলেন জনতাকে শান্ত করার জন্য। কিন্তু শান্ত হল না জনতা—ক্রমান্বয়ে জিগির তুলতে লাগল—'না—না আসামী নিরপরাধ।'

'যার প্রাণ বাঁচাতে এসেছিল আসামী তার নাম?'

সে আসামীর দ্বিতীয় সাক্ষী। নাগরিক গ্যাবেল।

যে চিঠিখানি লিখেছিল গ্যাবেল, সীমান্তরক্ষীরা সেটি আসামীর অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, হয়ত প্রেসিডেন্টের সম্মুখে রাখা দলিলপত্রের মধ্যেই সেটি পাওয়া যাবে।

চিঠিখানি যাতে থাকে তার জন্যে পূর্বেই ব্যবস্থা করেছিলেন ডাক্তার। চিঠিখানি আদালতে পড়া হল। চিঠির সত্যতা প্রমাণের জন্য গ্যাবেলকেও প্রেসিডেন্টের সম্মুখে হাজির করা হল।

সওয়াল-জবাবে সাক্ষী জানাল, অ্যাবে জেলে সে এতদিন বন্দী ছিল। নতুন সরকার নানা কাজের চাপে তার জেলে নজর দিতে পারেননি। তাই তার দীর্ঘ কারাবাস ঘটল। মাত্র তিন দিন আগে তাকে ট্রাইবুন্যালের সামনে হাজির করা হয়েছিল। চার্লস ডার্নে ধরা পড়ায় তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের মীমাংসা হয়েছে। বিচারে মুক্তি পেয়েছে সে।

এবার ডাক্তার ম্যানেতের জেরা শুরু হল। ডাক্তারের জনপ্রিয়তা, একনিষ্ঠতা ও উত্তরের স্পষ্টতায় প্রভাবান্বিত হলেন বিচারকেরা। দীর্ঘ কারাবাসের পর যখন মুক্তি পেয়েছিলেন, বন্দীই তাঁর নতুন জীবনের প্রথম বন্ধু। তাঁর কন্যার প্রতিও পরম স্নেহশীল সে। ফ্রান্সের অভিজাত শাসনতন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে ডার্নে ইংল্যান্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসিতের জীবনযাপন করেছে। সেখানেও ইংল্যান্ডের সরকার তাকে সে-দেশের শত্রু ও যুক্তরাজ্যের বন্ধু হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। ইংরেজ ভদ্রলোক মি. লরি, যিনি এখানে বিচার-সভায় উপস্থিত আছেন সেই বিচারের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী—তাঁকে জিজ্ঞেস করলেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ডাক্তার ম্যানেতের বক্তব্য শোনার পর জুরিরা সমস্বরে বন্দীকে নির্দোষ বলে রায় দিলেন। মুক্তি পেল বন্দী। ট্রাইবুন্যালের রায়ে জনতার সন্তোষের অবধি রইল না। যে জনতা এখুনি হত্যার জন্য খেপে উঠেছিল, তারাই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ডার্নেকে বিপ্লবের বন্ধু বলে সাগ্রহে বুকে তুলে নিল। বন্দীর মুক্তি-বার্তা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের বাইরে আনন্দের রোল উঠল।

মুহূর্তের পটপরিবর্তনে দেখা গেল যে-মানুষের দল এতক্ষণ হত্যার নেশায় উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যে জেগে উঠল ক্ষমা আর উদারতা। জনতার চরিত্র যে কত প্রগল্‌ভ, কত চটুল তা যেন এক মুহূর্তে ধরা পড়ে গেল—বন্দীর মুক্তির হুকুম হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলের ধারা নেমে এল নারী-পুরুষের চোখে। সবাই ছুটে গিয়ে বন্দীকে জাপটে ধরতে লাগল। এই মুহূর্তে তাকে আদরে আদরে ভাসিয়ে দিল—সামান্য পরি-বর্তনেই তারা হয়ত তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিত।

ডার্নের পরে আর পাঁচজনের বিচার হল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের মৃত্যুর হুকুম হয়ে গেল।

ডাক্তার ম্যানেত ও ডার্নে গেটের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনতা ঘিরে ধরল তাদের। ডার্নে চারদিকে চেয়ে কোর্টে-দেখা পরিচিত মুখগুলি দেখতে পেল। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না সেই বিশেষ দুটি নারী ও পুরুষের মুখ।

সবাই মিলে ডার্নেকে একটা বিরাট চেয়ারে বসিয়ে দিল—চেয়ারটা হয়ত কোর্ট বা অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে—একটা রক্ত পতাকা জড়ানো তাতে। জনতা রক্ত

পতাকা উড়িয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল ডার্নেকে। এরা কি তাকে গিলোটিনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—এমনি সন্দেহ ডার্নের মনে আনাগোনা করতে লাগল। এইভাবে উচ্ছল জনতা এক বন্য উল্লাসে তাকে বয়ে নিয়ে চলল। অবশেষে এক সময় নিজের বাড়ির উঠোনে এসে নামল ডার্নে। ডাক্তার ম্যানেত আগেই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। ডার্নে এসে যখন তার সামনে দাঁড়াল আবেগের আতিশয্যে বিবশ হয়ে তার বাহুর উপরে ঢলে পড়ল লুসি।

লরি এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। চিরবিশ্বস্ত মিস প্রসও এল। ডার্নে সকলকেই তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল বারে বারে। তার পর প্রিয়তমাকে নিয়ে নিজেদের ঘরে গেল। বলল—'লুসি আমি নিরাপদ—'

লুসি বলল—'রোজ আমি ভগবানকে ডেকেছি। প্রতিদিন তাঁর কাছে তোমার মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাতাম।'

'প্রিয়তমা, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বল। তোমার বাবা আমার জন্যে যা করেছেন, আজকের ফ্রান্সে তা আর কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। কি অমানুষিক—'

এক দিন তিনি যেমন মেয়ের কোলে মাথা রেখেছিলেন আজ ছোট্ট মেয়ের মতো পরম নির্ভয়ে বাবার বুকের উপর তেমনি মাথা রাখল লুসি। মেয়েকে তিনি সুখী করতে পারলেন, এই তাঁর পরম গৌরব।

'অমন করে কাঁপছিস কেন, মা? এত দুর্বল হয়ে পড়িস না। আমি তাকে বাঁচিয়েছি।'

৭ অশনি সংকেত

'আমি তাকে বাঁচিয়েছি।'

এ আর স্বপ্ন নয় যে-স্বপ্নে সে মাঝেমাঝে ফিরে আসত। সত্যিই সে এখন এখানে। তবু কেন যেন লুসির ভয় ঘোচে না। কি এক নামহীন আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

চারদিকের পরিবেশ কেমন যেন চাপা ছমছমে। মৃত্যু নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে সারা দেশটা। হত্যা হয়েছে নেশা। হিংস্র হয়ে উঠেছে নারী-পুরুষ। অহেতুক সন্দেহের বশে বা হীন প্রতিহিংসার জন্যে কত নিরীহ লোকের প্রাণ যাচ্ছে গিলোটিনের শানিত কোপে। এ-কথা কেমন করে ভুলে থাকবে লুসি যে তার স্বামীর মতোই কত নিরপরাধ নির্দোষ লোক জনতার কোপে জীবন হারাল। তারাও তো কোন কন্যা-জননী জায়ার আদরের ধন—পরম প্রিয়জন। তবু ভাগ্যবতী সে, কেন না সে-নিষ্ঠুর নিয়তির বজ্রমুষ্টি থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছেন বাবা। এ-সব যখন ভাবে লুসি, কান্না ঠেলে আসে চোখের দুকোল ছাপিয়ে। শীত-সন্ধ্যার কালো পক্ষচ্ছায়ায় ঢেকে যায় চারদিক। নিষ্প্রদীপ পথে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের শকটগুলির ভয়াবহ ঘড়-ঘড় শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ কানে আসতেই লুসি স্বামীর কাছে আরও ঘন হয়ে বসে। কাঁপুনি বাড়তে থাকে বুকের।

বাবা তাকে অভয় দেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন—রক্ষা করেছেন মেয়ের স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। এক দিন তিনি ছিলেন প্রায় উন্মাদ—স্মৃতি-ভ্রংশ দুর্বল। আজ আর সেই অন্ধকার কক্ষ নেই—নেই জুতো তৈরির নর্থ টাওয়ার—এক শ পাঁচ। আজ বিরাট বনস্পতির মতো তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে সবাই—এ তাঁর কম সৌভাগ্য নয়।

ওদের সংসার এখন খুব মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলছে। এখনকার দিনে এইভাবে জীবনযাপন করা সব থেকে নিরাপদ। নয়ত মানুষজনের নজরে পড়লে বিপদের

সম্ভাবনা। তা ছাড়া তারা ধনী নয়। বিশেষ করে ডার্নের কারাবাসের সময় ভালো রকমের খাওয়া, তার পাহারাদার আর গরীব বন্দীদের সাহায্য বাবত বহু টাকা খরচ করতে হয়েছে তাদের। এইসব কারণে খরচ-পত্তরের কিছুটা হিসেবিয়ানা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বাড়িতে তারা কোন চাকর রাখেনি। এই সব গৃহ-ভৃত্যরা গোয়েন্দার কাজ করে। সুতরাং তাদের থেকে বিপদের সম্ভাবনা। নিচেকার গেটে যেসব মেয়ে-পুরুষেরা কাজ করে তারা এদের অনেক কাজকর্ম করে দেয়। জেরিকে লুসিদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রেখে দিয়েছেন লরি। রাতে এসে সে এখানে শোয়।

সেই এক ও অখণ্ড রিপাব্লিকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গৃহদ্বারে গৃহের অধিবাসী প্রত্যেকটি নরনারীর নাম স্পষ্টাক্ষরে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় লিখে রাখতে হবে। সেই আদেশ অনুযায়ী এই বাড়ির অধিবাসীর তালিকায় জেরির নামও উল্লিখিত।

আজ পড়ন্ত বিকেলের আলোয় জেরি যখন এসে উপস্থিত হল তখন ডাঃ ম্যানেতের নির্দেশ অনুযায়ী একজন চিত্রকর সেই তালিকায় চার্লস ডার্নের নাম যোগ করছিল।

একটা সর্বব্যাপী ভয় আর অবিশ্বাস এই সময়কে তিমিরাচ্ছন্ন করেছিল। জীবনের স্বাভাবিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত। অন্য অনেক সংসারের মতো ডাক্তারের ছোট সংসারেও জিনিসপত্রের যা প্রয়োজন তা প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানা দোকান থেকে খুচরো খুচরো কেনা হয়। এতে মানুষজনের নজর পড়ে না। গুজব ছড়াবারও কোন কারণ ঘটে না।

গত কয়েকমাস জেরি আর প্রস দুজনে এই বাজার করার দায়িত্ব পালন করছে। একজন নেয় টাকাকড়ি আর একজন বাজারের থলি। বিকেলে যখন রাস্তার আলো জ্বলে ওঠে তারা দোকানে দোকানে ঘুরে কেনাকাটা সারে।

দীর্ঘকাল একটি ফরাসী পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ইচ্ছা করেই ফরাসী ভাষা শেখায় মন দেয়নি প্রস। দোকানে গিয়ে নাম না বলতে পেরে সে প্রার্থিত বস্তুটি হাত দিয়ে ধরে দরাদরি করে—দরাদরির পর কেনাকাটি।

'আজ অনেক কিছু কিনতে হবে'—বলল প্রস—'তা ছাড়া মদও নিতে হবে।'

বাইরে বেরুবার আগে লুসিকে সতর্ক করল প্রস। বলল—'আমি যতক্ষণ না ফিরে আসছি তুমি একদম বাড়ির বাইরে যাবে না। ঘরের ভেতরে ঐ আগুনের ধারে ওর কাছে বসে থাক। এতদিন পরে যে স্বামীকে ফিরে পেয়েছ তার সঙ্গ একেবারেই ছেড় না। তাকে আর চোখের আড়াল করো না।'

প্রস ডাক্তারকে বলল—'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'স্বচ্ছন্দে'—বললেন ডাক্তার—'তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি, বল তুমি।'

'স্বাধীনতার নিকুচি করেছে'—রূঢ় কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে ওঠে প্রস—'স্বাধীনতার যথেষ্ট দেখা গেল।'

লুসি তাকে সতর্ক করে বলল—'চুপ! চুপ! আবার ঐ সব কথা!'

খুব জোরে মাথা নেড়ে প্রস বলল—'শোন লুসি আমি হলাম মহান বদান্য রাজা তৃতীয় জর্জের প্রজা। আমার নীতি—ওদের রাষ্ট্রনীতি জলাঞ্জলি যাক—ওদের যত কপট কৌশল ধ্বংস হোক। আমাদের সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।'

জেরিও প্রসের কথার প্রতিধ্বনি করল। প্রস এবার বলল—'ডাঃ ম্যানেত, এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি?'

'সে-সম্ভাবনা এখন নেই'—বললেন ডাক্তার—'চার্লসের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হবে।'

আগুনের আভায় লুসির সোনালী চুলগুলি ঝকমক করছে। সেইদিকে তাকিয়ে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল প্রস।

'তবে এখানেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ভালো। মাথা তুলে বাঁচতেই হবে আমাদের। আমার ভাই সলোমন বলত—মাথা উঁচু করে সব সময় নিচুতে লড়বে। চল জেরি, আমরা বেরিয়ে পড়ি। লুসি, তুমি খবরদার বাইরে যেও না।'

আগুনের ধারে ঘন হয়ে বসল লুসি স্বামীকে নিয়ে। নাতনীকে নিয়ে বসলেন বাবা। লরিও এখুনি ব্যাঙ্ক থেকে এসে পড়বেন। মিস প্রস আলো জেবলে দিয়ে গেছে ঘরে। সোট আড়াল করা। আগুনের নরম আলোয় ওরা আরামে বসে গল্প করছে। দাদুর হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়ে নাতনী পরীর গল্প উৎকর্ণ হয়ে শুনছে—যে-পরী এক বন্দীকে জেলখানার দরজা খুলে উদ্ধার করেছে। সেই বন্দী নাকি একদিন পরীর একটা উপকার করেছিল। চারদিক নীরব নিঝুম।

একটা শান্তির ছবি এখানে।

'ও কিসের শব্দ'—হঠাৎ আঁতকে উঠল যেন লুসি।

ডাক্তার ম্যানেত গল্প বলা থামিয়ে বললেন—'মা, তুমি বড্ড ভয়কাতুরে হয়ে পড়েছ আজকাল। একটুকুতেই অত ঘাবড়ে যাও কেন? সাহসিনী হও মা।'

ধরা গলায় ফ্যাকাশে মুখে বলল লুসি—'আমার মনে হল, সিঁড়িতে যেন কাদের পায়ের শব্দ পেলাম।'

'সিঁড়ি মড়ার মতো নিঃসাড় পড়ে আছে, মা।'

কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় করাঘাত হল।

'ঐ যে বাবা! চার্লসকে লুকিয়ে ফেল! বাবা, বাঁচাও একে!'

'কেন উতলা হচ্ছ, মা! তোমার চার্লসকে আমি বাঁচিয়ে এনেছি। বাঁচিয়েছি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ছিঃ, এ কি দুর্বলতা তোমার! আমি দেখছি কে।'

ডাক্তার ম্যানেত বাতি হাতে দু ঘর পেরিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন মেঝেতে ভারী পায়ের শব্দ করে মাথায় লাল টুপি, হাতে পিস্তল, কোমরে ছোরা, রুক্ষ চেহারার চার জন লোক ঘরে প্রবেশ করল।

'চার্লস এভ্রে ম'দ ওরফে ডার্নে আছেন?'—বলল প্রথম জন।

'কে খোঁজ করছে তার?'—প্রশ্ন করল ডার্নে।

'আমি। আমরা। আপনাকে চিনি আমরা—আজকের ট্রাইবুন্যালের বিচারের সময় দেখেছি। চার্লস ডার্নেকে রাষ্ট্রের বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।'

লুসি আর মেয়ে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। তবু ডার্নেকে চার জনে ঘিরে ফেলল।

'এখন আবার সোজা জেলে ফিরে যেতে হবে এইটুকু মাত্র বলতে পারি। আগামী কাল সব জানতে পারবেন। আগামী কালই বিচার হবে।'

ডাক্তার ম্যানেত বাতিটি হাতে ধরে এতক্ষণ নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এবার বাতিটা নামিয়ে বক্তার হাত চেপে ধরে বললেন—'ওকে চেনেন বললেন। ভালো কথা। আমায় চেনেন কি?'

'চিনি বই কি আপনাকে, নাগরিক ডাক্তার।'

'আপনি আমাদের সকলেরই পরিচিত, ডাক্তার। আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ।'

তাদের মুখের দিকে আশ্চর্য অদ্ভুত উদাস দৃষ্টি মেলে নিচু-গলায় বললেন ডাক্তার —'এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান, কেন ওকে আবার বন্দী করার হুকুম হল? কি ওর অপরাধ?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম লোকটি বলল—'সেণ্ট আঁতোয়ানের বিপ্লবী পার্টি ওকে

বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। এই লোকটি সেখান থেকেই আসছে'—দ্বিতীয় লোকটিকে দেখিয়ে দিল প্রথমজন।

'কি অভিযোগ?'

'এর বেশি আর জানতে চাইবেন না, ডাক্তার। দেশ আমাদের কাছে যা দাবি করছে বিপ্লবী হিসেবে তা হাসিমুখে স্বীকার করতেই হবে আমাদের। রাষ্ট্রের দাবি প্রথম। জনতার দাবি লঙ্ঘন করবে কে? কিন্তু আর সময় বেশি নেই আমাদের হাতে। তাড়াতাড়ি করুন।'

'আর একটি কথা'—ডাক্তার প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন—'অভিযোগকারী কারা তাদের নাম জানতে পারি কি?'

লোকটি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাড়িতে হাত দিল—একটু নড়ে দাঁড়িয়ে অবশেষে নিচু-গলায় বলল—'এ প্রশ্ন বে-আইনি। তবে আপনি যখন জানতে চাইছেন বলছি। অভিযোগ-কারীদের নাম—মদের দোকানের নাগরিক দ্যফর্জ ও মাদাম দ্যফর্জ। আরও এক জন আছেন।'

'কে সে?'

'সত্যি জানতে চাইছেন?'—বলে এক অদ্ভুত দৃষ্টি হানল লোকটি—'এ প্রশ্নের জবাব আজ নয়। আগামী কাল আদালতে সব জানতে পারবেন। কিন্তু আর নয়। চলুন মঁসিয়ে চার্লস ডার্নে। এর পর আমি নিরুত্তর।'

৮ জীবন-জুয়া

তাদের বাড়িতে যে নতুন বিপদ ঘটেছে—সুখের বিষয় সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল মিস প্রস। সংসারের অতি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কি কি না কিনলেই নয় মনে মনে ভাবতে ভাবতে সরু পথ ধরে এগিয়ে চলছিল প্রস—এইভাবে এক সময় সাঁকো পেরিয়ে নদীর ওপারে এসে পড়ল। বাজারের ঝুড়ি নিয়ে তার পাশে পাশে যাচ্ছিল জেরি।

রাস্তার দুপাশে যত দোকান পড়ছে সেগুলি দেখতে দেখতে যাচ্ছিল ওরা। যে সব জায়গায় অনেক মানুষের ভিড়—জমে-ওঠা ছোট জনতার জটলা কিংবা যে-সব জায়গায় বহুলোক উত্তেজিতভাবে সোরগোল করছে সে-সব পথ এড়িয়ে যাচ্ছিল ওরা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। নদীর উপর কুয়াশার আস্তরণ। কান-ফাটানো তীক্ষ্ম চিৎকার আর চোখ-ধাঁধানো আলোর উপর ঐ ভারী কুয়াশা একটা চাদর টেনে দিয়েছে যেন। আর ঐ স্তিমিত আলোয় নদীবক্ষে শুধু দেখা যাচ্ছে বড় বড় মালবাহী নৌকোগুলো—যেখানে কামাররা কাজে ব্যস্ত—প্রজাতন্ত্রী সৈন্যদের জন্য কামান তৈরি হচ্ছে সেখানে। যারা সৈন্যদের সঙ্গে চালাকি করতে যাবে তাদের কপালে অনেক দুঃখভোগ আছে। এই সময়ে বিপ্লবের ক্ষুরে দাড়ি কামানোর চেয়ে গালে দাড়ি না গজানোই ভালো।

মুদীর দোকানে ছোটখাট কয়েকটি জিনিস কেনার পর বাতির জন্য কিছুটা তেল কিনল প্রস। তার পর তার মনে পড়ল মদ কেনার কথা।

কয়েকটি মদের দোকানে উঁকি দেবার পর জাতীয় প্রাসাদের কাছাকাছি জমকালো নামের একটা সাইনবোর্ড দেখে সেই দোকানের সামনে দাঁড়াল প্রস। এই দোকানটি নিরিবিলি দেখে তার পছন্দ হল। এখানেও বিপ্লবী কর্মীদের মাথায় স্বদেশপ্রেমের লাল টুপি—তবে এদের উগ্র লালের ঝাঁঝটা একটু কম যেন।

তার পছন্দের সঙ্গে জেরি একমত হওয়াতে দুজনে সেই মদের দোকানে প্রবেশ করল।

ভিতরে ধোঁয়াটে আলো। বেশ কিছু লোকের ভিড়। কেউ বসে দাঁড়িয়ে পাইপ খাচ্ছে। অনেকেই তাস নিয়ে খেলছে। একটি বুক-খোলা আদুল গা ভুসোকালি-মাখা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ খবরের কাগজ থেকে চেঁচিয়ে কি যেন পড়ছিল। বাকিরা মনোযোগ দিয়ে সেই খবর শুনছিল। তাদের কারুর হাতে হাতিয়ার—কারুর হাতিয়ার পাশে রাখা। জনপ্রিয় খসখসে কালো পশমের জামা গায়ে উঁচু কাঁধওয়ালা তিনজন খদ্দের ঘুমে অচেতন—যেন তিনটে লোমশ কুকুর বা ভালুক ঘুমোচ্ছে। এই পরিবেশে দুজন বিদেশী খদ্দের দোকানে এসে ঢুকল মদ কিনতে।

ওদের প্রয়োজনীয় মদ যখন মাপ করে দিচ্ছিল কাউন্টারে, সেই দোকানেরই কোণ থেকে একজন লোক তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা শেষ করে বেরিয়ে আসছিল। বেরুবার পথে সে মুখোমুখি এসে পড়ল প্রসের।

তার সামনাসামনি দাঁড়াতেই একটা উচ্ছ্বসিত শব্দ প্রসের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। প্রস দুহাতে তালি দিয়ে উঠল।

মুহূর্তে দোকানের সবাই চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। আজকাল কোন মতবিরোধে প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষায় একজন আরেকজনকে খুন করছে—এই রকম ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। সবাই মাটির দিকে তাকিয়ে দেখল কে খুন হল। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখল যে সে-রকম কোন মারাত্মক পরিস্থিতি ঘটেনি—কেবল একটি মেয়ে একটি পুরুষের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। লোকটি বহিরঙ্গ সাজে নিখুঁত ফরাসী। খাঁটি রিপাবলিকান। আর স্ত্রীলোকটি ইংরেজ।

এই ঘটনার আকস্মিকতায় যে হতাশা আর আশাভঙ্গ ঘটল, তার জন্যে সারা দোকানে যে কলরব উঠল তার মর্মার্থ প্রস অনুধাবন করতে পারল না। সেই আকস্মিক বিস্ময়ের মুহূর্তে সে-কথা বোঝার মতো মানসিকতাও তার ছিল না। চরম উত্তেজনা ও বিস্ময়ের মুহূর্তে কেবল প্রসই যে হতবুদ্ধি হয়েছিল তা নয়, তার সঙ্গিনীর এই ভাবান্তরে জেরিও কম বিস্মিত হল না।

চাপা রূঢ় গলায় ইংরেজিতে বলল লোকটি—'কি চাও তোমরা এখানে?'

দুটি হাত সশব্দে জড়ো করে নিয়ে কণ্ঠে মমতা মাখিয়ে বলল প্রস—'সলোমন—আমার সলোমন! এত দিন পরে এমনি করে তোর দেখা পেলাম, ভাই। কতদিন তোর খবর নেই, চিঠিপত্তর নেই। এমনি করে কি সরে থাকতে হয়—ভাইটি আমার!'

'ও নামে খবরদার ডাকবে না আমায়'—ভয়ার্ত চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকিয়ে বলল লোকটি—'খবরদার ডাকবে না। খুন করাবে নাকি আমায়!'

'কেন অমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছিস ভাই? আমি কি করেছি তোর?'

প্রসের চোখ সজল হয়ে উঠল।

সলোমন তেমনি নিম্নকণ্ঠে ইংরেজিতে বলল—'কথা বলতে চাও তো চুপচাপ জিনিস নিয়ে বাইরে চলে এস। দাম দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। আমার দেরি করার সময় নেই। সঙ্গের ও লোকটি কে?'

'ও জেরি।'

তেমনি দুঃখিত গলায় বলল প্রস। ভাইয়ের ব্যবহারে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে।

'ওকেও চলে আসতে বল। আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছে কেন? আমি কি ভূত নাকি?'

জেরি তার দিকে অবাক চোখে চেয়েছিল নিঃশব্দে।

প্রস দাম মিটিয়ে দিল মদের। সেই অবসরে লোকটা তার সঙ্গীদের ফরাসী

ভাষায় কি সব বুঝিয়ে দিতেই তারা নিঃশব্দে যে যার আসনে ফিরে গেল। আবার সব ঝিমিয়ে পড়ল দোকানের ভিতরে।

বাইরে নিরিবিলি গা-ঢাকা আঁধারে দাঁড়িয়ে সলোমন বলল—'কি চাও বল?'

'একটু মিষ্টি কথা বল ভাই। কেন অমন শুকনো-গলায় কথা কইছিস? তুই কি নিষ্ঠুর রে, সলোমন!'

নিতান্ত দায়সারা গোছের করে বোনের ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল সলোমন—'হল?'

ঘাড় দুলিয়ে সাড়া দিল প্রস। তেমনি নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

'তোমরা ভেবেছিলে আমায় অবাক করে দেবে, কিন্তু তোমরা আমায় অবাক করতে পারনি। শুধু তোমরা কেন—ইংল্যান্ড থেকে এখানে যারা আসে কেউই আমার নজর এড়ায় না। কিন্তু আর নয়—এবার আমায় নিষ্কৃতি দাও। আমি এদের অফিসার, তোমাদের সঙ্গে ভাব করতে গেলে আমার নিজের প্রাণ-সংশয়। আমার জীবন-সঙ্কট হয় তা তোমরা নিশ্চয় চাও না।'

'বলিস কি ভাই!'—প্রসের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না—দুচোখে জল টলমল করতে থাকে—'ওখানে থাকতে তোর ওপর কত ভরসা আমরা করতাম। তুই ছিলি দেশের ভবিষ্যৎ। নিজের পিতৃভূমিতে কত বড় হতে পারতিস তুই। তা নয়—তুই হলি বিপ্লবীদের অফিসার? এই বিদেশীদের মধ্যে আর এই রকম যারা—এর চেয়ে যে—'

'ঠিক জানি'—বোনের কথা থামিয়ে দিয়ে বলল সলোমন—'ঠিকই বুঝেছি—তুমি আমার মরণই চাও। তারই ব্যবস্থা করতে এসেছ এত দূর। নিজের বোন হয়ে আমার সর্বনাশ করতে চাইছ।'

'ভগবান আমায় রক্ষা করুন', বলল প্রস—'তোকে আমি কত ভালোবাসতাম। তুই আমায় এত বড় কথা বলতে পারলি, ভাই। এর চেয়ে তোর সঙ্গে আমার দেখা না হলেই বোধ হয় ভালো ছিল। একটা মিষ্টি কথা তুই আমায় বল। আমার ওপর কোন রাগ আক্রোশ নেই সেই কথাটা একবার বলে যা—আমি তোকে আর আটকাব না।'

হতভাগী প্রস ভাবল, যেন তার কোন দোষে আজ এমন করে সলোমন তার পর হয়ে গেছে। তাকে ধরা দিতে চাইছে না।

একদিন তার সর্বস্ব নষ্ট করে দিয়ে এই ভাই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, সে-কথা লরিকে একদিন কত দুঃখে বলেছিল প্রস।

এমন সময় আচম্বিতে সলোমনের কাঁধে হাত দিল জেরি। কর্কশ তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করল—'একটা জবাব আমায় দাও হে। তোমার নাম সলোমন জন না জন সলোমন?'

সলোমনের দু-চোখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল। জেরির দিকে চকিতে ফিরে দেখল।

'কি হল?'—বলল জেরি—'জবাব দাও। জন সলোমন না সলোমন জন? তোমার দিদি তোমাকে সলোমন বলে ডাকছে—তার ভুল হবার কথা নয়। আমি কিন্তু জানি তোমার নাম জন। কোনটা তোমার প্রথম নাম। আর তোমার উপাধি প্রস কিনা। এখন তোমার যে নাম বলছ—ইংল্যান্ডে থাকতে তোমার তো সে নামে পরিচয় ছিল না।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'ঠিক কি বলতে চাই—এখনও মনস্থির করতে পারিনি, কেন না, ওদেশে তোমার কি নামে পরিচয় ছিল—তা স্মরণে আনতে পারছি না।'

'পারছেন না?'

'না। তোমার নামের দুটো ভাগ ছিল—এইটুকু মনে আছে।'

'বটে?'

'ঠিক তাই। তোমায় আমি ঠিক চিনেছি। তুমি ছিলে বেলি জেলের সরকারী গুপ্তচর সাক্ষী। ভগবানের দিব্যি করে নিজের নাম বল।'

'বারসাদ।' কে যেন তৃতীয় ব্যক্তি এই নামটি উচ্চারণ করল।

'ঠিক—ঠিক। বারসাদ'—আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জেরি।

যে তৃতীয় লোকটি এদের কথার মধ্যে নামটি বলেছিলেন তাঁর দিকে সবাই তাকিয়ে দেখল।

তিনি সিডনি কার্টন।

বড় কোটের পিছন দিকে তাঁর হাত দুটি জড়ো করা। জেরির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। যেন ওল্ড বেলিতেই দাঁড়িয়ে আছেন—এমনি একটা অবিন্যস্ত উদাসীন ভাব তাঁর।

'খুব শঙ্কিত হয়ো না, মিস প্রস। গতকাল সন্ধ্যায় আমি এসে পেঁাছেছি। মি. লরিও খুব অবাক হয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে যে, যতক্ষণ না পরিস্থিতি সহজ হচ্ছে অথবা খুব একটা প্রয়োজন পড়ছে—ততক্ষণ আমি কোথাও আত্মপ্রকাশ করব না। আমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কিছু গোপন আলাপ করতে চাই। তোমার ভাই আর একটু ভদ্র জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই আমাদের ধারণা ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, অন্তত তোমার মতো মেয়ে যার বোন তার জেলের টিকটিকি হওয়ার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে!'

বারসাদের ফ্যাকাশে মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। প্রতিবাদ করার উপক্রম করতেই সিডনি কার্টন তাকে থামিয়ে দিলেন।

বললেন—'কি করে সব জানতে পারলাম, বলছি। আমি ঘণ্টা খানেক আগে জেলখানার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কি সব ভাবছিলাম, এমন সময় তোমায় বেরিয়ে আসতে দেখলাম। ঐখানেই তোমায় আমি প্রথম দেখতে পাই আর তখুনি চিনতে আমার ভুল হয়নি। ঐ মুখ! ঐ মুখ একবার দেখলে আর বিস্মরণ হবার উপায় নেই। ঐ রকম জায়গায় তোমায় দেখে, আমি আমার এক বন্ধুর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে তোমার পিছু নিয়েছিলাম। তোমায় অনুসরণ করে আমি মদের দোকান অবধি এসেছি। তার পর তোমার কাছ বরাবর বসে তোমার সব খোলামেলা কথাবার্তা শুনে আর তোমার বন্ধুদের জবাব শুনে আমার আর কিছু বুঝতে বাকি নেই। আর সেই সময় আমি মনস্থির করে ফেলেছি যে তোমায় আমার প্রয়োজন হবে কোন-একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে।'

'কি মতলব আপনার?' প্রশ্ন করল সলোমন।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতে চাও তো বলতে পারি। কিন্তু সে হবে বিপজ্জনক —সাংঘাতিক। তার চেয়ে চল না কেন টেলসন ব্যাঙ্কের নিরিবিলিতে—যেখানে কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাবে।'

'আপনি কি ভয় দেখাচ্ছেন নাকি?'

'সে-রকম কথা কি আমি বলেছি?'

'তবে টেলসনেই বা যাব কেন?'

'তুমি যদি যেতে না পার, আমিও বলতে পারব না।'

'অর্থাৎ আপনি কারণ বলবেন না।' ব্যঙ্গ করে বলল সে। বারসাদের নিজের উপর আস্থায় চিড় খেয়েছে যেন।

'তুমি আমার কথা ঠিকই বুঝতে পেরেছ'—বললেন কার্টন—'তাহলেও আমি বলব না।'

সিডনী কার্টনের মুখ-চোখের বেপরোয়া ঔদাসীন্য দেখে বারসাদের বুঝতে বাকি

রইল না যে এ মানুষটির সঙ্গে তার কোন কৌশল চলবে না। তার অভ্যস্ত চোখ সতর্ক হল। কি করতে হবে তা অন্তরে অন্তরে বুঝল সে।

তবু বোনের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল বারসাদ—'আমার যদি কোন ক্ষতি হয় বুঝব যে তোমার জন্যেই তা হল।'

'থাক থাক—খুব হয়েছে'—ধমক দিয়ে উঠলেন কার্টন—'অকৃতজ্ঞ অমানুষের মতো কথা বলো না। তোমার দিদিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাই, নইলে সামান্য ব্যাপারের জন্যে তোমার সঙ্গে এমন ভদ্রতা আমার না করলেও চলত। তুমি আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাবে কি না?'

'আপনার বক্তব্য শুনতে হবে বই কি। বেশ, যাব আপনার সঙ্গে।'

'কিন্তু তার আগে তোমার দিদিকে নিরাপদে পেঁাছে দিতে হবে। আসুন মিস প্রস, আমার হাত ধরুন। এই সময় এমন অরক্ষিত অবস্থায় পথে বেরুনো আপনাদের ঠিক হয়নি। আপনার ভাইকেও আমাদের সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ করছি। রাজি তো? তবে এস।'

পরে প্রস বুঝেছিল আর সারা জীবন সে এই কথাটি কখনও ভোলেনি—সে যখন সিডনি কার্টনের বাহুতে হাত দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে তার ভাই সলোমনের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই কথা জানাতে চাইছিল, তখন সেই মানুষের চোখে এমন একটি উদ্দীপ্ত ভাব সে দেখল যাতে তার ভয় কেটে গেল। মানুষটির স্বাভাবিক হালকা ভাবের বদলে সেখানে এক অনির্বচনীয় উদার জ্যোতি সে দেখতে পেল। আর সেই সঙ্গে মানুষটির সম্বন্ধে তার ধারণাই বদলে গেল।

প্রসকে পথের বাঁকে নিরাপদে পেঁাছে দিয়ে এগিয়ে গেলেন কার্টন টেলসন ব্যাঙ্কের দিকে। জন বারসাদ ওরফে সলোমন প্রস তাঁর সঙ্গী হল।

সান্ধ্য আহার সেরে গনগনে আগুনের মুখোমুখি বসেছিলেন লরি। সেই নির্জনে বসে বোধ করি বহুদিন পূর্বের স্মৃতিচারণ করছিলেন তিনি। স্মৃতির পটে আঁকতে চেষ্টা করছিলেন আজকের টেলসন ব্যাঙ্কের প্রবীণ কর্মচারীটির সেই তরুণ বয়সের ছবিটি—যে সেদিন ডোভারের রয়াল জর্জে এমনি ধারা জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে চেয়ে বসেছিল। কার্টনের সঙ্গে অপরিচিত লোকটিকে দেখে সবিস্ময়ে তাকালেন তাদের দিকে।

'মিস প্রসের ভাই—বারসাদ।' বললেন কার্টন।

পরিচয় শুনেই লরি সামান্য বিচলিত হলেন, বললেন—'নামটার সঙ্গে যেন পরিচয় হয়েছিল কোন সময়ে। মুখ দেখেও চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।'

'বস, বারসাদ'—বলে সিডনি কার্টন নিজেও আসন নিলেন।

তার পর সেই পরিচয় স্পষ্ট করে দেবার জন্যে বললেন—'চেনা বই কি। ও-মুখ কেউ ভুলতে পারে না সেই কথাই বলছিলাম এতক্ষণ ওকে। বেলি জেলের বিচারে রাজসাক্ষী বারসাদকে মনে পড়ে আপনার?'

আগন্তুকের দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে আছেন লরি। দেখে কার্টন বললেন—'মিস প্রস ওকে নিজের ভাই বলে চিনতে পেরেছেন আর আমাদের সৌভাগ্য যে বারসাদ মিস প্রসের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর দুঃসংবাদ আছে, মি. লরি—ডার্নে আবার গ্রেপ্তার হয়েছে।'

'বলেন কি?'—ভীষণ ভয়ের অতর্কিত ধাক্কায় অভিভূত হয়ে পড়লেন লরি।

'বলেন কি মি. কার্টন! এই যে ঘণ্টা দুই হল ওকে নিরাপদে গৃহে রেখে এলাম। এখুনি একবার ওদের খবর নেবও ভেবেছিলাম। কিন্তু কি হল কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'কি জন্যে আবার গ্রেপ্তার হল? এ ঘটনা কখন ঘটেছে, বারসাদ?'

'এই একটু আগে।'

'আমিও বুঝতে পারছি না কিছু। এই বারসাদ সব খবর জানে। ওর মুখেই আমি খবরটা প্রথম শুনলাম। আশ্চর্য হবেন না, মি. লরি। মদ খেতে খেতে আর এক টিকটিকিকে জানাচ্ছিল বারসাদ খবরটা। আমি তা শুনে ফেলি। তাকে নিরাপদে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই খবর বলাবলি করছিল ওরা। কোন সন্দেহ নেই মি. লরি যে সমূহ বিপদ ঘটে গেছে। কি, আমি ঠিক বলিনি, বারসাদ?'

মি. লরির ব্যবসাদারী চোখ বক্তার মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তে বুঝে ফেলল যে এ নিয়ে আর বাক্য ব্যয় বৃথা। বিভ্রান্ত হলেও এ-প্রত্যয় তাঁর হল যে কার্টনের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব হয়ত এ সংকট সমাধানের কোন ইংগিত দিতে পারে। নিঃশব্দ ঔৎসুক্যে তিনি তাকালেন তাঁর দিকে।

লরির সপ্রশ্ন চোখের দিকে চেয়ে কার্টন বললেন—'কাল আবার বিচার-সভায় হাজির হতে হবে তাই বলছিলে না তুমি, বারসাদ? হয়ত এবারও ডাক্তার ম্যানেতের নাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি তাকে মুক্ত করতে পারবে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু কি জানি কেন এবার আমি বড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, মি. লরি। ডাক্তার ম্যানেতের প্রতিপত্তি মনে রাখলে ডার্নের এই গ্রেপ্তার আর পুনর্বিচারের ব্যাপারটা কেমন যেন অসংলগ্ন বোধ হয়—'

'কিন্তু ডাক্তার হয়ত আগে জানতেই পারেননি।'

'জানা-না-জানার প্রশ্ন নয় আর। ডার্নের সঙ্গে ডাক্তার ম্যানেতের নিবিড় সম্পর্কের কথা চিন্তা করলে এই গ্রেপ্তারের ঘটনা গভীর উদ্বেগজনক বলে মনে হয়।'

এ কথার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না লরি। এই অকল্পনীয় বিপদের সম্মুখীন হয়ে নিতান্ত বিচলিতভাবে বসে রইলেন বক্তার মুখের দিকে চেয়ে। চিবুকে হাত-দিয়ে-ধরা চেহারাটি তার ভিতরের দুর্ভাবনাকে যেন মূর্ত করে তুলল।

শান্ত কণ্ঠে বললেন সিডনি কার্টন—'এ বড় ছন্নছাড়া সময় মি. লরি। জীবন-মৃত্যুর এই বেহিসেবী জুয়োখেলায় পণের পরোয়া রাখলে চলবে না। দান ফেলতেই হবে—কেউ জিতবে, কেউ সর্বস্ব খোয়াবে। ডাক্তার জিতুন, আমি হারার দান ধরছি। আজ আর প্রাণের দাম নেই। নইলে এখুনি যাকে জনতার রোষ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলাম—কালই হয়ত তাকে আবার জনতার কোপে পড়ে গিলোটিনে মাথা দিতে হবে। না, মি. লরি, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এই জুয়ো আমি খেলব। যদি সে চরম সঙ্কট আসেই—যদি হারা ঘুঁটি পড়েই আমাদের, তবে জেলের এক বন্ধু আমাকে সেই জুয়োয় সাহায্য করবে। সেই বিপদের দিনের ভরসা হল এই আমাদের বারসাদ।'

'ভালো তাস আছে তো হাতে?'—বলল বারসাদ।

'বাজি ধরতেই হবে। একবার সাজিয়ে নিয়ে দেখি কি কি তাস উঠেছে হাতে। মি. লরি, আমি একটু গলাটা ভিজিয়ে নেব। জানেন তো আমি মানুষটা একটু বদ ধরনের।'

'সানন্দে'—বলে লরি তাঁর দিকে পানপাত্র এগিয়ে দিলেন।

প্রথমে এক গ্লাস—তার পর আর-এক গ্লাস মদ খেয়ে চিন্তান্বিত মুখে বোতলটা সরিয়ে রাখলেন কার্টন।

সিডনি কার্টন কিছুক্ষণ আপনমনে বসে রইলেন। যেন নিবিষ্ট মনে বিচার করে দেখছেন তাঁর হাতের তাস। তার পর বললেন—'ভয় কি বারসাদ। জেলখানার টিকটিকি, রিপাবলিকান কমিটির দূত, এই প্রহরী, এই বন্দী, সর্বক্ষণের গোয়েন্দা আর গুপ্তচর। আর তার ওপরে নিজে ইংরেজ হয়ে ফরাসী বলে ছদ্মনামে আত্মপরিচয় দেওয়া আর বিদেশী সরকারের টাকা খাওয়া। এতগুলো জোরালো তাস আমার হাতে। ফ্রান্স

আর তার স্বাধীনতার শত্রু যে ধনতন্ত্রী ইংরেজ সরকার—তাদের কাছে চাকরি করতে তুমি আগে। এখন ফরাসী সরকারের অধীনে করছ। এটাও মন্দ তাস নয়। আজকালকার অবিশ্বাসের যুগে কে বিশ্বাস করবে যে তুমি এখনও ইংরেজ সরকারের টাকা খাও না—তাদেরই গুপ্তচর নও? তুমি কি বল, বারসাদ, তোমার কি মনে হয়—লোকে বিশ্বাস করবে? আমার কথা ধরতে পেরেছ তো?'

একটু বিব্রত বোধ করল বারসাদ। সেটা সিডনি কার্টনের চোখ এড়াল না।

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না'—বলল বারসাদ।

'আমি টেক্কা মারছি, বারসাদ। এই তো কাছেই সেকসন কমিটি। সেখানে গিয়ে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি চল। তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। ভালো করে ভেবে-চিন্তে দেখ।'

মদের বোতলটা কাছে টেনে নিলেন কার্টন। আরও এক গ্লাস নিঃশেষে পান করলেন। এমনি করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন তিনি, এখনই তাকে নিয়ে বিপ্লবীদের কাছে ধরিয়ে দেবেন, এই আতঙ্কে বারসাদের মুখ বিবর্ণ হল। বারসাদের মুখের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন কার্টন। তাকে আরও ভয় দেখানোর জন্যে আর-এক গ্লাস মদ কার্টন গলায় ঢাললেন।

বারসাদ মনে মনে বুঝল যে সে এক প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে সম্মানজনক চাকরি তাকে খোয়াতে হয়েছিল, তার পর ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে সে ফ্রান্সে এসে ফের চাকরি নিয়েছে। প্রথমে ছিল তার নিজের দেশের মানুষদের মধ্যে গুপ্তচরের কাজ, তার পর ফরাসী দেশের লোকজনের মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি। রাজতন্ত্রের পক্ষে সে সেণ্ট আঁতোয়ান আর দ্যফর্জের মদের দোকানের উপর নজর রাখার দায়িত্ব পেয়েছিল। ডাঃ ম্যানেত, তাঁর কারাবাস, মুক্তি আর তাঁর পুরোনো ঘটনাবলী সম্বন্ধে দ্যফর্জের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার কাজ ছিল তার।

মদের দোকানের সেই মেয়েটির কথা, যে ঐখানে বসে বোনার কাজ করত—তার কথা ভাবলে ভয় হয়। সেই মেয়েটিকে সে সেকসন কমিটিতে দেখেছে বার বার। তার সেই বোনার কাপড়ে যাদের নাম বোনা আছে তারা একে একে গিলোটিনের তলায় বলি হয়েছে। তাদের মতো যারা গুপ্তচর বৃত্তি করে তাদের সর্বদাই মৃত্যুভয়। তাদের পালানোর কোন উপায় নেই। উদ্যত খড়্গের ছায়া সর্বদাই তাদের মাথায়।

একবার যদি সে ওদের হাতে ধরা পড়ে, সেই নিষ্ঠুর মেয়েটা তাকে অবলীলাক্রমে হত্যা করবার ব্যবস্থা করবে।

শান্তকণ্ঠে বললেন কার্টন,—'ভাল করে ভেবে কাজ করবে, বারসাদ।'

অল্পক্ষণ বিহ্বল হয়ে রইল বারসাদ। তার পর একটা নোংরা ভঙ্গিতে মি. লরির দিকে ফিরে বলল—'আপনি তো জ্ঞানী মানুষ। বয়োবৃদ্ধ। ঐ ভদ্রলোক আপনার চেয়ে বয়সে কত ছোট। ওঁর মতো ভদ্রলোকের পক্ষে এই ধরনের হীন কাজ করা কি উচিত? ওঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেটা কি শোভা পায়? আমি তো স্বীকার করছি যে আমি গোয়েন্দা—চর—টিকটিকি, আমি তো অন্নের জন্য এই কাজ করছি। আর আমি না করলে অন্য কেউ তো করতই। কিন্তু তাই বলে উনিও যদি সেই নোংরামির মধ্যে নামেন—আপনিই বলুন।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন কার্টন। বারসাদকে সম্বোধন করে বললেন,—'বৃথা বাক্য ব্যয় করো না। আমার হাতে সময় বেশি নেই। কয়েক মিনিট সময় আমি তোমায় দিচ্ছি।'

'আমার দিদিকে আপনি শ্রদ্ধা করেন—।'

মি. লরিকে নিজের দিকে আনবার আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করল বারসাদ।

'তোমার মতো ভাইয়ের হাত থেকে আমি তাকে চিরদিনের মতো মুক্তি দিতে চাই, বারসাদ।'

'ওকথা বলবেন না, স্যর।'

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

অধৈর্য কণ্ঠে কার্টন বললেন, 'শুধু তাই নয়, আরও আছে। যে টিকটিকির সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে, যে অন্য সব জেলখানাতে ঘুরে বেড়ায়, সে লোকটা কে?'

'ফরাসী। আপনি তাকে চেনেন না।'

আপনমনে গুনগুন করলেন কার্টন। তার পর বললেন,—'ফরাসী! হতেও পারে।'

'আমি তো বলছি, সে ফরাসী। তবে তাতে কি এসে যায়।'

'কি এসে যায়। কি এসে যায়। ঐ মুখ—ঐ মুখ।'

'না না, আপনার ভুল হচ্ছে।'

'ভুল হতে পারে না। লোকটা ভালো ফরাসী বলছিল, কিন্তু লোকটা ফরাসী নয়, বিদেশী।'

'গ্রামের লোক'—বলল বারসাদ।

'না, লোকটা বিদেশী।' হঠাৎ তার মনের ভিতর আলোকপাত হল। টেবিলের উপর হাত চাপড়ে কার্টন বললেন—'ক্লাই। ছদ্মবেশে সেই লোক। ওল্ড বেলিতে একেই আমি দেখেছি।'

বারসাদ এতক্ষণে মৃদু হাসল। সেই হাসিতে তার একদিকে হেলানো নাক আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'আপনি খুবই ভুল করছেন। ক্লাই অনেকদিন আগে মারা গেছে। তার শেষ অসুখের সময় আমি তার কাছে ছিলাম। লণ্ডনের এক কবরখানায় তার শেষকৃত্য করা হয়। আমি নিজেই তাকে কফিনে রেখেছিলাম।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই লরি এক ভৌতিক দৃশ্য দেখলেন। দেয়ালের উপর প্রতিফলিত ছায়ায় চমকিত হয়ে লরি মুখ ফিরিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, জেরির মুখটি কঠিন—তার মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

বারসাদ বলল,—'আসুন স্যর, যুক্তি দিয়ে সবটা বিচার করুন। আপনার অনুমান যে কত ভুল সেটা আমি এখুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমার পকেট-ডায়েরির ভিতরে ক্লাইয়ের সমাধির সারটিফিকেট আছে।'

দ্রুত হাতে পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে বারসাদ এগিয়ে দিল। বলল—'আপনি নিজের হাতে দেখুন, স্যর। এর ভেতর কোন জাল জোচ্চুরি নেই।'

লরি দেখলেন জেরির ছায়া বড় হল। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। তার পর ধীর পায়ে আসছে এগিয়ে।

বারসাদের অলক্ষিতে জেরি তার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। তার কাঁধের উপর হাত রাখল।

'তা হলে রজার ক্লাই-কে তুমিই কফিনে পুরেছিলে কবর দেবার জন্যে।'

'আমি পুরেছিলাম।'

'তবে তাকে বের করে নিয়েছিল কে?'

হঠাৎ এই অতর্কিত আক্রমণে বারসাদ চেয়ারে ঝুঁকে পড়ল। থতমত খেয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি?'

'আমি বলছি'—বলল জেরি,—'রজার ক্লাই কখনও কফিনের ভেতর শোয়নি। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

বারসাদ ঘুরে ঘুরে দুই ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তাঁরা অপারিসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলেন জেরির দিকে।

'আমি বলছি, সেই কফিনে তোমরা মাটি আর পাথর ভরেছিলে। সেই কফিন তোমরা মাটিতে পুঁতেছিলে। তার ভিতর রজার ক্লাই ছিল না। সব জিনিসটাই বানানো সাজানো। তোমরা লোককে ধাপ্পা দিয়েছ। সে-কথা আমি আর আমার দুই সঙ্গী সব থেকে বেশি জানি।'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'তাতে তোমার কি, বিশ্বাসঘাতক! তোমার ওপর আমার পুরোনো আক্রোশ আছে। আমার মতো সৎ-ব্যবসায়ীর কাজে তুমি বাগড়া দিয়েছ। আধ গিনি পেলে আমি তোমায় গলা টিপে মারব।'

লরি আর সিডনি কার্টন এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন। এইবার জেরিকে বললেন শান্ত হতে।

সে কি জানে তা পরিস্কার করে বলতে বললেন লরি।

জেরি এখুনি সব কথা খুলে বলতে চাইল না। সে শুধু জানাল যে ক্লাই সে কফিনে ছিল না। কি করে সে জানল সে-কথা সে গোপনে লরিকে বলবে। তার সৎ ব্যবসায়ের অঙ্গই হল কফিনের মৃতদেহ।

এতক্ষণে বারসাদ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল।

সে বলল, 'রজার ক্লাই সত্যিই মরেনি। তার মৃতদেহ কবর দেওয়াও হয়নি। ওদেশে আমি এত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম যে আমাকে ওখান থেকে গোপনে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। নইলে ওরা আমাকে খুন করে ফেলত। রজার ক্লাই যদি এমন করে মৃত্যুর অভিনয় না করত, তবে সে-ও পালিয়ে আসতে পারত না। কিন্তু এই লোকটা—এই লোকটা কি করে সব জানতে পারল। এটাই আমার কাছে অনেক আশ্চর্যের এক আশ্চর্য।'

'তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই'—কটু কণ্ঠে বলল জেরি, 'তুমি এই ভদ্রলোকের কথামতো কাজ কর।'

এতক্ষণে নির্বীষ নির্বীর্য বারসাদ সিডনি কার্টনের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে। আমার ডিউটির সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আমি আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আপনি বলছিলেন আপনার কি একটা প্রস্তাব আছে। সে-প্রস্তাবটা আমায় বলুন। আমার দ্বারা যা সম্ভব তা করতে আমি দ্বিধা করব না। বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

'খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করি না'—বললেন সিডনি কার্টন, 'জেলে তোমার অবাধ যাতায়াত। তুমি তো ওখানে কাজ কর।'

বারসাদ দৃঢ় কন্ঠে বলল, 'আপনি মনে করেন আমি কারুর পালাবার ব্যবস্থা করে দেব, সে আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'যে প্রস্তাব আমি রাখি নি, সে কথা তুলছ কেন? তোমার ডিউটির সময় তোমার কাছে তো চাবি থাকে। জেলে তোমার অবাধ গতিবিধি শুনেছি, এ কথা কি সত্যি?'

'আমি যখন খুশি আসতে যেতে পারি।'

সিডনি কার্টন গেলাসে মদ ঢাললেন।

তার পর স্থির নিষ্কম্প হাতে সেই গেলাসের মদ ধীরে ধীরে আগুনের উপর ঢালতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে বসে দেখতে লাগলেন, যতক্ষণ না আগুনে সবটা নিঃশেষ হল।

যখন সব ফুরিয়ে গেল সিডনি কার্টন উঠে দাঁড়ালেন! বললেন,—'আজ এই অবধি

রইল। এতক্ষণের সমস্ত কথাবার্তার সাক্ষী হয়ে রইলেন এ'রা দুজন। ভালোই হল যে, এত বড় জিনিসটার পটভূমিকা শুধু তোমার আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না।'

সিডনি কার্টন আবার বললেন,—'এস বারসাদ, পাশের ঐ অন্ধকার ঘরে আমাদের শেষ কথা আমরা নিভৃতে বলে নিই।'

৯ বাজিমাত

সিডনি কার্টন জেলের গুপ্তচর বারসাদকে নিয়ে পাশের একটি আঁধার কক্ষে একান্ত হলেন। দুজনের নিম্নকণ্ঠ পরামর্শ লরির সজাগ কানে পেঁছিল না।

এ-ঘরে লরি বসেছিলেন জেরির সামনাসামনি।

লরির চোখে আজ রাজ্যের সংশয় আর অবিশ্বাস।

জেরি যেভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে তার মধ্যে সৎ ব্যবসায়ীর ভাবটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বলে মনে হল না। বসে বসে অনবরত সে পায়ের স্থান বদল করছে, দেখে মনে হবে যেন পঞ্চাশ জোড়া পা নিয়ে সে খেলা করছে। আঙ্গুলের নখগুলো তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে সে—যেন কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। যতবার লরির দৃষ্টি পড়ছে তার চোখে অমনি হালকা কাশি চাপতে জেরি তার হাতের তালু দিয়ে মুখ আড়াল করছে।

'জেরি, এদিকে এস'—ডাকলেন লরি।

একপাশ হয়ে, যেন কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল জেরি।

'ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়া আর কি কাজ কর তুমি?'

ব্যাঙ্কের এই উচ্চপদস্থ পরম শ্রদ্ধাভাজন মানুষটির দিকে গভীর শ্রদ্ধাভরে তাকাল জেরি। তার পর একটু বিনয়ের সঙ্গে বুদ্ধি মিশিয়ে বলল—'চাষবাষের ব্যাপার—।'

'আমার মনে কিন্তু অন্য সন্দেহ হয়েছে।' জেরির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ক্রোধভরে বললেন লরি—'আমার তা মনে হয় না। ব্যাঙ্কের ঐ চাকরির আড়ালে তুমি এমন কোন কাজে লিপ্ত আছ, যা মোটেই ভদ্র কাজ নয়। আমার মতে রীতিমতো নোংরা ব্যাপার। আর সে-কথা যদি সত্য হয়, তবে ইংল্যাণ্ডে ফেরার পর আমাকে তুমি আর হিতৈষী মানুষ বলে জানবে না। তা ছাড়া তোমার ঐ সব নোংরা ব্যবসার কথা আমি প্রকাশ করে দেব। টেলসন ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত কোন কর্মচারীর দুর্নামের অংশীদার হতে পারে না ব্যাঙ্ক।'

লজ্জিত জেরি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল—'তবু আমি আশা করি, স্যার, যে কাজ করে করে আমি চুল পাকিয়ে ফেললাম, সেই কাজ থেকে আমাকে বরখাস্ত করার আগে আপনি আমার কথাটা ভালো করে ভেবে দেখবেন। যদি কিছু দোষের ব্যবসা করে থাকি তারও দুটো দিক আছে, স্যার। দুটো দিকই, আপনি ভেবে দেখবেন, স্যার।

'বড় বড় সব নামজাদা ডাক্তার আছেন, স্যার, যারা বেশ মোটা মোটা টাকা কামাচ্ছেন আর আমার মতো সৎ ব্যবসায়ী খেটে-খুটে দুটো পাইপয়সা রোজগার করতে হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের গাড়ি করে ওরা যখন যাতায়াত করে—আমাদের মতো সৎ গরীব ব্যবসায়ীদের, যারা সিকি পয়সা রোজগার করতে পারে না—তাদের দিকে ডাক্তারী চোখে বাঁকা করে তাকায়। তারাও তো সমাজের কলঙ্ক, স্যার। আপনি যদি একজনকে নিন্দে করেন তো অন্যজনকে আদর করতে পারেন না। এই যে ব্যবসার কথা বলছেন সেটাও তো সমাজকে নষ্ট করছে, স্যার। ডাক্তারের বউরা সেই পয়সায় আরাম করছে, শুধু আমার বউ স্যার—। ডাক্তাররাই-বা কেন, গির্জার পাদ্রি, কবর দেওয়ার লোকগুলো,

পাহারাদার, কে নয় বলুন—সবাই তো এই ব্যবসায়ে জড়িত। এত জনকে ভাগ দিয়ে আমার মতো সৎ ব্যবসায়ীর কি থাকে বলুন! তা ছাড়া একবার এ লাইন থেকে বেরিয়ে অন্য রোজগারের উপায় বের করতে পারলে, সে নিশ্চয়ই দোসরা সৎ ব্যবসায়ে চলে যাবে। এই সামান্য ব্যবসায়ে এমন কিছু দুঃখ ঘোচে না, স্যর।'

জেরির দীর্ঘ বক্তৃতা শোনার পর লরি তীব্র কণ্ঠে তাকে ভর্ৎসনা করলেন।

'তোমাকে দেখে রাগে আমার গা রি-রি করছে।'

'তবু আমার কথাটা শুনুন, স্যর—'

'সত্যের অপলাপ করো না, জেরি—।'

'মিথ্যে বলব না, স্যর। আমার বিনীত নিবেদনটা আপনি শুনুন, স্যর। ঐখানে ব্যাঙ্কের দরজায়, স্যর—ঐ টুলের ওপর আমার ছেলেটা বসে, স্যর। ও তো বড় হবে —আমার মতন মানুষ হবে—আপনার কাজ করবে, খবরাখবর নিয়ে আসবে, কাজ করবে, স্যর। সে সব তো আপনার আদেশেই হবে। তাই বলছি হুজুর, ঐখানে বাপের টুলে আমার ছেলের বসার হুকুম হোক। মায়ের দেখাশোনার ভার নিক তার পেটের ছেলে। ছেলের বাপকে আপনি—না স্যর, আপনি তেমন হুকুম দেবেন না,—যাতে বাপকে আবার সেই কবর-খোঁড়ার কাজে যেতে হয়—আমি আপনার কাছে মিনতি করে বলছি।'

'তোমার কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়', বললেন লরি—'আর এখন কিছু বলতে হবে না। যদি সত্যি তোমার অনুশোচনা হয়—কথায় নয়, কাজে নিজের অনুতাপ প্রকাশ কর তবে আমি তোমার হিতৈষীই থাকব। কিন্তু আমি আর কথা শুনতে চাই না। কাজে তার প্রমাণ চাই।'

সিডনি কার্টন অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন বারসাদের সঙ্গে, দেখে কপালে আঙুল ঠুকতে লাগল জেরি।

'আচ্ছা, তুমি এখন আসতে পার, বারসাদ—' বললেন কার্টন। 'এই রকমই ব্যবস্থা হয়ে রইল। আমার দিক থেকে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই।'

আগুনের সামনে বসলেন কার্টন।

দুজনে যখন একান্ত হলেন লরি প্রশ্ন করলেন—'কি কথা হল? কি ব্যবস্থা করলেন?'

'বিশেষ কিছু নয়'—বললেন কার্টন, 'বন্দীর সঙ্গে একবার দেখা করবার ব্যবস্থা পাকা করলাম। কি জানি যদি ভাগ্য বিরূপ হয় ডার্নের, অন্তত তার কাছে একবার যাওয়া দরকার—।'

এ কথা শুনে লরির মুখের আলো এক ফুৎকারে নিভে গেল।

'এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। অতিরিক্ত কিছু করতে গেলে ঐ লোকটির মাথা গিলোটিনের নিচে ঠেলে দেওয়া হবে। অবশ্য ও যে-কাজ করত সেটা জানাজানি হলে এর চেয়ে খারাপ আর-কিছু হবার নেই।'

'কিন্তু ট্রাইবুন্যালের বিচারে মন্দ কিছু যদি ঘটে, শুধু দেখা করলেই তো তাকে বাঁচানো যাবে না।'

'সে-কথা আমিও বলি না।'

লরি যে কত ভালোবাসেন এই পরিবারটিকে তা জানেন কার্টন। ডার্নের দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হওয়ায় নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন তিনি। দুর্ভর দুশ্চিন্তায় মানুষটি এ ক-দিনে যেন কত বুড়ো হয়ে পড়েছেন। কার্টন দেখলেন, সামনের মানুষটির দুটি চোখের তট উপচে টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আগুনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসেছিলেন মানুষটি।

'নিখাদ সোনার মতো খাঁটি মানুষ আপনি। এদের অকৃত্রিম বন্ধু। আমার কথায়

আপনি যে কতখানি ভেঙে পড়েছেন তা আমি চোখেই দেখতে পাচ্ছি। ক্ষমা করবেন আমায়' কার্টনের গলার স্বরে নিবিড় মমতা মাখানো—'আমার বাবা যদি পাশে বসে এমনি নিরুপায়ের মত কাঁদতেন, আমি কি দেখতে পারতাম? আপনি যদি আমার বাবা হতেন, আপনার এই দুঃখে আমি এর চেয়ে বেশি কাতর হতাম না।'

কার্টনের মুখে এই ধরনের কথার জন্য লরি একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। এই লোকটির সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনদিনই উঁচু ধারণা ছিল না। কিন্তু এই বেদনার্ত সঙ্কটকালে তাঁর কণ্ঠস্বরে, তাঁর স্পর্শে এমন একটা দরদ আর শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়ে পড়ল যে লরি অভিভূত হলেন। লরি হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে। কার্টন তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিলেন।

'লুসির কথা ভাবছি আমি। তাকে এই ব্যবস্থার কথা জানানো চলবে না। ডার্নের সঙ্গে তার দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়। আর ভগবান না করুন, সত্যি যদি কোন অমঙ্গল ঘটে শেষ অবধি, সে হতভাগিনী হয়ত ভাববে আগে থেকে আমরা তাকে খারাপটা সম্বন্ধেই জানান দিয়ে রেখেছিলাম।'

ততটা ভাবেননি লরি। তাই অবাক হয়ে তিনি কার্টনের মুখের দিকে তাকালেন—সত্যি সত্যি কি তবে কার্টনের মনে এত সব চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছে? কার্টনের দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে লরি মাথা নাড়লেন। সমস্ত সঙ্কটটা যেন তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে উপলব্ধি করলেন লরি।

'শুধু কি তাই। হয়ত আরও হাজারো ভাবনায় কণ্টকিত হবে সে। তাতে তার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। দয়া করে আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না তাকে। আমি কি করতে পারি দেখি। তার চোখের আড়াল থেকেই আমি আমার যথাসাধ্য করব —এ শুধু আপনিই জেনে রইলেন। সংসারে আর কাউকে আমি জানাতে চাই না। আপনি এখন যাচ্ছেন তো তার কাছে? আজ রাতে নিশ্চয় ও ভারি একলা বোধ করবে।'

'আমি এখুনি যাব সেখানে।'

'সেই ভালো। আপনাকে বড় ভালোবাসে—বিশ্বাস করে লুসি। কত দিন তাকে দেখিনি। এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে?'

'উৎকণ্ঠায় কাতর। মনে তার সুখ নেই। কিন্তু ভারি মিষ্টি লাগে তাকে দেখতে।'

'আহা!'—বলে কার্টন চুপ করে রইলেন।

কিন্তু সে তো শুধু একটা শব্দ নয়। যেন একটা বুক-ফাটা দীর্ঘনিশ্বাস। একটা চাপা কান্নার অস্ফুট আর্তনাদের মতো শোনাল সে-শব্দ লরির কানে। চমকিত হয়ে তিনি ফিরে তাকালেন কার্টনের দিকে।

দেখলেন আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছেন কার্টন। গায়ে তার রাইডিং কোট। দেখলেন তাঁর মুখের উপর দিয়ে একটা কুয়াশা মুহূর্তে সরে গেল। দেখলেন যেন উজ্জ্বল ঝরঝরে দিনে পাহাড়ের উপর দিয়ে সঞ্চরমান একটা আলো বা একটা ছায়ার ঝিলিমিলি চঞ্চল পায়ে চলে গেল তার মুখের উপর দিয়ে। পা দিয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠ ঠিকমতো সাজিয়ে দিলেন তিনি।

উদ্দীপ্ত আগুনের আভায় সেই সুন্দর মুখে ততোধিক সুন্দর করুণা—সাদা রাইডিং কোট পরনে, পায়ে উঁচু বুট।

মাথার বাদামী চুলগুলি অনেকদিন অমার্জিত। কানের দু-পাশ দিয়ে সেগুলি অবিন্যস্ত, দীর্ঘ। এত দিন পরে আজ প্রথম আবিষ্কার করলেন লরি যে বেশ সুন্দর দেখতে সিডনি কার্টন। কিন্তু সে-সৌন্দর্যে বড় নিষ্করুণ ঔদাস্য। অবহেলায় অনাদরে সে-রূপ কত মলিন হয়ে পড়েছে। যেন আপনার মনের কারাগারে মানুষটি বন্দী জীবন-যাপন করছেন কত দিন। তারই ছায়া পড়ছে সে-মুখে।

লরি তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কার্টনের বুট তখনও জ্বলন্ত কাঠের উপর চাপা ছিল। আর কাঠটি ভেঙে পড়ছিল সেই চাপে। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক কার্টনকে তাই সতর্ক করলেন লরি।

'আমি ভুলে গেছি', বললেন কার্টন।

'আপনার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে নিশ্চয়?'—একটু পরে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, কাল রাতে বলছিলাম না, লুসিরা হঠাৎ এসে পড়ায় যা করা সম্ভব শেষ করে এনেছি। এদের এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ দেখে প্যারিস ছেড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। যাবার পাসপোর্টও পেয়ে গেছি। যাবার জন্য আমি তো প্রস্তুত হচ্ছিলাম।'

কথা বলতে বলতে দুজনেই হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। এক সময় কার্টন বললেন—'ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কত দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি পেছনে ফেলে রেখে এসেছেন।'

'তা প্রায় আটাত্তর হবে।'

'একটি সফল সুন্দর জীবন। সকলের ভালোবাসা শ্রদ্ধা পেয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্ত কাজের ভিতর দিয়ে কাটিয়েছেন। আজ আটাত্তর বছরের শেষে সহজেই অনুমান করা যায় কোথায় আপনার স্থান। যখন আপনার অবর্তমানে এ পদ শূন্য থাকবে, কত লোক আপনার জন্যে ভাববে।'

'আমি অকৃতদার একলা মানুষ। আমার জন্যে চোখের জল ফেলবে না কেউ।'

'এ-কথা কি করে বলছেন? লুসি কাঁদবে না আপনার জন্য! তার মেয়ে কাঁদবে না?'

'তা ঠিক, তা ঠিক। সেটুকুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। যা বললাম তা আমার মুখের কথা, মনের কথা নয়।'

'ঐটুকু পাওয়ার জন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। নয় কি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'আজ যদি এই দীর্ঘ নিরালা জীবনের শেষে ভাবেন যে কারুর ভালোবাসা প্রেম পাইনি জীবনে, পাইনি কারুর শ্রদ্ধা-প্রীতি, কারুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে এতটুকু স্থান পাওয়ার মতো কিছু করিনি, করিনি স্মরণযোগ্য কোন মঙ্গল কর্ম—তা হলে আপনার এই আটাত্তর বছর আটাত্তরটি অভিশাপের মতো ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসত না কি জীবনে? সত্যি নয়, বলুন?'

'সত্যি বই কি।'

কার্টন অগ্নিশিখার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, কয়েক মিনিট নীরব বিরতির পর আবার বললেন, 'শৈশবের দিনগুলির কথা কি মনে পড়ে না আপনার যখন মায়ের কোলে মাথা রেখে তাঁর আদর খেতেন? সে-সব স্মৃতি কি সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে?'

'এই তো বছর কুড়ি আগের কথা!'

লরির মনও দ্রবীভূত হল। স্নেহ-সজল নরম কণ্ঠে বললেন—'যত শেষের কাছে এগোচ্ছি—তত যেন শুরুর কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। জীবন একটা বৃত্ত। আজ থেকে কুড়ি বছর পেরিয়ে—না না আরও অনেক কালের সেতু পেরিয়ে বহু মানুষের স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। তারা সব ঘুমিয়ে আছে মনের পালঙ্কে। মনে পড়ছে মায়ের কথা, আমার সেই ছোট্ট সুন্দরী মায়ের আদর। কত সঙ্গী-সাথীর কথা মনে পড়ছে—যখন প্রবেশ করিনি সংসারের বিচিত্র রঙ্গভূমিতে। যখন আমার জীবন ছিল অপাপবিদ্ধ, সংসারের দাগ লাগেনি মনে।'

'কিন্তু দোষের তুলনায় আপনি অনেক ভালো ছিলেন।'

'তা হয়ত ছিলাম।'

সর্বাঙ্গের অলসতা ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ আলাপের সূত্র ছিন্ন করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন কার্টন।

'কিন্তু তোমার এখন যুবা বয়স', লরি পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসতে চেষ্টা করলেন—'তুমি তো এখনও শরীর-মনে তরুণ।'

'হ্যাঁ, এখনও আমি বুড়ো হয়ে পড়ি নি। কিন্তু আমার তারুণ্য আমার বয়সে নয়। বাঁচার স্পৃহা আমার মিটে গেছে।'

'আমারও ঠিক তাই' বললেন লরি—'তুমি কি এখন বেরুবে?'

'লুসিদের বাড়ি পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে আছে। জানেন তো আমার অস্থির স্বভাব। অনেক রাত পর্যন্ত যদি আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, ভয় পাবেন না যেন। আবার ঠিক হাজির হব সকালে। কোর্টে যাচ্ছেন তো আগামীকাল?'

'তা যেতে হবে বই কি। কিন্তু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।'

'আমিও থাকব সেখানে ভিড়ে মিশে। আমার স্পাই আমার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে রাখবে। হাত ধরুন আমার।'

কার্টনের হাত ধরলেন লরি, তার পর দুজনে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলেন উঠোনে—উঠোন থেকে রাস্তায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পেঁাছে গেলেন তাঁরা। কার্টন তাঁকে বাড়ির দোরগোড়ায় পেঁাছে দিয়েই চলে এলেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলেন না। একটু গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—দরজা বন্ধ হলে আবার ফিরে এলেন—স্পর্শ করলেন দরজায় যেখানে লুসি হাত রেখেছিল। কার্টন শুনেছে, লুসি রোজই জেলখানায় যেত।—'এই পথ দিয়েই তো তার নিত্য যাওয়া আসা ছিল। তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমিও যাব এই পথ ধ'রে।'

রাত দশটার সময় কার্টন লা ফোর্স জেলের পাঁচিলের সামনে এসে উপস্থিত হলেন—যেখানে লুসি নিত্য এসে দাঁড়িয়ে থাকত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা একটি দিনও বাদ দেয়নি।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দোরগোড়ায় বসে পাইপ টানছিল করাতী। কার্টন তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে চাইলেন।

লোকটা সন্দেহের চোখে তাকাল তাঁর দিকে।

'শুভরাত্রি বন্ধু।'

'রিপাব্লিকের খবর কি?'

'গিলোটিনের খবর তো? মন্দ নয়। আজ গেছে তেষট্টি জন। শীগগিরই এক শয়ে উঠবে। স্যামসন আর তার লোকেরা বলে তারা নাকি লোকের মাথা কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে উঠেছে।' লোকটা হা হা করে হেসে উঠল। 'ব্যাটা একটা আস্ত ভাঁড়! একেবারে ঘুঘু নাপতে।'

'তুমি কি যাও নাকি মাঝেমাঝে দেখতে?'

'প্রতিদিন যাই। দেখবার জিনিস বটে। আর কি নিপুণ-হাতে কাজ সারে দেখলে অবাক হতে হয়। আপনি দেখেছেন কোনদিন?'

'না।'

'একদিন গিয়ে দেখে আসবেন যেদিন বন্দীর দলের সংখ্যাটা বেশ বড় হয়। নিজেই একবার ভাবতে চেষ্টা করে দেখুন—দুটো পাইপ শেষ করতে করতেই তেষট্টি জনকে খতম করে দিয়েছে।'

কেমন নিখুঁত হাত চালায় বোঝাবার জন্যে মুখের পাইপটা নিয়ে দেখাল দাঁত বের-করা ছোট্ট লোকটা। কার্টনের বুকের ভিতর একটা দুরন্ত বাসনা জেগে উঠতে লাগল—এখুনি লোকটাকে খুন করে ফেলবে সে।

'কিন্তু আপনি তো ইংরেজ নন'—বলল লোকটা 'আপনার পরনে অবশ্য ইংরেজের পোশাক।'

উঠে চলে যাবার উপক্রম করছিলেন কার্টন। তাই ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—ইংরেজ।'

'কিন্তু কথা বলেন ফরাসীর মতো।'

'এদেশে আমি ছাত্র-অবস্থা থেকে ছিলাম।'

'ও তাহলে খাঁটি ফরাসী ভদ্রলোক!—শুভ রাত্রি।'

বিদায়ের প্রাক্‌কালে লোকটা আর-একবার স্মরণ করিয়ে দিল কার্টনকে। 'গিয়ে একবার ভাঁড়টাকে দেখে আসবেন। আর সঙ্গে একটা পাইপ রাখবেন।'

কিছু দূর গিয়ে পথের মাঝখানে দাঁড়ালেন কার্টন। স্তিমিত আলোয় একখানা কাগজে পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখলেন।

আজকাল বড় বড় রাস্তাগুলোও পরিষ্কার করে না কেউ। সেইরকম কিছু নোংরা অন্ধকার বড় রাস্তা আর গলিপথ পেরিয়ে কার্টন গিয়ে দাঁড়ালেন একটি ওষুধের দোকানে।

দোকানদার ঝাঁপ ফেলছিল সেদিনের মতো।

লোকটাকে দেখতে যেমন কুচুটে—তার দোকানটাও তেমনি। বিশ্রী অন্ধকার নির্জন জায়গায় অনেকটা পথ বেয়ে উঁচুতে উঠতে হয়। দোকানের ভিতরটাও আধা অন্ধকার।

শুভরাত্রি জানিয়ে কার্টন দোকানদারের সামনে চিরকুটটা রাখলেন। দোকানদার আপনমনে শিস দিতে লাগল কাগজ পড়তে পড়তে। 'আপনার নিজের জন্যে?'—প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ।'

পুরিয়া দুটোকে আলাদা রাখবেন। মিশে গেলে কিন্তু মারাত্মক ফল দাঁড়াবে। জানেন তো?'

'খুব জানি।'

দোকানদার দুটো ছোট পুরিয়া দিল কার্টনের হাতে। কার্টন পুরিয়া দুটো কোটের পকেটে চালান করে, দাম মিটিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

'কালকের আগে আর-কিছু করবার নেই। কিন্তু আজ আর চোখে কিছুতেই ঘুম আসবে না।' আশ্চর্য বেপরোয়াভাবে উচ্চারণ করলেন কথাগুলি। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে উদ্ধত অগ্রাহ্য ভাবের চেয়ে ঢের বেশি ফুটে উঠল ঔদাসীন্য।

আকাশে মেঘের ভেলা ভাসছে। পৃথিবীর জনারণ্যে ঘুরে-ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত তাঁর মন বার বার পথ হারিয়ে ফেলেছে। আজ আবার পেয়েছে যেন পথের নিশানা। এত দিনে বুঝি জানতে পেরেছে তার চরিতার্থতা কিসে! তার পথের শেষ কোথায়।

বহুদূর অতীতের শৈশব কৈশোর যৌবনের দিনগুলির মধুময় স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। সেদিন তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল কত উজ্জ্বল—বহু সম্ভাবনা-পূর্ণ। প্রতিভা-শালী বলে খ্যাতি ছিল বন্ধু-মহলে। এমন সময় বাবা মারা গেলেন। মা কয়েক বছর আগেই গতায়ু হয়েছিলেন। পিতার শেষ সংকারের সময় পুরোহিত যে গুরু-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন আজও তা যেন স্পষ্ট মনে পড়ছে।

পথ নির্জন অন্ধকার। মেঘের অন্তরালে চাঁদ। পৃথিবীতে ছায়া সঞ্চরমান। কখনও-বা আলোছায়ার চলচ্ছবি।

সেই নির্জন গম্ভীর মুহূর্তে আপন প্রাণের তন্ত্রীতে বাজছে সেই স্বর। কানে বাজছে সেই উদাত্ত মন্দ্রস্বর—'আমিই জীবন—আমিই মৃত্যু। আমার প্রতি যে বিশ্বাস

রাখে, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মৃত্যুর দ্বার পেরিয়ে সে অমর লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।'

উদ্যত কুঠারের নিচে প্রাণ-ভয়ে ভীত শহরের নির্জন পথে একাকী ঘুরতে ঘুরতে নিহত সেই তেষট্টি জন মানুষের জন্য আর এখনও যারা অন্ধকার কারাকক্ষে পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে—তাদের কথা মনে করে কার্টনের হৃদয় ব্যথায় টন-টন করে উঠল।

সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন কার্টন একাকী—একটি অতন্দ্র বিমূর্ত আত্মার মতো। তাঁর মনে ছায়া ফেলছিল কত আশ্চর্য স্মৃতি। তাঁর প্রাণ উদ্বেলিত হচ্ছিল কত বিচিত্র অনুভূতিতে।

রাত্রির নিস্তব্ধতায় বাতায়নে বাতায়নে জ্বলছে আলো। তাদের জীবনকে যে ভয়াবহ দুর্যোগ ঘিরে আছে, অন্তত কয়েকটি প্রহরের জন্য তা বিস্মৃত হয়ে এই শহরের মানুষরা নিদ্রার শান্তিপূর্ণ কোলে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিগত বহুবর্ষ ধরে পুরোহিতরা আর শোষণকারী পাণ্ডাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়ে মানুষের মনে বিতৃষ্ণা আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে। তাই আজ আর গির্জায় ভজন হয় না। ঈশ্বরের মহিমায় নত হয় না মানুষের মন। প্রার্থনা বন্ধ হয়েছে। দূর দূর কবরখানায় গেটের উপর ওরা লিখে দিয়েছে—চিরনিদ্রা। গিলোটিনের রক্ততৃষ্ণার বলি মানুষদের নিয়ে শকটগুলি যায়, কেউ একবার দুঃখও করে না। জেলে জেলে বন্দীদের ভিড়। আজকের বন্দী যারা, তারা কালকের বলি। এখন এই রাতে বাইরের বিপুল জীবন ও মৃত্যুর কলরোলের ক্ষণিকের বিরতি মাত্র।

নদী পার হয়ে কার্টন আলোকিত পথে এসে পড়লেন।

পথে গাড়িঘোড়ার ভিড় নেই। এই টালমাটালের দিনে লোকে রাতে কম বের হয়। সম্ভ্রান্ত লোকেরা সন্দেহ এড়াতে মাথায় দেয় লাল টুপি—পায়ে পরে ভারী জুতো। কিন্তু থিয়েটারে লোক থৈ-থৈ। কার্টন দেখলেন—মায়ের সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে কাদায় রাস্তা পার হতে পারছে না। তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন—রাস্তা পার করে তাকে আবার যখন মায়ের কাছে নামিয়ে দিলেন পরম স্নেহে তার নরম গালে ঠোঁট ঠেকালেন।

—'আমিই জীবন—আমিই পুনরুজ্জীবন। আমাতে যে বিশ্বাস রেখেছে মৃত্যুর জগৎ পার হয়ে সে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাতে যে আশ্রয় করেছে—আমাতে যার আস্থা, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না।'

পথ নির্জন। ক্ষয়িষ্ণু রাত্রি। অখণ্ড শান্তির মধ্যে বার বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন সিডনি কার্টন। মন শান্ত হয়ে এল। সেই নিস্তব্ধ রাত্রির প্রহরে সেতুর উপর দাঁড়িয়ে একবার প্রকৃতির সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে উঠলেন কার্টন—তার পর ধীরে ধীরে চাঁদ, তারা, রাত্রির আকাশ সব নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মনে হল সৃষ্টি বুঝি বিনাশে লীন হল।

কিন্তু সূর্য উঠল মহা মহিমায়—মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবিত করলেন সৃষ্টিকে। সেই উদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে কার্টনের শ্রদ্ধানম্র দৃষ্টির সামনে এক আলোর সেতু উদ্ঘাটিত হল।

ভোরের বাতাসে, শান্ত নির্জন কোমল সূর্যালোকে, জোয়ার-লাগা নদীর ঢলঢল কলতানে কি মমতা ছিল—কার্টন বাড়ি থেকে বহু দূরে নদীর তীরে স্নিগ্ধ বাতাস আর উষ্ণ আলোর স্নেহ-ক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁর মনে রইল না।

যখন উঠলেন, অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলেন দাঁড়িয়ে।

দেখতে লাগলেন নদীর জলের একটি ঘূর্ণিকে। অবিরত সেটি ঘুরছিল। কার্টনের

মনে হল কোন উদ্দেশ্য নেই সেই চক্রাকার আবর্তনে। তার পর একসময় নদী সেই ঘূর্ণিকে আপন অঙ্কে টেনে নিল। নিয়ে গেল দূর সমুদ্রের দিকে।

'ঠিক আমারই মতো', ভাবলেন কার্টন। আর-একবার উচ্চারণ করলেন—'আমিই জীবন—আমিই পুনরুজ্জীবন।'

ঘুম ভেঙে উঠে যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখলেন লরি ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন। কোথায় গেছেন তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না কার্টনের। হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু খেয়ে তিনিও পা বাড়ালেন আদালতের দিকে।

আদালত-প্রাঙ্গণ বহু পূর্বেই জনতার স্পন্দনে মুখরিত হয়ে উঠেছে। বারসাদ তাঁর জন্যে দর্শকদের ভিড়ে একটি আসনের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তারই এক কোণে আসন নিলেন কার্টন। দেখলেন, লরি ডাক্তার ম্যানেতের পাশে বসে আছেন। লুসিও এসেছে—বসেছে তার বাবার পাশে। কিছু পরেই বন্দীকে আনা হল। স্বামীকে যখন আদালতে আনা হল লুসি তাকাল তার দিকে। সে-দৃষ্টিতে গভীর আশ্বাস, ভালোবাসা, স্নিগ্ধ প্রীতি, কোমলতা, নির্ভীকতা ঝরে পড়তে লাগল। তা দেখে ডার্নের মনের ভয় কেটে গেল। সে উদ্দীপিত হয়ে উঠল আত্মপ্রত্যয়ে। লুসির চোখের একাগ্রতা সিডনি কার্টনের মনেও একই প্রভাব বিস্তার করল।

সেই একই জুরি—একই বিচারকেরা।

আসামী দেশত্যাগী ফরাসী নাগরিক চার্লস এভ্‌রে মঁদ ওরফে ডার্নে। গতকাল মুক্তি পেয়েছিল কিন্তু পুনরায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। অত্যাচারী অভিজাত শ্রেণী, প্রজাতন্ত্রের শত্রু—মৃত্যুর শাস্তি বিধান হয়েছে জনতার রায়ে যাদের, সে তাদেরই একজন।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন—'গোপনে না প্রকাশ্যে—কিভাবে আসামী অভিযুক্ত হয়েছে?'

'গোপনে নয়, প্রকাশ্য দলিলের ভিত্তিতে।'

'অভিযোগকারীদের নাম?'

'আর্নেষ্ট দ্যফর্জ। সেন্ট আঁতোয়ানের মদওয়ালা।'

'আর কেউ?'

'তার স্ত্রী মাদাম দ্যফর্জ।'

'আর?'

'ডাক্তার আলেকজান্দার ম্যানেত।'

এ কথায় আদালতে তুমুল অট্টরোল উঠল। ডাক্তার ম্যানেত রক্তহীন পাংশুমুখে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'মহামান্য প্রেসিডেন্টকে আমি জানাচ্ছি, এ জঘন্য মিথ্যা—জালিয়াতি। আপনি জানেন আসামী আমার মেয়ের স্বামী। আমার মেয়ে এবং তার প্রিয়জনেরা আমার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আমি আমার মেয়ের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি এ-কথা যে বলে, সে মিথ্যা ষড়যন্ত্রকারী কে? কোথায় সে?'

'বিচলিত হবেন না ডাক্তার। ট্রাইবুন্যালের ক্ষমতা আপনি যদি না মানেন তবে বিচারযোগ্য অপরাধে আপনি অপরাধী হবেন। তা ছাড়া রিপাবলিকের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কি আছে ডাক্তার?'

প্রেসিডেন্টের এই ভর্ৎসনায় জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। ডাক্তার ম্যানেত বসে পড়লেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি তাকালেন চারদিকে। লুসি বাবার কাছে ঘেঁষে বসল।

আদালত কক্ষ শান্ত হলে দ্যফর্জ সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠল। দ্যফর্জের জেরা শুরু হল। তার নিজের কারাবাসের কাহিনী। ডাক্তারের অধীনে সে কাজ করত যখন, তখন

তার বালক বয়স। তার পর সে ডাক্তারের মুক্তি-কাহিনী, তাঁর মানসিক অবস্থার কথা একে একে বিবৃত করে যেতে লাগল। আদালত দ্রুত বিচার শেষ করতে চায় তাই জেরাও সংক্ষিপ্ত ভাবেই সারা হতে লাগল।

'বাস্তিল জয় করতে তো আপনি খুবই সাহায্য করেছিলেন?'

'তা কিছুটা করেছিলাম।'

এই সময় একজন উত্তেজিত মহিলা ভিড়ের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে উঠল—'সেদিনের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের তুমিও একজন, সে-কথা আদালতকে বলছ না কেন? সেদিনের গোলন্দাজদের দলে তুমিও ছিলে। সেই কুখ্যাত দুর্গের পতনের পর তুমিই প্রথম দুর্গে ঢুকেছিলে। সত্যি কথা বল।'

এ কণ্ঠ প্রতিশোধের। সমবেত জনতার সপ্রশংস সমর্থনে উৎসাহী হয়ে সে যেন আদালতের সাহায্যে এগিয়ে এল।

প্রেসিডেন্ট ঘণ্টাধ্বনি করলেন।

প্রতিশোধ চেঁচিয়ে উঠল—'আমি এ ঘণ্টাধ্বনি মানি না।' তার এই উক্তি উৎসাহী জনতার সমর্থন পেল।

'ট্রাইবুন্যালকে জানাও—সেদিন বাস্তিল দুর্গে যা যা করেছিলে।'

দ্যফর্জ স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। সিঁড়ির ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে আছে মাদাম। দৃষ্টি তার প্রখর। দ্যফর্জ তার বিবৃতিতে বলল—

'যে-বন্দীর কথা আমি বলছি তিনি নর্থ টাওয়ারের এক শ পাঁচ নম্বর সেলে বন্দী ছিলেন। আমি সে কথা জানতাম। তাঁর মুখ থেকেই আমি সে কথা জানতে পারি। নিজেকে নর্থ টাওয়ার এক শ পাঁচ ভিন্ন অন্য-কোন নামে তিনি জানতেন না। বাস্তিল অধিকারের পর আমি সেই সেল পরীক্ষা করি। একজন প্রহরীর সাহায্যে আমি সেই সেলে প্রবেশ করি। মাননীয় জুরিদের এক জন সেদিন সেখানে আমার সঙ্গী ছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পর চিমনির একটি গর্তে পাথর সরিয়ে একখানা দলিল খুঁজে পাই। এই সেই দলিল। ডাক্তার ম্যানেতের লেখা সেই দলিলটি আমি মহামান্য প্রেসিডেন্টের হাতে সমর্পণ করছি। ডাক্তারের হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি আমি—তাতে আমার সব সন্দেহ ঘুচেছে।'

'দলিল পড়া হোক'—আওয়াজ তুলল জনতা।

আদালত ঘরে নামল নিস্তব্ধতা। বন্দী মমতা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর দিকে। লুসি দিশেহারা আকুতিভরা চোখে চেয়ে দেখল স্বামীর দিক থেকে বাপের মুখের দিকে। ডাক্তারের দৃষ্টি দলিল-পাঠকের উপর স্থিরনিবদ্ধ। মাদাম একদৃষ্টে দেখছে বন্দীকে। মাদামের দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না দ্যফর্জ। দর্শকেরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। কেবল ডাক্তার দেখছেন না কাউকে—শুধু পাঠক ছাড়া। দলিল পড়া হতে লাগল।

১০ ছায়ার কায়া

'আমি আলেকজান্দার ম্যানেত—হতভাগ্য ডাক্তার আমি, জন্মেছিলাম বোভ্যায়, পড়েছিলাম প্যারিসে। বাস্তিল দুর্গের নির্জন কারাকক্ষে বন্দী আমি—সতেরো শ সাতষট্টি সালের শেষ মাসে এই দলিলটি লিখছি সবার অলক্ষ্যে নানা অসুবিধার মধ্যে। কেউ জানতে পারেনি—কেউ জানতে পারবে না এমনভাবে একে আমি লুকিয়ে রাখব। এই ঘরের চিমনির দেওয়ালে একটি নিরাপদ গহ্বর তৈরি করেছি দীর্ঘ দিন ধরে। তার

মধ্যেই এটিকে আমি সযত্নে লুকিয়ে রাখব। কোনদিন কোন দয়ালু লোক হয়ত এটিকে আবিষ্কার করবে। তখন লোকে জানতে পারবে আমার দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা, আমার উপর অত্যাচার নির্যাতনের কথা। কিন্তু সেদিন হয়ত আমি আর আমার দুঃখ সব মাটিতে মিশে মাটি হয়ে যাব।

'চিমনির ঝুলের সঙ্গে গায়ের রক্ত মিশিয়ে কালি তৈরি করেছি। মরচে-ধরা লোহার সূচিমুখ সেই রক্তমাখা কালিতে ডুবিয়ে আমি লিখছি আমার কথা। বন্দীজীবনের দশম বৎসরের শেষ মাসে আমি এই লেখা লিখছি। লিখছি—কারণ আমার জীবন থেকে আশা অন্তর্হিত। আমার আশাহীন আনন্দহীন বন্দী-জীবনের চরম অবমাননার কথা। শরীর আমার ভালো নেই। যেভাবে চলেছে তাতে অধিক দিন আর আমার মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে না। কিন্তু আজ এখন যা লিখছি তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অসংলগ্নতা নেই—মিথ্যা বানানো কিছু নেই। আমার এই স্মৃতিশক্তি অটুট আছে—আর আমি যা লিখছি তা পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আমার এইসব কথা এক দিন দরবারে পেশ হবে—সে মানুষের আদালতেই হোক আর ভগবানের বিচার-সভাতেই হোক।

'সতেরো শ সাতান্ন সালের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এক মেঘলা জ্যোৎস্না রাতে সিন নদীর ধারে একলা বেড়াচ্ছিলাম। বোধ করি সেদিন ছিল বাইশ তারিখ। শীতে কুয়াশায় নিঝুম রাতে আমি বেড়াচ্ছিলাম আমার বাড়ির কিছুটা দূরে—যেখানে চিকিৎসা-বিদ্যার স্কুল অবস্থিত সেই রাস্তায়।

'এমন সময় দুরন্ত বেগে একখানা গাড়ি আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। চাপা পড়ার ভয়ে আমি ত্রস্ত পায়ে সরে দাঁড়ালাম। আর সেই মুহূর্তে শুনলাম ছুটন্ত গাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন আরোহী গাড়োয়ানকে হুকুম দিল গাড়ি থামাতে।

'বলগা সামলে ঘোড়াদের থামাতে থামাতে কিছুটা এগিয়ে গেল গাড়ি। তার পর সেটি থামতেই কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। সাড়া দিয়ে সেদিকে যেতে যেতে গাড়ির দুজন আরোহী ততক্ষণে পথে নেমে পড়েছে। দুটি লোক আপাদমস্তক ভারী পোশাকে ঢেকে আমার দুপাশে দাঁড়াল। যেন নিজেদের পরিচয় গোপন করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাকিয়ে দেখলাম দুজনকে আশ্চর্য এক রকম দেখতে—চলনে বলনে চেহারায়, যতটুকু তখন আমার নজরে এসেছিল। দেখলাম দুজনেই প্রায় আমার সমবয়সী।

'আপনি ডাক্তার ম্যানেত?'

'কি প্রয়োজন বলুন।'

'আপনার বাসায় গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা পেলাম না। শুনলাম আপনি এইদিকে নদীর ধারে বেড়াতে এসেছেন। সেই আশায় এত দূর অবধি গাড়ি ছুটিয়ে আসছি আমরা। দয়া করে গাড়িতে উঠুন।'

'তাদের আচরণ উদ্ধত। কথা বলতে বলতে দুজনে আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে আমাকে গাড়ির দরজার সামনে দাঁড় করাল। দুটি সবল যুবা আমার দুপাশে, দুজনেই সশস্ত্র। আমি অসহায়, নিরস্ত্র। শীতের নির্জন রাত্রি।

আমি বললাম, 'কিন্তু কি প্রয়োজন বলুন আগে। কি রোগ, রোগীর অবস্থা কেমন, সে-সব না জেনে কোন রোগীর গৃহে চিকিৎসার জন্য আমার যাওয়ার অর্থ হয় না।'

'দক্ষিণার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না, ডাক্তার। আপনার পারিশ্রমিক যথোচিত পাবেন। আর রোগী—সে আপনি স্বচক্ষে দেখে যা হয় ব্যবস্থা করবেন। আপনার মতো খ্যাতনামা ডাক্তারকে রোগ সম্বন্ধে আমরা কি উপদেশ দেব। চলুন ডাক্তার—দেরি করবেন না। যথেষ্ট হয়েছে।'

'নিরুপায় হয়ে নিঃশব্দে আমি গাড়িতে উঠলাম। তারাও দুজন উঠল। দ্বিতীয়জন সিঁড়ি তুলে দিয়ে লাফিয়ে গাড়িতে প্রবেশ করল। দিক বদলে গাড়ি ছুটল উল্কাবেগে।

'সেদিন আমাদের আলাপ ঠিক যেভাবে হয়েছিল সেইভাবে আমি বিবৃত করছি। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে—এখানে যা লিখছি তা হুবহু ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেদিনকার সব-কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা প্রয়োজন, আর সেই কারণে এই পবিত্র ব্রতে আমার মনকে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেব না। এই অবধি দাগ দিয়ে আজকের মতো আমি বিরত হচ্ছি। কাগজ আমার গোপন প্রকোষ্ঠে আমি লুকিয়ে রাখলাম...

'বহু পথ পেরিয়ে এল গাড়ি। উত্তর সীমান্ত পার হয়ে গ্রাম্য পথে গিয়ে পড়ল। সীমান্ত থেকে বেশ কিছুদূর গিয়ে—তখন দূরত্বের হিসেব আমার মাথায় আসেনি, কিন্তু পরবর্তী কালে আমি যখন ঐ পথে আবার যাই, তখন আমার ধারণা হয়েছিল পথের দূরত্ব প্রায় তিন মাইলের মতো হবে।

'বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল একটি নির্জন বাগান-বাড়ির গেটে।

'আমরা তিনজনে নেমে পড়লাম। ভিজে ঘাসে ভরা পথ দিয়ে আমরা একটা বাগানের ভিতর প্রবেশ করলাম। একটা অযত্নে রক্ষিত ফোয়ারা দিয়ে অবিরত জল উপচে পড়ছে।

'সঙ্গীরা নেমে সদরে ঘণ্টাধ্বনি করল। কিন্তু দরজা খুলতে দেরি হল অনেক। যে লোকটি দরজা খুলে দাঁড়াল তার মুখে ঘুঁষি মারল এক জন প্রচণ্ডবেগে, তার পর আমায় নিয়ে দুজনে বাগানবাড়ির অন্দরে পা বাড়াল।

'এই যে সামান্য কারণে লোকটাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে মারল এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার মতো কিছু নেই। বাড়ির লোকজনদের কুকুর-বেড়ালের মতো মারধোর করাটা বড়লোকদের বাড়ির নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। দ্বিতীয় লোকটাও হাতের অস্ত্র দিয়ে তাকে একটা ঘা দিল। কিন্তু আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগল এই দুজনের চেহারা দেখে। এক রকম মুখ-চোখ, সর্বাঙ্গ। এরা দুটি যমজ ভাই বলেই আমার সন্দেহ হল।

'বাইরের দরজা এদেরই একজন খুলেছিল। ভেতরে ঢুকে আবার তালা বন্ধ করল।

'বাড়ির ভেতর পা দেওয়া মাত্রই একটি আর্ত কান্না-মেশানো গোঙানি আমার কানে এসেছিল। সিঁড়ি ভেঙে আমরা যত ওপরে উঠতে লাগলাম সে-আওয়াজ বেশি করে কানে আসতে লাগল। ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম প্রচণ্ড জ্বরের তাড়সে অস্থির একটি মেয়েকে।

'মেয়েটি পরমাসুন্দরী। কুড়ি বছরও বয়স হয়নি বোধ হয়। দুটি হাত দুপাশে বিছানার সঙ্গে বাঁধা। মাথার চুল বিপর্যস্ত, ছিন্ন। তার হাত যা দিয়ে বাঁধা হয়েছে সে সব পুরুষের ব্যবহৃত জিনিস—কোন বিশেষ অভিজাত বংশের কুলচিহ্ন-পরিচায়ক সাজসজ্জা। একটি ঝালর দেওয়া স্কার্ফের এক কোণে একটি 'ই' বোনা। রোগের পাণ্ডুরতায় সেই সুন্দর মুখে একটা অপার্থিব প্রভা থর-থর করে কাঁপছে।

'অস্থির আক্রোশে মুখের ভেতর সেই বড় রুমালটির শেষপ্রান্ত পুরে দিয়ে মেয়েটি বিছানার ধারে মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছিল। আমার মনে হল এখুনি তার শ্বাসরোধ হয়ে যাবে। রুমালটি সরিয়ে দিতেই সেই অক্ষরটি আমার চোখে পড়ল। আমি তাকে সযত্নে তুলে শোয়ালাম। তার পর শান্ত করে বুকে হাত দিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে বসলাম। প্রথমেই তার চোখে মুখে তাকিয়ে দেখলাম।

'সারা মুখের মধ্যে দুটি চোখের দৃষ্টিতেই যেন প্রাণ ধক্-ধক্ করে জ্বলছে। সে-চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নয়। উন্মত্ততার প্রান্তে মানুষের চোখে যে বিস্ফারিত বিভ্রান্তি দেখা যায়—সেই উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি সুন্দরী মেয়েটির চোখে দেখে আমি নিজেও কেমন যেন অবাক হলাম।

'এক-এক বার আর্ত চিৎকার করে উঠছে মেয়েটি—'বাবা—আমার বাবা—আমার স্বামী—আমার স্বামী—আমার আদরের ভাই।' এক দুই করে বার অবধি গুনছে

আপন-মনে। তার পর 'চুপ' বলে নিস্তব্ধ হয়ে যেন কি শুনছে। সাড়া না পেয়ে আবার সেই কান্না-ভাঙা চিৎকার—'বাবা—আমার বাবা—আমার স্বামী—আমার আদরের ভাই।' তার পর আবার সেই এক-দুই-তিন করে বার অবধি বার বার গোনা। 'চুপ' বলে আবার সেই নিঃসাড়ে কান পেতে শোনা। রোগিণীর পাশে বসে একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে লাগলাম।

'কখন থেকে এ রকম করছে?'

'চেনার সুবিধার জন্য দুভায়ের একজন বড়, একজনকে ছোট বলব। দুই ভায়ের মধ্যে যাকে বড় বলছি তার কর্তৃত্ব বেশি বলে মনে হল। সেই আমার কথার জবাব দিল। বলল, 'কাল রাত এই সময় বরাবর শুরু হয়েছে।'

'মেয়েটির বাপ ভাই স্বামী—তারা সব এখানে আছে?'

'না, একটি ভাই আছে শুধু।'

'তার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

পরম ঘৃণাভরে উত্তর দিল সে—'তা হবে না।'

'তা হোক। কিন্তু এক-দুই করে বার অবধি গোনার অর্থ কি? বার-র রহস্যটা কি?'

'বার নয়—রাত বারটা বলতে পারেন।'

'তাদের আগ্রহহীন প্রত্যুত্তরে আমি নিরাশ হলাম। বললাম—'দেখুন, এই ভাবে নিরুপায়ের মতো এখানে বসে আমি রোগিণীর রোগের কোন উপশম করতে পারব না। আমি নিজেও প্রস্তুত হয়ে আসিনি—এই নির্জন জায়গায় ওষুধপত্র পাওয়ারও কোন সুবিধা নেই। আমাকে তো একবার বাসায় ফিরতেই হবে। এই গুরুতর অবস্থায় বহু সময় বৃথা নষ্ট হবে।'

'কোন অসুবিধা হবে না আপনার'—বলে বড় ভাই আলমারি থেকে একটি বড় ওষুধের বাক্স এনে রাখল আমার সামনে—'প্রয়োজন মতো ওষুধ আশা করি এরই মধ্যে পাবেন।'

'সেগুলি নিয়ে আমি ঘ্রাণে বর্ণে পরীক্ষা করছি দেখে ছোট ভাই দর্পভরে বলল—'ওষুধগুলো কি আপনি উপযুক্ত মনে করেন না, ডাক্তার ম্যানেত? আপনার সন্দেহ হয়?'

'ওষুধ আমি ব্যবহার করব।' আমি আর-কোন কথা বললাম না।

'নিজের পরীক্ষা শেষ করে রোগিণীর মুখে আমার বিধান-মতো এক মাত্রা ওষুধ ঢেলে দিলাম বহুকষ্টে। তার পর তার বুকে হাত রেখে তেমনিভাবেই বসে রইলাম। আমার ইচ্ছা যে কিছু সময় পরে আর-একবার ঐ ওষুধ তাকে খাওয়াব।

'রোগিণীর সেই আর্ত-কান্না আর শব্দের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড যে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক লয়ে ফিরে আসছে, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। গভীর আগ্রহে আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। অব্যক্ত যন্ত্রণা-কাতর সেই পাণ্ডুর মুখে একটা স্বস্তির ভাব ফিরে আসছে দেখে আমি নিজেও অনেক-খানি আশ্বস্ত বোধ করলাম। তাকিয়ে দেখলাম বাড়িটি জরাজীর্ণ, পরিত্যক্ত। ঠাণ্ডা রৌদ্রবাতাসহীন। জানালাগুলো ভেতর থেকে পেরেক দিয়ে বন্ধ যাতে এই চিৎকার বাইরে থেকে শোনা না যায়।

'আধ ঘণ্টা এমনি ভাবে তার শয্যার পাশে কাটল। দুই ভাই ঠায় সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে। মেয়েটির কষ্টের কিছুটা আরাম হয়েছে দেখে বড় ভাই আমায় বলল—'আরও একটি রোগী আপনাকে দেখতে হবে, ডাক্তার।'

শুনে চমকিত হয়েছিলাম, এ স্বীকার করতে লজ্জা নেই—'সেও কি জরুরী কেস নাকি?'

'চলুন দেখবেন'—উদাসীন কণ্ঠে একথা বলে আলো দেখিয়ে আমায় নিয়ে গেল সে।

'আরও একটি সিঁড়ি পার হয়ে বাড়ির পেছন দিকে আস্তাবলের ওপরে একটি টালির ঘরে আমায় নিয়ে গেল সে। আজ দশ বছর এই জেলখানায় নির্জনে কাল কাটাচ্ছি। কিন্তু সে-দৃশ্যের কোন সামান্য খুঁটিনাটি অবধি আমি ভুলিনি। ঘর-আসবাব-মানুষ কিছুরই বিস্মরণ হয়নি আমার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি সে-ছবি এঁকে দিতে পারি আমার এই বর্ণনায়। সারা ঘরে খড় আর জ্বালানির কাঠ বোঝাই। সেই খড়ের গাদার ওপর একটি বছর সতের বয়সের ফুটফুটে চাষীদের ঘরের ছেলে দাঁতে দাঁত চেপে ডান হাতে বুক ধরে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। দুটি চোখ তার জ্বল-জ্বল করছিল তামসী রাতের এক জোড়া নক্ষত্রের মতো।

'কোথায় তার ক্ষত দেখার জন্যে আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম তার পাশে। তীক্ষ্ণ কোন অস্ত্রের আঘাতে সে মরতে বসেছে তা তার চোখের স্থির তারকায় আর দৃঢ়বদ্ধ অধরোষ্ঠের চাপা কাতরতায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি।

'ভয় কি! আমি ডাক্তার। আমায় দেখতে দাও তোমার ক্ষত।'

'কোন দরকার নেই আমার ডাক্তারের।'

'তার হাতের নিচে চাপা সেই ক্ষত। তাকে শান্ত করে আমি তার হাত সরালাম। তার পর যত্ন করে আমি তাকে দেখলাম। অন্তত বিশ ঘণ্টার বেশি এই ভাবে সে পড়ে আছে তীক্ষ্ণ তরবারিতে বিদ্ধ হয়ে ক্ষতের মুখে শুধু হাত চাপা দিয়ে। হয়ত সময়-মতো ব্যবস্থা নিলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হত। কিন্তু অযত্নে পড়ে তার সেই সুন্দর শরীর থেকে রক্তের সঙ্গে মাটিতে ঝরে পড়ছে প্রাণ-রস। জীবনের ধারা শুষ্ক শীর্ণ হয়ে এসেছে। দ্রুত সে মরছে।

'সেই অবস্থায় তাকে দেখে আমার মনে হতে লাগল এ কোন মানুষ নয়। মানুষের সমাজের বাইরে এ বুঝি কোন জানোয়ারের রাজ্য। কোন গভীর অরণ্যে একটা আহত পশু কি পাখিকে বুঝি এর চেয়ে অসহায় অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয় না। অন্তত বড় ভাই তার দিকে যেভাবে ঘৃণাভরে তাকিয়ে আছে তাতে কোন আহত অসুস্থ মানুষকে সে দেখছে বলে মনে হল না।

'কি হয়েছিল?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমি তাকালাম বড় ভাইয়ের দিকে।

'পথের নোংরা কুকুরটা আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করতে এসেছিল। তাই মুগুরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে। ভদ্রলোক যা করে আমার ভাই তাই করেছে।'

'সে-উত্তরে আহত প্রাণীর প্রতি কোন করুণা-মমতার লেশ নেই। এই ভাবে তাদের বাগান-বাড়িতে মরবে এ জন্যে যেন কত বিরক্ত ভাব তার! পথের কুকুর পথেই মরবে। তাদের জ্বালাতে এসেছে মিছিমিছি, এমনই তাচ্ছিল্য তার কণ্ঠে। সেই লোকটার কথায় আচরণে এতটুকু মমতা নেই। না এই ছেলেটার প্রতি, না তার দুর্ভাগ্যের প্রতি।

'একবার চকিতে তার দিকে তাকিয়েই ছেলেটি চোখ ফিরিয়ে নিল। আমার দিকে ফিরে বলল—'ডাক্তার! ওরা জমিদার, বড়লোক—বনেদি ঘর। ওদের দেমাকের অবধি নেই। আমরা পথের শেয়াল-কুকুর—আমাদের শরীরেও ভগবান রক্তমাংস দিয়েছেন। যত খুশি অত্যাচার অনাচার করুক ওরা—পিষে মেরে ফেলুক যত বার ইচ্ছে, তবু গরিবের গর্ব ওরা ভাঙ্গাতে পারবে না। সে গর্ব মাঝেমাঝে মাথা চাড়া দেবেই—আমার দিদি—আমার দিদিকে আপনি দেখেছেন, ডাক্তারবাবু?'

'এতক্ষণে সে আর্ত চিৎকার আর কান্নার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হল। এখান থেকেও সেই চাপা আর্তনাদ কানে আসছিল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, দেখেছি ভাই।'

'ও আমার দিদি, ডাক্তারবাবু। ঐ ওরা ভাবে যে পৃথিবীতে সব মেয়েই বুঝি ওদের ভোগের জিনিস। তাই মেয়েদের নারীত্ব আর সম্ভ্রম নষ্ট করতে ওদের বাধে না।

অনেক মেয়েও তেমনি পায় ওরা। কিন্তু সব মেয়ে সমান নয়—ডাক্তারবাবু! আমি তো দেখেছি। আমার বাবাও বলতেন সে-কথা—আমার দিদির মতো ভালো মেয়েও সংসারে ছিল। ভালো একটি পাত্রে বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে-ও আমাদের মতো ওদের প্রজা। ঐ দুই ভাইয়ের। কিন্তু ওরা—' কথা কইতে তার অমানুষিক কষ্ট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথায় যেন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে ছেলেটি।

'ছেলেটা বলল—'ঐ যে লোকটা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও আমাদের সর্বস্ব লুট করেছে। ও যেন মহাপুরুষ আর আমরা রাস্তার কুকুর। খাজনা নিয়েছে জোঁকের মতো, মজুরি না দিয়ে খাটিয়ে নিয়েছে পশুর মতো, ওদের কলে আমাদের শস্য ভাঙাতে হয়েছে, আমাদের কত কষ্টের শস্যের দানা ওদের পোষা পাখিদের জন্যে আমাদের দিতে হয়েছে। ওদের হুকুমে আমাদের ঘরে একটা পাখি আমরা পুষতে পারিনি। যদি কখনও এক টুকরো মাংস আমাদের জুটেছে সে আমরা খেয়েছি ওদের ভয়ে জানালা বন্ধ করে, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, পাছে ওদের চরেরা দেখতে পেয়ে সেসব ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের এমন হতচ্ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা হয়েছিল যে আমাদের বাবা বলতেন—আমাদের মতো গরিবের ঘরে একটা শিশু জন্মানো পাপ। আমাদের বাড়ির মেয়েরা যেন বন্ধ্যা হয়। গরিবের ঘরে যেন ছেলে-মেয়ে না জন্মায়। আমাদের মতো গরিব মানুষরা যেন শীগগির মরে শেষ হয়ে যায়।'

'অত্যাচার মানুষকে কিভাবে খেপিয়ে তোলে, সেদিন সেই ছেলেটির চোখের আগুন দেখবার আগে আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। এ কথা আমি জানতাম যে সে-আগুন মানুষের মনের ভিতরে চাপা পড়ে আছে। কিন্তু সে মৃত্যুপথযাত্রী বালকটির সঙ্গে আমার দেখা না হলে সেই আগুনের আত্মপ্রকাশ আমি ধারণা করতে পারতাম না।

'জানেন ডাক্তার, দিদির আমার বিয়ে হল। দিদির সেই ভালোবাসার মানুষটি তখন অসুস্থ ছিল। আমার দিদি তাকে বিয়ে করল, যাতে আমাদের কুঁড়েঘরে তাকে এনে, রেখে, যত্ন করে সারিয়ে তুলতে পারে। আমাদের সেই কুঁড়েঘর যাকে ঐ লোকটা বলত কুকুরদের ঘর।

'বিয়ের ক-সপ্তাহ পরে ঐ লোকটার ভাই কি করে আমার দিদিকে দেখে, আর তার কুনজর পড়ল দিদির ওপরে। সে-লোকটা আমার ভগ্নীপতিকে বলল, আমার দিদিকে তার হাতে কিছু দিনের জন্যে দিতে। আমার ভগ্নীপতির কোন উপায় ছিল না। ওদের জমিদারিতে আমাদের মতো গরিব সংসারে স্বামীদের কিই-বা করবার আছে! তার এই কু-প্রস্তাবে আমার দিদি ঘেন্নায় মুখ ফেরাল। তখন এরা কি করল জানেন? আমার ভগ্নীপতিকে চাপ দিতে লাগল যাতে সে আমার দিদিকে রাজি করাতে পারে।'

'এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিল ছেলেটি। ধীরে ধীরে সে চোখ ফিরিয়ে তাকাল সেই বড় ভাইয়ের দিকে। সেই মুখের ভঙ্গি দেখে আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, ছেলেটি যা বলছে তা সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একজনের মুখে অত্যাচারীর দম্ভ আর-একটি মুখে তার দিদির নারীত্বের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এই খানে এই বাস্তিলের কারাগারের অন্ধকারে বসে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই দুজোড়া চোখের দৃষ্টি। এক জনের চোখে উদাসীন অবহেলা। আর-একজনের চোখে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের প্রতিহিংসার আগুন।

'জানেন ডাক্তার, এই সব অভিজাত জমিদার আর তাদের বংশধররা মনে করে যে তাদের গাড়িতে আমাদের জুড়ে দিয়ে তারা পশুর মতো চালাতে পারে—এ অধিকার তাদের আছে। আমার ভগ্নীপতিকে ওরা তাই করেছিল। সারা রাত—কুয়াশার ভেতর খোলা ভিজে মাঠে তাকে পড়ে থাকতে হত। আবার সকালবেলা ওরা তাকে গাড়িতে

জুড়ত, কিন্তু তাকে ওরা রাজি করাতে পারেনি। একদিন দুপুরবেলা আমার ভগ্নীপতি খেতে এল। বার বার গির্জার ঘণ্টা বাজল, আর সেই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তার কান্নার আওয়াজ মিশে গেল। আমার দিদির বুকে মাথা রেখে আমার ভগ্নীপতি মারা গেল।'

ছেলেটির ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। বোধ করি শুধু মনের জোরে বেঁচেছিল, নইলে এতক্ষণ তার শেষ হয়ে যাবার কথা।

ডান হাত দিয়ে সে তার ক্ষত চেপে ধরে রইল। মৃত্যুর আসন্ন ছায়াকে যেন ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল, যাতে যতক্ষণ না তাদের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তা সব প্রকাশ করতে পারছে—ততক্ষণ সে শান্তিতে মরতে পারবে না।

'তার পর এই লোকটার অনুমতি নিয়ে, এরই সাহায্য নিয়ে, এর লম্পট ভাই আমার দিদিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। আমি জানি, ডাক্তার, আমার দিদি ওর ভাইকে কি বলেছিল—সেসব কথা আপনি সব জানতে পারবেন। ওর ভাই আমার অমন দিদিকে ধরে নিয়ে গেল তার দু-দিনের আমোদের সখ মেটাতে। আমার সামনে দিয়ে তাকে নিয়ে গেল। আমি পথে তাদের দেখতে পেলাম।

'বাবাকে খবর দিতে তিনি যে সেই বুক চাপড়ে চুপ করে গেলেন আর কথা কইতে পারলেন না। তখন আমার ছোট বোনটিকে নিয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। তাকে রেখে এলাম সমুদ্রের ধারে এক জেলেদের পরিবারে। যেখানে ওর হাত পেঁছিবে না। তাকে আর ভোগের উপকরণ করতে পারবে না ঐ শয়তান।

'খুঁজে খুঁজে কাল রাতে আমি এখানে এসে পেঁছিই। আমি একটা পথের কুকুর—একটা পুরোনো তরোয়াল হাতে নিয়ে আমি জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ি। সে উঁচু জানালাটা কোথায়? এই খানেই কোথায় ছিল।'

'ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে তার দৃষ্টির সামনে। জগতের বিস্তৃতি কমে আসছে মৃত্যুর ছায়ায়। আমি তাকিয়ে দেখলাম সেখানে খড়ের উপর একটা মারামারির চিহ্ন রয়ে গেছে।

'আমার সাড়া পেয়ে আমার দিদি ছুটে এল। আমি তাকে সাবধান করলাম যেন সে কাছে না আসে যতক্ষণ না ঐ শয়তানটা মরছে।

'লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পর কিছু টাকার লোভ দেখাল আমাকে। তার পর কুকুরের মতো আমাকে চাবুক দিয়ে মারল। আমি তরোয়াল দিয়ে ওকে আঘাত করতে গেলাম। লোকটা তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে তরোয়াল দিয়ে আমায় এমনি করে মারল।

'এতক্ষণে আমার নজরে পড়ল সেই খড়ের স্তূপের ওপর একটা ভাঙ্গা তরোয়ালের কয়েকটা অংশ। দেখেই বোঝা যায় সেটি কোন অভিজাত ঘরের মানুষের। অন্য জায়গায় পড়ে আছে আর একটি পুরোনো তরোয়াল। হয়ত-বা কোন সৈন্যের।

'একবার আমায় উঠিয়ে দিন, ডাক্তার! একবার উঠিয়ে দিন! সেই লোকটা কোথায়?'

'সে এখানে নেই।' আমি তাকে সাবধানে তুলে ধরলাম।

'শয়তান আমার সামনে আসতে ভয় পায়। এখানে যে লোকটা ছিল সে কোথায়? তার দিকে একবার আমায় ফিরিয়ে দিন, ডাক্তার।'

'আমি তাকে তুলে ধরলাম। আমার হাঁটুর উপর সে তার মাথাটি রাখল। কি একটা দুর্জয় শক্তি তার ভিতরে জেগে উঠল হঠাৎ। ছেলেটা সম্পূর্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে উঠল। আমিও তাকে ধরে উঠে দাঁড়ালাম।

'তার দুটি চোখ বিস্ফারিত। ডান হাতটি তুলে ছেলেটি বলল—'মারকুইস। সেই দিন আসছে যেদিন এই সব অত্যাচারের জবাব দিতে হবে। সেদিন তোমাকে আর

তোমার শেষ-হয়ে-আসা বংশধরদের সেই আদালতের সামনে হাজির হতে হবে। জবাব দিতে হবে সব কৃতকর্মের। এই আমি রক্ত দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন দিলাম তোমাদের নামে শপথ ক'রে। সেই বিচারের দিন তোমার ভাইকে এই সব অনাচার অত্যাচারের জবাব দেবার জন্য উপস্থিত হতে হবে। তার নামেও আমি শপথ নিলাম—এই আমার বুকের রক্তে ক্রুশ চিহ্ন দিলাম।'

'বুকের ক্ষতের উপর দুবার সে হাত দিল। আঙ্গুলের রক্ত দিয়ে যেন বাতাসে দুবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

'তেমনি করে দাঁড়িয়ে রইল সে প্রতিমূর্তির মতো। তার পর তার হাতখানি ঝুলে পড়ল। আর তার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'মৃত বালকটিকে আমি সেইখানে শুইয়ে দিলাম।

ক্লান্ত পা টেনে আবার সেই মেয়েটির শয্যাপার্শ্বে এসে বসলাম। সেই একই রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা চলেছে তার। সেই এক কথা, সেই এক আর্তচিৎকার—সেই গোঙানি। একই রকম—নিঃশব্দে শুধু কান পেতে শোনা। আমি বুঝলাম এ কষ্ট আরও অনেক প্রহর সহ্য করতে হবে মেয়েটিকে। হয়ত মাটির নিচে গিয়ে শান্তি পাবে অভাগিনী!

'আর একবার ওষুধ খাইয়ে প্রতীক্ষা করে বসে রইলাম। রাত গভীর হতে লাগল। সেই চিৎকার—আমার স্বামী—আমার ভাই। এক দুই করে বার। চুপ। এখানে প্রথম আসার পর ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুবার শুধু বাড়ির বাইরে গিয়েছিলাম আমি, নইলে সর্বক্ষণই আমার কাটল তার পাশে। তার পর ধীরে ধীরে তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে এল। গলার স্বর হল স্তিমিত—সর্বাঙ্গ বিবশ। সেই বিলম্বিত বিভীষিকাময় যন্ত্রণার অবসানে লুটিয়ে পড়ল শিথিল দেহ। তখন আমার কাজ ফুরোল। যেন ঝড় আর বৃষ্টির প্রশান্তি হল অনেক দুর্যোগের শেষে।

'ঘরের আর-একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে সেই সংজ্ঞাহীন দেহলতা আমি সযত্নে শয্যায় শুইয়ে দিলাম। আর সেই প্রথম আমি জানলাম যে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা। তার সারা মুখে তখন আসন্ন মাতৃত্বের একটি কোমল আভা আমি দেখতে পেলাম।

'মরেছে?'—রোগিণীর অবস্থা দেখে বড় ভাই আমায় প্রশ্ন করল শান্ত কণ্ঠে।

'বললাম—'এখনো মরেনি—তবে মরবে বটে।'

'যুঝবার কি আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছে ভগবান এই সব ছোটলোকদের।'

'তার চোখে অগাধ বিস্ময় দেখে বললাম—'দুঃখে দুঃখে ওরা পাথর হয়ে যায় কিনা—তাই। সহ্য করতে পারে খুব।'

'প্রথমটা আমার কথায় সে হেসে উঠল। তার পর বোধ করি কথার মর্মার্থ বুঝে একটা চকিত অবজ্ঞার হাসি ফুটল সেই মুখে। আবার তখুনি সেই হাসি কুটিল দ্রূকুটিতে বদলে গেল।

'পা দিয়ে একটা চেয়ার সরিয়ে আনল বড় ভাই। সেই স্ত্রীলোকটিকে চলে যেতে ইশারা করল। তারপর নিচু চাপা গলায় বলল—'এই চাষীগুলোর জন্যে ভাই আমার নিতান্ত বিপদে পড়েছে বলেই আমি তাকে উপদেশ দিলাম আপনার শরণাপন্ন হতে। আপনি বয়সে তরুণ, ডাক্তার হিসেবে আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে যে, এ দু-দিনে যা দেখলেন শুনলেন, তা মনে মনে রাখলেই ভালো করবেন। কোথাও যেন প্রকাশ করবেন না।'

'আমি সন্তর্পণে রোগিণীর লঘু নিশ্বাস পতন-ধ্বনি শোনার চেষ্টা করছি দেখে বিরক্ত কণ্ঠে সে বলল—'আমার কথাগুলো কি ডাক্তারের কানে গেল না?'

'মনে রাখবেন মঁসিয়ে, আমি ডাক্তার। ডাক্তারের ইতি-কর্তব্য কতটুকু তা আমায়

স্মরণ করিয়ে না দিলেও চলবে। আমরা ডাক্তাররা রোগীর ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করেই থাকি। সে আমাদের সেবার অঙ্গ।'

'মেয়েটির নিশ্বাস বইছে এত মৃদু তা যেন বোঝাই যাচ্ছে না।

'তার বুকে হাত দিয়ে দেখলাম আমি। সাবধানে আমি তার নাড়ী পরীক্ষা করলাম। প্রাণ এখনও বুকের ভিতর ধুকধুক করছে। তার বেশি আর-কিছুই নয়।

'আমি দেখতে পাচ্ছি দুই ভাই সর্বক্ষণ আমার কাজকর্ম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে।

'আজ ঠাণ্ডা বড় বেশি। লিখতে আজ বড় কষ্ট হচ্ছে। সর্বদা আতঙ্ক—যদি কেউ এ অবস্থায় আমায় দেখে ফেলে তবে শাস্তি হিসেবে আমায় হয়ত পাঠাবে কোন নির্জন সেলে। সেখানে আলোর রেশ থাকবে না। সেই ভয়ে এই কাহিনী আমি সংক্ষিপ্ত করছি। তবে আমার স্মৃতিতে কোথাও কোন কুয়াশা নেই। আমি সযত্নে প্রত্যেকটি বর্ণনা নিখুঁত বাস্তবতায় বিবৃত করছি। দুই ভাইয়ের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি যথাযথ লিপিবন্ধ করছি।

'আরও এক সপ্তাহ মেয়েটা বেঁচে রইল। শেষের দিকে তার দু-একটি কথা আমার বোধগম্য হয়েছিল। মেয়েটির ঠোঁটের কাছে আমার কান রেখে তার কথা আমি শুনেছিলাম।

'সে কোথায় রয়েছে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে আমি তাকে সব বললাম। আমি কে তাও বললাম।

'তাদের বংশের নামধাম আমি অনেক চেষ্টাতেও তার কাছ থেকে জানতে পারিনি। গভীর লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজে সে নীরবে কেঁদেছে। তার ভাইয়ের মতো সে-ও পরিবারের লজ্জা প্রকাশ করতে চায়নি।

'দুই ভাইকে আমি যখন জানালাম, আর একটা দিন বোধ করি সে বেঁচে থাকবে, তখন তারা এ-ঘর থেকে সরে গেল। এ ক-দিন আমিই থাকি আর সেই স্ত্রীলোকটিই থাকুক, ওদের একজন সর্বক্ষণ পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাল।

'কিন্তু এখন তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। তারা ভাবল যে শুধু মেয়েটাই মরছে না, সেই সঙ্গে আমিও মরছি। তাই আমাদের মধ্যে কি আলোচনা হয় তা নিয়ে তাদের আর দুর্ভাবনা রইল না।

'তার ছোটভাই যে একটা ছোটলোক চাষা ছোকরার সঙ্গে তরোয়াল দিয়ে লড়াই করেছিল, এতে তাদের পারিবারিক সম্মান কত নষ্ট হয়েছে সেই ভেবে বড় ভাইয়ের মনে তিক্ততা জমে উঠেছিল। আমি দেখলাম যে ছোট ভাইয়ের চোখে আমার উপর একটা গভীর বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছে। আমি যে সেই চাষা ছেলেটির কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি এর জন্য সে আমাকে খুবই অপছন্দ করছিল। তবু বড় ভাইয়ের চেয়ে ছোট ভাইকে আমার কাছে অনেক নরম অনেক ভদ্র বলে মনে হল।

'মধ্যরাত্রের দু-ঘণ্টা আগে সেই রোগিণী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। আমার ঘড়িতে মিলিয়ে দেখলাম, যেদিন প্রথম তাকে আমি দেখতে আসি, ঠিক যেসময় তার শয্যাপার্শ্বে আমি বসেছিলাম, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সেই মুহূর্তে মেয়েটি মারা গেল।

'সেই মৃত মেয়েটির মাথার শিয়রে আমি একলা ব'সে। তার মাথাটি বালিশের একপাশে হেলে পড়েছে। এই তরুণ বয়সে জীবনের যত অত্যাচার সে ভোগ করল, যত দুঃখ তার শরীর-মনকে আক্রান্ত করেছিল—এবার সব শেষ হল।

'নিচু তলায় দুভাই অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্যে তারা উদ্গ্রীব হয়ে বারান্দায় পায়চারি করছিল আর বুট ঠুকছিল মাটিতে।

'এতক্ষণে সে মরেছে?' আমায় দেখে সাগ্রহে বড় ভাই প্রশ্ন করল।

'আর সন্দেহ নেই। মেয়েটা এতক্ষণে মরল।'

'ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বড় ভাই বলল—'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে ভাই এত দিনে?'

'এর আগেই দুজনে আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিল কিন্তু নেব নেব করে আমি ফেলে রেখেছিলাম। এখন আমার হাতে স্বর্ণমুদ্রা এক থলে গুঁজে দিল তারা। এই সবের পর আর অর্থ নেবার ইচ্ছা ছিল না আমার। টেবিলের ওপর থলেটি রেখে দিয়ে দুই ভাইকে অভিবাদন জানিয়ে আমি নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে এলাম সে রাতে।

'ওরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কিন্তু কোন কথা না বলে মাথা নামিয়ে নিল।

'কি যে ক্লান্তি লাগছে লিখতে! বড় কষ্ট হচ্ছে মনের স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে সেই পুরোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু লিখে আমায় রেখে যেতেই হবে। কি যে লিখছি আমি নিজেই ভালো করে পড়তে পারছি না।

'পরের দিন ভোরে আমার দ্বারপ্রান্তে ছোট একটা বাক্সের মধ্যে সেই মুদ্রার থলে আমি পড়ে থাকতে দেখলাম। উপরে আমারই ঠিকানা লেখা। এই শোচনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মুহূর্ত থেকেই আমার মধ্যে একটা তীব্র বাসনা জেগেছিল যে এই কদিনের ঘটনা আমি গোপনে মন্ত্রিদপ্তরে পেশ করব। রাজ-দরবারে অভিজাত জমিদারদের প্রতিপত্তির কথা জানতে আমার বাকি ছিল না—তারা যে কোন শাস্তিই পাবে না তা আমি জানতাম। তবু আমার মনের ভার লাঘব করতে এ সিদ্ধান্ত আমি করলাম। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এই হত্যা ও মৃত্যুর কাহিনী নিবেদন করে আমি দায়মুক্ত হব ভেবে স্ত্রীর কাছে অবধি এ-সব কথা গোপন করেছিলাম। নিজের দিক থেকে কোন বিপদের ভাবনাই আমার ছিল না। কিন্তু অন্য কেউ যদি এ-সব কথা জেনে কোন-কিছু করতে চায় তবে তাদের বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়।

'পরের দিন আমার নানা জরুরী কাজে কাটল। ভোরবেলা উঠে মন্ত্রিদপ্তরের উদ্দেশ্যে চিঠিখানা সবে লিখে শেষ করেছি। সেদিন বছরের শেষ দিন, এমন সময় খবর পেলাম একজন মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

'এখানে এত ঠাণ্ডা আর অন্ধকার—আমার সব চেতনা যেন লোপ পাচ্ছে, আর যেন লিখতে পারছি না। তবু আমাকে শেষ করতেই হবে।

'অত্যন্ত বিচলিত ভাবে এসেছেন দেখে সাগ্রহে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—তিনিই আত্ম-পরিচয় দিলেন। মারকুইস সাঁ এভরে মঁদের স্ত্রী। সর্বাঙ্গের আবরণে আভরণে জমিদার-বধূর সম্ভ্রম জাজ্বল্যমান।

'নামটি শুনেই চিনতে বিলম্ব হল না আমার। বড় ভাই যিনি, মহিলা তাঁরই স্ত্রী। স্কার্ফের ওপরে লেখা 'ই' অক্ষরের কথা মনে পড়ল। নামও শুনেছি ছেলেটির মুখে। তাঁদের পারিবারিক সুনাম ও কল্যাণ বিঘ্নিত ও খণ্ডিত হচ্ছে দেখে এবং আমি ডাক্তার হিসাবে সে-সব কথা জানি বলে নারীজাতির স্বভাবসুলভ মমতায় চাষী-বউয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে ছুটে এসেছেন জমিদার-বধূ। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপের সব খুঁটিনাটি আজ বিস্মরণ হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামী ও দেওরের লুব্ধ দৃষ্টিতে পড়ে একটি নিষ্পাপ দরিদ্র বধূ যে অপরিসীম নির্যাতন ও লজ্জা ভোগ করেছে তার জন্যে তাঁর মনে শান্তি নেই। তিনি জানেন না যাকে তিনি উদ্ধার করতে এসেছেন সে মরে গেছে এদের অত্যাচারে। যে-কোন ভাবে গোপনে এ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চান তিনি—মুক্তি দিতে চান। দেখাতে চান আর-একটি মেয়ের গোপন মমতা। তা না হলে একটি হতভাগিনীর নিরুপায় অভিশাপে তাঁর সুখের সংসারে আগুন লাগবে। একেই তো বহু কাল ধরে এই পরিবারের পাপের বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে, তার উপর বিধাতার অভিশাপ লাগলে আর কি নিস্তার থাকবে?

'তাঁর বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে মৃতার একটি ছোট বোন আছে। তাঁর একান্ত ইচ্ছে—মেয়েটিকে সাহায্য করা। ছোট বোন একজন যে আছে এর বেশি কিছু তাঁকে আমি বলতে পারলাম না। তার বেশি জানিও না আমি। তাঁর এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য—আমার ওপর তাঁর গভীর আস্থা আছে—মেয়েটির নাম, কোথায় থাকে আমি যেন জানাই তাঁকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজও আমি এ দুটোর কিছুই জানিনে।

'গতকাল এক টুকরো কাগজ ওরা পেয়ে আমায় সতর্ক করে দিয়েছে। আজ আমায় লেখা শেষ করতেই হবে।

'ভারি স্নেহময়ী মিষ্টি মহিলা। কিন্তু কি বিধাতার লিখন, অমন মেয়েও বিবাহে সুখী হল না। দেবর তাকে অবিশ্বাস করে, অপছন্দ করে। গোটা সংসার তাঁর বিরুদ্ধে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা-স্নেহের লেশমাত্র নেই। আপন সংসারে প্রতিষ্ঠা পায় নি বধূ। সকলকে ভয় করেই চলতে হয় তাঁকে।

'সদর অবধি তাঁকে পেঁছে দিতে এলাম। গাড়িতে বছর দুই-তিনের একটি ছেলে বসেছিল। তাকে দেখিয়ে বললেন তিনি—'এই এর জন্যে আমি সকলের ঋণ পরিশোধ করে দিতে চাই, ডাক্তারবাবু। তা যদি না করি ওর জীবনেও শান্তি-সুখ আসবে না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি আমরা না করে যাই, আমার সর্বদা ভয় হয় যে এক দিন রুদ্র নিয়তি ওর কাছে হয়ত প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে নেবে, ওর জীবনে অভিশাপ লাগবে। আমার তো নিজের বলতে এই কটি রত্ন আছে, এগুলি সেই অত্যাচারিত পরিবারের নামে আমি দেওয়াব। যেমন করে হোক আপনি সেই অভাগিনীর বোনের খবর এনে দিন। তাকে সুখী করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

'ছেলেটিকে আদর করে মা গদগদ কণ্ঠে বললেন—'তোর জন্যে রে, চার্লস! তুই আমার ভালো ছেলে হবি তো, বাবা?'

'হব মা'—সেই আধ-মিষ্টি কথা কি যে মধু বর্ষণ করল আমার কানে! মায়ের মুখও হাসিতে ভরে উঠল। ছেলেকে কোলে করে আদর করতে করতে চলে গেলেন।

'আমি তাঁকে আর কখনও দেখিনি।

'আমি জানি প্রকাশিত হবে না এই বিশ্বাস থেকেই তিনি তাঁর স্বামীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাই সে-কথা আমি চিঠিতে উল্লেখ করলাম না। চিঠিটা শেষ করে খামে পুরে সীলমোহর করে পাছে যথাস্থানে না পেঁছয় এই ভয়ে আমি স্বহস্তে চিঠিখানা দিয়ে এলাম। দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

'সেই রাতে উপরের ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছি, আমার প্রাণের প্রিয়তমা, আমার সুন্দরী ইংরেজ স্ত্রী—তার কথা আজ কতবার মনে পড়ছে—দেখি আমার ভৃত্য দ্যফর্জের পেছনে একটি লোক দাঁড়িয়ে, তার সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা।

'এই লোকটা, বছরের এই শেষ রাতে আমার দরজার কড়া নেড়ে আমার সঙ্গে দেখা করার দাবি জানিয়ে দ্যফর্জের সঙ্গে সোজা উপরে উঠে এসেছে। তখন রাত নটা।

'আমি অবাক হলাম যে, যার নিচে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কথা সে আমার শোবার ঘরে এসে উপস্থিত!

'সেই লোকটা বলল—'রু সাঁৎ অনর্-এ বড় জরুরী কেস্, ডাক্তারবাবু। আপনার দেরি হবে না, সদরে গাড়ি এনেছি।'

'নিয়ে এল এখানে—নিয়ে এল কবরের স্থানে। বাড়ি থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই পেছন থেকে কে যেন কালো মাফলার দিয়ে অতর্কিতে আমার মুখ বন্ধ করে দিল। হাত বেঁধে ফেলল পেছনে। পথের অন্ধকার কোণে এতক্ষণ সেই দুই ভাই দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে হাতের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল আমায়। তার পর আমার সেই চিঠিখানি

বের করে আমায় দেখাল মারকুইস। লণ্ঠনের আলোয় সেই চিঠি পুড়িয়ে ফেলে ঘৃণাভরে পা দিয়ে তার ছাই মাড়িয়ে দিল।

'কোন কথা নয়—সাড়া নয়। নিঃশব্দে ওরা আমায় এইখানে এনে বন্দী করে রেখে দিল—এ যেন আমায় জীবন্ত সমাধি দিয়ে গেল।

'শুধু একবার, শুধু একটি বারের জন্যে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর সংবাদের জন্যে আকুলি-বিকুলি করে মরেছি। মাথা কুটেছি কারাগারের নির্জন পাথরের দেওয়ালে। ভগবান আমায় নয় শাস্তি দিলেন, তার জন্যে তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করব না। কিন্তু অত্যাচারী দুই ভাইয়ের কথা ভাবি। তাদের ঘরেও তো স্ত্রী-পুত্র আছে। তবে দয়া-মায়া তাদের শরীরে নেই কেন? কেন আমার স্ত্রীর একটি খবর তারা আনতে দেয় নি? তবে কি সে অভাগিনী আর বেঁচে নেই? আজ আমার বিশ্বাস হয়েছে যে তাদের উপর—তাদের বংশধরদের উপর সেই লাল ক্রুশ চিহ্ন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছে। আর নিস্তার নেই। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না ভগবান! তোমার পৃথিবীতে যারা গরিবের ওপর এত অত্যাচার করছে তুমি তাদের অপরাধ ক্ষমা করো না, ভগবান! তোমার রুদ্র অভিশাপে তাদের বংশে আগুন লাগুক। আমি ডাক্তার ম্যানেত—আমার এই দুর্বিষহ বেদনায়—মানুষের কাছে—দেবতার কাছে এই প্রার্থনা রেখে গেলাম—একদিন এই সব অত্যাচারের শেষ বিচার হোক। চরম শাস্তিতে তাদের প্রায়শ্চিত্ত হোক।'

'এ দলিল পাঠে আদালতে যেন অপ্রত্যাশিত বজ্রপাত হল। যে গভীর মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ, তা শুনে সমবেত জনতার কণ্ঠে বাক্‌রোধ হয়ে এল। শুধু প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল প্রাণ থেকে প্রাণে। ডাক্তার ম্যানেত বিভ্রান্তের মতো মুখে মুখে চেয়ে দেখতে লাগলেন। নিষ্ঠুর দাফর্জ এই জন্য বুঝি এতদিন গোপন করে রেখেছিল এই দলিল? তার মৃত্যু-রেজিস্টারে তুলে রেখেছিল এই বংশের নাম —একদিন এমনি করে প্রতিশোধ নেবে বলে।

'এই চরম অধ্যায়ের নিষ্ঠুরতম আঘাত লাগল বন্দীর ভাগ্যে। যিনি এই নাটকে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ নিলেন তিনি একজন গণ্যমান্য নাগরিক—বিপ্লবের বন্ধু—তার স্ত্রীর পিতা। বন্দী বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'অবশেষে ডাক্তারকে সম্বোধন করে প্রেসিডেন্ট বললেন—জাতীয়তার পবিত্র বেদি-মূলে ঐ জমিদার-নন্দনকে বলি দিয়ে মাতৃভূমির চরম সেবা করার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার নিজের জীবন ধন্য করুন। আপন কন্যার বৈধব্যের দুঃখ, একটি পিতৃহীন শিশুর দুঃখ সব দেশপ্রেমের অগ্নিতে সহনীয় হয়ে উঠুক ডাক্তারের মনে। শুনে জনতা সোল্লাসে গর্জন করে উঠল। তার মধ্যে উন্মাদনা ছিল, দেশ-প্রেমের আগুন ছিল। কিন্তু মানবতার কোন চিহ্ন ছিল না।

'এই বার ডাক্তার বাঁচান ঐ নরকের কীটকে। নিজের জামাইকে।' তিক্ত কণ্ঠে বলল মাদাম দাফর্জ তার সঙ্গিনীর কানে—'অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি ডাক্তারের, না?'

এক জন জুরি উঠে মৃত্যুর রায় দিতেই সমগ্র আদালত পৈশাচিক আনন্দে চিৎকার করে উঠতে লাগল। তার পর মুহুর্মুহুঃ সেই কলরোল তরঙ্গে তরঙ্গে বিদীর্ণ হতে লাগল।

সমবেত জুরিগণের সর্ববাদিসম্মত বিচারে রায় হল মৃত্যুদণ্ড। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার্লস ডার্নের শিরশ্ছেদ হবে গিলোটিনের তলায়। অন্তরে অভিজাত—জন্মে অভিজাত —মানুষের রিপাবলিকের শত্রু—অত্যাচারী শয়তান—মৃত্যুই এর একমাত্র শাস্তি।

১১ গোধূলি

রায় দেবার পর বিচারক-মণ্ডলী কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। সেই সঙ্গে জনশূন্য আদালতে একটা ব্যাপ্তিহীন শূন্যতা মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল।

গিলোটিনে স্বামীর মৃত্যুর দণ্ডাদেশ শোনার পরেই লুসির সর্বাঙ্গ বিবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে শুনতে পেল না কেউ। অন্তরের নিভৃত অন্তঃস্থলে একটি পরম বাণী যেন তাকে উদ্বুদ্ধ করে রাখল। এ-বেদনার মধ্যে, সর্বনাশা বিপাকের মধ্যে তাকে মাথা তুলে রাখতেই হবে। অপার ধৈর্য দিয়ে পরাভূত করতেই হবে সকল বিপর্যয়কে। স্বামীকে তুলে ধরতেই হবে তাকে।

তবু ঘর একটু নিরিবিলি হতেই বেদনাবিদ্ধ বিহঙ্গিনীর মতো স্বামীর প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠল লুসি। দুটি হাত বাড়িয়ে অগাধ স্নেহ আর সান্ত্বনা নিয়ে সে দাঁড়াল স্বামীর দিকে মুখ ক'রে।

'একটি বার যদি ছুঁতে পারি ওঁকে। একটি বার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি! ওগো! তোমরা একটিবার দয়া কর আমায়।'

একজন জেলার ছাড়া গতরাতের দুজন বিপ্লবী উপস্থিত ছিল। আর ছিল বারসাদ।

লুসির কণ্ঠের মিনতিতে পাষাণ গলে গেল। বারসাদ বাকি কজনকে বল্‌ল—'দাও না অভাগিনীর সাধ মিটিয়ে। শেষবার তো!'

বন্দীর ডেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল লুসি। দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে ডার্নে তাকে স্পর্শ করল। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল—'দুঃখ করো না, লুসি। আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও। শান্তিময়ের রাজত্বে আবার আমাদের চিরমিলন হবে।'

কান্নায় ভিজে এসেছিল গলা, তবু স্বামীর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লুসি। বলল—'এ আমি সহ্য করতে পারব, চার্লস। ভগবান ওপরে আছেন—আমার জন্য দুঃখ করো না। শুধু তোমার মেয়ের জন্যে—'

'তাকে আমার চুমু দিও—আর জানিও তার বাপের শেষ বিদায়।'

'বেশি দিন আমাদের আলাদা হয়ে থাকতে হবে না—এই বিচ্ছেদ একটু একটু করে আমার বুক ভেঙে ফেলবে। আমার কর্তব্য আমি করব, প্রিয়তম'—বলল লুসি—'তারপর আমি তোমার কাছে যাব। তোমার মেয়েকে ভগবান দেখবেন। যেমন আমায় তিনি দেখেছিলেন।'

ডাক্তার ম্যানেত মেয়ের পিছন পিছন আসছিলেন।

এখন এই দুজনের সমক্ষে জানু পেতে বসবার উপক্রম করলেন। তাকে নত হতে দেখে ডার্নে হাত বাড়িয়ে তাঁকে তুলে ধরল।

কাঁদতে কাঁদতে বলল—'না না, আপনি কি করেছেন যে অমন করে হাঁটু গেড়ে বসছেন আমাদের কাছে? আমি তো জানি, কি অপরিসীম সংগ্রাম আপনি করেছিলেন। আমার বংশ মর্যাদার কথা যখন আপনি জানতে পেরেছিলেন তখনও কি দুশ্চিন্তা আপনার ছিল! আমার মতো মানুষদের ওপর কোনদিন আপনার সহানুভূতি ছিল না। শুধু আপনার প্রিয় কন্যার জন্য আপনি এই বিবাহে মত দিয়েছিলেন। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে শক্তি দিন।'

ডার্নের হাতখানি নিজের মাথার উপর রাখলেন বৃদ্ধ। দুই হাতে সেটি আদর করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

ডার্নে আবার বলল—'আজ যে-পরিণতির মুখে আমি এসে দাঁড়ালাম এটাই স্বাভাবিক। একদিন আমার মা তরুণ ডাঃ ম্যানেতের কাছে আমাকে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। তবে একথা সত্য, অন্যায়ে যার শুরু কোন

মঙ্গল তার থেকে আসতে পারে না। আপনি শান্ত হোন। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

এইবার প্রহরীরা ডার্নেকে নিয়ে যাচ্ছে। তার হাত ছেড়ে দিল লুসি।

দুটি হাত জড়ো করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লুসি। তার মুখে একটি পবিত্র আভা। তার ভঙ্গিতে সান্ত্বনার ভাব।

একটু পরে জেলারের পিছু পিছু ডার্নে অদৃশ্য হয়ে যেতেই লুসি তার পিতার বুকে মাথা রাখল। কি যেন বলার চেষ্টা করল। বলতে না পেরে পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

এতক্ষণ ঘরের সেই অন্ধকার কোণে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছিলেন কার্টন। এখন সামনে এগিয়ে এলেন। নিচু হয়ে লুসিকে তুলে নিলেন। তাকে তোলার সময় তাঁর দুই বাহু কি এক আবেগে কাঁপছিল। সে-আবেগের মধ্যে সবটাই করুণা নয়, কিছুটা বোধ করি পরম প্রাপ্তির আনন্দও ছিল।

ডাক্তার ম্যানেত আর মিস্টার লরির দিকে তাকিয়ে কার্টন বললেন—'অনুমতি করেন তো আমি একে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে পারি। এ আনন্দ আর কোনদিন তো আমি পাব না!'

পরম মমতায় লুসিকে হাতের পালঙ্কে তুলে নিলেন কার্টন। যত্নভরে তাকে গাড়ির মধ্যে শুইয়ে দিলেন। ডাক্তার ও লরি ভিতরে বসলেন। কোচোয়ানের পাশে গিয়ে বসলেন কার্টন।

বাড়ির গেটের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। এই তো কিছুক্ষণ আগে এই গেটের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছিলেন, কোন্ কোন্ পাথরের উপর দিয়ে লুসি তার নরম পা ফেলে হেঁটে যায়।

কোচোয়ানের পাশ থেকে নেমে দাঁড়ালেন কার্টন। অতি যত্নে লুসিকে দুই বাহুতে জড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের ঘরে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

তাকে দেখেই মেয়ে আর প্রস দুজনেই কাঁদতে লাগল।

প্রসকে কোমল কণ্ঠে বললেন—'এখন ওকে ডেকে জাগিয়ো না। ও মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। খানিকক্ষণ ওকে বিশ্রাম দাও।'

ছোট লুসি দেখে ছুটে এল। কান্না-ভরা খুশি কণ্ঠে বলল, 'আপনি এসেছেন, মি. কার্টন! বাঁচলাম আমরা। আপনি আমার মাকে কাঁদতে দেবেন না। আপনি আমার মাকে বাঁচান—আমার বাবাকে বাঁচান।'

কার্টন তাকে কোলে তুলে নিলেন। পরম আদরে আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে কানে কানে বললেন—'ভয় কি মা! তুমি যাতে খুশি হও তাই হবে।' তার পর মূর্ছিতা লুসির দিকে তাকিয়ে বললেন—'যাবার আগে—আমি ওকে একবার একটি চুমু খেতে পারি?'

যখন কার্টন লুসির গালে ঠোঁট ঠেকালেন, অস্ফুট স্বরে কি যেন বলেছিলেন তিনি।

সে-কথা শুনেছিল ছোট লুসি। সে-কথা পরে সে তার মাকে নিভৃতে বলেছিল। আর সে যখন নিজে বুড়ী ঠাকুমা হয়েছিল তখন সে তার নিজের নাতি-নাতনীদের কাছে গল্প করার সময় বলত—যে-কথা সেদিন কার্টন উচ্চারণ করেছিলেন তার সংজ্ঞাহীন মায়ের কানে তা হল—'যে-জীবন তুমি ভালোবাস, তুমি তা পাবে, লুসি।'

লরি, সিডনি কার্টন ও ডাক্তার ম্যানেত পাশের ঘরে গেলেন।

ঘরে যাবার পর হঠাৎ সিডনি কার্টন ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললেন—'গতকাল অবধি আপনার তো প্রচণ্ড প্রভাব ছিল ওদের উপর। বিচারক—যাদের হাতে আজকের ক্ষমতা তারা সবাই আপনার সুহৃদ—আপনার সেবায় কে না উপকৃত! আপনি একটা শেষ চেষ্টা করে দেখুন।'

ডাক্তার ধীর কণ্ঠে কিন্তু অতি কষ্টে জবাব দিলেন—'ডার্নের ব্যাপারে কোন-কিছুই তো আমার কাছে গোপন ছিল না। ওরা আমায় সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিল যে আমি ওকে রক্ষা করতে পারব। রক্ষা তো আমি করেছিলাম।'

'আপনি আবার চেষ্টা করুন। কাল বিকেল অবধি কঘণ্টাই বা সময়, তবু চেষ্টা করতেই হবে।'

'করব, একটি মুহূর্ত আমি বিশ্রাম নেব না। আমি নিজে সরকারি উকিলের কাছে যাব, যাব প্রেসিডেন্টের কাছে—আর আরও দু-এক জনের কাছে যাব যাদের নাম আমি বলব না। কিন্তু—পথে কিসের বিজয়-উৎসব চলছে সন্ধ্যার আগে কাউকেই পাওয়া যাবে না।'

'সে কথা সত্যি, তবু ডাক্তার ম্যানেত, আশা আমাদের করতেই হবে। কখন আপনার দেখা হবে মনে হয়—আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই?'

'সন্ধ্যার পরেই দেখা করব।'

কার্টন উতলা কণ্ঠে বললেন, 'চারটের পরই তো সন্ধ্যে হবে—আমি নটা নাগাদ মি. লরির ওখানে থাকব। তাঁর কাছ থেকে বা আপনার মুখ থেকে শেষ সংবাদ আমি নিশ্চয়ই পাব।'

'পাবে।'

'ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন।'

সদর দরজা অবধি সিডনিকে এগিয়ে দিলেন লরি। তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—'আশা কিছু দেখছি না। সারা কোর্টে যেভাবে লোক খেপে উঠেছিল, তাতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ সাহস করে তার মুক্তির চেষ্টা করবে না।'

কার্টন বললেন—'আমিও না। তবু ডাক্তারকে আমি অতখানি আবেদন করলাম যাতে লুসি জানুক যে আমরা ডার্নের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলিনি।'

চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল লরির। বললেন—'ঠিকই বলেছ তুমি! আর আশা নেই—মৃত্যু ওর শিয়রে। ওর বিনাশ অনিবার্য।'

কার্টন যেন সে-কথার প্রতিধ্বনি করলেন। বললেন—'না, আর-কোন আশা নেই। তাঁর মৃত্যু অনিবার্য।'

দৃঢ় নিশ্চিন্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন কার্টন।

১২ তিমিরাভিসার

পথের অন্ধকার কোণে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কার্টন। কোথায় যাবেন স্থির করতে পারলেন না। নটায় টেলসন ব্যাঙ্কে লরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তার আগে বোধ করি নিজেকে একবার লোকচক্ষে প্রকাশ করা ভালো। লোকগুলো দেখুক যে এই শহরে আমার মতো একজন লোক বাস করছে। ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর পক্ষে এটা প্রয়োজন, কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে।

অন্ধকার পথের বাঁকে বাঁকে তাঁর এই উদ্দেশ্যের ভালো-মন্দ নিয়ে নাড়া-চাড়া করলেন মনে মনে। তার পর কৃতসঙ্কল্প হয়ে কার্টন সেণ্ট আঁতোয়ানের দিকে পা বাড়ালেন।

দ্যাফর্জের মদের দোকান এই অঞ্চলেই, সে-রকমই সেদিন বিচারসভায় বলেছিল সে। সুতরাং তা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হবে না। শহরের এই দিকটা যারা জানে তাদের পক্ষে না জিজ্ঞেস করেই সে-দোকান পাওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

একটা খাওয়ার জায়গায় কিছু খেয়ে নিয়ে কার্টন বিশ্রাম নিলেন। জীবনে এই প্রথম কোন কড়া মদ তাঁর পেটে পড়ল না। গতরাত্রি থেকে একপ্রকার নিরাহারেই আছেন তিনি। কেবল একটু হালকা মদ খেয়েছেন। কড়া ব্র্যান্ডি তিনি সঁপেছেন আগুনে। তাঁর জীবনে ঐ রকম মদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন।

ঘুম ভেঙে উঠে যখন পথে নামলেন কার্টন তখন সন্ধ্যে সাতটা। দ্যফর্জের দোকানে যাবার পথে একটা দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বেশবাস ও অবিন্যস্ত চুল ঠিক করে নিলেন, তার পর পরিপূর্ণ আস্থায় গিয়ে প্রবেশ করলেন দ্যফর্জের মদের দোকানে।

ঠিক সেই সময়টিতে দোকানে খদ্দেরের ভিড় ছিল না। মাদাম ও দ্যফর্জ আর জ্যাকুজ এই তিনজন ভিন্ন আর যে একজন স্ত্রীলোক কাউন্টারের পাশে গল্প করছিল সে মেয়েটি প্রতিশোধ—তাদের বিপ্লব-সংঘেরই। অল্প একটু মদের অর্ডার দিলেন কার্টন অনভ্যস্ত ফরাসীতে, তার পর আরাম করে বসলেন। মাদাম অবহেলা ভরে একবার তাকাল খদ্দেরের দিকে। তৎক্ষণাৎ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতে লাগল তার চোখ।

উঠে এসে জিজ্ঞেস করল 'কিসের অর্ডার দিয়েছেন? আপনি কি ইংরেজ?' তার কালো ভুরু তুলে প্রশ্ন করল মাদাম।

যেন প্রতিটি ফরাসী বাক্য উচ্চারণ করতে তাঁর অনভ্যস্ত জিহ্বা অনেক আয়াস করছে, এমন ভঙ্গিতে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, আমি ইংরেজ।'

মাদাম কাউন্টারের দিকে গেল। এই অবসরে কার্টন যেন গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা পত্রিকা পড়তে লাগলেন। তিনি শুনতে পেলেন মাদাম তার স্বামীকে লক্ষ্য করে বলল—'হুবহু চার্লস এভরে মঁদের মত দেখতে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি।'

দ্যফর্জ মদের পাত্র রাখল কার্টনের সামনে। বলল—'শুভ সন্ধ্যা।'

দ্যফর্জ কাউন্টারে ফিরে গেল। এই অদ্ভুত সাদৃশ্যে তার মনও কম অভিভূত হয়নি। সে বলল—'হাঁ মিল আছে বটে।' ওরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—'তোমার মনে সেই মানুষটার কথা নিশিদিন আসা-যাওয়া করছে তাই এতটা মিল খুঁজে পাচ্ছ সকলেরই মুখে। ভয় কি আছে? সবাই তো তোমরা কাল তাকে শেষবারের মতো দেখে নিতে পারবে।'

কার্টন সেই পত্রিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। কাউন্টারের ওপাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনজনে নিচুগলায় কথা বলছে আর তাকিয়ে দেখছে তাঁর দিকে।

'মাদামের কথাই সত্যি। খুব সত্যি। কিন্তু এখানেই থামা হবে কেন?'

দ্যফর্জ বলল—'কথাটা ঠিক। কিন্তু একটা জায়গায় তো শেষ করতে হবে। কোথায় —সেইটাই তো কথা—'

'মৃত্যু।'

'মৃত্যু—রায় দিতে সহজ—' বলল দ্যফর্জ—'কিন্তু মাদাম—অন্য বিবেচনা কি নেই? ডাক্তারের কথা ভাব একবার। কি অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তিনি! আজ যখন রায় পড়া হল—তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলে তুমি?'

'দেখেছি বইকি'—ঘৃণাভরে বলল মাদাম—'দেখেছি বইকি। সে-মুখে অন্তত বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য ছিল না। ছিল অন্য-কিছু। নিজের বিষয়ে তাঁর সাবধান হবার কারণ ঘটেছে।'

তবু দ্যফর্জ স্ত্রীর কথায় সায় দিল না—'ডাক্তারের মেয়ের কথাটা একবার ভাব। তার বিপদের দিকটা—'

'সে মেয়েটার মুখও আমি দেখেছি। একবার নয়, বার-বার। শুধু আজ কোর্টে

নয়—জেলখানার পাঁচিলের সামনে পথে দাঁড়িয়ে থাকত যখন, তখনও দিনের পর দিন দেখেছি। কিন্তু আমি বলছি এই এমনি ভাবে—আমার এই উদ্যত আঙ্গুলের নিচে—।'

শব্দ করে আঙ্গুলটা ঠুকল মাদাম কাউন্টারের উপর। যেন উদ্যত খড়্গ পড়ল কোন হতভাগার গলায়। মাদাম আবার বলল স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে—'যদি তোমার ওপর চরম রায় নির্ভর করত—তুমি ঠিক লোকটাকে বাঁচিয়ে দিতে।'

'না—না—এমন কথা তুমি কখনই বলতে পার না'—তীব্র প্রতিবাদ করল দ্যফর্জ।

কণ্ঠে যেন আক্রোশ ফেটে পড়ল মাদামের—'ঐ সব অত্যাচারী শয়তানদের নাম আমার মৃত্যু-রেজিস্টারে বহুদিন আগেই আমি লিখে রেখেছি। ওদের বংশ যতদিন না নির্মূল হচ্ছে ততদিন আমার স্বস্তি নেই। যেদিন বাস্তিলের পতন হল, আমার স্বামী বাস্তিলের একটা অন্ধকার সেল থেকে এই কাগজগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন। মাঝ-রাত্তিরে নিরিবিলি ঘরে এইখানে বসে আমরা দুজনে সেই দলিল পড়েছি। ভোরবেলা অবধি সেই দলিল পড়ে যা জেনেছি সেই গোপন কথা তোমাদের জানাব।'

'এ কথা সত্যি।'—বলল দ্যফর্জ।

'সেদিনও আমি এমনি করে বুক চাপড়ে মরেছিলাম। আমার স্বামীকে বলেছিলাম চাষা-পরিবারের যে ছোট বোনের কথা তাতে লেখা আছে, সমুদ্র তীরে সেই জেলে-পরিবারে যে-মেয়েটি মানুষ হয়েছিল সে আর কেউ নয়—আমি। ঐ ডার্নে-পরিবারের দুই ভাই কি অপরিসীম অত্যাচার করেছে আমাদের পরিবারের ওপর। নিষ্ঠুর ওরা—আমার ভাইকে খুন করেছে, ওদের লাম্পট্যের আগুনে তিলে তিলে পুড়ে মরেছে আমার সতীসাধ্বী দিদি। আমার বোনের স্বামী মরেছে, তাদের অজাত সন্তান মরেছে, আমার ভাই, আমার বাবা—আমাদের পরিবারের সব মরেছে। সেই সব মৃত মানুষ—সবাই এখন সেইসব মৃত্যুর জবাব চাইছে। সে-জবাব নিতে হবে আমাকে। সে পবিত্র দায়িত্ব আমার—তবে আর থামবার প্রশ্ন কোথায় আছে? এর শেষ দেখব। তবে আমার বুকের আগুন নিভবে।'

দোকানে খদ্দেরের আনাগোনা শুরু হল। কার্টন টাকা-পয়সা মিটিয়ে নিঃশব্দে দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দুটি উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হয়েছে। পথে নেমে জেলখানার অন্ধকার দেয়ালের পাশ দিয়ে তিনি লরির ঘরে এলেন। দেখলেন উৎকণ্ঠিত বৃদ্ধ সারা ঘরে পায়চারি করছেন। ডাক্তার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। পাঁচ ঘণ্টা হয়ে গেল এখনও তিনি ফিরলেন না। রাত দশটা অবধি অপেক্ষা করে লরি ফিরে গেলেন লুসির কাছে। সে মেয়েটিকে এই দুঃখের মুহূর্তে একলা রাখতে মন চাইল না। তিনি রাত বারটায় ফিরে আসবেন বলে গেলেন।

রাত বারটা বাজল। সিডনি কার্টন একা অপেক্ষা করছিলেন আগুনের ধারে।

লরি যখন ফিরলেন তার কিছু পরে ডাক্তারের পায়ের শব্দ শুনল ওরা দুজনে। তিনি যখন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে সর্বনাশের কোন প্রতিকারই হয়নি। তিনি কোথায় গিয়েছিলেন তদবির করতে, না এই দীর্ঘ সময় পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরেছেন সে-কথা জানা হল না—তার মুখেই সব-কিছু লেখা।

এই দুটি মানুষের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বললেন—'কোথায় গেল আমার জুতো তৈরির বেঞ্চ। আর তো আমার সময় নেই। আমাকে তো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।' কোন উত্তর না পেয়ে নিজের চুল ছিঁড়ছেন। অস্থির বালকের মতো মাটিতে পা ঠুকছেন। 'আমার কাজ যে আজই আমায় শেষ করতে হবে। আর তো সময় নেই।'

তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, বিপর্যস্ত বেশ একটি কথাই পরিষ্কার করে দিল—ডাক্তারের

আবার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। তাঁর মাথায় গলায় কোন ঢাকা নেই। গা থেকে কোট খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। তার পর অসহায় চোখে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

দুজনে মিলে ডাক্তারকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। অসহায় বালকের মতো কাঁদছেন বৃদ্ধ। একদিন দ্যফর্জের মদের দোকানের উপর যে ভগ্ন বিপর্যস্ত মানুষটিকে এঁরা দেখেছিলেন তাঁকে আবার সেই অবস্থায়ই এঁরা পেলেন।

এই ধ্বংস-স্তূপের দিকে তাকিয়ে দুজনেরই হৃদয় আতঙ্কে ভরে গেল। এখন যে ভাবে হোক সেই দুঃখী মেয়েটিকে রক্ষা করতে হবে।

এখন ভাবাবেগে ভেঙ্গে পড়বার সময় নয়। কার্টন লরির দিকে তাকালেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন—'শেষ সুযোগ আমাদের হাত থেকে চলে গেল। এখন চলুন, ডাক্তারকে ওঁর মেয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক। কিন্তু যাবার আগে আপনি আমার দুটো কথা শুনুন। আমায় প্রশ্ন করবেন না, কেন আমি এসব বলছি। শুধু আপনি আমার শর্তগুলি স্বীকার করুন। প্রতিজ্ঞা করুন—আমি যা বলব সেই মতো কাজ হবে। আমার কথার গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে বলেই আপনার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আমি দাবি করছি।'

লরি বললেন—'তোমার কথা তুমি বল, কার্টন। সেইমতো কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি।'

কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কার্টন বললেন—'এইটে ধরুন মি. লরি। এই শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সার্টিফিকেট। একজন ইংরেজ—তার নাম সিডনি কার্টন, তার নামেই এই সার্টিফিকেট।'

লরি সেই কাগজখানি হাতে নিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কার্টনের দিকে। 'এটা কাল অবধি আপনার কাছে রেখে দিন। আগামী কাল আমি জেলে ডার্নের সঙ্গে দেখা করব। সেখানে এটা আমি নিয়ে যেতে চাই না। আর ওই ধরুন ডাক্তার ম্যানেতের পকেট থেকে পড়ে-যাওয়া সার্টিফিকেট। তিনি, তাঁর মেয়ে আর ছোট লুসি এই সার্টিফিকেটের জোরে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবে।'

'দাও আমায়।'

'হয়ত গত কাল ডাক্তার এই সার্টিফিকেট বের করে নিয়েছিলেন, শেষ মুহূর্তে নিতান্ত বিপদে পড়ার আশঙ্কায়। দেখুন তো তারিখ কবেকার? কিন্তু তারই বা দরকার কি। আপনার দরকারী কাগজপত্রের মধ্যে এটাকে সাবধানে রাখবেন। যতক্ষণ না এই সার্টিফিকেট বাতিল হচ্ছে ততক্ষণ এটা কাছে রাখুন। কি জানি, আমার আশঙ্কা হচ্ছে এটা বাতিল করার চেষ্টা হবে।'

'ওরা তো আর সত্যিকার কোন বিপদে পড়েনি।'

'খুবই বিপদে পড়েছে ওরা। মাদাম দ্যফর্জ ওদের গুরুতর বিপদের কারণ হবে। আজ সন্ধ্যায় তার নিজের মুখ থেকে আমি এ-কথা জেনেছি। একজনের সঙ্গে যখন কথা বলছিল মেয়েটা আমি গোপনে সব শুনেছি। তাইতেই অশুভ চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। তার পরেই ঐ গুপ্তচরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আর অন্য সব ব্যবস্থা আমি করেছি। ঐ জেল-প্রাচীরের ধারে থাকে একজন করাতী; সে লুসিকে বহুদিন ধরে দেখে আসছে। ঐ করাতী লোকটা দ্যফর্জের লোক। তাকে ওরা শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছে। সে সাক্ষী দেবে যে বন্দীর স্ত্রী তাকে নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করে নানা কথা জানিয়েছিল। এটা একটা চক্রান্ত ভিন্ন আর-কিছু নয়। আর আজকালকার দিনে এই রকম চক্রান্তের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। শুধু লুসির একলার নয়—সে তো মরবেই। তার সঙ্গে মরবে তার মেয়ে—হয়ত-বা তার বাবা ডাক্তার ম্যানেতও পরিত্রাণ পাবেন না।

আপনি এত আতঙ্কিত হবেন না মি. লরি। আপনি সবাইকেই রক্ষা করতে পারবেন।'

'তাই যেন হয় কার্টন। কিন্তু সে কি করে সম্ভব হবে?'

'সেই কথাই আমি আপনাকে বলব। সব ব্যাপারটা আপনার ওপর নির্ভর করবে। আগামীকাল অবধি এই অভিযোগ উঠবে বলে মনে হয় না। অন্তত আর দু-দিনের আগে নয়। হয়ত-বা এক সপ্তাহ পরে। আপনি তো জানেন যে-সব বন্দী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে—তাদের জন্যে শোক করা বা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে যারা—তারাও এক রকমের অপরাধী সাব্যস্ত হবে। ডাক্তার আর তাঁর মেয়ে সেই অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হবে। এ স্ত্রীলোকটি সেই রকমই ব্যাপারটা দাঁড় করাতে চেষ্টা করবে। আপনি আমার যুক্তি বুঝছেন, মি. লরি?'

ডাক্তারের চেয়ারের পিছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন লরি। বললেন—'এই দারুণ দুঃসময়ে যখন চিন্তা করে আমি কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না, তখন তোমার কথায় আমি অনেকখানি আশ্বাস পেলাম।'

'আপনার কাছে টাকাকড়ি আছে নিশ্চয়ই। সমুদ্রতীর অবধি যাবার খরচপত্র আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার নিজের তো ইংল্যান্ড অবধি যাবার ব্যবস্থা সব পাকা করা আছে। আপনি শুধু এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন যেন বেলা দুটোয় আপনাদের গাড়ি ছেড়ে যায়। কিছুমাত্র দেরি যেন না হয়।'

'তাই হবে।'

কার্টনের বক্তব্যে এমন একটা তীব্র আবেগ ছিল—যা লরির শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করল।

'এই দুর্দিনে আপনার চেয়ে মহৎপ্রাণ কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ কে পাবে? আজ রাতেই আপনি লুসিকে জানাবেন তার মেয়ের আর তার বাবার আসন্ন বিপদের কথা। তাকে আশ্বাস দিয়ে বলবেন যে স্বামীর কাছে সে চিরকাল থাকতে পারবে—কোন ভয় নেই।'

মুহূর্তের জন্য কার্টনের কণ্ঠ যেন আত্মলীন হল—তারপর সংবিত পেয়ে আবার বললেন—'তাকে বলবেন যে তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই তাদের যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের সকলের নিরাপত্তার জন্যে। বাবাকে নিয়ে সে যেন তৈরি হয়ে থাকে এই যাত্রার জন্যে।'

'সে-ব্যবস্থা হবে, কার্টন।'

'নিঃশব্দে আপনি সব করে রাখবেন। গাড়ি যেন দরজায় প্রস্তুত থাকে। যে মুহূর্তে আমি এসে পড়ব, আমায় গাড়িতে তুলে নিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে দেবেন।'

'তোমার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে থাকব, কার্টন।'

'আমার সার্টিফিকেট আপনার কাছে রইল। আমার আসনের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রাখবেন। কোন-কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করবেন না। শুধু আমার অপেক্ষা—তার পর সোজা ইংল্যান্ড।'

'আমি বুড়ো মানুষ। একজন তরুণ বন্ধুর সাহায্য তো আমি পাব!'

'যে-আয়োজন করা হল, তার কোন ত্রুটি যেন না হয়।'

'কোন ত্রুটি হবে না, কার্টন।'

'শুধু স্মরণে রাখবেন—দেরি করলে বা অন্য কোন কারণে ত্রুটি ঘটলে তার এক মাত্র পরিণতি—সর্বনাশ। অনেকগুলি জীবনের নিশ্চিত বিনাশ।'

'আমার কর্তব্য আমি করব, কার্টন।'

'আমার কর্তব্য আমি করব। মি. লরি, আমায় বিদায় দিন।'

সারা মুখে একটা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ম্লান হাসলেন সিডনি কার্টন। বৃদ্ধের হাত-খানি নিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকালেন। কিন্তু তখনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন না কার্টন। সাবধানে তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলেন। তাঁর গায়ে ক্লোক জড়িয়ে দিয়ে—মাথায় চাপিয়ে দিলেন টুপি।

লুসিদের বাড়ির বাইরে নির্জন প্রাঙ্গণে এসে কিছুক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে রইলেন কার্টন। উপরে তাকিয়ে দেখলেন, লুসির ঘরের বাতায়নে জ্বলছে স্তিমিত আলো।

সেখান থেকে চলে যাবার সময় একটি আশীর্বাণী নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন তিনি। সেই ঘরের দিকে উৎসর্গ করলেন একটি নীরব বিদায়বাণী।

১৩ বাহান্ন

সেই অন্ধ কারাগারে সেদিনের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীরা মৃত্যুর অপেক্ষায়। সেদিন বিকেলে বাহান্নটি প্রাণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এই শহরের জীবন-জোয়ার থেকে তারা গিয়ে পড়বে অন্তহীন সময়-সমুদ্রে। যারা গিলোটিনে প্রাণ দেবে তাদের কক্ষ শূন্য হবার আগেই মৃত্যুদণ্ড-পাওয়া নতুন কয়েদীরা এসে হাজির হবে। গতকালের রক্তের দাগ শুকোবার আগেই আগামী কালের মৃত্যুপথযাত্রীদের—যাদের রক্ত সেই ধারায় এসে মিশে একাকার হয়ে যাবে তাদের জিইয়ে রাখছে বিপ্লবীরা।

এই দলে আছে সত্তর বছরের বৃদ্ধ বিরাট ভূস্বামী—যার সম্পদ তার জীবনকে রক্ষা করতে পারল না। আছে কুড়ি বছরের গরিব মেয়ে-দর্জি যার দারিদ্র্য তাকে বাঁচাতে পারল না জনতার রোষ থেকে। বহুকালের নির্যাতন, যন্ত্রণা আর ক্ষুধা মানুষের মনে যে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার সামনে কোন-কিছুরই আর বাছবিচার নেই। প্রমাণে-সন্দেহে জনতার রোষবহ্নিতে পুড়ে মরল সবাই।

নির্জন কারাকক্ষে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত চার্লস ডার্নে একথা ভালোই উপলব্ধি করল যে লক্ষ মানুষের বিচারে তার যে শাস্তি হয়েছে, কোন শক্তিই—কোন ব্যক্তিগত প্রভাব, তা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। গতকালের পড়া দলিলের প্রত্যেকটি লাইনে যা লেখা আছে তার মধ্যে কেবল দোষারোপ—কেবল শাস্তিযোগ্য অপরাধের খতিয়ান। নিজের মনকে শান্ত করে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করতে চেষ্টা করছিল ডার্নে—তার প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখখানি তার চোখের উপর ভেসে উঠছিল—অস্থির চঞ্চল করে তুলছিল তার মন। কিন্তু অচিরেই তার মন শান্ত হয়ে এল। সে জানল যে অন্যায়ভাবে তার উপর এই দুর্ভাগ্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ মৃত্যুর মধ্যে অমর্যাদা কিছু নেই। এই পথে প্রতিদিন তার মতো আরও অনেকেই দৃঢ় চিত্তে বীরের মৃত্যু বরণ করছে। এই চিন্তা তার মনকে উদ্দীপিত করল। মনে মনে ভাবল ডার্নে, সে যদি শান্তভাবে এগিয়ে যেতে পারে তার প্রিয়তম মানুষগুলিও শান্তি পাবে।

মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে তার মন জীবনের ফেলে-আসা অনেক পথ পরিক্রমা করল,—কাগজ কলম নিয়ে বাতির সামনে বসল ডার্নে। প্রিয়তমা লুসিকে এক দীর্ঘ পত্র লিখল। তার পিতার কয়েদী জীবনের কথা সে কিছুই জানত না। স্ত্রীর মুখেই প্রথম সে-কথা সে শুনেছে। তার নিজের বাবা-কাকা যে-অত্যাচার করেছিলেন তা-ও সে জানত না। সে যে নিজের নাম গোপন করে ইংলণ্ডে বাস করছিল সে-কথা ডাক্তার জানতেন। তাঁর শর্ত অনুযায়ী এই গোপনীয়তা রক্ষা করেছে ডার্নে। অনেক মিনতি করে লুসিকে লিখল ডার্নে, সে যেন কোনদিন কোনভাবেই তার পিতাকে তাঁর সেই স্মৃতিকথা স্মরণ করিয়ে না দেয়—যা বাস্তিল দুর্গ থেকে খুঁজে এনেছিল দ্যফর্জ। সে

তো জানে লুপ্তস্মৃতি বৃদ্ধের পক্ষে সে-কথা মনে রাখা সম্ভবপর ছিল না। তিনি যেন এই দুঃখ না পান যে তাঁরই জন্যে তাঁর মেয়ের জীবনে এই বিপর্যয় ঘটল। ডার্নে লিখল, এ-জীবনে বিচ্ছিন্ন হলেও একদিন তারা আবার মিলিত হবে।

লুসির বাবাকে সে একই ভঙ্গিতে লিখল। শুধু এইটুকু লিখল যে তাঁরই তত্ত্বাবধানে তার প্রিয়তমা লুসি আর তার মেয়েকে সে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছে। এই দায়িত্ব খুব জোরের সঙ্গেই সে বৃদ্ধের উপর ন্যস্ত করল। হয়ত এই কর্তব্যবোধ মানুষটিকে তাঁর হতাশা থেকে, বিপর্যয় থেকে, স্মৃতিভ্রংশ থেকে রক্ষা করতে পারবে। ডার্নে ভাবল, এই দুর্বিপাকে হয়ত মানুষটির একটা অবলম্বন প্রয়োজন হবে।

মি. লরির কাছে সে তার তিনটি প্রিয়জনেরই দায়িত্ব দিল; তার নিজের বৈষয়িক ব্যাপার তাঁকে সব জানাল। বহুভাবে বিনয় ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সে চিঠি শেষ করল।

সিডনি কার্টনের কথা একবারও তার চিন্তায় এল না। অন্য মানুষগুলিকে নিয়ে তার চিন্তা এমন আচ্ছন্ন হয়েছিল যে একবারও কার্টনের কথা মনে পড়ল না তার।

আলো নেভার আগে চিঠিগুলি তার শেষ হয়ে গেল। সেদিনের মতো খড়ের বিছানায় যখন সে শুয়ে পড়ল, তার মনে হল, এ সংসারের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু ঘুমের মধ্যে সংসার আবার তাকে হাতছানি দিল—উজ্জ্বল আলোয় এসে দাঁড়াল তার সুপ্ত মনের পটে।

মুক্ত সুখী সে আবার ফিরে গেছে তাদের সোহোর বাড়িতে। কত হাল্‌কা মনে হচ্ছে দেহ-মন। লুসির সঙ্গে সে আবার মিলিত হয়েছে। লুসি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছে, এ সব স্বপ্ন মাত্র। কোনদিন সে তাকে ছেড়ে যায়নি।

আবার সুষুপ্তির বিস্মৃতি। মৃত্যুর পরপারে পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে সে মিলিত হয়েছে লুসির সঙ্গে—সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু তার তো কোন পরিবর্তন হয়নি মনে হল। আবার সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়ল সে।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল—চোখ চেয়ে দেখল সকাল হয়েছে। বিষণ্ণ সকাল। কেমন একটা অচেতনতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে সে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। সহসা সে যেন চকিত হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল—'আজই তো আমার প্রাণদণ্ড।'

ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রহরে প্রহরে পা ফেলে অবশেষে সে এসে দাঁড়াল মৃত্যুর দিনে। নিজের মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি সে গড়ে তুলেছিল। আশা করেছিল যে শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে সে মৃত্যুকে বরণ করবে। কিন্তু তার জাগ্রত চিন্তায় একটা নূতন দোলা লাগল—তাকে বশ করা তার সাধ্যায়ত্ত নয় বোধ হল।

যে-অস্ত্রে তার জীবন বিনষ্ট হবে সেটি কেমন তা কখনও দেখেনি ডার্নে। সেটি কত উঁচু—ক-টি সিঁড়ি পার হয়ে তার উপর উঠতে হবে তাকে! কোন্‌দিকে কেমন ভাবে দাঁড়াবে সে। সে কি প্রথম বলি হবে—না সর্বশেষ। এমনি ধারা নানা টুকরো টুকরো চিন্তা তার মনকে বিচলিত করতে লাগল। সে যে খুব আতঙ্কিত হয়েছে তা নয়। কোন আতঙ্কের চেতনা তার মনে নেই। কি একটা অদ্ভুত অবোধ্য বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়ে এই চিন্তা তার মনকে শত ভাবে খণ্ডিত করতে লাগল। যেন একটা অজানিত আত্মা তার ভিতরে জেগে উঠেছে।

সারা ঘরে সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। সময় এগিয়ে আসছে। ন-টা বেজে গেল। তার জীবনের শেষ ন-টা বাজল। বাজল শেষ দশটা। এগারটা। বারটা বাজার সময় এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে মনের সেই অস্বস্তিকর চিন্তাগুলি সরে গেছে।

কত হাল্‌কা লাগছে নিজেকে। ঝড় কেটে গেছে। প্রার্থনা। প্রার্থনায় চিত্ত নিবেদন করল ডার্নে। নিজের জন্যে, তার প্রিয়জনদের জন্যে।

তার জীবনে বারটার ঘণ্টা শেষ বারের মতো বেজে গেল।

বেলা তিনটেয় তারা সেখানে পৌঁছবে। তার কিছু আগে নিশ্চয়ই তার ডাক পড়বে। তাদের নিয়ে যে-সব গাড়ি গিলোটিনের কাছে পৌঁছে দেবে সেগুলি চলে ধীরে ধীরে। সুতরাং দুটোর সময় তার ডাক আসবে—এ-বিষয়ে তার আর সন্দেহ রইল না।

লা ফোর্সের জেলখানার বন্দী ছিল যে-ডার্নে, সে আর এ-মানুষটির মধ্যে রইল না। এখানে বুকে হাত জড়ো করে যে নিয়ন্ত্রিত শান্ত পদচারণায় ঘরময় পায়চারি করছে সে এক ভিন্ন সত্তা।

যখন একটার ঘড়ি বাজল, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী ডার্নে বিচলিত হল না। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদিত ডার্নের নিরাসক্ত আত্মমগ্ন মন ভাবল—'আর একটি ঘণ্টা অবশিষ্ট রইল।'

তার পর আবার শান্ত পায়ে পায়চারি করতে লাগল।

এমন সময় দরজার বাইরে পাথরের উপর পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দে চকিত হয়ে উঠল ডার্নে। শুনল স্পষ্ট ইংরেজি উচ্চারণে কে বলল—'উনি আগে কখনও বাইরের কাউকে দেখেননি এখানে। আপনি একা ভিতরে যান। আমি কাছেই আছি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।'

পিছনে দরজা বন্ধ হল। আর সেই স্তিমিত আলোয় মুখে এক অপার্থিব হাসি নিয়ে ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে যে-মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে মুহূর্তে চিনতে পারল ডার্নে।

সে সিডনি কার্টন।

কার্টনের চোখে একটা কি আভা ছিল, একটা কি অমিত জ্যোতি—যা দেখে ডার্নের মুহূর্তে মনে হল এ বুঝি তার চিত্তবিভ্রম।

কিন্তু যখন সে কথা বলল তার বিভ্রম দূর হল। যখন সে তার হাত ধরল, ডার্নে জানল এ বিভ্রম নয়।

কার্টন বললেন—'এই মুহূর্তে এখানে আমাকেই বুঝি সবচেয়ে কম আশা করছিলেন!'

'আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না যে আপনি এখানে। আপনিও তবে কি বন্দী?' একটা অদ্ভুত আতঙ্কে কেঁপে উঠল যেন ডার্নে।

'না। বন্দী নই। এখানকার এক প্রহরীর সাহায্যে আমি আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। মি. ডার্নে, আমি এসেছি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে। আমি তার এক মিনতি আপনার কাছে এনেছি।'

ডার্নে নিদারুণ বেদনায় বলল—'কি সে মিনতি?'

'কেন, কি, এসব প্রশ্নের জবাব দেবার মতো সময় আমার হাতে নেই। আমি যা বলছি তাই করুন। আপনার পায়ের বুট খুলে ফেলে আমার এই জুতোটা পরে ফেলুন।'

সেলের দেয়ালের ধারে একটা চেয়ার ছিল। কার্টন চকিতে সবলে তাকে সেই চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন—'যা বলছি করুন।' নিজের পায়ের জুতো সে ততক্ষণে খুলে ফেলেছে।

'কার্টন', বলল ডার্নে, 'এখান থেকে কেউ পালাতে পারে না। এ পাগলামি করবেন না—আপনিও মরবেন।'

'কে আপনাকে পালাতে বলছে? শুধু এই কোটটা বদলে নিন। টাইটা বদল

করে নিন। মাথার রিবনটা খুলে ফেলুন। আপনার চুলটা আমার মতো করে দিই। আপনি বেশ বদল করে ফেলুন।'

ঘটনার অকস্মিকতায় বিভ্রান্ত ডার্নেকে শিশুর মতো আপন হাতে সাজিয়ে দিলেন কার্টন। তার পর বললেন—'এই নিন কাগজ-কলম। যা বলছি লিখে ফেলুন, কাগজে। নিন, দেরি করবেন না। সময় বড় কম আমাদের হাতে। আপনার লিখতে হয়ত কাঁপবে না তো?'

'না—কাঁপবে না।'

'তবে ঠিক করে নিন। যা বলছি লিখুন। তাড়াতাড়ি করুন বন্ধু, দেরি করবেন না।'

'কাকে লিখব? কি তারিখ দেব?'

মাথায় হাত দিয়ে বিভ্রান্ত ডার্নে টেবিলে ভালোভাবে বসল। নিজের বুকে হাত দিয়ে কার্টন তার কাছে দাঁড়িয়ে।

'ঠিক যা বলছি তাই লিখুন।'

'কাকে উদ্দেশ করে লিখব?'

'কাউকে না—'

কার্টন তখনও বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে।

'কি তারিখ দেব?'

'কিছু না।'

ডার্নে বারবার মুখ তুলে তাকাচ্ছে উপরে। কার্টন নিচু হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখছেন।

কার্টন তাকে বললেন—'বহুদিন আগে আমাদের মধ্যে যে-কথা হয়েছিল, তা স্মরণ করলে, ব্যাপারটা আপনার কাছে স্পষ্ট হবে। আপনার সব কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। ভুলে যাওয়া তো আপনার প্রকৃতি নয়।'

বুক থেকে হাত সরিয়ে আনলেন কার্টন।

তাড়াতাড়ি লিখতে লিখতে একবার মুখ তুলে তাকাতেই সে হাত স্থির হয়ে গেল।

'তাদের ভুলে যেও—'

'লিখেছি—কিন্তু আপনার হাতে কোন অস্ত্র আছে নাকি?'

'না—আমি নিরস্ত্র।'

'তবে আপনার হাতে ওটা কি?'

'এখুনি দেখতে পাবেন। আপনি লিখুন, লিখুন। আর মাত্র সামান্য ক-টি কথা লিখতে হবে। লিখুন—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে জীবনে সেই পরম লগ্ন এসেছে—যখন আমি নিজেকে প্রমাণ করতে পারব। এই যা আমি করছি—তার জন্যে কোন দুঃখ কোন অনুশোচনা আমার নেই।'

এই কথা বলবার সময় তাঁর হাতটি ধীরে ধীরে ডার্নের মুখের খুব কাছে নেমে এল।

ডার্নের হাত থেকে কলমটা টেবিলের উপর খসে পড়ল। অসহায় বোবা চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল ডার্নে।

'কিসের গ্যাস?' বলল সে।

'গ্যাস!'

'কি যেন নাকে লাগল আমার।'

'কি জানি আমি তো কিছু জানি না। নিন, কলমটা তুলে নিন। শেষ করে ফেলুন লেখাটা। তাড়াতাড়ি করুন।'

ধীরে ধীরে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছিল। তার মস্তিষ্কে একটা নিস্তেজ ভাব নেমে আসছিল।

তার চোখে কুয়াশা নেমে আসছে। তার নিশ্বাস ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারছে ডার্নে।

'তাড়াতাড়ি করুন—তাড়াতাড়ি করুন।'

ডার্নে আবার কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ল।

'যদি পরিস্থিতি হত অন্য রকম—।' কার্টনের হাত সন্তর্পণে নেমে আসছিল নিচে। 'যদি অন্য পরিস্থিতি হত তবে সে দীর্ঘস্থায়ী সুযোগ আমি কখনও নিতাম না। যদি অন্য রকম হত—যদি অন্যরকম হত—'

কার্টন লক্ষ্য করে দেখল, বন্দীর হাতে কলম এখন শুধু আঁকাবাঁকা দাগ কাটছে। তার সংজ্ঞা লোপ হতে চলেছে।

ডার্নে শেষ মুহূর্তে শক্তি সঞ্চয় করে একবার উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কার্টন তাকে সুযোগ দিলেন না। তার কোমরে এক হাত জড়িয়ে আর-এক হাত নাকের উপর চেপে ধরলেন। যে-মানুষটি ডার্নের হয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে এসেছেন তিনি তার উপর অল্প একটু শক্তি প্রয়োগ করলেন।

একটু পরেই মেঝের উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে শুয়ে পড়ল ডার্নে।

তাঁর হৃদয় যেভাবে প্রস্তুত হয়েছিল—তেমনি কুশলতার সঙ্গে তাঁর হাতও কাজ করল। তড়িৎগতিতে বন্দীর সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে নিলেন কার্টন। মাথার চুল ঠিক করে নিলেন। গলায় বাঁধলেন বন্দীর টাই। তার পর শান্ত কণ্ঠে ডাকলেন—'ভেতরে এস।'

বারসাদ ভিতরে আসতেই কার্টন বললেন—'একে নিয়ে বাইরে যাবার আর কোন অসুবিধা হবে?' বন্দীর পাশে জানু পেতে বসে সেই কাগজখানা তার পকেটে দিয়ে দিলেন কার্টন।

'যদি আপনি কথা রাখেন—'

'ভয় নেই। গিলোটিন অবধি আমি সত্যনিষ্ঠ থাকব। কিন্তু আর দেরি নয়।'

আবার বললেন—'তোমার পথ থেকে আমি শীগগিরই সরে যাব। কিন্তু আর দেরি করো না—আমাকে মানে সিডনি কার্টনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।'

'কার্টন? কি বলছেন আপনি?'

'ঐ তো কার্টন। ওর সঙ্গে আমি জায়গা বদল করেছি, বারসাদ। যখন নিয়ে এসেছিলে আমায় জেলের ভেতরে, আমি ছিলাম দুর্বল, এখন আমার শরীর আরও ভেঙ্গে পড়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্নায়ু একেবারে তচনচ হয়ে গেছে। এমন তো হামেশাই হচ্ছে তোমাদের জেলে। যাও, সাবধানে ওকে বাইরে নিয়ে যাও। ওর জীবনের সঙ্গে তোমার প্রাণও সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা সে কথা ভুলো না।'

'আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না, আশা করি।' থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল বারসাদ।

দৃঢ় কণ্ঠে কার্টন বললেন—'আমি কি তোমার কাছে শপথ নিইনি? বলিনি কি তোমাকে যে এই আগুনের ভেতর দিয়ে আমি এগিয়ে যাব। তবে কেন ভয় পাচ্ছ ভাই—কেন অমূল্য সময় নষ্ট করছ? নিজের হাতে ওকে বাইরে নিয়ে যাবে তুমি, নিজের হাতে গাড়ির ভেতর শুইয়ে দেবে, মি. লরিকে বলবে যে কোনরকম ওষুধের ব্যবস্থা যেন তিনি না করেন। কেবল বাতাস লেগেই ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। মনে করিয়ে দেবে তাঁকে আমার গতরাতের কথা আর তাঁর প্রতিশ্রুতি। আর দেরি করো না—চলে যাও।'

বারসাদ বেরিয়ে যাবার পর—সেই টেবিলের উপর বসলেন কার্টন। তাঁর হাতে আলতো ভাবে কপাল ঠেকিয়ে বসে রইলেন।

তখুনি দুজন ভৃত্যকে নিয়ে বারসাদ ফিরে এল।

সেই সংজ্ঞাহীন দেহটিকে একটা ঠেলা গাড়ির উপর রাখার জন্যে তারা নিচু হয়ে বেরিয়ে গেল।

'আর বেশি সময় নেই—' বলল বারসাদ নিম্নকণ্ঠে।

'তা জানি। তুমি শুধু একটু সতর্ক হয়ে কাজ করো। আমি ঠিক আছি। তুমি ওকে যত্ন করে নিয়ে যেও।'

'তবে চলে এস তোমরা।'

সেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সেই ঘরে কার্টন তখন একলা। সতর্ক হয়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন তিনি—বাইরে কোথাও কোন সন্দেহজনক আওয়াজ উঠছে কিনা।

কিন্তু তেমন কোন শব্দ তাঁর কানে এল না।

সেইখানে বসে ধীরে ধীরে তাঁর নিশ্বাস আবার সহজ হয়ে এল।

তার পর দুটো বাজার আওয়াজ পেলেন তিনি।

তখন সেই সব শব্দের প্রতিধ্বনি তাঁর কানে আসতে লাগল। যে-সব শব্দের অর্থ তাঁর অজ্ঞাত নয়—কিন্তু তাতে কোন ত্রাসের সঞ্চার হল না তাঁর মনে।

পর পর কয়েকটি দরজা খোলার শব্দ পেলেন তিনি। অবশেষে তাঁর ঘরের দরজা খুলে গেল।

একজন জেলার হাতে একটি কাগজ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল—

'আমার পেছন পেছন আসুন, মারকুইস।'

তাকে অনুসরণ করে একটা বড় অন্ধকার হলঘরে এসে দাঁড়ালেন কার্টন।

অন্ধকার শীতের দিন। ভিতরে ছায়া। বাইরে ছায়া। সেই ঘরে একত্রিত অনেকগুলি নারীপুরুষ, যাদের হাত বাঁধার জন্যে এখানে আনা হয়েছে—তাদের কাউকেই চিনতে পারলেন না কার্টন।

কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বসে। অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প। অধিকাংশই নিঃশব্দে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

অন্ধকার কোণে নীরবে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলেন তিনি। একটি তরুণী মেয়ে দূরে বসেছিল। মেয়েটির তন্বী দেহ—সারা মুখে একটি বালিকা-ভাব। ভারি মিষ্টি মুখ।

মেয়েটি উঠে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

বলল, 'আমায় আপনি চিনতে পারছেন? আপনার সঙ্গে আমি লা ফোর্স জেলে ছিলাম। আমি দর্জির কাজ করি।'

'আমি ভুলে গেছি বলে দুঃখিত'—বললেন বন্দী—'কি যেন তোমার অপরাধ ছিল?'

'চক্রান্ত, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমি নির্দোষ।'

তার সরল মুখে এমন একটা হাসি, যা কান্নার চেয়েও করুণ। সেদিকে তাকিয়ে কার্টনের চোখে জল এল।

'আমি মরতে ভয় পাই না, মারকুইস। কিন্তু আমি তো কোন অপরাধ করিনি। আমার মৃত্যুতে যদি গরিবের মঙ্গল হয় তবে শতবার আমি মরতে পারি। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আমার মত দুর্ভাগিনী একটা মেয়েকে মেরে রিপাবলিক কি করে দুঃখীদের দুঃখ ঘোচাবে?'

সংসার থেকে বিদায়ের প্রাক্‌কালে এই বুঝি শেষবার তাঁর হৃদয় মানুষের দুঃখে বিগলিত হল।

'আপনি তো মুক্তি পেয়েছিলেন।'

'তা ঠিক, তবে আবার আমি গ্রেপ্তার হয়েছি।'

সেই কোমল শান্ত চোখ দুটি—এতক্ষণে পরিপূর্ণ ভাবে এই বন্দীর উপর ন্যস্ত করল মেয়েটি। হঠাৎ একটা সন্দেহ জেগে উঠল তার মনে। একটা আশ্চর্য বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে। তার ক্ষুধা-শীর্ণ আঙ্গুলগুলি নিয়ে সিডনি কার্টন তার ঠোঁটে স্পর্শ করলেন।

'আপনি কি তার জন্যে প্রাণ দিচ্ছেন?' সে ফিসফিস করে বলল।

'তার স্ত্রী আর মেয়ের জন্যেও। চুপ!'

'ওগো বিদেশী, তোমার ঐ সাহসী প্রাণের স্পর্শ দাও আমায়। আমার হাত দুটি একবার ধর।'

'হ্যাঁ বোন, এই আমি তোমার হাত ধরলাম। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আর তা ছাড়ব না।'

সেদিন অপরাহ্নে জেলখানার উপর যে-ছায়া নেমে আসছিল, সেই ছায়ার পটভূমিকায় প্যারিসের সীমান্তে একখানি গাড়ি সীমান্ত-রক্ষীদের সামনে দাঁড়িয়ে অনুমতির অপেক্ষা করছিল।

'কে যায় ঐ গাড়িতে, কয়জন? কাগজপত্র কই?'

লরি সব কাগজপত্র দিলেন।

'ডাক্তার আলেকজান্দার ম্যানেত কে?'

'ঐ যে বিড়বিড় করছেন আপনমনে। অসহায় চোখে তাকিয়ে আছেন শুধু। এই বিপ্লবের ঝড়-ঝাপটায় ওঁর শরীর-মনের ওপর খুবই প্রতিক্রিয়া হয়েছে।'

'অনেকেরই এরকম হয়েছে। লুসি—তার মেয়ে—কোথায়?'

'এই তারা।'

'সিডনি কার্টন। আইনজ্ঞ। ইংরেজ। তিনি কোথায়?'

'ইংরেজ ব্যবহারজীবী অসুস্থ, অজ্ঞান অবস্থায় ঐ শুয়ে আছেন।'

'জার্ভিস লরি—ইংরেজ। ব্যাঙ্কের অফিসার। তিনি কোথায়?'

লরিই সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। বাইরে বেরিয়ে গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন তিনি।

রক্ষীদল গাড়ির ভিতর উঁকি দিয়ে দেখল। গাড়ির মাথায় দেখল।

'আমরা যেতে পারি?'

'চলে যান।'

গাড়ির ভিতর মৃদু কান্নার আওয়াজ। ভয়ের শিহরণ। দুই হাত জড়ো করে লরি একবার ঊর্ধ্ব মুখে তাকালেন।

'আর একটু জোরে যাওয়া যায় না?'—বলল লুসি।

'তাতে সন্দেহ বাড়বে। লোকে ভাববে আমরা পালাচ্ছি।'

'পেছনে কেউ আসছে কি?'

'না লুসি, রাস্তা পরিষ্কার। কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না।'

এতক্ষণে গ্রামের রাস্তায় পড়ল গাড়ি। সেই একই রকম বাড়ি। সেই কুটির। পুকুর। গোলাবাড়ি। একই ধরনের মেঠো রাস্তা।

তবে কি আমরা পথ ভুলে একই পথে ঘুরে মরছি।

কেউ কি অনুসরণ করছে আমাদের?

আবার ঘোড়া বদল। কত আস্তে আস্তে কাজ হচ্ছে। নতুন ঘোড়া জুতে দেওয়া হল। টাকা-পয়সা গুনে নিতে লোকগুলো কত দেরি করছে! যাত্রার কত বিলম্ব হচ্ছে! আমাদের বুকের দুরুদুরু ঘোড়ার খুরের আওয়াজের চেয়েও দ্রুততর হয়ে যাচ্ছে।

আবার গাড়ি ছুটল। আবার সেই পথ। টিলার পর টিলা। নিচু জলাভূমি।

'অ্যাই! গাড়িতে কে যাচ্ছ?'

'কি হল?'—গাড়ির বাইরে মুখ বের করে বললেন লরি।

'আজ ক-জনের গলা কাটা হবে?'

'আমি কথা বুঝতে পারলাম না।'

'ক-জন আজ গিলোটিনে যাবে?'

'বাহান্ন—'

সন্ধ্যার শেষে নামল রাত্রি।

আবার জ্ঞান ফিরে আসছে। এখন কথার জড়তা অনেক কেটে গেছে। আবার সবাই একত্রে।

ঈশ্বর দয়াময়। আমাদের রক্ষা করুন।

তাকিয়ে দেখ পিছনে। কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা!

রাত্রির হাওয়া আমাদের অনুসরণ করছে। আমাদের পিছনে আকাশে মেঘেদের সঞ্চরণ। আকাশের নীল সমুদ্রে চাঁদ আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

ভয়াল গভীর রাত্রি আমাদের পিছনে ধেয়ে আসছে। তা ছাড়া আর কেউ নেই—আর-কিছু নেই।

১৪ যবনিকা

বিচারকদের রায়ে মৃত্যুপ্রতীক্ষমাণ বন্দীরা যখন কারান্তরালে মুহূর্ত গুনছিল, ঠিক সেই সময় মাদাম দ্যফর্জ তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে গোপনে আলোচনা করছিল। প্রতি-শোধ বলে মেয়েটি ছিল, আর ছিল জ্যাকুজ তিন। অন্যদিনের মতো আজ আর মদের দোকানে বসেনি তাদের মন্ত্রণা-সভা। জেল প্রাচীরের কাছে ছুতোরের দোকানের অন্ধকার নিরিবিলিতে কথা হচ্ছিল তিনজনের। সে দাঁড়িয়েছিল দূরে।

'দ্যফর্জ সাঁচ্চা বিপ্লবী'—বলল জ্যাকুজ তিন।

ভ্রূকুটি করে মাদাম বলল—'বুঝে কথা বল, বন্ধুরা। স্বামী আমার অবিসম্বাদী বিপ্লবী—সাহসের তার তুলনা নেই। বিপ্লবের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনে কিছুমাত্র কুয়াশা নেই। কিন্তু আমার স্বামীর কি যেন এক মহৎ দুর্বলতা। ডাক্তার ম্যানেতের কোনরকম ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারেন না প্রাণভরে।'

'ভালো নয়—ভালো নয়'—হিংস্র ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল জ্যাকুজ। 'বিপ্লবী সৈনিকের এসব দুর্বলতা মাপ করা চলে না।'

'আমি বলছি, শোন'—মাদাম নির্মম গলায় বলল—'আমি ডাক্তারের ভালোমন্দ গ্রাহ্য করি না। তার মাথা যাক কি মাথা থাক, কোন হিসেব রাখবার দরকার বোধ করি না আমি। কিন্তু ঐ জমিদার অভিজাত—ওদের একটি প্রাণীকেও বাঁচতে দেব না আমি। নির্বংশ করব ওদের। ঐ ডার্নের বউ-মেয়ে ওদেরও শেষ করতে হবে ওর ঐ নীল চোখ আর সোনালী মাথা গিলোটিনে দিব্যি মানাবে।'

মাদামের কথায় হিংসার নীল আভা জ্বলে উঠল ওদের দুজনের চোখে। দেখে মাদাম বলল—'স্বামীকে এ-বিষয়ে পুরো বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। সেই জন্যে আমাদের কর্তব্য কি সে-বিষয়ে তার সঙ্গে সুস্পষ্ট আলোচনা করতে চাই না আমি। হয়ত-বা সে তাদের সতর্ক করে দিতেও পারে। দেরি হয়ে গেছে আমাদের। আর বেশি দেরি করে ফেললে ওরা আমাদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যাবে।'

'পালাতে দেওয়া হবে না। কাউকেই দেওয়া হবে না পালাতে। গিলোটিনের তেষ্টা মেটাবে কে?'

'আমার স্বামী'—বলল মাদাম—'এই পরিবারটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, সেটা আমার স্বামীর ইচ্ছা নয়। ডাক্তারের ব্যাপারে কোন সহানুভূতি আমার নেই। সুতরাং আমাকে এ-ব্যাপারে একাই যা করবার করতে হবে। এদিকে এস—'

করাতী এই মেয়েটিকে খুব মান্য করত। ভয়ও পেত।

মাথার টুপিতে হাত রেখে সে অনুগত সৈনিকের মতো এগিয়ে এল।

কঠিন কণ্ঠে বলল মাদাম—'তুমি দেখেছিলে যে ঐ সব দেখিয়ে লুসি মেয়েটা বন্দী ডার্নেকে সঙ্কেত করত। এই এখুনি দরকার হলে তুমি তার সাক্ষী দেবে?'

'নিশ্চয়ই। কেন দেব না'—বলল করাতী—'রোজ করত। শীত গরম সব সময় করত। বেলা দুটো থেকে চারটে সে নানা রকম সঙ্কেত করত। কখনও আসত একা —কখনও কখনও কচি মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসত। নিজের চোখে সব আমার দেখা। আমি আবার জানি না কি!'

নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে দেখাতে লাগল করাতী। যে-সব সে কখনও দেখেনি শোনেনি, তেমন ধারা অনেক সঙ্কেতও করল।

'এ আবার চক্রান্ত ছাড়া আর কি? এ তো পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে।'

একটু যেন ভাবল মাদাম। তার পর আবার বলল—একটু চিন্তা কর তোমরা। ডাক্তারের ব্যাপারটা আমি আমার স্বামীর ওপর ছাড়তে পারি কি? আমার মন তো সায় দিচ্ছে না। তোমরা সবাই কি বল?'

'ওকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দাও।'

মাদাম যেন নিজেকে বুঝিয়ে বলল—'আমি সেদিন দেখেছিলাম, ডাক্তার নিজে মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বন্দীকে সঙ্কেত করছিল। এত বড় একটা ষড়যন্ত্র না জানিয়ে আমার পক্ষে চুপ করে থাকা অন্যায় হবে। আমি তো সাক্ষী হিসেবে খারাপ হব না!'

এরা তিনজনেই সমস্বরে সায় দিল যে সাক্ষী হিসেবে মাদাম দ্যফর্জের তুলনা হবে না।

'আমি ডাক্তারকেও ছেড়ে দিতে পারি না। তোমরা তো তিনটের সময় গিলোটিনের সামনে যাচ্ছ? আজকের দলটাকে পার করবে তো?'

করাতী শুনে তখুনি ঘাড় নাড়ল। এই মৃত্যু-উৎসবে যেদিন সে যেতে পারবে না—দাঁড়িয়ে পাইপ খেতে খেতে মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ দেখতে পারবে না—সেদিন তার দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকবে না। এমনি করে সে প্রতিদিন গিয়ে দাঁড়ায় যেন সকলকে জানাতে চায় যে তার মতো একনিষ্ঠ দেশপ্রেমী দেশে আর দুটি নেই। হয়ত-বা তার মনের ভিতর নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোন গোপন ভয় আছে—তাই এমন সাড়ম্বরে সে নিজেকে দেশপ্রেমী হিসেবে জাহির করে বেড়ায়।

'আমিও ওখানে যাব'—বলল মাদাম—'তার পর গিলোটিনে বাহান্ন জনের মাথা কাটা হবার পর, ধর প্রায় রাত আটটা নাগাত সেকসন কমিটির কাছে খবর দেওয়া যাবে।'

এত বড় একটা কাজে তার প্রয়োজন হচ্ছে জেনে করাতীর গর্বের, আনন্দের অবধি রইল না।

কিন্তু মাদামের চোখে চোখ পড়তেই লোকটা যেন হঠাৎ কুঁকড়ে গেল। মহা বিব্রতভাবে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। ছোট কুকুরের মতো পালিয়ে তার কাঠের স্তূপের পিছনে গিয়ে আত্মগোপন করল।

বাকি দুজনকে কাছে ডাকল মাদাম। দরজার কাছ-বরাবর এসে নিজের বাকি কথা তাদের বলল।

'স্বামীর মৃত্যু-সংবাদের প্রতীক্ষায় এখন সে বাড়িতেই থাকবে। নিশ্চয়ই কেঁদেকেটে উন্মাদিনীর মতো হয়ে আছে। ঠিক এই রকম মনের অবস্থায় রিপাবলিকের সম্বন্ধে তার মুখ থেকে অনেক কটু কথা বের হবে। যারা বিপ্লবের শত্রু তাদের প্রতি সহানুভূতির শেষ থাকবে না মেয়েটার। আমি এখুনি যাব তার কাছে।'

প্রতিশোধ যার নাম সেই মেয়েটা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

বলল—'কি অপূর্ব বুদ্ধি তোমার, মাদাম। এ রকম বুদ্ধিমতী মেয়ে জীবনে দেখিনি।'

মাদামকে আদর করে জড়িয়ে ধরল সে।

তার হাতে নিজের বোনার সরঞ্জাম দিল মাদাম।

বলল—'এগুলো তুমি নিয়ে যাও। গিলোটিনের সামনে আমার আসনটা ঠিক করে রাখবে। আমি গিয়ে বুনব সেখানে। আজ সকাল সকাল যাও সব। আজ খুব ভিড় হবে। আজ বড় বড় মাথা পড়বে।'

'তোমার হুকুম আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।' মাদামের গালে চুমু খেল প্রতিশোধ। তারপর বলল—'তুমি দেরী করো না।'

'গলা কাটা শুরু হবার আগেই আমি এসে পড়ব।'

'বন্দীদের নিয়ে গাড়িগুলো পৌঁছানোর আগেই এস। দেখ যেন দেরি হয় না কিছুতেই।'

হাত ঈষৎ আন্দোলিত করল মাদাম, প্রতিশোধের কথা যে তার কানে গেছে তারই সঙ্কেত দিল সে। এমন ভাব দেখাল যে যথাসময়ে আসাতে তার কোন অসুবিধে হবে না।

জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে সে পথের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরা দুজন পিছনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কি অপূর্ব শরীরের গঠন ঐ মেয়েটির! মনের কি জোর! তাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠল।

ফ্রান্সে তখন যে-কাল চলছে, সেই কালের সম্পর্কে বহু মেয়ের মনেই তখন এমনি পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্যারিসের পথে যে-স্ত্রীলোকটি হেঁটে চলে যাচ্ছিল, তার চেয়ে ভয়ঙ্করী মেয়ে আর বোধ করি কেউ ছিল না। এ মেয়ের মুখে কাঠিন্য আর নির্ভয়। এর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—চতুর। এর সঙ্কল্প একবার স্থির হলে তা থেকে আর কেউ তাকে বিচ্যুত করতে পারে না। এর শরীরে এক আশ্চর্য ধরনের সৌন্দর্য আছে যা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করবেই। তার শরীর-মনের বিশিষ্টতাকে মান্য করতে বাধ্য করাবে। এই দুর্যোগের দিনে এই সব মেয়ে আপনা থেকেই যেন নেতৃত্বে উঠে আসে জনতার ভিতর থেকে। শিশুকাল থেকেই তার মনের ভিতর জন্মেছিল প্রতিহিংসা। একটা বিশেষ শ্রেণীর উপর ঘৃণার বীজ উপ্ত ছিল তার মনে। বয়সকালে তা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। নারীচিত্তের মমতাকে বাঘিনীর হিংস্রতায় পরিবর্তিত করেছে দিনে দিনে।

আজ তার মনে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। কোনদিন যদি-বা ছিল আজ তা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

পিতৃপুরুষের পাপে একজন নিরপরাধ মানুষ মরতে যাচ্ছে তার জন্যে কোন বিকার

নেই মাদামের মনে। সে তো একজনকে দেখছে না, সে দেখছে ওদের সবাইকে। ও তো কোন ব্যক্তি নয়—একটা কলঙ্কিত বংশের ধারা-প্রবাহ, যা ওর মৃত্যুতে নিশ্চিহ্ন হবে।

একটি মেয়ে বিধবা হবে, একটা কন্যা হবে পিতৃহারা, সে সব তার ভাবনার মধ্যে নেই। এই সব মানুষ তার শত্রু। তার হিংস্রতার শিকার। এদের বৈধব্য খুব কোমল শাস্তি। বেঁচে থাকার কোন অধিকার এদের নেই।

শুধু যে অপরের প্রতি কোন করুণাবোধ নেই তা নয়, নিজের উপরেও এই মেয়ের কোন মমতা নেই। এই দারুণ সময়ে কোন-একদিন কোন ঘটনায় যদি এই মেয়েটিকে কেউ আহত করে রাস্তার ধুলোয় ফেলে দেয়, নিজের প্রতি মমতায়ও তার মন কাঁদবে না।

তার আটপৌরে পোশাকের নিচে এমনি একটা নিষ্করুণ কঠিন হৃদয় বহন করে এই মেয়েটি। বেশভূষায় একটা উদাসীন বেপরোয়া ভাব। মানুষের হৃদয়ে একটা ভয়ের ভাব জাগিয়ে তোলে তার পোশাক। মোটা লাল টুপির তলায় তার সমস্ত চুল ঢাকা পড়ে না, গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে।

তার জামার ভিতরে বুকের কাছে একটা গুলি-ভরা পিস্তল লুকনো। কোমরের বেল্টে গোপনে ঝোলানো ধারালো ছোরা। এভাবে সশস্ত্র হয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মাদাম দ্যফর্জ পথ দিয়ে হেঁটে যায়। সমস্ত ভঙ্গিতে একটা বিজয়িনীর ভাব।

একদিন একটি কিশোরী মেয়ে সমুদ্র-সৈকতের বাদামী বালুর উপর দিয়ে খালি পায়ে যে-স্বচ্ছন্দ গতিতে হেঁটে যেত, আজকের মাদাম দ্যফর্জের ভঙ্গিমায় সেই স্বাচ্ছন্দ্য অটুট রয়ে গেছে।

সিডনি কার্টনের ব্যবস্থা অনুযায়ী লরি বাড়ির দরজায় গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিস প্রসকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে একটা সমস্যার সম্মুখীন হলেন তিনি।

গাড়িতে যতদূর সম্ভব, ভিড় এড়ানো প্রয়োজন। গাড়ি যত ভারী হবে তত তার গতি মন্থর হয়ে যাবে, অথচ যত দ্রুত সম্ভব সীমান্ত পার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

তা ভিন্ন গাড়িতে যত বেশি সংখ্যক যাত্রী থাকবে, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কাগজপত্র দেখানোর ব্যাপারে তত ঝামেলা হবার আশঙ্কা। তার ফলে তাদের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার সময় বিলম্বিত হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে সে আত্মহত্যার সমান। এখন প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য।

অনেক বিচার-বিবেচনা করে লরি স্থির করলেন, যেহেতু প্রস এবং জেরি দুজনেরই এই শহর ছেড়ে চলে যাবার উপর কোন বাধা-নিষেধ নেই, তারা তিনটের গাড়িতে আলাদা যাত্রা করবে। তাদের দুজনের হাতে মালপত্র থাকবে না। তারা খালি হাতে চলে যেতে পারবে।

দ্রুতগামী গাড়িতে যাওয়ার ফলে ওরা অনেক আগে পৌঁছাতে পারবে এবং ঘোড়া বদলের জায়গায় আগেই ব্যবস্থা করতে পারবে। এর ফলে তাদের যাত্রার সময় অনেক কমে যাবে। পথে তাদের যত বিলম্ব হবে তত ধরা পড়বার ভয় বেশি।

এই ব্যবস্থায় তার প্রিয় লুসি আর সবাই যে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার অনেক বেশি সুযোগ পাবে সে কথা ভেবে প্রস আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

যাত্রার সময় প্রস আর জেরি দুজনে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কাকে সলোমন অসুস্থ অবস্থায় গাড়িতে এনে তুলল, ওরা জানে। দুরু দুরু বুকে তারা দেখল যে ওদের নিয়ে গাড়ি উল্কা-বেগে ছুটে চলে গেল। তার পর তারা নিজেদের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

এদের গাড়ি যখন চলে গেল তখন মাদাম দ্যফর্জ আর বেশি দূরে ছিল না। সে ধীরে ধীরে এই বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল একটা হিংস্র অভিসন্ধি নিয়ে।

প্রসের সমস্ত শরীর-মন একটা গভীর আবেগে আন্দোলিত হচ্ছিল।

সে বলল—'আমার মনে হয় আমরা এখান থেকে গাড়ি নেব না। এখনই ওদের গাড়ি চলে গেল। আমরাও যদি এখনই যাত্রা করি লোকের মনে দারুণ সন্দেহ হবে।'

'তুমি যা ভালো বোঝ, আমিও তাই করব'—বলল জেরি।

'কিন্তু আমি তো মনস্থির করতে পারছি না। তুমি একটা পরিকল্পনা কর।'

প্রস আবার বলল—'দেশে ফিরে গিয়ে আমি তোমার কথা মনে রাখব, জেরি। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হবে। তাকে আমি বলব এই দুর্দিনে তুমি কত বিশ্বাসের সঙ্গে এদের দেখাশোনা করেছ। সে-সব কথা যখন বলব তখন তোমার স্ত্রী আর তোমার উপর রাগ রাখতে পারবে না। তখন দেখবে সে তোমায় কত মান্য করে চলবে। কত বিশ্বাস করবে।'

মাদাম দ্যফর্জ ক্রমশই এই বাড়ির কাছাকাছি আসছে।

'আমি বলি কি'—বলল প্রস—'তুমি বরং আগে গিয়ে অন্য কোথাও গাড়ি দাঁড় করাও। আমি গিয়ে উপস্থিত হব।'

এ কথায় সম্মত হল জেরি।

'কোথায় তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, বল।'

জেরি একবার স্থির করল যে সে টেম্পল বারে অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে তো অনেক দূর

তবে বড় গির্জার দরজায়।

কিন্তু জেরির তাও পছন্দ হল না।

তবে কি ডাকঘরের সামনে।

'তোমাকে এখানে একলা ফেলে'—আপনমনে মাথা নাড়ল জেরি। ইতস্তত করে বলল—'তোমায় একলা ফেলে যেতে কি জানি কেন মন চাইছে না। যদি কিছু হয়—'

প্রস উত্তরে বলল—'ভগবান জানেন কি হবে। কিন্তু আমার জন্যে ভয় করো না।' তিনটের সময় গির্জার কাছ-বরাবর আমি গিয়ে পড়ব। আমার জন্যে তুমি ভেব না। তাদের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর।'

জেরির দুটি হাত জড়িয়ে ধরে প্রস নিজের উৎকণ্ঠা যেন বোঝাতে চাইল তাকে। সান্ত্বনা দিয়ে জেরি চলে গেল তাদের পরিকল্পনা মতো সমস্ত ব্যবস্থা করতে।

তারা যে এটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারল এর জন্যে প্রসের মনের ভার অনেকখানি লাঘব হয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রস। দুটো বেজে কুড়ি মিনিট। হাতে সময় নেই। সাজ-পোশাকটা ঠিক করে নিতে হবে যাতে রাস্তার লোকের চোখে না পড়তে হয়। তাড়াতাড়ি করতে লাগল প্রস।

বাড়ির ভিতর সব নিঝুম। কি-একটা ভয় প্রসের মনকে আচ্ছন্ন করল। যেন প্রত্যেকটি কোণ থেকে কারা সব উঁকি মেরে দেখছে। তার মনে দুর্ভাবনা। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে উঠেছিল। এক গামলা ঠান্ডা জল নিয়ে প্রস সারা মুখে-চোখে ঝাপটা দিতে লাগল। তার চঞ্চল চোখ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল কেউ তার উপর নজর রেখেছে কিনা। এমনি এক সময় হঠাৎ এক ঝলকে প্রসের চোখে পড়ল ঘরের ভিতর একটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে।

হাত থেকে খসে পড়ে জলের গামলাটা চুরমার হয়ে গেল। জলের ধারা গড়িয়ে মাদাম দ্যফর্জের পা অবধি ভিজিয়ে দিল। যে পা-দুটি জীবনের অনেক দুর্গম পথ

মাড়িয়ে এসেছে মানুষের গায়ের রক্তে যা সিক্ত হয়েছে বার বার—নিয়তির বিধানে এতদিনে সেই পা জলে ভিজে গেল।

মাদামের চোখে শীতল শানিত দৃষ্টি। 'সে কোথায়—চার্লস ডার্নের বউ?'

তখন প্রসের মনে পড়ল সারা বাড়িতে দরজা সব হাট করে খোলা। সেই খোলা দরজা দিয়ে সে নিচে নেমে যেতে পারে। কিন্তু প্রস এক-এক করে সব দরজাগুলি বন্ধ করল। তার পর লুসির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল।

নিঃশব্দ সতর্কতায় এই মেয়েটির কাজ লক্ষ্য করতে লাগল মাদাম। তার পর সে এই স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে দেখল সে সুন্দরী নয়। তার সমস্ত শরীরের যে বলিষ্ঠতা, যে কাঠিন্য—তা বয়সে কিছুমাত্র কমেনি।

প্রসও তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আগন্তুক এই মেয়েটিকে দেখল। তার সর্বাঙ্গ অণু অণু করে পর্যবেক্ষণ করল। 'তুমিই সেই'—উত্তেজনায় চাপা নিশ্বাস ফেলল প্রস। 'আমার সঙ্গে তোমার সুবিধে হবে না। আমি ইংরেজ-মহিলা।'

মাদাম ঘৃণাভরে এই মেয়েটির দিকে তাকাল। কিন্তু দুজনেই জানল যে এই অর্গলবন্ধ ঘরের মধ্যে তারা সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মাদাম দ্যফর্জ জানল যে এদের সংসারের সব চেয়ে বড় বন্ধু এই মেয়েটি। আর প্রসের বুঝতে বাকি রইল না যে লুসির সবচেয়ে বড় শত্রু আজ তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

মাদাম বলল—'গিলোটিনের সামনে আমার চেয়ারের ব্যবস্থা করা আছে। সেখানে যাবার পথে ভাবলাম একবার তোমাদের জমিদার-গিন্নীকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে যাই। তার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার।'

'তোমার অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে আমার বাকি নেই। তবে আমায় ডিঙিয়ে তোমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।'

এদিকে ফরাসী ওদিকে ইংরেজ। দুজনের ভাষা দুজনের কাছে দুর্বোধ্য। সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে দুজনে চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। ভঙ্গিতে কথার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছে।

'নিজেকে গোপন করে কোন লাভ হবে না তার। এই মুহূর্তে যে আত্মগোপন করবে দেশপ্রেমিকরা তাকে অন্যভাবে বিচার করবেই। যাও, গিয়ে তাকে বল যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বুঝতে পাচ্ছ—আমি কি বলছি!'

'আমি ইংরেজের মেয়ে। আমি সামনে থাকতে তোমায় কিছু করতে দেব না।'

'শয়তান বিদেশী মেয়েমানুষ' মাদাম ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে বলল—'নোংরা হিজড়ে বদ মেয়েমানুষ।"

'তোমার মুখ থেকে আমি কোন জবাব চাই না। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। দরজা থেকে সরে দাঁড়াও। আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা। এতক্ষণে মাদাম এক পা এগিয়ে এল।

প্রস বলল—'আমি তোমার কোন কথা শুনব না। এখানে যত বেশিক্ষণ তোমায় আমি আটকে রাখতে পারব আমার লুসি তত বেশি দূরে চলে যেতে পারবে। তোমার ঐ চুলের মুঠি ধরে আমি—'

প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ফুলকি যেন ঠিকরে পড়তে লাগল প্রসের চোখ দিয়ে। তবু আবেগপ্রবণ স্ত্রীলোকের মন। উত্তেজনায় দুটো চোখই তার জলে ভরে উঠল। তাকে দুর্বলতা বলে ভুল করল মাদাম।

অবহেলার হাসি হেসে বলল—'এই মুরোদ তোমার! ঠিক আছে, আমিই তাদের সাড়া নিচ্ছি।' এই কথা বলে উচ্চকণ্ঠে তাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল মাদাম।

কেউ কোথাও সাড়া দিল না। প্রসের মুখের দিকে চেয়ে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা চিন্তা মাদামের মনে খেলে গেল। তবে কি তারা পালিয়েছে! যে চারটে দরজা প্রস বন্ধ করেছিল তার তিনটে দরজাই খুলে ফেলল মাদাম।

'এই ঘরগুলোতে সবই তো অগোছালো পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি মালপত্র বাঁধা-বাঁধি হয়েছে। তোমার পেছনের দরজাটা খুলে দাও, আমি দেখব ভেতরে কে আছে।'

'এ দরজা আমি খুলব না। যতক্ষণ না এ-দরজা আমি খুলছি তুমি বুঝতে পারবে না তারা আছে কি নেই। আর জানতে পার বা না পার, তোমায় আমি এখান থেকে যেতে দেব না।'

মাদাম বলল—'আমি তোমায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। তুমি দরজা খুলবে কিনা বল।'

'এই নির্জন বাড়ির সব থেকে উঁচুতলায় আমরা দুজন একলা। কেউ শুনতে পাবে না আমাদের কথা। আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমি এইখানে তোমায় আটকে রাখব। এখন প্রত্যেকটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান।'

দরজার দিকে এগোতেই মাদামকে সবলে ধরে ফেলল প্রস। তার কোমর জড়িয়ে তাকে শক্ত হাতে বেঁধে ফেলল।

বৃথাই মাদাম নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। বৃথাই ঘুষি মেরে তাকে নিরস্ত করতে পারল। ভালোবাসার শক্তিতে ঘৃণার শক্তিকে পরাজিত করল প্রস। মাথা নিচু করে সে মাদামের বেপরোয়া ঘুষির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগল। ডুবন্ত মানুষ যেমন করে আঁকড়ে ধরে—তেমনি করে তাকে জাপটে ধরে নিল।

একটু পরেই মাদাম তার কোমরে হাত দিতে চেষ্টা করল। তার ভঙ্গি দেখে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলল প্রস—'আমার হাত দিয়ে তোমার ঐ খুনে-অস্ত্রটা ঢাকা আছে। ওটা বের করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার চেয়ে আমার শরীর ঢের বেশি মজবুত করে গড়েছেন ভগবান। যতক্ষণ না একজন মরছে ততক্ষণ তোমায় আমি নিষ্কৃতি দেব না।'

বুকের কাছে হাতটা রাখল মাদাম। প্রস দেখতে পেয়েছিল তার বুকের ভিতর কি লুকনো আছে। চকিতে সেখানে সে বজ্রমুষ্টি হানল। এক ঝলক আগুন। একটা ভয়ানক শব্দ। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে প্রস একলা দাঁড়িয়ে।

এ-সবই এক মুহূর্তের ঘটনা। ধোঁয়াটা সরে যেতেই প্রস দেখল সেই ভীষণপ্রকৃতি স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ মাটিতে পড়ে।

সেই পরিস্থিতিতে ভয়ার্ত প্রস মৃতদেহটাকে দূরে সরিয়ে দিল। তার পর দিশে-হারা হয়ে সাহায্যের জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ল কি সর্বনাশ সে করতে যাচ্ছিল! দ্রুত ঘরে ফিরে এল সে। ঘরের ভিতর থেকে তার বনেট আর পোশাক বের করে নিয়ে এল। ঘরের দরজা বন্ধ করে চাবিটা সাবধানে রাখল। ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করল প্রস। তার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পেরিয়ে পথে নেমে গেল।

সেতু পেরিয়ে এপারে আসবার সময় চাবিটা নদীতে ফেলে দিল প্রস।

গির্জার কাছে সে আসার খানিক পরে জেরি এসে পৌঁছল।

'রাস্তায় কোন গোলমাল দেখলে?' জিজ্ঞেস করল প্রস।

'যেমন রোজ হয়, বিশেষ কিছু নয়।'

'কি বললে, আমি তোমার কথা শুনতে পেলাম না।'

একটু পরে প্রস আবার জিজ্ঞেস করল—'রাস্তায় কোন আওয়াজ নেই কেন? আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

জেরি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এক ঘণ্টার ভিতরে মেয়েটা কালা হয়ে গেল! কি হল ওর!

'একটা আগুন আর একটা শব্দ। তার পর আর আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

জেরি বলল—'ঐ শোন সেই গাড়িগুলো আসছে। আজ যাদের গিলোটিনে মাথা কাটা যাবে তাদের নিয়ে আসছে গাড়িগুলো। শুনতে পাচ্ছ?'

জেরির ঠোঁট নাড়া দেখে প্রস বুঝল যে সে কিছু বলছে।

'একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল—তার পর সব চুপচাপ। আমি আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। এ জীবনে আর-কোন শব্দ আমি শুনতে পাব না।'

জেরি ভাবল কাছের ঐ সব ভয়াবহ গাড়ির শব্দ যদি শুনতে না পায়, তবে এ-পৃথিবীর আর-কোন শব্দ ওর কানে পেঁছিবে না কোনদিন।

আর কোনদিন কোন-কিছুই আর সে শোনেনি।

১৫ প্রশান্তি

প্যারিসের পথ দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রীদের নিয়ে গাড়িগুলি এগিয়ে চলেছে। তাদের ঘড়ঘড় শব্দ পথের বাতাস বিকম্পিত করছে; আজ গিলোটিনের রক্ততৃষ্ণা মেটাবে ছ-টি গাড়ির যাত্রী। মানুষের হাতে আজ পর্যন্ত যত রক্তপায়ী দানবের সৃষ্টি হয়েছে—রক্তপান করে যাদের তৃষ্ণা মেটেনি—তাদের সকলের জিঘাংসা একটি মৃত্যু-যন্ত্রে মিলিত হয়েছে—তার নাম গিলোটিন। কি আশ্চর্য! ফ্রান্সের শ্যামল প্রকৃতি এমন বীভৎসতাকে সৃষ্টি করতে পেরেছে! মনুষ্যত্বকে হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে দুমড়ে দিয়েছে যারা, তারাই এই অত্যাচারের বীভৎস রূপ সৃষ্টি করেছে। যতবার হবে এমন অত্যাচার, ইতিহাস এমনি করে তার প্রতিশোধ নেবে।

জনতার ভিড়ের ভিতর দিয়ে গাড়িগুলি এগিয়ে চলেছে—যেন জমির উপর দিয়ে লাঙলের ফলা খাদ কেটে এগিয়ে চলেছে। দু পাশে মানুষ উঁচু হয়ে দেখছে গাড়ির ভিতরে। প্রতিদিন সেই একই বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে এই অঞ্চলের লোকেদের অনেকেরই উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে। আগেকার মতো জানালায় জানালায় আর কৌতূহলী দর্শকের ভিড় নেই। কোন কোন গৃহস্বামী অতিথিদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেখাচ্ছেন কাল কোন্ গাড়িতে কে ছিলেন, আর আজ কোন্ গাড়িতে কে গিলোটিনে গলা দিতে যাচ্ছেন। পথের লোকেরাও কাজ থেকে মুখ তুলে একবার নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে দেখছে শুধু।

মৃত্যুযাত্রীদের মধ্যে কত ভাবের প্রকাশ—কেউ মাথা নত করে বসে আছে, কারুর দুচোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। মানুষজনের দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ কেউ চোখ বুঁজে বসে আছে—একটি হতভাগ্য কয়েদী মৃত্যুর আতঙ্কে পাগলের মতো গান করছে, নাচার ভঙ্গি করছে। সেই মানুষগুলোর একজনের দিকে তাকিয়েও জনতার চোখে কণামাত্র মমতা, কি করুণা দেখা গেল না।

শুধু একটি গাড়িতে একটি শান্ত-মূর্তি কয়েদী। যে ঘোড়সোয়ারের দল সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, তাদের যারা প্রশ্ন করছে, তারা তরোয়ালের ডগা দিয়ে সেই তৃতীয় গাড়িটির একটি বন্দীর দিকে দেখিয়ে দিচ্ছে। চারপাশের প্রতি কোন লক্ষ্য নেই তার, শুধু পাশের একটি অল্পবয়সী মেয়ে-কয়েদীর সঙ্গে স্নেহভরে কথা বলতে বলতে চলেছে সে। পথের জনে জনে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে—'ঐ সেই'। জনতার সেই বীভৎস উল্লাসে সেই নিরাসক্ত মানুষটির মুখে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না—শুধু একটি সুন্দর স্মিতের

ভাব তার অধরোষ্ঠে খেলা করছে। দুটি হাত তার বাঁধা। মাথার চুলগুলি কপালে মুখে উড়ে এসে পড়েছে—হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার উপায়ও নেই তার।

গির্জার সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে আছে গুপ্তচর বারসাদ। একটির পর একটি গাড়ির ভিতরে লক্ষ্য করছে। তবে কি তাকে—?

তৃতীয় গাড়িটি দেখেই তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পিছনের একটি লোকের প্রশ্নের জবাবে বারসাদ বলল—'ঐ হল সেই।'

জনতার ধিক্কার যেন ফেটে পড়ল চারদিকে। এমনি সময় সিডনি কার্টনের চোখে চোখ পড়ল বারসাদের। পাশের গরিব মেয়ে-কয়েদীর সঙ্গে নিচু গলায় তখনও কথা বলছেন তিনি।

বারসাদ পাশের লোকটিকে বলল—'আর চিৎকার কেন? এখুনি ওর শেষ হবে।'

চারদিক থেকে একটা শব্দ উঠল,—'মাদাম কই, মাদাম কই। শয়তানটা এখুনি মরবে। তা দেখবার আনন্দ পেল না মাদাম। কোথায় গেল সে?'

সামনের দিকে চেয়ারে মেয়েরা বসে বুনছিল। তার মধ্যে ছিল প্রতিশোধ। কিন্তু তার নির্দিষ্ট আসনে মাদাম দ্যফর্জ অনুপস্থিত। মাদামের জন্যে আকুল হয়ে তারা সবাই চিৎকার করতে লাগল।

'মাদাম কোনদিন গরহাজির হয়নি'—একটি মেয়ে বলল।

প্রতিশোধ জোর দিয়ে বলল—'আজও না এসে থাকতে পারবে না। ও আসবেই। তবে খুব চেঁচিয়ে ডাক একবার।'

ডাক। আরও জোরে ডাক। প্রাণ ফাটিয়ে ডাক। ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে ডাক। কিন্তু সে আর আসবে না। কাউকে পাঠাও। তাকে খুঁজে আনতে পাঠাও। জীবনের অনেক বীভৎস কাজ তারা করেছে কিন্তু মাদাম দ্যফর্জকে খুঁজে আনার ক্ষমতা তাদের নেই। কেননা সে যেখানে গেছে, সাধ করে সেখানে কেউ যাবে না।

ঐ তো সব গাড়ি এসে পড়ল। এখুনিই বন্দীদের নামানো হবে। এক এক করে রিপাবলিকের শত্রুদের ছিন্ন শির লুণ্ঠিত হয়ে পড়বে। কিন্তু মাদাম দ্যফর্জ দেখবে না। তার আসন শূন্যই পড়ে থাকবে।

আজ একটি করে মানুষের শিরশ্ছেদ হবে, আর তার সংখ্যা হিসাব রাখবে প্রতিশোধ। সে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে আজ আর মাদাম নেই।

গাড়ি থেকে বন্দীদের নামানো হচ্ছে। সব-কিছু প্রস্তুত। এই এখনই একজন বন্দীর শিরশ্ছেদ হল। মুখে মুখে হিসাব হল—এক।

পর পর গাড়ি থেকে বন্দীদের নামানো হচ্ছে। এতক্ষণে দ্বিতীয় বন্দীর শিরশ্ছেদ হল।

আজ যাকে মারকুইস এভরেমঁদ ওরফে চার্লস ডার্নে বলে মৃত্যুদণ্ডের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে সেই বন্দী গাড়ি থেকে নামল। তার পরে নামল সেই মেয়েটি। কথা দিয়েছিল যে তার হাত সে ছাড়বে না। মেয়েটিকে গিলোটিনের দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড় করালেন কার্টন। মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে।

বলল—'আপনি আমার অপরিচিত, কিন্তু আপনার দয়া আমি কখনও ভুলব না। আমার দুর্বল মন এই দুর্ভাগ্যকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। আপনার সঙ্গে এই সামান্য সময়ের পরিচয়ে আমি যেন কত জোর পেলাম মনে। একদিন ঈশ্বরের পুত্র এমনি করেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমাদেরই জন্যে—সেই চিন্তায় কত শক্তি পেয়েছি আমি। তাই মৃত্যুতে আর আমার ভয় নেই। আপনি আমার কাছে সেই পরম করুণাময় ভগবানের দূত হয়ে এসেছেন। আর আমার কোন ভয় নেই।'

সিডনি কার্টন বললেন—'বোধ করি তুমিই সেই ঈশ্বরের দূতী। তুমি কোন দিকে তাকিয়ো না বোন—আমার দিকে চেয়ে থাক শুধু।'

'আপনার হাত ধরে আছি আমি। আর-কোন চিন্তা আমার নেই। যখন হাত ছেড়ে দেব,—তার পর আর কি বেশি বিলম্ব হবে?'

'ভয় নেই বোন। এখুনি আমরা শান্তি পাব।'

একে একে গিলোটিনে প্রাণ দিচ্ছে বন্দীরা। একের পর এক সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সেই মৃত্যুর পটভূমিতে দুটি শান্তচিত্ত নরনারী দাঁড়িয়ে আছে, কি এক অপার্থিব আকুতিতে তাদের কণ্ঠে মিলেছে কণ্ঠ, দৃষ্টিতে দৃষ্টি। সেই দুটি সন্তান—সংসারে যারা কত বিচ্ছিন্ন, আজ জীবনের অন্ধকার রাজপথে যুগের এক অন্ধকার মুহূর্তে তারা কত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আজ ফিরে যাচ্ছে এক সঙ্গে একই মাতৃক্রোড়ে।

মেয়েটি বলল কার্টনকে—'আপনি শুধু একটি কথা আমায় বলুন, আমার একমাত্র আত্মীয় একটি ছোট বোন আছে—সে আমারই মত অনাথ। আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। দক্ষিণের চাষীদের ঘরে সে থাকে। তাকে আমি বড় ভালোবাসি। গরিব বলে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারিনি—সে কষ্ট আমি ভুলব না। যদি এই বিপ্লব সত্যি গরিবের মঙ্গল করে—যদি দুবেলা খাওয়ার অন্ন মুখে তুলে দেয়—যদি যন্ত্রণার ভোগ কমাতে পারে, তবে সে যেন অনেকদিন বেঁচে থাকে এই পৃথিবীতে—আনন্দে তার দিন কাটে। যত দেরিই হোক, তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'—আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে কি আপনি আমি—আমরা শান্তি পাব?'

সিডনি কার্টন পরম মমতায় বললেন—'তুমি কিছু ভেব না। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাল অন্তহীন—চির শান্তির রাজ্য।'

'কত শান্তি পেলাম আপনার কথায়। আমি তো কিছুই জানি না। এইবার কি আপনাকে চুমু দেবার সময় হল? আমার বিদায়-চুম্বন?'

'হ্যাঁ, বোন।'

মেয়েটি তার মুখ তুলে নরম ঠোঁট দিয়ে সিডনি কার্টনকে চুম্বন করল। সিডনি বিদায় জানালেন তাকে।

নিঃশব্দে তারা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাল। তার পর কার্টন যখন তার হাত ছেড়ে দিলেন, সে হাত এতটুকু কাঁপল না।

মেয়েটির মুখে একটি শান্ত উজ্জ্বল হাসি।

একটু পরেই সব শেষ।

বাইশ। গুনল মেয়েরা।

'তিনি বলেছেন—আমিই জীবন, আমিই পুনরুজ্জীবন। আমাতে যে চিত্ত স্থাপনা করেছে, মৃত্যু পার হয়ে সে জেগে উঠবে জ্যোতির্লোকে। আমাতে যার আশ্রয়, যার আস্থা—মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না।'

অনেক কণ্ঠের কানাকানি। অনেক উন্মুখ দৃষ্টির উদ্বেলতা। ভিড়ের প্রান্তে অনেক অনেক মানুষের বেষ্টনী। জনতা যেন উত্তাল সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত ফুঁসে উঠল।

তার পর একটা বিদ্যুতের ঝলকানি।

তেইশ। গুনল মেয়েরা।

সে-রাতে সারা প্যারিসের লোক কানাকানি করল, কোন বন্দীর মুখে অমন শান্ত জ্যোতি আজ অবধি কেউ দেখেনি। মৃত্যু-ভয়ের লেশমাত্র ছিল না সেই অপূর্ব চোখে-

মুখে। ভিতরের একটা অব্যক্ত আনন্দ, একটা অনির্বচনীয় প্রশান্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তাকে যেন অমর্ত্য মনে হচ্ছিল—যেন ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতিভূ।

কিছু আগে ঐ একই গিলোটিনের নিচে বসে এক বিশিষ্টা বন্দী নারী যে-সব চিন্তায় আলোড়িত হচ্ছিল তা লিখে প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। ঐ মানুষটিও যদি তার হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করত—তা দৈববাণীর মতো দীপ্তিময় হয়ে উঠত এবং বোধ করি সে-চিন্তা এভাবে প্রকাশ পেতঃ

আমি তোমাদের দেখছি। ঐ বারসাদ, রজার ক্লাই, দ্যফর্জ, প্রতিশোধ। ঐ তোমরা জুরিরা, ঐ বিচারক। ঐ তোমরা নতুন অত্যাচারীর দল—পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উঠে এসেছ। যে-পুরাতন নতুন-সৃষ্ট ঐ যন্ত্রের তলায় ছিন্নশির হল। একদিন এর প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। আমি দেখছি এই পঙ্কের অতলান্ত থেকে জেগে উঠছে এক সুন্দর নগর—এক আনন্দোজ্জ্বল মানবসমাজ। আমি দেখছি সত্যি-কারের মুক্তির আস্বাদনের জন্য তাদের সংগ্রাম, তাদের দীর্ঘকালব্যাপী জয়-পরাজয়ের গৌরব-গ্লানি উত্তীর্ণ হয়ে তারা এক যুগান্তর সৃষ্টি করবে। এই যুগের যত অন্যায়, যত পাপ, যা অতীত যুগের স্বাভাবিক পারম্পর্যে সৃষ্ট হয়েছে, তা নিজেকে নিঃশেষ করবে, প্রায়শ্চিত্ত করবে সমস্ত অতীত গ্লানির।

আমার সেই ইংল্যান্ড, এ জীবনে দুচোখ ভরে যাকে আর আমি দেখতে পাব না, সেখানে তারা সুখে ঘর করুক, শান্তিতে ঋদ্ধিতে। সুখী হোক তারা, যাদের জন্যে আমার এই আত্মবলিদান। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, তার বুকে একটি শিশু। তার মধ্যে আমার নাম বেঁচে থাকবে। আমি দেখছি তার বৃদ্ধ পিতাকে বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তিনি সব মানুষের প্রতি গভীর সেবাপরায়ণ। আমি দেখতে পাচ্ছি সেই উদারপ্রাণ মি. লরিকে। আর দশ বছরের মধ্যে হয়ত তাঁর সব-কিছু এদের হাতে সমর্পণ করে চিরশান্তিতে বিশ্রাম নেবেন।

ওদের প্রাণের মন্দিরে একটি আসন রইল আমার। রইল তাদের বংশধরদের হৃদয়ে। বৎসরে বৎসরে এই দিনটিকে নীরব অশ্রুধারায় ভিজিয়ে দেবে যে নারী, তাকে আমি ভুলতে পারিনি। সে-ও আমায় ভুলতে পারবে না। আয়ুর দীর্ঘপথ-শেষে একদিন স্বামী-স্ত্রী ওরাও দুজনে মাটির নিচে চির-বিশ্রাম পাবে। তবু জানি যত দিন বাঁচবে—ওদের চিত্ত-প্রদীপে আমার স্মৃতির আরতি চলবে।

আমি সেই শিশুটিকে দেখছি যে একদিন তার মায়ের বুকে ছিল। আমার নামে ছিল যার নাম। আমারই জীবনের পথ ধরে সে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়ে চলেছে। তার জীবনের দীপ্তিতে আমি জ্যোতিষ্মান্ হয়ে উঠব। আজকের কোন বিচ্যুতি স্পর্শ করবে না তার জীবনে। সেদিনের সমাজে সে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ বিচারক এবং সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ। তার সন্তান হবে—তার নাম হবে আমার নামে। আমার চেনা তার সেই কপাল তার সেই সোনালী চুল। সে পরম আগ্রহে আমার কথা বলবে তার সন্তানকে। বলতে বলতে তার গলা আবেগে কাঁপবে—স্বর কোমল হয়ে আসবে।

এখন আমি যা করছি—জীবনে এ অবধি যা করেছি—তার চেয়ে বড়—অনেক বড়। যে-বিশ্রাম আমি পেতে যাচ্ছি—তেমন মহাবিশ্রাম জীবনে কখনও কল্পনাও করিনি আমি।

আলেকসান্দার ইভানোভিচ্‌ কুপ্‌রিন

য়্যামা

অনুবাদক

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীসুকুমার গুপ্ত

আলেকসান্দার ইভানোভিচ্ কুপ্রিন রাশিয়ার পেনজা প্রদেশে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মস্কো ক্যাডেট স্কুল এবং মিলিটারি কলেজে পড়াশুনা ক'রে তিনি লেফ্টেনাণ্ট হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সাত বছর কাজ করার পরে তিনি সে কাজ ছেড়ে দেন। এর পরে নানা পেশা ধরতে ও ছাড়তে থাকেন, কিছুতেই সুবিধা হয় না, মনও বসে না। অবশেষে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে 'দি ডুয়েল' নামে তাঁর একটি ক্ষুদ্রাকার উপন্যাস বিশেষ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে এবং তিনি পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে, বিপ্লবের পরে তিনি দেশত্যাগ করে প্যারিতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। পরের বছর মস্কোয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুপ্রিনের যে-সব উপন্যাস এবং ছোটগল্প-সংগ্রহ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে তার একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে (নামগুলি ইংরেজি অনুবাদ থেকে নেওয়া)।

১। দি ডুয়েল ২। ওলেস্সিআ ৩। এ স্ল্যাভ সোল এণ্ড আদার স্টোরিস্ ৪। দি ব্রেস্লেট এণ্ড আদার স্টোরিস্ ৫। সাশা ৬। য়্যামা ৭। দি হোয়াইট্ পুড্ল এণ্ড দি এলিফ্যাণ্ট ৮। গ্যামব্রিনাস।

কুপ্রিনের বহুসংখ্যক রচনার কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা হল। অনুবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এগুলি রুশ ভাষার সীমার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে। কুপ্রিনের রচনার মতো বিষয়বস্তুর এত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য কমই দেখা যায়। রুশ চাষী ('ব্ল্যাক উড', 'সোয়াম্প'), ইহুদী ('জুয়েস্', 'কাওয়ার্ড'), সৈনিক ('ডুয়েল', 'ক্যাডেট্স্, নাইট-ওয়াচ্'), অভিনেতা ('ইন রিটায়ারমেণ্ট'), সার্কাস-খেলোয়াড় ('ইন দি সার্কাস'), 'শ্রমজীবী ('মোলোচ্'), মফস্বলী মানুষ ('স্মল ফ্রাই'), বাউণ্ডুলে (কাপ্তেন রিবনিকব'), মাঝিমাল্লা ('রিভার লাইফ') তাঁর রচনাবলীতে এসে ভিড় করেছে। বাইরের সব রঙ্, রোমাণ্টিক কাব্যিকতা মুছে ভিতরের খাঁটি সত্যটি, তা যতই মর্মান্তিক ও অসহনীয় হোক না কেন বের করে নিয়ে আসাই তাঁর বস্তুনিষ্ঠ শিল্পদৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিদ্রোহী সাহিত্যিক তাই সমালোচক-মহলে 'এনফ্যাণ্ট টেরিব্ল্' (enfant terrible) বিশেষণ লাভ করেছিলেন।

'য়্যামা' গ্রন্থটির তিন খণ্ড ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'স্বোরনিক জেম্লিআ' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছিল। এতেই বিভিন্ন সময়ে য়্যামার বিভিন্ন অংশ মুদ্রিত হয়।

য়্যামা ১ম খণ্ড—(সবোরনিক জেমলিআ ৩য় খণ্ডে) ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে।
য়্যামা ২য় খণ্ড—(পূর্বোক্ত সঙ্কলন ১৫শ খণ্ডে) ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে।
য়্যামা ৩য় খণ্ড—(পূর্বোক্ত সঙ্কলন ১৬শ খণ্ডে) ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে।

পরবর্তী কালে লেখক এর কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটান।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে পারি থেকে তিনি তাঁর বইটির মার্কিনী প্রকাশককে যে চিঠি লেখেন এখানে তার সামান্য অংশ সংযুক্ত হল।

'বইখানা লোকের যে পছন্দ হয়েছে, পাঠক-চিত্তের কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল সেজন্যে দায়ী নয়; আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, বহু লোককে য়্যামা আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে।......

এত শত পাপাচারের মধ্যে চিরদিনই আমার কাছে জঘন্যতম পাপাচার বলে মনে হয়েছে নারীদেহের কারবারকে, মানবজাতির প্রতি বিধাতার যা শ্রেষ্ঠ দান সেই নারীর প্রেমের বেসাতিকে। তবুও আমার মনে হয়েছে মানবজাতির পুরাতন ব্যাধিস্বরূপ এই যে গণিকাবৃত্তি, অতি দ্রুত হতে পারে চিরদিনের মতো এর নিরসন।'

গ্রন্থকার উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন, 'এই উপন্যাসকে নীতি-বর্জিত ও অশ্লীল বলে অনেকে মনে করলেও আমি আন্তরিকতার সঙ্গে এটি উৎসর্গ করছি জননী ও তরুণদের উদ্দেশে।'

১

বহুদিন আগেকার কথা। তখনও রেল-লাইন হয়নি। দক্ষিণ-রাশিয়ার কোন-একটি শহরের শেষপ্রান্তে সরকারী আর বে-সরকারী যাত্রীগাড়ির গাড়োয়ানরা বংশপরম্পরায় বাস করত। তাই সে জায়গাটার নাম হয়েছিল 'ইয়াম্‌স্কায়া স্লোবোদা' মানে 'গাড়োয়ানী শহর'—ছোট করে বলতে গেলে, 'ইয়াম্‌স্কায়া' বা 'ইয়াম্‌কা' অর্থাৎ 'খানাখন্দ', অথবা আরও সংক্ষেপে, 'ইয়ামা' ('য়্যামা'), মানে 'ডোবা'। তারপর যখন এসে দেখা দিল বাষ্পের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি গেল উঠে, অমন কড়া জানের গাড়োয়ানের দলও ভুলল তাদের হৈ-হুল্লোড়, হারাল তাদের বেপরোয়া চালচলন, কাজের চেষ্টায় একে-একে দল ভেঙে সব ছড়িয়ে পড়ল নানান জায়গায়। কিন্তু অনেক কাল পরেও, এমন কি এখনও, ইয়ামার গায়ে লেগে রয়েছে সেই কলঙ্কের ছাপ, লোকে জায়গাটাকে ফুর্তিবাজি, মাতলামি, আর গুণ্ডামির জন্যে কুখ্যাত বলে জানে—রাতের বেলায় ভয়ের বলেই মনে করে।

আর কেমন করে যেন, আগে যেখানে পল্টনদের রাঙামুলো নাচুনি বউয়ের ঝাঁক আর শাঁসেজলে সুশ্রী ইয়ামার যত বিধবার পাল তাদের কালো ভ্রূ নাচিয়ে গোপনে গোপনে বোদ্‌কা মদের আর প্রেমের ব্যবসা চালাত, সেখানে একটি-একটি করে রুশ-সরকারের অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন যত সব গণিকালয় গজিয়ে উঠতে লাগল। উনিশ শতকের শেষদিকে ইয়ামার, মানে বড়ো আর ছোট ইয়ামস্কায়ার পথের দুধারেই এ রকমের গণিকালয়ে ভর্তি হয়ে যায়। গৃহস্থদের যে খান পাঁচ-ছয় বাড়ি শেষ অবধি টিকেছিল, তাও শেষে হয়ে উঠল ভাঁটিখানা, তাড়িখানা, আর দোকানপাট—ইয়ামার গণিকাবৃত্তির দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোই হল এগুলোর কাজ।

ত্রিশ-বত্রিশটি গণিকালয়ের নিয়মকানুন, চালচলন সব প্রায় একই রকমের—কেবল বাড়ি আর বারবিলাসিনীদের রূপ আর রূপসজ্জা হিসেবে দক্ষিণা কম-বেশি।

বড় ইয়াম্‌স্কায়ায় ঢুকতেই বাঁ-হাতে 'ত্রেপেল' হচ্ছে সব চেয়ে কায়দা-দুরস্ত বাড়ি,—অনেক দিনের পুরোনোও বটে। এখন যিনি এ বাড়ির মালিক তাঁর একেবারে আলাদা নাম, পৌরসভার নির্বাচকদের মধ্যে তিনি একজন, এবং নিজেই হচ্ছেন পৌরসমিতির একজন সদস্য। বাড়িটা দোতলা, সবুজ আর সাদায় রঙ-করা, স্থপতি রোপেৎ-এর উদ্ভাবিত ভুয়ো বিকৃত রুশীয় পদ্ধতিতে তৈরি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা; সামনের বড় হল-ঘরে একটি ভল্লুকের প্রতিমূর্তি, থাবায় ধরে রয়েছে একটি কাঠের পাত্র—ভিজিটিং কার্ডের জন্যে। বলরুমের পালিশ করা মেঝে, জানালায় মোটা রেশমী পর্দা, দেয়ালে বাঁধানো আর্শি। তাছাড়া দুটো আলাদা ঘরও রয়েছে—সারা মেঝে কার্পেট মোড়া। শোবার ঘরে নীল আর গোপালী আলো; সিল্কের লেপ, ধবধবে বালিশ। গৃহ-বাসিনীদেরও সাজ-সজ্জার পারিপাট্য আছে। লম্বা বল-নাচের গাউন পরা, তাতে আবার ফার-এর পাড় দেওয়া; নয়ত দস্তুরমতো শৌখিন শোভাযাত্রীদের বেশ। হরেক রকমের সাজঃ কেউ সাজে অশ্বারোহী সৈনিক, কেউ-বা খিদমতগার, কেউ মেছুনী, আবার কেউ বা স্কুলের ছাত্রী। এদের মধ্যে অনেকেই বল্টিক অঞ্চলের জার্মান—বেশ লম্বা-চওড়া গড়ন, সুন্দরী, ফর্সা ধবধবে, আর পীনপয়োধরা। 'ত্রেপেল'-এ একবারের জন্য তিন রুবল দক্ষিণা, আর সারারাতের জন্যে দশ।

সোফিয়া বাসিলিয়েব্‌নার গণিকালয়, 'ওল্ড কিয়েব', আর আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়—এই তিনটিই হল দুই রুবলের প্রতিষ্ঠান,—ঈষৎ নিম্নস্তরের। বড় ইয়ামস্কায়ার বাকি গণিকালয়গুলো এক রুবলের, সেগুলো আরও এক ধাপ নিচে। আর ছোট ইয়ামস্কায়াতে সেপাই, ছিঁচকে চোর, কুলিমজুর, আর যত রকমের ফালতো লোকের যাতায়াত। সেখানকার দক্ষিণা হচ্ছে পঞ্চাশ কোপেক, কি তারও কম, আর ঝিলি-ব্যবস্থাও যার-পর-নাই খারাপ। বৈঠকখানার মেঝে উঁচুনিচু, খোলামকুচিতে ভর্তি। জানালাগুলোতে লাল ন্যাকড়া ঝোলানো; শোবার ঘর তো নয়, যেন এক-একটা খোপ—নিচু ছিটেবেড়া দিয়ে ভাগ ভাগ করা, তোশক ছেঁড়া, বিছানার সব চাদরে দাগ; লেপ হচ্ছে ফ্লানেলের—তা-ও পুরোনো, ময়লা, আর শতছিন্ন। জায়গাটার আবহাওয়াও জঘন্য—এঁদো, নরনারীর দেহ-নিঃস্রাব আর মদের গন্ধ-মেশানো ধোঁয়ায় ভর্তি, বিলাসিনীরা সস্তা ছাপা পোশাকে কোন রকমে সাজগোজ করে; কেউ-বা পরে মাঝি-মাল্লার পোশাক। গলার আওয়াজ তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা, নয়ত খোনা। তাদের নাক পড়েছে ঝুলে, মুখে দগদগ করছে গতরাত্রির মারামারি খামচাখামচি কামড়াকামড়ির দাগ। সেই মুখই তারা আবার সাজায় লাল সিগারেটের বাক্স থুতু দিয়ে ভিজিয়ে গালের উপরে বিশ্রী করে এঁটে দিয়ে।

'পুণ্য সপ্তাহে'র শেষ তিন রাত আর 'বার্তাবহনে'র[১] আগের রাতটা (যখন পাখিরা পর্যন্ত নাকি বাসা বাঁধে না, আর বেশ্যারা বাঁধে না চুল সে ক-টা রাত) ছাড়া বৎসরের প্রতি সন্ধ্যায় এই সব গণিকালয়ের দরজায় জ্বলে ওঠে লাল আলো। বড়দিনের মতো সব সুসজ্জিত রাস্তা যেন! প্রত্যেকটি জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে রাস্তায়, ভেসে আসে বেহালা-পিয়ানোর মিঠে সুর, গাড়ির পর গাড়ি আসা-যাওয়া করতে থাকে রাত-ভর। সব কয়টা গণিকালয়েরই সদর দরজা থাকে খোলা। রাস্তায় এসে দাঁড়ালে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সিঁড়ি, বারান্দা আর সামনের হলেই সুইজারল্যাণ্ডের দৃশ্য-আঁকা সবুজ দেয়াল (সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে এদের কিসের সম্পর্ক?)। ভোর অবধি এ সিঁড়ি দিয়ে কত যে লোক ওঠে আর নামে! আসে এখানে সকলেই—কৃত্রিম উত্তেজনাকামী জীর্ণদেহ বৃদ্ধ পর্যন্ত, আসে ছেলেরাও—সামরিক স্কুলের, হাই স্কুলের, তাদের শিশু বললেই হয়। আসেন কত বড় বড় পরিবারের কর্তা-ব্যক্তি—যত সব শ্মশ্রুল প্রবীণের দল। আসেন কত মান্যগণ্য সমাজপতি—আসেন তাঁরা সব সোনার চশমা এঁটে, আসেন সেজেগুজে; নব-বিবাহিতেরা, বিখ্যাত অধ্যাপকেরা, কেউই বাদ যান না। আবার আসে চোর, আসে খুনে। এদিকে আবার উকিলরাও আসেন, যত সব ন্যায়ধর্মের ধ্বজাদণ্ড-ধারী। নামকরা লেখকরা এবং যাঁরা মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার নিয়ে লিখে থাকেন তাঁদেরও দেখা মেলে এখানে। এ ছাড়া আসে গোয়েন্দা, আসে পলাতক। সরকারী কর্মচারীরাও আসেন, ছাত্রেরা আসে, রোগীরা আসে, সুস্থ-সবলেরা আসে। আবার অনেকে আসে যারা পুরোনো ঘাগী—কোন পাপই যাদের বাকি নেই। বিকলাঙ্গ, বোবা, কালা, কানা, নেকো, মোটা, সরু, টেকো, ভীরু, বাঁদর-মুখো—হরেক রকমের লোকের দর্শন মেলে এখানে। দিব্যি আসে—যেন কোন রেস্তোরাঁয় এসেছে। আসে, বসে, সিগারেট ফোঁকে, মদ খায়—দেখায় যেন কতই না আমোদ পাচ্ছে! অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচেও তারা, আর নাচের জন্যে মেয়েদেরও সঙ্গে সঙ্গে বেছে নেয়। দক্ষিণা আগেভাগেই দিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি; তারপর যে-শয্যায় তার পূর্বগামীর দেহের উত্তাপ তখনও রয়েছে মাখানো, সেই বারোয়ারি বিছানায় অন্ধ খেয়ালের বশে সে বিশ্বের মহত্তম, মধুরতম রহস্যে

১ পুণ্য-সপ্তাহ—ঈস্টার-পর্বের পূর্ব-সপ্তাহ। 'বার্তাবহন'—দেবদূত জিব্‌রাইলের যিশু-জননী মেরীর কাছে যিশুর মানবজন্ম গ্রহণের বার্তা বহন।

—নবপ্রাণ সৃষ্টির রহস্যে—মগ্ন হয়। আর ঐ সব নারী অবহেলা-মেশানো আগ্রহে, বাঁধাবুলি আউড়ে, পেশাদারী অঙ্গভঙ্গি ক'রে, তাদের কামনা চরিতার্থ করতে সাহায্য করে—যেন কলের পুতুল যত সব! একই রাতে, সেই একই রকমের কথায়, সেই একই রকমের হাসি আর অঙ্গভঙ্গিতে পর পর তৃতীয়, চতুর্থ—দশম—তারপর আরও যদি কেউ অপেক্ষা করে থাকে তবে তারও কামনা চরিতার্থ করতে বাধ্য তারা।

এইভাবে কাটে সারা রাত, তারপর সকাল হয়, ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে আসে ইয়ামা। ইয়ামাতে দিনের বেলায় লোক নেই। অধিবাসিনীরা সব ঘুমে অচেতন। দরজা বন্ধ। জানালার খড়খড়ি নামানো। যখন সন্ধ্যা হয়, বিলাসিনীদের ঘুম ভাঙে; আবার রাতের জন্যে প্রস্তুত হয় তারা।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, বাস করে আসছে তারা সব 'বারোয়ারি অন্তঃপুরে'। সমাজ তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে, পরিবার তাদের ত্যাগ করেছে। সমাজের খোশখেয়ালের বশ তারা—রয়েছে নাগরের কামাগ্নিতে শান্তি-বারি সেচন করতে! পাপিষ্ঠের পাপলালসা থেকে ভদ্র-পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা করছে ওই সব বারবিলাসিনী—ওই চার শ অবোধ, অলস, উত্তেজনা-প্রবণ, বন্ধ্যা রমণী।

২

বেলা দুটো বেজে গেছে। আনা মারকোব্‌নার দু-রুবলের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানটির সব-কিছুই যেন ঘুমে অচেতন। বাঁধানো আর্শি আর চেয়ার দিয়ে সাজানো বৈঠকখানা ঘরটিও যেন পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। কোণে আধো আঁধারে মকোভিস্কির আঁকা 'রুশীয় মহাপুরুষগণ' এবং 'স্নান' নামে ছবি দুখানিও যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। গত রজনীতেও যথারীতি নাচ-গান-হল্লা চলেছে এখানে; তামাকের ধোঁয়া আর বাজনার সুর ভেসে বেড়িয়েছে ঘরময়; আর মেয়ে-পুরুষেরা কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে আর উঁচুতে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জোড়ায় জোড়ায় নেচে ফিরেছে অবিরাম। বাইরের রাস্তা আলোয় আলোময় হয়ে গিয়েছিল তখন; ভোর অবধি গাড়ির পর গাড়ি এ-সব পথে যাতায়াত করেছে।

এখন রাস্তায় কেউ নেই। গ্রীষ্মের রৌদ্রে রাস্তাগুলো ঝকঝক করছে। বৈঠক-খানার ঘরটায় জানালার পর্দাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে; তাই ঘরের ভিতরটা অন্ধকার আর ঠান্ডা। চিত্ত আকর্ষণের মতো কিছুই নেই সেখানে। গত রাতের পঙ্কিল আবহাওয়া যেন থমকে স্থির হয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। সুগন্ধি, তামাক, ক্লেদময় অসুস্থ নারীদেহের স্বেদবিন্দু, মুখে মাখবার পাউডার, ঔষধি-সাবান, মেঝে পালিশ করবার গুঁড়ো—সব কিছুর গন্ধই একাকার হয়ে মিশে ঘরের মধ্যে এক বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

আজ 'ত্রিনীতি' উৎসব। তাই প্রাচীন প্রথামতো প্রতিষ্ঠানের পরিচারিকারা বাজার থেকে জলা-ঘাস কিনে এনে ঘর-দোরের যেখানে পেরেছে সাজিয়েছে। মেয়েরা তখনও ঘুমিয়ে। পরিচারিকারা দেবমূর্তির সামনে আলো দিয়ে বেশ করে সাজাল।[১] বিলাসি-নীরা নিজ হাতে এসব কাজ করে না। ভয় পায়—যে-হাতে নিশীথে করেছে কামচর্চা, সে-হাতে প্রভাতে করবে দেবতার পরিচর্যা!

সদর-দরজাও সাজানো হয়েছে। কিন্তু বাড়ির ভিতরটা এখনও যেন ফাঁকা ফাঁকা।

১ রাশিয়ার খ্রীষ্টানরা গ্রীক চার্চের অনুবর্তী। গ্রীক চার্চে—এবং রোমান চার্চেও মূর্তিপূজার বহুল প্রচলন আছে।

কেবল রান্নাঘর থেকে কাটলেটের জন্যে মাংস কুচোনোর আওয়াজ আসছে। প্রতিষ্ঠানের একটি মেয়ে,—নাম তার লিউব্কা, মুখে মেচেতার দাগ, দেখতে খুব ভালো না হলেও বেশ আঁটসাঁট তার গড়ন আর শরীরখানাও বেশ তাজা—খালি পায়ে, একটা হাতকাটা জামা গায়ে, ভিতরের উঠোনে নেমে এল। গতরাতে তার ঘরে পর পর দু-জন অতিথি জুটেছিল বটে, কিন্তু কেউই সারারাত কাটায়নি তার সঙ্গে। তাই গোটা বিছানাটায় বেচারা একটু আরামে ঘুমোতে পেরেছিল। হয়তো তাই ঘুমও তার আগেই ভেঙ্গে-ছিল, মানে বেলা দশটায়। খুশি হয়েই সে এসে ঘরের মেঝে আর রান্নাঘরের টেবিল ঘষতে রাঁধুনিকে সাহায্য করতে লাগল। পরে সে শেকলে-বাঁধা 'য়্যামর' (=প্রেম) নামে কুকুরটাকে মাংসের টুকরোগুলো খাওয়াতে বসল। কুকুরটা তার সামনের পা-দুখানা উঁচু করে মেয়েটার ঘাড়ের উপর পড়ে তার হাত থেকে মাংসের টুকরোগুলো কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল—শেকল ছিঁড়ে যায় আর কি! মেয়েটি রাগের ভান করে বলল, 'দুষ্টু, তুই ভেবেছিস তোকে দেবার জন্যেই এই টুকরোগুলো এনেছি, না? না, দেব না তোকে—'

কিন্তু দিল তাকে। আদরও করল। মন তার আজ খুশিতে ভরা। রাতে ঘুমও হয়েছে ভালো, আর তার ওপর আজ 'ত্রিনীতি' উৎসব। বয়ে এনেছে বালিকা বয়সের স্মৃতি। কতদিন পরেই না এল!

রাতের অতিথিরা রাত শেষ হতে-না-হতেই চলে গেছে। আবার তো যে-যার কাজে যেতে হবে। কেবল বৈঠকখানায় কয়েকজন মাত্র বসে কফি খাচ্ছিল। কারা ওরা?

ওঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাড়িউলী আনা মারকোব্না। বয়স ষাটের কাছা-কাছি। দেখতে ছোট্টটি, কিন্তু বেশ গোলগাল। চোখদুটো ফিকে নীল—অল্পবয়সী মেয়েদের মতো, কচি মেয়েদের মতোই বলতে গেলে; কিন্তু মুখখানা ঠিক বুড়োমানুষের মতোই। ঠোঁটের রঙ লালচে, নিচের ঠোঁটখানা একটু যেন ঝুলেও পড়েছে। স্বামীও একটি আছেন—নাম ইসাইয়া সাবিচ; ছোট্টখাট্ট মানুষটি—চুপচাপ, বুড়ো, আর বউয়ের 'ভেড়ো'। আনা মারকোব্না যখন ছিল এ বাড়ির একজন খবরাগিরনী, তখন ইসাইয়া এখানে খিদমতগারের কাজ করত। কাজের লোক হবার আশায় আপন চেষ্টায়ই ইসাইয়া বেহালা বাজাতে শিখেছিল, তাই এখন নাচের সঙ্গে—আর দরকার হলে শবযাত্রার সঙ্গেও বেহালা বাজায় সে।

এখন এ বাড়ির দুজন খবরাগিরনী। বড়জনের নাম এমা এডওয়ার্ডোব্না,—লম্বা, পূর্ণাঙ্গী, বয়স ছেচল্লিশ। বাদামী রঙের চুল আর ঢেউ-খেলানো থুতনি তার। চোখের কোলে কালো দাগ। গায়ের রঙ মেটে-মেটে। চোখ দুটো ছোট ছোট আর কালো; চাপা নাক; আর ঠোঁটের কোণে কাঠিন্যের ছাপ। বেশ রাশভারী লোক সে। এ বাড়ির সকলেই জানে আর দু-একবছর পরে আনা মারকোব্না যখন অবসর নেবে আর এই প্রতিষ্ঠানের সব স্বত্ব, মায় আসবাবপত্র পর্যন্ত সব-কিছুই দেবে বিক্রি করে, তখন এই এমা-ই কিছু নগদ টাকা দিয়ে আর বাকিটা হুন্ডি কেটে কিস্তিবন্দীতে টাকা শোধ করবার শর্তে প্রতিষ্ঠানটি নিজের নামে খাস করে নেবে। তাই মেয়েরা বর্তমানে বাড়িউলী আনার মতোই এমাকেও মান্য করে চলে। যে-সব মেয়ে ভুল করে বসে, এমা তাদের ভীষণ ঠেঙায়। বেশ হিসেব করে, কায়দা করে অন্তরটিপুনি দিয়ে, মারতে জানে সে। তাতে তার মুখের শান্ত ভাব একটুও বদলায় না। আবার ঐ সব মেয়েদের মধ্যে থেকেই তার একটি করে প্রেমপাত্রীও জুটে যায়; তার উপর চলে দুর্দান্ত প্রেম আর ঈর্ষার অত্যাচার। সে আবার তার মারের চেয়েও মারাত্মক।

ছোট খবরাগিরনী হচ্ছেন যোসিয়া। উনি সাধারণ মেয়েদের মধ্যে থেকে 'প্রমোশন' পেয়ে উঁচুতে উঠেছেন। মেয়েরা তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে, কখনও বা মন রাখতে তাকে

'ছোটগিন্নী' বলে ডাকে। মেয়েটি ছিপ ছিপে, চটুল, আর সামান্য একটু টেরা ; গায়ের রঙ গোলাপী ; ঢেউ-খেলানো খোঁপা। অভিনেতা বা হাস্য-রসিকদের সে পছন্দ করে। এমার মন রেখে চলতে চেষ্টা করে সে।

পঞ্চম জন হচ্ছেন স্থানীয় পুলিসের দারোগা বারকেশ। খেলোয়াড় লোক। টেকো মতন। মুখে লাল দাড়ি। ঘুমঘুম নীল চোখ। ঈষৎ ভাঙ্গা মিঠে গলার আওয়াজ। সকলেই জানে আগে সে গোয়েন্দাবিভাগে কাজ করত, বদমায়েশদের ঠাণ্ডা করতে সে একজন ওস্তাদ। কয়েকটি অপকর্মের হাতযশও আছে তার। কেন, শহরের সকলেই তো জানে, বছর দুই আগে সে এক সত্তর বছরের শাঁসালো বুড়িকে বিয়ে করে, আর এই তো গেল বছরেই তার গলায় ফাঁস লাগায়। যাক্—ব্যাপারটা কোনরকমে চাপা দিতে পেরেছিল তাই রক্ষে!

দারোগা সাহেব ননী-মেশানো কফি পান করছিলেন আর ভাবখানা দেখাচ্ছিলেন যেন বাড়ির লোকদের কৃতার্থ করছেন তিনি।

বাড়িউলী বলল, 'আচ্ছা, কি হবে ফোমা-ফোকিচ্? এ ব্যবসায় লাভ তো ঘোড়ার ডিম। তা—আপনি শুধু কথাটি খসালেই—'

বারকেশ ধীরে ধীরে কফির বাটিটা তুলে নিয়ে একটু চুমুক দিল ; তারপর আর একটু কফি খেয়ে নিয়ে গোঁফজোড়ায় আঙ্গুল বুলিয়ে বলল, 'তুমিই ভেবে দেখ, মাদাম শোইবেস, আমার দায়িত্বটা। মেয়েটাকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে—এই—কি বলব, ভদ্র-ভাষায়ই বলি, কুস্থানে। এখন তার বাপ-মা করছে খোঁজাখুঁজি। বেশ! তাকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় সরানোও হচ্ছে; এখন সে তোমারই হাতে এসেছে—আর ভেবে দেখ, ব্যাপারটা ঘটছে কিনা আমারই এলাকার মধ্যে। এখন আমি কি করতে পারি?'

'কিন্তু, মি. বারকেশ, সে তো এখন সাবালিকা', উত্তর দিল বাড়িউলী।

'হ্যাঁ, ওদের কেউই নাবালক কি নাবালিকা নয়,' সায় দিয়ে বলল ইসাইয়া সাবিচ। 'তারা মুচলেকাও দিয়েছে। নিজেদের ইচ্ছায়—'

এমা বলল, 'মাইরি, এখানে সে নিজের মেয়ের মতোই রয়েছে।'

দারোগা একটু বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আমি তা বলছি না। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার বুঝে দেখ। একটা কর্তব্য তো আছে।'

বাড়িউলী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, চটি পায়ে দরজার কাছে এসে, ঢুলু ঢুলু চোখে ডাক দিল, 'মি. বারকেশ, একটু এদিকে আসুন না। দেখুন তো, এখানটা ভেঙ্গে জায়গাটা বড় করলে কেমন হয়!'

'দেখি তো।' বলে উঠে গেলেন দারোগা।

দশ মিনিট বাদে দুজনেই ভিতর থেকে বৈঠকখানায় ফিরে এলেন। বারকেশের হাতে একখানা একশ রুব্লের নতুন নোট—পকেটে ঢুকছে। ভুলিয়ে-আনা মেয়েটির বিষয়ে আর-কোন কথা হল না।

আলোচনা চলতে লাগল, এখনকার ছেলেদের লঘুগুরু জ্ঞানের অভাব নিয়ে। দারোগা সাহেবই কথা পাড়লেন, 'আমার একটি ছেলে আছে—স্কুলে পড়ে—পল্! পাজিটা একদিন এসে বলে কিনা, 'বাবা, স্কুলের ছেলেরা আমার পিছনে লাগে। বলে, তুমি নাকি পুলিসের লোক·আর তুমি নাকি বেশ্যাবাড়ির খবরদারি কর, আর তাদের কাছ থেকে ঘুষ খাও।'—শোন একবার কথা!'

'সে আবার কি কথা!' আমতা আমতা করে বলে আনা।

'আমিও ধমকে দিয়েছি তাকে', বলতে লাগলেন দারোগা সাহেব, 'হেডমাস্টারকে বলিস, ফের যদি ও-রকম কথা শুনি, দেব গভর্নরের কাছে নালিশ ঠুকে। কিন্তু ও-ছোঁড়া

বলে কি জান? বলে, 'আর আমি তোমার ছেলে নই—তুমি অন্য ছেলের খোঁজ কর।' শোন কথা! তা আমিও উচিত শিক্ষা দিয়েছি! ওঃ, তাই কথা বলেন না আমার সঙ্গে! আরও শিক্ষার দরকার—'

'আর বলতে হবে না,' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে আনা, 'এই আমাদের বার্ডি—। হাইস্কুলে পাঠালাম তাকে, কোথায় ভালোটা শিখবে—তা নয়, ফিরে এল যখন তখন তার মুখের বুলি শুনে তো আমি একেবারে থ।'

'বাস্তবিকই।' সায় দেয় ইসাইয়া।

'যা বলেছ!' প্রত্যুত্তরে বলেন দারোগা সাহেব, 'আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো যেন কি হয়েছে। কেলেঙ্কারি! বাপ-মায়ের ওপর ভয়-ভক্তি নেই। নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে। গুলি করে মারা উচিত ওদের।'

এমন সময় যোসিয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'ভালো কথা, গত পরশুর ব্যাপার বুঝি জানেন না? একটা লোক এসেছিল, বেশ জোয়ান—'

'থাম্, থাম্!' এমা ধমকে থামিয়ে দিল তাকে, 'যা, বরং ছুঁড়িগুলোর খাবার যোগাড় করগে যা!'

বাড়িউলী আরম্ভ করল, 'কারুকে দিয়ে কিচ্ছুটি হবার জো নেই। ছুঁড়িগুলো কেবল পীরিতের নাগর নিয়েই ব্যস্ত; কাজের বেলায় সব ঢুঁ ঢুঁ।'

এমন সময় কে যেন ভিতরের দরজায় ধাক্কা দিল। মেয়েলী গলায় বলল, 'পয়সাটা নিয়ে একখানা টিকিট দিন তো!'

উঠে দাঁড়ালেন দারোগা সাহেব—'আচ্ছা, আসি এবার।'

'আর-এক গ্লাস হবে না?' জিজ্ঞেস করল ইসাইয়া।

'নাঃ, থাক,—অশেষ ধন্যবাদ!'

'আবার আসবেন!'

'হ্যাঁ, আবার বলে যাই'—দারোগা সাহেব বললেন, 'মেয়েটাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিও। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি। আসি।'

দারোগা সাহেব চলে গেলেন।

এমা এডওয়ার্ডোব্না মুখ ভেঙচে বলে উঠল, 'তিলে খচ্চর কোথাকার!'

৩

ক্রমে সবাই ঘর থেকে বেরুতে লাগল। ঘর তখনও অন্ধকার; সাজানো জলা ঘাসের গন্ধে ভরপুর, নিস্তব্ধ।

সন্ধ্যা ছ-টার খাওয়া না-হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের হাতে সময় থাকে অফুরন্ত। রোজই এ-সময়টা বড় একঘেয়ে আর ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে—অনেকটা লম্বা ছুটির কর্মহীন দিনগুলোর মতো। কোন কাজ তো নেই; তাই তারা সে-সময়টা শুধু পেটিকোট আর হাতকাটা ঢিলে জামা পরে খালি পায়ে এঘর-ওঘর করে বেড়ায়। গা-ধোয়া, কি চুল-বাঁধার নাম নেই। হয়ত পিয়ানোতে আঙুল ঠুকে ঠুন করে অযথা একটা আওয়াজ করল, নয়ত এ ওর সঙ্গে আরম্ভ করে দিল বচসা।

লিউব্কা আর নিউরা কতকগুলো ফল আর ফুলের বীচি কিনে এনে জামার বুকের মধ্যে রেখে সামনের রাস্তার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল আর লোক-চলাচল দেখছিল। আলোওয়ালা এসে রাস্তার বাতিতে বাতিতে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে

গেল, একজন পুলিস রোজনামচার বইখানা বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এক গণিকালয়ের এক খবরাগরনী দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে এক দোকানে এসে ঢুকল।

নিউরা মেয়েটা ছোটখাট গড়নের; চোখ দুটো তার নীল, রঙ ফর্সা, চুলগুলো চিকন, কপালের নীল শিরাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। মুখখানি দিব্যি ভালোমানুষের মতো। বেশ চটপটে, সব-কিছুতেই নাক গলানো চাই, সকলের মতেই মত দিতে পারে; একখানা গেজেট বলা যেতে পারে তাকে। আর এত তাড়াতাড়ি কথা বলে সে যে মুখ দিয়ে থুতু আর ফেনা উঠতে থাকে—কচি ছেলে-মেয়েদের মতো। সামনের ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে অন্য এক বাড়ির এক খিদমতগার—ষণ্ডামার্কা মতো চেহারা—দৌড়ে পাশের একটা গণিকালয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

'প্রোখোর আইবানোবিচ, ও প্রোখোর আইবানোবিচ,' নিউরা ডাকতে লাগল তাকে।

'আরে, এদিকে এসই না একবার।' লিউবকাও যোগ দিল।

নিউরা হাসতে হাসতে চেঁচাতে লাগল, 'আরে, পা-দুখানা অন্তত গরম করে যাও।'

এমন সময় সদর দরজা খুলে দেখা দিল এমার গম্ভীর মূর্তি।

'ও আবার কি অসভ্যতা!' ধমকে উঠল এমা, 'কতবার বলতে হবে যে দিনের বেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় আসবে না। তা-ও আবার ঐ পোশাকে! তোমাদের কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান হবে না? ছিঃ, ছিঃ! খামকা লোকের কাছে নিজেদের মান-সম্মান খোয়ানো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তোমরা ছোট ইয়ামস্কায়ার যত সব ছোটলোকদের আস্তানায় গিয়ে পড়নি, মনে রেখ সে-কথা।'

মেয়ে দুটি সুড় সুড় করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে রান্নাঘরে গিয়ে বসে ফুলের বীচি চিবোতে লাগল।

এদিকে ছোট মানকার ঘরে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে। মানকা আর জো বিছানার ধারে বসে তাসে '৬৬' খেলছে। জো-কে দেখতে ভালোই, ভ্রূ দুটি বাঁকানো, চোখ দুটি ভাসা ভাসা, রঙ ফর্সা, রুশীয় গণিকা বলে বেশ চেনা যায়। ছোট মানকার প্রাণের বন্ধু জেনী তাদের পিছনে শুয়ে শুয়ে মঁসিয়ে দুমার লেখা 'রানীর হার' নামে একখানা ছেঁড়া উপন্যাস পড়ছে, আর সিগারেট ফুঁকছে। বাড়ির মধ্যে ও একাই বই পড়তে ভালোবাসে, পড়েও বেশ মন দিয়ে। রোমাঞ্চকর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের গল্প বেশ ভালো লাগে ওর—কোন বীর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আগে নিজের জুতোর ফিতে খুলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বোঝাচ্ছে যে, সে যুদ্ধে এক পা-ও হঠবে না, তারপর শত্রুকে তরোয়াল দিয়ে বিঁধে হয়ত দুঃখ করছে যে শত্রুর দামী জামাটায় একটা ফুটো হয়ে গেল, কিংবা গল্পের নায়ক সোনায় ভরা থলি এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলছে—এই সব। চতুর্থ হেনরির প্রেমকাহিনীও ওর মন্দ লাগে না। আসল কথা, সে ভালোবাসে ফরাসী ইতিহাসের রোমাঞ্চকর বীরত্বের বিচিত্র কাহিনী। জেনী কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী, আর কাজের মেয়ে—লম্বাটে, ছিপছিপে, চোখ দুটি সুন্দর, একটু যেন গোঁফের রেখা আছে।

ঠোঁট থেকে সিগারেট না নামিয়ে, আঙুলে থুতু লাগিয়ে বইয়ের পাতার পর পাতা উলটে যায় সে। পেটিকোট হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে, পায়ের গড়ন খুব ভালো নয়—পায়ের বুড়ো আঙুলের তলায় কড়া পড়েছে বিস্তর।

কাছেই পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছে তামারা। কি যেন সেলাই করছে সে মাথা নিচু ক'রে। ভারি শান্ত মেয়েটি। দেখতেও বেশ। চকচকে গাঢ় রঙের চুল। আসলে তার নাম গ্লিসেরা, কি লিউকেরিয়া। কিন্তু গণিকালয়ে ও-ধরনের নাম, যেমন মাত্রেনাস, আগাথাস, সাইক্লিটিনিয়াস, এ-সব চলে না।

তামারা এককালে ছিল সন্ন্যাসিনী, কিংবা কোন মঠের নবীনা ব্রতচারিণী। ওর মুখে আজও লেগে আছে নবীনা ব্রতচারিণীদের মতো নম্রতা, গাম্ভীর্য ও ঈষৎ শ্লেষের

ছাপ। একা একা থাকতেই ভালোবাসে ও। নিজের গত-জীবনের কথা নিয়ে আলোচনা করা পছন্দ করে না মোটেই। কিন্তু হাবভাবে আর চোখের চাউনিতে মনে হয় সন্ন্যাসিনী হওয়া ছাড়াও ওর গত-জীবনের ইতিহাস অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। কি একটা ব্যাপারে অন্যান্য মেয়েরা জানতে পারল তামারা ফরাসী আর জার্মান ভাষা বেশ বলতে পারে। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা সংযম আর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বাইরে সে শান্তশিষ্ট হলেও, বাড়িসুদ্ধ সবাই ওকে বেশ খাতির করেই চলে—তা সে বাড়িউলী থেকে আরম্ভ করে বড় ছোট দুই খবরাগিরনী, মায় খিদমতগারটা অর্থাৎ যে হচ্ছে গিয়ে গণিকালয়ের খাঁটি সুলতান, তার প্রধান নায়ক, এবং সকলেরই ভয়ের পাত্র—সে পর্যন্ত!

রঙের তুরুপ মেরে জো বলল, 'নে, এবার ঠেকা। আমার হয়েছে চল্লিশ। আর আছে ইস্কাবনের টেক্কা, মানে দশ ফোঁটা—বুঝেছ, মান্‌কা রানী। মোট সাতান্ন আর এগার—আটষট্টি। তোর কত?'

'মোটে তিরিশ।' গম্ভীর হয়ে বলল মান্‌কা, 'তোর খেলা মনে আছে তাই।—আচ্ছা, এর পর কি হবে ভাই তামারোচ্‌কা?' বলে তার বন্ধুর দিকে মুখ ফেরায় মান্‌কা। 'তুমি বলে যাও, আমি শুনছি।'

জো ময়লা পুরোনো তেলচিটে তাসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে মান্‌কাকে ঘাঁটতে দিল।

ততক্ষণে তামারা সেলাই না থামিয়েই শান্তকণ্ঠে বলতে শুরু করে দিয়েছে, 'সত্যি ভাই, মঠে যখন ছিলাম সে এক রকম সেলাই ছিল; সোনা, ঘাস, ফুল দিয়ে বেদির ঢাকা সেলাই হত। শীতের সময় ঘরের মধ্যে বসে আলো-অন্ধকারে এ-সব করতাম। তেলের আলো জ্বলত, ধূপধুনো পুড়ত, ফুলের গন্ধ আসত। কারুর গল্প করবার উপায় ছিল না—গুরু-মা ছিলেন ভীষণ কড়া। কখনও কখনও ধর্মসংগীত গাইতাম আমরা, ভালোই গাইতাম। বেশ কাটত দিনগুলো—বাইরে তুষারপাত হত, জানালা দিয়ে তাই দেখতাম। সে-সব এখন যেন স্বপ্ন!'

জেনী পেটের উপর ছেঁড়া উপন্যাসখানা রেখে জোরে মাথার উপর দিয়ে পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠল, 'তোদের ও-সব গল্প আমার জানা আছে, ছেলে হলেই ছুঁড়ে ফেলে দিতিস তো! তোদের ঐ মঠ-মন্দিরগুলো হচ্ছে শয়তানের আড্ডা।'

'চল্লিশ।—আগে ছিল ছেচল্লিশ—ব্যস্‌!' আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল ছোট মান্‌কা।

তামারা লেওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার মতো হাসি হেসে বলল, 'লোকে সন্ন্যাসিনীদের বিষয়ে অনেক কিছুই বলে বটে। আর যদি ক্বচিৎ কালেভদ্রে কোনই বা পাপ—'

গম্ভীর ভাবে জো হঠাৎ বলে উঠল, 'করো না পাপ, সয়ো না তাপ।'

খানিকক্ষণ তামারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে জেনী বলল, 'তামারা, তুই ভাই এক অদ্ভুত মেয়ে! তোকে যতই দেখি ততই অদ্ভুত মনে হয়। হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি কিসের লোভে এই সেনেস্‌কার মতো যত সব বেহুদ্দে মিনসেরা পীরিতের খেলার জন্যে হেদিয়ে মরে। ঐ তো ওদের আহাম্মুকি। তোকে দেখে কিন্তু মনে হয় অনেক পোড় খেয়েছিস তুই, খেয়েছিস নানান ঘাটের জল। তবু তুই যে এ-সব হ্যাংলাপনার প্রশ্রয় দিস সেইটেই আশ্চর্য। যাক, ওটা সেলাই করছিস কি জন্যে?'

'একটা কিছু করে সময়টা কাটাতে হবে তো। আমি আবার তাস খেলতেও পারি না—ভালোও লাগে না।' উত্তর দেয় তামারা।

মাথা নাড়তে নাড়তে বলে যেতে থাকে জেনী, 'সত্যি, তুই অদ্ভুত! আমাদের

সকলের চেয়ে তোর আয়ই বেশি। লোকে তোকে দেয়-থোয়ও ঢের। অথচ টাকা না জমিয়ে বোকার মতো কেবলই খরচ করিস তুই। সাত রুবল দামের আতরের কি দরকার তোর বল দেখি? তারপর ঐ সিল্কের জামা, পনের রুবল দিয়ে কিনলি, কেন? তোর সেনেস্কার জন্যে না কি?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সেনেস্কার জন্যেই।'

'মাইরি, কি রত্নই না কুড়িয়ে পেয়েছিস! পয়লা নম্বরের চোর ওটা। আসে সেনাপতির মতো যেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। অনেক ভাগ্যি যে এখনও ওর হাতে মার খাসনি তুই। চোর ছ্যাঁচড়ের কম্মই তো ঐ। ভয় করে না তোর?'

দাঁত দিয়ে সুতো কেটে তামারা বলে, 'আমার প্রাণ যা দিতে চায় তার বেশি তো দেব না কিছুতেই।'

'ঐ জন্যেই তো আমার আরও আশ্চর্য লাগে। তোর মতো যদি রূপ আর বুদ্ধি থাকত তা হলে একটা বেশ বড় গোছের রুই-কাতলা পাকড়ে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতাম।'

'যার যেমন অভিরুচি, জেনেচ্কা। তুইও তো খুবই সুন্দরী, মন-কাড়া মেয়ে; চরিত্রবল আছে তোর, আছে সাহস। তবু তুই আর আমি দুজনেই শেষ অবধি এসে ঠেকেছি এই একই ঘাটে।'

খেপে ওঠে জেনী, তিক্তকণ্ঠে বলতে থাকে, 'বটে! তা কেন! তোরই কপাল ভালো। তোর ঘরেই যত সব ভালো লোক আসে। আর আমার কাছে আসে যত সব বুড়ো-হাবড়া, আর না হয় কাঁচ খোকার দল। আমার কপালটাই মন্দ। খোকাবাবুদের নাক দিয়ে জল ঝরে, বুড়ো-হাবড়াদের মুখে ফেনা উঠতে থাকে। ঐ সব খোকাদের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কেমন এসে ঢোকে ভয়ে ভয়ে, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে থাকে কাঁপতে কাঁপতে, তারপর কাজ হয়ে গেলে লজ্জায় চোখ তুলেও চাইতে পারে না। তখন মনে হয় দিই নাকে এক ঘুষি বসিয়ে। টাকা দিতে গিয়ে পকেটের মধ্যে তা মুঠো করে ধরে রাখে, নোটখানা গরম হয়ে ওঠে আর ঘামে ভিজে যায়। দুধের ছেলে আর কি! তার মা হয়ত দিনে দশ কোপেক করে দেয় তাকে জলখাবারের জন্যে, আর তিনি তাই থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চেখে চেখে বেড়াচ্ছেন মেয়েমানুষের মাংস। শোন্, বলি তবে— কয়েকদিন আগে মিলিটারি ইস্কুলের একটি অল্পবয়সী ছাত্র তো এলেন আমার ঘরে। ঠাট্টা করে বললাম তাকে, 'এই নাও, লক্ষ্মীটি, চকোলেট, যাওয়ার সময় চুষতে চুষতে যেও!' শুনে তো বাবু রেগে টং প্রথমে; কিন্তু লোভ সামলাতে পারলেন না। লক্ষ্য করে দেখি—রাস্তায় বেরিয়েই খোকা-নাগর আমার চকোলেট মুখে পুরেছেন। বিচ্ছু!'

'বুড়োদের নিয়ে আরও মুশকিল! কি বলিস, জো?' মিঠে গলায় বলে ওঠে ছোট মান্কা, আর দুষ্টুমি করে চায় জো-র দিকে।

জো ততক্ষণে তাস খেলা শেষ করেছে। মান্কার কথা শুনে সে হাসবে, না রাগবে, বুঝতে পারে না। মানে, জো-র ঘরে প্রায় নিত্যি আসে উচ্চপদস্থ এক শাঁসালো বুড়ো—বেশ বড় সংসার তার। বুড়োর আবার রয়েছে একটা বিদকুটে রকমের অশ্লীল অভ্যাস। বাড়িসুদ্ধ সবাই ঐ নিয়ে হাসাহাসি করে।

জো কি করবে এর মধ্যে ভেবে নিয়েছে। সুর করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আ গেল যা— মরণ আর কি! জাহান্নমে যাক্ বুড়ো তোদের নিয়ে।'

'তবু, বুঝলি জোয়েন্কা, তোর ঐ বুড়ো ডিরেক্টর বাহাদুর, কি আমার ঐ খোকা-নাগরের চেয়েও খারাপ হচ্ছে তোদের যত সব পীরিতের নাগর। কি সুখ রে ওতে? বাবু আসেন মাতাল হয়ে, ভাবখানা দেখান যেন একজন কেউ-কেটা, তারপর তোমায় নিয়ে ফুর্তিবাজি করে চলে যান। কি এল গেল তাতে? কই, কিছুই তো

নয়। তবুও হামলে মরিস তোরা। কি আমার নাগররে! সমাজের সবচেয়ে নোঙরা আবর্জনা, গায়ে ছাড়ে দুর্গন্ধ, সারা অঙ্গে মারামারির দাগ,—শুধু ঐ একটা গরব আছে তার, সে হচ্ছে তামারকার হাতে-বোনা ঐ রেশমী আঙরাখাখানা। কুত্তীর বাচ্চা ঐ, সে আবার গাল দেয় লোকের মা তুলে, মারামারির জন্যে হেদিয়ে মরছে তার প্রাণ,—উঃ! নাঃ!'—বলতে বলতে হঠাৎ কেন কি জানি পুলক জেগে ওঠে জেনীর। মান্‌কাকে বিছানার উপর ফেলে দুহাতে জড়িয়ে তার চুলে, ঠোঁটে, চোখে চুমু খেতে খেতে গদগদ স্বরে বলতে থাকে, 'আমি কিন্তু আমার এই মানেচ্‌কাকে আমার এই ছোট্ট-মান্‌কাকে, ফরসা মান্‌কাকে, মান্‌কা-কলঙ্কিনীকে সব চাইতে ভালোবাসি।'

'ছাড়, ছাড়—কি হচ্ছে জেন্‌কা!' নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ঝটাপটি লাগিয়ে দেয় ছোট মান্‌কা।

যখন রেহাই পায় তখন তার চিকন চুলের রাশ এলোমেলো হয়ে গেছে, ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে গাল দুটো হয়ে উঠেছে রাঙা—লজ্জায়-কৌতুকে চোখ দুটো হয়ে পড়েছে ঝাপসা ও নত।

বাস্তবিকই, মান্‌কা হচ্ছে এ বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে শান্তশিষ্ট। প্রাণে মায়া-মমতাও আছে। সকলের মন রাখতে চেষ্টা করে। একটুকুতেই লজ্জা পায়—তখন দেখতে তাকে ভারি সুন্দর লাগে। তাই তাকে সবাই ভালোবাসে। রাতে কিন্তু তিন-চার গেলাস মদ পেটে পড়লে তাকে আর চেনবার জো থাকে না। তখন ঘরের অতিথির উপরও হাত তুলতে সঙ্কোচ হয় না তার। কিংবা মদভরা গেলাস কি বাতিদানই হয়ত দেয় উলটে; বাড়িউলীর চোদ্দপুরুষকেও স্বর্গে তুলে দিতে দ্বিধা হয় না তার। এ-সব সময় বাড়িউলীর, কি খিদমতগারের, এমন কি, সময় সময় পুলিসের পর্যন্ত, হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। জেনী ওকে দেখে থাকে কেমন এক অদ্ভুত মমতার চোখে।

'এই মেয়েরা সব, খেতে চল!' বাড়ির ছোট-গিন্নী যোসিয়া বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। 'চল সব—খাওয়ার সময় হয়েছে।'

সবাই রান্নাঘরে যায়—সেই পোশাকেই, হাত-মুখ না ধুয়েই। তৈরি হয়েছে টমেটোর স্যুপ, কাটলেট্, ক্রীম-রোল। কিন্তু তেমন খিদে নেই কারুর, ইস্কুলের মেয়েদের মতো সবাই প্রায় দোকান থেকে মুখরোচক এটা-ওটা-সেটা আনিয়ে খেয়ে খিদে নষ্ট করে ফেলেছে। কেবল পাড়াগেঁয়ে মেয়ে নীনা, চারজনের খাবার ও একাই খায়—এদের মতো এখনও তার খিদে নষ্ট হয়নি। নতুন এসেছে সে এখানে। এক দোকানদার তাকে গ্রাম থেকে ভুলিয়ে এনে এখানে বিক্রি করে দিয়ে গেছে।

জেনী ক্রীমরোলে এক কামড় দিয়ে নীনাকে বলে, 'লক্ষ্যী ফেক্লুশা, তুই আমার এই কাটলেটটা খা, আমার খিদে নেই। তুই খেলে বরং তোর শরীর ভালো হবে।'

তারপর আর সবাইকে ডেকে সে বলে, 'শোন্ তোরা, আমাদের নীনার পেটে ফিতে-কিরমি আছে, তাই ও বেশি খেতে পারে—নিজের পেট আর পোকাটার পেট দুটো পেট ভরাতে হয় কি না!'

নীনা চটে যায়। 'আমার পেটে, না তোর পেটে আছে ফিতে-কিরমি? তাই তুই দেখতে অমন রোগাটে।'

তারপর চুপ করে নিজের মনে ধীরেসুস্থে খেয়ে উঠতে না উঠতেই তার একটু তন্দ্রা আসে।

ইতিমধ্যেই আবার যোসিয়ার গলা শুনতে পাওয়া যায়, 'কই গো মেয়েরা, নাও, এবার সব সাজগোজ করোগে, দেরি করো না।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঔষধি-সাবান আর সস্তা ও-ডি-কোলনের গন্ধে ঘরগুলো সব ভরে উঠে। মেয়েরা সব সন্ধ্যারানী সাজছে।

৪

গোধূলির সোনালী আলো ক্রমে গাঢ় কালো অন্ধকারে পরিণত হয়। আনা মারকোভ্নার গণিকালয়ের খিদমতগার সাইমন বৈঠকখানায় আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়; বাইরে ঝুলিয়ে দেয় লাল আলো। সাইমন লোকটা বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা,—বৃষস্কন্ধ, বসন্তের দাগের জন্যে ভ্রূ আর গোঁফের জায়গায় জায়গায় চুল গজাতে পারেনি। দিনের বেলা তার ছুটি, তখন তার নিদ্রার সময়। রাতে দরজার কাছের আলনার পিছনে বসে থাকে সে; অতিথিদের কোট খুলতে সাহায্য করে, আবার পরিয়েও দেয়, আর হঠাৎ কোন গণ্ডগোল হলে, সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পিয়ানো-বাদক আসে—লম্বা ছিপছিপে ছোক্‌রা। ভ্রূ আর চোখের পাতা সাদা। ডান চোখে ছানি পড়েছে। অতিথিদের আসবার আগে সে আর ইসাইয়া সাবিচ 'পিঠে-পুলির নাচন' নামের নাচের বাজনাটা ঠিক করে নেয়। আজকাল ঐ নাচটারই চলন হয়েছে খুব বেশি। কোন অতিথি যদি নাচের বাজনার ফরমাশ করে তবে তাকে সাধারণ বাজনার জন্যে দিতে হয় ত্রিশ কোপেক, আর শক্ত হলে আধ রুবল। অবশ্য এর অর্ধেক যায় আনা মারকোভ্নার পকেটে, আর অর্ধেক বাজিয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। বিলাসিনীরা অতিথিদের কাছে তাদের পিয়ানো-বাদকের শতমুখে প্রশংসা করে।

আনা মারকোভ্নার বাড়ির সবাই সেজেগুজে খদ্দেরের অপেক্ষা করছে। নিজেদের নাগর ছাড়া অন্য সমস্ত পুরুষের প্রতিই প্রায় প্রত্যেক মেয়েরই যদিও কেমন এক নির্লিপ্ত উদাসীনতা—এমন কি, রূঢ় উপেক্ষার ভাব রয়েছে, তবু কেন যেন প্রতি সন্ধ্যায়ই তাদের অন্তরে ক্ষীণ আশার দুরু দুরু স্পন্দন জেগে ওঠে; তারা প্রত্যেকেই ভাবে—আজ না-জানি কোন্ নবাগত আসবে তার ঘরে, হয়ত আজ এমন একটা-কিছু ঘটবে যাতে করে তার জীবনের চাকা একেবারে উলটো দিকে ঘুরে যাবে। এ যেন অনেকটা জুয়াড়ীর তখনকার সেই মনোভাব, ট্যাঁকের কড়ি গুনতে গুনতে যখন চলেছে সে জুয়ার আড্ডায় আসর জমাতে। তা ছাড়া দেহপসারিনীদের মধ্যে যৌন অবসাদ সত্ত্বেও, নারীজাতির যা অন্তরতম সংস্কার তা তারা তখনও হারায়নি—সে হল লোককে সুখী করবার আকাঙ্ক্ষা।

আর বাস্তবিকই এ-সব জায়গাতে প্রায়ই চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেও থাকে। হঠাৎ হয়ত পুলিস ছদ্মবেশী গোয়েন্দার সঙ্গে এসে ভদ্রবেশী কোন অতিথিকে গলাধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চলে গেল। কিংবা হয়ত মাতালে মাতালে বেধে গেল মারামারি। জানালার সার্সিগুলো গেল ভেঙ্গে। মাথা ফাটাফাটি, রক্তারক্তি, হৈ-চৈ! আর তার মধ্যেই পাছা থাবড়ে থাবড়ে নাচ শুরু করে দিল জেন্‌কা। অন্য মেয়েরা ততক্ষণে হয়ত ভয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

এমনও হয়, কোন খাজাঞ্চী টাকা ভেঙ্গে দলবল নিয়ে এল ফূর্তি করতে। এর পর তার অদৃষ্টে আছে হয় আত্মহত্যা, নয় হাজত-বাস। এ-সব ক্ষেত্রে বাড়ির দরজা-জানালা সব এঁটে বন্ধ হয়ে যায়; তারপর চলে দুদিন দুরাত ধরে অষ্টপ্রহর সেই চিরন্তন রুশীয় উন্মাদনা—ভুতুড়ে কাণ্ড, অসহ্য বর্বরতা, উন্মত্ত চিৎকার, অবিরল অশ্রুপাত, আর নারীদেহের উপর অকথ্য অত্যাচার। নগ্ন দেহে ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে, মোটা থলথলে মেয়েমানুষের সঙ্গে মাতাল হয়ে নাচতে নাচতে মেঝেয় তারা সব গড়াগড়ি যায়। মদের গন্ধে, গায়ের ঘামে, একাকার হয়ে ঘরময় হয় একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি।

মাঝেমাঝে হয়ত কোনও সার্কাস দলের খেলোয়াড় আসে,—বিরাট বপুখানা নিচু ছাদওয়ালা ঘরের মধ্যে দেখায় ভারি বেমানান, ভ্রম হয় মানুষের আস্তানায় আস্তাবল থেকে এসে ঢুকেছে বুঝি কোন ঘোড়া! আসে নীল কোর্তা গায়ে, সাদা মোজা পায়ে

কোন চীনা; কিংবা নিকষ-কালো এক নিগ্রো—সাদা জামা, আর ছিটের পাজামা পরে বুকে ফুল গ'ুজে, আসে সে ফুর্তি করতে। মেয়েরা ভাবে, লোকটার গায়ের রঙ লেগে জামাটাও কালো হয়ে যাবে না তো!

নতুন নতুন পুরুষ দেখে বিলাসিনীদেরও যৌন-উত্তেজনা হয়। কেউ যদি এ-রকম কোন অতিথি পায়, অন্যেরা তাকে হিংসা করে থাকে।

একবার সাইমন নিজে সঙ্গে করে এনেছিল একটা লোককে। লোকটা গম্ভীর, চোয়াল উ'চু; ঘরে ঢুকে চারদিকে বেশ করে দেখে নিয়ে শেষে মুটকী কিটিকে ব্যবসাদারী চালে হুকুম করল—'চল দেখি।' তারা দু জনে ঘরে গিয়ে দোর দিতেই সবজান্তা সাইমন তার মনের মেয়ে নিউরাকে চুপি চুপি খবরটা দিল—'জানিস ও কে? ওর নাম ভেরা ভসেৎকো। গেল বছর একাই দুদিন ধরে এগার জন খুনীকে ফাঁসিতে লটকেছে ও।' খবরটা যখন সবার মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল তখন সকলেই কিটিকে হিংসে করতে লাগল। আধ ঘণ্টা পরে যখন কিটির ঘরের দরজা খুলে লোকটা সোজা বেরিয়ে গেল গম্ভীর চালে, মেয়েরা সব হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্ব্যস্ত করে তুলল কিটিকে। নতুন চোখে যেন অবাক হয়ে—দেখতে লাগল তারা কিটিকে, তার বিছানাটাকে পর্যন্ত—তখনও দুমড়ে রয়েছে তার চাদরের ভাঁজ। কিছুই বলতে পারল না কিটি, শুধু তার মোজার মধ্যে থেকে একটা পুরোনো তেলচিটে নোট বের করে সবাইকে দেখাল তার আয়, বলল, 'আর পাঁচজন যেমন হয়ে থাকে তেমনিই এক মিন্‌সে।' কিন্তু যখন শুনল তার পরিচয়, বেচারা কেন যে কে'দে ফেলল, তা সে নিজেই বুঝল না।

লোকটা কিটির সঙ্গে কোনরকম অসদ্ব্যবহার করেনি, প্রেম-পাগলও হয়ে ওঠেনি সে। বরং অবহেলাই করেছে সে কিটিকে। লোকে একটা কুকুর কি ঘোড়া, কিংবা একটা ছাতা, কোট কি টুপিকেও যতটুকু যত্ন করে থাকে, কিটির উপর ততটুকু মনোযোগও দেয়নি লোকটা। সে যেন ছিল একটা নোংরা, বিশ্রী জিনিস, যা সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে দরকার হয়েছিল মাত্র, তারপর কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজাতীয় ঘৃণায় দূর করে ছু'ড়ে ফেলে দিয়েছে, হয়ত মুটকী কিটির কান্নাটা আসলে এই অবহেলাটুকুর জন্যেই। তবু তার অবোধ মনের কাছেও মনে হল মিছে অকারণে তার এই কান্না।

আরও অনেক কিছুই হয় এখানে। এই সব হতভাগিনীর প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়ে। হয়ত কোন বর্বর কারুর উপর রেগে গিয়ে ছু'ড়ল পিস্তল, কিংবা দিল বিষ খাইয়ে গোপনে। আবার গোবরে পদ্মফুলের মতো প্রেমও দেখা যায় এখানে—তবে তা একান্তই বিরল ব্যাপার। কত বিলাসিনী যে তাদের নাগরের সঙ্গে পালিয়ে গেছে—অবশ্য ফিরে আসতে হয়েছে প্রায় সবাইকেই। আবার, ক্বচিৎ কোন রঙ্গিণীকে গর্ভিণীও হতে দেখা গেছে: তখন সকলের কাছে তাকে হতে হয়েছে লজ্জিত ও হাস্যাস্পদ—ব্যাপারটার গভীরতা বাস্তবিকই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

সে যা-ই ঘটুক, প্রতিটি সন্ধ্যাই এদের মনে জাগিয়ে দেয় চাঞ্চল্যকর, রোমাঞ্চকর, একটা নতুন আশা। নইলে এই মনোবলহীন, অলস নারীদের জীবন আরও নির্জীব হয়ে পড়ত।

৫

তা একদিন আনা মারকোবনার গণিকালয়ে এক অদ্ভুত ঘটনাই ঘটল বটে! ইয়ামাবাসীদের কাছে তা একটু নতুনও বই কি!

শীতের এক সন্ধ্যা—ছ-টা বাজে তখন। বাইরের দরজায় কে এসে যেন ঘন্টা নাড়ল। সাইমন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'বাড়িউলীকে।'

'কেন?'

'দরকার আছে, এখানে থাকতে চাই।'

'একটু অপেক্ষা করতে হবে, খবর দিচ্ছি।'

এমা এডোয়ার্ডোব্না সব শুনে প্রথমেই প্রশ্ন করল, 'মেয়েটি দেখতে কেমন,' 'কেমন সেজে এসেছে', 'পুলিসের গুপ্তচর নয় তো?'—তারপর তাকে আনতে হুকুম দিয়ে সাইমনকে কাছেই থাকতে বলে দিল—কি জানি যদি কোন দরকার পড়ে।

মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকল। এমা বেশ করে তাকে দেখে নিয়ে বুঝল এ পথে সে নবাগতা। কালো সিল্কের পোশাক পরা, মুখে কিছুই মাখেনি, বেশি লম্বা নয়, দেখতেও বেশ। বয়স—হয়ত কুড়ির বেশি হবে না। জিজ্ঞেস করল—'বয়স কত?'

'ছাব্বিশ।'

'কিন্তু দেখতে তো দেখি ছুক্‌রীর মতো! পোশাক খুলতে আপত্তি আছে?'

'এক্কেবারে?'

'হ্যাঁ, এক্কেবারে। ভয় নেই, ঘর গরম আছে।'

বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে উলঙ্গ হয়ে সামনে দাঁড়াল মেয়েটি। সপ্রশংস কণ্ঠে বলল এমা—'বেশ! এভাবে মেয়েরা শুধু মেয়েদেরই সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পায়, পুরুষদের সামনে নয়।'

পাকা জহুরীর মতো সারা দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে এমা বলল—'নাঃ, শরীর বেশ তাজাই আছে দেখছি। মাই দুটোও বেশ ডবডবে। উরুৎ আর পায়ের গোছাও বেশ শক্ত। নোঙরা ব্যামো-ফ্যামোর কোনও চিহ্ন নেই দেখছি। তা ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। দাঁতও মন্দ নয়। একটা বুঝি বাঁধানো!—হয়েছে, এবার পোশাক পরতে পার।'

মেয়েটি এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে দিয়ে চলবে?'

হাসল এমা—'চলবে বই কি! তবে কথা হচ্ছে, আমরা স্বাধীন জেনানাদের এ-সব জায়গায় ভর্তি করি না বড়।'

'কেন, কারও প্ররোচনাতে তো আমি আসছি না, নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু যদি তোমার কোন আত্মীয়স্বজন তোমার খোঁজ করে, বা তোমার জানাশোনা কেউ এখানে ফুর্তি করতে এসে তোমায় চিনে ফেলে—তখন?'

'তার জন্যে ভয় করবেন না। আমি এখানকার নই, পিতাস্‌বার্গ থেকে আসছি।'

'তা-ও যেন হল'—আমতা আমতা করে বলে এমা,—'চেহারা দেখে তো মনে হয় বেশ বড়োঘরের ঘরণী গো, ছেলেমেয়েও হয়ত আছে।'

'নাঃ, কেউ নেই আমার,'—জোর দিয়েই বলে মেয়েটি, 'স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে, —যাক্ সে-কথা। আমি আপনার সব নিয়মই মেনে চলতে রাজি আছি। দেখবেন, কথাবার্তায় আপনাদের উপযুক্তই হব মনে করি।'

'সে তো ভালো কথা! সব নিয়ম মেনে চললে বেশ খুশিই হব।'

'কি আপনাদের নিয়ম, শুনি?'

'এই ধরো, তোমার পাশপোর্টখানা নিয়ে নেওয়া হবে, আর তোমাকে যেতে হবে পুলিসের কাছে। সেখানে তোমাকে একখানা হলদে টিকিট দেবে—তাতে থাকবে তোমার

নাম, তোমার বাবার নাম, পদবী—আর ব্যবসা লেখা থাকবে 'বেশ্যাবৃত্তি'। পাশপোর্ট-খানা পুলিসের জিম্মায় থাকবে। তা আবার ফেরত পাওয়া বড়ো মুশকিল।'

'দরকার নেই আমার পাশপোর্টে।'

'প্রতি সপ্তাহে পুলিস থেকে ডাক্তারি পরীক্ষা হবে কিন্তু।'

'সে তো ভালোই।'

'ঠিক বলেছ, ব্যবস্থাটা ভালোই। হ্যাঁ, নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখবার নিয়মগুলো তোমায় বলে দিতে হবে না বোধ হয়। প্রেমের ব্যবসাতে এটা বিশেষ দরকার। আর এ-ও বোধহয় জান—যে-ই তোমাকে পছন্দ করবে তারই শয্যা-সঙ্গিনী হতে হবে তোমায়। ঘেন্নায় যদি বমিও ঠেলে আসে, তবু আপত্তি করতে পারবে না।'

'চোখ বুজে সব সহ্য করব, তা সে যতই কষ্টকর হোক। আর কিছু?'

'হ্যাঁ, আর-এক কথা, নেশা করবার অভ্যেস আছে নাকি?'

'নাঃ, মরফিয়া, আফিম, কোকেন, কখনও ছুঁইনি। এর কুফল দেখেছি।'

'মদ চলে?'

'কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে পান করি, নইলে নয়।'

'বলছি শোন। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে তাই বলা। মদ খাও না—ভালোই। তবে শাঁসালো খদ্দেরকে খুশি করতে হলে একটু-আধটু খেতে হয়। এতে লাভও মন্দ হয় না। বোতল-পিছু শতকরা পাঁচ রুবল থাকবে। দেখবে জ্ঞানটা যেন টনটনে থাকে!

'চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, আর-একটা বিষয় তোমাকে জানানো উচিত। কথাটা হচ্ছে—মানে সব খুলে বলাই ভালো, কিছু মনে কোরো না—অনেকে অনেক রকমের নোঙরামি করে তোমায় জ্বালিয়ে মারবে, উপহারও দেবে অনেক কিছু—সে সবই তোমার—শুধু প্রতিষ্ঠানের আইনমাফিক ট্যাক্স আর নাগরের ঘাড় ভেঙে যা খাওয়া-দাওয়া করবে তার দাম দিতে হবে। কাজেই যদি কেউ তোমার কাছে অন্যায় কিছু দাবি করে—ইচ্ছে করলেই স্রেফ 'না' বলতে পার। সেজন্যে আমরা তোমাকে জোর করব না, বা করতেও পারি না,—তা-ও বলি লোকটিকে একেবারে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কিন্তু, তাহলে সেটা হবে চুক্তিভঙ্গ। তবে এ-ও ঠিক, যদি এ-সমস্ত অদ্ভুত লোকের লালসা পূর্ণ করতে পার তবে অনেক কিছুই প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে।'

''এ-সব বিষয় ভেবে দেখব, তবে প্রত্যেকের সঙ্গে—'

'আচ্ছা, তোমাকে মাঝেমাঝে না হয় ছুটি দেওয়া হবে। তবে ট্যাক্স—আর অতিথি-দের নিয়ে খাও বা না খাও, রোজ দশটি করে কোপেক খাওয়ার খরচ বাবদ দিতে হবে। তোমার যদি ইচ্ছে না হয়, অথচ কেউ যদি তোমার সঙ্গ কামনা করে, তুমি বলতে পার যে তুমি অসুস্থ হয়েছ—না শোনে, পুলিসের হুকুমনামা দেখিয়ে দেব; ভালো মেয়েদের জন্যে এসব আমরা করে থাকি।'

'ধন্যবাদ।'

'যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা জিজ্ঞেস করব—এ-পথে এলে কেন? সহজে আয় হয় বলে? জীবনে বিতৃষ্ণ হয়েছ? কিংবা কারও উপরে প্রতিশোধ নিতে এ রকম করছ না তো—বা স্রেফ একটা কৌতূহল?'

'নাঃ, যা ভাবছেন তার কোনটাই নয়। গোপনে বলছি—শুধুমাত্র পুরুষের সঙ্গলাভের লালসায় আসা। মাত্র একজনের নয়—অনেকের। সমাজে থাকলে তা হবার উপায় নেই। সেখানে কাউকে পেতে হলে কত রকমেরই না ফাঁদ পাততে হয়! পরে যদিই বা আশা পূর্ণ হল, তারপরই আসে অবসাদ, ক্লান্তি, একঘেয়েমি; শেষে কান্না-কাটি, আত্মহত্যার ভয় দেখানো; শেষ পর্যন্ত নাটকীয় বিচ্ছেদ, না-হয় পালিয়ে যাওয়া।

অতি বিশ্রী! তাই তো এলাম এখানে। সে-সব কোন হাঙ্গামা নেই—ভয় যা একটু রোগের।'

'না, না, সে ভয় করতে হবে না। সাবধান হবার উপায় বলে দেব তোমায়। একটু থেমে পরে বলল এমা, 'সত্যি বলতে কি, তোমাকে আমার বেশ ভালোই লেগেছে। তা হোক, একদিন বেশ করে ভেবে দেখ। তারপর কাল বেলা চারটের সময় আমাদের কর্ত্রীঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। আর-একটা কথা, কাউকে নিয়ে জড়িয়ে থেক না যেন, কাউকে একা মনের মানুষ করে তুলো না।'

'আমিও তা চাই না।'

'ভালোই।'

'তবে একটা অনুরোধ—'

'আমার নাম এমা এডোয়ার্ডোব্না।'

'হ্যাঁ, মাদাম এমা এডোয়ার্ডোব্না, দয়া করে কিন্তু কাউকে বলবেন না যে আমি এখানে নানা পুরুষের সঙ্গসুখের জন্যে এসেছি।'

'আচ্ছা।' ঘাড় নাড়ল এমা।

পরদিন এল মেয়েটি। আনা মারকোব্নার্ পছন্দ হল, অতএব ভর্তিও হয়ে গেল সে। ইসাইয়া সাবিচ একটু আপত্তি তুলেছিল,—লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তা-ও আবার ভদ্রঘরের, সুবিধে হবে কি? পরে কোন দোষ না পেয়ে চুপ করে গেছে।

মেয়েটির নতুন নাম হল ম্যাগ্দা বা ম্যাগ্দালেন। পুরোনো মেয়েরা ম্যাগ্দাকে নিয়ে হাসাহাসি, ফিসফিস, কত কি করতে লাগল। স্কুলে, সৈন্যদলে, জেলে, সর্বত্রই প্রথম-প্রথম এ-রকমটি হয়।

তা ম্যাগ্দা মেয়েটি ছিল শান্ত, ধীর, সংযমী—কথা বলার তার ছিল এক মধুর ধরন। তাই কারও সঙ্গে তার কখনও ঝগড়া বাধত না, কারও সঙ্গে যে গলায় গলায় ভাব ছিল তা-ও নয়। ক্রমে ক্রমে ঐ বাড়িতে সে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসল। শত্রু-মিত্র বলতে তার কেউই রইল না, অথচ সবাইকেই সে খুশি রাখতে পারত, দরকার হলে টাকা ধারও দিত, পরামর্শ দিয়ে অন্যকে সাহায্যও করত। তামারাই শুধু মাঝে মাঝে তার ঘরে এসে দশ-পনর মিনিট গল্প করত বটে, কিন্তু জমত না দেখে একটু অভিমান করেই উঠে চলে যেত—বলত, 'তুমি যেন কেমন একটু অদ্ভুত, ম্যাগ্দা।'

এমা এডোয়ার্ডোব্না ম্যাগ্দার যৌন-রহস্য গোপনই রেখেছে। এমা নিজেই যেন ম্যাগ্দাকে ঠিক করে বুঝে উঠতে পারে না। সবাই ম্যাগ্দাকে পছন্দ করে,—বেঁটে, মোটা, রোগা, আধুনিক, সবরকমের খদ্দেরেরই নজর ওর উপর। কিন্তু, সে ঐ একবারের জন্যেই, দ্বিতীয়বার আর কেউ তার ধারে ঘেঁষে না। 'এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার!'—দেখে শুনে মনে মনে ভাবে এমা,—'দেখতে ভালো, চালাক-চতুর, কথা কইতে জানে, আভিজাত্যও আছে, পেঁচিয়ে আদায় করতেও পারে, তবু নাগর থাকে না কেন?' এমা তার দুই-একজন ঘনিষ্ঠ অতিথিকে জিজ্ঞেসও করেছে, 'আচ্ছা, ওর ঘরে দ্বিতীয়বার আর যাও না কেন গো?'

প্রত্যেকে প্রায় একই রকমের উত্তর দিয়েছে, 'মানে সবই ভালো, তবে কিনা, কি বলব, বুঝেছ বোধ হয় ঐ যাকে বলে প্রেমের ব্যাপারে ঠিক সুবিধের নয়,—একটু যেন বেশি লাজুক; প্রাণে ঠিক আগুন ধরাতে জানে না আর কি।'

'কিন্তু,' বলে এমা, 'ছুঁড়ী সুন্দরী তা মানতে হবে, যার তার সঙ্গে ওর মিল খাবে না দেখছি।'

এমা ঠিক করল ম্যাগ্দার সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলে দেখবে।

'আচ্ছা ম্যাগডচ্‌কা,' একদিন এসে জিজ্ঞেস করল এমা, 'বলো তো জায়গাটা লাগছে কেমন তোমার?'

'খাসা,' উত্তর দিল ম্যাগ্‌দা।

'খদ্দেরদের বেশ খুশি করতে পারছ তো?'

'তা কি করে বলব, জানতেও চাই না কে খুশি হল না-হল, নিজের কাজ করে গেলেই হল।'

'ঐ তো ভুল করলে, ম্যাগ্‌দা'—একটু যেন বিরক্তই হল এমা, 'কেবল নিজেরটি দেখলেই তো চলে না। পুরুষরা চায় মেয়েরা দুঃখু করবে, কাঁদবে কাটবে, মান করবে, কামড়াবে খিমচোবে, চাই কি দুটো-একটা কুচ্ছিত কথাও বলবে। প্রেম করতে গিয়ে পাষাণ হলে চলে না, সুন্দরী! এক-আধটু ঢং করাও দরকার।'

ম্যাগ্‌দা বলল, 'একদিন রাতে পাশের ঘরের এ-রকম নকল কান্না আর ন্যাকামি আমার কানে এসেছিল। কি বিশ্রী! ও-সব আমার আসে না, বাপু।'

'যা ইচ্ছে করোগে তবে,' রাগ করল এমা, 'জাঁদরেল না হয়ে শুধু নিধিরাম সর্দার হতে চাইলে কি আর করা যাবে! যাক্‌গে, যা খুশি করোগে।'

'কি করব? প্রেমের অভিনয় করতে পারি না যে!'

'পারতে হবে।'

'কি ক'রে?'

'এই সাইমন তোমায় শিখিয়ে দেবে তার চাবুক দিয়ে,'—চটে গেল এমা, 'তার চাবুক দেখনি বুঝি! ভয় নেই, আমরা ঢের ঢের মেয়েকে এভাবে ঢিট্‌ করেছি।'

'তা হলে আমি নালিশ করব।'

'কার কাছে?' তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল এমা।

'পুলিসের কাছে, নয় গবর্নরের কাছে।'

'গবর্নর থাকেন অনেক দূরে, আর পুলিস!' একটু হাসল এমা, 'তারা তো আমাদের কেনা। তোমার একখানা চিঠিও বাইরে যেতে দেব না, তোমাকে কড়া নজরে রাখব।'

'আমি ঠিক পালিয়ে যাব,' কেঁপে উঠল ম্যাগ্‌দার স্বর।

'চাঁদবদনী, পালাবে কোথায়? ছিঃ, ও চেষ্টাও করতে যেও না,' ঠাট্টা করল এমা, 'তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, বরং এ-পথে চলবার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নাও।'

তিন দিন পরের ঘটনা।

দুপুরবেলা। ক্যাপটেনের পোশাক-পরা দীর্ঘকায় অতি সুশ্রী এক যুবক, সেনা-বিভাগের একজন অফিসার, আনা মারকোব্‌নার প্রতিষ্ঠানে এসে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে দারোগা বার্‌কেশ, একেবারে যেন ভিজে বেড়ালটি! ইয়ামায় এমনটি তাকে এর আগে কেউ কখনও দেখেনি।

বেশ ভদ্রভাবেই বললেন সৈনিকপুরুষটি, 'কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

সাইমন বলল, 'তিনি এখন এখানে নেই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন।'

ভয়ে ভয়ে নিবেদন করল বার্‌কেশ, 'কর্তা, হুকুম দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করতে পারি। এ সব নোঙরা ঘাঁটা তো আমাদেরই কাজ। আপনি কেন এই সব ছোটলোকের সঙ্গে কথা বলবেন!'

'বেশ,' ক্যাপটেন বললেন।

'এই,' গলা ফাটিয়ে হুকুম করল বার্‌কেশ, 'বাড়িউলীকে ডাক্‌ শীগ্‌গির।'

বাড়িউলী দরজার ফাঁক দিয়ে সবই দেখছিল। এবার তার তলব হওয়ায় দরজাটা একটু ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে বলল, 'কাপড় ছেড়ে আসছি, একটু বসুন।'

'না, না—দেরি করা চলবে না এখন,' গর্জে উঠল বারকেশ।

'একটু আস্তে'—অফিসারটি বললেন।

'হুজুর, এরা আস্তে কথা, ভালো মুখে কথা, এ-সব বোঝে না। সব সময়ে এদের কড়া শাসনে রাখা দরকার। চলুন, ঐ ঘরে যাই তবে।'

পাশের ঘরে একটু পরেই পরিচালিকা এল তাদের কাছে। পুলিসের বড়কর্তার সই-করা একখানা কাগজ এমার নাকের ডগায় ধরে বারকেশ চেঁচাতে লাগল, 'এই হতভাগী, এ-কাগজে যাঁর নাম লেখা, চিনিস তাঁকে?'

'চিনি।'

'এঁর নামের হলদে টিকিটখানা দে। 'হুজুর,' অফিসারের দিকে ফিরে বলল বারকেশ, 'টিকিটখানা ছিঁড়ে ফেলব, না, আপনাকে দেব?'

'আমাকে দাও। তাঁর এখানকার নাম কি?'

'ম্যাগদা।'

'এখানে বেশ চালাক-চতুর কোন মেয়ে আছে?'

'তামারা বলে একটি মেয়ে আছে, বেশ চালাক-চতুর।'

বারকেশ আবার গর্জে উঠল, 'কে তামারা? এখখুনি এখানে নিয়ে এস তাকে। যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবেই আন।'

তামারা এল, বারকেশ হুকুম করল, 'এই, মাদাম ম্যাগদার ঘরে এখখুনি যা। তাঁর গা-হাত-পা মুছিয়ে এখুনি সাজিয়ে নিয়ে আয় এখানে। আর তোরা সব ছুঁড়ীরা এখান থেকে পালা, কারও যেন টিকিটি দেখতে না পাই। দেখলেই ধরে নিয়ে যাব।'

খানিক পরে ম্যাগদা এল,—নির্ভীক, শান্ত, ধীর। তাকে দেখেই অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে একটু নত হয়ে তার করচুম্বন করলেন। বারকেশ সরে গিয়ে কাঠের পুতুলের মতো সিধে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়িউলী বলল, 'এর বিল শোধ করা এখনও বাকি আছে।'

ধমকে উঠল বারকেশ' 'যা, যা, ওসব হবে না।' অফিসার তাকে থামিয়ে বিলের টাকা শোধ করে বাইরে দাঁড়-করানো গাড়িতে তুলে ম্যাগদাকে নিয়ে চলে গেলেন।

তামারা ম্যাগদাকে যখন সাজাচ্ছিল, তখন দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল—

'তা হলে ম্যাগদা তুমি আর পাঁচজনের মতো নও।'

'না, ছিলামও না কোনদিন,' একটু হাসল ম্যাগদা।

'তুমি তা হলে বড়ঘরের মেয়ে?'

'না ভাই, বরং বড়ঘরের শত্রু আমি।'

'তা তুমি এখানে এলে কেন? পুরুষ-সঙ্গ-লাভে এতই যদি লোভ ছিল তা যেখানে ছিলে সেখানে কি কাউকে পটাতে পারতে না?'

ম্লান হাসি হাসল ম্যাগদা।—'তামারা, তামারা, আমার লক্ষ্মী তামারা, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আমি পাপিষ্ঠা নই? এখন পর্যন্ত আমি ঠিকই আছি।'

হো হো করে হেসে উঠল তামারা, 'আর হাসিও না, সতীশিরোমণি। রোজ ছ-সাত জন করে লোক বসাতেন, আর উনি ঠিকই আছেন। সতী!'

গম্ভীর হয়ে গেল ম্যাগদা। 'আচ্ছা, তামারা, তোমার তো বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। ধর, তুমি সত্যিই একটি ভালো মেয়ে, কিন্তু কেউ একজন জোর করে তোমায় বলাৎকার করল, তাতে কি তুমি ভ্রষ্টা হয়ে গেলে?'

'তা জানি না, তবে নষ্ট তো হয়ে গেলাম, ঠিক আগের মতনটি তো আর রইলাম না।'

'বেশ, ঈশ্বরের কাছে, কি দরদী স্বামীর কাছে, নয়ত ধর, তোমার নিজেরই কাছে, দোষী না নির্দোষ মনে করবে তখন?'

'নির্দোষই মনে করব অবশ্য।'

'আমারও ঠিক তাই। তুমি তা বুঝবে না, তামারা।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তামারা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ঐ অফিসারটি কে? তোমার স্বামী, না প্রেমিক, না ভাই?'

'কোনটাই নয়, ও আমার কমরেড—সঙ্গী।'

'ম্যাগ্‌ডচ্‌কা, তুমি যে মিথ্যে বলছ না, তা আমি বুঝতে পারছি, অথচ বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছ। তুমি যে একজন ভদ্রমহিলা, তা প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু বুঝিনি যে কেন তুমি এই পঙ্কে নেমে এলে। খুলেই বলি—এক-আধটু লেখাপড়া শিখেছিলাম আমি, এই যে ভাষাতে কথা বলছি, এ আমার মাতৃভাষা নয়। ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে এ ভাষায় কথা কইতাম আমি। কিন্তু আমি হচ্ছি জন্ম-বেদেনী, পাখির মতো চঞ্চল আমার মন, কোথায় যাবার জন্যে প্রাণ যে আমার উড়ু উড়ু করে, কোন্ ডালে গিয়ে বাসা বাঁধতে চায় সে, তা জানি না। কিন্তু, তুমি ম্যাগ্‌ডচ্‌কা, তুমি এখানে মরতে এলে কেন?'

হঠাৎ পাথরের মতো শক্ত, হিম হয়ে উঠল ম্যাগ্‌দার মুখখানা।

'হ্যাঁ,' শুকনো গলায় বলল সে, 'এই দলের মধ্যে এক হয়ে মিশে থাকবার জন্যে তুমি যে মুখোশ পরে আছ, অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছি তা। তবে জানতে এখন এতই সাধ তোমার, তখন আমিও খুলে বলি তোমায়। আমি একজন লেখিকা, গণিকা-বৃত্তির বিষয়ে লিখব বলে সে সম্বন্ধে জানবার জন্যেই আমার এখানে আসা, তারই জন্যে স-ব সয়েছি এখানে—সয়েছি সব-কিছুই।'

এতক্ষণে তামারার কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। সোজা হয়ে উঠে বলল সে, 'বেশ। তোমার সঙ্কল্পের সাধুতায় সন্দেহ করি না কিছু। তবে এই যে লেখিকার ব্যাপারটা বললে,—নাঃ! তোমার দৌড়ের পাল্লা আরও বেশি। তবে আজকের এই কথাবার্তা, কাকপক্ষীও টের পাবে না বলে দিলাম।'

'তা যা তোমার খুশি,' নিস্পৃহ কন্ঠে জবাব দিল ম্যাগ্‌দা, 'ধন্যবাদ।'

তারপর হঠাৎ যেন নরম হয়ে পড়ে, শক্ত করে বুকে চেপে ধরল সে তামারাকে, আবেগভরে চুমু দিয়ে তার কানে কানে বলল, 'তোমায় চিঠি দেব ভাই।'

তারপর আট মাস কেটে গেছে। রুশীয়ার আকাশে বাতাসে নানারকমের রাজনৈতিক বিপত্তি দেখা দিতে লাগল—খানাতল্লাশি আর গ্রেপ্তারি চলতে লাগল নানা জায়গায়।

একদিন হঠাৎ আনা মারকোব্‌নার গণিকালয় ঘেরাও করে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল, বাড়ির অতিথিদের সব আলাদা এক ঘরে সরিয়ে পুলিসের পাহারায় রাখা হল। যারা ঘুমিয়েছিল তাদের ঠেলে তোলা হল, খানাতল্লাশি চলল, নর্দমা পর্যন্ত বাদ গেল না। বোমা বা আপত্তিজনক কাগজপত্রাদির খোঁজ করা হল। পুলিস অফিসার প্রত্যেকটি মেয়েকে আলাদা করে একটি ঘরে ডেকে এনে ম্যাগ্‌দার বিষয়ে নানা-রকমের প্রশ্ন করতে লাগলেন—সে এখানে কি করত, কি বলত, কাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করত, কাকে চিঠি লিখত, কাউকে কখনও বই কিংবা অন্য কিছু দিয়েছে কিনা ইত্যাদি।

মেয়েরা কিছুই বুঝল না, ভয়ে ঘাবড়ে গেল, ঘেমে উঠল, চোখ মিটমিট করে মাঝে-মাঝে পুলিস অফিসারের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে অযথা ক্ষমা চাইতে লাগল, 'ধর্মাবতার,

আমার মাথায় বাজ পড়ুক, যদি আমি কাউকে খুন করে থাকি বা কারুর কিছু চুরি করে থাকি।'

তামারা ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে ম্যাগ্‌দার শেষদিনের কথাবার্তা সব বলে দিতে পারত, তাতে সে অন্য পাঁচজন মেয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যও হয়ে উঠত নিশ্চয়ই। কিন্তু সে সোজা বলে গেল, 'ওর বিষয়ে কি আর জানতে যাব, মশাই। আমাদেরই মতো একজন ছিল। বাইরে বোধহয় পুরুষমানুষ জুটত না, তাই এখানে পুরুষের খোঁজে মরতে এসেছিল।'

পুলিস চলে গেল, আর আসেনি। কিন্তু আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়ের পসার নষ্ট হতে বসল বুঝি! ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের অন্যেরা সোস্যালিস্টদের আড্ডা বলে এদের ঠাট্টা—ঠাট্টাও ঠিক নয়, ঘৃণা করতে লাগল।

কিন্তু একদিন তামারা হঠাৎ আড়াল থেকে শুনতে পেল বার্‌কেশ দারোগা বাড়িউলী আনা, তার স্বামী, আর খবরগিরনীকে বলছে—'তোমাদের ম্যাগ্‌দাকে মনে পড়ে? ওঃ, তিনি একটি গভীর জলের মাছ! কতবার যে নাম বদলেছেন তার লেখা-জোখা নেই। এমা তার যে পাশপোর্ট বদলে পুলিস থেকে হলদে টিকিট আনিয়েছে, তাতে তার নাম লেখা ছিল 'ওলগা লার্বিনিস্কায়া, বাদ্য-শিক্ষয়িত্রী'। এখানে এসেছিল কেন জান? বেশ্যাবৃত্তি শেখবার জন্যে।—চমকে উঠলে যে বড়ো? আরও শোন—তারপর করেছে কি, বেশ্যা সেজে সব বন্দরে গিয়ে নৌ-সেনাদের সঙ্গে মিশে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, জমিদারি-প্রথায় ও মহাজনি ব্যবসায় বড়লোকেরা নাকি আরও ফেঁপে উঠছে আর গরিবদের রক্ত শুষে খাচ্ছে, এই সব বলে সবাইকে খেপিয়ে বেড়িয়েছে। কেউ ধরতে পারেনি। তার কমরেডরা সব জায়গায় তাকে সামলে নিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কেন, ঐ যে ব্যাটা ক্যাপটেন দিব্যি কেমন মিলিটারি পোশাক পরে আমাদের দিয়ে ব্যাগ বইয়ে নিল, আর কেমন চোখে ধুলো দিয়ে চলে গেল! করেছিল কি জান? সরকারি কাগজে বেমালুম গবর্নরের নাম জাল করে লিখে, সোজা আমাদের পুলিসের বড়কর্তার কাছে এসে হাজির—হুকুম তামিল করতে হবে। বুকের পাটা দেখ একবার! তা বাছাধন এখন ধরা পড়ে সাইবেরিয়ায় গিয়ে সোনার খনি খুঁড়ছেন।'

'আর ম্যাগ্‌দা?' জিজ্ঞেস করল আনা।

'তাঁর হয়ে গেছে; গবর্নরের ওপর বোমা ছুঁড়েছিলেন, তাই তাঁকে ফাঁসিকাঠে লটকে দেওয়া হয়েছে।'

৬

সন্ধ্যার সুরভি অন্ধকার। ঘরের জানালাগুলো খোলা; পাতলা পর্দাগুলো মৃদু বাতাসে ঝিরঝির করে কাঁপছে; বাড়ির সামনের মরা বাগান থেকে ভেসে আসছে শিশির-ভেজা ঘাসের গন্ধ আর 'ত্রিনীতি' উৎসবের দিনে সদর দরজায় লটকানো সেই শুকিয়ে-আসা লাইলাক আর বার্চপল্লবের ক্ষীণ সুবাস।

লিউবা পরেছে নীল রঙের বুক-কাটা মখমলের ব্লাউজ, আর নিউরা সেজেছে যেন খুকি—পরনে তার হাঁটুপ্রমাণ ঝুলের গোলাপী ফ্রক, ঝকঝকে চুলের রাশ এলো করে ছড়ানো, কপালের দিকে তা আবার সামান্য একটু কোঁকড়ানো। জানালার পাশে ওরা দু'জন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, আর হাসপাতাল নিয়ে সেই যে গানটার আজকাল খুব চল্‌তি হয়েছে—গণিকামহলে গানটার খুবই কাটতি—সেই গানটা গাইছে তারা।

নিউরা গাইছে নাকী সুরে চড়া গলায়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিচু পর্দায় চাপা সুরে তান ধরে চলেছে লিউবা—

সেই তো আবার এল রে সোমবার,
আজ বাইরে আমায় করবে কারা পার!
ডাক্তার ক্রাস্‌সোব হেন পাজি—
ছেড়ে দিতে হয় না যে সে রাজি
—হায় রে পাজি...

সব গণিকালয়েরই জানালা দিয়ে আলো আসছে। সদর দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে লণ্ঠন। সোফিয়া বাসিলিয়েব্‌নার গণিকালয়টা সামনেই; লিউবা আর নিউরা দুজনেই তার ভেতর অবধি সব দেখতে পাচ্ছে। ওদের বাড়িও সাজানো হয়েছে। বাড়ির মেয়েরাও সেজেছে—আসছে যাচ্ছে তারা বিদ্যুতের ঝলকের মতো, আয়নার বুকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের চকিত ছায়া। ডানদিকে ত্রেপেল-এর গোল-গম্বুজ বাড়িখানা নীলাভ বিজলি আলোয় ঝলমল করছে।

ঈষৎ উষ্ণ শান্ত সন্ধ্যা। কোথায় দূরে, বহুদূরে, রেলপথ পেরিয়ে, ঘরবাড়ির কালো ছাদ আর গাছপালার কালো চূড়ো ডিঙিয়ে, ধরণীর গহিন বুকের মাঝে যেখানে বসন্তের বিপুল শ্যামলিমা চোখে শুধু ধাঁধা লাগিয়ে দেয় সেইখানে, সন্ধ্যার শেষ রক্তিমাটুকু ধূসরবর্ণের কুয়াশা ভেদ করে এসে যেন একটি ক্ষীণ সোনালী রঙের রেখা টেনে দিয়েছে মাটির কালো বুকে। এই আবছা সুদূরের আলোয়, এই সোহাগশীতল বাতাসে, আগন্তুক রাত্রির মদির গন্ধে, কি যেন এক গোপন মধুর বেদনার আভাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—বসন্ত আর গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণে প্রতি সন্ধ্যায়ই এমন একটি শান্ত করুণ উদাস ভাব জড়িয়ে থাকে। দূর থেকে শহরের অস্পষ্ট কলকোলাহল ভেসে আসছে, ভেসে আসছে তন্দ্রার মতো জড়িত বাঁশীর সুর, কানে আসছে গোরু-বাছুরের হাম্বারব। নিচে কে এক পথচারী চলেছে জুতো মস্‌মস্‌ ক'রে, ছড়ির আওয়াজ তার পথের উপর শনশন করে উঠছে। অলস মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলেছে গাড়ির চাকা ইয়ামার পথে। আর সব শব্দ, সমস্ত কোলাহল, সন্ধ্যার সেই স্বপ্নাতুর তন্দ্রায় কোন্‌ এক গভীর সৌন্দর্য আর কোমলতার মধ্যে যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের বুকে জ্বলছে রেললাইনের সবুজ আর লাল আলো, আর তারই মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠছে ইঞ্জিনের বাঁশী শান্ত সাবধান গীতচ্ছন্দের মতো।

আবার গাইতে লাগল তারা—

ওই যে রে ধাই-মা আসে ধেয়ে—
চিনি আর পিঠে নিয়ে,
পিঠে আর চিনি নিয়ে,—
দেখ্‌ সে এখন সব্বাইকে ও বেঁটে দেবে যেয়ে
—ওই ধাই-মা মেয়ে!

'প্রোখোর ইবানিচ! ও প্রোখোর ইবানিচ!' হঠাৎ গান থামিয়ে ডাক শুরু করে দেয় নিউরা।

প্রোখোর ইবানিচ হল এদিককার এক মদের দোকানের খিদমতগার। সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে সে হনহন করে ছুটে চলেছে, দেখে মনে হয় ধূসরবর্ণের একটা প্রেতমূর্তি যেন হনহন করে চলেছে পথ বেয়ে।

'আঃ, মোলো যা!' ডাক শুনে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে প্রোখোর ইবানিচ, জিজ্ঞেস করে, 'কি হল আবার?'

'তোর এক বন্ধুর সঙ্গে আমার আজ দেখা হয়েছিল। সে তোকে ভালোবাসা জানিয়েছে।'

'কেমন বন্ধু?'

'ছোট্টখাট্টো, খাসা দেখতে! শ্যামবর্ণ মনকাড়া মেয়ে।—নাঃ, তোর কিন্তু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কোথায় দেখা হল তার সঙ্গে।'

'বটে, কোথায়?' এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায় প্রোখোর।

'কোথায় আবার, এখানে—ওই কুলুঙ্গির ওপরে লটকানো রয়েছে, যেখানে মরা বেড়ালগুলোকে ফেলে রেখে দি আমরা!'

'বেড়াল! নচ্ছার পাজি কোথাকার!'

খনখনে গলায় হেসে ওঠে নিউরা সারা ইয়ামা কাঁপিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করে জানালার চৌকাঠের উপর শুয়ে পড়ে শূন্যে পা ছুঁড়তে থাকে। তারপর হাসি থামিয়ে হঠাৎ চোখ দুটো বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গোল গোল করে পাকিয়ে ফিসফিস করে লিউব্-কাকে বলে, 'জানিস ছুঁড়ী, কি সব্বনেশে কথা! আর বছর ও একটা মেয়ের গলায় ছুরি বসিয়েছিল—ওই আমাদের প্রোখোর। মাইরি বলছি!'

'তাই না কি! মেয়েটা মরে গেল?'

'না, মরেনি! সেরেই উঠল,' যেন একটু হতাশার সুরেই উত্তর দেয় নিউরা, 'তবে দুটি মাস পড়ে থাকতে হয়েছিল আলেকজান্দ্রোব্‌স্কায়া হাসপাতালে। ডাক্তাররা বলেছিল আর এই একরত্তি উঁচুতে লাগলেই অক্কা পেত ছুঁড়ী।'

'তা মারতে গেল কেন?'

'কি করে জানব? হয়ত টাকা চেয়েছিল, দেয়নি; নয়ত ছুঁড়ী মজেছিল আর কাউকে নিয়ে। ও ছিল ওর ভাবের মানুষ কিনা—ছিল ওর ঢ্যাম্না।'

'কিন্তু ওর কি শাস্তি হল?'

'কিছুই না। কোন প্রমাণই ছিল না। সেখানে তখন বেঁধে গিয়েছিল এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। শ-খানেক লোক মারামারি করছিল কেন যেন। কাজেই প্রোখোরই যে ফাঁক বুঝে ছুঁড়ীটার ওপর ছুরি চালিয়েছে, তা মাগী নিজেও টের পায়নি। পুলিসকে বলল, 'কারুকে সন্দেহ হয় না আমার।' তাই প্রোখোর বেঁচে গেল। প্রোখোরই শেষে দেমাক দেখিয়ে বলেছে, 'দুনকাকে যুৎসই তাগ কষতে পারিনি সেবার, কিন্তু মাগীকে সাবাড় করবই একদিন।' বলে, 'আমার হাত থেকে নিস্তার নেই ওর। ওকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটব।'

আতঙ্কে শিউরে ওঠে লিউবা। ভয়ে ভয়ে বলে, 'সব্বনেশে লোক এই ঢ্যাম্না-গুলো!'

'তা যা বলেছিস!' জবাব দেয় নিউরা, 'জানিসই তো আমাদের এই সাইমনের সঙ্গে পুরো একটি বছর ধরে ভাবের খেলা খেলে এসেছি আমি। কত বড় কশাই, ছুঁচো কোথাকার! সারা গায় একরত্তি আস্ত চামড়া ছিল না আমার। গা-ভর্তি শুধু আঁচড়-কামড়ের দাগ। কিছুর জন্যেই নয় কিন্তু—এমনি এমনি শুধু। সকালবেলায়ই আমায় কোন-একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দোর এঁটে দিত ও, তারপর শুরু করত অত্যাচার কখনও ওপরের হাতদুটোর মাংস খুবলে নিত, কখনও মাইদুটোয় মারত খামচি, কখনও গলা জড়িয়ে ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দম আটকে মারতে শুরু করত আমায়; নয়ত কখনও চুমো খাচ্ছে তো খাচ্ছেই আর শেষে ঠোঁট দুটো-কামড়াতে কামড়াতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার করে ছাড়ত—যন্ত্রণায় কাঁদতে শুরু করতাম আমি, আর ও সেটা চাইত! তারপর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পশুর মতো ও এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার ওপর। বলব কি, আমার টাকাকড়িগুলো পর্যন্ত সব কেড়ে নিত; এক বাক্স সিগারেট কেনবার পয়সা

পর্যন্ত রাখত না। ভীষণ কিপ্টে আমাদের এই সাইমন; খালি টাকা জমাচ্ছে—বলে, এক হাজার রুবল জমলে পর কোন-এক মঠে গিয়ে থাকবে।'

'তারপর?'

'ওর ঘরে গিয়ে দেখিস, ঠাকুর-দেবতার মূর্তিতে ভর্তি, যেন কত বড় ধার্মিক! ওর পাপের শেষ নেই কিনা, তাই অত ভক্তি। আসলে ও একটা খুনে।'

'বলিস্ কি!'

'যাক গে, ওর কথা এখন থাক, লিউবোচকা। আয় এখন গানটা শেষ করি।'

'দোকানে গিয়ে কিনব আমি বিষ।
আত্মহত্যা করতে আমায় দিস।'

জেনী ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে এক-একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে নিচ্ছে। কমলালেবু রঙের সাটিনের জামা পরেছে সে।

মান্‌কা তাসের নেশায় ভরপুর; পাশার সঙ্গে '৬৬' খেলছে। মান্‌কা পরেছে বাদামী রঙের জামা; ঐ জামাটা পরলে তাকে দেখায় যেন হাই স্কুলের ছাত্রী।

পাশা মেয়েটি কিন্তু ভারি অদ্ভুত। বড়ই দুঃখিনী সে—বহুকাল পূর্বেই গণিকালয়ের পরিবর্তে তার স্থান হওয়া উচিত ছিল মানসিক ব্যাধির কোন চিকিৎসালয়ে। সে ছিল এমন একটা মানসিক বিকারে পীড়িত যার ফলে যখন যে-কোন পুরুষই তাকে চাইত—তা লোকটা যত কুৎসিতই হোক না কেন—তখনই তার কাছে এক উন্মত্ত অসুস্থ আগ্রহে নিজেকে একান্তভাবে বিলিয়ে না দিয়ে থাকতে পারত না সে। পুরুষজাতির প্রতি গণিকাদের মধ্যে যে একটা সমবেত বৈরভাব আছে, পাশার এই দুর্বলতা তাকে যেন পদে পদে ক্ষুণ্ণ করে চলত। তাই তার সঙ্গিনীরা এই অপরাধের জন্য তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করতে কসুর করত না কখনই। পুরুষের কাছে আত্মদানের অসহ্য আনন্দে পাশা যে-সব আদর-সোহাগের কথা বলে ফেলত, হাসত, কাঁদত, গোঙাত—সে-সবই দু-তিনটে ছিটেবেড়ার আড়াল পেরিয়ে সবার কানে এসে পেঁছুত, আর তাই হুবহু নকল করে নিউরা পরদিন জুড়ে দিত হাসাহাসি।

গুজব, পাশা নাকি ভুলে, কি লোভে পড়ে, কিংবা টাকার জন্যে এখানে দেহের ব্যবসা করতে আসেনি—এসেছে সে ইচ্ছে করে, নিজের খেয়ালে। কিন্তু বাড়িউলী আর খবরগিরনী দুজনেই পাশার ওপর খুব খুশি, কারণ অন্য মেয়েদের চাইতে চার-পাঁচগুণ বেশি উপায় করত সে—হয়ত তার ঐ বিকৃত মস্তিষ্ক আর অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যেই বাঁধা খদ্দের ছাড়া তাকে সহজে যার-তার সামনে বের করা হত না; কারণ বাঁধা খদ্দেররা আবার পছন্দ করে না যে, তাদের বাঁধা মেয়েমানুষ অন্যের ভোগ্য হয়। বাঁধা খদ্দের পাশার অবশ্য অনেকগুলোই আছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই তাকে ভালোবাসেন। একটি জর্জিয়ান্ কেরানী—সে মদের দোকানে কাজ করে, আর একজন চালবাজ রেল-কর্মচারী—গরিব অথচ বড়ঘরের ছেলেই বটে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অথচ এই ব্যক্তি-নিরেপক্ষ যৌন-উন্মাদনা ছাড়া আর সব বিষয়েই পাশা নির্বিকার। তার মিষ্টি মুখখানিতে, আধো-ঢাকা চোখের দৃষ্টিতে, কোমল সিক্ত অলস ওষ্ঠাধরে, ইতিমধ্যেই একটা ক্ষীণ উন্মত্ততার আভাস চকিতে খেলে যেতে শুরু করেছে,—সেখানে সর্বদাই কেমন যেন একটা একরোখা অথচ সলজ্জ ভীরু আনন্দের হাসি লেগে আছে। অনবরত ঠোঁট চাটা তার একটা অভ্যাস; আর তার শান্ত মৃদু হাসি—সে হল অবোধের হাসি।

ঐদিকে সমাজের নির্মম খেয়ালে পীড়িত এই অবলা প্রাণীটি তার দৈনন্দিন জীবন-

যাত্রায় অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, অমায়িক, আর সম্পূর্ণ নির্লোভ—দ্বেষদ্বন্দ্বহীন। তার এই দুর্নিবার কামনার জন্যে অন্তরে অন্তরে লজ্জিতও বটে। তার সঙ্গিনীদের প্রতি তার হৃদয়ে অপার মমতা, তাদের আদর-সোহাগ করে, চুমু খেয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরতে, তাদের সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমুতে সে বড় ভালোবাসে। তবুও মনে হয় প্রত্যেকেরই তার প্রতি কেমন যেন একটা বিরাগ রয়েছে।

'মান্নেচ্‌কা, লক্ষ্মীটি আমার'—মান্‌কার হাত ধরে আদর করে বলে পাশা,—'আমার হাতটা একবার গুনে বল না, ভাই!'

'আ-চ্ছা, আ-চ্ছা',—ছোট্ট খুকির মতো ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে জবাব দেয় মান্‌কা; 'আর একটু খেলে নি, দাঁড়া।'

'মান্নেচ্‌কা, মানিক আমার, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, আমার মনি,' বায়না ধরে পাশা।

বাধ্য হয়ে মান্‌কা তাসের তাড়া কোলের ওপর নামায়। সপাৎ করে বেরিয়ে আসে এক তাড়া হরতন, রুইতন, আর দলবল নিয়ে চিড়িতনের রাজা। উল্লাসে দুহাত এক করে পাশা,—'আহা, এই যে আমার লেবান্‌শিক! আজ সে আসবে বলে কথা দিয়ে গেছে। লেবান্‌শিক আজ নিশ্চয়ই আসবে।'

'এ হচ্ছে তোর সেই জর্জিয়ান বাবু?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই আমার জর্জিয়ান বন্ধু।—আহা, কি যে লক্ষ্মীটি সে! তার কাছছাড়া হতে একটুও ইচ্ছে করে না আমার। সেবার এসে সে আমায় কি বলেছিল জানিস্? বলেছিল, 'যদি এই খেলাঘরে থাক তবে তোমায় খুন করে নিজে মরব আমি।' আর কি করে যে চোখ পাকিয়ে চেয়েছিল সে আমার দিকে, তা যদি দেখতিস!'

কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় জেনী, রাগত ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'কে বলেছে এ কথা?'

'কেন, লেবান! আমার সেই জর্জিয়ান বন্ধু। বলে, 'তোমারও মরণ, আমারও মরণ।'

'ও, ঐ তোর জর্জিয়ান বাবু। ও তো একটা আর্মেনিয়ান। তুই যেন নেকী।'

'না, ও জর্জিয়ান।'

'আমি বলছি ও আর্মেনিয়ান। নেকী কোথাকার!'

'কেন গালমন্দ করছিস, ভাই? আমি কি তোকে গালমন্দ করেছি?'

'করেই দ্যাখ না! নেকী কোথাকার! ও কে তাতে তোর কি এসে যায়? তুই ওকে ভালোবাসিস বুঝি—অ্যাঁ?'

'বাসি।'

'নেকী আমার! তুই তো সেই টুপি-পরা রেলের খোঁড়া লোকটাকেও ভালোবাসিস।'

'তাঁকে শ্রদ্ধা করি আমি।'

'আর ঐ খাতা--লিখিয়ে নিকি? তারপর সেই ঠিকেদারটা? তারপর ঐ গোল আলুর মতন লোকটাকে—ঐ আন্‌তোশ্‌কা-কার্‌তোশ্‌কা? তারপর ঐ মোটা অভিনেতাটা? ওর সঙ্গেও তো তোর খুব—; উঃ, বেহায়া কোথাকার! তোর দিকে চোখ তুলে চাইতেও ঘেন্না হয়। তুই একটা কুত্তী! একসঙ্গে অতগুলো নাগর! আমি হলে গলায় দড়ি দিতাম। নোঙরা জানোয়ার কোথাকার!'

ছলছল করে ওঠে পাশার দুচোখ। মান্‌কা তার হয়ে বলে, 'কেন তুই ওকে অমন করছিস্, জেন্‌কা?'

'বটে!'—খেপে যায় জেনী, 'তোরা সবাই সমান। মানমর্যাদা বলে কিছুই নেই। কোন্ এক ঘাটের মড়া আসবে, একমুঠো খাবারের মতো কিনে নেবে তোকে, গাড়ির মতো ঠিকে-দরে ভাড়া করবে, তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে ডলাইমলাই করে থুঃ করে ফেলে

দিয়ে চলে যাবে! আর তাতেই গলে যাবি তোরা! ক'কিয়ে বলতে থাকবি কি সুখ, প্রিয়তম, কি আনন্দ! থুঃ!' ঘৃণায় থুথু ফেলে জেনী।

তারপর উত্তেজনায় সারা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে থাকে সে।

আর এদিকে তখন চলেছে সুরভোলা তালকানা বেহালা-বাদকদের নিয়ে পিয়ানো-বাদক আইজাক ডেভিডোবিচের বাজনার মহড়া।

'ও রকমটি নয়, ও রকমটি নয়, ইসাইয়া সাবিচ। এই এক লহমার জন্যে বন্ধ করুন দিকিনি আপনার বাজনা। শুনুন মন দিয়ে। এই হচ্ছে আসল তান।'

এই বলে এক আঙ্গুলে পিয়ানোর সুর তুলতে তুলতে, ছাগবিনিন্দিত কালোয়াতি গলায় তানটা বুঝিয়ে দেন তিনি। 'এস্-তাম্, এস্-তাম্, এস-তিয়াম্-তিয়াম্। নিন, ধরুন আমার সঙ্গে প্রথম কলিটা। প্রথমে ফাঁক,—এই—অ্যাঁয়্, জ্যাঁয়্—'

পিয়ানো-যন্ত্রের উপরে কনুইয়ের ভর দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে এদের মহড়া দেখতে থাকে কটা-চোখী, গোলমুখী, বাঁকা ভুরু জো—মুখখানা তার সস্তা রুজ আর সাদা রঙে নির্মম ভাবে ঘষামাজা; তার সঙ্গে রয়েছে ছিপছিপে গড়নের মেয়ে ভেরা—মদের ঝাঁঝে ঝলসে গেছে মুখখানা তার, পরেছে সে ঘোড়-সহিসের সাজ। বহু চেষ্টার পর শেষ অবধি সঙ্গত যখন ঠিক হল, ছোট্টখাট্টো গড়নের ভের্কা এসে দাঁড়াল বিপুল-কায়া জো-র সামনে—পুরুষের বেশে, অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে, এবং এসেই পুরুষের ভঙ্গিতে কৌতুক ভরে সেলাম ঠুকল তাকে; তারপর মহাফুর্তিতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল তারা।

চঞ্চলা নিউরা—সব রকমের খবর জানাতে সেই হচ্ছে অগ্রণী—হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে জানালার উপর থেকে, চেঁচিয়ে বলে, একটা জমকালো ফিটন গাড়ি আসছে তাদের বাড়ির দিকে। সবাই দেখতে ছুটে যায় জানালার ধারে—যায় না কেবল মানিনী জেনী।

জমকালো পোশাক পরে দাড়িওয়ালা কোচোয়ান গাড়ির উপর বসে আছে—মন্দ দেখাচ্ছে না।

নিউরা সেখান থেকে চেঁচাতে শুরু করে দেয়,—'ও কোচোয়ান খুড়ো, একটু গাড়িতে চড়াও না, মাইরি!'

মুচকি হেসে কোচোয়ান খুড়ো আঙ্গুল নেড়ে কি যেন ইঙ্গিত করে, ঠিক বোঝা যায় না। ঘোড়াটা যেন ঠিক এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। খটাখট পা ফেলতে ফেলতে তাদের চোখের সামনেই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এমন সময় শোনা যায় এমার গলা—'এ সব কি বেহায়াপনা! ছি, ছি, কেলেঙ্কারি! আমি জানি নিউরাই হচ্ছে পালের গোদা।'

এমাও কালো পোশাক পরে বেশ করে সেজেছে। সে সবাইকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। সামনের সোফিয়া বাসিলিয়েব্নার গণিকালয়ের সামনেই দুটো গাড়ি এসে দাঁড়ায়। ইয়ামার রাস্তায় আস্তে আস্তে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে।

সাইমন একজন লোককে নিয়ে ঘরে আসে। জেনী সেইভাবেই ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। মনে মনে বলতে থাকে, 'কে যেন এল মোটাসোটা, কারুর বাবা নিশ্চয়ই লোকটা!' এমা তাড়া দেয়,—'মেয়েরা সব বৈঠকখানা ঘরে যাও।'

এক এক করে সবাই এসে হাজির হয় বৈঠকখানায়। তামারা আসে হাত-কাটা জামা আর ঝুটো মুক্তার মালা গলায়, পিছনে পিছনে আসে মুটকী কিটি। তারপর সবুজ রঙের জামা পরে আসে নতুন মেয়ে নীনা। তারপর একে একে মান্কা, ইহুদী সোন্কা, সবাই এসে জড়ো হয় বৈঠকখানায়।

৭

প্রথমে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক দু-হাতের তালু ঘষতে ঘষতে গম্ভীর চালে লিউব্‌কার পাশে এসে বসেন। কায়দা-দুরস্ত গণিকার মতো স্কার্টটা সামান্য একটু তুলে অভ্যর্থনা জানায় লিউব্‌কা।

'তারপর মিস'—কথা পাড়তে যান ভদ্রলোকটি।

'বলুন,' উত্তর দেয় লিউব্‌কা।

'খবর সব ভালো?'

'এই চলছে, ধন্যবাদ! সিগারেট আছে?'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'পুরুষ মানুষ সিগারেট খায় না! আসুন তবে লেমনেড খাই। আমার বেশ ভালো লাগে।'

ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন। লিউব্‌কা বলে যেতে থাকে, 'বাপস কি কিপ্‌টে! আপনি সরকারী কর্মচারী বুঝি!'

'না, আমি হচ্ছি শিক্ষক, জার্মান ভাষা শেখাই।'

'কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে।'

'হতে পারে। রাস্তায় হয়ত।'

'একটা কমলালেবু খাওয়ান অন্তত।'

ভদ্রলোক আবার চুপ! কিন্তু তাঁর চোখ দুটো চারদিকে মেয়েদের মধ্যে ঘুরছে। মুটকী কিটির শরীরখানা বেশ নিটোল বটে, তবে মোটা মেয়েরা আবার কামকলায় অপটু. তা ছাড়া মুখখানাও ওর সুন্দর নয়। ভেরা মেয়েটা মন্দ নয়—দিব্যি ছোট ছেলের মতো দেখতে; সাদা আঁটসাঁট পায়জামা পরেছে বলে উরুৎ দুটিতে বেশ বাঁধুনি আছে মনে হয়। ছোট মান্‌কাকে স্কুলের ছাত্রীর মতো দেখাচ্ছে। গরবিনী জেনীর মুখখানি কিন্তু বেশ। তা জেনীকেই ঠিক করা যাক। 'নাঃ, দরকার নেই'—ভাবতে লাগলেন খদ্দেরমশায়। 'মেয়েটার বড্ড দেমাক; একবার ফিরেও চাইছে না, বোধহয় দর বেশি।' ভদ্রলোক হিসেবি, তাই হঠাৎ কিছুই করে বসলেন না। সংসারী লোক। মেয়ে-স্কুলের মাষ্টার, ছাত্রীদের দেখেন আর জ্বলেপুড়ে মরতে থাকেন। ভাগ্যিস, তিনি কৃপণ আর ভীতু, তাই ছাত্রীরা কিছু টের পায় না। বেচারা অনেকদিন ধরে পয়সা জমিয়েছেন, গাড়িতে চড়েননি, ইচ্ছে থাকলেও মদ কিনে খাননি, এই করে কিছু কিছু জমিয়ে বছরে দুই-তিন বার নারীমাংসের স্বাদ নিতে আসেন তিনি, তাও আবার অনেক ভেবে-চিন্তে। সস্তা হওয়া চাই, একটুতেই মজা ফুরিয়ে গেলে চলবে না, আবার খারাপ রোগের চিন্তাও আছে। আর বাস্তবিকই তাঁর এই টাকাটার জন্যে চানও তিনি অনেক কিছু. চান অসম্ভব রকমেরই কিছু। তাঁর ভাবপ্রবণ জার্মান অন্তরাত্মা অজান্তে, অস্পষ্টভাবে গণিকার পাষাণ-মূর্তির কাছে কামনা করে অপাপবিদ্ধ সারল্য, কুমারীর শুচিশুদ্ধ যৌবন-ভীরুতা, আত্মদানের সুমধুর কাব্য। অথচ পুরুষ মানুষ হিসেবে অন্তরে অন্তরে এ স্বপ্নও রচনা করতেন তিনি, করতেন এই কামনা, এই দাবি যে, তাঁর সোহাগ-স্পর্শে নারীর অন্তরাত্মা উঠবে উদ্বেল হয়ে, দেহে রোমাঞ্চ ও কম্পন জাগবে, দেহমন মধুর অবসাদে অবশ হয়ে পড়বে।

'না হয়' বলল লিউব্‌কা, 'একটা পলকা বাজাতেই বলুন। একটু নাচুক মেয়েরা।'

তা একরকম মন্দ নয়। নাচতে নাচতে বরং সাহস বাড়ে, তখন পছন্দমতো কাউকে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে যাবে। নইলে এভাবে সকলের চোখের

সামনে থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে আসা, যেন কেমন লাগে। মাষ্টার মশাই মনে মনে রাজি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাতে কত লাগবে?'

'কত আবার! চতুরঙ্গ হলে আধ রুবল, এমনি নাচের জন্যে ত্রিশ কোপেক। চলবে এতে?'

'বেশ, শুরু হোক তবে, আপত্তি নেই আমার।' দিলদরিয়া মেজাজের ভান করে বললেন ভদ্রলোক। তারপর পিয়ানোযন্ত্রের উপরে রুপোর একটা টাকা রেখে বাজনা বাজাবার হুকুম দিলেন তিনি বাজিয়েদের।

হাত বাড়িয়ে টাকাটা পকেটে ফেলে জিজ্ঞেস করে ইসাইয়া সাবিচ্, 'কি হবে? ওয়াল্‌জ্? পল্‌কা? না, পল্‌কা-মাজোর্‌কা?'

'মানে—এই যা হোক—'

'তবে ওয়াল্‌জ্ চলুক,' চেঁচিয়ে ওঠে ভেরা, নাচেতে ভারি আমোদ তার।

'না, পল্‌কা!—ওয়াল্‌জ্—বেঙ্গার্গা'—যার যা খুশি চেঁচাতে থাকে মেয়েরা।

'না, পল্‌কা হবে।' লিউব্‌কা বলে, 'আমার বরের হয়ে বলছি আমি,' বলেই লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'তাই না গা?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নেন মাষ্টার মশাই। লিউব্‌কাও রাগ না করে নিউরাকে নিয়ে নাচতে উঠে যায়। সবাই ঘুরে ফিরে দলে দলে নাচতে থাকে। তখন সাহস করে মান্‌কার কাছে গিয়ে বলেন ভদ্রলোকটি, 'তুমি চল।' হেসে রাজি হয় মান্‌কা।

মান্‌কা তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। রুপবিলাসিনীদের ঘর যেমনটি হওয়া দরকার তেমনি করেই সাজানো। আর্শি, ফুল, খাট, বিছানা, ছবি—সবই রয়েছে। বিছানা লাল চাদর দিয়ে ঢাকা। একটা লাল আলো ঝুলছে। একটা গোল টেবিল, আর তিনটে চেয়ারও রয়েছে।

বডিস্ খুলতে খুলতে মান্‌কা বলে, 'ওগো প্রিয়তম, একটা লেমনেড কি লফেৎ হবে নাকি?'

'পরে হবে; তা এখানকার লফেৎ কি ভালো?' এড়াবার চেষ্টা করেন মাষ্টার মশাই।

'হ্যাঁ ভালো।' মান্‌কা যেন ছিনে জোঁক। 'এক বোতলের দাম দু-রুবল, তবে যদি মনে কর বেশি খরচ হল, তা হলে না হয় বীয়ারই আনাই।'

'বেশ।'

'আর আমার জন্যে লেমনেড, না হয় কমলালেবু।'

'বরং লেমনেড খেতে পার, কমলালেবু নয়। পরে হলেও হতে পারে, এমন কি শ্যাম্পেনও খাওয়াতে পারি যদি আমাকে খুশি করতে পার।'

'তা হলে কিন্তু চার বোতল বীয়ার দু-বোতল লেমনেড আনাই। ঠিক তো? আর একখানা চকোলেট কেক আমার জন্যে! কেমন?'

'না না, বড় জোর দু-বোতল বীয়ার আর এক বোতল লেমনেড। আর-কিছু নয়। এ সব ছ্যাঁচড়ামো ভালো লাগছে না আমার।'

'আমার এক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করব?'

'না না, ও সব বাদ দাও।'

মান্‌কা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, 'দু-বোতল বীয়ার আর আমার জন্যে একটা লেমনেড চাই।'

সাইমন ট্রেতে করে এনে বোতলের মুখ খুলে দিয়ে যায়। পিছন পিছন আসে যোসিয়া,—'বাঃ, এ যে দেখছি বিবাহ-উৎসব চলেছে এখানে। বেশ বেশ!'

যোসিয়াকে দেখিয়ে মান্‌কা মাষ্টার মশাইকে বলে, 'ভাই, একে একটু বীয়ার খাওয়াবে না?' বলেই যোসিয়াকেও একপাত্র খাইয়ে দেয়।

মাষ্টার মশাইও তাঁর বীয়ার শেষ করেন। যোসিয়া বলে, 'এইবার দামটা দিন।'

'বাব্বাঃ, এত তাড়া! আমি কি পালাচ্ছি!' চটে যান মাষ্টার মশাই।

'রাগ করবেন না।' জবাব দেয় যোসিয়া খবরগিরনী। 'মান্‌কার পাওনা পরে তাকেই না হয় দেবেন। আমি শুধু বীয়ার আর লেমনেডের দামটা চাইছি। আবার বাড়িউলী মাসীকে হিসেব দিতে হবে কিনা। দু-বোতল বীয়ারের দাম হয়েছে এক রুবল আর লেমনেডের ত্রিশ কোপেক—মোট এক রুবল ত্রিশ কোপেক।'

'তার মানে এক বোতল বীয়ারের দাম আধ রুবল! দোকানে তো বার কোপেকে পাওয়া যায়।'

'তবে দোকানে গেলেই হত। নামকরা বাড়িতে এলে এই রকমই দাম দিতে হয়। আমাদের এখানকার মতো সব বাড়িতেই এই দাম। বেশি চাইনি, দিন এখন দাম।' যোসিয়াও গরম গরম বলে যায়। কাজেই সুড়সুড় করে দামও বেরিয়ে আসে।

'আর কেউ যেন ঘরে এসে না ঢোকে।' জার্মান মাষ্টার বলেন।

'নাঃ, কেউ আসবে না।'

যোসিয়া বেরিয়ে যায়। মান্‌কা দরজায় খিল দিয়ে এসে জার্মান মাষ্টারের হাঁটুর উপরে বসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে।

প্রেমের অভিনয় করবার আগে একটু চেনা-পরিচয় হওয়া দরকার। তাই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কতদিন আছ?'

'বেশি নয়, তিন মাস মোটে।' মিথ্যে কথা।

'বয়স কত তোমার?'

'ষোল।' পাঁচ বছর কমিয়ে বলে।

নিচু হয়ে জুতো খুলতে খুলতে মাষ্টার মশাই বলেন, 'এত কম বয়সে এখানে এলে কেমন ক'রে?'

'আমাদের দেশে একজন অফিসার প্রথমে নষ্ট করে। মা ছিলেন খুব কড়া লোক। ভয় হল যদি জানতে পারেন তবে গলা টিপে মেরে ফেলবেন। তাই পালিয়ে গেলাম। পরে সাত ঘাটের জল খেতে খেতে এখানে ছিটকে এসে ঠেকেছি।'

'সেই অফিসারকে তুমি ভালোবাস না আর?'

'সে কথা শুনে—হ্যাঁগা, আলোটা জ্বলবে, না, নিবিয়ে দেব? বরং একটু কমিয়ে দিই!'

'তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে? কি নাম তোমার?'

'মান্যা। সত্যি কথা বলতে কি ভালো লাগে না এখানে।'

জার্মান মাষ্টার মান্‌কার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বললেন, 'কাউকে ভালোবাস না? এখানে তোমার মনের মানুষ কেউ নেই?'

'নাঃ! আমার বরং তোমাকে ভাই, বেশ মনে ধরেছে। কেমন মোটাসোটা গোলগাল।'

মাষ্টার মশাই খানিকক্ষণ কি যেন একটু ভাবলেন। তারপর সব পুরুষই নারীদেহ ভোগ করবার আগে যেমন করে বলে, তিনিও তেমনি বললেন, 'আমার মারিচেন, আমিও তোমাকে ভালোবেসেছি। তোমাকে আমি আমার কাছে নিয়ে রাখব।'

'কিন্তু তোমার তো বউ আছে গো।'

'আমি বউকে নিয়ে ঘর করি না। সে ভালোবাসতে জানে না।'

'আহা বেচারি! যদি জানতে পারে তা হলে বড় কষ্ট পাবে।'

'ওসব কথা ছাড়। শোন, মেরি, আমি তোমারই মতো একটি নম্র ধীর সুন্দরী

মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার পয়সা আছে। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে তোমায় নিয়ে থাকব। যাবে আমার সঙ্গে?'

'বেশ তো!'

মাষ্টার মশাই মান্‌কাকে আবার চুমু খেয়ে বললেন, 'তোমার কোন অসুখ বিসুখ নেই তো?'

'নাঃ! ডাক্তার এসে প্রতি শনিবার আমাদের পরীক্ষা করে দেখে যায়।'

মিনিট পাঁচেক পরে মান্‌কা মাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এল। মাষ্টার মশাইয়ের দেওয়া দক্ষিণা আজ তার বউনি, তাই রুবলে থুথু দিয়ে (যাতে কেউ চোখ দিতে না পারে) মোজার মধ্যে গুঁজে রেখে দিল সে। মন-ভোলানো কথার শেষ হল।

আমাদের জার্মান মাষ্টারকে মান্‌কা কিন্তু খুশি করতে পারেনি। মান্‌কা নাকি প্রেমের ব্যাপারে একেবারে কাঠ। তাই মাষ্টার মশাই যোসিয়াকে ডেকে পাঠালেন।

মান্‌কা এসে বলল, 'যোসিয়া, আমার নাগর তোমায় তলব পাঠিয়েছে।' মান্‌কা আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করতে লাগল।

যোসিয়া তাঁর কাছ থেকে ঘুরে এসে পাশাকে বাইরের বারান্দায় ডেকে এনে কি যেন বলে, ঘরে এসে মানকাকে বলল, 'এ কি রকম, মান্‌কা? ভদ্রলোক তোমার নামে নালিশ করলেন; বললেন, তুমি নাকি মেয়েমানুষই নও—এক টুকরো কাঠ, না, এক চাঁই বরফ। আমি তাঁর কাছে পাশাকে পাঠালাম।'

মান্‌কা ঘৃণায় থুথু ফেলে বলল, 'আরে রামোঃ, ও একটা পুরুষ-মানুষ নাকি! কেবল বকবক করতেই জানে। আর খালি প্রশ্ন, চুমু খাচ্ছি, ভালো লাগছে? মেজাজ ভালো তো? বুড়ো হাবড়া, আবার বলে, তোমায় নিয়ে গিয়ে বাঁধা রাখব।'

'ও রকম সবাই বলে, নতুন কিছু নয়।' মন্তব্য করে জো।

জেনীর মেজাজ আজ সকাল থেকেই বিগড়ে রয়েছে। মান্‌কার কথা শুনে সে যায় আরও খেপে। 'ইতর বদমায়েশ কোথাকার! বুড়ো নোঙরা জানোয়ারটাকে আমি হলে তার কান ধরে আর্শির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতাম, 'দ্যাখ আগে নিজের চেহারাখানার কেমন ছিরি! আরও কেমন খুবসুরৎ দেখায় যখন কপালে চোখ তুলে আর মুখে ফেনা কেটে মেয়েমানুষের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিস। তোর ঐ দুটো রুবলের জন্যে আমার মনপ্রাণ পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হবে নাকি রে, পাজি হতভাগা!'

'জেনী, চুপ!' ধমক দেয় এমা।

'না, না!'—ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জেনী।

৮

ক্রমে বৈঠকখানায় অতিথি এসে জমতে থাকে। রলি-পলি আসে। সারা ইয়ামাই বহুদিন থেকে চেনে তাকে,—লম্বা, রোগা, বুড়ো, আমুদে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কাটায় সে কোন-এক অতিথিশালার খেলাঘরে, সর্বদাই আধ-মাতাল অবস্থায়; হাসিমস্করার কথা, চটকদারি গল্প, আর প্রবাদ-প্রবচন আওড়ায় সে দিনরাত। সবার সঙ্গেই তার ভাব। বাড়িউলী থেকে শুরু করে ঝিটা পর্যন্ত তাকে খানিকটা অবজ্ঞার চোখেই দেখে থাকে, তবে তার উপরে কারও বিন্দুমাত্রও বিরূপ ভাব নেই। এককালে লোকটাকে দিয়ে অনেক কাজও আদায় হত। মেয়েরা তাদের নাগরদের কাছে চিঠিপত্র পাঠাত ঐ রলি-পলির মারফত, আবার দরকার হলে দোকানে বাজারেও সে-ই ছুটত।

অতিথিদের হাত-উড়ানি কাজ করে যা পেত, সবই আবার সে ঐ-সব মেয়েদের পিছনেই খরচ করে ফেলত।

'রলি-পলি যে!' দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিউরা।

'হ্যাঁ, আমিই বটে,—এই আনন্দরাজ্যের একজন মাননীয় পারিষদ। কৈ প্রিন্স বটল্‌কিন, কাউন্ট লিকিয়োর্কিন, ব্যারন হোয়াটিন্‌কেভিচ গিন্দ-পোভ্‌স্কি—মিষ্টার বিটোফেন, মি. চোপিন, বাজাও, বাজাও বাজনা!'

ঠাট্টা-ইয়ারকি করতে করতে রলি-পলি মুটকী কিটির পাশে এসে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে কিটি তার একখানা গোদা ঠ্যাং রলি-পলির হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। রলি-পলি কিছু না বলে সিগারেট পাকাতে আরম্ভ করে।

'ঐভাবে কাগজে সিগারেট পাকাতে বিরক্ত লাগে না?'—কিটি জিজ্ঞেস করে।

'বি-র-ক্ত! বল কি? শোন তবে—

রে সিগারেট! গোপন প্রিয়া।
তোরে ভালো না বেসে বাঁচে কি হিয়া?
নয় গো নয় এ নয় খেয়ালে,
এ বিধিলিপি সব কপালে—
তাই সবারি চুম
ছুটায় ধুম—
—ছুটায় ধুম ও তোর অধরে।
আয় রে সখী, মোর অধরে।'

'এই তো, এখুনি বুঝি গলা-খাঁকারি শুরু করবে রলি-পলি,' নিরাসক্ত ভাবে মন্তব্য করে কিটি।

'সে আর এমন শক্ত কাজটা কিসের!'

'রলি-পলি, এর চেয়েও মজার কথা কিছু বল তো শুনি,' আবদার করে বলে ভেরকা।

হুকুম মাত্রই এক কৌতুককর ভঙ্গিতে আপত্তি জানাতে শুরু করে দেয় রলি-পলিঃ

'আকাশে অনেক তারা,
গুনতে কি সব যায় রে পারা?
হুঁ হুঁ হুঁ বয় যে বাতাস,
কয় যে কানে 'হুঁ',
তবু হায় কাজের বেলায়
শুধুই ঢুঁ ঢুঁ ঢুঁ।
শুধু ফুলেরা ফুটছে বনে
গন্ধেতে ভোঁ ভোঁ,
আর পাখিরা তান ধরেছে—
কোঁকর-কোঁ কোঁ-কোঁ॥

'আর এই শোন তবে এক মন-মাতানো ছড়া,'—বলেই কাঁপা কাঁপা গলায় চড়া সুরে গান জুড়ে দেয় রলি-পলি।

'রাজার লোক যাচ্ছে ঘোড়ায় ধেয়ে।
পেছনে তার ছুটছে সে এক মেয়ে—
ইচ্ছেটা তার—লোকটা যেন বিয়ের
কথাটা তার পাড়ে তারই কাছে,
তবু লোকটা সে কি চায় রে ফিরে পাছে?

বরং মুচড়ে গোঁফ যায় যে ঘোড়ায় ধেয়ে।
তবু ছোটে মেয়ে॥

এইভাবে ভাঁড়ামির চূড়ান্ত করে সন্ধ্যা থেকে রাতভোর গণিকালয়ের বৈঠকখানায় কাটিয়ে দেয় রলি-পলি। মেয়েরা তাকে তাদেরই একজন বলে জানে; নিজেদের খরচেই তারা রলি-পলিকে বীয়ার আর ভদ্‌কা খাইয়ে দেয়।

একটু পরেই আসে একদল থিয়েটারের লোক, এসেই তারা খুব হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেয়। শুরু হয় থিয়েটারের গালগল্প আর কেচ্ছা; তারপর তাই থেকে ওঠে থিয়েটারের মালিকদের কথা, শেষটায় তাদের বউদের কথাও বাদ যায় না। তারপর মদ আর নাচ-গান-হল্লা। শেষে 'আবার আসব' বলে কেটে পড়ে তারা। মেয়েদের ধারেও কেউ ঘেঁষে না। তারপর আসে একদল সরকারী কর্মচারী আর জনকয়েক ছোকরা। কয়েকজন অফিসারও আসেন তাদের সঙ্গে—আত্মসম্মানের জ্ঞানটুকু তাঁদের আবার ষোল আনা আছে। দেখতে দেখতে বৈঠকখানা ঘর গোলমাল আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়।

সোন্‌কার বাঁধা বাবুও আসেন। আসেন তিনি প্রায় প্রতিদিনই। এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে থাকেন তিনি প্রেয়সীর মুখের দিকে তাকিয়ে—দুঃখ বেদনা হতাশা হাহাকার ভরা সে-চোখের দৃষ্টি। কেন সোন্‌কা মরতে এল এখানে, কেন করেছে সে কুলত্যাগ, ছেড়েছে ধর্ম, জলাঞ্জলি দিয়েছে সমাজ সংসার পরিবার সবকিছুকে —তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বচসা হয় ওদের দু-জনের মধ্যে।

আড্ডা-ইয়ার্কি নাচগান হৈ-হল্লায় বৈঠকখানাটি যখন বেশ সরগরম জমজমাটি হয়ে ওঠে তখন প্রায়ই যোসিয়া এসে বেঁকিয়ে চুপি চুপি বলে বাবুটিকে, 'এখানে হাঁ করে বসে কেন? যাও না, বাপু, ছুঁড়ীটাকে নিয়ে নিরিবিলি একটু সময় কাটাও গে যাও!'

এরা দু-জনেই জাতে হচ্ছে ইহুদী। দু-জনেরই জন্মভূমি হোমেল শহর। বিধাতা দুটিকে সৃষ্টি করেছিলেন যেন পরস্পরকে নিবিড় ভাবে ভালোবাসার জন্যই শুধু। কিন্তু ঘটনাচক্রে—বিশেষত সেই যে তাদের শহরে সেবার জনসাধারণ মেতে উঠেছিল ইহুদী-নিধন পর্বে, তারই ফলে, হতবুদ্ধি আর বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে এবং যথাসর্বস্ব খুইয়ে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছিল। তারপর আবার কত দুঃখ-কষ্টের পর এরা পরস্পরের সন্ধান পেয়েছে। বিস্তর দুঃখকষ্ট অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করে, লোকটা শেষে এখানকার একটা ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। নাম তার নেমান। ভারি ধর্মভীরু লোক এই নেমান, আর বেশ গোঁড়া ইহুদীও বটে। সে জানে সোন্‌কাকে দেহবণিকদের কাছে বেচে দিয়েছিল সোন্‌কার মা নিজে—তারপর বারবার বিকিকিনির মধ্য দিয়ে হাতবদল হতে হতে শেষটায় এখানে এসে ঠেকেছে হতভাগী। এসব কথা তার মনে পড়ে, আর অন্তরাত্মা থেকে থেকে শিউরে ওঠে—যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় সে আপনার মধ্যে। তবুও তার ভালোবাসা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাই প্রতি সন্ধ্যায় নেমান এসে হাজির হয় আনা মারকোব্‌নার এই বৈঠকখানায়। দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে থেকে তার স্বল্প আয় থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যেদিন সে দুই রুবল জমিয়ে তুলতে পারে, সেদিন এসেই সোন্‌কাকে নিয়ে সোজা চলে যায় তার ঘরে। কিন্তু তাতে করে শেষ অবধি তাদের কেউই সুখী হতে পারে না—ক্ষণিক দৈহিক সম্ভোগের যখন অবসান ঘটে, তখন তাদের মধ্যে শুরু হয় পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, আর তার ফলে কান্নাকাটি—ব্যর্থতার হতাশা। তাদের হিব্রু ভাষায় ঝগড়া কেউ বুঝতে পারে না বটে, তবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর সোন্‌কার রাঙা চোখ আর ফুলো ফুলো গাল দেখে সবাই বুঝতে পারে—বেশ একটা ঝড় বয়ে গেছে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু প্রায়ই নেমানের হাতে টাকাকড়ি কিছু থাকে না। সে এসে সারা সন্ধ্যা

নীরবে বসে থাকে সোন্‌কার পাশটিতে। আর দৈবাৎ যদি অন্য কোন খদ্দের এসে সোন্‌কাকে নিয়ে চলে যায়, তবে সে তার ফিরে আসবার আশায় ধীরভাবে বসে বসে প্রতীক্ষা করে আর ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। তারপর সোন্‌কা যখন ফিরে এসে আবার তার পাশটিতে গিয়ে বসে তখন—যাতে অপর কারও মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট না হয় তাই সোন্‌কার দিকে না চেয়ে সোজা শূন্যের দিকে তাকিয়ে—ভর্ৎসনায় আর তিরস্কারে তাকে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে সে, আর সোন্‌কার অশ্রুসিক্ত পেলব চোখ দুটিতে ফুটে ওঠে শুধু মৌন নিরুপায় আত্মবিসর্জনের বেদনা।

একদল জার্মান এসে ঢোকে; সবাই তারা কাজ করে এক চশমার দোকানে। মাছ আর মশলাপাতির কারবারে কাজ করে এমন একদল কেরানীও এসে হাজির হয়। আর আসে দুজন যুবক, সারা ইয়ামাই চেনে তাদের ভালো ক'রে—দুজনেরই মাথায় টাক। একজন হল হিসেব-লিখিয়ে নিকি, আর একজন হচ্ছে গাইয়ে মিশ্‌কা—ইয়ামা-ময় এই দুই নামে পরিচিত তারা। দুজনকেই বিশেষ খাতির করে বসানো হয়। চঞ্চলা নিউরা একবার করে বাইরের ঘরে উঁকি মেরে দেখে যায় কে এল, তারপর উল্লাসভরে গিয়ে তার অভ্যাসমতো হাঁক ছাড়ে—

'তোর বর এয়েছে রে, জেন্‌কা।' নয়ত বলে, 'তোর মনের মানুষ এল রে ঐ, ছোট মান্‌কা!'

আর ঐ গাইয়ে মিশ্‌কা—লোকটা আসলে গাইয়ে ছিল না মোটেই, ছিল এক ওষুধের দোকানের মালিক—ঘরে ঢুকেই গিটকিরি দিয়ে তার সেই বেসুরো ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে,

সাঁচ্চা ক-থা সবা-ই জা-নে
আয় ছু-টে আয় আমার পা-নে-এ-এ!

সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে চতুরঙ্গ—শুরু হয় নাচ।

তামারার মনের মানুষ সেনেস্‌কাও আসে। সে আবার পছন্দ করে না যে কেউ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাই সবার অলক্ষ্যে এসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে (পায়ের দোষ আছে একটু) তামারার কাছে গিয়ে, তাকে নিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে পড়ে সে।

তারপর আসে আরও অনেকে। নাচ-গান-হল্লা সেই যে চলেছে তো চলেইছে। এমন সময় এসে ঢোকে সাতজন ছাত্র, একজন তরুণ অধ্যাপক, আর 'প্রতিধ্বনি' কাগজের জনৈক সংবাদদাতা।

৯

এই সংবাদদাতাটি ছাড়া আর সব ছেলে ক-টিই সেদিন তাদের জানা-শোনা মেয়েদের নিয়ে 'মে দিবস' উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই হৈ-চৈ করে বেড়িয়েছে। নিপার নদীতে নৌকো বেয়েছে তারা। চড়ুইভাতি করেছে। ছেলেমেয়েরা পালা করে স্নান করেছে নদীতে। গেরস্ত-বাড়িতে তৈরি সুস্বাদু মদ খেয়েছে। প্রাণ খুলে গেয়েছে তারা ক্ষুদে রুশীয়ার গান। পরে সন্ধ্যার সময় ছেলেরা সব নিজ নিজ সখীদের মধ্যে কয়েকজনকে বাড়ি পর্যন্ত, বা গেট পর্যন্ত, পেঁৗছে দিয়ে চলে এসেছে।

সারাটা দিন তাদের বেশ হৈ-চৈ করেই কেটেছে সত্যি। সবুজ গাছপালা, স্রোতের জল, আর রোদের আলো, মাতিয়ে রেখেছিল সবাইকে। তারই সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের কলধ্বনি, অঙ্গভঙ্গি, কটাক্ষ, চকিত স্পর্শ, অঙ্গাবরণের সৌরভ, নদীর বুকে তাদের

মন-ভোলানো মেয়েলী ভয়, সবুজ ঘাসের উপরে সামোভার ঘিরে উপেক্ষা-ভরে তাদের অর্ধশয়ান দেহসৌষ্ঠব, এই সব নির্দোষ স্বাধীনতা ছেলেদের প্রাণে এনে দিয়েছে এক মধুর আবেশ। ছেলেমেয়েরা একত্রে চড়ুইভাতি করতে বা প্রমোদ ভ্রমণে গেলে এ-ধরনের মেশামেশি হবেই, আর তাতে করে তরুণদের মনও যে চঞ্চল হয়ে উঠবে, সে আর নতুন কি!

তারপর সকলে ছাত্রদের রেস্তরাঁ 'চড়াইপাখির নীড়ে' এসে মদ খেতে আর হাসি-গল্প করতে লাগল। রাত বারটায় রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে গেল। মদে বুঁদ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সবাই। এখন কোথায় যাওয়া যায়? নিজের নিজের বাড়ি? নাঃ, এত তাড়াতাড়ি, এখনই ছাড়াছাড়ি,! এ-ই তো চলেছে বেশ। একবার ছাড়াছাড়ি হলে আর জমবে না। 'টিবোলি গার্ডেনে' চল। না, সে-জায়গাও আবার বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে। 'তবে সবাই চল আমার বাড়িতে,'—প্রস্তাব করল বোলোদিয়া পাব্‌লোব্‌। বলল,—'আমার কাছে মদ আছে।'

'দুর, এই দুপুর রাতে গেরস্তের বাড়ি—নাঃ!'

'তার চাইতে চল মেয়েদের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। সেই হবে যা চাইছ তার অনেকটা কাছাকাছি,' মেজাজের মাথায় প্রস্তাব করে বসল লিখোনিন।

লিখোনিন হচ্ছে একজন পুরোনো ছাত্র—ঢেঙা, একটু যেন কুঁজো মতন, আর বিষণ্ণ গোছের মুখশ্রী তার। মনে-প্রাণে সে ছিল অ্যানার্কিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী, আর কাজেকর্মে ছিল তাস, বিলিয়ার্ড আর ঘোড়দৌড়ের অতি-বড় জুয়াড়ী—তা জুয়াড়ী হিসেবে ভাগ্যও ছিল তার ভারি অনুকূল। ঠিক আগের দিনই 'বণিকদের আড্ডায়' সে হাজার রুবল জিতে এসেছে, সেই টাকাটা খরচ না হওয়া অবধি স্বস্তি নেই তার।

'সেই ভালো। চল তবে সব।' কে যেন সায় দিয়ে ওঠে।

'আর একজন প্রস্তাব করে, তার চাইতে যে যার বাড়ি ফিরে যাই এখন।' তারপর একজনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে সে, 'প্রফেসর, তুমি কি ঠিক করলে?'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাজ্যজয় করতে পারবে না হে,' বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠে লিখোনিন, 'প্রফেসর, তুমিও আসছ তো!'

ওদের দলে ছিল একজন ছোকরা অধ্যাপক—অনেকটা পাঠশালার সর্দার পড়ুয়ার মতন ছিল তাঁর কাজ। নাম তাঁর ইয়ারশেঙ্কো। লিখোনিনের কথায় বাস্তবিক চটে গেছেন বলেই মনে হল তাঁকে; যেন সভয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'না না, আমি ওসব নোঙরামিতে নেই। বেশ তো সারাদিন নির্মল আনন্দ হল; আবার ওসব কেন?'

'বটে!' উত্তরে বলল লিখোনিন, 'আমার স্মরণশক্তি যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে না থাকে তবে, বেশিদিনের কথা নয়, এই গত শরৎকালেই এক ভাবী অধ্যাপক মোমসেনকে যেন দেখেছি আমাদের সঙ্গে নাচনা-গাওনা আর হৈ-হল্লোড় করতে—'

মিথ্যে বলেনি লিখোনিন। ছাত্রাবস্থায় এবং তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে, মদের আড্ডা, প্রমোদ-ভবন, সবখানেই ছিল ইয়ারশেঙ্কোর অবাধ গতিবিধি। তাঁর সঙ্গীরা ভেবেই পেত না পড়াশোনার সময় তিনি পেতেন কখন। অথচ গোড়া থেকেই সব পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে এসেছেন তিনি। তবে সম্প্রতি তিনি আগেকার অভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন।

লিখোনিনের ঠাট্টা শুনে চুপ করে থাকতে পারলেন না তিনি; বললেন, 'হা ভগবান! ছেলেবেলায় কি করেছি না-করেছি তাতে কি এসে যায়? ছেলেবেলায় চিনি চুরি করে খেয়েছি, জামাকাপড় নোঙরা করেছি, পোকামাকড় ধরে পাখা ছিঁড়ে দিয়েছি।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ইয়ারশেঙ্কো। বলে চললেন তিনি, 'কিন্তু সবটারই একটা সীমা আছে, আছে মধ্যপন্থা। তোমাদের অবশ্য আমি উপদেশ, কি

শিক্ষা, দিতে চাইছি না; তবে সকলেরই উচিত সুসংগত আচরণ করা। এ-বিষয়ে আমরা সবাই একমত যে, গণিকাবৃত্তি হচ্ছে মানবতার এক মহা-অভিশাপ। আর এ-বিষয়েও কোনও মতদ্বৈধ নেই যে, এ মহাপাতকের জন্যে আসলে মেয়েরা দায়ী নয়, বরং দায়ী হচ্ছি আমরা পুরুষরাই। কেন না, আমাদেরই চাহিদা হচ্ছে এই যোগানদারির মূল। আর তাই এক-আধ পেয়ালা মদ বেশি গিলেই, আমার সমস্ত বিশ্বাস সত্ত্বেও আজ যদি আমি কোন এক গণিকার কাছে যাই, তবে আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে একই সঙ্গে তিন-তিনটে নীচতা। প্রথম অপরাধ হবে ঐ নির্বোধ হতভাগী নারীর কাছে,—তাকে আমি আমার পাপ রুবলের বিনিময়ে হীনতম দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করাব; দ্বিতীয়ত অন্যায় হবে মানবতার কাছে, কারণ আমার এই ন্যক্কারজনক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে, দু-এক ঘণ্টার জন্যে এক বারবনিতাকে ভাড়া করে, আমি গণিকাবৃত্তির সমর্থনই করে বসব; এবং তৃতীয়ত অপরাধ হবে নিজের বিবেকের কাছে—এবং যুক্তির কাছেও বটে।'

'ফুঃ-উঃ-উঃ!'—ঠাট্টা করে শিস দিয়ে উঠল লিখোনিন। 'আমাদের দার্শনিক মশাই দেখছি চর্বিত-চর্বণ শুরু করে দিলেন, 'রশি মানে সাধারণ দড়ি।'

তাতেও দমলেন না অধ্যাপক। বলতে লাগলেন, 'অবশ্য ভাঁড়ামি করার চেয়ে সোজা কাজ আর নেই। কিন্তু আমার মতে আমাদের এই দুঃখময় রুশীয় জীবনে এই ভাবের ঘরে লুকোচুরির চেয়ে পরিতাপজনক ব্যাপার নেই আর-কিছুই। আজ আমাদের মনে হচ্ছে, 'তা একটিবার গণিকালয়ে গেলেই কি, আর না গেলেই কি? এই একটি বারের জন্যে তো আর সব কিছু ভালোও হয়ে উঠছে না, মন্দও হয়ে যাচ্ছে না।' পাঁচ বছর পরে বলব, 'ঘুষের কারবারটা বড়ই জঘন্য বটে, কিন্তু বুঝলে তো ভায়া, পুত্রকন্যা-পরিবার—।' তারপর ঠিক এইভাবেই দশ বছর পরে, মেরুদণ্ডহীন রুশীয় উদারপন্থী হিসেবেই আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্যে হা-হুতাশ করতে করতে ইতর বদমাশ লোকের সামনে মাথা নত করে চলতে থাকব, আর তাদের বৈঠকখানায় গিয়ে তাদের কৃপা-ভিক্ষা করে মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে তখন আমাদের। তখন আমরা বলব, 'জানই তো ভায়া, বাঘের সঙ্গে বাস করতে গেলে বাঘের মতো হালুম হুলুম করে চলতে হয়। সেই যে একজন মন্ত্রী রুশীয় ছাত্রদের 'ভাবী হেডক্লার্কের দল' বলে বর্ণনা করেছিলেন, এক-তিলও অত্যুক্তি করেননি তিনি—রুশীয় ছাত্রেরা বাস্তবিকই হচ্ছে যত সব ভাবী হেডক্লার্ক'!'

'নয়ত প্রফেসর।' জুড়ে দিল লিখোনিন।

সে-কথায় কান না দিয়েই বলে যেতে লাগলেন ইয়ারশেঙ্কো, 'আর সব চাইতে বড় যা—তোমরা কি কেউ ভেবে দেখেছ, এই কিছুক্ষণ আগে আমরা আমাদের বান্ধবীদের নিয়ে নদীতে, নদীতীরে কতই না হেসে বেড়ালাম। কই, কেউই তো কোন অসভ্য আচরণ করিনি তখন! আর যেই বান্ধবীরা সব চলে গেলেন অমনি সবই এই সব ভ্রষ্টা নারীর কাছে ছুটলাম। এ যেন বোনকে দেখে কামার্ত হয়ে চলে এলাম ইয়ামাতে! ছিঃ ছিঃ!'

'তা বলে পুরুষমানুষের কাম-প্রবৃত্তিকে তো আর দমিয়ে রাখা যাবে না। আর সে-কামনা চরিতার্থ করবার একটা জায়গাও থাকা চাই সমাজে,' বলল বোরিস সোবাসনি-কোব। লম্বা, চশমা-পরা, ফিটফাট ছোকরাটি।

বলেই চলল সে, 'বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে মাখামাখি করা, কি পরের বউয়ের ওপর নজর দেওয়ার চাইতে এ বরঞ্চ ভালো। আর আমার যদি নারী না হলে না-ই চলে, তা হলে যাতে সহজপ্রাপ্য মেয়েমানুষ পাই তার একটা ব্যবস্থাও তো থাকা দরকার সমাজে?'

'এঃ, বেজায় যে দরকার দেখছি!' বিরক্তিভরে একটা ক্ষীণ হতাশার ভঙ্গি করে বলে উঠলেন ইয়ারশেঙ্কো, 'যাই হোক, অন্তত এটুকু স্বীকার করবার মতো সৎসাহসও

থাকা উচিত আমাদের যে, আমরা রাশিয়ার শিক্ষিত-সমাজের ব্যক্তিরা, কলেজে থাকতে থাকতেই যাদের সব কাঁধ আসে ঝুঁকে, যারা সব অকালেই হয়ে পড়ে পঙ্গু, তারা নিজেদের মধ্যে বর্বর উন্মাদনা, কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, অনুভব করবার শক্তিটুকু হারিয়ে বসে আছি সবাই। আমাদের এটা যৌন-ক্ষুধা নয় মোটেই, এ হচ্ছে গিয়ে সামান্য একটা শখ, একটা অসংযম, এক মুহূর্তের ক্ষীণ আত্মবিনোদন। তবে শোন বলি—একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা এক বিবরণ। একজন ইঙ্গুশ—না কি এক অসেটিয়ানের গল্প, যাই হোক, সংক্ষেপে বলতে গেলে সে হচ্ছে এক দুর্ধর্ষ পার্বত্য ককেশিয়ান ঘোড়-সওয়ারের কাহিনী। কিস্‌লোবোদ্‌স্ক-এ বেড়াতে এসেছিল লোকটা। জায়গাটা হচ্ছে বড়লোকদের এক শৌখিন স্বাস্থ্যনিবাস। গন্ধমাদির ঈষৎ উষ্ণ সন্ধ্যা। লোকটার কানে এসে ঠেকল গান-বাজনার আওয়াজ। শব্দ শুনে আপনমনেই পা বাড়াল সে সেইদিকে, গিয়ে পৌঁছুল এক নাচের মজলিশের পাশে। জায়গাটা ছিল চেরা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে তখন চলছিল এক নাচের মহড়া। একজন মহিলার বেশ এমনই আলুথালু ছিল যে তাঁকে প্রায় উলঙ্গ বললেই হয়—তিনিও কি এক খেয়ালের বশে আমোদ করে নাচতে নাচতে বারবার সেই বেড়ার পাশে এসে এমনভাবে ঘুরপাক খেতে লাগলেন যে, তাঁর ঘাগরার প্রান্তটুকু সেই সুরূপ ঘোড়-সওয়ারের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় আর কি। তারপর, কোথাও কিছু নেই—আচম্‌কা শোনা গেল এক আর্ত চিৎকার! ব্যাপার কি? এক লাফে সেই চেরা কাঠের বেড়ার আড়াল ডিঙিয়ে পাহাড়িটা গিয়ে সেই মহিলার নাচের দোসরকে ধাক্কা মেরে কাছছাড়া করে দিয়েছে; চোখের নিমেষে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেছে মহিলাটির পরন থেকে তাঁর নাচের সেই ঝিলঝিলে পোশাকখানা, চিৎ করে শুইয়ে ফেলেছে তাঁকে মাটিতে। কত লাঠি আর ছাতা যে লোকটার পিঠে ভাঙ্গা হল। কে একজন ছুঁড়ল এক রিভলবার। একজন পদাতিক সৈন্য এসে দিল তার পিঠে বসিয়ে তরোয়ালের এক ঘা। কিন্তু দিলে কি হবে? ঐ অতগুলো ভদ্রলোকের চোখের সামনে, মশাই, লোকটা হতভাগিনীকে করল বলাৎকার!—তারপর পুলিস এসে যখন ছেঁকে ধরল তাকে, তখন শান্ত হয়ে সে কি বলল জান? বলল—'যা খুশি, জেলে দাও, মাথা কাট, কিছুতেই আপত্তি করব না। কিন্তু মেয়েটা ন্যাঙটো হয়ে বেড়াচ্ছিল কেন? এই ব্যাপার। আমি থাকলে ককেশিয়ানটার পক্ষ নিতাম। তার দোষ কি? প্রাণ-শক্তিকে রুখবে কে? কিন্তু তোমরা বলছ তোমাদের প্র-য়ো-জ-নে-র কথা। হায়রে! আমরা মাথাওয়ালা লোকেরা সব প্রেম করি শুধু কল্পনায়। পুরুষ নই আমরা।'

'কইছ কথা সবার হয়ে,'—বলে উঠল সোবাসনিকোব, 'কিন্তু প্রফেসর, তোমার প্রাণটা হচ্ছে ঠিক সেই রোমানের মতো যে এক সাবাইন মেয়েকে চুরি করে এনেছিল। অথচ তোমার মনোভাব হচ্ছে অনুতপ্ত গ্রামীণ ভদ্রলোকের মতো।'

এইখানে বন্ধুমহলে রামেশিস নামে পরিচিত একজন ছাত্র সালিশি করতে এগিয়ে এল। ছাত্র-সমাজে তার চালচলন ছিল একটু অদ্ভুত গোছের। অন্য সব ছাত্র যখন পালা করে রাজনীতি, প্রেম, অভিনয়, আর যৎসামান্য লেখাপড়া করে দিন কাটাত, সে তখন মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করত যত সব মামলা-মোকদ্দমার নথিপত্র। এরই ফলে আইনজীবী-মহলে সে বেশ প্রতিপত্তিও গড়ে তুলেছিল। তার বয়স কম হলেও, খুব বড় বড় আইনবিদ্ পর্যন্ত তার মতামত মন দিয়ে শুনতেন। সবারই বিশ্বাস ছিল রামেশিস কালে প্রচণ্ড পশার জমিয়ে ফেলবে। রামেশিস নিজেও কখনও এ ভাব গোপন করার কোন চেষ্টাই করত না যে, বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের মধ্যেই সে আইনজীবীর কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে ফেলতে পারবে। তার বন্ধুবান্ধবরাও প্রায়ই তাকে তাদের সভাসমিতিতে সভাপতি নির্বাচন করত। তবে সে-ও আবার সময়াভাবের

অজুহাতে এ সম্মান গ্রহণে প্রায় কখনই রাজি হত না। তবে ইয়ারশেঙ্কোর মতো সে-ও ছাত্রসমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তির কদর বুঝত, আর তাই ছাত্রদের বিপদ-আপদের সময় সালিশির ব্যাপারে কখনই পিছপা হত না। সে-ই এখন এগিয়ে এসে বলল, 'নাও হে, গাবরিলা পেত্রোবিচ তোমায় কেউ পাঁকে বসাতে যাচ্ছে না—ভয় নেই। সামান্য একটা ব্যাপার, তা নিয়ে এত তর্কাতর্কি কেন? কয়েকজন রুশীয় ভদ্রলোক একটু ফুর্তি করে রাতটা কোথাও কাটাতে চান, অথচ ঐ সব বাড়ি ছাড়া সে-রকম কোন জায়গাও খোলা নেই এখন, ব্যাপার তো মোটে এই। নাও, চল!'

'তাই বলে দেহপসারিণীদের কাছে যেতে হবে আমোদ করতে?'

'ক্ষতি কি? একবার এক ভোজসভায় এক দার্শনিককে অপদস্থ করবার জন্যে আসন দেওয়া হয়েছিল বাজনাদারদের পাশে। আসন গ্রহণ করে তিনি বললেন, 'সবার শেষের আসনটিকে সবার প্রথমের আসনে পরিণত করার এই হচ্ছে সুবর্ণসুযোগ'। তুমিও তাই কর—নারীসঙ্গ করতে যদি তোমার বিবেকে বাধে, তবে শুধু আমাদের সঙ্গে থেক, ফিরেও এস একেবারে নিষ্পাপ অবস্থায়।'

'তুমি যে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ হে, রামেশিস!' উত্তর দিলেন অধ্যাপক, 'তোমার কথা শুনে আমার মনে পড়ল ঐ সব বুর্জোয়াদের কথা যারা মানুষ-মারা দেখবার জন্যে রাত থাকতেই উঠে বধ্যভূমিতে গিয়ে কেবলই আক্ষেপ করতে থাকে, আমরা কি করতে পারি? আমরা তো প্রাণবধের শাস্তির বিপক্ষেই; কিন্তু কি করব, বিচারের ওপর তো হাত নেই আমাদের।'

'চমৎকার বলেছ, গাবরিলা পেত্রোবিচ।' উত্তর দিল রামেশিস 'একেবারে মিথ্যেও নয়। তবে তোমার ও উপমা আমাদের বেলায় খাটতে না-ও পারে। দেখ, কোথাও অনুপস্থিত থেকে কেউ কখনও কোন কঠিন রোগ আরাম করতে পারে না,—তার জন্যে প্রথমে রোগীকে দেখা চাই। অথচ এই যে আমরা সব এখন পথে দাঁড়িয়ে পথিকদের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি, এই আমাদের সবাইকেই একদিন না একদিন এই গণিকাবৃত্তি রূপ মহা-অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। লিখোনিন, আমি, বোরিস সোবাসনিকোব, আর পাবলোব্ এই ক-জনকে লড়তে হবে আইনবিদ হিসেবে, পেত্রোবস্কি আর তোলপাইগীন এদেরকে লড়তে হবে চিকিৎসক হিসেবে। অবশ্য ভেল্টমান-এর কথা আলাদা—সে পড়ছে গণিত। তবে সে হবে শিক্ষক—তরুণদের পরিচালক, আর, যাক গে, জাহান্নমে যাক, বয়সকালে সন্তানের পিতাও হবে সে। আর যদি সত্যিই জুজুর ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাও, তা হলেও তার আগে অন্তত গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসা উচিত। আর তুমি নিজে গাবরিলা পেত্রোবিচ, তুমি হলে ভবিষ্যতে যত সব কবর খোঁড়া হবে তার প্রধান পাণ্ডা, প্রত্নতত্ত্বের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রাচীন থিবিস আর নিনেবে-এর পবিত্র দেবদাসী-প্রথা রহস্য উদ্ঘাটনকারী, বর্তমান গণিকাবৃত্তির পরিচয় কি তোমার কাছেও শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার নয়?'

'সাবাস, রামেশিস। চমৎকার।' বাহবা দিয়ে উঠল লিখোনিন, 'ঢের হয়েছে, এইবার নে, আমাদের প্রফেসরকে চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তোল।'

অধ্যাপককে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একটা পুলিস অনেকক্ষণ থেকে এই সব ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখছিল, এখন এগিয়ে এসে বলল—'আপনারা এখানে জটলা করবেন না।'

একটু ঠাণ্ডা হলেন ইয়ারশেঙ্কো, বললেন, 'বেশ, যাব তোমাদের সঙ্গে, তবে ভেব না যে মিশরের ফারাও রামেশিসের কথায় রাজি হয়েছি,—না, তা মোটেই নয়। না গেলে তোমাদের এই মধুর সঙ্গ ছাড়তে হবে, তাই। তবে এক শর্তে, শুধু একটু মদই খাব, তার বেশি-কিছু নয়—গল্প, হাসাহাসি, ফাজলামি, নোংরামি, সে-সব কিছু চলবে

না। আমরা ভাবী রাশিয়ান, ঘাগরা দেখলেই যদি আমাদের নোলায় জল আসে, তবে সে হবে বড়ই লজ্জার কথা।'

সকলেই এই শর্তে রাজি।

ঠেলাঠেলি করে সকলে গিয়ে একটা গাড়িতে চড়ে বসল। লিখোনিন বলল, 'আমরা ডোরোসেনকোতে নামব।'

ডোরোসেনকোতে এসে সকলে একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে ঢুকল। সারারাত এটি খোলা থাকে। ওরা এখানে কেউই কিছু খেল না। প্রত্যেকেরই মনে একটা অজানা আশঙ্কা —এ কি ভালো হচ্ছে?—বোধ হয় না। গণিকালয়েই কি চরম আনন্দের সন্ধান মেলে? —না, তার চাইতে বরং নেশায় বিভোর হওয়া যাক। সন্দেহের দোলায় দুলে লাভ কি? তাই তারা সব ঠিক করল, মদ খেয়ে মনটাকে রামধনুর রঙে রঙিন করে তুলবে, বিবেকের উপরে পড়বে এক তরল যবনিকা। তারপর?

তারপর তাদের হাত কি করল, পা কি করল, মুখ কি করল, জানবার কোন দরকারই হবে না—তারা জানবেও না।—শুধু ছাত্রেরাই নয়, ইয়ামাতে যারাই প্রথম ঢুকতে যায় তাদেরই বোধ হয় এই রকমের দ্বিধা আসে। আর তাই বোধ হয় এখানকার এই রেস্তরাঁয় রাতে এত ভীড় জমে। কেউই এখানে বেশিক্ষণ বসে না। আসে,—মনের দ্বিধা, বিবেকের অনুশাসন, এ-সব কিছুকে ক্ষণকালের জন্যে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে, শয়তানকে সাথী করে নরকে ডুবতে যায়।

ছাত্রদের যখন মদ খাওয়ার পালা চলছে তখন দূরে ঘরের কোণে উপবিষ্ট দুটি লোকের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখছিল রামেশিস—তাদের একজন ছিল ছিন্নবাস পরিহিত এক বিশাল-বপু বৃদ্ধ, আর অপর জন—যে তার সামনে বসেছিল—সে ছিল এক ভদ্র-বেশধারী ব্যক্তি। বৃদ্ধ তার সম্মুখে রক্ষিত একটি বাদ্যযন্ত্রে আঙ্গুল চালাতে চালাতে নিচু ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিন্তু মিঠে সুরে গান গেয়ে চলেছিল,

'ও আমার দেশের মাটি, দেশের মাটি,
ফসল-ভরা দেশের মাটি গো।'

'তোমরা বসো, আমি আসছি,' বলে উঠে গেল রামেশিস। তারপর সেই ভদ্রবেশ-ধারী লোকটির কাছে গিয়ে, একটু পরেই তাকে ডেকে নিয়ে এসে বলল, 'শোন সবাই, এ'র সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন ইবানোবিচ্ প্লাতোনোব, একজন সাংবাদিক। এমন কুঁড়ে কিন্তু এমন আশ্চর্য প্রতিভাবান সাংবাদিক আর পাবে না কোথাও।'

'তা হলে আসুন একটু পান করা যাক,' প্রস্তাব করল লিখোনিন। ইয়ারশেঙ্কো নবাগতকে বলল, 'আচ্ছা, আপনিই না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিকলোন্স্কির বিষয়ে কাগজে লিখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমিই বটে,' উত্তর দিলেন সাংবাদিক।

'ভারি চমৎকার হয়েছিল সে-লেখাটা। ঠিকই লেখা হয়েছিল।'

সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি খুশি হলেন অধ্যাপক। তারপর সকলের সঙ্গে সাংবাদিকের আলাপ জমে গেল। তখন সবাই বলল, 'ইয়ামায় যেতে হবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে।'

'বেশ, আপত্তি নেই'—সাংবাদিক বললেন, 'যদি আমায় নিয়ে কোন অসুবিধা না হয়, আপনাদের সঙ্গে যেতে আমি রাজি আছি। আজ 'নিপার জগৎ' কাগজখানা থেকে হঠাৎ কিছু পাওয়াও গেছে। আচ্ছা, আমি আসছি এখ্খুনি!'

প্লাতোনোব বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বিদায় নিয়ে

বলল, 'আমি এখন যেখানে যাচ্ছি, ঠাকুরদা, সেখানে তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি বরং কাল আমার সঙ্গে ঐ জায়গায় দেখা করো। আসি তবে!'

সকলে রেস্তরাঁ ছেড়ে বাইরে এল। বোরিস সোবাস্নিকোব লিখোনিনকে আড়ালে ডেকে এনে বলল, 'বেশ তো ছিলাম আমরা, ওকে আবার আমাদের মধ্যে টানা কেন? কে না কে?'

লিখোনিন বলল, 'চুপ কর ভাই! খেড়ে ফুর্তিবাজ লোক ও।'

১০

আনা মারকোব্নার গণিকালয়ের সামনে এসে ইয়ারশেঙ্কো বললেন, 'যদি একান্তই কোন গণিকালয়ে যেতে হয় তবে ভালো জায়গাতেই যাওয়া উচিত। আর একটু এগিয়ে 'ত্রেপেল'-এ গেলে কেমন হয়?'

'আসুন দয়া করে, আসুন কত্তা,'—দরবারী কায়দায় কুর্নিশ করতে করতে ইয়ারশেঙ্কোকে ঠাট্টা করে বলল লিখোনিন, 'পায়ের ধুলো পড়ুক গরিবের আস্তানায়।'

'এ কিন্তু ভারি নোংরা জায়গা—ত্রেপেলে অন্তত মেয়েরা দেখতে সুন্দর।'—আপত্তি করতে লাগলেন অধ্যাপক মশাই।

সবাই আনা মারকোব্নার গণিকালয়েই এসে ঢুকে পড়ল। সাইমন দেখল একদল লোক ঢুকছে। একসঙ্গে অতগুলো লোকের আসা সে পছন্দ করে না। তাতে হৈ-চৈ, হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা থাকে। সে চায় লোক আসবে একলা-একলা, লুকিয়ে লুকিয়ে। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক চাইবে, কোন চেনা লোক দেখতে পেল কিনা। সে রকম আগন্তুককে খাতিরও করে থাকে সাইমন।

বৈঠকখানা ঘর তখন অতিথিতে ভর্তি। কেরানীরা একটু আগে নেচে-কুঁদে তখন বিশ্রাম করছিল আর রুমাল নেড়ে হাওয়া খাচ্ছিল। রলি-পলি ঢুলছিল একটা চেয়ারে বসে।

ছাত্রেরা এসে ঢুকতেই জনকয়েক মেয়ে তাদের কাউকে কাউকে চিনতে পেরে এগিয়ে এল তাদের দিকে।

'তামারোচ্কা, তোর বর এয়েছে রে—বোলোদেন্কা!' চেঁচাতে লাগল নিউরা, 'আমারও বর এয়েছে—মিস্কা!'—বলেই সে পেত্রোবিস্কির গলা ধরে ঝুলে পড়ল। 'সত্যি, মিসেন্কা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?'

প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো তো কাণ্ডকারখানা দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে খবরগিরনী এমাকে বললেন, 'আমাদের জন্যে একটা আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত হতে পারে কি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' এমা বলতে লাগল, 'পারবে, তা পারবে, পারবে বই কি! আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'আর রঙিন মদ আর কফি?'

'তারও ব্যবস্থা হতে পারবে, পারবে বই কি! আর—মেয়েদের কি ঘরে পাঠিয়ে দেব?'

ইয়ারশেঙ্কো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দরকার মনে কর তো দিও পাঠিয়ে।'

এক এক করে মান্কা, কিটি, লিউব্কা ও আরও কয়েকজন মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। যে যার কোল খালি পেল সে তারই কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরল।—'ওগো আমার খোকা, মাইরি, কি সুন্দর তোমায় দেখতে! কমলালেবু খাওয়াবে, ভাই?'

'বোলোদেন্‌কা, আমায় লজেঞ্জ কিনে দাও,—দেবে?'

'আমায় চকোলেট।'

প্রফেসরের কাঁধে ভর করেছিল ভেরা। বলল, 'আমার এক বন্ধুর অসুখ, তাই তার ঘরে অতিথি নেই। তার জন্যে কিছু চকোলেট আর আপেল কিনে দাও না, ভাই।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়। লক্ষ্মী মেয়েটির মতো ওখানটিতে সরে গিয়ে বসো।' প্রফেসর উত্তর দিলেন।

ঢঙ করে বলল ভেরা, 'কিন্তু তোমার ঐ রূপ দেখে তা যে পারি না, প্রিয়তম।'

'পাড়বে, টা পাড়বে, পাড়বে বই কি!'—এমা এডোয়ার্ডোব্‌নার জার্মান উচ্চারণ-ভঙ্গি নকল করে গম্ভীরভাবে বলল তাকে লিখোনিন।

'তবে, মধু, খিদমতগারকে বলি আমার বন্ধুর জন্যে কিছু ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসুক,' জবাব দিল ভেরা।

একটু পরেই সাইমন কফি, মদ, ফল, লজেঞ্জ, আর গ্লাস নিয়ে ঘরে এল। মদের বোতল খোলা হল। গল্প-গুজব চলতে লাগল। কথায় কথায় নিউরা বলে ফেলল, 'সাংবাদিক সেরজাই ইবানোবিচ্‌ আমাদের এখানকার পুরোনো অতিথি।'

'তাই নাকি!' বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল লিখোনিন।

'হ্যাঁ,' গম্ভীরভাবে স্বীকার করলেন সাংবাদিক।

'সেরজাই হচ্ছে আমাদের ভাইয়ের মতো,' বুঝিয়ে বলল নিউরা।

'দূর বোকা!' তামারা ধমকে দিল তাকে।

কিন্তু সোবাস্‌নিকোবও লক্ষ্য করছিল সেরজাই ইবানোবিচ্‌ বেশ ঘরের লোকের মতোই ব্যবহার পাচ্ছে। এ-বাড়িতে তার বেশ খাতির আছে বলেই মনে হল। সকলেই মন দিয়ে শুনছে তার কথা। তামারা এসে তার মদের গেলাস ভরে দিল; মান্‌কা দিল তাকে একটা পেয়ারা খেতে; অথচ কোন মেয়েই তার কাছ থেকে চকোলেট কি ফল খেতে চাইছে না। হিংসুটে সোবাস্‌নিকোব ভাবল সেরজাই বোধ হয় ওদের দালাল; তাই অত আদর।

'সত্যি, আমি এদেরই একজন,' সেরজাই বললেন, 'জানেন না বোধ হয়—এক সময় চারমাস আমি রোজ এখানেই খাওয়া-দাওয়া করতাম।'

'বটে!—সত্যি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারশেঙ্কো।

'হ্যাঁ। সত্যি। এখানকার খাওয়া-দাওয়া খুব খারাপ নয়।'

'কিন্তু কেন?'

'আমি বাড়িউলীর মেয়েকে পড়াতাম কিনা, তাই। আমার মাইনে থেকেই অবশ্য খাই-খরচ বাদ যেত।'

'সে কি! যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—আপনি কি ইচ্ছে করে এখানে খেতেন, না, অসুবিধে ছিল বলে?'

'ইচ্ছে করেই। আমি এদেরই একজন হয়ে এদের পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ জীবনের সন্ধান নেবার চেষ্টা করছিলাম।'

'বুঝেছি!' প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো বললেন, 'এদের নিয়ে লিখবেন বলে আমাদের বন্ধু এদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। শীঘ্রই বন্ধুর এ-বিষয়ে লেখা বই পড়বার সৌভাগ্য হবে আমাদের।'

'গণিকালয়ের ট্র্যাজেডি!' অভিনয়ের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল সোবাস্‌নিকোব।

সাংবাদিক ইয়ারশেঙ্কোর কথার উত্তর দিচ্ছেন, সেই অবসরে তামারা উঠে এসে সোবাস্‌নিকোবের কানে কানে বলল, 'শোন, বন্ধু, ঐ সাংবাদিকের কাছে ঘেঁষ না বেশি; তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।'

'কেন?' দু আঙুল দিয়ে নাকের উপর চশমাজোড়া ঠিক করে নিয়ে মুরুব্বিয়ানার চালে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল সোবাস্নিকোব, 'তোমার নাগর নাকি ও? না, তোমাদের ফড়ে?'

'ও কোন জন্মেও আমাদের কারুর সঙ্গে থাকেনি; আমায় বিশ্বাস কর। কিন্তু ঘাঁটিয়ো না ওকে,' উত্তর দিল তামারা।

'বটে? ও হ্যাঁ, তা তো বটেই! আর নয়ই বা কেন!' বিদ্রূপ ভরে মুখে ভেঙচি কেটে বলল সোবাস্নিকোব, 'সারা বেশ্যাপাড়াটাই দেখছি ওর হয়ে কথা কয়! ইয়ামাসুদ্ধই ওর প্রাণের বন্ধু—ওর সাঙাত!'

'না, তা নয়,'—কানে কানে কথা বলার ভঙ্গিতে জবাব দিল তামারা, 'তবে এই তোমার ঘাড়ে চিমটি দিয়ে ধরে ছোট্ট কুকুরছানাটির মতো জানালা গলিয়ে দেবে ছুঁড়ে ফেলে—এই আর কি! আমি ওকে দেখেছি কিনা আর-একবার এ রকমটি করতে। তাই বললাম।'

'দূর হ, মুখপুড়ী! দূর—দূর!'—ঘুষি বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সোবাস্নিকোব।

'তবে চললাম, প্রাণ,' উপেক্ষাভরে লঘু পদক্ষেপে সরে গেল তামারা।

চিৎকার শুনে সবাই ফিরে চাইল ছাত্রটির দিকে।

'অসভ্যতা করো না হে, ফুলকুমার।' আঙুল উঁচিয়ে ধমকে দিল তাকে লিখোনিন; তারপর সাংবাদিকের দিকে চেয়ে বলল, 'কই বলুন, সেরজাই, আপনার কথা—বেড়ে লাগছে।'

'বলছিলাম—এখানে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে আসিনি,' বলে যেতে লাগলেন সাংবাদিক—'তবে এখানকার এই সব ব্যাপার একেবারে পর্বতপ্রমাণ, সব-কিছু পিষে মারে, ভয়ঙ্কর।—অথচ নারী-মাংসের কারবার, রূপোপজীবিনীদের দাসীত্ব, গণিকাবৃত্তির সঙ্গে বড় বড় শহরের ক্ষয়রোগের তুলনা, এই সব যত চোস্ত চোস্ত বুলি, এর কোনটাই কিন্তু তেমন ভয়ানক নয়—এই রকমের আবোল-তাবোল বুকনি শুনে শুনে অরুচি ধরে গেছে সবার! নাঃ, এর আসল বিভীষিকা কোন্‌খানে তা জানেন? সে হচ্ছে এখানকার প্রতিদিনের যত সব মজ্জাগত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে—এখানকার দৈনন্দিন ব্যবসাদারিতে লাভ-লোকসানের খতিয়ানে, সহস্র বৎসরের পুরাতন যুগযুগসিদ্ধ কামকলা-চর্চার বিজ্ঞানে, এর এই নীরস রীতি-নীতির মধ্যে। এই সব অলক্ষ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় বিরাগ, হীনতাবোধ, লজ্জা, মানবমনের এই সব যত কিছু অনুভূতি। থাকে শুধু একটা রসকষহীন পেশা, একটা চুক্তির বোঝাপড়া, একটা মতৈক্য, মোটের উপরে সাধু গোছেরই একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যবসা—তা, এই ধরুন না কেন মুদীর দোকানের কারবারের চেয়ে কোন অংশে তা উৎকৃষ্টও নয়, নিকৃষ্টও নয়। বুঝতে পাচ্ছেন কি আপনারা এর অন্তর্নিহিত বিভীষিকাটুকু আসলে গিয়ে হচ্ছে কোন্‌খানে? সে হচ্ছে ঠিক এইখানে যে বিভীষিকা বলে এর মধ্যে একদম কিছুই নেই! বুর্জোয়া সমাজে যেমন কাজের দিনের দিনপঞ্জী—ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। আর তার উপরে রয়েছে গণ্ডিবদ্ধ বিদ্যায়তনের কৌতুককর নির্বুদ্ধিতা, তার কর্কশতা, ভাবালুতা আর অনুকরণপ্রিয়তার অলস রোমন্থন।'

পানপাত্রের মধ্যে বিষণ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সাংবাদিক।

'যথার্থ কথা,' তাঁকে সমর্থন করে বলল লিখোনিন।

'সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে উদ্বিগ্ন অন্তঃকরণের কত বিলোপোক্তি পাঠ করে থাকি আমরা। মহিলা চিকিৎসকেরাও এ বিষয়ে কত কি করবার প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁদের সে-প্রয়াস বেশ বিরক্তিকরও হয়ে ওঠে সময় সময়। 'আহা, বাছা ইআন। আহা, বাছা, উচ্ছেদ! আহা, বাছা, জীবন্ত পণ্য। দাসীত্ব। এই সব বারাঙ্গনা। মানব-

জাতির হীন কলঙ্ক, রক্ত শুষে খাচ্ছে এরা বেশ্যাদের।' কিন্তু গলাবাজি করে কাউকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবে না তুমি, কোন ক্ষতি করতে পারবে না কারুর। আপনারা সবাই জানেন এ প্রবাদবাক্য—যত গর্জে তত বর্ষে না। সব ভয়ের কথার সেরা ভয়ের কথা—শতগুণ ভীতিপ্রদ বাক্য—হচ্ছে গিয়ে এই রকমেরই এমন কোন একটি ছোট্ট নীরস কথা যা অকস্মাৎ ঘা মেরে চেতিয়ে তুলবে আপনাদের, মাথায় লগুড়াঘাতের মতো। এই ধরুন না কেন সাইমনের কথা, সাইমন মানে এখানকার ঐ খিদমতগার। আপনাদের মনে হবে ওর চেয়ে নিচে নামতে পারে না আর কেউই—বেশ্যাবাড়ির সর্দার, একটা পশু, খুব সম্ভব একটা খুনে, বেশ্যাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে, স্থানীয় ভাষায় বলতে গেলে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেয় তাদের, অর্থাৎ সোজা কথায় মারধোর করে। তবুও, আপনারা জানেন কি, কিসের জন্যে তাতে আমাতে মিল হতে পেরেছে, দুজনের মধ্যে জমে উঠেছে একটা বন্ধুভাব? সে হল ধর্মাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্যে। ধার্মিক লোক ও—অসম্ভব রকমেরই ধার্মিক। আমি ওকে পরিচালনা করতাম, আর ছলছল চোখে ও গাইতঃ

এস ভাইসব, দাও চুম্বন—
চির-বিশ্রাম লভিল যে জন।

যারা সাধুসন্ত নয়, সাধারণ লোক, এ হচ্ছে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা অঙ্গ। না, শুধু একবার ভেবে দেখুন—কেবল এক রুশীয় অন্তরাত্মায়ই এ-হেন স্ববিরোধ সম্ভবপর।'

'তা বটে। এই রকমের লোক প্রার্থনা-মন্ত্রের পর প্রার্থনা-মন্ত্র আউড়ে যাবে, তারপর গিয়ে ছুরি বসাবে কারও গলায়, শেষে এসে হাত-পা ধুয়ে আচমন করে কোন বিগ্রহের সামনে জেবলে দেবে এক প্রদীপ,' বলল রামেশিস।

'তাই-ই বটে। এই যে পরিপূর্ণ ভক্তিভাবের সঙ্গে অন্তর্গূঢ় অপরাধপ্রবণতার মিশ্রণ, এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার আমি আর কল্পনা করতে পারি না। মনের কথা খুলে বলব? সাইমনের সঙ্গে একা বসে যখন গল্প করি আমি—তা আমাদের মধ্যে অনেক সময় নিরিবিলিতে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েও থাকে—তখন আচমকা এক-এক সময় কেমন যেন সত্যি সত্যি ভয় ভয় করে আমার। কি একটা যেন অন্ধ ভয়! যেন, এই ধরুন না কেন, ভরসাঁঝে একটা নড়বড়ে পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, সেটা আবার কাত হয়ে রয়েছে এক অন্ধকার পূতিগন্ধময় কূপের মুখের ওপরে, আর ঠিক ঠাহর হয় না, কিন্তু তার নিচে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে যত রাজ্যের সরীসৃপ। তবুও কিন্তু সাইমন হচ্ছে ঐ এক রকমের সত্যিকারেরই ভক্তলোক। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস কালে সে গিয়ে সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়বে, উপবাস আর উপাসনায় ছাড়িয়েও যাবে অনেককে। আর শুধু শয়তানই জানে কোন্ দানবীয় পদ্ধতিতে সত্যিকারের ধর্মানন্দ তার অন্তরাত্মাকে তখন ঘিরে রাখবে তার এই অধর্মবুদ্ধি, পবিত্র বস্তুর প্রতি তার এই বিদ্বেষ, তার এই ন্যক্কারজনক উন্মাদনা, তার নির্মমাচরণজনিত পরিতৃপ্তি, কি এই রকমের আর-কোন দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে!'

'যাই হোক, আপনি তো আপনার এই সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পাত্রকে রেহাই দেন না,'—চোখের দৃষ্টিতে সযত্নে মেয়েদের নির্দেশ করে বললেন ইয়ারশেঙ্কো।

'অ্যাঁ, সে কিছু নয়। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক এখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।'

শুধু শেষের কথা কয়টিই ধরতে পারল বোলোদিয়া পাবলোব। জিজ্ঞেস করল সে, 'কিসের জন্যে?'

'এমনিই—গল্প করবার মতো ব্যাপার কিছু নয়,' এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে মৃদু হেসে জবাব দিলেন সাংবাদিক,—'তুচ্ছ ব্যাপার।—আপনার গেলাসটা আনাই, মি. ইয়ারশেঙ্কো।'

জিভ-আলগা নিউরা কি তাই বলে চুপ করে থাকতে পারে? হঠাৎ সে মুখের রাশ খুলে দিয়ে বকবকানি শুরু করে দিল—'কিসের জন্যে আবার! সেরজাই ইবানোবিচ একবার ওর মুখে কষে দিয়েছিল এক ঘুষি, তারই জন্যে—মানে ঐ নিন্‌কার জন্যে। সেবার এসেছিল এক বুড়ো—নিন্‌কার কাছে—এসেছিল সারারাত থাকবে ব'লে। আর তার মধ্যে হয়েছে কি নিন্‌কা দেখেছে ফল—তবুও সারাক্ষণ ধরে ওকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে সেই বুড়ো —তাই কাঁদতে শুরু করে দিল নিন্‌কা, ছুটে পালিয়ে এল।'

'থাক, থাক, নিউরা; ভারি বিশ্রী লাগছে সে-কথা, ক্লান্তিভরা মুখচ্ছবিতে তাকে থামতে বললেন প্লাতোনোব।

'কাটান দে! থাম্'—বেশ্যালয়ের দুর্বোধ ভাষায় কড়া সুরে হাঁক দিয়ে তাকে হুকুম করল তামারা।

কিন্তু একবার যখন ছাড়ান পেয়েছে তখন নিউরাকে থামায় কে! বলেই চলল সে।

'আর নিন্‌কা বলে 'ওর সঙ্গে আমি থাকব না, থাকব না, থাকব না, কিছুতেই থাকব না, আমাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও থাকব না।' ও বলে, 'লোকটা সারা অঙ্গ আমার থুথুতে ভিজিয়ে দিয়েছে।' আর এদিকে হয়েছে কি, বুড়ো এসে নালিশ করেছে খিদমতগারের কাছে, আর খিদমতগার, মাইরি, ছুটে এসেছে নিন্‌কাকে ঠেঙিয়ে সিধে করবে ব'লে। সেরজাই ইবানোবিচ তখন আমার হয়ে বাড়িতে, মানে দেশে, একখানা চিঠি লিখছিল, কিন্তু যেই না শুনেছে নিন্‌কা চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছে—'

'ওর মুখ চেপে ধর তো, জো,' হুকুম করলেন প্লাতোনোব।

'অমনি সেরজাই লাফিয়ে উঠে একেবারে—প্‌প্‌!' জো এসে মুখ চেপে ধরতেই নিউরার বাক্যস্রোত আচম্‌কা গেল স্তব্ধ হয়ে।

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। সেই গোলমালের মধ্যে উপেক্ষার চোখে চেয়ে চাপা গলায় ফরাসী বুলি আউড়ে মন্তব্য করল শুধু বোরিস সোবাস্‌নিকোব, 'ওঃ, বীরপুঙ্গব আমার!'

ততক্ষণে তার মাথায় চড়ে গেছে মদের নেশা; দেয়ালে হেলান দিয়ে যেন মারমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, উত্তেজনায় ক্রমাগত ফুঁকে চলেছে সিগারেট।

'নিন্‌কা মেয়েটি কে?' 'কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারশেঙ্কো, 'আছে কি এখন?'

'না, এখানে নেই। ছোটখাট খাঁদানাকী মেয়েটি। সাদাসিধে, ভারি অভিমানী।' —বলতে বলতে বাস্তবিকই ভারি আমোদ পেয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন সাংবাদিক। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন—'মাপ করবেন—এমনি এমনি হেসে ফেলেছি—একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই। বুড়োর কথা এইমাত্র ভারি স্পষ্ট করে মনে পড়ল আমার—ঠিক যেমনটি প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় কাপড়চোপড় আর জুতো-জোড়া বগলদাবা করে বারান্দা দিয়ে ভয়ে ভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল বেচারা—এমন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মহাপুরুষের মতো চেহারা। কোথায় কাজ করেন তিনি তা আমি জানি। কেন, আপনারাও সবাই তাঁকে চেনেন। কিন্ত সব চেয়ে মজার ব্যাপার হয়েছিল যখন ছুটতে ছুটতে বৈঠকখানাঘরে এসে ভাবলেন তিনি, এবার নিরাপদ হয়েছেন। বুঝতে পাচ্ছেন—বসেছেন তিনি এক চেয়ারে, পরেছেন তাঁর পাৎলুন, কিন্তু তখনও কিছুতেই ঠাহর পাচ্ছেন না পা ঢুকোবেন ঠিক কোথায়, অথচ এদিকে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলেছেন—'কি ভয়ানক অন্যায় কথা! লজ্জার অবধি নেই! মজা দেখিয়ে ছাড়ব! কালই তোমরা দেখবে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখানকার পাট গুটোতে হবে।'—জানেন আপনারা, কৃপা উদ্রেক করার মতো এই অসহায়তার সঙ্গে ভয় দেখাবার জন্যে এই রকমের

চিৎকারের সংমিশ্রণ এমনই কৌতুককর হয়ে উঠেছিল যে, গোমড়ামুখো সাইমন অবধি হাসতে শুরু করে দিল—যাক, এখন সাইমনের সূত্র ধরেই দেখুন না।—আমি বলছি কি, জীবনের এই অদ্ভুত জগাখিচুড়ি গোছের ব্যাপারটা লোককে হতভম্ব করে দেয়, বিভীষিকাগ্রস্ত করে তোলে। বেশ্যার দালাল, বেশ্যার অন্নোপজীবী, এদের বিষয়ে হাজারো রকমের শ্রুতিমধুর শব্দ উচ্চারণ করে বেড়াতে পারেন আপনারা, তবুও ঠিক এমন একটি সাইমনের কথা কল্পনায়ও আনতে পারবেন না। জীবন এমনই শতধাবিচ্ছিন্ন, এমনই এক বহুরূপীর খেলা। নয়ত ধরুন না আনা মারকোব্‌নার কথা—এখানকার স্বত্বাধিকারিণী তিনি। এই রক্তচোষা হায়েনা, ক্রূরস্বভাবা নারী, যাই কিছু বলুন না তাঁকে, ইনিই হচ্ছেন আবার যার-পর-নাই স্নেহশীলা জননী। এ'র একটি কন্যা আছে—বার্ডি, ইস্কুলে পঞ্চম মানের ছাত্রী সে এখন। যদি একবারটি আপনারা দেখতে পেতেন—মায়ের পেশা কি মেয়ে যেন তা ঘুণাক্ষরেও টের না পায় তার জন্যে এ'র কি অসম্ভব রকমের প্রয়াস! তা ছাড়া সব-কিছুই শুধু বার্ডির জন্যে। নিজে তিনি মেয়ের সামনে কথা কইতে অবধি ভরসা পান না, ভয় হয় পাছে বৃদ্ধবেশ্যার চিরাভ্যস্ত অশ্লীল বুলি মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে। শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি, পুরোনো দাসীর মতো, নির্বোধ স্নেহান্ধ পরিচারিকার মতো, বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ঘেয়ো কুকুরীর মতো নত হয়ে থাকেন। বহুকাল হয়ে গেল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম উপভোগের সময় এসেছে তাঁর; তাঁর টাকার কোন অভাব নেই, যে-কাজ নিয়ে আছেন তিনি তা শ্রমসাধ্য এবং বিরক্তিজনকও বটে, তা ছাড়া যথেষ্ট বয়সও হয়েছে তাঁর। কিন্তু তা হতে পারে না, কিছুতেই নয়, আর-একটি হাজারের প্রয়োজন, তারপর আরও একটি, আরও একটি—সবই শুধু বার্ডির জন্যে। চড়ে বেড়াবার জন্যে বার্ডিকে ঘোড়ার পর ঘোড়া কিনে দেওয়া হচ্ছে, তার জন্যে রাখা হয়েছে একজন ইংরেজ অভিভাবিকা, ফি-বছর বার্ডিকে বিদেশ-ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়, বার্ডিকে কিনে দেওয়া হয়েছে হীরের গয়না, তাতে লেগেছে চল্লিশ হাজার—কে জানে সেগুলো কার, মানে এই গয়নাগুলো। আর এ শুধু আমার নিশ্চিত বিশ্বাসই নয়, আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, এ সেই বার্ডির সুখের জন্যে—না ঠিক তার সুখের জন্যেও নয়, বরং ধরুন তার কড়ে আঙ্গুলটির নখের কোণে একটু চামড়া ছিঁড়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে—তা যদি হয়, তবে সেটুকু যন্ত্রণা দূর করবার জন্যে কি ব্যাপার হবে একবার শুধু কল্পনা করে দেখুন! আনা মারকোব্‌নার চোখের পাতাটি কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও কেঁপে উঠবে না, অবহেলায় তিনি মহাপাতকের মুখে ঠেলে দেবেন আমাদের বোন আর মেয়েদের। আমাদের সবার দেহে, আমাদের ছেলেদেরও দেহে সংক্রামিত করে দেবেন গর্মীরোগ। কি? রাক্ষসী, এই তো বলতে চান? আমি কিন্তু বলব ওঁর এই সব কাজের মূলে রয়েছে ঠিক সেই একই মহৎ, যুক্তিহীন, অন্ধ, আত্মকেন্দ্রিক অনুরাগ যার জন্যে আমাদের জননীদের আমরা বলে থাকি সাধ্বী রমণী।'

'বাঁকের পথে সামলে চলো, ভাই!' দাঁতে দাঁত পিষে মন্তব্য করল বোরিস সোবাস্‌নিকোব।

'মাপ করবেন, আমি কারও সঙ্গে কারও তুলনা করছিলাম না, শুধু মানবমনের প্রবৃত্তির উৎস সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করছিলেন। মানবেতর প্রাণীদের আত্মবিসর্জনশীল মাতৃস্নেহকেও উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত করতে বাধা নেই আমার। যাক, একটা ভারি নীরস ব্যাপারের আলোচনা বন্ধ করাই ভালো।'

'না, আপনার বক্তব্য শেষ করুন আপনি,'—বাধা দিয়ে বলল লিখোনিন, 'মনে হচ্ছে আপনার মগজের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ভাব।'

'নিতান্তই সরল ভাব, বলতে পারেন। সেদিন জনৈক অধ্যাপক আমায় জিজ্ঞেস করেন কোনরূপ সাহিত্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানকার জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে যাচ্ছি

কি না। তাকে আমি বললাম, আমি শুধু চোখ মেলে চেয়েই দেখতে পারি, লক্ষ্য করে দেখতে জানি না। এই আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করলাম সাইমন আর এক কুটনীকে। আমি বুঝতে পারি না কেন, কিন্তু অনুভব করে থাকি এই ব্যাপারটা যে, এদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জীবনের কোন-এক অন্তর্গূঢ়, বীভৎস, অলংঘনীয় বাস্তব সত্য; তা বুঝিয়ে বলবার, কি চোখের সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা আমার নেই। এর জন্যে প্রয়োজন সেই শক্তির যা সামান্য, অতি তুচ্ছ একটা ঘটনাকে এমন ভাবে চোখের সামনে তুলে ধরবে, এমন সহজে তাতে একতিল রস সঞ্চার করবে যে, তা থেকে নিমেষে যে ভয়ঙ্কর সত্যের উদ্ভব ঘটবে তা দেখে স্তম্ভিত পাঠক হতবুদ্ধি হয়ে এ অনুভূতিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে বসে থাকবে যে এতক্ষণ সে মুখব্যাদান করে রয়েছে। শব্দ-সম্ভারের মধ্যে, আর্তচিৎকারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিক্ষেপে, লোকে খুঁজে মরে ভয়ানকরস। ভালো কথা, উদাহরণস্বরূপ ধরুন—আমি পড়ছি কোন এক সঙ্গবদ্ধ হত্যালীলার বর্ণনা, কি কোন কয়েদখানার মধ্যে পাইকিরি-দরের হত্যাকাণ্ডের কাহিনী, কিংবা কোন গণবিক্ষোভ দমন করার গল্প। যথেচ্ছাচারের বাহন পুলিসবাহিনী সম্বন্ধে সেখানে বস্তুতই পাঠ করছি যে তারা মন্থরপদে অগ্রসর হচ্ছে হাঁটু অবধি উঁচু রক্তস্রোতের উজান ঠেলে, নইলে এমন বিষয়ে তারা লিখবেই বা কি? বাস্তবিকই এ-সব বর্ণনা মর্মপীড়াদায়ক, উত্তেজনাপ্রসূ, ঘৃণ্য, কিন্তু এ সবই বুঝি আমরা মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে নয়। কিন্তু ধরুন, লেব্যাঝিয়া ষ্ট্রীট দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি, পথ চলতে চলতে দেখতে পেলাম এক জায়গায় জমেছে লোকের ভিড়, ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে—মায়ের সঙ্গে পথ চলতে চলতে পেছনে পড়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটি, নয়ত এমনও হতে পারে তার মা নিজেই ইচ্ছে করে ফেলে গেছে তাকে। আর মেয়েটির সামনে উবু হয়ে বসে আছে এক পাহারাওয়ালা। প্রশ্ন করছে সে মেয়েটিকে—নাম কি, বাড়ি কোথায়, বাবার নাম কি, এই সব। ঘেমে নেয়ে উঠেছে বেচারা পাহারাওয়ালা, টুপিটা খসে পড়েছে ঘাড়ের দিকে, গুঁফো মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে এমন মমতা, করুণা আর অসহায়তার ভাব যে তা কি বলব! গলার আওয়াজ কি মৃদু, কি মধুর! তারপর, বলুন দেখি কি ঘটতে পারে? মেয়েটি তো এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙেছে; সব্বাইকে তার ভয়; আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারা—লোকটা, মানে সেই রোঁদে-বেরোনো পাহারাওয়ালা, তখন শক্ত কড়াপড়া হাতের দুই আঙুল, তর্জনী আর কনিষ্ঠা—মুখে পুরে দিয়ে মেয়েটিকে ভোলাবার জন্যে দুধলো ছাগলের ডাক নকল করতে লেগে গেল। আর তারই সঙ্গে আবৃত্তি করে চলল এক ছেলে-ভোলানো ছড়া!—আর তাই যখন আমার চোখে পড়ে এই মন-ভোলানো মধুর দৃশ্যটি তখন আমি ভাবি যে, আধঘণ্টা পরে সেই লোকটাই যখন থানায় গিয়ে হাজির হবে তখন হয়ত এমন একটা লোকের মুখে আর বুকে বুটসুদ্ধ পায়ের লাথি মারতে শুরু করবে যাকে সে ইতিপূর্বে কখনও চোখেও দেখেনি, যার অপরাধটা যে কি তা-ও সে কিছুই জানে না। এখন বুঝতে পারছেন ব্যাপারখানা? এ-সব কথা যখন ভাবি তখন যে কি রকম একটা ছমছমে ভাব, কি একটা বিষণ্ণতা পেয়ে বসে আমায় কি বলব! তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করি, মন দিয়ে নয়। জীবনটা এই রকমেরই এক শয়তানী জগাখিচুড়ি।—কিছু কনিয়াক্ চলবে, লিখোনিন?'

'আচ্ছা, আমাদের মধ্যে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে কেমন হয়?'—হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল লিখোনিন।

'মন্দ কি! তবে হ্যাঁ, এখন এই চুমো-টুমো খাওয়ার কাজটা বাদ দিয়ে। এই যে, কল্যাণ হোক তোমার ভাই।'—বলে এক গেলাস কনিয়াক্ উঁচু করে ধরলেন সাংবাদিক। তারপর সেটা পান করে ফের শুরু করলেন তিনি,—'নয়ত ধর আর-একটা উদাহরণ। একখানা নামকরা ফরাসী উপন্যাসে আমি পড়েছি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক

ব্যক্তির চিন্তাধারা ও অনুভূতির বর্ণনা। মধুর বাক্যবিন্যাসে চমৎকার ভাষায় পরম শক্তিমত্তার সঙ্গে লেখক তা বর্ণনা করে গেছেন। পড়ছি, পড়ছি—কিন্তু তবুও কেন যেন তা মনে রেখাপাত করছে না; বেদনাবোধ কি বিরক্তি কোনটি জাগাতেই না—শুধুই নীরসতার উদ্রেক মনের ভেতর করছে। কিন্তু অল্প কয়েকদিন হল এক খবরের কাগজে ফ্রান্সের কোথায় এক নরহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড বিধানের একটি বিবরণ পড়ছিলাম। জেল-দারোগা লোকটার শেষ অঙ্গসজ্জার সময় উপস্থিত ছিল, সে দেখল লোকটা জুতো পরল খালি পায়ে। দেখে সে আহাম্মক তাকে মনে করিয়ে দিল, 'মোজা পরলে না?' লোকটা তার দিকে চোখ তুলে চাইল, একটু যেন চিন্তিত ভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'দরকার কি?' বুঝতে পাচ্ছ? দুটো ছোট্ট কথা, কিন্তু যেন মাথায় লাঠি মেরে চেতনা জাগিয়ে দিল আমার। মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল আমার কাছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অন্তর্নিহিত ভীষণতা, তার নির্বিকার মূঢ়তা। নয়ত শোন মৃত্যু সম্বন্ধে আর-একটা কথা। আমার এক বন্ধু মারা যায়, পদাতিক সৈন্যদলের এক ক্যাপটেন—মাতাল, ভবঘুরে, অথচ এমন দিল-দরিয়া লোক আর দুনিয়ায় মেলে না। কোন-একটা কারণবশত আমরা তার নাম দিয়ে-ছিলাম বিজলী কাপ্তান। আমি তখন সেই অঞ্চলেই ছিলাম; আমারই উপরে পড়ল অন্তিম কুচকাওয়াজের জন্যে তাকে সাজিয়ে দেবার ভার। তার উর্দিখানা নিয়ে আমি তার কাঁধের ফিতেগুলো পরাচ্ছি। তোমরা জান তাতে একটা দড়ি থাকে, কাঁধের দিককার বোতামগুলোর মধ্যে দিয়ে নিয়ে সেটার মুখ দুটো একসঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। ভারি গোলমেলে কাজ। যাক, সবই তো ঠিক করলাম, কিন্তু দড়ির মুখ দুটোয় ফস্কা গেরো পরাতে পাচ্ছি না কিছুতেই—হয় একটা মুখ বেশি ছোট হয়ে যায়, নয় গেরোটা ঢিলে হয়ে পড়ে। এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, হঠাৎ আমার মাথায় এল একবারে তাক লাগিয়ে দেবার মতো এক সহজ বুদ্ধি—মুখ দুটো নিয়ে ফস্কা গেরো বাঁধবার দরকারটা কি? এমনি গেরো দিয়ে দিলেই তো গোল চুকে যায়—কেউ তো আর সে-গেরো খুলতে যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করলাম মৃত্যুকে। তার আগে পর্যন্ত ক্যাপটেনের চোখের দিকে চেয়ে দেখেছি, দেখেছি তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে; তার কপালে হাত দিয়ে দেখেছি কপাল ঠাণ্ডা হিম হয়ে এসেছে, কিন্তু যেই সেই গেরো দেবার কথা মনে পড়ল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্য দিয়ে যেন শাণিত তীর চলে গেল, দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে অনুভব করলাম আমাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, অনুভূতি, সব-কিছুরই, এই সমগ্র দৃশ্যমান জগতের, অমোঘ, অনিবার্য বিলুপ্তি; সে-অনুভূতি যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল আমায়। এই রকমের শত শত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার বিবরণ দিতে পারি আমি। আমি চাইছি আমার চিন্তাধারাকে বিশেষ একটা লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে। আমাদের চারপাশে এই যে সব তুচ্ছ ব্যাপার ছড়িয়ে পড়ে আছে, অন্ধের মতো —যেন দেখতে পাইনি বলে—সে-সব অগ্রাহ্য করে চলি আমরা। কিন্তু আসবেন শিল্পী, সযত্নে লক্ষ্য করবেন এই সব খুঁটিনাটি, খুটে তুলবেন মাটি থেকে; তারপর অকস্মাৎ জীবনের এরূপ একটি কণাকে সূর্যের আলোয় এনে এমনভাবে সবার চোখের সামনে তুলে ধরবেন যে, আমরা প্রত্যেকে চিৎকার করে উঠব—'হা ভগবান! এ যে আমি নিজেরই চোখে দেখেছি। শুধু মনোযোগ দিয়ে দেখবার কথাটা মাথায় ঢোকেনি আমার।' কিন্তু আমাদের এই রুশীয় সাহিত্যিকেরা—সারা জগতের মধ্যে সবচেয়ে দরদী আর সবচেয়ে বিবেকী রূপশিল্পী এঁরা—কেন কি জানি, এ পর্যন্ত গণিকাবৃত্তি ও গণিকালয়কে এড়িয়েই চলে এসেছেন। কেন? বাস্তবিকই এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। হয়ত রুচিবিগর্হিত বলে কিংবা সাহসের অভাবে—ভয় পান পাছে অশ্লীল রচনার লেখক বলে বদনামের ভাগী হতে হয়; শেষ অবধি হয়ত ভড়কে যান এই ভেবে যে, ইতর লোকে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠবে, সাহিত্যস্রষ্টার

জীবনের গুপ্ত তথ্যের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগে যাবে তারা। কিংবা হয়ত তাঁরা সময়ও করে উঠতে পারেন না—জীবনের পঙ্কিল স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সোজাসুজি তার উৎসমুখে এসে মধুর বাক্যজাল, ভীরু দয়া, সব-কিছু পরিহার করে, এর যাবতীয় রাক্ষসী সরলতায় প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের পটভূমিতে সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে একে বিচার করে দেখবার মতো আত্মত্যাগের স্পৃহা এবং চরিত্রবল সঞ্চয় করে উঠতে অপারগ তাঁরা। ওঃ, তা যদি সম্ভবপর হত তবে কি প্রচন্ড, কি শক্তিমান, কি সত্যময় একখানি মহাগ্রন্থই না রচিত হতে পারত!'

'কিন্তু তাঁরা তো লিখে থাকেন।'—যেন অনিচ্ছাভরেই মন্তব্য করল রামেশিস।

'লেখেন বটে,' ক্লান্তকণ্ঠে রামেশিসের মতোই অনিচ্ছাভরে উত্তর দিলেন প্লাতোনোব, 'কিন্তু সে-সব লেখা হয় মিথ্যেয় ভরা, নয় ছেলে-ভোলানো কি মনমাতানোর জন্যে বেশ রঙিন করে নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা, নয়ত সে সব হচ্ছে ভাবীকালের ঋষিদের কাছে বোধগম্য সুচতুর রূপক মাত্র। বাস্তবের ধার-কাছ দিয়েও যায়নি সে-সব লেখা। শুধু একজন বড় লেখক—স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ছিল তাঁর হৃদয়, চরিত্রাঙ্কনে ছিল অদ্ভুত প্রতিভা--তিনি এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু বাইরের লোকের চোখে যা-যা পড়তে পারে শুধু সেই সব জিনিসই প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর মনোমুকুরে। শুধু খিদমতগারের কুকুরের গায়ের লোমের মতো রুক্ষ চুলের দিকে চেয়ে মন্তব্য করেন তিনি, 'কিন্তু এঁরও তো মা ছিল!' তাঁর সুতীক্ষ্ম জ্ঞানদৃষ্টি নিয়ে বেশ্যাদের মুখের দিকে চেয়েই চলে গেছেন তিনি। যে-বিষয়ে জানতেন না কিছু, সে-বিষয়ে লিখতেও ভরসা পাননি তিনি। তা ছাড়া এ-ও লক্ষ্য করবার মতো বিষয় যে, এই সাধু সত্যসন্ধ লেখক একাধিক বার চাষীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে এ-কথা বেশ উপলব্ধি করতেন যে, এ-সব লোকের কথাবার্তার ভঙ্গি, তাদের মনের গড়ন, তাদের অন্তরাত্মা, এ সবই তাঁর কাছে হচ্ছে অন্ধকার, অবোধ্য। তাঁর বিস্ময়কর কলা-চাতুর্য নিয়ে বিনম্রচিত্তে লোকের অন্তর-মন্দির প্রদক্ষিণ করে বেড়াতেন তিনি, কিন্তু তাঁর সে-সব অভিজ্ঞতার অপরূপ সঞ্চয় বাইরে প্রক্ষেপ করেছেন তিনি শহরবাসীদের দৃষ্টির ভেতর দিয়ে। এ-কথার অবতারণা করেছি আমি ইচ্ছে করেই। আপনারা জানেন আমাদের লেখকেরা গল্প রচনা করেন গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে, আইনজীবীদের বিষয়ে, রাজস্ববিভাগের পরিদর্শকদের নিয়ে; শিক্ষক, অ্যাটর্নী, পুলিস, সামরিক কর্ম-চারী, এঁদের সকলের বিষয়ে; কামাতুরা ভদ্রমহিলাদের উপলক্ষ্য করে; ইঞ্জিনীয়ার, সঙ্গীতজ্ঞ এই সব লোকদের সম্বন্ধে—আর বাস্তবিকই ভগবানের নামে শপথ কেটেই বলা যায় যে, লেখেন তাঁরা বেশ ভালোই, তাঁদের লেখায় মুন্সিয়ানা আছে, কলাকৌশলের অভাব নেই, প্রতিভারও স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায়। তবুও এই সব লোকের জীবন নিয়ে লেখবার আছে কি? এরা সব হচ্ছে জীবনের আবর্জনা। তাদের জীবন জীবনই নয়, তা হচ্ছে জগতের সংস্কৃতি-ভান্ডারের এক রকমের কাল্পনিক প্রেতসদৃশ, অনর্থক প্রলাপমাত্র। জগতে রয়েছে আপন বৈশিষ্ট্যে স্থিতিশীল দুটি মাত্র অনুপম বাস্তব—ঠিক এই মানবজাতির মতোই সুপ্রাচীন—এই বেশ্যা আর ঐ চাষী। অথচ এদের বিষয়ে জানি না আমরা কিছুই—শুধু এক সাহিত্যের খানিকটা রাঙতামোড়া উগ্রস্বাদ বিকৃতাঙ্গ চিত্রাঙ্কন ছাড়া। জিজ্ঞেস করছি আমি—গণিকাবৃত্তির এই নিদারুণ দুঃস্বপ্ন থেকে কত-টুকু কি উদ্ধার করে আনা হয়েছে রুশীয় সাহিত্যে? শুধু এক ঐ সোনেচ্‌কা মারমেলাদোবা (দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসের নায়িকা)। চাষীর বিষয়ে তা আপনাদের কি দিয়েছে এক এই খানিকটা জঘন্য, মিথ্যা, জাতীয়তাভাবে প্রণোদিত পল্লীগাথা ছাড়া? একটি মাত্র, শুধুই ঐ একটিই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেটি—এক মর্মবিদারক ট্র্যাজেডি, তার সত্যভাষণ

শ্বাসপ্রশ্বাসকে রোধ করে দেয়, রোমাঞ্চ জাগায় সর্বদেহে। বুঝতে পাচ্ছেন বোধহয় কিসের কথা বলছি আমি।'

'নখের ডগা বিঁধল এসে' —আস্তে আস্তে আবৃত্তি করে লিখোনিন।

'হ্যাঁ, যা বলেছ,' লিখোনিনের দিকে সকৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে বলেন সাংবাদিক।

'কিন্তু সোনেচ্‌কার কথা কেন, সে তো একটা অবাস্তব টাইপ মাত্র,' নিশ্চিত বিশ্বাসে মন্তব্য করলেন ইয়ারশেঙ্কো,—'মনস্তত্ত্বের মারপ্যাঁচ দেখাবার কৌশল বলা যেতে পারে।'

'একশ বার শুনেছি একথা, একশ বার! তবুও কথাটা মিথ্যে! তার স্থূল, অশ্লীল পেশাদারির অন্তরালে, তার এই লোকের মা তুলে জঘন্যতম গালিগালাজের অন্তরালে—তার সে মাতাল অবস্থার, সেই অতি-কুৎসিত বহিরঙ্গের অন্তরালে—আজও বেঁচে আছে সোনেচ্‌কা মারমেলাদোবা! রুশীয় গণিকার ভাগ্য; ওঃ, কি ভীষণ, মর্মন্তুদ, রক্ত-কলঙ্কিত, কিম্ভূতকিমাকার, আর পদে পদে নির্বুদ্ধিতায় ভরা সে পথ! সব-কিছুই সেখানে যেন এসে ঠেকেছে এক বিপরীতকাণ্ডে—রুশীয় ভগবান, রুশীয় ঔদার্য ও ঔদাসীন্য, জীবনের পথে কারও পদস্খলন ঘটলে সে-বিষয়ে রুশীয় হতাশা, রুশীয়দের মধ্যে সংস্কৃতির অভাব, রুশীয় সরলতা, রুশীয় ধৈর্য, রুশীয় নির্লজ্জতা! কেন, যাদেরই তোমরা শয়ন-কক্ষে নিয়ে যাও তাদের সবাই,—তাদের দিকে চেয়ে দেখ, দেখ তাকিয়ে—তাদের সবাই হচ্ছে শিশু; প্রত্যেকেরই বয়স যেন মাত্র এগার বছর। ভাগ্য তাদের ঠেলে দিয়েছে বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে, আর সেই থেকে তাদের যাপন করে আসতে হচ্ছে এক ধরনের অদ্ভুত, পরীদের মতো, খেলার পুতুলের মতো, এক অবাস্তব অস্তিত্ব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারছে না তারা, ঘটছে না জীবনের পথে তাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, সবাই থেকে যাচ্ছে অবোধ, নির্ভরশীল, খামখেয়ালী; তারা জানে না কি বলবে বা করবে এই আধ ঘণ্টা পরে—সব-কিছু মিলিয়ে একেবারে শিশুর মতন। এই সরল অথচ কিম্ভূতকিমাকার শিশুভাব দেখেছি আমি একেবারে পতনের নিম্নতম স্তরে ডুবে গেছে—সেই মাজাভাঙ্গা ঠিকে-গাড়ির ঘেয়ো ঘোড়ার মতো কঙ্কালসার বৃদ্ধ-বেশ্যাদের মধ্যে পর্যন্ত। তবুও তাদের মধ্যে কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না এই অক্ষম কৃপাবৃত্তি, মানুষের দুঃখদৈন্য মোচনের জন্যে এই ব্যর্থ কাতরতা।—উদাহরণস্বরূপ—' বলতে বলতে ধীরে ধীরে শ্রোতাদের সকলের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন প্লাতোনোব; তারপর হঠাৎ হতাশার ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'যাক গে—মরুক গে যাক! ঢের হয়েছে—যেন দশ বছরের কথা বলে ফেলেছি একদিনে আজ। কিন্তু সবই বৃথা!'

'কিন্তু বাস্তবিক, সেরজাই ইবানিচ, এ-সব নিজে কেন বর্ণনা করার চেষ্টা কর না?' জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারশেঙ্কো। 'তোমার মনোযোগ তো এ সমস্যার ওপর খুব দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়েছে।'

'চেষ্টা করেছিলাম,'—হেসে বললেন প্লাতোনোব, 'কিন্তু হল না। লিখতে গিয়ে দেখি, যত রাজ্যের 'কেন,' 'কে,' 'কোথায়' এসে পড়ে কলমের মুখে। এই সব গরম গরম কথা, কাগজে দেখি নরম হয়ে গেছে। তেরেখোবকে জান নিশ্চয়ই—সে একবার এখানে এসেছিল। সেই যে বেশ নামজাদা—তাকে আমি এদের বিষয়ে অনেক কিছুই বলেছিলাম—যা তোমরা বিরক্ত হবে বলে এখানেও বলিনি। তাকে বললাম—আমার এই সব কথা নিয়ে তুমি কিছু লেখ। সব কথা শুনে শেষে সে বলল—'প্লাতোনোব, রাগ করো না। পরের কথা নিয়ে বই লেখা যায় না। তুমি যা বললে তা নিয়ে লেখা উচিত আমি বুঝছি; কিন্তু কি করব, লেখার মতো লিখতে হলে শুনে লিখলে তো হবে না; তাদের সঙ্গে মিশে তাদেরই একজন হয়ে তাদের মর্মকথা বুঝতে হবে। তারপর

যে-প্রেরণা আসবে তা থেকেই সৃষ্টি হবে প্রকৃত রচনা। তেরেখোবের কথা শুনে মনটা আমার দমে গেল বটে, কিন্তু আশাও হল এই ভেবে যে, আজ না হোক, পঞ্চাশ বছর পরে হয়ত একজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হবে—হয়ত এই রুশীয়াতেই—যিনি এদের জীবনের ধারা এমন সুন্দর, সরল, সহজ করে লিখে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন যে আমরা বিস্ময়ে চমকে বলে উঠব, 'সত্যিই তো—কি ভীষণ! কি ভীষণ! কি ভয়ানক এই গণিকাবৃত্তি!'—আসবে সেদিন।'

'তাই যেন হয়,'—বলল লিখোনিন, 'এস, সেই অনাগত লেখকের সম্মানে পান করা যাক।'

হঠাৎ বলে উঠল ছোট মান্‌কা, 'কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিষয়ে সত্যি কথা লেখে, ভারি বিশ্রী হবে সে। আমরা যে কত বড় পাপী—'

কে যেন এসে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলে যেতেই ঘরে এসে ঢুকল জেনী, —কমলা রঙের ঝকঝকে পোশাক পরনে তার।

১১

ঘরে ঢুকে সবাইকে সস্মিত ভাবে অভিবাদন করল জেনী। পরে এসে বসল সেরজাই ইবানোবিচের পিছনের একটা চেয়ারে। এতক্ষণ সে সেই জার্মান শিক্ষকের সঙ্গে ছিল —মানে, মান্‌কাকে নিয়ে খুশি হতে না পারায়, যোসিয়া পাশাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল। যথাকালে সে-পর্বও চুকল। কিন্তু ভদ্রলোকের প্রাণে বিঁধে ছিল জেনীর তেজ, তার আত্মাভিমান, তার সৌন্দর্য। তাই ঘণ্টা-তিনেক ধরে এ-রেস্তরাঁ ও-মদের দোকান —এই রকম ঘুর ঘুর করে সাহস সঞ্চয় করে শেষটায় এলেন তিনি তাঁর মানসীর জন্যে। এসে দেখলেন জেনীর ঘরের দরজা বন্ধ। তার 'বাঁধাবাবু' চশমাওয়ালা কার্ল ভার্লোভিচ্ এসে গেছে তাঁর আগে। কি আর করবেন—অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। তারপর যখন ঘর খালি হল, তখন তিনি এসে ঢুকলেন। আর এই একটু আগেই চলে গেলেন তিনি।

জেনীর দিকে চেয়ে দেখলেন প্লাতোনোব। দেখলেন তার সুন্দর মুখখানি, দীপ্তিময় চোখ দুটি; গরবিনী নারী রয়েছে ঠোঁট চেপে; আভিজাত্য যেন সারা অঙ্গে মাখা তার। বড় সুন্দর লাগছিল প্লাতোনোবের। লক্ষ্য করে দেখলেন, এক লিখোনিন ছাড়া আর সব ছাত্রই তাকে দেখছে—কেউ আড়চোখে, কেউ বা বেহায়ার মতো, চোখে তাদের কৌতূহল ও কামনার ছায়া।

'কি ভাবছ, জেনী?' জিজ্ঞেস করলেন প্লাতোনোব।

'কিছু নয়। আমাদের মেয়েলী ব্যাপার। তেমন কিছুই নয়।'

বলেই সে তাদের পাঁচমিশেলি গোপন ভাষায় কি যেন বলল তামারার কানেকানে।

তামারা বলল, 'সেরজাইকে ভোলাতে পারবে না। ভারি চালাক ও।'

বুঝতে পেরেছেন প্লাতোনোব। জেনী বলছিল, আজ নাকি পাশকাকে দশবার দশজন লোককে ঘরে বসাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু পরে জ্ঞান হতেই আবার নাকি এমা তাকে এনে বৈঠকখানায় বসিয়েছে—নতুন খদ্দেরের জন্যে। জেনী নাকি বলেছিল—ওকে ছেড়ে দাও, আমি না হয় ওর হয়ে লোক বসাব। তাতে এমা আপত্তি করে বলেছে, এ-রকম করলে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারশেঙ্কো।

'কিছু না। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার।—তোমার মদ একটু খাব, সেরজাই?'

নিজের হাতেই আধ-গেলাস আন্দাজ ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে সবটা শেষ করে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জেনী। কিছু না বলে প্লাতোনোব ততক্ষণে উঠে একেবারে দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির হয়েছেন।

'দরকার নেই, সেরজাই, ছাড়ান দাও,' বলে তাকে থামাতে গেল জেনী।

'না, তা হয় না,' আপত্তি করলেন সাংবাদিক, 'এক কাজ করি বরং—পাশাকে নিয়ে আসি এখানে, আর ঐ রাক্ষসীদের পাওনা মিটিয়ে দিই। পাশা ততক্ষণ এখানে শুয়ে একটু বিশ্রাম করুক। নিউরা, চট করে একটা বালিশ নিয়ে এস তো!'

প্লাতোনোব বাইরে যেতে-না-যেতেই বলে উঠল বোরিস সোবাস্‌নিকোব, 'এ সব হচ্ছে কি? কোথায় আমরা এলাম একটু স্ফূর্তি করতে, আর ঐ লোকটা চায় ঝঞ্ঝাট বাধাতে। কে না কে! লিখোনিনের যত সব—'

'লিখোনিন নয়, আমিই ওকে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছি,'—বলল রামেশিস, 'আমি জানি ও যা-তা লোক নয়।'

'কি তবে? পরের মাথায় হাত বোলাতে ওস্তাদ। পরের খরচে মদ খাচ্ছে। ওদের দালাল নিশ্চয়। লোক ধরে আনলে দালালি পায়।'

'ও-সব কি বকছ বোকার মতো?' ধমক দিয়ে বললেন ইয়ারশেঙ্কো।

জেনী এতক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়েছিল ছেলেটির দিকে; হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'বাহবা, বাহবা হে ছোকরা! সেরজাই আসুক, সব বলে দেব।'

'নিজেই সব বলব। ভয় করি নাকি?' উত্তর দিল সোবাস্‌নিকোব।

'অত ওস্তাদি করিস না, বোরিস; এখানে আমরা সবাই সমান।' বলল লিখোনিন।

এমন সময় নিউরা এল বালিশ নিয়ে। 'আবার বালিশ-টালিশ কেন?' চেঁচিয়ে উঠল সোবাস্‌নিকোব 'এ কি বোর্ডিং হাউস পেলে নাকি?'

'থাক না কেন, প্রাণ!'—ভারি মিঠে গলায় বলে উঠল জেনী, 'তোমার তাতে কি?' তারপর বালিশখানা তামারার পিছনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও প্রাণ, আমি বরঞ্চ তোমার কাছে গিয়ে বসি একটু।'

বলেই টেবিলের পাশ কাটিয়ে জেনী সিধে চলে এল বোরিস-এর কাছে। জোর করে তাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েই ধপ করে বসে পড়ল তার কোলে, তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরে নিজের ঠোঁট দুখানা এমন জোরে তার মুখের উপরে চেপে ধরে পড়ে রইল যে, সে-বেচারার তো এদিকে দম বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড়! সোজাসুজি নিজের চোখের উপরে বোরিস দেখতে পেল একটি মেয়ের একজোড়া কালো চোখ, অদ্ভুত রকমে ডাগর হয়ে উঠে জ্বলজ্বল করছে—তারপরই ঝাপসা স্থির! নিমেষের জন্য মনে হল, তার সে চাহনিতে রয়েছে প্রেতের মতো কি-এক তীব্র উন্মত্ত বিদ্বেষ মাখানো। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল সে অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়। কোনমতে নিজেকে জেনীর পেলব বাহুলতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, মুখে হাসি টেনে এনে বলে উঠল সে, 'ও জেন্‌কা, তুমি সুন্দরী, মায়াবিনী, ভয়ঙ্করী!'

পাশাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন প্লাতোনোব। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মেয়েটার, আধো-নিমীলিত চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ক্ষীণ অবোধ হাসির রেশ, ঠোঁট দুখানা পড়েছে ঝুলে। হাঁটছে যেন কেমন ক'রে—এক পা বড় বড় করে ফেলে আর-এক পা ছোট ছোট করে টেনে টেনে। 'তামারা, একে এক টুকরো চকোলেট আর একটু মদ দাও তো,'—বললেন প্লাতোনোব।

উঠে দাঁড়াল বোরিস সোবাস্‌নিকোব। মাথা উঁচু করে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল,

'ওহে, কি যেন তোমার নাম? ও মেয়েটা কি তোমার রক্ষিতা?' পা দিয়ে দেখিয়ে দিল পাশাকে।

'কি বললে?'

'ঐ হল। ও তোমার রক্ষিতা নয় যদি, তবে তুমি বোধ হয় ওর নাগর। ঐ একই কথা।'

'শুনুন!'—গম্ভীর হয়ে বললেন সেরজাই, 'আপনি কেবলই আমার সঙ্গে অযথা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছেন। বেশি মদ খেয়ে এভাবে মাতলামি করলে ফল কিন্তু ভালো হবে না। আপনার বন্ধুদের খাতিরে কিছু বললাম না এবার। কিন্তু ফের যদি আপনি এ-ধরনের কথা বলেন তবে তার আগে আপনার চশমা খুলে রাখবেন।'

'চশমা! কিসের চশমা? কেন খুলব?'

'আপনাকে ঘা-কতক দিতে হবে কিনা তাই। তাতে চশমার কাঁচ চোখে ঢুকে গেলে ফল খারাপ হতে পারে।'

'বেশ, এই আমি চললাম। এ-রকম লোকের সঙ্গে থাকা আমি লজ্জাকর মনে করি।'—রাগে গরগর করতে করতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বোরিস। তার ইচ্ছে করছিল যাবার সময় দেয় সেরজাইয়ের নাকে এক ঘুঁষি বসিয়ে। কিন্তু সেরজাইয়ের বলিষ্ঠ হাত, মোটা কব্জি, আর চওড়া কপাল দেখে তার একটু ভয় হল। নাঃ, দরকার নেই। নিজের মান নিজের হাতে। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

'নোংরা আপদ বিদেয় হল, ভালোয় ভালোয় বাঁচা গেল,' তার দিকে চেয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠল জেনী। তারপর তামারার দিকে চেয়ে বলল, 'কই গো, তামারা রানী, একটু-খানি মদ দাও—খাই।'

পেত্রোবস্কি নামে ছাত্রটি ভাবল বোরিসের পক্ষ নেওয়া উচিত। তাই সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'তোমাদের কি মত জানি না, তবে আমাদের কমরেড, হতে পারে সে ভুল করেছে, কিন্তু তাকে যখন অপমান করা হল তখন এখানে আমার অন্তত থাকা উচিত মনে করি না।

'হায় রে!' বলল লিখোনিন, 'বুঝি না বাবা! অভদ্র ব্যবহার করল বোরিস। তবু তার সঙ্গে হাত মেলাতে হবে?'

'বেশ তো, তুমি থাক না! তবে আমি চলে যাচ্ছি।' চলে গেল পেত্রোবস্কি।

'হ্যাঁ, যাও। মাথায় তোমার বাজ পড়ুক।' জেনী তার দিকে তাকিয়ে বলল।

সোবাস্নিকোব ঘরের বাইরে এসে ভাবল, ভালোই হল। জেনীকে আলাদা ডেকে এনে বেশ আমোদ করা যাবেখন।

পেত্রোবাস্কি ভাবল, যাক, বোরিসের পক্ষ নিয়েছি যখন, তখন কি আর গোটা তিনেক রুবল তার কাছ থেকে ধার পাব না?

বৈঠকখানায় এসে দুজনে কি পরামর্শ করল। একটু পরেই য়োসিযা ছাত্রদের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে বলল, 'জেনী আর নিউরা, একটু শুনে যেও এদিকে। বিশেষ দরকার।'

লজ্জা পেয়ে গেলেন সেরজাই, বললেন, 'মাপ করবেন আপনারা, আমিই বরং চলে যাই। আমার জন্যেই আপনাদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। আর হ্যাঁ, পাশার দরুন ওদের যা প্রাপ্য তা আমি সাইমনকে দিয়ে এসেছি।'

'না না। সে কি।'—লিখোনিন বলল, 'বোরিস আর বাস্কা অবুঝ নয়। তবে বয়েস কম কিনা, তাই একটু রগ-চটা। দাঁড়ান, আমি ডেকে আনছি।'

কিন্তু বাইরে গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এসে বলল—'নাঃ, হল না। দুই বাবুই এখন বিশ্রাম করছেন।'

১২

এমন সময় ছাত্রদের ঘরে এসে ঢুকল সাইমন। হাতে তার একখানা ট্রে। ট্রে-তে একখানা ভিজিটিং কার্ড। হাঁক দিয়ে সে বলল, 'এখানে আপনাদের মধ্যে কার নাম গাবরিলা পেত্রোবিচ ইয়ারশেঙ্কো—জানতে পারি কি?'

'আমার নাম,' ইয়ারশেঙ্কো বললেন।

'একজন অভিনেতা-ভদ্রলোক এই কার্ডখানা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

কার্ড হাতে নিয়ে ইয়ারশেঙ্কো জোরে জোরেই পড়লেন, 'গুমেনি পলুয়েকটোভিচ এগমন্ট-লাব্রেৎস্কি, অভিনেতা, মেট্রোপলিটান থিয়েটার।' তারপর বললেন, 'এ'কে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।' পরে কার্ডের পিছনের লেখা নজরে পড়ল, 'ও, পেছনেও কি যেন লেখা আছে। হাতের লেখা তো তেমন ভালো নয়—বোধ হয় মদ খেয়ে লেখা ; বানানও ভুল। দেখি পড়ে. 'আমি পান করিতেছি—রুশীয় বিজ্ঞানের জ্যোতিষ্ক গাবরিলা পেত্রোবিচ ইয়ারশেঙ্কোর কল্যাণ-কামনায় পান করিতেছি। তাঁহাকে বারান্দা দিয়া যাইতে দেখিয়াছি। একবার সাক্ষাৎ চাই। মনে আছে কি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'দারিদ্র্য লজ্জার নয়' নাটকে আমি আফ্রিকাবাসীর চরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলাম?'—ঠিক বটে। মনে পড়েছে এবার। গোঁফ-দাড়ি কামানো বেশ মাতব্বর গোছের লোকটি।'

'নিয়ে এস না এখানে!' লিখোনিন বলল।

'কি. আনব?'—অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন সাংবাদিককে।

'আমার কোন আপত্তি নেই। আমি বরং ওকে চিনি। এসেই বলবে—কেলনার শ্যাম্পেন। তারপর তার সুন্দরী বউয়ের গল্প বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করে দেবে। তারপর দেশভক্তি নিয়ে এক বক্তৃতা। শেষে রেস্তরাঁর বিল শোধবার সময় গণ্ডগোল। ও একাই একশ।'

মুটকী কিটির কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল কোলোদিয়া, 'তাকে আনা হোক!' কিটি তার কোলে বসে পা দোলাচ্ছিল।

'আর তুমি ভেল্টম্যান. কি বল?'

'কি? কি বলব?' ছাত্রটি হঠাৎ যেন খেই পেল না কথার, 'ও অভিনেতা! হ্যাঁ, তা আসুক—আসুক না!'

মানে ছাত্রটি এতক্ষণ মগ্ন ছিল পাশাকে নিয়ে। পাশার ঘাড়ে, মাথায়. কপালে. চুলে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে। আর পাশা আধ-বোঁজা চোখে তখনও তার সেই অবোধ লালসালুব্ধ হাসি হাসছিল শুয়ে শুয়ে।

ইয়ারশেঙ্কো সাইমনকে দিয়ে অভিনেতাকে ডাকিয়ে আনালেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অভিনেতা মশায় নাটকীয় ভঙ্গিতে টুপি খুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'হে ভদ্রমহোদয়গণ! আমি কি আপনাদের এই গোপন সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি?'

'আসুন. আসুন।'

তারপর শুরু হল হাত-ঝাঁকুনির পালা। ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ করতে লাগলেন সকলের সঙ্গে। দেখতে বেশ চালাক-চতুর ; বয়সও তেমন বেশি নয়, তবে মুখ-খানাতে রয়েছে ঘাগী লম্পট আর মদো-মাতালদের মতো একটা নীচতা, কর্কশতা, আর

কাঠিন্যের ছাপ। তাঁর পিছনে পিছনেই ঢুকলেন এসে দুজন কলাবতী—হেনরিয়েটা আর বড়ো মান্‌কা—ভদ্রলোকটির প্রণয়িনীদের দু-জন মাত্র। হেনরিয়েটা হল এখানকার—এই আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়ের—সব চেয়ে বড় মেয়ে; অনেক কিছুই দেখা আছে তার, জানে শোনেও সে ঢের। গলার আওয়াজ তার বেশ মোটা, তবে দেখতে এখনও বেশ সুন্দরী রয়েছে সে। গত রাত থেকে হেনরিয়েটা ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে, কারণ তিনি ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক হোটেলে।

অভিনেতা মশায় বেশ আমিরি চালে ইয়ারশেঙ্কোর পাশটিতে এসে বসলেন। হুকুম হল, 'কে-ল-নার শ্যাম্প-এন!' বলেই সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর সজোরে এক মুষ্ঠি-আঘাত।

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে মিশ্‌কা আর নিকি কেমন করে এসে জুটল ঘরের মধ্যে, আর জোর কদমে গান জুড়ে দিলঃ

সাঁচ্চা কথা সবাই জানে

আয় ছুটে আয় আমার পানে...সই রে!

হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল ঘরের মধ্যে। রলি-পলির ঘুম গেল ছুটে, সে-ও ছুটে এল।

সবাইকে দেখে লিখোনিন তো ভারি খুশি। কিন্তু প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো—যতক্ষণ অবধি না মদের নেশা তাঁর মাথায় চড়ে বসেছে ততক্ষণ—এ-সব দেখে শুনে চোখ দুটো কপালে তুলে ভয়ে ভয়ে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলেন শুধু চার-দিকে। গোলমাল দেখে সশব্দে জানালাগুলোর শিক এ'টে দিল সাইমন। লোক বসাবার ফাঁকে ফাঁকে, কি নাচের অবসরে, অন্য সব মেয়েরাও এক-একবার এসে ঢুঁ মেরে যেতে লাগল এখানে। বৈঠকখানা ঘরে বসতে আর মন চাইছিল না তাদের। তাই মাঝেমাঝে এসে যার-তার কোলে চড়ে, সিগারেট ফু'কে, আবোল-তাবোল সুর ভে'জে, মদের গেলাসে এক-আধ চুমুক মেরে, দু-চারটে চুমকুড়ি দিয়ে, ফের চলে যেতে লাগল তারা—আবার একটু বাদেই হয়ত বা আসতে লাগল ফিরে। মেয়েরা বৈঠকখানার লোকদের চেয়ে এদের উপরেই বেশি করে মনোযোগ দিচ্ছে বলে কেরেশকোবস্কীর কেরানীর দল একটু গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সাইমনের দু-চারটে কড়া কড়া মন্তব্য কানে এসে পড়তেই ঠান্ডা হয়ে গেল তারা।

নিউরাও এল। পিছনে পিছনে এল পেত্রোবস্কি। এসে বলল, এতক্ষণ পথে পথে ঘুরছিল সে, কিন্তু দেখল সত্যিই যখন সোবাস্‌নিকোব দোষ করেছে তখন তার সঙ্গে যোগ দেওয়াটা ঠিক হবে না।

একটু পরেই এল জেনী—একা। সোবাস্‌নিকোব তখন তার ঘরে ঘুমে অচেতন।

অভিনেতা মশায়ের গুণের অন্ত নেই। একজন মাতাল কাঁচের জানালার ধারে একটা ভনভনে মাছি ধরতে গেলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে যেমন শব্দ হয় তা নকল করে দেখালেন তিনি। ভীতু মেয়েমানুষ টেলিফোনে কেমন করে কথা কয়—তা শোনালেন। গ্রামোফোন-রেকর্ডের অনুকরণে গানও গাইলেন। পারস্য-দেশের ছেলেরা কেমন করে বাঁদর নাচায় আর বাঁদরগুলো কেমন করে দাঁত খি'চোয় তা-ও দেখালেন। নাকী-নাকী সুরে গানও হলঃ

কসাক ছোঁড়া গেছে চলে লড়ুই করবে বলে,

ছুঁড়ীটা তার পা ছুঁড়ছে শুয়ে বেড়াল কোলে।

তাইরে না'না নাইরে তা না তা না না না না না।

তারপর এক সময় ছোট-মান্‌কাকে তাঁর লম্বা জামা দিয়ে জড়িয়ে বুকের কাছে ধরে ভবঘুরে ছেলের অভিনয় করে দেখালেন তিনিঃ

'কে তুই?'—কিটি জিজ্ঞেস করল। এ তামাশাটা ভারি পছন্দ ছিল তার।

'মুই সার্বিয়া দ্যাশের মনিষ্যি, মা-ঠাকরোন!'

'তোর ঐ বাঁদরটার নাম কি রে?'

'মাত্রেচ্কা, মা-ঠাকরোন।—উয়ার ভুখ নাগছে, মা-ঠাকরোন! কিছু খাতি দ্যান উয়ারে—'

'বটে! ছাড়পত্র আছে?'

'এ'জ্ঞে, মোরা সার্বিয়ার মনিষ্যি—ভিখ মাঙি, মা ঠাকরোন—'

আর তারই মাঝেমাঝে থেকে থেকে আর্মির চালে হাঁক দিয়ে উঠছেন তিনি—'কেল-নার শ্যাম্প-এন!' অবশ্য সাইমন কানও দিচ্ছে না তাতে।

পুরোদস্তুর একটি রুশীয় হুল্লোড় পড়ে গেছে—গোলমেলে কাণ্ড, অর্থহীন ব্যাপার। তোলপাইগীন সেই যে বাজনা বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই, আর রলি-পলি তারই সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলেইছে তো চলেছে—কামারিন্স্কি চাষাদের নাচ, আর মাঝেমাঝে দুই বন্ধুতে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে—'সাঁ-চ্চা ক-কথা সব্বা-ই জা-নে—সই রে!'

তারপর পেড়ে বসলেন তিনি যত সব অশ্লীল গল্প। গল্প শুনে উপস্থিত ছাত্র আর মেয়েরা তো হেসেই অস্থির। হৈ-চৈ হাসি তামাশায় আসর বেশ সরগরম, তারই এক ফাঁকে ভেল্টম্যান সুড়ুৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে পাশাও তার শান্ত অবোধ লাজুক হাসি হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তারপর একে একে অন্য ছাত্ররাও এক-একটা অজুহাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল,—গেল না শুধু লিখোনিন। 'একটু নাচ দেখে আসি,'—বলে বোলোদিয়া পাবলোব বেরিয়ে পড়ল। তোলপাইগীনের হঠাৎ মাথা ধরে উঠল; তাই তামারাকে বলল, 'একটা নিরিবিলি ঘর দেখিয়ে দাও তো—একটু শোব।' পেত্রোবস্কি একবার এক ফাঁকে লিখোনিনের কাছ থেকে তিনটি রুবল ধার করেছিল; তাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে খবরগিরনী যোসিয়াকে বলল ছোট-মান্কাকে তার কাছে ডেকে দিতে। এমন কি, রামেশিস পর্যন্ত শেষটায় নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। বলল, 'বাইরে যাই, একটু ঘুমুই।' কিন্তু বাইরে যাবার আগে জেনীকে চোখের ইশারা করে গেল সে। ইঙ্গিতটা বুঝল জেনী, চোখের পাতা বুঁজিয়ে সম্মতিও জানাল। সবই লক্ষ্য করছিলেন প্লাতোনোব; জেনীর চোখের পাতা উঠলে পর দেখতে পেলেন সে-চোখে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ছাপ। মিনিট পাঁচেক বাদেই জেনী উঠে পড়ল, 'আমি আসছি এখুনি।' বলেই স্কার্ট দুলিয়ে বাইরে চলে গেল সে।

'এবার লিখোনিনের পালা,' বলে উঠলেন সাংবাদিক।

'না, ভাই, ভুল করলে!' জবাব দিল লিখোনিন—'অবশ্য কোন রকমের ধর্মবুদ্ধি কি ন্যায়নীতির খাতিরে এ থেকে বিরত থাকছি না আমি; বরং একজন অ্যানার্কিস্ট হিসেবে আমি বলি কি গতিক যতই মন্দ হয়ে উঠবে ততই হবে সেটা শুভ লক্ষণ। তবে, ভাগ্য ভালো যে আমি হচ্ছি গিয়ে একটি জুয়াড়ী, খেলার নেশায়ই মশগুল। আমার রুচি ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্য এ-সব আমোদে আমার আগ্রহ নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমিও যে ঠিক ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম তোমায়!'

'আমি? নাঃ! যদি কখনও বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ি তবে ইসাইয়া সাবিচের কাছ থেকে তার ছোট কামরাখানার চাবিটা চেয়ে নিয়ে সেখানে গিয়ে পাটাতনের ওপরে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দি। এখানকার মেয়েরা জানে আমি পুরুষও নই, প্রকৃতিও নই—একেবারে নির্গুণ পরম ব্রহ্ম।'

'সত্যি নাকি? কখনও—?'

'নাঃ, কখনও নয়।'

'হুঁ!'—বলে উঠল নিউরা, 'সেরজাই আমাদের সাধু মহাপুরুষ!'

'প্রায় বছর পাঁচেক আগে,' আরম্ভ করলেন সেরজাই—'আমার এই অভিজ্ঞতাও হয়েছে। ভারি বিশ্রী আর বিরক্তিকর সে—বুঝলে? এই যে অভিনেতা ভদ্রলোকটি মাছি-মারার খেলা দেখালেন অনেকটা প্রায় সেই রকম। জানালার ঝিলমিলে সেগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আটকা পড়বে, তারপর অবাক হয়ে বোকার মতো পেছনের ঠ্যাং দুটো তুলে পিঠ চুলকে যে-যার মতো আলাদা হয়ে উড়ে পালাবে। আর এখানে এসে প্রেম-প্রেম খেলা? আরে, ওদের মনের মতো পাত্রই নই আমি। দেখতেও তো আমি সুশ্রী নই, তা ছাড়া মেয়েদের সামনে আমি কেমন যেন হয়ে পড়ি—লজ্জায়, সঙ্কোচে, সৌজন্যে। আর এখানে ওরা হামলে মরছে বর্বর উন্মাদনা, হিংস্র ঈর্ষা, অশ্রুধারা, বিষদান, প্রহার, প্রাণপাত—এক কথায়, উন্মত্ত ভাবালুতার জন্যে। আর তার কারণ কি তা-ও সহজেই বুঝতে পারা যায়। নারীহৃদয় চায় নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, অথচ এখানে প্রতিদিন প্রেম-কাহিনী শুনছে এরা তীক্ষ্ম ঝাঁঝালো ভাষায়। নিজেরই অজ্ঞাতসারে সবাই প্রেমের মধ্যে চায় ঝাঁঝ; তাই কারুরই আর শুধু স্নেহ-মমতার কথায় মন ওঠে না, তারা চায় সাংঘাতিক রকমের মদমত্ত কাজ। আর তাই চোরডাকাত, খুনে, বেশ্যাসক্ত, বেশ্যার অন্নে প্রতিপালিত ঢ্যামনারাই সবক্ষেত্রে হয়ে থাকে এদের প্রণয়ী।'

'আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে,' একটু দম নিয়ে বললেন প্লাতোনোব, 'প্রণয়ী হবার চেষ্টা করতে গেলে এদের সঙ্গে এই এতদিনের বন্ধুত্ব হারাতে হবে আমায়।'

'ঠাট্টা করছ তুমি,' অবিশ্বাসের সুরে বলল লিখোনিন, 'নইলে এখানে দিনরাত পড়ে থাক কেন? যদি একজন লেখক হতে, বুঝতাম তথ্য সংগ্রহ করতে এখানে আস; যেমন ঐ জার্মান প্রফেসর বাঁদরের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তিন-তিনটি বছর কাটিয়ে-ছিলেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু লেখার কারবার তো কর না তুমি।'

'তা যে করি না তা ঠিক নয়; তবে কি করে লিখতে হবে বুঝে উঠতে পারি না।'

'ধর্মপ্রচারকও তো নও তুমি। তা হলে না হয় বুঝতাম—এদের এখানে এসে এদের মনে ধর্মজ্ঞান জাগাবার চেষ্টা করছ।'

'না, তা নই।'

'তবে কেন ছাই এখানে পড়ে থাক?' অথচ এসব নোংরামি, মারামারি তো তোমার ভালো লাগে না দেখছি। কে কোন্ মেয়েকে ধরে ঠেঙাল, আর অমনি তোমার প্রাণ কেঁদে উঠল।'

এখনই কোনও জবাব দিলেন না সাংবাদিক।

'দেখ,' থেমে থেমে প্রত্যেকটি কথার দিকে এই যেন প্রথম নজর রেখে আর তা ওজন করতে করতে বলে যেতে লাগলেন তিনি, 'দেখ, এদের এই জীবন আমাকে কেন যেন আকর্ষণ করে থাকে, আমার প্রাণে কৌতূহল জাগায় এদের এই—কি বলব—এর নিষ্ঠুর নগ্ন সত্যের জন্যে। বুঝতে পারছ, এ হচ্ছে গিয়ে যেন সকল রকম সংস্কারের বাঁধন ছেঁড়া। এতে কোন কপটতা নেই, নেই ন্যায়-নীতির লোকদেখানো ভণ্ডামি, কোন রকমেরই আপোস নেই এতে—না জনমতের সঙ্গেও নয়, আমাদের পিতৃপুরুষদের উদ্ধত বিধি-নিষেধের সঙ্গেও নয়, নিজ নিজ বিবেকের সঙ্গেও নয়। কোন রকমেরই ভ্রান্তির অবকাশ নেই এখানে, নেই কোন মোহ। রয়েছে শুধু একটি মেয়ে—'আমি'—বলছে যেন সে—'আমি হচ্ছি এক বারবনিতা, বহু-ব্যবহার্য জলপাত্র, নগরীর সঞ্চিত কাম-লালসার নির্গম-পথ। আয়, কে আসবি তোরা, আয় আমার কাছে; আমি তোকে বঞ্চিত করব না। ঐ তো আমার কাজ। কিন্তু সে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের বিনিময়ে মূল্য দিতে হবে তোকে—তোর ঐ অর্থ, ঘৃণা, রোগ, আর হীনতাবোধ দিয়ে, আর-কিছু নয়। মানব-জীবনের এমন কোন অধ্যায় নেই যেখানে তার মূলতত্ত্ব এমন প্রচণ্ড, বিকট, উলঙ্গ স্পষ্টতায়, কোন রকমেরই

মানবিক দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষার প্রলেপে আবৃত না হয়ে, একেবারে স্পষ্টাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে।'

'ওহো, তা কি জানি! তবে এই সব মেয়েদের তো দেখি একেবারে শয়তানের মতো মিছে কথা বলতে। একবার যদি জিজ্ঞেস কর কাউকে এ-পথে সে এল কি করে, এমন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে শুরু করবে!'

'বটে! জিজ্ঞেস না করলেই হয় তবে। তোমার তাতে কি? আর যদিই বা এরা মিছে কথা বলে, দেখবে একদম ছেলেমানুষের মতো মিছে কথা বলে। আর জানই তো শিশুরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কিন্তু সবচেয়ে মনকাড়া মিথ্যুক, আর তারই সঙ্গে হল গিয়ে তারা সবচেয়ে অকপট লোক এ সংসারে। মজার ব্যাপার এই যে, এদের দু-দলই—এই গণিকা আর শিশুরা—মিছে কথা কয় শুধু আমাদের কাছে—পুরুষমানুষ আর বয়স্ক লোকেদের সামনে। নিজেদের মধ্যে তারা মিছে কথা বলে না—উদ্দীপনায় মুখর হয়ে বানিয়ে বলে শুধু। কিন্তু আমাদের কাছে মিছে কথা বলে তারা, কারণ আমরা নিজেরাই তাই দাবি করি তাদের কাছ থেকে, আমরা আমাদের বিমূঢ় কৌশল আর অহেতুক কৌতূহল নিয়ে তাদের অন্তরাত্মার মধ্যে ঢু মেরে প্রবেশ করতে চাই—কিন্তু তাদের মন হচ্ছে একেবারে আলাদা ছাঁচে তৈরি, আর মনে মনে তারা জানে আমাদের নিরেট মূর্খ আর ভণ্ডতপস্বী ব'লে। যদি চাও তো আমি আঙ্গুলে গুনে বলে দিতে পারি একজন বেশ্যা ঠিক কি কি নিয়ে মিছে কথা বলে থাকে, আর তা হলেই বুঝতে পারবে তুমি যে, পুরুষরাই তাকে মিছে কথা বলতে প্রবৃত্ত করে থাকে।'

'বেশ, বেশ, দেখাই যাক না!'

'প্রথমত নিজেকে সে ক্যাঁটকেঁটে করে রঙচঙ মেখে সাজায়, এমন কি নিজের শরীরের ক্ষতি করেও। কেন? কারণ বসন্ত-সমাগমে মিলিটারি ইস্কুলের কোন-এক ছোকরা, মুখময় ব্রণ ভর্তি তাঁর, তিনি ক্ষেপে উঠলেন বনমোরগের মতো; নয়ত কোন সরকারি আপিসের এক পুঁচকে কেরানী, ঘরে তাঁর পোয়াতি বউ আর গুটি কয়েক কাচ্চাবাচ্চা,—বেশ এলেন এঁরা দুজনেই, কিন্তু বিচক্ষণের মতো সিধেসিধি নিজের বাড়তি লালসাটুকু চরিতার্থ করে চলে যাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় এঁদের। লোকটা, এদিকে তো হচ্ছে গিয়ে একদম অপদার্থ, এসেছে কিন্তু রসের সন্ধানে; চান তিনি রূপ—বুঝেছ, আরে তিনি যে হলেন মস্ত বড় এক সৌন্দর্যের পূজারী! আর এই সব মেয়েরা, এই সরল অনাড়ম্বর উদার মহারুশের কন্যারা—তারা এই সব রসিক নাগরদের নিয়ে কি করবে তখন? 'মিঠে হলেই স্বাদু আর রাঙা হলেই সুরূপ।' ব্যস, তবেই হল, রূপ যদি চাও তো নাও এই এণ্টিমনি, সাদা সীসের গুঁড়ো, আর রুজ!

'এই হল গিয়ে পয়লা নম্বর। তারপর সে রসের নাগরের শুধু রূপ হলেই চলবে না,—না, চাই তাঁর প্রেমের আদল, অতএব তাঁর আদরে মেয়েটিকে সাড়া দিতে হবে অঙ্গভঙ্গি করে, গদগদ স্বরে কথা বলে, ঘন ঘন নিশ্বাস ছেড়ে, পুরুষটিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আহা, তুমি কি রসের নাগর! তোমায় পেয়ে ধন্য আমি! অথচ মনে মনে সে-ও জানে যে এ-সব হচ্ছে নিছক ছলাকলা; তবুও নিজে থেকেই সে চায় ঠকতে আর নিজেকে বোঝাতে আমি কি হনু রে! মেয়েরা আমায় কত ভালোবাসে! কিন্তু প্রশ্ন হল—কে প্রবৃত্ত করল মেয়েটিকে মিথ্যাচার করতে?

'তারপর তৃতীয় কথা হচ্ছে, তুমি কেন তার গত-জীবনের কথা জানতে চাইবে? সে চায় জানতে তোমার সেই স্বর্গীয় প্রথম প্রণয়-কথা? সে চায় জানতে তোমার ঘরের কথা, তোমার মা-বোনেদের কথা, তোমার বউয়ের কথা? তুমি যে জন্যে টাকা খরচ করছ তাই হিসেব করে আদায় করে নাও মেয়েটির কাছ থেকে; তার গতজীবনের ইতিকথায় দরকারটা তোমার কি? কুটনী, দালাল, পুলিস, বদ্যি, গবর্নমেণ্ট সবাই

মিলে তোমার স্বার্থরক্ষা করছে, গ্যারাণ্টি রয়েছে তোমার—যাকে তুমি ভাড়া করলে তার কাছ থেকে প্রেম আদায়ের, সৌজন্য আর সদ্ব্যবহার পাবার, আর রোগের ভয় থেকেও মুক্ত তুমি যদিও তোমার অনর্থক গায়ে-পড়া প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে তোমার পাওয়া উচিত ঠাস করে গালে একটি চড়। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে তুমি চাও সত্য—বটে? বেশ, তারা তোমায় এমন এক কেতাদুরস্ত গল্প বানিয়ে বলবে যা—নিজেও তুমি কেতাদুরস্ত আর ইতর ব'লে—অনায়াসে হজম করতে পারবে। নয়ত শুধু শুধু জীবনটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কাছে ভারি একঘেয়ে আর নীরস, নয়ত এমনই এক অসম্ভব কাণ্ড, যার পার নেই। তাই সেই একই কাহিনী ঘুরে ফিরে শুনতে পাবে তুমি—সেই মান্ধাতার আমলের মিলিটারি অফিসারের কাণ্ড, নয় কোন দোকানের মুহুরির কেচ্ছা, নয়ত পেট হওয়ার কথা, দূর-পাড়াগাঁয়ে বুড়ো-হাবড়া বাপের হারানো মেয়েকে ফিরে পাবার জন্যে কাতরানি—এই সব। তাই বলে তোমায় এ-সব বলছি না। তোমার মধ্যে আন্তরিকতা আছে, মহত্ত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে—এস, তোমার কল্যাণে এক চুমুক মদ খাওয়া যাক—কি বল?'

মদ খাওয়া হল।

'আরও বলব? বিরক্ত হচ্ছ না তো?' প্লাতোনোব জিজ্ঞেস করলেন।

'না, না, বল, বল!'

'তা ছাড়া এরা মিছে কথা বলে, আর বলেও খুব সরল বিশ্বাসে—তাদের কাছে যারা নিজ নিজ রাজনৈতিক মতামতে দীক্ষিত করতে চায় এদের।'—বলে যেতে লাগলেন প্লাতোনোব। 'ওদের কোন নিজস্ব মতামত নেই। তুমি যদি গিয়ে ওদের বল—জমিদার-মহাজনদের বংশ নির্বংশ না করলে দেশের উন্নতি হবে না—ওরা সায় দেবে, ঠিক বলেছ। আবার কেউ যদি এসে বলে, রগচটা ছাত্রদের যদি ফাঁসিতে লটকানো না হয় তবে ওরা দেশটাকে দিন-দিন উচ্ছন্নে দেবে।—অমনি ওরা সায় দেবে, বটেই তো। তারপর ওরা এতই সরল যে, যদি ওদের কেউ একজন একবার তোমায় ভালোবেসে ফেলল, তবে আর দেখতে হবে না। তুমি তাকে জাহান্নমে নিয়ে যাও—আপত্তি করবে না। বুঝলে, লিখোনিন?

'হয়ত মেয়েটির চোদ্দ বছর বয়সে কেউ তাকে নষ্ট করল; ষোল বছর বয়সে দেখবে, রীতিমতো পেশাদার দেহ-বিলাসিনী হয়ে উঠেছে সে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে একখানা হলদে টিকিট আর যৌন রোগ। সংসারের গণ্ডির বাইরে এক অচলায়তনের মধ্যে তখন তার ঠাঁই। মন দিয়ে শোন ওদের কথা—দেখতে পাবে মোটে গোটা চল্লিশেক কথা ছাড়া আর-কিছুই জানে না ওরা—ঠিক একেবারে শিশুর মতো, কি বর্বরদের মতো। পানাহার, নিদ্রা, নানান জাতের পুরুষ, বিছানা, পোশাক, বাড়িউলী, রুবল, প্রণয়ী, ডাক্তার, পুলিস—এই শুধু! মানসিক উন্নতি বলতে কিছুই নেই। মন রইল কাঁচা, দেহ হল অকালপক্ক।—তার দেহের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ডাক্তারী পরীক্ষা; বোরিক জল। প্রতি রাতে যত পুরুষই আসুক, সঙ্গসুখ দিতে হবে তাদের। আর এদের মধ্যে পাবে তুমি, একেবারে প্রত্যেকেরই মধ্যে, সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি মর্মান্তিক বিদ্বেষ, আর তারই শূন্যতা পূরণ করে এরা নিজেদের মধ্যে অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনচর্চা ক'রে, আর সে-ব্যাপারে মোটেই কোন রকমের ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই এদের এখানে। এদের এই সঙ্গতিহীন জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসই আমার নখদর্পণে রয়েছে—এর অন্তর্নিহিত আস্থাশূন্য মনোভাব, এর নিদারুণ স্থূল অবিচার। কিন্তু এদের মধ্যে পাবে না তুমি নিজের বা অপরের প্রতি সে মিথ্যাচার, সে কপটতা, যা উঁচুনিচু সকলকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাদের এই মানবসমাজে। একবার ভেবে দেখ, লিখোনিন, কি রকমের গায়ে-পড়া, টানাহেঁচড়া, বিরক্তিকর প্রবঞ্চনা, কতখানি বিরাগ, লুকিয়ে রয়েছে শতকরা

নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে বৈবাহিক সহবাসের মধ্যে। কি অন্ধ, নির্মম নির্দয়তা—ঠিক পাশবিক নয় বটে, তবে মানবিক, সুচিন্তিত দূরদর্শী, একেবারে মাপজোক করা নিষ্ঠুরতা—রয়েছে পবিত্র মাতৃত্বের সহজাত প্রেরণার মধ্যে, আর দেখ কি কোমল বর্ণরাগেই না সুশোভিত করে তোলা হয়েছে সে সহজাত প্রেরণাকে।

'সত্যি, লিখোনিন, আমি বুঝি না কেন মানুষ এই গণিকাবৃত্তির প্রশ্রয় দিল,—নিজের ঘর-সংসারকে, নিজের স্ত্রী-কন্যাকে পবিত্র রাখতে? কিন্তু নিজেরা? নিজেরা তো সে ঘৃণ্য কলুষিত কামনার দ্বারে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক, কাঙালই বটে। সত্যি, এ-সব দেখেশুনে এখন ঐসব বড় বড় গালভরা কথা, যেমন—কর্তব্য, প্রতিবেশী, আত্মোন্নতি, পবিত্র প্রেম, এ-সবই যেন হাস্যকর মনে হয়।

'মানুষ জন্মেছে উদার আনন্দলাভের জন্যে, নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টির প্রেরণায়—তাই তো সে হল বিশ্ববিধাতা। উদার উন্মুক্ত তার প্রেম, তাতে কোন বাধা নেই, বিচার নেই—ঐ যে একটি গাছ, ঐ যে নীলাকাশ, এই যে মানুষ, এই যে কুকুর, এই যে মধুর স্নেহময়ী ধরণী—আহা, বিশেষ করে এই ধরণী আর তার অপার্থিব মাতৃত্ব, তার প্রভাত তার রাত্রি, প্রতিদিনের পরমাশ্চর্যবিভূতি! কিন্তু মানুষ কি মিথ্যাবাদী, কি কাঙালই না হয়ে পড়েছে, কত নিচে নেমে গেছে সে।'

'অ্যানার্কিস্ট হিসেবে তোমার কথা বুঝছি বোধ হয় কিছু কিছু,' লিখোনিন বলল, 'কিন্তু এর প্রতিকারের চেষ্টা কর না কেন?'

প্লাতোনোব বললেন, 'প্রতিকার! প্রতিকার কি করব? আমি নিজেকেই নিজে চিনলাম না আজ পর্যন্ত। দেখছ, আমি একটি ভবঘুরে; ভালোবাসি কেবল জীবনকে। এককালে কারখানায় কাজ করেছি আমি, তামাকের জমিও চাষ করেছি, আজভ সাগরে পাড়ি দিয়েছি। ইট বয়েছি, সার্কাস দলে খেলা দেখিয়েছি, আবার অভিনয়ও করেছি। আরও কত কি যে করেছি সব মনেও নেই। অবশ্য পয়সার জন্যে এসব করিনি; করেছি জীবনটাকে দেখব ব'লে—করেছি কৌতূহলী হয়ে। হেস না, এক-এক সময় আমার কি মনে হয় জান? যদি ঘোড়া, কি গাছ, কি মাছ হয়ে জন্মাতাম তো জানতে পারতাম তাদের জীবন কেমন! কিংবা মেয়েমানুষ হতাম যদি, তাহলে ছেলে হতে গিয়ে কেমন লাগে জানা যেত। দেখবার, জানবার, ভারি শখ আমার। তাই তো আমি শহরে শহরে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াই অকারণে। আর ঘুরতে ঘুরতে আজ আবার এসে পেঁাছেছি এই গণিকালয়ে। কিন্তু এই গণিকাচরিত্র আমি যতই দেখি ততই ভয়ে, ক্রোধে, বোধশক্তি হারিয়ে কেমন যেন হয়ে যাই। এখানকার পালাও শেষ করব শীগ্‌গির। যাব একবার রেললাইন তৈরি করবার কারখানায়। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে—সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে।—ঐ দেখ, লিখোনিন, অভিনেতা মশায়, ফের শুরু করেছেন—।'

সত্যিই, এবার তিনি কুকুর-বেড়ালের ঝগড়া নকল করতে আরম্ভ করেছিলেন। ধীরে ধীরে যেন ঝিমিয়ে আসছিলেন তিনি; পর পর একটি একটি করে যেন অন্তরাত্মার গ্রন্থি খসে পড়ছিল তাঁর। শেষে ছলছল চোখে বলতে লাগলেন তিনি, 'আমি এসেছি এখানে, তাই আমাকে আপনারা ঘৃণা করতে পারেন বটে। কিন্তু আমার বউ আছে—সতীসাধ্বী। সে যদি জানে আমি এখানে এসেছি—আহা, যদি সে জানতে পারে! সত্যি আমি কি পাষণ্ড, চরিত্রহীন, পাজী, বদমায়েশ! প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো, আপনি চলুন আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে। দেখবেন কেমন দেবীর মতো স্ত্রী আমার। আমার জন্যে রাত জেগে বসে রয়েছে সে; খোকাখুকুদের হাতে হাত মিলিয়ে করজোড়ে বলছে—হে ঠাকুর, ওকে বাঁচিয়ে রাখ, ভালো রাখ।'

'হ্যাঁ, দেখ গে যাও, দিব্যি আরামে শুয়ে আছে সে তোমারই বিছানায় পরপুরুষের সঙ্গে,' চেঁচিয়ে উঠল ফর্সা ছোট মান্‌কা। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উঠেছিল সে তখন।

'তবে রে খান্‌কি,' বলেই মদের বোতল তুলে নিয়ে মাথার উপরে দোলাতে লাগলেন ভদ্রলোক, 'দেখি কার সাধ্যি ঠেকাক সে এসে আমাকে। নইলে দেব মাগীর মাথা ফাটিয়ে। ফের যদি মুখ খারাপ করবি তো—'

'তুই চুপ কর্‌, ড্যাকরা মিনসে।'—মুখ খুলল মান্‌কা, 'নিজে এসেছেন মাগীবাড়ি ফুর্তি মারতে আর বউ নষ্টামি করলেই যত দোষ? না! অত চোখ রাঙাসনি—কে তোকে ভয় করে রে, বিটকেল মিনসে?'

ইয়ারশেঙ্কো বহুকষ্টে দু-জনের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। অভিনেতা মশায় অভিমানে অপমানে কেঁদে ফেললেন। হেনরিয়েটা তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

শ্রান্ত হয়ে পড়ছিল সবাই। বুঝি শেষ হয়ে এল ছাত্রদের অভিসার-রাত্রি। এবার বিদায়ের পালা।

'তুমি কোথায় যাবে এখন?' সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করল লিখোনিন।

'কি করে বলি, দেখি না হয় ইসাইয়ার ঘরেই গিয়ে শোব। না, তার চেয়ে বরং স্নান সেরে ষ্টিমারে করে ঘুরে আসি লিপ্‌স্কি মঠ থেকে। কিন্তু কেন বল তো?'

'সবাই চলে গেলে তোমাকে দু-একটা দরকারী কথা বলতাম।' লিখোনিন বলল।

একে একে সবাই বিদায় নিতে লাগল। সবার শেষে গেলেন প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো। খানিক বাদে প্লাতোনোব উঠে গিয়ে লিখোনিনকে জানালার ধারে টেনে এনে বললেন—'ঐ দেখ!'

দেখা গেল প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো গিয়ে ব্রেপেল-এর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। একটু পরে দরজা খুলে যেতেই তিনি ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'কি করে বুঝলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লিখোনিন।

'সে কিছুই নয়। লক্ষ্য করছিলাম অধ্যাপক ভেরকার বডিসে হাত বুলোচ্ছে। আর সবাই সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেলেছিল, উনিই শুধু লজ্জায় তা পারেননি।'

'যাক গে, চল যাই। তোমায় আর বেশিক্ষণ আটকাব না,' লিখোনিন বলল।

১৩

মেয়েদের মধ্যে ঘরে এখন শুধু জেনী আর লিউব্‌কা। জেনীর গায়ে রাতের ব্লাউজ। লিউব্‌কা সেই কথাবার্তার মধ্যেই একটা আরাম-চেয়ারে শুয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল—মুখখানায় তার কচি মেয়ের মতো শান্ত শ্রী, ঠোঁট দুটিতে মৃদু হাসির ছোঁয়াচ। জেনী চোখ নিচু করে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বেঞ্চির উপরে বসেছিল। প্লাতোনোব দেখতে পেলেন ধিকিধিকি জ্বলছে সে-চোখে কিসের যেন জ্বালা। ধোঁয়ায় আর মদের গন্ধে ঘর ভরপুর।

'মোমবাতিটা নিবিয়ে দিই?' বলেই লিখোনিন গিয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল মোমবাতিটা। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়ল ভোরের ফ্যাকাশে আলো। লিখোনিন বলল, 'কথাটা সামান্যই, কিন্তু আরম্ভ করি কি ক'রে?' বলে চোখ তুলে শূন্যদৃষ্টিতে চাইল সে, জেনীর দিকে।

'উঠে যাব?'—জিজ্ঞেস করল জেনী।

'না।' উত্তর দিলেন সেরজাই, 'কথাটা বোধ হয় গণিকাবৃত্তি নিয়ে। তাই না লিখোনিন?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই বটে।'

'জেনী থাকুক তাহলে। ওর মতামতের দাম আছে।'—সাংবাদিক বললেন।

মুখখানা দু-হাত দিয়ে ভালো করে রগড়ে নিল লিখোনিন, তারপর দু-হাত জড়িয়ে বার-দুই আঙ্গুল মটকাল। শেষে হঠাৎ বলে উঠল, 'এই সব মেয়ের বিষয়ে তুমি যা বললে, সেরজাই, তা এমন নতুন কিছু নয়। অথচ তা আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে এদের সমস্যাকে আমার কাছে নতুন করে তুলে ধরেছে। জিজ্ঞেস করি, শেষ পর্যন্ত গণিকা-বৃত্তিটা কি? নাগরিক জীবনের এক প্রচণ্ড প্রলাপ, না, চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্য? এর কি শেষ আছে, না, পৃথিবীতে মানুষ যতদিন অছে এ-ও থাকবে ততদিন? কে আমায় দেবে এর উত্তর?'

মন দিয়ে শুনছিলেন প্লাতোনোব। বললেন, 'এই ব্যবসার কবে যে শেষ হবে কেউ তা বলতে পারে না। তবে মনে হয় যেদিন এই পৃথিবী সাম্যবাদী কি নৈরাষ্ট্রবাদীদের আদর্শে চলবে, যেদিন এই পৃথিবী হবে আমাদের সকলের—কারুর একলার নয়, যখন প্রেমকে সবাই সম্মান দিতে শিখবে, মানুষ হবে সুখী, তোমায় আমায় থাকবে না কোন ভেদ, সেই শুভদিনে এ জগতে নেমে আসবে স্বর্গীয় আনন্দ; মানুষ আবার হবে নিষ্পাপ —নগ্ন আদম-ইভের মতো। হয়ত তখন—'

'তাহলে কি বলতে চাও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? মেনে নিতে হবে, এ বৃত্তি মানব-সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ?'

'ঠিক অপরিহার্য নয়, তবে দুস্তর বটে। কিন্তু তুমি তো বিপ্লবী—তোমার এতে কি এসে যায়?'

'সত্যি, আমার কি এসে যায়। তাই তো ভাবি মাঝেমাঝে—এ ভালোই হচ্ছে। হোক, মানুষে মানুষে মারামারি। ছিঁড়ুক এ-ওর গায়ের চামড়া। চলুক অত্যাচার শিশুর ওপরে, নারীর ওপরে। চলুক গোলামি; চলুক নারী-মাংসের কারবার। ভালোই হবে। যতই অবনতি হবে ততই ভালো; কারণ ততই এ-সবের শেষ হবে তাড়াতাড়ি। তাই নয় কি? পাপের তো একটা শেষ আছে। যেমন ফোঁড়া ক্রমে বড় হয়, পাকে, শেষে একদিন যায় ফেটে—তেমনি। নিদারুণ যন্ত্রণায় এ পাপ যাবে ফেটে; বেরুবে পুঁজ; ভেসে যাবে বিশ্বসংসার। তারপর? তারপর শান্তি। নতুন করে জীবন আবার গড়ে উঠবে—সুন্দর, সবল, সরল, সত্য।'

এক বাটি কালো ঠাণ্ডা কফি খেয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগল লিখোনিন, 'কিন্তু হায়, ভাবি তো তাই। শুধু আমি নই—আমার মতো অনেকেই ঘরে বসে চা-রুটি খেতে খেতে আরাম করে মানুষের দুঃখের কথা বেশ হিসেব করেই ভাবেন, আর মানুষের নির্মম অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন সবাই। কিন্তু যখন দেখা যায় একটি ছোটছেলের উপরে অত্যাচার চলেছে তখন শিরার রক্ত কি গরম হয়ে ওঠে না? তখন কি মানুষের ঐ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে চুপ করে বসে থাকা যায়? এই যে কেন যেন আজ আমার মনে হচ্ছে, এই গণিকাবৃত্তির জন্যে আমিই দায়ী। কেন আমি উদাসীন থেকেছি এতদিন? কেন আমি এই ঘৃণিত ব্যবসা বন্ধ করবার চেষ্টা করিনি? সত্যি, প্লাতোনোব, আমি কি করি বল তো?' বিষাদে চুপ করল ছাত্রটি।

'কেন? সেই রকম কর না,' কঠিন শ্লেষের স্বরে বলে উঠল জেনী, 'একজন ইংরেজ মহিলা এসে যেমন করেছিলেন। একদিন বারুকেশ দারোগা এসে বলল, 'একজন তোদের দেখতে আসবে। খবরদার, কারও মুখ দিয়ে যেন কোন রকম কুচ্ছিৎ কি বাজে কথা না বেরয়। যদি শুনতে পাই, চাবকে ঠাণ্ডা করে দেব। এলেন মহিলাটি বিদেশী ভাষায় কি সব বললেন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে। বুঝলাম তো ঘোড়ার ডিম। শেষে যাবার সময় আমাদের সবাইকে দিয়ে গেলেন এক-একখানা করে পাঁচ কোপেক দামের বাইবেল। তুমিও সেই রকম কর না কেন, প্রাণ?'

হো হো করে হেসে উঠলেন প্লাতোনোব। কিন্তু দেখতে পেলেন তিনি বিষাদে ভরে উঠেছে লিখোনিনের মুখ। জেনীর ঠাট্টাও বুঝতে পারেনি সে। প্লাতোনোব তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি কি করতে পার, লিখোনিন? সম্পদ যতদিন থাকবে, দারিদ্র্যও থাকবে। বিবাহ থাকলে বেশ্যাবৃত্তিও থাকবে। জান তুমি, এই সব বারাঙ্গনাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন কারা? যাঁরা সংসারী লোক, যাঁরা সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোক, হয়ত কোন পতিব্রতার স্বামী, কোন বোনের স্নেহশীল ভাই—এ'রাই। এ'রাই গণিকাদের বাঁচিয়ে রাখেন, লুকিয়ে রাখেন। এ'রা জানেন, এ'রা বোঝেন যে গণিকাবৃত্তি আছে, তাই তাঁদের শয়নকক্ষের আর ছেলেমেয়েদের খেলাঘরের শুচিতা বজায় রয়েছে। শুধু তাই নয়। এ'রা—এই সব সংসারের বুড়ো বুড়ো মুরুব্বিরাও চান একটু-আধটু বৈচিত্র্য—লুকিয়ে-চুরিয়ে একটুখানি নষ্টামি। নইলে সেই মান্ধাতার আমলের বউ, বাড়ির ঝি, কি পাশের সঙ্গিনীটিকে নিয়ে আর চলে না, ভারি পানসে লাগে। মানুষ আসলে হচ্ছে বহুবিলাসী জানোয়ার, তাই তার সে-প্রবৃত্তির স্ফূর্তির জন্যে চাই ব্রেপেল কি আনা মার-কোব্নার এই নানাফুলের বাগান। অবশ্য দাম্পত্য প্রেমে সুখী কোন স্বামীর, কিংবা ছ-সাতটি আইবুড়ো মেয়ের বাপের মনে গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে ভয়ানক ভীতিও থাকে বটে। তিনি হয়ত সেণ্ট মাগদালেন আশ্রমের মতো পতিতা-রক্ষা-সমিতির সাহায্যের জন্যে কোন জলসা কি লটারিতে চাঁদাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করতে তিনি রাজি হবেন কখনও?'

'মাগদালেন আশ্রম,' কাষ্ঠহাসি হেসে যেন মনে মনেই উচ্চারণ করল জেনী। এতদিনেও বুঝি শুকোয়নি তার অন্তরের কি একটা পুরোনো ক্ষত।

'কথাটা ঠিকই বটে। তবুও এর একটা বিহিত যা হোক করতেই হবে। সেজন্যে হাস্যাস্পদ হই ক্ষতি নেই। কিছু করব না, কেবল দর্শক হয়ে হায় হায় করতে থাকব—এ আমার সইবে না।'

'তুমি কি লিখোনিন, তাহলে খেলনা-পিচকিরি নিয়ে দাবানল নিবোতে চাও?' যেন রূঢ়স্বরেই বললেন প্লাতোনোব।

'তাতে কি একজনকেও বাঁচাতে পারব না? অন্তত সেটুকুই করতে দাও আমায়। আমায় সাহায্য কর, প্লাতোনোব। ঠাট্টা করে দমিয়ে দিও না আমায়।'

'তুমি এখান থেকে কোন একটি মেয়েকে বের করে নিয়ে যেতে চাও নাকি হে, তাকে বাঁচাবে ব'লে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লিখোনিনের মুখের দিকে চাইলেন সেরজাই।

'ধর, যদি তাই হয়?'

'সে আবার এখানে ফিরে আসবে।'

'নিশ্চয়,' বলে উঠল জেনী।

হঠাৎ উঠে জেনীর কাছে গিয়ে লিখোনিন তার হাত দুটি চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'জেনেচ্কা, ধর তোমাকেই যদি আমি—। আমি তোমাকে আমার প্রণয়িনী হতে বলছি না, বন্ধু হতেই বলছি। আমরা দুজনে অন্য-কোন ব্যবসা করব—বেশ হবে।'

বিরক্ত হয়ে হাত টেনে নিয়ে বলল জেনী, 'তোমার সঙ্গে যাব! মরণ আর কি! তোমার মোজা সেলাই করতে হবে, না হয় তোমায় রে'ধে খাওয়াতে হবে। তুমি যাবে আড্ডা মারতে—আর আমাকে হাঁ করে বসে বসে রাত জাগতে হবে। তারপর যখন তুমি কোন চাকরি পাবে, কি ডাক্তার কিংবা উকিল হবে, তখন তো আমার পিঠে লাথিচড় মেরে বলবে, বেরো মাগী বাড়ি থেকে। আমার যৌবনটা নষ্ট করেছিস তুই। এখন একটি সদ্বংশজাত কুমারীকে বিয়ে করে সংসারী হব আমি—'

'না, না, আমি তা ভাবিনি। আমি ভাইয়ের মতো—'

'রেখে দাও তোমার ভাই। অমন ভাই-বেরাদার ঢের ঢের দেখা আছে আমার। বড়

জোর এক রাতের জন্যে সাধু হয়ে থাকবে তুমি—তারপরই ব্যস্। থাম এখন। তোমার ঐ-সব বাজে বুক্নি শুনতে শুনতে আমার মাথা ধরে গেল।'

'শোন লিখোনিন,' সাংবাদিক বললেন, 'যা পারবে না তা করতে যেয়ো না। অনেক আদর্শবাদী ছাত্র দেখেছি আমি; নিজেদের আদর্শ বজায় রাখতে গিয়ে চাষার মেয়ে বিয়ে করেছে তারা। কিন্তু দেখা গেছে—হয় সে মেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পয়লা নম্বরের কুঁড়ে আর শুধু সাজগোজেই পোক্ত হয়ে উঠেছে, নয় হয়েছে অসতী—লুকিয়ে কোন গাড়োয়ানের সঙ্গে মদ খাচ্ছে আর প্রেম করছে, কেন না ঐ হল স্বাভাবিক তার কাছে।'

এর পর কিছুক্ষণের জন্যে কেউই কোন কথা খুঁজে পেল না। লিখোনিন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মরুক গে যাক! তোমাদের কথা মানি না আমি। লিউব্কা!—লিউবোচ্কা!'—

লিউব্কা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল; এখন ডাক শুনে জেগে উঠল; তারপর হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁটের দুই কোণ মুছে, হাই তুলে, শিশুর মতো রঙ্গ করে মুচকি হেসে বলল, 'ঘুমুইনি, ভাই, ঘুমুইনি। স-ব শুনেছি। একটু তন্দ্রা এয়েছিল মোটে!'

'তুমি যাবে, লিউব্কা, আমার সঙ্গে? এক্কেবারে? চিরকালের জন্যে? আর যাতে এই নরকে ফিরে আসতে না হয়?'—তার হাত দুখানি ধরে মিনতি করে বলল লিখোনিন।

অবাক হয়ে জেনীর মুখের দিকে চাইল লিউব্কা, তারপর বলল, 'ওঃ, বুঝেছি। কিন্তু তুমি তো সবে একটি পড়ুয়া গো! আমায় বাঁধা রাখবে কি করে?'

'না, না, তা নয়! তোমায় আমি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে। এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে লাভ কি তোমার আর!'

'লাভ আর কি! তবুও যদি জেনেচ্কার মতো মানিনী কি পাশার মতো মনভুলুনি হতে পারতাম। কিন্তু এখানে আমি কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারব না!'

'তবে চল আমার সঙ্গে। তুমি তো কাটছাঁট, সেলাই-ফোঁড়াই, এ-সব হাতের কাজ জান কিছু কিছু?'

'ও-সব কিচ্ছু জানি না।' লজ্জা পেয়ে হাসতে হাসতে রাঙা হয়ে উঠে উত্তর দিল লিউব্কা। তারপর খোলা হাতের চেটোয় মুখ ঢেকে বলল, 'একটু-আধটু রাঁধতে পারি শুধু। পুরুত ঠাকুরের বাড়িতে যখন ছিলাম তখন রাঁধতাম।'

'ব্যস্, তা হলেই হবে। তুমি হোটেল খুলবে, আমি তোমায় সাহায্য করব। একটা সস্তার হোটেল। আমি বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব।' খুশি হয়ে উঠল লিখোনিন।

'থাক, থাক, ঢের হয়েছে! আর মস্করা করতে হবেনি, বাপু!' একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিল লিউব্কা, সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসু চোখে চাইল সে জেনীর দিকে।

'না রে, তামাশা করছে না, সত্যি-সত্যিই বলছে ও,' অদ্ভুত রকমের কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল জেনী।

লিউব্কার হাত চেপে ধরে লিখোনিন বলল, 'সত্যিই বলছি, লিউব্কা, ভগবান সাক্ষী!' বলেই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল সে।

জেনী বলল, 'তাই কর। ওকেই নাও, লিখোনিন। ওর প্রাণে মায়ামমতা আছে; আমার মতো পাষাণী নয় ও। আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না। কি দেখছিস, লিউব্কা, হাঁ ক'রে? বল, হ্যাঁ কি না?'

'না বলব কেন? ঠাট্টা নয় যদি, আর সত্যি হলে—জেনেচ্কা কি করতে বলিস, ভাই, আমায়?' লিউব্কা বলল।

'ওর হাতে চুমু দে, নেকী! না, বসলেন এখন হিসেব করতে! ও তোর ত্রাণকর্তা —বুঝলি?'—যেন রাগত ভাবেই বলল জেনী। ভালোমানুষ লিউব্কাও তাই শুনে সত্যি

সত্যি মুখ বাড়াল লিখোনিনের দিকে। তাই দেখে হেসে উঠল সবাই, কিন্তু প্রাণেও যে একটু লাগল না সবার তা-ও নয়।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠল লিখোনিন। বলল, 'যাও, লিউব্‌কা, বাড়িউলী মাসীকে বলে এসো গে যে জন্মের মতো চলে যাচ্ছ তুমি। আর সঙ্গে তোমার যা না নিলে নয়—শুধু তাই নিয়ে এস।'

'অত সোজা নয় গো, বন্ধু। দশ রুবল খরচ করতে প্রাণে সইবে তো?' বলল জেনী।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—।'

'তবে দশটি রুবল বাড়িউলীকে দক্ষিণা দিয়ে, লিউব্‌কাকে আজকের মতো ভাড়া করে নিয়ে যাও। ঐ হচ্ছে বাঁধা রেট। পরে কাল ওর হলদে টিকিট আর জিনিসপত্তর চাইতে এস। সে ব্যবস্থা আমরা করিয়ে দেব। পরে ঐ হলদে টিকিট নিয়ে পুলিসে গিয়ে বলবে, লিউব্‌কা অমুকতমুক বলে মেয়েটা তোমার ঝি-গিরি করতে রাজি হয়েছে, ওর এই হলদে টিকিট বদলে একখানা আসল 'পাশপোর্ট' দিতে হুকুম হোক। যা, এখুনি দৌড়ে যা, লিউব্‌কা। রুবল নিয়ে গিয়ে গিন্নিঠাকরুনকে দিয়ে আয়। দেরি করিস না। সাবধান। কুত্তী আবার টের না পায়। মাগী ভারি ঠেঁটা।'

আধঘণ্টা পরে সেই গণিকালয়ের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়িতে লিখোনিন আর লিউব্‌কা উঠে চড়ে বসল। জেনী আর সাংবাদিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

'মস্ত ভুল করলে হে, লিখোনিন!'—ক্লান্ত কণ্ঠে বলছিলেন সাংবাদিক, 'তবু তোমার সদ্ভাবকে শ্রদ্ধা করি আমি। যেই না ভাবা সেই না কাজ। সাহস আছে তোমার, চমৎকার ছেলে বটে তুমি।'

'এই তো সবে শুরু। তবে গোড়ায়ই বলে রাখি।'—হাসতে হাসতে বলল জেনী, 'দেখ, নামকরণ-উৎসবে আমায় খবর দিতে ভুলে যেও না যেন।'

'সে গুড়ে বালি। অনন্তকাল অপেক্ষা করে বসে থাকলেও সে খবর পাবে না বলে রাখছি।' লিখোনিনও হেসে টুপি দোলাতে দোলাতে জবাব দিল।

তারা চলে গেল। সাংবাদিক জেনীর দিকে ফিরে চাইলেন, দেখলেন জেনীর চোখে জল; আপনমনে বলছে সে, 'তাই যেন হয়, হে ভগবান, তাই যেন হয়।'

'কি হয়েছে তোমার, জেনী? বলবে আমায়?'

প্লাতোনোবের দিকে পিছন ফিরে সিঁড়ির হাতল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল জেনী। হঠাৎ ধরা-গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'বলবার যেদিন সময় আসবে—কোথায় তোমায় পাব বল তো।'

'কেন, সে তো খুব সোজা—প্রতিধ্বনি আপিস, সম্পাদকীয় বিভাগ, ব্যস্‌। চটপট ওরা পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে।'

'আমি—আমি—আমি,'—কি যেন বলতে চাইল জেনী, কিন্তু কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল, দুহাতে মুখ ঢাকল সে, বলল, 'বেশ, তোমায় লিখব তখন।'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে; দুহাতে মুখ চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ দশ বৎসর। আজও কিন্তু ইয়ামকার প্রাচীন অধিবাসীদের মন থেকে সেদিনকার সে-দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মুছে যায়নি। বাস্তবিক কি দুর্বৎসরই না পড়েছিল সেবার। প্রথমে শুরু হয় নানারকমের ছোটখাট অশান্তি আর উপদ্রব, তারপর দেখতে দেখতে দেখা দিল সেখানে খুন, জখম, রাহাজানি, আত্মহত্যা—প্রায় প্রতিদিনই। যে-গবর্নমেন্টের অনুমোদনে তিল তিল করে সেখানে একদিন গড়ে উঠেছিল গণিকাবৃত্তির নিশ্চিন্ত নীড়, শেষে একদিন আবার তারই হস্তক্ষেপের ফলে সেখানে তা পড়ল ছিন্নভিন্ন হয়ে—আর তারই ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরি হল শহরের জেলখানা, হাসপাতাল, পথঘাট। সেদিনের কথা স্মরণ করে আজও বুড়ী বাড়িউলীরা নির্বোধ, শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকে।

বস্তা খুলে ফেললে তা থেকে যেমন হুড় হুড় করে আলু ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তেমনি করে পড়ে গেল সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, চুরিডাকাতি, খুনজখম, আধিব্যাধির মরশুম। বাড়িউলীরা অবশ্য কোনদিনই শোনেনি যে মারাত্মক একটা-কিছু ঘটতে পারে সেখানে; তবুও সবাই যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল দুর্নিবার নির্বন্ধ এগিয়ে এসেছে ইয়ামাতে।

আর বাস্তবিকই তাই। যেখানেই মানুষ কোন-না-কোন কারণে সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজে পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে—তা সে সমস্বার্থই হোক, রক্তসম্পর্কই হোক, অথবা হোক না কেন তা কোন ব্যবসার খাতিরে—সেখানেই দেখতে পাই একদিন দুর্নিবার নিয়তির রহস্যলীলা, তিলে তিলে পুঞ্জীভূত ঘটনাবলীর অকস্মাৎ একত্র সমাবেশ, মহামারীর মতো তাদের বিস্তার, তাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত পারম্পর্য ও সঙ্গতি, তাদের দুর্জ্ঞেয় পরিব্যাপ্তি। পারিবারিক জীবনেও এমনটি ঘটে থাকে—দেখতে পাই ব্যাধি আর মৃত্যু এসে এক-এক করে প্রিয়জনদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—অনিবার্য সে গতি, দুর্জ্ঞেয় তার বিধান। প্রবাদ আছে দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। লোকে বলে, অমঙ্গল রয়েছে তোমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মঠ, ব্যাঙ্ক, সরকারী দপ্তরখানা, সৈন্যদল, বিদ্যালয় —এককথায় যে-কোন রকমের যৌথ-প্রতিষ্ঠানেই এটি দেখতে পাই। দিনের পর দিন নদীর মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে বয়ে চলেছে জীবনধারা—দীর্ঘকাল ধরে; অকস্মাৎ একদিন অতি তুচ্ছ কোন-একটা ঘটনা উপলক্ষ্য করে হল সেখানে পরিবর্তনের প্রথম সূত্রপাত; তারপর দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল স্থানান্তর, পদবিভ্রাট, কর্মচ্যুতি,ক্ষয়ক্ষতি, আধি-ব্যাধি। প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যেন চক্রান্ত করে—কেউ করল মৃত্যুবরণ, কেউ হয়ে গেল উন্মাদ, কেউ ধরা পরল চুরির দায়ে, কেউ কেউ বা আত্মহত্যা করে বসল, সঙ্গে সঙ্গে চলল শূন্যপদে বারংবার লোক-নিয়োগ, নিম্নপদ থেকে উচ্চপদে উন্নতি, ক্রমাগত নতুন নতুন লোকের আবির্ভাব,—তারপর? তারপর হয়ত মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই পুরোনো লোকদের একজনকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সেখানে; আগাগোড়া সবই তার নতুন —যদি না ইতিমধ্যে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে থাকে। বড় বড় নগর, সাম্রাজ্য, জাতি, দেশ—এমন কি হয়ত সমগ্র সৌরজগৎও এই অভাবনীয় দৈবেরই অধীন—কে জানে?

এইরূপ কোন এক দুর্জ্ঞেয় দৈবেরই তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল সমগ্র ইয়ামস্কায়া শহরের বুকের উপর আর তারই ফলে হল তার এত দ্রুত, এমনি কলঙ্কময় অবসান। যে ইয়ামকায় এককালে হৈ-হল্লা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সেখানে এখন হয়েছে এক শান্ত সাধারণ শহরতলীর উদ্ভব—সেখানে আজ বাস করে সাধারণ চাষী গৃহস্থ আর ছোটখাট ব্যবসাদারেরা। নির্বিঘ্নে তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অতীতের ইয়ামকার কলঙ্ক মুছে ফেলবার জন্যে এখানকার বর্তমান অধিবাসীরা কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে লিখে পড়ে স্থানীয় বড় ব্যবসায়ী ও গির্জার অধ্যক্ষ গলবোবের সম্মানে জায়গাটার নাম বদলে রেখেছে গলুবোব্কা।

প্রতি গ্রীষ্মে যে বার্ষিক মেলা বসে সেটা সেবার খুব জমকালো ধরনের হয়েছিল; আর সেই হল ইয়ামকার উপরে প্রথম রূঢ় আঘাত; এ-রকম আশাতীত সাফল্যের কারণও ছিল অনেক। ইয়ামকার পাশেই বসেছিল তিন-তিনটি নতুন চিনির কল। ফসলও ফলেছিল সেবার প্রচুর—গম আর বিশেষ করে বীটচিনি। বৈদ্যুতিক ট্রলি হল, খাল কাটা হল, আর তৈরি হল যত লম্বা লম্বা রাস্তা। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার হুজুগ লোককে যেন পেয়ে বসল একেবারে। আগাছার মতো চারিদিকে গজিয়ে উঠতে লাগল ইটের কল। খোলা হল প্রকাণ্ড এক কৃষি-প্রদর্শনী। দু দুটো নতুন ষ্টিমার কোম্পানি ব্যবসা খুলে বসল। তারা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এমনই পাল্লা জুড়ে দিল যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া পঁচাত্তর কোপেক থেকে নেমে প্রথমে পাঁচে, শেষে একেবারে একে এসে ঠেকল। তবুও সেখানেই কি শেষ? একটা কোম্পানি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিনা ভাড়ায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে লাগল। অন্যটা শুধু তাই-ই নয়, আবার আধখানা করে রুটিও দিতে লাগল তারই সঙ্গে। কিন্তু সব চাইতে বড় আর গুরুতর ব্যাপার যা সে হল এখানকার নদীর বন্দরে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ; তারই জন্যে হাজার হাজার শ্রমিকের নিত্য আমদানী হতে লাগল সেখানে। এতে কত যে ব্যয় হয়েছিল তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

আর ঠিক সেবারেই পড়ল স্থানীয় মঠের সহস্রবার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। সারা রুশীয়ায় এটিই ছিল প্রাচীনতম আর সব চেয়ে বিত্তশালী মঠ। রুশীয়ার চতুর্দিক থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রী আসতে লাগল। সুদূর সাইবেরিয়া, হিমসাগর-পারের দেশ, দক্ষিণ-প্রান্তের কৃষ্ণসাগর আর ক্যাম্পিয়ান সাগরের তীর—নানা দেশ থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রী এসে জুটল স্থানীয় দেবদেবী সাধুসন্তকে পুজো দিতে। সন্ন্যাসীরা বাস করতেন গভীর গুহাতে নিজেদের আশ্রমে। মঠ থেকে প্রত্যহ চল্লিশ হাজার যাত্রীকে খাদ্য-পানীয় দেওয়া হত। মঠের অতিথিশালায় যাদের স্থানসঙ্কুলান হত না রাতে তারা শুয়ে থাকত অলিন্দে, নয়ত মঠেরই কোন একপাশে পড়ে থাকত শুয়োরের পালের মতো।

বুঝি রূপকথার কোন-এক মনোরম গ্রীষ্মকাল। শহরের জনতা বেড়েছে চতুর্গুণ। হরেক রকমের লোক—রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, চিত্রকর, ইঞ্জিনীয়ার, কারখানার শ্রমিক, বিদেশী, চাষী, চোরাই মালের কারবারী, মাঝিমাল্লা, বেকার বদমাইশ, ভ্রমণকারী, চোর, জুয়াড়ী—কত কি! লোকের ভিড়ে শহরে আর তিলধারণের ঠাঁই নেই। কোন হোটেলেই একটুখানি জায়গা খালি পাওয়া যায় না—তা সে যত নোঙরাই হোক কিংবা হোক না কেন তার বিলি-ব্যবস্থা যতই সন্দেহজনক। সামান্য একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁইয়ের জন্যে লোকে অসম্ভব ভাড়া দিতে রাজি। স্টক-এক্সচেঞ্জে এর আগে বা পরে এমন উঁচুদরের ফাটকাবাজি আর কখনও হয়নি। লক্ষ লক্ষ টাকা যেন জলের মতো শুধু এ-হাত থেকে ও-হাত আর পরক্ষণেই সে-হাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কেউ হয়ত হয়ে উঠল বিপুল বিত্তের অধিকারী, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তর পুরোনো কারবার গেল

দেউলে হয়ে,—কাল যে ছিল লক্ষপতি আজ সে হয়ে দাঁড়াল দীনভিখারী। সামান্য দিন-মজুররাও এই অর্থের বন্যায় নেয়ে উঠে আরামে গা শুকোতে লাগল। আর এই কলরব-মুখর প্রবাসীর দল সহজ অর্থের আকর্ষণে, এই প্রাচীন প্রলোভনময়ী নগরীর লালসাদীপ্ত সৌন্দর্যে মত্ত হয়ে, দাক্ষিণের মন্দোষ্ণ মনোরম রাতের সুখস্পর্শে মুগ্ধচিত্তে, শুভ্র অশোক-স্তবকের মদির গন্ধে অন্ধ হৃদয়ে, মানুষের মূর্তিতে লক্ষ লক্ষ অতৃপ্ত কামান্ধ পশুর মতো তাদের অন্তরের সমবেত বাসনাকে শুধু একটিমাত্র কথায় ব্যক্ত করে তুলত—'নারীসঙ্গ চাই আমাদের!'

একমাসের মধ্যেই নিত্য নতুন আনন্দের বান ডাকল। ছোট ছোট হোটেল-রেস্তরাঁ—সঙ্গে হয়ত ছোট্ট একখানা করে বাগানও—হঠাৎ খুলে বসল ব্যবসা। বসে গেল বড় বড় রাস্তার মোড়ে ছোট ছোট নৈশ আড্ডা; উদ্দাম হয়ে উঠল সেখানে কুৎসিত ব্যভিচারের স্রোত। কত সংসার যে ভরে উঠল অশান্তিতে কে তা বলবে! কত যুবক যে ঘৃণিত ব্যাধি নিয়ে বাড়ি ফিরল তার শেষ নেই; তাদের জন্যে বুড়ো বাপ-মায়ের অশান্তি, সে আজও ঘোচেনি। গ্রাম থেকে দলে দলে আসত যত সব গরিবের মেয়ে—আসত কাজের জন্যে, নয়ত এমনিই মজা দেখতে; আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হতে পারে তাই ফলতে লাগল,—অনেকে তাদের শুচিতা হারিয়ে বাড়িয়ে তুলল গণিকার সংখ্যা। চুরিডাকাতি বেড়ে উঠল ভয়ানক। পুলিসের আধিক্য থাকলেও ঘুষের প্রাচুর্যে আর কর্তব্যের যথেষ্ট ত্রুটিতে মানুষের পক্ষে বাস করা হয়ে দাঁড়াল অত্যন্ত বিপজ্জনক। উপদ্রব এত বেড়ে উঠল যে দিনের বেলাতেও যেখানে-সেখানে হতে লাগল খুনখারাপি।

ইয়ামকার তখনকার সে-অবস্থা বর্ণনাতীত। যদিও বাড়িউলীরা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের 'পণ্য', দরও চড়িয়ে দিয়েছিল তিনগুণ, তা সত্ত্বেও খদ্দেরের ভিড় এত বেড়ে যায় যে বেচারীরা কেউই আর তাদের সন্তুষ্ট করে উঠতে পারছিল না। সর্বদা লোকে গিসগিস করছে বৈঠকখানা, কোন কোন মেয়েকে দিনে সাতবার-আটবার, এমন কি দশবারও, পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে হয়েছে।

সেই হল ইয়ামকার কাল। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আমাদের সেই চেনা মুটকী বুড়ী ঝাপসা-চোখী আনা মারকোভ্নার গণিকালয়ও।

২

প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা সানন্দে ছুটে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, নিমেষে পেরিয়ে চলেছে যত সব সোনালী গমের ক্ষেত আর মনোহর ওক-কুঞ্জ। ঐ তো গুড় গুড় করতে করতে লোহার পোলের উপর দিয়ে তা পার হয়ে এল কত ঝকঝকে তকতকে নদীনালা—পিছনে পড়ে রইল শুধু রাশি রাশি কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাখানার সব ক-টা জানালাই রয়েছে খোলা, তবুও ভিতরটা ভয়ানক গুমোট হয়ে উঠেছে—তেতেও উঠেছে বেশ। ইঞ্জিনের কুটকুটে ধোঁয়ায় গলা জ্বালা করছে সবার। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আর ভিতরের গরমে বড়ই কাবু হয়ে পড়েছে যাত্রীর দল—খালি একজন ইহুদী ছাড়া। লোকটা বেশ হাসিখুশি, চটপটে, মিশুক, আর বড় বাচাল; চালচলন দেখে বেশ সহৃদয় লোক বলেই মনে হয় তাকে। সেজেছে সে পরিপাটী করে। সঙ্গে একজন তরুণী। তাদের দেখলেই—অন্তত মেয়েটিকে দেখলেই—বেশ বুঝতে পারা যায় সদ্য-বিবাহিত তারা। লোকটার সামান্য একটু আদরে-সোহাগে থেকে থেকে অসম্ভব রকমে রাঙা হয়ে উঠছে মেয়েটি, আর যখনই সে নম্র ভীরু চোখ দুটি তুলে চাইছে তার দিকে, মনে হচ্ছে আকাশের বুকে বুঝি হঠাৎ দুটি তারা ফুটে উঠে নিমেষেই

হয়ে পড়ল বাষ্পাকুল! মেয়েটির সুন্দর মুখখানিতে এমনই একটি অপরূপ শোভা ফুটে উঠেছে যা শুধু এক ইহুদী কুমারীদের মুখেই দেখতে পাই নব অনুরাগের আবির্ভাবে—পেলব রক্তিম মুখখানি, রক্তিম ওষ্ঠাধর, অপার্থিব সরলতায় মাখা, আর কালো চোখ দুটির নিবিড় অন্ধকারে যেন এক হয়ে মিশে গেছে চোখের তারা আর চোখের মণি।

তিনজন অচেনা লোকের সামনেই একটুও লজ্জিত না হয়ে, থেকে থেকেই মেয়েটিকে আদরে-সোহাগে ছেয়ে ফেলছিল লোকটা। তাতে যে শালীনতার অভাব না ছিল এমন নয়। চালচলনে তার স্পষ্ট ফুটে বেরুচ্ছিল সম্মিত ভাব,—এ হল গিয়ে সেই একান্ত আত্মতান্ত্রিক প্রেম যা বিশ্বজগৎকে যেন ডেকে বলতে চায়—'চেয়ে দেখ কি সুখী আমরা—এতে করে তোমরাও সুখী বোধ করছ, নয় কি?' এই হয়ত লোকটা তার সঙ্গিনীর কটিতটের উপরে নিল হাত বুলিয়ে, এই দিল তার গাল টিপে, তারপর হয়ত নিজের পাকানো কড়া কড়া গোঁফজোড়া মেয়েটির ঘাড়ের উপরে বুলিয়ে দিল তাকে সুড়-সুড়ি—আর তাতে করে যদিও সে নিজে আনন্দে ঠিক আত্মহারা হয়ে পড়ছে না, তবুও তার ঘন ঘন পলক-পড়া চোখে, তার কম্পিত ওষ্ঠের উপরে, তার ঠেলে-বেরিয়ে-আসা চৌকো থুতনিতে, কেমন যেন একটা লালসাময় ভীরু অস্বাচ্ছন্দ্য উঠেছে ফুটে।

এদের সামনের আসনেই বসেছিলেন তিনজন যাত্রী; প্রথম, একজন অবসর-প্রাপ্ত জেনারেল—পাতলা, ফিটফাট, ছিমছাম, ছোটখাট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক; দ্বিতীয়জন এক জোতদার—বেশ মোটাসোটা দেখতে, গরমে গলার কলার খুলে ফেলে দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছি-লেন না ভদ্রলোক, মিনিটে মিনিটে একখানা ভিজে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিলেন আর হাঁপাচ্ছিলেন বসে বসে; তৃতীয়জন হলেন পদাতিক সৈন্যদলের একজন তরুণ সেনানী।

অনবরত বকবক করেই চলেছে ইহুদী যুবকটি। এরই মধ্যে সে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যে তার নাম হল সাইমন ইয়াকোবালবিচ হোরাইজন। ভাপসা গরমে যদি একটা মাছি ঘরের মধ্যে ঘ্যানঘ্যান করতে করতে বারে বারে জানালার কাঁচে এসে ঠোকা খেতে থাকে তবে সেটা যেমন বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, সাইমনের বকবকানিও এ'দের কাছে হয়ে উঠেছিল তেমনি বিরক্তিকর। কিন্তু সাইমন জানত সময় কাটাবার রহস্য। নানা রকম ম্যাজিক দেখাতে শুরু করে দিল সে, ইহুদীদের মধ্যে চলতি নানা রকমের মজার মজার গল্পও বলতে লাগল। ট্রেন থামলে সাইমনের বউ একটু ঠাণ্ডা হবার জন্যে স্টেশনের প্ল্যাট-ফরমে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছে, অমনি সাইমন এমন সব কথা পেড়ে বসেছে যে তা শুনে দন্তপাটি বিকাশ করেছেন জেনারেল, জোতদার মশায় হ্রেষাধ্বনি করে হাসতে শুরু করেছেন, আর তরুণ সেনানী বেচারা—মোটে বছরখানেক হল স্কুল থেকে বেরিয়েছে সে—হাসি চাপতে না পেরে বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

হোরাইজনের বউ খুব যত্ন করে মাঝেমাঝে স্বামীর মুখ রুমালে মুছিয়ে দিচ্ছিল, পাখা দিয়ে তাকে হাওয়াও করছিল, আর এই রকম সেবাযত্ন পেয়ে সাইমনের মুখে মূর্খের মতো ফুটে উঠছিল আত্মশ্লাঘা।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বৃদ্ধ জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু যদি মনে না করেন তবে জিজ্ঞেস করি, আপনি এখন করেন কি?'

'হা ভগবান!' বেশ সরলপ্রাণেই উত্তর দিল সাইমন, 'এই দুর্দিনে আমার মতো এক বেচারী ইহুদী কি-ই বা এমন করতে পারে? এই ঘুরে ঘুরে মালপত্র খরিদ-বিক্রি করি আর কি, দালালিও করি তার সঙ্গে সঙ্গে। তবে এখন সে-সব কিছুই করছি না—মানে, কি আর বলব, বুঝতেই তো পারছেন এই মধুচন্দ্র যাপন করতে বেরিয়েছি আর কি—না, না, সরোচ্‌কা রাঙা হয়ে উঠো না—বছরে এ তো আর বার বার ঘুরে ফিরে আসবে না। তবে হ্যাঁ, তারপরই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে, আর খাটাখাটনিও করতে হবে অনেক। এখন

সরোচ্‌কাকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করব। তারপর পথই হবে আমার সঙ্গী। মাদ্রসের আর দুটো ইংরেজ কারবারের প্রতিনিধি আমি। একবার দেখবেন তাদের জিনিস? এই দেখুন সব নমুনা—' বলেই পাকা দরজির মতো চট করে একটা কাপড়ের বাণ্ডিল খুলে বসল সে। শুরু করে দিল—'দেখুন, কি চমৎকার সব নমুনা! এটা হল বিলিতি, আর এটা দেশী—দেশীটা কোন অংশেই খারাপ নয়। এটাই কি রুশীয়ার উন্নতির পরিচায়ক নয়?'

বলেই চলল সে—'তারপর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাশোনা করব। একটু প্রমোদ-ভ্রমণও করব। তারপর ভল্‌গা থেকে জারিৎসিন হয়ে কৃষ্ণসাগর, শেষে একদম নিজের দেশ ওডেসাতে চলে যাব!'

'চমৎকার পরিকল্পনা আপনার!' ভদ্রভাবে বলল তরুণ সেনানীটি।

'বটেই তো!' বলল সাইমন, 'কিন্তু কি জানেন, ঐ যে কথায় আছে—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। ব্যবসায়ী লোকের কাজ বড়ই কঠিন। তার শুধু ব্যবসা-বুদ্ধি থাকলেই চলে না, আরও একটা জিনিস থাকা চাই তার, সেটা কি বলব—ধরুন, এই মানুষের মনের খোঁজখবর রাখা। ধরুন, একজন ভদ্রলোক কিছুতেই কিছু শুনবেন না, মালের অর্ডারও দেবেন না; তাঁকে পথে আনতে তখন অমানুষিক খাটুনি খাটতে হয়। আর আমার হচ্ছে কি জানেন? কোন বাজে মাল, কি নকল জিনিস রাখি না আমি। যদিও তাতে হয়ত আমি ঢের বেশি আয় করতে পারতাম। আমার কথা যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, সবাই একবাক্যে বলবে—'সাইমনের মতো মানুষ আর দুটি নেই, এমন লোক সে'—বলেই সাইমন তার একটা ঝোলা আর রঙবেরঙের বোতামের বাক্স খুলতে শুরু করল—সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাও চলতে লাগল তার।

'যখন একই জায়গাতে অনেক ভ্রাম্যমাণ দালাল এসে জোটে তখনই বাধে যত গণ্ডগোল। সেখানে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারা যায় না। লোকে কথাই শুনতে চায় না মোটে। আমি কিন্তু তাতে ঘাবড়াই না। হোরাইজনকে চেনে সবাই। কথায় মানুষকে এমন বশ করতে পারি—বনের পশুও বশ হয়। যখন একই জিনিসের জন্যে দুজন দালাল একই জায়গাতে আসে—তাতে হয় কি, দুজনেরই ব্যবসা নষ্ট। নানা রকম ফন্দিফিকির খাটাতে হয় তখন। সে যাই হোক, আমি নকল চোখ আর নকল দাঁতের ব্যবসাও করি, তবে এতে বিশেষ লাভ হয় না, ও-কাজ ছেড়ে দেব। তা ছাড়া এ-রকমের সব ব্যবসাই ছেড়ে দেব ভাবছি। যদ্দিন যৌবন থাকে, দেহে মনে শক্তি থাকে কানায় কানায় ভরা, তদ্দিনই চলে এ-সব কাজ—এই গুটিছেঁড়া প্রজাপতির মতো এখানে-সেখানে উড়ে বেড়ানো; কিন্তু যেই বউ এনে ঘরে তুলেছি আর তারপর সন্তান-সন্ততিও হয়েছে' —খেলাচ্ছলে স্ত্রীর হাঁটুতে টোকা মারতে লাগল সাইমন, আর সে বেচারাকে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠায় অপরূপ সুন্দর দেখাতে লাগল—'তা ভগবান আমাদের ইহুদীদের সকল রকমের দুর্ভাগ্যের বদলে দিয়েছেন প্রচুর প্রজনন শক্তি—বিয়ে করে মানুষ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে চায়, চায় নিজেই কোন একটা ব্যবসা ফেঁদে বসতে, এ-সব তাই বিয়ের আগেই ভালো।' তারপর বৃদ্ধ সেনানীটির দিকে চেয়ে বলল সে—'আপনার কি মত?'

'বটেই তো, বটেই তো।'

'আর সেই জন্যেই'—সাইমন শেষ করেনি তখনও, 'সরোচ্‌কার সঙ্গে একটু যৌতুকও নিয়েছি; যদিও খুব সামান্য, তবুও আমার কাছে তা অমূল্য। আমার নিজেরও কিছু টাকা আছে, আর যাঁদের কাছে কাজ করি তাঁরাও কিছু ধার দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। ভগবানের আশীর্বাদে খাওয়াপরার কোন কষ্ট থাকবে না। তা ছাড়া সাবাথের দিন একটু বিশেষ আয়োজন—।'

'ভাবছি,' সাইমন বলেই চলল—'হোরাইজন এণ্ড সন্‌ নামে একটা কারবার খুলব।

কি বল সরোচ্‌কা—'এণ্ড সন?'—যদি কোন দিন আমাদের দোকানের সাইনবোর্ড চোখে পড়ে হয়ত তখন মনে পড়বে যে একদিন এক হতভাগা প্রেমপাগলের সঙ্গে ট্রেনে একত্র ভ্রমণ করেছিলেন। আশা করি তখন আপনি আপনার অর্ডার দিয়ে বাধিত করবেন আমায়।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' সায় দিলেন জোতদার মশায়।

'জমির দালালিও করি আমি; জমি কেনাবেচা করে দিই, বন্ধকীর বন্দোবস্তও করি। আপনার যদি সে-রকম কোন কাজের দরকার হয়,'—বলেই তিনখানা কার্ড জোতদার আর অন্য দুজনকে দিল সে।

পকেট হাতড়ে জোতদার মশায়ও তাঁর একখানা কার্ড সাইমনের হাতে গুঁজে দিলেন। চেঁচিয়ে নামটা পড়ল সাইমন,—'যোসেফ ইবানোবিচ্ ডেন্‌জেসেবস্কি। বেশ বেশ! যদি কোন দিন দরকার হয়—'

'নয়ই বা কেন? হতেও তো পারে,' ভাবতে ভাবতেই বললেন তিনি, 'হ্যাঁ, ঠিক, বোধ হয় ভাগ্যই আমাদের দুজনকে আজ মিলিয়ে দিয়েছে। আমি এখন যাচ্ছি ক-তে একটা জমিদারি বিক্রির ব্যাপারে; আপনি যদি এসব কাজ করেন তবে দেখা করবেন আমার সঙ্গে। আমি বরাবর গ্র্যাণ্ড হোটেলেই গিয়ে উঠি।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি,' উৎসাহিত হয়ে উঠল যেন সাইমন, 'এই শর্মা যদি কোন কাজে হাত দেয় সে-সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

আধঘণ্টা পরে গাড়ির করিডরে দাঁড়িয়ে সাইমন আর সেই তরুণ সাব-লেফ্‌টেনাণ্ট ছোকরাটি ধূমপান আর আলাপ করছিল:

সাইমন।—আপনি কি প্রায়ই ক-তে যান?

সেনানী।—না, এই প্রথম যাচ্ছি। আমার রেজিমেণ্ট রয়েছে শেরনোবোব্-এ। আমার নিজের জন্মস্থান হল মস্কো।

'বটে! আপনি এতদূর এলেন কি বলে তবে?'

'কি করব? আমি যখন সৈনিক হই, তখন ও ছাড়া আর কোন জায়গা খালি ছিল না।'

'কিন্তু শেরনোবোব্ যে একেবারে অতল পাথার! সারা পডোলিয়ার মধ্যে এমনতর জঘন্য স্থান বোধ হয় আর নেই।'

'তা সত্যি, কিন্তু উপায় কি?'

'তার মানে তরুণ ভদ্র সেনানী আপনি ক-তে যাচ্ছেন একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে?'

'হ্যাঁ, ভাবছি দিন দুই থাকব সেখানে। দু-মাসের ছুটি পেলাম, ভাবলাম মস্কো যাবার পথে এ-জায়গাটা একবার ঘুরে যাই। শুনেছি চমৎকার জায়গা।'

'হ্যাঁ, ভারি চমৎকার জায়গা! পুরোদস্তুর একটি ইয়োরোপীয়ান শহর। যেমন চওড়া রাস্তা তেমনি বিজলি আলো, থিয়েটার, নাচঘর। আপনি অতি-অবিশ্যি 'সাভুয় দ্য ফ্রুও' দেখতে যাবেন তা হলে—তিবোলিতে; আর চট করে একবার দ্বীপটাও ঘুরে আসবেন। ওখানকার কথাই আলাদা! কি সব মেয়েমানুষ, কি মেয়েমানুষ সব, আহা!'

রাঙা হয়ে উঠল সৈনিকপুরুষটি, একটু যেন কাঁপা গলায়ই বলল, 'হ্যাঁ, আমিও তা শুনেছি; কিন্তু সত্যিই কি?'

'হ্যাঁ, মাইরি! বলতে কি, সুন্দরী বললে ঠিক বলা হয় না।'

'কি রকম!'

'শুনুন তবে। পাগল-করা রূপ তাদের, আর বুঝছেনই তো কত রকমের রক্তের সংমিশ্রণ সেখানে—পোলিশ, ক্ষুদে রুশীয়ান, হিব্রু—কত কি! আপনি স্বাধীন, আপনি একা,—হিংসে হয় আপনাকে। তেমন তেমন হলে আমিও একবার দেখে নিতাম! সব

চেয়ে বড় কথা—অসম্ভব তাদের লালসা, একেবারে যেন আগুন! আর জানেন একটা কথা?' জিজ্ঞেস করল সাইমন গভীর অর্থপূর্ণভাবে কানে কানে।

'কি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল যুবকটি।

'অবাক কাণ্ড! বিশ্বাস করুন আমায়, যারা সারা দুনিয়া চুঁড়ে বেড়িয়েছে তাদেরই কাছে শুনেছি, দুনিয়ার কোথায় কখনও—লণ্ডন কি প্যারিস যেখানেই হোক না কেন—এ রকমটি পাবেন না আপনি। ওর মধ্যে বিশেষত্ব আছে—আমরা ক্ষুদে ইহুদীরা যেমন বলে থাকি। এরা এমন সব কলা-কৌশল ভেবে ভেবে বের করেছে যা কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারে না। পাগল হয়ে যাবেন আপনি।'

'সত্যি?' শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে এল ছেলেটির।

'শুনুন তবে। এখন না হয় আমি অকর্মণ্যদের দলে গিয়ে পড়েছি, তা বলে চির-দিনই তো আর এমনটি ছিলাম না। বয়সও ছিল আমার, আর বয়সকালে সব্বাই পাপ করে থাকে—আচ্ছা, আপনাকে দেখাচ্ছি কয়েকখানা ছবি। খুব সাবধানে দেখবেন কিন্তু।'

চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চট করে একটা মরক্কো বাঁধাই কেস পকেট থেকে বের করে দেখাল হোরাইজন, 'এই যে, দেখুন এদিকে; কিন্তু মিনতি করে বলছি, খুব সাবধান!'

যুবকটি এক-এক করে কার্ডগুলো উলটে যেতে লাগল—নানা রকমের অশ্লীল ছবি যত, কামকলার বিবিধ ভঙ্গি, এক-একটা অসম্ভব রকমের কায়দা, যাতে করে মানুষ পশুরও অধম হয়ে ওঠে। হোরাইজন যুবকটির ঘাড়ের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল, আর মাঝেমাঝে খোঁচা মেরে মেরে জিজ্ঞেস করছিল,—'বলুন, চমৎকার নয়? প্যারিস কি ভিয়েনার মেয়েরা এদের কাছে লাগে?'

সেনানীটি যখন ছবিগুলো ফেরত দিল তখন তার হাত-পা কাঁপছে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, দৃষ্টি আবছা হয়ে এসে গালে একটু রঙও ফুটে বেরিয়েছে।

হোরাইজন বলতে লাগল, 'এখন আর আমার এ-সব বিষয়ে রুচি নেই একেবারে। ভারতীয় বৈরাগ্য এসে গেছে। তাই ভাবছি কাউকে দিয়ে দেব, ছবিগুলো। দামের জন্যে কিছু আটকাবে না। আমি বলি কি,—তা আপনিই নিন না কেন? আলাপ-পরিচয় আমাদের এখন বন্ধুত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি নেন তবে পঞ্চাশ কোপেকে ছাড়তে পারি।—ত্রিশেও ছাড়তে পারি।—কেন, এটা কি খুব বেশি মনে হচ্ছে?—মোটেই তা নয়। বেশ তো, তাই যদি হয় তবে পঁচিশই দিন—তাও নয়?—কি সাংঘাতিক লোক আপনি! আচ্ছা, কুড়ির নিচে নামবার উপায় নেই কিন্তু। —আমি যখনই এদিকে আসি, হারমিটেজে এসে উঠি। সেখানে অনেক সুশ্রী যুবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আপনাকেও পরিচয় করিয়ে দেব। অর্থের প্রত্যাশী নয় তারা, তারা চায় শুধু আপনার মতো একজন সুদর্শন যুবকের সঙ্গ। এই কার্ডগুলো এমনই জিনিস যে এগুলো এমনি পড়ে থাকবে না; যারা এসব মালের কদর বোঝে তারা হয়ত এক-একটাই তিন রুবলে কিনে নিতে চাইবে।'—চোখ একটু কুঁচকে মুখটা নিচু করে বলল সে, 'কত মেয়েই যে এসব ফটো পছন্দ করে!'

সাইমন যুবকটির হাত ধরে এমন ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল যেন কিছুই হয়নি।

তা সাইমন লোকটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। অনেকক্ষণ ধরে একটি বাচ্চা বছর তিনেকের সুন্দরী মেয়ের উপরে চোখ রাখছিল সে, এখন তার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে তার সঙ্গে তারই মতো আধো আধো ভাষায় আলাপ জুড়ে দিল, 'খুকুমণি,' দাত্তো কোতা মায়েল কোল থেলে—উই, উই, উই—!' হঠাৎ কোত্থেকে এক তন্বী সুন্দরী তরুণী এসে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করল তার এই গায়ে-পড়া আলাপের জন্যে।

সাইমন বলল, 'কিছু মনে করবেন না; ভারি সুন্দর আপনার ছোট মেয়েটি। আমারও এই রকম একটি মেয়ে আছে। আমি—কি বলে গিয়ে—সামলাতে পারিনি, তাই একটু আদর করছিলাম—।' কোন কথা না বলে বাচ্চাটির হাত ধরে সরে পড়লেন মহিলাটি।

এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে তিনজন সুন্দরী এক দাড়িওয়ালা, গোমড়ামুখো লোকের সঙ্গে বসেছিল! সাইমন আর সেই লোকটা নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলছিল অদ্ভুত এক ভাষায়। মেয়েরা সাইমনকে কি যেন জিজ্ঞেস করতে চায় অথচ সাহস করে বলতে পারছে না। যাই হোক, দুপুরের দিকে একজন এসে জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটার সম্বন্ধে আপনি যা বলেছিলেন তাই সত্যি, কি বলেন? কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছি যেন।'

'কি যে বল, মার্গারিতা তিবানোবা' বলল সাইমন—'আমি যা বলি সব খাঁটি কথা। —লেজার, শোন,' দাড়িওয়ালাকে ডেকে বলল সে, 'সামনেই একটা স্টেশন পড়বে। সেখানে এরা যা চায় কিনে দিও। পঁচিশ মিনিট ট্রেন থামবে।'

এক মুটকী বুড়ীর সঙ্গে আর-একটা কামরায় আরও একদল মেয়ে যাচ্ছিল। বুড়ীর খনখনে গলার আওয়াজ, ট্রেনের ঘটাংঘটাং শব্দ, তার সঙ্গে সঙ্গে তার স্থূল চিবুক আর পীনপয়োধরের দোলন মিলে বেশ একটা ছন্দের সৃষ্টি করেছিল যেন। পোশাক-আশাক আর চেহারাতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এদের জীবিকা কি? কেউ বেঞ্চির উপরে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, কেউ করছিল ধূমপান, আর কেউ-বা তাস পিঠছিল। যদি কোন যাত্রী এদের কোলাহলে বিরক্তি প্রকাশ করেছে অমনি এদের কুৎসিত গালা-গাল খেয়ে চুপটি মেরে গেছে একেবারে। আর ছোকরা যাত্রীরা তাদের মদ আর সিগারেট নিয়ে বেশ আলাপ জমিয়ে বসেছিল তাদের সঙ্গে। সাইমনকে দেখে চেনবার উপায়ই নেই এখানে, তার ভাবখানা এমন, যেন কে-এক মস্ত মাতব্বর বেরিয়েছেন। তার অধীনস্থ মেয়েরা ছিল নানা দেশীয়,—রুমানিয়ান, ইহুদী, পোল, রুশীয়ান—এই সব। তাদের সব খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে চলে গেল সে। এখানে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক পশু-ব্যবসায়ী। মাঝেমাঝে নেমে এসে এদের তদারক করে যাওয়া, খাবার বন্দোবস্ত করা, সবই ঠিক চলছে, তারপর আবার নিজের কামরায় গিয়ে বউকে আদর করা আর নানা রকমের গালগল্প—সে সবও চলছে।

'খাবার সম্বন্ধে আমার কোন বাছবিচার নেই; কিন্তু এখানকার খাবারে আমার বিশেষ আপত্তি।' ফিরে এসে বলতে লাগল সে, 'এখানে তিন রুবল খরচ করে হয়ত কিছু খেলেন, তারপর তার জের পোয়াতে ত্রিশগুণ খরচ হয়ে গেল ডাক্তারের পেছনে।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু, সরোচ্‌কা, তোমার কিছু খাওয়া দরকার।'

রাঙা হয়ে উঠল সরোচ্‌কা সৌভাগ্য-গর্বে, মুখে বলল, 'না না না, আমার খিদে নেই, কিছু খাব না।'

সাইমন কিছু না শুনে একটা ঝুড়ি থেকে মুরগির মাংস, রুটি, শস্য, মদ এই সব বের করে, দুজনে খানিকটা খেয়ে বাকিটা আবার তুলে রেখে দিল।

ট্রেন চলেছে ছুটে, উন্মত্ত বেগে গাড়ির সামনে এসেই আবার উন্মত্ততর বেগে পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের গাছপালা।

কন্‌ডাক্‌টর এসে সাইমনকে কি যেন ইশারা করতেই, সাইমন বেরিয়ে এল। 'ইন্‌স্পেক্‌টর এখ্‌খুনি এখান দিয়ে যাবে, দয়া করে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এই প্ল্যাট-ফরমে এসে দাঁড়ান একটু,' বলল সে।

'বেশ তো।'

'তা, টাকাটা কি এখন দেবেন?'

'কত?'

'যেমন চুক্তি হয়েছিল, ভাড়ার অর্ধেক—দুই রুবল আশি কোপেক।'

'কি!—চটে উঠল সাইমন, 'এ-ত! আমায় বোকা পেয়েছ—না! এই এক রুবল দিচ্ছি, এর বেশি নয়। যাও এখন।'

'মাপ করতে হবে, কথামতো টাকা দিতে হবে।'

'কথামতো! মানে? আচ্ছা, এই দেড় রুবল নাও। বেশি কথা বললে এখ্খুনি ইন্স্পেক্টরকে ডাকব। বলব যে বিনা ভাড়াতে ঘুষ নিয়ে তুমি গাড়িতে লোক চড়াও। আমাকে কচি খোকা পাওনি—বুঝলে?'

ভীষণ চটে উঠল কন্ডাক্টর, 'দেখে নেব তোমায়, হতভাগা পাজী কোথাকার।'

'কি!' গর্জে উঠল সাইমন, 'তুমি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে! দাঁড়াও, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করছি। তোমায় পুলিসে দেব।'—বলেই গাড়ির এলার্ম-চেনের কাছে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন কন্ডাক্টর মশায়।

সাইমন এসে স্ত্রীকে বলল, 'সারা, এস, একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। কি চমৎকার জায়গাটা!

অনুগতা সারা তার দামী নতুন পোশাকটা সন্তর্পণে ধরে বেরিয়ে এল।

গোধূলির সোনার রঙ এসে পড়েছে দূরে গির্জার চূড়ার উপরে। মেঘে আচ্ছন্ন পাহাড়ের উপরকার শুভ্র গির্জার চারদিক, মনে হচ্ছে যেন ফুল দিয়ে ঘেরা কি বুঝি উড়ছে আকাশে। উঁচু থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে ছোটবড় বন। নদীর নীল জলে নেয়ে-ওঠা শুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলি ছোট ছোট বনেজঙ্গলে ছেয়ে আছে—পাহাড়ের গায়ে যেন ছোট ছোট সবুজ শিরা-উপশিরা। উপকথার মতো মনোরম প্রাচীন শহরটিকে মনে হচ্ছে যেন ছুটে আসছে ট্রেনখানার দিকে।

ট্রেন থামার পর কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে সাইমন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চলল। নারী-বাহিনীর খবরগিরনী সেই স্থূলাঙ্গীকে বলল সে, 'মাদাম বারমান, হোটেল আমেরিকা, ইবানুকোব্স্কায়া বাইশ।' দাড়িওয়ালাটাকে বলল—'লেজার, মনে থাকে যেন, এদের বেশ করে খাইয়ে দাইয়ে কোন সিনেমাতে নিয়ে যাবে। রাত এগারটার সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, তোমার সঙ্গে কথা আছে। যদি কেউ এর মধ্যে ডাকে আমায়, আমার ঠিকানা তো জানই—হারমিটেজ—দিয়ে দিও। ফোন করো, কোন কারণে সেখানে না থাকলে রেইমান কাফে বা তার উলটো দিকে যে হিব্রু হোটেল আছে, সেখানে যেও, আমায় সেখানে পাবে। যাত্রা তোমাদের শুভ হোক।'

৩

নিজের ব্যবসা সম্বন্ধে হোরাইজন যে-সব গালগল্প ফেঁদে বসেছিল, সবই তার নির্লজ্জ চটুল মিথ্যা কথা। মালপত্রের যে-সব নমুনা দেখিয়েছে সে, তা-ও হল গিয়ে তার আসল যে-ব্যবসা, অর্থাৎ নারীদেহ নিয়ে কারবার, তা চাপা দেবার একটা ফন্দি। সত্য বটে, অনেকদিন—প্রায় বছর দশেক—আগে কোন-এক অজানা কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে লুকিয়ে চোলাই-করা মদের কারবারে তাকে সারা রুশীয়া ঢুঁড়ে বেড়াতে হয়েছিল; সেই থেকেই সে পেয়েছে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মতো তার এই অবাধ সহজ বাক্চাতুরী, আর তখনই সে তার আসল কারবারের সংস্পর্শে প্রথম আসে। কি-একটা কাজে তাকে একবার 'রোস্তোব-অন-দন'-এ যেতে হয়েছিল; সেখানে এক অল্পবয়সী মেয়ে-দরজীকে ফুসলিয়ে বার করে এনে তার সঙ্গে প্রেম চালাতে থাকে সে। মেয়েটার তখনও পুলিসের খাতায় নাম ওঠেনি বটে, তাই বলে দেহমন সম্বন্ধে কোন সংস্কারের

বাল্লাইও ছিল না তার। হোরাইজন তখন তরুণ যুবক—দিলদরিয়া রসিক নাগর; মেয়েটাকে সঙ্গে করে সে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল—ঘটলও অনেক রোমাঞ্চকর অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা পথে-প্রবাসে। মাসছয়েক যেতে-না-যেতেই কিন্তু তার অবসাদ এল—মেয়েটা হয়ে উঠল তার গলার কাঁটা। তা ছাড়া বহুদিন একত্র বসবাসের ফলে যা হয়ে থাকে—ঈর্ষা, অবিশ্বাস, জবরদস্তি, কান্না-কাটি সবই দেখা দিতে লাগল একে একে।—তারপর ক্রমে ক্রমে সে মারধোরও শুরু করে দিল মেয়েটাকে। প্রথমবার মার খেয়েই একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু তারপর থেকেই সে একদম ঠাণ্ডা আর ভারি বাধ্য হয়ে উঠল। এ তো জানা কথাই যে, প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরা কোন রকমের মধ্যপন্থা মানে না; হয় তারা হবে প্রচণ্ড মিথ্যুক, ছলনাময়ী, কপটী, বিকৃতচিত্ত—অন্তর হবে তাদের কুটিলতা আর কালিমায় অন্ধকার, নয় তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করবে, হয়ে উঠবে অন্ধ অনুরাগিণী, নির্বোধ, একেবারে একটি পোষা প্রাণী—বুঝবে না নিজের ভালোমন্দ, জানবে না ত্যাগ আর আত্মমর্যাদা-হানির মধ্যে ছেদ টানতে হয় কোথায়। এই মেয়েটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের; তাই সামান্য চেষ্টায়ই হোরাইজন কিছুদিন বাদে তাকে পথে নামাল—বেশ্যাবৃত্তির জন্যে। তারপর যেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পর মেয়েটা তার প্রথমরাতের রোজগার পাঁচটি রুবল এনে তার হাতে তুলে দিল, সেদিন থেকেই হোরাইজন অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল মেয়েটার প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা। আশ্চর্যের কথা এই যে, এর পর থেকে হোরাইজন যত মেয়েরই সংস্পর্শে এসেছে—আর এসেছে-গিয়েছেও তার হাত দিয়ে কত শত মেয়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই—সর্বদাই তাদের প্রতি তার এই পুরুষসুলভ বিতৃষ্ণা অটুটই রয়ে গেছে। বেচারা মেয়েটাকে তো সে যত রকমে পারে অপমান করতে শুরু করে দিল, সব চেয়ে ব্যথার বিষয়গুলো বেছে বেছে নিয়ে নানা রকমে আরম্ভ করল তার উপরে নৈতিক উৎপীড়নও। কথা বলতে পারত না মেয়েটা, নিঃশব্দে কাঁদত কেবল, আর শেষে নতজানু হয়ে সাইমনের হাতে খেত চুমো। তার এই নীরব নতি-স্বীকার হোরাইজনকে করে তুলত আরও অধৈর্য. মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত সে; একঘণ্টা কি দু-ঘণ্টা বাদেই কিন্তু ফিরে আসত মেয়েটা—শীতে কাঁপতে কাঁপতে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভিজে টুপি হাতে ক'রে, জামা-কাপড় থেকে সপ সপ করে জল ঝরছে হয়ত তখন। শেষে এক নরপিশাচ সাইমনকে পরামর্শ দিল মেয়েটাকে গণিকালয়ে বেচে দিতে। সাইমনও একটা নতুন পথের সন্ধান পেল।

বলতে কি, কাজটা বাস্তবিকই উতরোবে কিনা সে-বিষয়ে মনে মনে হোরাইজনের দারুণ সন্দেহই ছিল। কিন্তু শেষটায় দেখা গেল, এরই জন্যে যেন সব-কিছু বসে ছিল হাঁ ক'রে—এমন চমৎকার ভাবে কিছুই ওতরাতে পারে না কখনও।

খারকোবের এক গণিকালয়ে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করতেই বাড়িউলী রাজি হয়ে গেল। জানত সে সাইমনের কি রকম লোক বশ করবার ক্ষমতা আর কি রকম মজলিশি লোক সে। কিন্তু সব চাইতে মুশকিল হল মেয়েটাকে নিয়ে; সে সাইমনকে ছেড়ে কোথাও একদণ্ড থাকতে রাজি নয়; সাইমন পীড়াপীড়ি করাতে সে ভয় দেখাতে লাগল আত্মঘাতী হবে বলে, দেবে এসিড ছিটিয়ে সাইমনের চোখ দুটো কানা ক'রে, নয়ত পুলিসের কাছে গিয়ে নালিশ করবে—আর বাস্তবিকই সাইমনের এমন দু-একটা কাণ্ড-কারখানার কথা তার জানা ছিল যা ফাঁস হয়ে গেলে, চাই কি তার গলায় দড়িও পড়তে পারত। বেগতিক দেখে সাইমন অন্যপথ ধরল। হঠাৎ সে হয়ে উঠল প্রেমে গদগদ, একেবারে যেন প্রাণের দোসর—আদরে সোহাগে মাতিয়ে তুলল সে মেয়েটাকে আবার। তারপর হঠাৎ আবার একদিন ভারি বিমর্ষের ভান করে পড়ে রইল; মেয়েটা চিন্তিত হয়ে যতই তাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে, ততই সে যেন এড়িয়ে যেতে চায় তার প্রশ্ন;

কখনও হয়ত বেসামাল হয়ে এক-আধটা ভয়ের কথা মুখ থেকে খসিয়ে ফেলেই আবার তখনই চুপ মেরে যায়। শেষে শুরু করল সে এলোপাথাড়ি মিথ্যের ছড়াছড়ি—ভীষণ বিপদ তার সম্মুখে, অনিবার্য জেল—না, খালি জেল হয়ে চুকে গেলে এমন কি আর এসে যেত—ফাঁসিও হতে পারে, পারে কেন, হবেই নির্ঘাত! তবুও যদি মাসকয়েকের মতো গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যেত! হায়, কি ভুলই না করেছে সে! ওরই মধ্যে আবার বিশেষ জোর দিয়েই বলত সে কি-একটা মনগড়া ব্যবসার কথা—তাতে মন দিতে পারলে নাকি লক্ষপতি হতে পারে সে—এখনই! এত সব দেখে শুনে মেয়েটা বাস্তবিকই ভড়কে গেল। স্বভাবত সে ছিল মাতৃজাতি—প্রেমাস্পদের জন্যে তার অন্তরে সেই একান্ত নিঃস্বার্থ নারীসুলভ স্বর্গীয় শঙ্কার উদয় হল যার উৎস হচ্ছে নারীর অন্তরতম মাতৃত্ব। চোখের জলে সাইমনকে বিদায় দিল সে—তারপর দিন গুনতে বসল আবার কবে দেখা হবে! ইতিমধ্যে তার পাসপোর্টখানা বদলে একখানা হলদে টিকিট আনা হয়েছিল, হতভাগী জানতও না তার মানে কি। বাড়িউলীর কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবল দক্ষিণা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাইমন। চেয়েছিল সে দু-শ—তা পঞ্চাশেই বা ক্ষতি কি এমন? সবে তো মোটে হাতেখড়ি।

গণিকালয়েই বন্দী হয়ে রইল মেয়েটা। সাইমন তার কথা একদম ভুলে গেল—বছরখানেকের মধ্যেই সে নাকি শতচেষ্টায়ও আর তার মুখখানা মনে আনতে পারত না, কিংবা কে জানে ভানই করত বুঝি!

রুশীয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সাইমন এখন নারীদেহের একজন বড় ব্যবসাদার। সুদূর কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ আর আর্জেন্তিনার সঙ্গে চলে তার কারবার। ওডেসার বেশ্যাপল্লী থেকে দলে দলে মেয়েমানুষ চালান দেয় সে কিয়েব-এ, কিয়েব থেকে খারকোব-এ, আবার খারকোব থেকে ওডেসায়। তা ছাড়া বড় বড় প্রাদেশিক রাজধানীতেও রয়েছে তার ঘাঁটি। বিরাট এক মক্কেলের দল জুটেছে এসে তার, তাদের মধ্যে রয়েছেন সমাজের অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি—লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর এবং বড় বড় জমিদার আর বণিক গোষ্ঠীর লোক। সারা লাম্পট্য-জগৎটার নাড়ীনক্ষত্র, অন্ধিসন্ধি, গলিঘুঁচি, সমস্তই রয়েছে তার নখদর্পণে—জ্যোতিষীর কাছে যেমন থাকে তারা-ভরা ঐ আকাশখানার খবর। বাড়িউলী হাফগেরস্ত, দালাল, বাইজী, খেমটাওয়ালী—চেনে না সে হেন কেউ নেই অত বড় ঐ অঞ্চলটাতে। আর স্মরণশক্তি তার এমনই প্রখর যে কখনও খাতাপত্রে কিছু টোকাটুকি করতে হয় না তাকে—সে ভালোই বটে তার পক্ষে। হাজার হাজার মেয়ের নাম, তাদের ডাকনাম, বংশপঞ্জী, ঠিকানা, চেহারা, চালচলন, সবই একেবারে কণ্ঠস্থ তার। মক্কেলদের মধ্যে কে কি চায়, কার কেমন মর্জি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে সে; তাদের কেউ কেউ চায় যত সব বিশ্রী নোঙরামি, কেউ কেউ হচ্ছে অনাঘ্রাত অপাপবিদ্ধ কুমারীর জন্যে মুক্ত-হস্তে ব্যয় করতে উৎসুক, অপর কারও কারও লোভ নাবালিকাদের প্রতি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মেয়ে যোগাড় করা বড় কঠিন, আর বেশ ভয়ের কথাও বটে, কিন্তু এতে করে এক-এক দাঁওয়ে লাভও হয় হাজার হাজার টাকা। সকল রকমের চাহিদারই যোগান দিতে হয় তাকে—কামকলায় কেউ হচ্ছে নির্মম-নিষ্ঠুর, কেউ বা দুঃখবিলাসী, আবার কারও ঝোঁক হল যত সব অস্বাভাবিক রকমের যৌন বিকৃতির দিকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাত সে কচিৎ কখনও—শুধু যখন বড় রকমের দাঁও মারবার নিশ্চয়তা থাকত তখনই। এ জন্যে বারকয়েক জেলও খাটতে হয়েছে তাকে। তাতে তার ব্যবসায়ের ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হয়েছে; বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে তার সাহস, বুদ্ধি, আর আগ্রহ। এ পর্যন্ত সে বারবার পনর বার বিয়ে করেছে; প্রত্যেক বারই করে নিতে পেরেছে বেশ চলনসই গোছের যৌতুক গ্রহণের ব্যবস্থা। তারপর বলা নেই কওয়া নেই সন্দিগ্ধ হয়ে একদিন একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে সে, পাত্তা মেলার উপায় রেখে যায়নি কিছুই,

আর যখনই সম্ভব হয়েছে তখনই বউকে দিয়েছে বেচে—হয় কোন গোপন আড্ডাখানায়, নয় কোন কায়দাদুরুস্ত গণিকালয়ে। কনের বাপ-মা পুলিসে ডায়েরি করে, হুলিয়া বার করিয়ে, তার টিকির নাগালও পায়নি; তখন হয়ত নানান ছদ্মনামে সে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ যাবৎ সে এতগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করে এসেছে যে, সময় সময় আসল নামটার উপরে তার নিজেরই মনে ঘোর সন্দেহ জাগে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার এ-কারবারে অন্যায় বা গর্হিত কিছুই দেখতে পায় না সে। মাছমাংস, আটাময়দা, কাঠকুটো, এই রকম আর পাঁচটা মালের কারবারের মতোই মনে করে সে এটাকে। নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মেও মতি আছে তার। সময়ে কুলোলে প্রতি শুক্রবারে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই সে যায় সমাজে উপাসনা করবার জন্যে। আর যখন যেখানেই থাকুক না কেন, প্রত্যেকটি পাল-পার্বণ নিয়মমতো মেনে চলে সে। সংসারে আছে তার শুধু এক বুড়ী মা আর কুঁজো বোন একটি—তারা থাকে ওডেসায়। নিয়মিত ভাবে না হোক, প্রায়ই সে কিছু-কিছু করে তাদের টাকা পাঠায়—তা সে কুর্ক্স, ওয়ার্জা, সামারা, যেখান থেকেই হোক না কেন। ব্যাংকেও জমে উঠেছে তার প্রচুর টাকা, আর কেবলই বেড়ে চলেছে তা; সুদটুকু পর্যন্ত তাকে ছুঁতে হয় না কখনও। কিন্তু লোভ কি অর্থ-লালসা কাকে বলে তার কিছুই জানে না সে। এ-কারবারে ব্রতী হয়েছে সে শুধু এক ওই কারবারটার বিশেষ কদর, বিপদের ভয়, আর আত্মশ্লাঘার জন্যে। মেয়েমানুষের সম্পর্কে সে হল একেবারে উদাসীন; তবে সে তাদের বোঝেও বেশ, তাদের দর যাচাই করার একজন মস্ত বড় জহুরী—এ যেন সেই ময়রার মতন যে মিঠাইমণ্ডার ভালোমন্দ বেশ বোঝে কিন্তু তার নিজের সে-সবে ধরে গেছে অরুচি। যে-কোন মেয়েকে ভুলিয়ে বশ করতে, ফুসলিয়ে বের করে আনতে, তাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করিয়ে নিতে, একটুও বেগ পেতে হয় না তাকে; মেয়েরাও যেন তার ডাক শুনলেই সাড়া দিয়ে এসে জমায়েত হয়, আর তার হাতে এসে নাচে সব যেন কলের পুতুল! মেয়েদের প্রতি তার ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা আর আত্মপ্রত্যয় রয়েছে যাতে করে চোখের নিমেষে তারা বশ হয়ে পড়ে—বদমাইশ ঘোড়া যেমন জব্দ হয় জবরদস্ত সওয়ারের সামান্য একটি মুখের কথায়, চোখের চাউনিতে, কি গায়ে হাত-বুলুনিতে।

নিজের মতো থাকলে মদ সে কখনই খায় না, দলে পড়লেও খায় খুব কমই। খাওয়াদাওয়াতেও তার কোন আগ্রহ নেই। যা-কিছু দুর্বলতা রয়েছে তার স্বভাবে সে হল ওই এক পোশাক-আশাক নিয়ে—সাজে সে সদাসর্বদা পরিপাটী, ফুলবাবুটি যেন।

বউকে নিয়ে সোজা চলে এল সে হারমিটেজে। দুজনেরই সাজগোজের খুব পরিপাটী। সাইমনের হাতে রুপো-বাঁধানো এক বেতের ছড়ি, হাতলে বসানো রয়েছে এক নগ্ন নারীমূর্তি।

বিশালকায় এক দ্বারী জিজ্ঞেস করল, 'এখানে থাকবার ছাড়পত্র নিশ্চয়ই আছে আপনার কাছে।'

'আঃ, জাভার! বারবার সেই একই কথা—ছাড়পত্র!' বলে স্ফূর্তির ঝোঁকে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল সাইমন, 'সবসুদ্ধ দিন তিনেক থাকব। কাউন্ট ইপাটিয়েবের সঙ্গে দেনাপাওনার চুক্তিটা হয়ে গেলেই সোজা চলে যাব। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে থাক তোমরা। আর দেখ, তোমার জন্যে কেমন একটা খেলনা এনেছি ওডেসা থেকে। ভারি খুশি হবে দেখে।'—বলেই চট করে লোকটার থাবার মধ্যে গুঁজে দিল সে একটি মোহর। তারপর ঘরে ঢুকে সব ঠিকঠাক করে নিয়েই চাকরকে ডেকে একসঙ্গে একেবারে ছ-ছ-জোড়া জুতো বের করে দিয়ে বলল, 'ওরে, সব

ক-জোড়া এখনই পালিশ করে নিয়ে আয়, একেবারে যেন আর্শির মতো ঝকঝক করতে থাকে—বুঝলি? তোর নাম তিমোথী—না? তবে তোরও তো আমায় চিনতে পারার কথা। তা দেখ, তিমোথী, আমার কাছে কাজ করলে সে অমনি যাবে না। সাবধান, মনে থাকে যেন একেবারে আয়নার মতো পালিশ হওয়া চাই।'

৪

তিনদিন তিনরাত্রের বেশি হোটেল-হারমিটেজে থাকেনি হোরাইজন; তারই মধ্যে দেখা করেছে সে আন্দাজ শ-তিনেক লোকের সঙ্গে। তার পদার্পণে শহরময় যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। তার কাছে আসত চাকরবাকরদের কাজ জুটিয়ে দেবার আপিসের মালিকরা, সস্তা হোটেলের কর্ত্রীরা, মেয়েমানুষের দালালিতে চুল পাকিয়েছে এমন সব লোক, আরও কত কে!

এখানে এসে পৌঁছুবার ঠিক পরদিনই সে গেল ছবিওয়ালা মেৎজের-এর দোকানে, সঙ্গে তার এক গৌরাঙ্গী মেয়ে—বেলা। তার সঙ্গে নানান ছাঁদে শুয়েবসে খানকয়েক ছবি তোলাল সে। প্রত্যেকটি ছবির জন্যে পেল সে তিন রুবল দক্ষিণা; মেয়েটাকে কিন্তু শুধু এক রুবল দিয়েই বিদায় করে দিল। তারপর গেল সে বারসুকোবার সঙ্গে দেখা করতে।

এই বারসুকোবা মেয়েমানুষটা আসলে ছিল যাকে বলে 'বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী'। তার জুড়ি মেলে শুধু এক দক্ষিণ-রুশীয়াতেই; না ছিল সে পোল, না-ছিল ক্ষুদে রুশীয়ান, বয়সও মন্দ হয়নি তার, তবে তারই মধ্যে এত টাকা কামিয়ে ফেলেছে সে, দিব্যি কোত্থেকে বেশ সুশ্রী আর ভালোমানুষ গোছের এক পোলকে বর বলে ধরে নিয়ে এসে পুষছে, আর দুজনে মিলে চালাচ্ছে এখন একটা নাচের মজলিশ। হোরাইজন আর বারসুকোবা পুরোনো বন্ধুর মতোই আলাপ করতে লাগল; তাদের সে-সব কথাবার্তার মধ্যে না-ছিল ভয়ডর, না-ছিল লাজলজ্জা, কি বিবেকবুদ্ধির বালাই!

'মাদাম বারসুকোবা, তোমায় আমি খাসা মালের যোগান দিতে পারি—তিন-তিনটে মেয়ে, একটি হল শ্যামবর্ণ, ভারি শান্ত; আর-একটা বেশ ছোট্টখাট্ট ফর্সা মেয়ে, বুঝতেই পারছ সব তাতেই রাজি সে। আর একটা হচ্ছে এক 'রহস্যময়ী নারী', খালি হাসে, কোন কথা কয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে ঢের কাজ আদায় হবে,—আর হ্যাঁ, সুন্দরীও বটে মেয়েটা।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে বসে বসে মাথা নাড়ছিল মাদাম বারসুকোবা। 'তুমি কি বোকা বানাতে চাও আমায়, মি. হোরাইজন? সেবার যা করেছিলে এবারও কি সে-রকম কিছু করতে চাও?'

'হায় ভগবান! এই করেই দিনগুজরান করি আমি, আর আমিই তোমায় ঠকাব! যাক গে, আসল কথা সেটা নয়। তোমায় আমি একটি বেশ লেখাপড়াজানা মেয়েও দিচ্ছি। তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো। খুব সম্ভব সমজদার লোকই খুঁজে পাবে তুমি।'

চতুরের হাসি হাসে বারসুকোবা। 'ফের একটি বউ?' জিজ্ঞেস করে সে।

'না, বনেদী ঘরের মেয়ে।'

'না বাপু, পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে আবার।'

'কি যে বল! তোমার কাছে তো বেশি দাম চাইতে পারি না। মোটে এক হাজার রুবল পেলেই তিনটেকে ছাড়তে পারি।'

'বটে? তবে সিধে কথায় এস—পাঁচ-শ।—আর ঝক্কি পোয়াতে পারব না, বাপু।'

'দেখ, মাদাম বারসুকোবা, এই আমাদের নতুন কারবার নয়। তোমায় ঠকাব না

আমি, সিধে নিয়ে আসছি আমি মেয়েটাকে, কিন্তু মিনতি করে বলছি ভুলে যেও না যে তুমি আমার মাসী, আর বরাবর ঠিক সেই চালেই চলবে তার সামনে। তিন দিনের বেশি থাকব না আমি শহরে।'

খুশির হাসিতে একসঙ্গে দুলতে থাকে মাদামের বুক, পেট, আর থুতনি—'খুঁটি-নাটি নিয়ে দরদস্তুর করব না আমরা—বিশেষ যখন আমরা কেউ কাউকেই ঠকাব না। আজকাল মেয়েদের চাহিদা খুব। তা তুমি একটু মদ খাবে?'

'ধন্যবাদ!'

তারপর তারা অন্য কথা পাড়ে। যথা, 'বছরে কত আয় হয় তোমার?'

'কত আর, বার থেকে কুড়ি হাজার। তা ঘোরাঘুরিতেও তো কত খরচ হয়ে যায়!'

'কিছু জমাতে পার না?'

'যৎসামান্য। বছরে মোটে দু-তিন হাজার।'

'আমার তো ধারণা ছিল তার বেশি—দশ-বিশ হাজার—'

কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? মনে মনে সাবধান হয়ে ওঠে হোরাইজন।

আনা মিখাইলোব্‌না (বারসুকোবা) বিদ্যুতের ঘণ্টা টিপে পরিচারিকাকে ডেকে কয়টা ক্রীমরোল আর এক বোতল শ্যাম্পেন আনতে বলে দেয়; হোরাইজনের রুচি-অরুচি জানা আছে তার। তারপর জিজ্ঞেস করে সে, 'তুমি মি. শেপ্‌শেরোবিচ্‌কে চেন?'

একেবারে যেন লাফিয়ে ওঠে হোরাইজন। 'শেপ্‌শেরোবিচ্! হা ভগবান! কে না চেনে তাঁকে! মানুষ নন তিনি—একেবারে একটি দেবতা, অদ্ভুত প্রতিভাশালী লোক।' খেপে ওঠে হোরাইজন, ভুলে যায় যে তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে সে—'শুধু একটিবার ভেবে দেখ গত বছর কি করেছেন শেপ্‌শেরোবিচ্। কব্‌নো, বিল্‌নো আর ঝিতুমির থেকে একেবারে ত্রিশ-ত্রিশজন মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি সিধে আর্জেন্তাইনে। প্রত্যেকটি বেঁচে দিলেন তিনি এক-এক হাজার রুবলে—দেখ হিসেব ক'রে, মাদাম,—মোট হল ত্রিশ হাজার রুবল। তাতেই কি ঠাণ্ডা হয়েছেন নাকি শেপ্‌শেরোবিচ্? এই টাকা দিয়ে, তাঁর যাতায়াতের খরচা মেটাবার জন্যে, জনকয়েক নিগ্রো মেয়েকে কিনে আনলেন তিনি; তারপর দিলেন তাদের বিলি করে মস্কো, পিতার্সবার্গ, কিয়েব, ওডেসা, আর খারকোব-এ। তবে জানই তো মাদাম, মানুষ নন তিনি, একেবারে একটি শকুনি। হ্যাঁ, তবে ওই একটা লোকই যে ব্যবসা বোঝে।'

সোহাগ করে হোরাইজনের হাঁটুর উপরে হাত রাখে বারসুকোবা; এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে, তাই বেশ সহৃদয়তা মাখানো সুরে বলে—'আমিও বলি কি মি.—হ্যাঁ, তোমার এবারকার নামটি কি জানি না তো—'

'হোরাইজন, ধরই না—'

'আমি, ভাই বলি কি, মি. হোরাইজন, তুমি জনকয়েক কুমারী মেয়ের যোগাড় করতে পার? এদের চাহিদা আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে। টাকার কথা ভেব না, তাতে এলাব না আমরা। এই হল এখনকার দস্তুর। দেখ, হোরাইজন, তোমার এই সব মেয়ে-মক্কেলদের ফের একেবারে আগেকার মতো অক্ষত অবস্থায়ই ফেরত পাবে তুমি। বুঝতেই তো পারছ—এ হচ্ছে একটু ইতরোমো আর কি—ঠিক এর মানেও বুঝি না বাপু—'

নিচের দিকে চেয়ে, কপালটা একটু রগড়ে নিয়ে হোরাইজন বলে, 'দেখ, আমার এক বউ আছে—তুমি প্রায় তা আন্দাজ করেই ফেলেছ দেখছি।'

'তাই। আবার 'প্রায়' কেন?'

'খুলে বলতে লজ্জাই করছে যে! সে—কি বলব গিয়ে—সেটি এ যাবৎ আমার বিয়ের কনে হয়েই রয়েছে—।'

খুশিতে হেসে গড়িয়ে পড়ে বারসুকোবা। 'দেখ, হোরাইজন, আমি একদম ভাবতেই পারিনি যে, তুমি এমন নরকের কীট হতে পার। বেশ তো, তোমার বউকেই দাও না আমাদের কাছে। সে ঐ একই কথা! কিন্তু এও কি সম্ভব যে তুমি ছোঁওনি তাকে?'

'এক হাজার?' গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করে হোরাইজন।

'আঃ, কি আপদ! বেশ তো, হাজারে বেজার নই আমি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, সামাল দিতে পারব তো তোকে?'

'বাজে কথা?' দৃঢ়স্বরে বলে হোরাইজন—'এ কথা ভুলে গেলে চলবে কেন যে তুমি হলে আমার মাসী, আর তোমার কাছে বউকে রেখে যাচ্ছি। একবার ভেবে দেখ—মেয়েটা একেবারে পোষা মেনি বেড়ালটির মতো ভালোবাসে আমায়। তাকে যদি বল যে আমারই ভালোর জন্যে তাকে এই এই করতে হবে তো তার দিক থেকে কোনই কথা উঠবে না।'

ব্যস! আর কিছুই বলা-কওয়ার দরকার রইল না। মাদাম বারসুকোবা একখানা প্রমিসরি নোট নিয়ে এসে বহু কষ্টে তার উপর নিজের নাম, বাপের নাম, আর এর আগের বার তার নিজের যে নাম ছিল তা লিখে হোরাইজনের হাতে দিল। প্রমিসরি নোটখানা অবশ্য বানানো। তবে চোর-ছ্যাঁচড়দের মধ্যে কথার খেলাপ হয় না। এ-সব কারবারে কেউ ঠকায় না কাউকে। ঠকালে অনিবার্য মৃত্যু। কয়েদখানায়ই হোক, পথেঘাটেই হোক, কি বেশ্যাবাড়িতেই হোক—সবখানেই এই একই নিয়ম।

পরমুহূর্তেই, যেন এক গুপ্তদুয়ার ভেদ করে বিভীষিকা-মূর্তির মতো সেখানে হঠাৎ এসে আবির্ভূত হলেন এক তরুণ পোল—গোঁফজোড়া উঁচু করে পাকানো তাঁর। লোকটা হল গিয়ে মাদাম বারসুকোবার প্রাণের দোসর, আর তাদের সেই নাচঘরের মালিক। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে মদ খেতে লাগল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে হতে লাগল এটা-সেটা নিয়ে দু-একটা কথা—বিশেষ করে ব্যবসা-সংক্রান্ত গোলযোগের কথা। তারপর হোরাইজন হোটেলে নিজের ঘরে টেলিফোন করে বউকে ডেকে আনল। এসে পেঁছুলে পর তার সঙ্গে মাসী আর মাসীর কুটুমের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, গোপন রাজনৈতিক কারণে এখুনি আমার শহর ছেড়ে যেতে হচ্ছে।' তারপর মমতাভরে সারাকে চুমু খেয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, দিব্যি গটগট করে বেরিয়ে গেল সে।

৫

হোরাইজনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই (ভগবান জানেন লোকটার আসল নাম কি!) ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের একে একে সব কিছুই যেন যেতে লাগল উলটে। শুরু হল প্রচণ্ড রদবদল, ওলটপালট। ত্রেপেল থেকে চালান হয়ে মেয়েরা সব আসতে লাগল আনা মারকোব্নার আস্তানায়, আবার সেখান থেকে অনেকে এসে ঠেকল হয়ত কোন এক-রুবলের বাড়িতে, আর এক-রুবলের বাড়ি থেকে চালান হয়ে এল সব আধ-রুবলের বাড়িতে। উঁচুতে উঠতে পেল না কেউই, নিচুতেই নামতে লাগল সব একে একে। এই রকমের প্রত্যেকটি রদবদলে হোরাইজন উপায় করত পাঁচ থেকে এক শ করে রুবল। লোকটার উৎসাহ ছিল যেন প্রায় ঐ ইমাত্রার জলপ্রপাতেরই মতো।

দিনের বেলা। আনা মারকোব্নার বাড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছে হোরাইজন, আর পায়ের উপর পা রেখে এক পা দোলাচ্ছে অনবরত। সিগারেটের ধোঁয়ার জন্যে চোখদুটো টেরা করে বলে উঠল সে, 'মানে কথাটা হচ্ছে—সেই একই। সোন্কাকে নিয়ে কি আর করবে তোমরা? এসব সভ্য-ভব্য জায়গায় ঠাঁই নেই ওর। তার বদলে ওকে

যদি ভাঁটার টানে ছেড়ে দাও তো তোমরা ছাঁকা একশটি রুবল এখনি কামাতে পার, আমিও পাই গোটা পঁচিশেক রুবল। আচ্ছা, খোলাখুলিই বল না আমায়, ওকে কে আর এমন পোঁছে এখানে আজকাল?'

'মি. শাৎস্কি, তোমার সঙ্গে কথায় পারবে কে বলো! কিন্তু বুঝে দেখ, মেয়েটার জন্যে মায়া হয় আমার। এমন লক্ষ্মী মেয়েটি—'

ভাবতে লাগল হোরাইজন। একটা সময়োপযোগী প্রবচন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে।

'টোল টোল টুলুনি, সাবড়ে দে রে এখুনি।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাদাম শোইবেস, এ মাল এখন একদম অচল।'

ইসাইয়া সাবিচ্ দেখতে ছোটখাট, রোগা-পটকা, ঘ্যানঘেনে বুড়োমানুষটি হলে কি হয়, দরকারী কাজের বেলায় ভারি একবগ্‌গা লোক সে। হোরাইজনের কথায় সায় দিয়ে বলল সে, 'এ তো সিধে কথা। সত্যিই, একদম অচল হয়ে পড়েছে ছুঁড়ীটা। ভেবেই দেখ না, আন্নেচ্‌কা, মাগীর পোশাক-আশাকে খরচা পড়ছে পঞ্চাশ রুবল, মি. শাৎস্কি নেবেন পঁচিশ, আর বাদবাকি পঞ্চাশ রুবল তোমার আর আমার। ভগবানের অপার মহিমা, ছুঁড়ীর দায় থেকে রেহাই পাওয়া গেল—অন্তত ওর জন্যে আর খরচ পোয়াতে হবে না।'

এই রকম হতে হতে বেচারী সোন্‌কা শেষে এক-রুবলের বাড়ি থেকে বদলি হয়ে এল আধ-রুবলের এক বাড়িতে। সেখানে যত রাজ্যের সব ইতর লোক খেয়ালমাফিক মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সারারাত। এ-সব ক্ষেত্রে যা হচ্ছে একান্ত প্রয়োজন তা হল অপরিমিত স্বাস্থ্য আর অসম্ভব রকমের স্নায়বিক শক্তি। এক রাতে থেক্‌লা বলে পর্বতপ্রমাণ এক মেয়েমানুষ—তা ওজনে কিছু না হোক কম-বেশি আড়াই মণ তো হবেই,—এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়—সেখানেই কি একটা দৈহিক গ্লানি লাঘব করবে বলে। এমন সময় বাড়িউলী সে-দিক দিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে 'গিন্নীদি, ভাই শোনো—ছত্রিশ নম্বরের খদ্দের!—ভুলে যেও না যেন।' দেখেশুনে সোন্‌কা বেচারীর হাত-পা তো পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধুল।

তা সোন্‌কার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তাকে বিশেষ কেউ বিরক্ত করে না এখানে। এখানকার পক্ষেও সে ছিল বড্ড সাদাসিধে। বড় কেউই একটা তার ডাগর ডাগর চোখ দুটির দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। নেহাত আর কেউ হাতের কাছে না থাকলেই লোকে এসে তাকে নিয়ে যায়।

নেমান সেখানে এসেও খুঁজে বের করল তাকে, আর সেই থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সে এখানেই আসে। কিন্তু ভীরুতাই হোক, আর হিব্রু রুচির জন্যেই হোক, কিংবা কে জানে হয়ত দৈহিক ঘৃণাবশতই হবে, মেয়েটিকে সে এ বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখতে চেষ্টাও করেনি কোনদিন। সারারাত ধরে তার পাশটিতে গিয়ে বসে থাকে সে, আর দৈবাৎ কখনও কোন খদ্দের এসে সোন্‌কাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলে, আগের মতোই তার ফিরে আসার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে বসেও থাকে। আর সোন্‌কা ফিরে এলেই হয় সেই চিরন্তন দৃশ্যের অবতারণা—ঈর্ষা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার। তবু প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সে মেয়েটিকে, আর দিনের বেলায় ওষুধের দোকানের কোণটিতে বসে বড়ি তৈরি করতে করতে একটানা তারই কথা ভেবে ভেবে সারা হয়ে যায় বেচারা।

৬

শহরতলির ক্যাবারে। ঢুকতেই রঙ-বেরঙের বিজলি-বাতি দিয়ে তৈরি একটি কৃত্রিম পুষ্পস্তবক, তারপর দুধারে এইরকম আলো দিয়ে তৈরি চওড়া আর্চ—আস্তে আস্তে সরু

হয়ে একেবারে বাগানের মাঝখানটিতে এসে শেষ হয়েছে। আর-একটু এগিয়ে এলে হলদে বালি-ছড়ানো চওড়া এক স্কোয়ার; বাঁদিকে একটি খোলা মঞ্চ, একটা থিয়েটার আর এক চাঁদমারি; সোজা নাক-বরাবর হল গিয়ে মিলিটারি ব্যান্ডের এক আস্তানা (ঝিনুকের মতো করে তৈরি), আর সারি সারি বীয়ার আর ফুলের স্টল; ডাইনে রেস্তরাঁর লম্বা চাতাল। উঁচু উঁচু থামের গায়ে গোল গোল বিজলি বাতি; তা থেকে আলো এসে পড়ায় নিচে ছোট্ট স্কোয়ারখানিকে ফ্যাকাশে, সাদা-ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে। তারের জাল দিয়ে ঘেরা ঘষা-কাঁচের গায়ে গায়ে মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসে পড়েছে দেওয়ালি পোকা, আর নিচে মাটির উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এলো-মেলো হয়ে নড়াচড়া করছে তাদের ছায়া। ক্ষুধার্ত মেয়েদের দল ভারি শৌখিন কায়দায় কিম্ভূত-কিমাকার বেশে সেজে, বলতে গেলে আদুড় গায়েই, জোড়ায় জোড়ায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সেখানে—তাদের কেউ-বা চোখেমুখে একটা নিরুদ্বেগ হাসিখুশির ভাব টেনেবুনে বজায় রাখবার চেষ্টা করছে, কেউ-বা করছে মানিনীর ভান, কেউ কেউ দেখাচ্ছে অগম্যা নারীর অসন্তোষের ঠাট,—কিন্তু চলাফেরা করছে সবাই ক্লান্ত পায়ে—টেনে টেনে।

রেস্তরাঁর সবগুলো টেবিলই এখন জোড়া; তার উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু কাঁটা-চামচে-প্লেটের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ আর পাঁচমিশালী ভাষায় গালগল্পের ঢেউ। নাকে আসছে পাকশালার মোগলাই খানার খোসবু। মাঝখানটাতে একটা একটু উঁচু-মতন জায়গাতে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছে রেস্তরাঁর একদল রুমানিয়ান বাজনদার; পরনে তাদের লাল রঙের ফ্রক, গায়ের রঙ ময়লা, দাঁতের পাটি সব মড়ার মতো সাদা, মুখের গড়ন দেখলে মনে হয় মুখময় লম্বা লম্বা রোঁয়াভর্তি একপাল বনমানুষকে বেশ করে পমেড মাখিয়ে রোঁয়াগুলো পাট করে নামিয়ে দিয়ে সেখানে এনে কে যেন ছেড়ে দিয়ে গেছে। বাজন-দারদের পালের গোদা সামনের দিকে ঝুঁকে নানা ঢঙে অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বেহালা বাজাচ্ছে—আর অসভ্যের মতো এমন মিঠে-মিঠে করে চোখ ঠারছে সকলের দিকে চেয়ে যে লোকটাকে দেখে মনে হয় আস্ত একটি পুরুষ-বেশ্যা। আর এই অনাবশ্যক অপরিমিত আলোর খেলা, সুরের মেলা, মহিলাদের প্রসাধনের বৈচিত্র্যে, সুগন্ধির তীব্র সৌরভ—সব-কিছু মিলে একাকার হয়ে এক বিরক্তিকর, নির্বোধ, উন্মত্ত বিলাসের অযথা প্রলাপ সৃষ্টি করছে।

উপরে সমস্ত হলঘরখানার চারদিক ঘিরে খোলা গ্যালারি। তারই সামনে মাঝে-মাঝে এক-একটা নিরালা কুঠরির দরজা—যেন ছোট-ছোট অলিন্দের সামনে এক-একটি ঘরের দুয়ার। এই রকমেরই একটা কুঠরিতে বসে চারজন—দুজন মহিলা আর দুজন ভদ্রলোক: একজন হলেন রুশীয়ার বিখ্যাত বাইজী রোবিনস্কায়া—বেশ দোহারা গড়ন, সুন্দরী, মিশরীদের মতো টানা টানা সবজে চোখ, লম্বাটে লালচে লালসাদীপ্ত মুখখানি, বাঁকা ঠোঁটের কোণে পরুষভাব। আর-একজন হচ্ছেন ব্যারনেস তেফ্‌তিগু, দেখতে ছোট-খাট, চমৎকার, ফ্যাকাশে মতন—বাইজীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ান তিনি। পুরুষ দুজনের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত উকিল রিয়াজানোব, আর-একজন হচ্ছেন বোলোদিয়া শ্যাপলিন্‌স্কি—তরুণ, ধনবান, বিলাসী লোক, শৌখিন গীত-রচয়িতা, লিখেছেনও গোটাকয়েক মিঠে-মিঠে ছড়া আর হাল-আমলের বিষয় নিয়ে বিস্তর নক্সা। শহরময় সে-সব লেখার চলতিও হয়েছে বেশ।

ঘরের মধ্যে দেয়ালের গায়ে লাল রঙের পালিশ আর সোনালী রঙের নকশা। টেবিলের উপরে শামাদানে জ্বলছে আলো আর তার ক্ষীণ সোনালী আভা এসে মদের পাত্রের উপরে পড়ে ঝিকমিক করছে। বাইরে দরজার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে সরাবখানার একজন ওয়েটার। আর পরিচালক মশায় ডানহাতের কড়ে আঙুলে এক টুকরো হীরে-বসানো আঙটি পরে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে এসে মাঝেমাঝে এ-দরজায়

সে-দরজায় থমকে দাঁড়াচ্ছেন আর এক কান বাড়িয়ে মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছেন কি কাণ্ড চলেছে ভিতরে।

ব্যারনেস তাঁর অপেরা গ্লাসের ভিতর দিয়ে অলস দৃষ্টিতে নিচেকার ভিড় দেখছেন। রঙবেরঙের পোশাক-পরা মেয়েদের মধ্যে একই ছাঁদের পুরুষদের দেখে মনে হয় যেন একপাল বড় বড় কালো কালো গুবরে পোকা লেপটে রয়েছে সেখানে। রোবিনস্কায়া তাচ্ছিল্যভরে হলেও বেশ মনোযোগ দিয়েই স্ট্যান্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে দর্শকদের সবাইকে দেখছিলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠছিল শ্রান্তি, অবসাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় সেই রকমের এক পরম পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তি যা যে-কোন দৃশ্যেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। বাঁ হাতের লম্বা সুন্দর নরম আঙ্গুলগুলো তাঁর সিঁদুরের মতো লাল মখমল-মোড়া বক্স-সীটের উপরে অলসভাবে বিছিয়ে পড়ে আছে, আর সে-আঙ্গুলগুলোয় দুর্লভ মনোহর মরকতমণি এমনই হেলাভরে শোভা পাচ্ছে যে দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তেই বুঝি বৃন্তচ্যুত ফলের মতো তা আঙ্গুল থেকে খসে পড়ে যাবে। হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করে দিলেন তিনি; হাসতে হাসতে বললেন—'দেখ, দেখ! কি অদ্ভুত দেখতে, বরং যথার্থ বলতে গেলে, কি অদ্ভুত কারবার! ঐ যে, ওখানে, যে লোকটা বাজাচ্ছে ওই 'সপ্তছিদ্র বাঁশরী মোর'।'

সবাই ফিরে চাইল সেদিকে। বাস্তবিক সে একটা দেখবার মতো কাণ্ডই ছিল বটে! রুমানিয়ান বাজনদারদের পিছনে মোটাসোটা এক গোঁফওয়ালা বুড়ো—হয়ত কোন এক মস্ত বড়ো সংসারের বাপ কি ঠাকুর্দা হবে—বসে প্রাণপণে একসঙ্গে জড়ানো সাত-সাতটা বাঁশি ফুঁ দিয়ে বাজাচ্ছে, কিন্তু যন্ত্রটাকে ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে চোখের নিমেষে ঘোরানো ফেরানো তার পক্ষে শক্ত বলে লোকটা করেছে কি—অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের মাথাটাকেই বোঁ করে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে চলেছে।

'চমৎকার কাণ্ড তো,' বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া—'আচ্ছা, শ্যাপলিনস্কি, তোমার মাথাটা অমনি করে ঘোরাও তো দেখি।'

বোলোদিয়া শ্যাপলিনস্কি গোপনে গোপনে রোবিনস্কায়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন; তাই তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে বেশ আগ্রহভরেই হুকুম তামিল করতে বসে গেলেন, কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই থেমে পড়ে বললেন, 'নাঃ, এ অসম্ভব, হয় বহুকালের অভ্যাস, নয় বংশগত ক্ষমতার দরকার এর জন্যে।'

ব্যারনেস এতক্ষণ অবধি বসে বসে একটা গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মদের পাত্রে জমা করছিলেন; এখন কষ্টে একটা হাই চেপে মুখখানা সামান্য একটু বেঁকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'কিন্তু, হা ভগবান! কি কষ্ট করেই না ওরা আসে আমাদের ক-তে একটু ফুর্তি করতে! ঐ দেখ—হাসি নেই, গান নেই, নাচ নেই। ঠিক যেন একপাল গরু-ছাগলকে জবরদস্তি করে তেড়ে এনে ঢোকানো হয়েছে এখানে।'

আলস্যভরে মদের গেলাস ঠোঁটে তুলে এক চুমুক দিয়ে রিয়াজানোব তাঁর মধুরকণ্ঠে উদাসীন ভাবে বললেন, 'তবে তোমার প্যারিস কি নিস-এ কি এর চেয়ে আমোদ বেশি? কেন, এ কথা মানতেই হবে যে তারুণ্য, হাসি, আনন্দ, সবই চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে গেছে মানুষের জীবন থেকে, ও-সব যে আর কখনও ফিরে আসবে তার সম্ভাবনাও বিশেষ কিছু নেই। আমার তো মনে হয়, আরও অনেকখানি ধৈর্য নিয়ে মানুষকে বিচার করা উচিত। এই যারা আজ সন্ধ্যায় এখানে এসে ঐ বসে আছে তাদের সবার হয়ত এই একটু সময়ের জন্যেই বিশ্রামের অবকাশ মিলেছে—কে জানে?'

'এই শুরু হল ওদের পক্ষ-সমর্থনের বক্তৃতা।' বলে উঠলেন শ্যাপলিনস্কি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে।

চোখের পলকে রোবিনস্কায়া তাঁদের দুজনের দিকে ফিরে চাইলেন, টানা টানা চোখ

দুটি তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। এ ছিল তাঁর ক্রোধের নিশানা, তার সামনে রাজকুমার-দেরও সময় সময় মতিভ্রম ঘটত। যা হোক, চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন তিনি—'তোমরা কি যে সব বলছ আমার মাথায় ঢুকছে না কিছুই। কেন যে এখানে এসেছি আমরা তা-ও বুঝতে পাচ্ছি না আমি। সারা দুনিয়ায় দেখবার মতো জিনিস তো আর খুঁজে পাই না। নিজের কথা বলতে, সেবিল, নাদ্রিদ, আর সাঁ সেবাস্তিয়েন-এ আমি দেখে এসেছি ষাঁড়ের লড়াই—তা দেখে এক ধিক্কার ছাড়া আর কোন ভাবেরই উদয় হয় না অন্তরে। কুস্তি দেখেছি, মুষ্টিযুদ্ধ দেখেছি—কুশ্রী পাশবিকতা সে-সব। তারপর বাঘ-শিকারে যাবারও সুযোগ হয়েছিল আমার, ছিলাম আমি মস্ত বড় একটা শিক্ষিত শ্বেতহস্তীর পিঠের ওপরে হাওদার মধ্যে—এককথায় তোমাদের সবারই তো এ-সব জানা কথা। আমার সেই উদার, বহুবিচিত্র, কলরবমুখর জীবন যা আমি আজ পিছনে ফেলে রেখে এসেছি তা থেকে—'

"আহা, কি-যে সব বলছ, এলেনা ভিক্তোরাবনা!'—সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন শ্যাপলিনস্কি।

'স্তোকবাক্য ছাড় এখন, বোলোদিয়া! আমি জানি যে আমার দেহে যৌবনশ্রী এখনও অটুট রয়েছে; তবুও মাঝেমাঝে মনে হয় যেন একেবারে নব্বই বছরের খুনখুনে বুড়ীটি বনে গেছি—অন্তরাত্মা আমার এমনই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বেঁচে নেই—টিকে আছি শুধু। সারাজীবনে মাত্র তিনটি ঘটনা আমার অন্তরতম অন্তরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। প্রথমটা ঘটেছিল আমার বালিকা-বয়সে। একদিন পরম আতঙ্ক আর চরম ঔৎসুক্য নিয়ে দেখছিলাম, চোরের মতো পা টিপে টিপে একটা বেড়াল শিকার ধরবার জন্যে একটা মদ্দা চড়াই পাখির দিকে এগিয়ে আসছে, আর চড়াইটাও সাবধানে তার গতিবিধির নিশানা রাখছে। আজও ঠিক করে বলতে পারি না কোন্‌টায় আমার মন টেনেছিল বেশি—বেড়ালের শিকার ধরবার কৌশল, না পাখিটার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবার কায়দা। চোখের পলকে উড়ে গিয়ে পাখিটা সামনের গাছের ডালের ওপরে বসে তার কিচিরমিচির ভাষায় বেড়ালটাকে উদ্দেশ করে এমন অকথ্য গালাগাল করতে লাগল যে, তার একটি বর্ণও বুঝতে পারলে লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম আমি। আর বেড়ালটা তখন, যেন তারই ওপরে কত অন্যায় করা হয়েছে এমন ভাবখানা করে, সিধে লেজ উঁচিয়ে এমন ভান করতে লাগল যে, ও আর এমন নতুন কি হয়েছে! আর-একবার এক অপেরাতে একজন নামকরা গায়কের সঙ্গে আমায় ডুয়েট গাইতে হয়েছিল।'

'কার সঙ্গে?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন ব্যারনেস।

'নামে কি এসে যায়? কি করবে নাম দিয়ে? যাক গে, দুজনে মিলে গাইতে গাইতে হঠাৎ আমার সারা অঙ্গ কাঁপিয়ে যেন প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল! দুজনের কণ্ঠস্বর কোন্‌ এক অভাবনীয়ের স্পর্শে কেমন যেন এক অশ্রুতপূর্ব ঐকতানে মিশে এক হয়ে গেল। অবর্ণনীয় সে অনুভূতি। আহা! সারাজীবনে বোধহয় একবারই এমনটি ঘটে থাকে। ভূমিকায় আমার এক জায়গায় কান্নার কথা ছিল, সেদিন সেখানে সত্যি-সত্যিই অকপটে অশ্রু বিসর্জন করেছিলাম আমি। যবনিকা পতনের পর তিনি যখন আমার পাশে এসে তাঁর বিশাল করপল্লব আবেগভরে আমার মাথায় বুলোতে বুলোতে মোহন উজ্জ্বল হাসি হেসে বললেন, 'চমৎকার! এমন গান জীবনে এই প্রথম গাইলাম আজ—.' তখন আমি—আমার মতো এমন মানিনীও তাঁর করপল্লবে চুম্বন এঁকে না দিয়ে থাকতে পারেনি সেদিন। তখনও আমার চোখের কোণে অশ্রুরাশি টলমল করছিল।'

'আর তৃতীয় দফায়?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যারনেস, চোখ দুটো তাঁর ঈর্ষার জ্বালায় ধকধক করে জ্বলে

উদাস কণ্ঠে উত্তর দিলেন গায়িকা, 'তৃতীয় দফা, আহা! সে হচ্ছে যার-পর-নাই

এক সাধারণ ব্যাপার। গত মরসুমের সময় আমি ছিলাম নিস-এ, সেখানে থাকতে একদিন ফ্রেজুজ-এর স্টেজে 'কারমেন'-এর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম—সেসিলে কেওন তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি এখন'—বলেই আন্তরিকতার সঙ্গে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন রোবিনস্কায়া, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'জানি না এ তাঁর সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কিন্তু মহিলাটি আর বেঁচে নেই।'

অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল রোবিনস্কায়ার মনোরম দুটি চোখ, আর গ্রীষ্মের সুখোষ্ণ প্রদোষ-অন্ধকারে আকাশের বুকে সন্ধ্যাতারার মতো তা থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল এক অপরূপ স্নিগ্ধ দীপ্তি। স্টেজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, অবশ পেলব আঙ্গুলে অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে চেপে ধরে রইলেন বক্স-সীটের আড়াল-দেওয়া পর্দাখানি, তারপর আবার যখন তিনি তাঁর বন্ধুদের দিকে মুখ ফেরালেন ততক্ষণে চোখের জল তাঁর শুকিয়ে গেছে—রহস্যমধুর, মদালস, বাসনাঘন ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠেছে সহজ হাসি-হাসি ভাব।

সস্নেহ সৌজন্যভরে জিজ্ঞেস করলেন রিয়াজানোব, 'কিন্তু, এলেনা ভিক্টোরোব্না, তোমার এতখানি সুযশ, তোমার অসংখ্য স্তাবকের দল, জনতার জয়রব—আর শেষ অবধি দর্শকদলকে যে আনন্দ পরিবেশন করে বেড়াও তুমি! এ-ও কি সম্ভব যে তোমারও মনে শান্তি নেই?'

'না, রিয়াজানোব, তা নেই,' ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন গায়িকা—'এর মূল্য যে কতটুকু তা তুমি আমার চাইতে কম জান না। কোথাকার এক কাঠখোট্টা লোক একটা, এসেছে হয়ত বন্ধুবান্ধবদের জন্যে পাশ ভিক্ষে করতে, আর ওরই সঙ্গে সঙ্গে, যদি জুটে যায় এনভেলাপে ভর্তি গোটা-পঁচিশেক রুবল। নয়ত ইস্কুলের ছেলেমেয়ের দল তোমার অটোগ্রাফ-করা ফোটোগ্রাফের জন্যে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে। কোথাকার এক বোকাপাঁঠা জেনারেল এসে আমার গানের মাঝে দম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন তাঁর হেঁড়ে গলায় কপোতকূজন করে, আর সর্বদাই—'ঐ যে উনি, হ্যাঁ, ঐ তো সেই বিখ্যাত গায়িকা'—লেগেই রয়েছে। তারপর রয়েছে বেনামী চিঠির তাড়া, স্টেজের পেছন দিক্‌কার লোকগুলোর ভাঁড়ামি—সব কথা কি বলে শেষ করা যায় নাকি! কেন, তুমিও নিজে সময়ে-সময়ে প্রায়ই পড়ে থাক নিশ্চয় যত সব খ্যাপাটে মেয়েমানুষের পাল্লায়?'

'তা বটে,' নিঃসংশয়ে জবাব দিলেন রিয়াজানোব।

'এ সবের না হয় এখানেই শেষ,' বলে চললেন রোবিনস্কায়া। 'তারপর আবার ধর যা হল সব চেয়ে ভয়ানক কাণ্ড—অভিনয় করতে করতে যখনই সত্যিকারের প্রেরণা এসেছে অমনি রূঢ়ভাবে এ সত্য মনের মধ্যে জেগে উঠেছে যে, লোকের সামনে আমি ভান করে চলেছি, খিঁচোচ্ছি মুখ। তারপর রয়েছে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাফল্য সম্বন্ধে আতঙ্ক—আর সেই চিরন্তন ভয়, এই বুঝি কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেল, এই বুঝি চেঁচিয়ে ফেললাম বেশি, এই বুঝি সর্দি লাগল! বাস্তবিক, বিখ্যাত হওয়ার দায়িত্ব অনেক!'

'কিন্তু শিল্পীর খ্যাতি!' উত্তর দিলেন উকিল মশায়; 'প্রতিভার শক্তি! বাস্তবিক এ হচ্ছে গিয়ে এক অপার্থিব শক্তি—যে-কোন পার্থিব রাজার রাজশক্তির উর্ধ্বে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, বন্ধু! কিন্তু মান-যশ দূর থেকে দেখতেই মিঠে—ততক্ষণই মিঠে যতক্ষণ সে বিষয়ে বসে বসে স্বপ্ন রচনা করছ তুমি। কিন্তু এর নাগাল পেয়েছ কি তা গলার কাঁটা হয়ে আটকেছে। আর তারপর এ-সব যখন তিলে তিলে ক্ষয় পেতে থাকে তখন কি যন্ত্রণাই না সইতে হয় তোমায়! হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমরা এই সব শিল্পীরা যেন সব সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী। ভোরবেলা উঠে ব্যায়াম, দিনের বেলা তালিম; তারপর নাওয়া-খাওয়া সারা হতে-না-হতেই অভিনয়ের জন্যে হাজিরে দিতে যাওয়া। এই যে এখন তুমি আমি মিলে বসে যা করছি এই রকম এক-আধঘণ্টার

পড়াশোনা কি আমোদ-প্রমোদের জন্যে সময় পাওয়াও পরম সৌভাগ্যের কথা। আর তা-ই বা কি—এ সব আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে একেবারে গতানুগতিক ধাঁচের—'

ক্লান্ত অবহেলাভরে বক্সের রেলিঙের উপর থেকে আঙ্গুলগুলো সামান্য একটু নেড়ে মনের ভাব ব্যক্ত করলেন রোবিনস্কায়া।

এতক্ষণ এ-সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন বোলোদিয়া শ্যাপলিন্স্কি, এখন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন তিনি, 'আচ্ছা, বলতে পার, এলেনা ভিক্তোরাব্না, তোমার এই সব কল্পনা আর এই অবসাদ থেকে মন সরিয়ে নেবার জন্যে কি করতে চাও তুমি?'

প্রহেলিকাময় চোখদুটি তুলে তাঁর দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে, বুঝি একটু সলজ্জ ভাবেই জবাব দিলেন রোবিনস্কায়া—'আগেকার দিনে লোকের কোন কুসংস্কার ছিল না, এখনকার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দে দিন কাটাত তারা। তখনকার দিনে হলে আমিও সমাজে আমার সত্যিকারের স্থানটি বেছে নিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারতাম। হায় রে, প্রাচীন রোম!'

এক রিয়াজানোব বাদে কেউই এ-কথার তাৎপর্য ধরতে পারলেন না। তাঁর মধুর কণ্ঠে অভিনয়ের ভঙ্গিতে একটি পুরাতন অথচ বহুপ্রচলিত লাতিন উক্তি উদ্ধার করে বলে উঠলেন তিনি—'বিফল যৌবন তব, হে মহাসম্রাট!'

'ঠিক বলেছ!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া—'সুচতুর ছেলে তুমি, রিয়াজানোব, তাই তো তোমায় এত পছন্দ আমার। মনের কথাটি চট করে ধরতে পার তুমি—যদিও মানতেই হবে এ-কথা, যে খুব উঁচুদরের মানসিক গুণ নয় এ। আর সত্যিই, দুটি প্রাণের মিলন হল, সদ্য গতদিবসের পরিচয়, আহার-বিহার করেছে তারা একসঙ্গে ব'সে, বলেছে মনের কথা, তারপর আজই হতে হবে তাদের একজনকে শেষ। বুঝতে পারছ—শেষ, চিরদিনের জন্যে জীবনের কাছ থেকে বিদায়—মৃত্যু। রইল না তাদের মধ্যে কোন দ্বেষ, কোন আশঙ্কা। এর চেয়ে বাস্তব, এর চেয়ে সমৃদ্ধ কোন দৃশ্য কল্পনায় আসে না আমার।'

'কি পাষাণ প্রাণ!' চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বলে উঠলেন ব্যারনেস।

'তা, এখন কি-ই বা আর করা যাবে! আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন বীরব্রতী দস্যু। যাক গে, এখন ওঠা যাক তবে।'

সবাই বাগানের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বোলোদিয়া শ্যাপলিন্স্কি তাঁর মোটরগাড়ি আনতে বলে পাঠালেন। এলেনা ভিক্তোরাব্না তাঁরই বাহুসংলগ্ন হয়েছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আচ্ছা, বল দেখি, বোলোদিয়া, ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে যখন তুমি থাক না, তখন তুমি যাও কোথায়?'

আমতা আমতা করতে লাগলেন বোলোদিয়া। তবে জানতেনও তিনি যে রোবিনস্কায়ার সামনে মিছে কথা বলার ক্ষমতা নেই তাঁর।

'মানে, সে তোমার পছন্দ হবে না শুনলে। এই ধর জিগানিতে—নৈশ প্রমোদাগারে—'

'আর কোথাও? আরও খারাপ কোন জায়গায়?'

'বাস্তবিক, ভারি মুশকিলেই ফেললে দেখতে পাচ্ছি। যেদিন থেকে তোমার প্রেমে পাগল হয়েছি—'

'ভাবের কথা রাখ এখন।'

'আহা, বলিই বা কি ক'রে?' লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি, সারা দেহ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। অতিকষ্টে শেষে বলেই ফেললেন—'তা, হ্যাঁ, মেয়েমানুষের কাছে তো বটেই। তবে, হ্যাঁ, এ-সব আমার নিজের গরজেই—'

দুষ্টুমি করে শ্যাপলিনস্কির কনুইয়ের উপরে একটা চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রোবিনস্কায়া—'বেশ্যাবাড়ি ?'

কোন জবাব দিলেন না বোলোদিয়া। রোবিনস্কায়া বলে উঠলেন—'তবে এখনই তোমার মোটরগাড়িতে করে আমাদের নিয়ে চল সেখানে, সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে চল। ব্যাপারটা একেবারে আমার অজানা। কিন্তু মনে থাকে যেন তোমারই ভরসায় যাচ্ছি সেখানে।'

আর দুজন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন বলে মনে হল; কেননা এলেনা ভিক্তোরভ্নাকে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। তাঁর প্রাণ যখনই যা চাইত তাই তিনি না করে ছাড়তেন না। তা ছাড়া তাঁদের সকলেই শুনেছিলেন আর বাস্তবিক জানতেনও বই কি যে, পিতার্সবার্গে মদের নেশার ঝোঁকে ভদ্রঘরের মেয়েরা, এমন কি বালিকারাও, শৌখিন বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে, এর চেয়েও ঢের ঢের জঘন্য রকমের খেয়াল চরিতার্থ করে থাকে।

৭

'দেখ,' বোলোদিয়াকে বললেন রোবিনস্কায়া ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে—'প্রথমে নিয়ে যাবে সেরা জায়গায়, তারপর মাঝারি গোছের একটাতে, শেষে সব চেয়ে জঘন্য স্থানে।'

'দেখ, এলেনা,' জবাব দিলেন শ্যাপলিনস্কি—'তোমার জন্যে সবই করতে পারি। হুকুমে প্রাণও দিতে পারি আমি।—কিন্তু এ-সব জায়গায় তোমায় নিয়ে যেতে সাহস পাই না। ভয় হয় পাছে কেউ তোমায় অপমান করে বসে—'

'হা ভগবান!' অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া—'লন্ডনে যখন জলসা চলছিল আমার, কত লোক যে তখন প্রেম নিবেদন করতে আসত আমায়; তখন কিন্তু বাছা বাছা সঙ্গীদের নিয়ে হোয়াইট শ্যাপেলের জঘন্যতম ডেরাডান্ডায় ঘুরে বেড়াতে দ্বিধা করিনি আমি। আমায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন দুজন লর্ড; কিছুতেই তাঁরা তাঁদের সামনে একজন নারীর অপমান সইতেন না। কিন্তু তুমি, বোলোদিয়া, তুমি বুঝি কাপুরুষদের দলের!'

দপ করে জ্বলে উঠলেন শ্যাপলিনস্কি—'আহা, না, তা নয়, এলেনা ভিক্তোরভ্না। তোমায় আমি আগে থেকেই সাবধান করতে চেয়েছি, সে শুধু তোমায় ভালোবাসি ব'লে। নইলে যেখানেই যেতে চাও তুমি, সেখানেই নিয়ে যেতে প্রস্তুত আমি—একেবারে মরণের মুখে পর্যন্ত।'

ইতিমধ্যে তাঁরা ইয়ামকার সেরা গণিকালয়ের সম্মুখে—ত্রেপেলে—এসে পৌঁছুলেন। আইনজীবী রিয়াজানোব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'এই যে, চিড়িয়াখানা পরিদর্শন শুরু হল দেখছি।'

তাঁদের নিয়ে গিয়ে একটা লাল রঙের কুঠরিতে বসানো হল; দেয়ালের গায়ে 'এম্পায়ার' স্টাইলে লরেল-স্তবক আঁকা—সোনালী নকশায়।

বল্টিক অঞ্চলের চারজন জার্মান মেয়ে এগিয়ে এল। তাদের প্রত্যেকেরই বেশ নিটোল গড়ন, পীনোন্নত পয়োধর, গৌরবর্ণ, পাউডার-ঘষা মুখ, ভারিক্কি চাল, আর সসম্ভ্রম ব্যবহার। আলাপ-পরিচয়ে সুর ধরতে চায় না প্রথমটায়। মেয়েরা ক-জন তো পাথরের মূর্তির মতো অচল হয়ে বসে রইল, যেন প্রাণপণে প্রমাণ করতে চায় যে তারা সব হচ্ছে অভিজাত ভদ্রমহিলা। শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলেন রিয়াজানোব, তাতেও ভাবান্তর ঘটল না তাদের। রোবিনস্কায়াই তখন এগিয়ে এলেন তাদের উদ্ধার করতে। তাদের মধ্যে যে ছিল সব চেয়ে মোটাসোটা, দেখতে একেবারে যেন আস্ত একখানা পাঁউরুটি, তার দিকে চেয়ে সৌজন্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তিনি—'বল তো দেখি, তোমার দেশ কোথায়? খুব সম্ভব জার্মানীতে—নয়?'

'আজ্ঞে না, মাদাম, রিগাতে।'

'তবে এখানে কাজে এসে ঢ্বকলে কি ক'রে? দারিদ্র্যের জন্যে নয় বোধ হয়?'

'না, মাদাম, সেজন্যে নয় মোটেই। হান্স্, আমার হব্ব-বর, একটা রেস্তরাঁয় রস্বইয়ের কাজ করে, এখন আমাদের আর্থিক অবস্থা ঠিক বিয়ে করার মতো সচ্ছল নয়। তাই খরচ-খরচা থেকে আমি যা বাঁচাতে পারি তা এক ব্যাঙ্কে জমা রাখছি, সে-ও তাই করছে। এভাবে দশহাজার র্বল জমা হলে আমরা বীয়ার-হল খ্বলব, আর ভগবানের আশীর্বাদে তখন আমাদের ছেলেপিলের ম্বখ দেখবার সৌভাগ্য হবে; দ্বটি মাত্র সন্তান—একটি ছেলে, একটি মেয়ে।'

'শোন, বাছা!' অবাক হয়ে বললেন রোবিনস্কায়া—'তুমি তর্ণী, স্বন্দরী, দ্ব-দ্বটো ভাষা শিখেছ—'

'আজ্ঞে, তিনটে ভাষা মাদাম,' বেশ একট্ব গর্বভরেই বলে উঠল জার্মান মেয়েটি; 'লাতিনও জানি আমি। আমি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পড়া শেষ করে হাইস্কুলের তিন ক্লাস অবধি পড়েছি।'

শ্বনে বেশ একট্ব গরম হয়ে উঠলেন রোবিনস্কায়া। বললেন—'হ্যাঁ, তা হলেই দেখছ যে, এ-রকম শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে তুমি খাওয়াপরা বাদে ত্রিশ র্বল মাইনেতে ইচ্ছে করলেই কাজ পেতে পার, যেমন ধর ঘর-সংসার দেখবার কাজ, কার্বর সঙ্গিনীর কাজ, কিংবা কোন একটা ভালো স্টলে সিনিয়র কেরানী কি ক্যাশিয়ারের চাকরি—আর তোমার হব্ব-বর—ফ্রিৎজ্—'

'হান্স্, মাদাম'

'হান্স্, সে যদি পরিশ্রমী আর হিসেবি হত তবে এই বছর তিন কি চারের মধ্যে তোমাদের পক্ষে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো একট্বও কঠিন হত না। কি বল?'

'কিন্তু, মাদাম, একট্ব ভুল করছেন আপনি। আপনার খেয়াল নেই যে, এ সবগ্বলোর মধ্যে সব চেয়ে সেরা একটা কাজ পেলেও, আমি কষ্টেস্বষ্টে না-খেয়ে না-দেয়ে বড়জোর পনের কি কুড়ি র্বল জমাতে পারি মাসে মাসে। কিন্তু এখানে একট্ব সমঝে চললেই শ-খানেক র্বল হাতে থেকে যায় আমার, আর তখনি আমি খাতাপত্রস্বদ্ধ ব্যাঙ্কে গিয়ে তা জমা দিয়ে আসি। তা ছাড়া আর-একটা কথাও ভেবে দেখ্বন মাদাম, কার্বর বাড়িতে ঝি-গিরি করা কি লজ্জার কাজ! অষ্টপ্রহর মনিবদের সবার মন য্বগিয়ে চলতে হবে। আর মনিব তো দিনরাত যত রকমের ন্যাকাপনা করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবেন, ছিঃ! ইদিকে তো আবার গিন্নী-ঠাকর্বণের ম্বখভার, ম্বখনাড়া, আর গালাগাল। উঃ!'

'নাঃ,—ঠিক ব্বঝতে পারলাম না,' মেঝেতে দ্বষ্টি নিবদ্ধ করে চিন্তিত স্বরে টেনে টেনে বলতে লাগলেন রোবিনস্কায়া—'তোমাদের এখানকার—এই কি বলব, এ-সব জায়গায় মেয়েদের জীবনযাত্রার কথা শ্বনেছি আমি ঢের। লোকে বলে সে বড় ভয়ানক। শ্বনতে পাই অতি কদর্য,—ব্বড়োহাবড়া, কুৎসিত লোকদেরও মনোরঞ্জন করতে বাধ্য করা হয় তোমাদের, আর অত্যন্ত নিষ্ঠ্বর ভাবে তোমাদের পয়সাকড়ি সব ট্বইয়ে নেওয়া হয়ে থাকে—।'

'না মাদাম, কখ্খনো সে-সব করা হয় না—আমাদের প্রত্যেকেরই একখানা করে হিসেবের খাতা রয়েছে, তাতে খ্বটিনাটি সব জমাখরচের হিসেব লেখা থাকে। গত মাসে আমি পাঁচশ-র কিছ্ব বেশি আয় করেছি। নিয়মমতো দ্বই-তৃতীয়াংশ খাওয়া-থাকা-পরা বাবদ বাড়িউলী ঠাকর্বণকে দিতে হয়, তারপর তো দেড় শ থাকে, কি বলেন? তাই থেকে পঞ্চাশ র্বল পোশাক আর হাতখরচা, বাকি রইল এক-শ—ঐটেই আমি বাঁচাই। একে কি ট্বইয়ে নেওয়া বলে, মাদাম? যদিই বা আমি কাউকে অপছন্দ করি—সত্যিই এ রকম কুৎসিত কেউ কেউ আসে—বললেই পারি যে আমি অস্বস্থ, তাহলেই আমার বদলে যাবে আন্‌কোরা মেয়েদের মধ্যে থেকে কেউ।'

'কিন্তু তারপর—কিছু মনে করো না—তোমার নামটি তো জানি না।'

'এল্‌জা।'

'লোকে যে বলে তোমাদের ওপর খুব জোরজবরদস্তি হয়ে থাকে—প্রহারও চলে নাকি সময়ে সময়ে—তোমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও নাকি অনেক ঘেন্নার কাজ করিয়ে নেওয়া হয়—সত্যি?'

'কখ্‌খনও নয়, মাদাম।' একটু যেন রাগতভাবেই উত্তর দিল এল্‌জা—'এখানে সবাই এক পরিবারের লোকের মতোই আছি; সবাই আমরা এক দেশের লোক, নয়ত আত্মীয়কুটুম, ভগবান করুন আমাদের মতো আরও দশটা পরিবার এইরকম মিলে-মিশেই থাকুক। সত্যি বটে, এই ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটে অনেক ঢলাঢলি, মারামারি, কেলেঙ্কারি হয়, কিন্তু সে-সব হল ঐ সব এক রুবলের বাসাতে। রুশ মেয়েরা পিপে পিপে মদ গেলে, আর তাদের প্রত্যেকেরই একটি-না-একটি নাগর থাকে, নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেও জানে না তারা।'

'বিচক্ষণ মেয়ে তুমি, এল্‌জা!' ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া, 'তা সবই তো যেন ভালো। কিন্তু দৈবাৎ যদি ব্যামো হয়? ছোঁয়াচে রোগ? তবেই তো মরণ—নয়? বুঝবে কি ক'রে?'

'আবার সেই একই উত্তর আমার—'না মাদাম।' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ না করে কাউকে আমি আমার বিছানা মাড়াতে দিই না—এভাবে অন্তত এক-শর মধ্যে পঁচাত্তরটির বেলায় আমি ব্যামো-ফ্যামোর বালাই থেকে নিশ্চিন্দি।'

'চুলোয় যাক!'—হঠাৎ খেপে উঠে টেবিলে এক ঠোক্কর মেরে বসলেন রোবিনস্কায়া—'কিন্তু তারপর, তোমার আলবার্টের দশা কি হবে...'

'হান্‌স,' এল্‌জা ভয়ে ভয়ে শুধরে দিল তাঁকে।

'ও হ্যাঁ, ভুল হয়েছে—তোমার হান্‌স নিশ্চয়ই একথা ভেবে পুলকিত হয়ে ওঠে না যে, তুমি রয়েছ এখানে আর প্রতিরাতেই চলেছ তার বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে?'

এল্‌জা বাস্তবিকই চকিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর শান্ত করুণকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু মাদাম, আজও তো তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইনি আমি। সে হল ঐ-সব নষ্ট মাগীরা, বিশেষ করে ঐ-সব রুশ মাগীরা যাদের একটি করে ভাবের মানুষ থাকবেই থাকবে, আর তাদের জন্য এই রক্ত-জল-করা পয়সা তারা জলের মতো খরচ করবেই করবে। কিন্তু আমি অত নিচে নামব, ছোঃ!'

'উঃ, এর চেয়ে নিদারুণ অধঃপতনের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না!'—ঘৃণাভরে চেঁচিয়ে উঠলেন রোবিনস্কায়া, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'উঠুন, মশাইরা, এদের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়া যাক এখান থেকে।'

রাস্তায় এসে বোলোদিয়া বললেন—'দোহাই ভগবান! একটিতেই কি সাধ মেটেনি তোমার?'

'কি-ইতরমো! উঃ, কি ইতরমো!'

'তাই তো বলি কাজ নেই আর আমাদের এ রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে।'

'না, দেখতে হবে কোথায় এর শেষ।'

দশ পা দূরেই ছিল আনা মারকোব্‌নার আস্তানা।

কিন্তু এখানেই ছিল তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে চরম বিস্ময়। সাইমন তো তাঁদের ঢুকতেই দিতে চায় না, শেষে রিয়াজানোবের হাত থেকে গোটা কয়েক মোহর খসে এসে তার হতে পড়তে তবু একটু নরম হল সে। সবাই গিয়ে বসলেন একটা কুঠরিতে—ত্রেপেলের ঘরখানার মতোই প্রায় দেখতে। এমা এডোয়ার্ডোবনার হুকুমে মেয়েদের সব গাদাগাদি করে এনে ঢোকানো হল সেখানে। কিন্তু ফল হল ঠিক শাকসবজির বাগানে এক পাল ছাগল এনে ছেড়ে দিলে যেমনটি হয়ে থাকে প্রায় তেমনটি। সব চেয়ে মারাত্মক

ভুল হল জেন্‌কাকে এনে ঢোকানো—বদরাগী, খিটখিটে জেন্‌কা, উদ্ধত চোখদুটো থেকে তার ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুনের হল্‌কা। সবার শেষে এল তামারা—শান্ত, নম্র, ঠোঁটের কোণে মোনালিসার মতো সেই সলজ্জ, চটুল বক্রহাসি। শেষ অবধি ডেরার প্রায় সকলেই এসে জুটল ঘরের মধ্যে। রোবিনস্কায়া আর হিতে বিপরীতের ভয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন না—'এপথে পা বাড়ালে কেন?' অন্তঃপুরিকারাও তাঁকে মৌখিক ভদ্রতা দেখিয়ে অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করল না। এলেনা ভিক্তোরাব্‌না তাদের বললেন গান গাইতে, বিনা আপত্তিতে গান ধরল তারা—'সেই তো আবার এল রে সোমবার...'

তারপর আরও একখানাঃ

হায় পোড়া কপাল, কপাল আমার রে!
ভাঁটিখানা বন্ধডানা,
আমার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল যে!

ফের আবারঃ

ভুঁইফোঁড় সে ভবঘুরের
প্রাণের ভালোবাসা
যেমনি মিঠে তেমনি কড়া,
—খাসা, আহা, খাসা!
বেশ্যেমাগীর মড়াকান্না,
নেইকো চোখে জল,
সেরা চীজ সে এ-সংসারে,
নয় তবুও ছল।
হাঃ, হাঃ, হাঃ!
ঘরকন্না বাঁধল দুজন,
—কোথায় মেলে জুড়ি?
বরটি হলেন সিঁধেল চোর,
কনে বেশ্যে ছুঁড়ী!
হাঃ, হাঃ, হাঃ, !
রাত পেরুলো তে-পওর, ভাই,
—সিঁধ দিতে যায় বর,
ঠমকে হেসে গড়িয়ে পলো
কনে বিছানার 'পর!
হাঃ, হাঃ, হাঃ, !
ভোরটি হলে কয়েদখানায়
আটক হলেন ভায়া,
মাগী তখন নাগর-দোলায়,
—নেই কো হায়াকায়া!
হাঃ, হাঃ, হাঃ, !

তারপর কয়েদীদের একটা গানঃ

টানাপোড়েন সারাজীবন—
লাগল গলায় ফাঁস,
বছর ঘুরে বছর এল,
উঠল নাভিশ্বাস!

তারপর ফের ঃ

মাইরি! আমার মেরী,
এমন কি আর দেরি?
কাঁদিস কেন, ভাই?
লড়াই যখন হবে ফতে,
করব বিয়ে বিধানমতে,
চুমকুড়ি দে, এখন আমি
বিদেয় হয়ে যাই!

কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ গোমড়ামুখী মুটকী কিটি হো-হো করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল একেবারে। বাড়ি ছিল তার ওডেসায়।

'আমিও একটা গান গাই—কেমন? আমাদের মোল্দাবাঙ্কা আর পেরেজীপ্-এ চোরছ্যাঁচড় আর তাড়িখানার মাগীদের মধ্যে গানখানার খুব চল্তি।'—বলেই কিটি তার ভীষণ মোটা মরচে-ধরা বেসুরো গলায় গান জুড়ে দিল হাত-পা নেড়ে। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছিল, আগে কোথাও দেখা কোন-এক ক্যাবারে-গায়িকাকে নকল করে চলেছে সে ঃ

আয়, চল যাই দুকোব্কা—
বসব পিঁড়ে পেতে,
ঘেরাটোপটা ছুঁড়ে ফেলে,
বসে যাব খেতে।
'কি খাবে গো, মাইরি যাদু?'
শুধাই সাঙাৎনীরে—
'গা বমি আর মাথাধরা,'
বলে মাগী ফিরে।
'ব্যামোর কথা রাখ না, মাগী,
কি খাবি তা বল্—
ধেনো মদ, কি পচা তাড়ি,
নে চটপট, সাতভাতারী,
নয় কি শুধু খাবি খাবি—
খোল্সা কর বল।'

চলছে বেশ—চলতও বেশ শেষ অবধি। এমন সময় কোত্থেকে ফর্সা মান্কা ঝড়ের মতো ছুটে এসে ঘরে ঢুকল,—পরনে তার খালি একটা সেমিজ, সাদা লেশ দিয়ে বোনা কোমরবন্ধ দুধারে লটপট করছে। গতরাত থেকে কে একজন ব্যবসাদার এসে এখনও অবধি ওকে নিয়ে মদের স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিল, আর ও-জিনিসটি পেটে পড়লে মান্কার যা হয়ে থাকে এখনও হয়েছিল ঠিক তাই—সে মান্কাই আর নেই, একেবারে মারমুখী হয়ে উঠেছে সে। এক ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে সটাং একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ে হি হি করে প্রাণখোলা হাসি হাসতে লেগে গেল মান্কা। তার রকম-সকম দেখে আর সবাইও হাসতে লেগেছে, এমন সময় হঠাৎ হেই করে মেঝের ওপর সিধে উঠে বসে একেবারে চিল-চেঁচাতে শুরু করে দিল সে—'বাহবা রে বাহবা! দ্যাখ্ সে এসে, নতুন নতুন বেউশ্যে মাগীরা এসে ভিড়ছে, আমাদের দলে,—।'

অবাক কাণ্ড! তায় আবার ব্যারনেস একটুখানি বোকামিও করে বসলেন। বললেন—'আমি হচ্ছি এক পতিতা-উদ্ধার আশ্রমের উৎসাহী কর্মী; তোমাদের মতো মেয়েদের খবরাখবর করা হল আমার একটা কাজ।'

যেই না বলা, আর যাবে কোথায়! দপ্ করে জ্বলে উঠল জেন্‌কা—'সিধে বেরিয়ে যাও, বুড়ী গাধী! ছেঁড়া ন্যাতা! খ্যাংরামুখী কোথাকার—তোমাদের ম্যাগ্‌দালেন আশ্রম—সে তো কয়েদখানারও অধম। তোমাদের কর্মীরা সব কেচ্ছা করেন আমাদের নিয়ে। তোমাদের বাপ-ভাইয়েরা, তোমাদের সোয়ামীরা সব, আমাদের নিয়ে থাকে, আর দিই আমরা চালান করে যত রকমের ব্যামো তাদের শরীরে—ইচ্ছে করেই দিই। সে-সব বিষ তারা আবার ছড়ায় তোমাদের মধ্যে। তোমাদের মেয়ে-কর্মীরা থাকেন সব গাড়োয়ান, পুলিস, দরোয়ানদের সঙ্গে। আর নিজেদের মধ্যে যদি আমরা একটু হাসিঠাট্টা করেছি তো আর রক্ষে নেই—অমনি চোরকুঠরিতে আটকে ফেলে রাখবে আমাদের। হ্যাঁ, আর মনে থাকে যেন এখানে তামাশা দেখতে এলে শুনে যেতে হবে মুখের ওপর এই রকম সব সাঁচ্চা সাঁচ্চা বুলি।'

'জেনী, থাম তুই! আমিই বলছি ওদের।'—তামারা শান্তভাবে থামিয়ে দিল তাকে, তারপর বলতে লাগল, 'ব্যারনেস, সত্যিই কি আপনারা তথাকথিত ভদ্রমহিলাদের চেয়ে হীন মনে করেন আমাদের? আমার কাছে হয়ত এল একটি লোক, একবারের জন্যে দিল সে আমায় দু-রুবল, কি, সারারাতের জন্যে ধরুন পাঁচ। এ-সংসারে কারও কাছেই ব্যাপারটা গোপন করে চলি না আমি।—কিন্তু আপনিই বলুন, ব্যারনেস, এমন কোন পতিপুত্রবতী বিবাহিতা মহিলার কথা আপনার জানা আছে কি, যিনি ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে কখনও কোন তরুণ পরপুরুষকে, কিংবা নিছক অর্থের লোভে কোন বয়স্ক ভদ্রলোকের কাছে, দেহদান করেননি? বেশ ভালো করেই জানা আছে আমার যে, আপনাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনকে পোষে তাদের গোপন নাগররা, আর বাকি পঞ্চাশ জন, যাদের এখন বয়স হয়ে গেছে, তারা নিজেরাই পোষে ছেলে-ছোকরাদের। তা ছাড়া এ-ও জানি আমি—আহা, আপনাদের মধ্যে কত মেয়েই না থাকে তাদের বাপ, ভাই, এমন কি পেটের সন্তানটির সঙ্গে পর্যন্ত! কিন্তু এ-সব গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখেন আপনারা। এই হল আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাত—বুঝলেন? আমরা পতিতা কিন্তু মিছে কথা বলতে জানি না; আপনারাও পতিতা, কিন্তু তার ওপর হলেন গিয়ে মিথ্যেবাদী। ভেবে দেখুন এখন, তফাতটা কোথায়?'

'বাহবা, বাহবা, তামারোচকা! উচিত শিক্ষা দিয়েছিস ভাই, ওদের!' চেঁচিয়ে উঠল মান্‌কা। তখনও বসেই ছিল সে মেঝের উপরে; মাথার লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো চুলের রাশ আলুথালু হয়ে পড়েছে,—দেখে মনে হয় বুঝি কোন্ তের বছরের এক কিশোরী।

'তারপর, তারপর?' জেন্‌কা উসকে চলল তামারাকে,—চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে তখনও।

'ভয় কি, জেনেচ্‌কা? আরও আছে, বলছি!' উত্তর দিল তামারা; তারপর শুরু করল ফের, 'আমাদের মধ্যে ক্বচিৎ কখনও—তা হাজারে একটির বেশি হবে না—কেউ হয়ত ভ্রূণহত্যা করে থাকে। আর আপনাদের সবাই সে-কাজ করেছেন—একবার নয়, বহুবার। কি? সত্যি নয়? আর আপনাদের মধ্যে যাঁরাই এ কাজ করেছেন তাঁদের কেউই হতাশা কি নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বাধ্য হয়ে এমন কাজ করেননি, করেছেন শুধু দেহসৌষ্ঠব বজায় রাখবার অভিপ্রায়ে, পাছে সৌন্দর্যের হানি হয় সেই ভয়ে। আপনারা চান শুধু পাশবিক ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হয়ে থাকতে, অন্তঃসত্ত্বা হলে তাতে ব্যাঘাত ঘটে।'

অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলেন রোবিনস্কায়া; দ্রুত ফিস ফিস করে ফরাসী ভাষায় বললেন, 'দেখুন ব্যারনেস, মেয়েটিকে বেশ শিক্ষিতাই বলা চলতে পারে এদের মধ্যে—নয়?'

ব্যারনেসও ফরাসীতেই জবাব দিলেন, 'দেখুন, মেয়েটির মুখখানা আমার যেন চেনা

চেনা বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু দেখবই বা কোথায় একে—স্বপ্নে? ভাবের ঘোরে? না, এর শৈশবে?'

'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি।'—তাঁদের কথাবার্তায় বাধা দিয়ে একটু যেন অসহিষ্ণু হয়েই বলে উঠল তামারা ফরাসীতে, 'খারকোবের কথা মনে পড়ে কি—সেই যে কোনিয়াকিন্-এর হোটেলের একটা ঘর, থিয়েটারের ম্যানেজার সোলোভিৎস্‌শীক, আর সেই একজন টেনর-গাইয়ে ভদ্রলোক?—তখনও আপনি 'ব্যারনেস দ্য অম্নুকতুসনুক হননি—। যাক গে, ফরাসী এখন থাক, ঘরোয়া বনুলিই চলনুক। আপনি তখন ছিলেন সখীদলের একজন, গাইতেন আমার সঙ্গে।'

ব্যারনেস কিন্তু ফরাসী ছাড়লেন না, জিজ্ঞেস করলেন, 'দোহাই ভগবানের! বল আমায়, এখানে তুমি এলে কি ক'রে, মাদমোয়াজেল মার্গারেত?'

'আহা, সব্বাই একথা প্রত্যেক দিনই তো আমাদের জিজ্ঞেস করছে।' রাশিয়ানেই জবাব দিল তামারা—'কেন, এমনি ইচ্ছে হল তাই এখানে এলাম—।' তারপর এক অননুকরণীয় শ্লেষের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে বসল সে, 'আশা করি আপনাদের সঙ্গে এই যে এতক্ষণ কাটালাম তার ন্যায্য মূল্য দেবেন আপনারা?'

'না, গোল্লায় যাও সব!' কম্বলের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল ছোট্ট ফর্সা মান্‌কা; তারপর পায়ের মোজার ভেতর থেকে দুটো মোহর বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'ঐ যে নাও!—আমিই দিলাম তোমাদের গাড়িভাড়া। সিধে পথ দেখ এখন এখান থেকে, নইলে এখানকার সমস্ত আয়না বোতল সব ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলব আমি।'

'হ্যাঁ, যাব বই কি!'—সজল চোখে উঠে দাঁড়ালেন রোবিনস্কায়া; দরদভরে বলতে লাগলেন তিনি, 'তবে মাদমোয়াজেল মার্গারেত-এর শিক্ষা মনে থাকবে আমাদের। আর হ্যাঁ, তোমাদের সময় নষ্ট করার জন্যে ক্ষতিপূরণও করা হবে—সেদিকে খেয়াল রেখ, বোলোদিয়া। কিন্তু সে-কথা এখন থাক, আমাদের জন্যে এতক্ষণ ধরে গান গাইলে তোমরা, আমায়ও দাও তবে তোমাদের একটা গান শোনাতে।'

রোবিনস্কায়া উঠে পিয়ানোয় গিয়ে বসলেন, টুং টাং করে দু-চারটে ঘা দিলেন, তারপর হঠাৎ দারগোমাইঝ্‌স্কির সেই অপরূপ গাথা তানে-লয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ঘর ছেয়ে ফেলল:

হায় নীরব অভিমানের বোঝা বহি
যবে বিদায় হনু দোঁহে,
কণ্ঠে নাহি সরিল হায় বাণী,
রুধিল শ্বাস মোহে।
শুধু রাখিয়া গেনু ঈর্ষাকাতর দাহ
তোমার তরে প্রিয়,
ভুলিব বলি বাহির হ'নু ছুটি'—
আজিকে তবু করুণ ক্ষমা দিয়ো।
আজিকে হায় আকস্মিকের টানে
মিলন যদি ঘটে,
পুন অরুণ-লিখা উঠিবে না কি ঝলি'
বিস্মরণীর পটে?
আজি অশ্রু নাহি, নাহিক অভিযোগ,
নাহিক লাজ ভয়,
ভাগ্যবেদীর তলে নোয়াই মাথা—

মানিনু প্রিয় পরম পরাজয়!
শতেক দোষে দোষী চরণতলে
অভাগীরে বেসেছ কি ভালো?
জানিনি কভু, মানিনি কভু,
জানিতে তবু চাহিনি প্রভু,
মিনতি শুধু চোখের জলে,
এ মরু ধু ধু হৃদয়-তলে,
আঁধার অমানিশার কোলে
প্রদীপখানি জবালো।
হায়, ক্ষণিকের দেখা সে যে
দৈববেদীর ফুল,
আকস্মিকের পটে উজল লিখা—
মরণ সমতুল।

এই সকরুণ আবেগবিধুর গাথাসঙ্গীত সুবিখ্যাত একজন গায়িকার কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠে তাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে আলোড়িত করে তুলল প্রথম প্রণয়ের স্মৃতি—সেই প্রথম পদস্খলনের কাহিনী, বাসন্তী ঊষায় সেই যে সেদিনকার সেই বিলম্বিত বিদায় গ্রহণ—প্রভাতী শিশিরে দূর্বাদল তখনও রয়েছে শুভ্র, বার্চ-গাছের শাখায় শাখায় গোলাপী আভা মাখিয়ে দিয়েছে আকাশের অরুণিমা, তখন এসে সূঁচের মতো গায়ে বিঁধছে প্রভাতের শীত; শেষ আলিঙ্গন-পাশ তখনও রয়েছে অঙ্গে অঙ্গে লতার মতো জড়িয়ে, আর তারই মধ্যে মৃদু সকরুণ গুঞ্জনে কেবলই বলে চলেছে সত্যসন্ধ হৃদয়,—'না গো না, এ আর ফিরে আসবে না গো!'

স্তব্ধ হয়ে রইল তামারা; স্তব্ধ হয়ে রইল দুর্মুখী মান্কা; আর সব চেয়ে যে ছিল দুর্দান্ত সেই জেন্কা হঠাৎ ছুটে এসে গায়িকার সামনে নতজানু হয়ে বসে তাঁর পায়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল কেঁদে।

সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন রোবিনস্কায়া, 'এস বোন, তোমায় চুমু দিই!'

জেন্কা ফিসফিস করে কি বলল তাঁর কানে কানে।

'তাতে কি?' উত্তর দিলেন রোবিনস্কায়া—'ও কিছু নয়। কয়েকমাস চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।'

'না, না, না, ওদের সবাইকে দেব এ-ব্যামো। পচে গলে কাতরাতে থাকুক ওরা সবাই।'

'ছিঃ, বোন! তোমার মতো হলে আমি কিন্তু তা করতাম না,' বললেন রোবিনস্কায়া।

'তবে কেন ওরা এমন অত্যাচার করল আমার ওপরে? কেন করল এ অন্যায়? কেন? কেন?'—বলতে বলতে জেন্কা, আমাদের সেই গরবিনী জেনী, পাগলের মতো বারবার গায়িকার হাতে পায়ে চুমু খেতে লাগল।

প্রতিভার এমনই ক্ষমতা বটে!

এই হল একমাত্র শক্তি যা হীন বিচারবুদ্ধিকে নয়, মানুষের রাগদীপ্ত অন্তরাত্মাকে বশ করে টেনে নিতে জানে নিজের বিভূতি দিয়ে। রোবিনস্কায়ার বসনপ্রান্তে মুখ লুকোল গরবিনী জেনী; রুমালে মুখ ঢেকে নিরীহের মতো চেয়ারে বসে রইল ছোট মান্কা; হাঁটুর উপরে কনুই রেখে কপালে হাত দিয়ে একদৃষ্টিতে নিচের দিকে চেয়ে রইল তামারা, আর এদিকে যদি কোন অঘটন ঘটে থাকে তার খবরদারি করতে এসে এ-সব দেখে-শুনে হতবুদ্ধি হয়ে দোড়গোড়ায় থমকে থ হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল সাইমন।

স্থির শান্তকণ্ঠে জেন্‌কার কানে কানে বলছিলেন রোবিনস্কায়া—'হাল ছেড়ে দিয়ো না। এক-এক সময় চারদিকে এমন অন্ধকার হয়ে আসে যে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে থাক, দেখতে পাবে হঠাৎ কি করে মেঘ কেটে গেছে! এই যে দেখছ, বাছা, আজ পৃথিবীময় আমার খ্যাতি, কিন্তু যদি জানতে, বোন, কি দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে, কত লাঞ্ছনা সয়ে, শেষে আজ তীরে এসে উঠতে হয়েছে আমায়! সামলে ওঠ, বাছা, অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করতে শেখ।'

বলতে বলতে নিচু হয়ে এসে জেন্‌কার কপালে চুমু দিলেন রোবিনস্কায়া। বোলোদিয়া শ্যাপালিন্‌স্কি এতক্ষণ ধরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এ-দৃশ্য দেখছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে গায়িকার টানা টানা ফিকে সবুজ চোখ দুটিতে যে অপরূপ সহৃদয় ভাব ফুটে উঠল তা তিনি জীবনে কখনও ভুলতে পারেননি।

তারপর সকলে বিষণ্ণ হৃদয়ে বিদায় নিলেন, শুধু রিয়াজানোব বেরোলেন এক মিনিট দেরি ক'রে। জেন্‌কার কাছে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধা ও সৌজন্যভরে তার হাতে একটি চুমু দিয়ে বললেন তিনি, 'যদি পার তো আমাদের এ প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করো; তবে এই আমাদের শেষ। কিন্তু যদি কখনও আমাদের দিয়ে কোন উপকার হয়, জানাতে দ্বিধা করো না। এই যে আমার কার্ড; অনর্থক টেবিলের ওপর ফেলে রেখে দিয়ো না। মনে রেখ, আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু।'

তারপর জেন্‌কার হাতে আর-একটি চুম্বন দিয়ে, সবার শেষে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন তিনি।

৮

বৃহস্পতিবার ভোর থেকে অনবরত টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। গাছের পাতায় আবার দেখা দিয়েছে সবুজ রঙ। তারপর হঠাৎ আজ আবার সব যেন হয়ে পড়েছে স্বপ্নের মতো নিথর নিঝুম একঘেয়ে—সবই যেন বিষণ্ণ, বিরস।

মেয়েরা সব নিত্যিকারের মতোই জেন্‌কার ঘরে এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন থেকে জেন্‌কার মধ্যে কি-একটা অদ্ভুত ভাবান্তর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর সে আগের মতো রসিকতা করে না, হাসে না, সারাক্ষণ তার সেই হলদে মলাটওয়ালা উপন্যাসখানা নিয়েও পড়ে থাকে না। জেনী এখন হয়ে পড়েছে খিটখিটে, সদাই বিষণ্ণ, চোখে তার মর্মান্তিক ঘৃণা আর বিদ্বেষের ছায়া। ছোট্ট মান্‌কা, আমাদের সেই দুরন্ত ছোট্ট মান্‌কা, যে জেনীকে ভালোবাসে প্রাণেরও বেশি, বৃথাই সে জেনীর মন তার দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে। জেনী তাকে দেখেও দেখে না, ভালো করে কথাই বলে না তার সঙ্গে। বড়ই প্রাণে লাগে তার। তা বোধ হয় এই একটানা টিপটিপ বৃষ্টি—এতে করে সকলেরই মনমেজাজ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তামারা এসে বসে জেন্‌কার বিছানায়, তারপর সস্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখটি এনে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে তোর, জেনেচকা? কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি তোর কেমন যেন এক অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটেছে। মান্‌কাও লক্ষ্য করেছে। দেখ্‌ না, তোর আদর না পেয়ে পেয়ে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে বেচারী। বল্‌ না আমায়, যদি কোন একটা উপায় করতে পারি।'

চোখ বোঁজে জেন্‌কা, তারপর মাথা নেড়ে জানায়, 'না।' একটু সরে বসে তামারা, কিন্তু আস্তে আস্তে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়েই চলে।

'তোর নিজের বিষয় জেন্‌কা—তাতে মাথা গলাই আমি কোন্‌ সাহসে? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম শুধু তুই হচ্ছিস—'

আচমকা বিছানার উপরে উঠে বসে জেন্‌কা; তারপর তামারার হাত ধরে হঠাৎ যেন একটু আদেশের সুরেই বলে ওঠে, 'বেশ! বাইরে চল্‌ তবে এক লহমার জন্যে। বলছি সব। মেয়েরা সব ঘরে বসে থাক।'

দরদালানে এসে জেন্‌কা তাঁর সঙ্গিনীর কাঁধের উপরে হাত দু-খানা রেখে, হঠাৎ বিকৃত ফ্যাকাশে মুখে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, তবে শোন এখানে দাঁড়িয়ে—কে যেন আমায় দিয়ে গেছে গর্মীরোগ।'

'আহা, ভাই! বেশিদিন হবে?'

'হ্যাঁ; অনেকদিন। মনে আছে তোর, সেই যে একদল পড়ুয়া এসেছিল? সেই যে যারা প্লাতোনোবের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিল? তখনই আমি প্রথম টের পাই। দিনের বেলা টের পেলাম।'

'আমি এক রকম আন্দাজও করেছিলাম তাই হবে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় তামারা, 'বিশেষ করে সেই যে, যেদিন তুই সেই গায়িকার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর কানে কানে চুপি চুপি কি বলছিলি। তা সে যাই হোক্‌, জেনেচ্‌কা লক্ষ্মীটি আমার, তোর কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত।'

ক্রোধে হতাশ্বাসে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে হাতের যে রুমালখানা এতক্ষণ বিমূঢ় ভাবে পাকাচ্ছিল তা ছিঁড়ে দুটুকরো করে ফেলে জেন্‌কা।

'না! কিছুতেই নয়!' বলে ওঠে সে, 'এ-বিষ তোদের কাউকে দেব না। হয়ত নিজেই লক্ষ্য করে থাকবি, গত কয়েক হপ্তা থেকে আমি মোটেই সবার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করি না, আর নিজেই আমি থালাবাসন ধোয়ামাজা করি। তাই তো আমি যে-মান্‌কাকে সত্যি সত্যি এত ভালবাসি তাকে ঠেলে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখি। কিন্তু এই সব দু ঠেঙে জানোয়ারগুলোকে আমি ইচ্ছে করেই এ-বিষ দিয়ে থাকি—রোজ সন্ধ্যেয় দিই, দিনে দশ জন পনের জন ক'রে। পচে গলে মরুক ওরা, দিক এ গর্মীর বিষ চারিয়ে ওদের বউয়ের শরীরে, ওদের বাঁধা রাঁড়দের মধ্যে, ওদের মায়েদের শরীরে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের মা-বাপ, ওদের দাইমা, চাই কি ঠাকুমা-দিদিমাদের মধ্যেও দিক চারিয়ে এ-বিষ। মরুক সব, মানুষ না জানোয়ার কোথাকার!'

সযত্নে সস্নেহে জেন্‌কার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করে তামারা, 'সত্যি, জেনেচ্‌কা, এমন নিষ্ঠুর হতে পারিস্‌ তুই?'

'পারি বই কি! কোন দয়ামায়া নেই আমার। তবে তোদের কারও কোন ভয় নেই। আমি নিজেই বেছে নিই কাকে দেব এ-বিষ। আহাম্মুখের শেষ, দেখতে মাকাল ফলটি, টাকাকড়িতে ঘুণ ধরেছে যার, সব চেয়ে মান্যগণ্য যে-সব ভদ্রলোক তাদের একজনকেও আমি এরপর তোদের কারও পাশে ঘেঁষতে দেব না। আহা! তাদের সামনে আমি এমন ভাবখানা দেখাই যেন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি একেবারে—তোরা তা দেখলে হেসে কুটো-পাটি হতিস! তাদের কামড়ে খামচে, কেঁদে ক'কিয়ে, থেকে থেকে শিউরে উঠে, কি ধিঙ্গিপনাই যে করি! আর ভোলেও তারা এতশত দেখেশুনে, যত সব আহাম্মুকের দল!'

নিচের দিকে চেয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বলে তামারা, 'এ-সব তোর কাজ, তুই-ই বুঝিস। হয়ত এ তুই ঠিকই করছিস। কে জানে? কিন্তু বলবি আমায়, ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দিলি তুই কি ক'রে?'

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেয় জেন্‌কা সেদিক থেকে: তারপর জানালার কোণের দিকে চৌকাঠের উপরে মুখ রেখে মর্মান্তিক আত্মগ্লানিতে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলে—বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার জ্বালা সে চোখের জলে। কান্নার মধ্যেই ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁপতে কাঁপতে বলে চলে সে—'কি ক'রে—কি ক'রে—শুনবি—ভগবানের এমনি দয়া

আমার উপরে—যে—যেখান দিয়ে ব্যামো আমার ফ‍ুঁড়ে বেরিয়েছে সে ব‍ুঝি ডাক্তারদেরও নাগালের বাইরে, ভাই। আর তাছাড়া আমাদের ডাক্তারবাব‍ু তো ব‍ুড়োহাবড়া, মোটাব‍ুদ্ধি।'

তারপর যেমন হঠাৎ সে কে‍ঁদে ফেলেছিল তেমনি আবার আচমকা প্রাণপণ চেষ্টায় এক নিমেষে কান্না চেপে ফেলে বলে—'আয় ভাই আমার কাছে, তামারোচ্‌কা! বল গা ছ‍ুঁয়ে এ নিয়ে বেশি বকবক করবি না।'

'না, ভাই, ভয় নেই তোর।'

তারপর দ‍ুজনই শান্ত সংযত হয়ে ঘরে এসে ঢোকে।

একট‍ু পরে সাইমন আসে সেখানে। লোকটা বর্বর গোছের হলেও, কি জানি কেন জেন্‌কাকে ওরই মধ্যে একট‍ু সম্ভ্রমের চোখে দেখে থাকে। এসে বলে সে, 'হ্যাঁ, দেখ, জেনেচ্‌কা, মহামহিম বাহাদ‍ুররা এসেছেন ভান্দার সঙ্গে মোলাকাত করতে। মিনিট দশেকের জন্যে ছেড়ে দাও ওকে।'

ভান্দা হচ্ছে এখানকার এক নীলনয়না উজ্জ্বলা গৌরাঙ্গী; ম‍ুখখানা তার বেশ বড়, ঠোঁট দ‍ুখানা লাল টকটকে আর ম‍ুখের গড়ন দেখলেই বেশ ব‍ুঝতে পারা যায় খাঁটি লিথ‍ুয়ানিয়ান মেয়েটি। জেন্‌কা যদি একবার 'না' বলে দেয় তবে তাকে আর যেতে হয় না ঘর ছেড়ে, তাই সে কাতরনয়নে চায় তার দিকে। কিন্তু জেন্‌কা ইচ্ছে করেই চোখ ব‍ুঁজে থাকে, হ্যাঁ না কিছ‍ুই বলে না। একান্ত অন‍ুগত মেয়েটির মতো তাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়।

এই মহামহিম জেনারেল-বাহাদ‍ুরটি একেবারে যেন কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে দ‍ু-হপ্তা অন্তর অন্তর মাসে দ‍ু-বার করে এসে পায়ের ধ‍ুলো দিয়ে যান এখানে (ঠিক যেমন এখানকার আর-একটি মেয়ে জো-র কাছে আসেন, এখানে ডিরেক্টর বাহাদ‍ুর বলে পরিচিত আর-একজন ভদ্রলোক)।

হঠাৎ জেন্‌কা তার ছে‍ঁড়া বইখানা পিছনের দিকে ছ‍ুঁড়ে ফেলে দেয়। তার কটা চোখ দ‍ুটিতে তখন সত্যিকারের আগ‍ুনের হল্‌কা ফ‍ুটে বের‍ুচ্ছে।

'এই সেনাপতি মশায়কে হেলাফেলা করা ভুল তোদের,'—বলে ওঠে সে, 'এর চাইতেও ঢের খারাপ অনেক ইথিয়োপিয়ান জানা আছে আমার। একবার আমার কাছে এসেছিল এক খদ্দের—একেবারে আস্ত একটি বোকাপাঁঠা। আমার সঙ্গে পিরিতের আর পথ পেল না মিনসে এই—ইয়ে ছাড়া—খ‍ুলেই বলি তবে—মাইয়েতে পিন ফ‍ুটিয়ে দিত হতভাগ্য। আবার ভিল্‌নোতে এক পোলিশ ক্যাথলিক পাদ্রি করত কি, আমার সারা দেহ সাদা কাপড়ে সাজাত, বাধ্য করত সে আমায় সারাদেহে পাউডার মাখতে, তারপর আমায় বিছানায় শ‍ুইয়ে দিয়ে আমার আশেপাশে জ্বালাত তিন-তিনটে মোমবাতি। তারপর শেষে যখন আমি একেবারে মড়ার মতো পড়ে রইতাম তখন আচমকা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত সে।'

'খাঁটি কথা বলেছিস, ভাই জেন্‌কা!' হঠাৎ বলে ওঠে ছোট মান্‌কা, 'আমারও ছিল এক ব‍ুড়ো জানোয়ার। তার কাছে সদাসর্বদা অক্ষত কুমারীর মতো সতীপনার ভান না করলে তার আবার মন উঠত না! তাই আমাকে সারাক্ষণ কান্নাকাটি চে‍ঁচামেচি করতে হত।'

হঠাৎ কিটি তার সাঁইসাঁই-করা গলায় হেসে ওঠে—'শোন্ বলি তবে, আমার ছিল এক মাষ্টার মশাই; সে ভাবখানা দেখাত যেন আমিই হলাম গিয়ে প‍ুর‍ুষ আর তিনি হলেন প্রকৃতি, আর তাই আমাকেই গিয়ে—জোর করে—আর কি গাধা! সারাটিক্ষণ ষাঁড়ের মতো চে‍ঁচাতে থাকবে সে—'ওগো, আমি যে তোমারই প্রেয়সী! আমি যে মনেপ্রাণে তোমারই গো! ধর আমায়, ধর প্রাণনাথ।'

'মাথা খারাপ আর কি!'—বলে ওঠে নীলনয়না চঞ্চলা ভের্‌কা পরিষ্কার মেয়েলী গলায়, 'মাথা খারাপ একদম।'

'না, তা কেন!' হঠাৎ প্রতিবাদ করে ওঠে নম্র মমতাময়ী তামারা—'মাথা খারাপ নয় একটুও, শুধু কেবল একটি লম্পট—সব পুরুষমানুষই যেমন তেমান। বাড়িতে অরুচি লাগে, তাই বাইরে এসে টাকা খরচ করে মরাজ-মাফিক সুখটি আদায় করে নিয়ে যায়। এই তো সোজা কথা, তাই নয় কি?'

জেন্‌কা এতক্ষণ চুপ করে পড়েছিল, এখন তড়াক করে উঠে বসে বিছানার উপরে। 'তোরা সব গাধা!'—চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'এ-সব ক্ষমা করিস কেন? আগে আমিও ছিলাম গাধা, কিন্তু আজকাল আমি ওদের সবাইকে আমার সামনে চারপায়ে হাঁটাই, আমার পা চাটাই, আর মহানন্দে করেও ওরা এসব।—তোরা জানিস সব্বাই, টাকাকড়ির ওপর মমতা নেই আমার, কিন্তু ওদের সব চুষে নিই যেমন করে পারি। ওরা, এই সব নোঙরা জানোয়ারের দল, আবার আমায় এনে উপহার দেয় তাদের বউ, কনে, মা, মেয়ে এদের সব ছবি—বোধ করি দেখে থাকবি তোরা সে-সব ছবি পায়খানার ভেতর। কিন্তু শুধু একবার ভেবে দেখ, বাছারা, মেয়েমানুষ জীবনে শুধু একবারই ভালোবাসে, আর ভালোও বাসে আজীবন, আর পুরুষ-মানুষের ভালোবাসা মদ্দা-কুকুরের রক্ত-চোষা। ওরা যে অবিশ্বাসী হয়, সে কিছু নয়; কিন্তু বাঁধা মেয়েমানুষের ওপর, তা সে নতুনই হোক আর পুরোনোই হোক ওদের একটুও দরদ থাকে না, এই যা দুঃখ। শুনেছি আজকাল-কার ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের মন বেশ সাদা। বিশ্বাসও করি সে-কথা, তবে নিজে আমি দেখিনি এ-রকম কাউকে; আমি যাদের দেখেছি, তাদের না আছে চালচুলো, না আছে আর-কিছু—যত সব আঁস্তাকুড়ের জানোয়ার।'

ভান্দা ফিরে আসে। জেন্‌কার বিছানার যে-পাশটিতে প্রদীপের ছায়া এসে পড়েছিল, সাবধানে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সেখানটিতে সে ধপ করে বসে পড়ে। ফাঁসির আসামী, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী, আর বেশ্যাদের মধ্যে যে একরকমের বিকৃত কিন্তু গভীর আন্তরিক চক্ষুলজ্জা দেখতে পাওয়া যায়, তারই দরুন কেউ তাকে সাহস করে এ-কথাটা আর জিজ্ঞেস করে না, এই দেড়ঘণ্টা সময় কাটল তার কেমন ক'রে। হঠাৎ সে টেবিলের উপরে প'চিশটা রুবল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, 'খানিকটে সাদা মদ আর একটা তরমুজ আনিয়ে দে তো আমায়।'

তারপর টেবিলের উপর দু হাত অবশ ভাবে এলিয়ে দিয়ে তার মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে সে। তবুও সাহস করে কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করে না। শুধু জেন্‌কা ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে, ঠোঁট কামড়াতে থাকে বসে বসে।

'হ্যাঁ, এই যে, এখন তামারার ব্যাপার বুঝতে পারছি আমি।' বলতে শুরু করে সে, 'শুনছিস, তামারা, তোর কাছে ক্ষমা চাইছি আমি। তোর ওই চোর সেন্‌কার সঙ্গে মাখা-মাখির জন্যে কত না হাসাহাসি করেছি আমি, কিন্তু এই এখন, এ-কথা মানছি যে এ-সংসারে যদি সত্যিকারের ভালোমানুষ কেউ থেকে থাকে তো সে হচ্ছে ওই চোরছ্যাঁচড় খুনে-ডাকাতরা। কোন ছুঁড়ীর সঙ্গে তার পিরিতের কথা সে লুকিয়ে বেড়ায় না, আর দরকার হলে মাগীর জন্যে সে চুরিচামারি কি খুনখারাপি করতেও পেছ-পা নয়। কিন্তু এই সব —বাকি আর সবাই! যত সব মিথ্যে, ছলনা, ছিঁচকেপনা, ধূর্তোমি, বদমাইশি! এক নোঙরা জানোয়ার, রয়েছে তার তিন-তিনটে সংসার, এক বউ আর গোটা পাঁচেক কাচ্চাবাচ্চা। তা ছাড়া রাঁড়ও আছে একজন অন্য কোথাও, আর তার পেটের গোটা দুই কাচ্চাবাচ্চা। প্রথম পক্ষের মেয়ের পেটেও হয়েছে বাপের একটি ছেলে। শহরের সব্বাই জানে এ-সব কথা। তবুও, ভেবে দেখ একবার, তিনি হলেন একজন মান্যগণ্য লোক, সারা পৃথিবীময় সুখ্যাতি তাঁর।—হ্যাঁ, দেখ, বাছারা, মনে হয় কোনদিন আমরা নিজেদের মধ্যে গোপন কথার

বেসাতি করিনি। তবু বলছি, আমার বয়স যখন সবে সাড়ে দশ, আমার নিজের মা আমায় বেচে দেয় ঝিতুমির শহরে ডাক্তার তারাবুকিনের কাছে। কত চুমু খেতাম তার হাতে, কত কাকুতি মিনতি করতাম তাকে আমায় রেহাই দেবার জন্যে, কে'দে বলতাম, 'আমি যে ছেলেমানুষ গো।' উত্তরে বলত সে, 'ও কিছু নয়; বুড়ো হয়ে উঠবে বই কি তুমি! ব্যথা তো লাগতই, ঘেন্না, নোঙরামি। সেই লোকটাই আবার পরে আমার সে হাপুস হাপুস করে কান্নার কথা চারদিকে রটিয়ে বেড়ায়—যেন কি একটা মজাদার চলতি গল্প!'

'কথা যখন উঠেছে তখন শেষই হোক এর'—হঠাৎ শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে জো, মুখে তার অবহেলা আর বিষাদের হাসি। 'আমায় প্রথম নষ্ট করে পাদ্রি সাহেবদের ইস্কুলের এক মাস্টার মশাই—আইভান পেত্রোবিচ যুয! আমায় তিনি ডেকে নিয়ে এলেন তাঁর ঘরে, তাঁর বউ তখন গিয়েছিল বড়দিনের বাজার করতে। আমায় মেঠাই খাওয়ালেন তিনি, তারপর বললেন হয় তিনি যা বলবেন তাই শুনতে হবে আমায়, নয়, বদস্বভাবের দায়ে আমায় ইস্কুল থেকে দেবেন দূর ক'রে। কিন্তু তখনকার দিনে মাস্টার মশাইদের তো আমরা ভয় করতাম স্বয়ং যমরাজ কি রাজার চেয়েও বেশি।'

'আর আমায় নষ্ট করে একটি পড়ুয়া। মনিবের ছেলেদের পড়াত সে ওখানে, ঐ যে যেখানে ঝি-এর কাজ করতাম—'

'তা নয়, আমায় কিন্তু—,'—বলেই নিউরা, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একেবারে হাঁ হয়ে যায়। দেখাদেখি সেদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে হাত কচলাতে শুরু করে দেয় জেন্কা। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লিউব্কা—রোগা হয়ে গেছে, চোখের কোণে পড়েছে কালি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশি-ডাকা লোকের মতো দরজার হাতলখানা হাতড়ে বের করবার চেষ্টা করছে সে—ভর দিয়ে দাঁড়াবে ব'লে।

'কি হয়েছে তোর, লিউব্কা?'—চে'চিয়ে ওঠে জেন্কা, 'একি কাণ্ড!'

'অ্যাঁ? কি আর হবে? আমায় নিল, আবার দূর দূর করে খেদিয়ে দিল।'

একটি কথাও বেরয় না কারুর মুখ থেকে। দু হাতে চোখ ঢেকে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে থাকে জেন্কা, চোয়ালের কঠিন পেশীগুলো কিভাবে যে কু'চকে উঠতে থাকে তার!

'জেনেচ্কা, তুই-ই আমার ভরসা,' শ্রান্ত অসহায় কণ্ঠে বলে লিউব্কা, তোকে সবাই এত খাতির করে চলে। এ বিষয়ে তুই—ই, লক্ষ্মীটি, কথা কয়ে দেখিস আনা মারকোব্না কি সাইমনের সঙ্গে। ফিরে যেন নেয় আমায় আবার।'

সোজা হয়ে উঠে বসে জেন্কা বিছানার উপরে; তারপর তার শুকনো, জ্বলন্ত, বাষ্পাকুল চোখে স্থিরদৃষ্টিতে লিউব্কার দিকে চেয়ে ধরাগলায় জিজ্ঞেস করে—'আজ তোর খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছে?'

'না। কালও হয়নি, আজও হয়নি। কিছুই খেতে পাইনি, ভাই।'

'শোন, জেনেচ্কা,' শান্তকণ্ঠে বলে ভান্দা, 'আমি খানিকটা মদ দিই ওকে—কেমন? আর ভেরকা ইতিমধ্যে একবার চট করে গিয়ে দেখে আসুক গে রান্নাঘর থেকে কিছু মেলে কিনা—অ্যাঁ?'

'যা ভালো বুঝিস কর। আর হ্যাঁ, তাই তো ঠিক। কিন্তু একি! চেয়ে দেখ, ছুড়ীরা সব, সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে যে ওর। উঃ, কি বোকা মেয়ে! এই, নে চটপট! কাপড়-চোপড় ছাড়্ এখন! ছোট্ট ফর্সা মান্কা, নয়তো তুই ভাই তামারোচ্কা, দে তো রে ওকে শুকনো পাজামা এনে একটা, আর একজোড়া গরম মোজা আর চটিজুতো।' তারপর লিউব্কার দিকে ফিরে বলে—'বল্ দেখি, বোকা কোথাকার, কি হয়েছিল, সব খুলে বল আমাদের।'

৯

যেদিন প্রত্যূষে অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ আনা মারকোব্‌নার প্রমোদভবন থেকে লিউব্‌কাকে সরিয়ে নিয়ে যায় লিখোনিন, সেদিন ছিল গ্রীষ্মের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি—গাছপালায় সবুজের সমারোহ ; বাতাসের মধু সৌরভে, পত্রে-পুষ্পে, তৃণলতায় আসন্ন শরতের সকরুণ মোহন ইঙ্গিত—সুদূরের হাতছানি। মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে দেখল লিখোনিন নির্মল, নিষ্পাপ, শান্ত বনশ্রী। লোকচক্ষুর অগোচরে রাতের অন্ধকারে পৃথিবীর বুকে নেমে এসে স্বহস্তে সারি সারি বৃক্ষরোপণ করে রেখে গেছেন বুঝি স্বয়ং ভগবান। নদী-নালা-খালবিলের বুকে ঘুমন্ত নীল জলরাশির শান্ত শোভার দিকে মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে রয়েছেন স্বয়ং বনলক্ষ্মী। বর্ষাস্নাত প্রদোষের আকাশ সব জেগে উঠছে তখন, তন্দ্রা-জাগরণের সন্ধিক্ষণে অলস-মধুর মৃদু রক্তিম হাসিতে প্রভাত-রবিকে জানাচ্ছে-অভিনন্দন।

প্রভাতের এই অপরূপ শোভায়, প্রাণের প্রাচুর্যে, জনাকীর্ণ ধূম্রমলিন কক্ষে রাত্রি জাগরণের পর বাইরের নির্মল বায়ুসেবনে, বিকশিত স্পন্দিত হয়ে উঠল লিখোনিনের অন্তর। মহৎ কর্মের উদার আত্মপ্রসাদ বর্ধিত করে তুলল সে অন্তরতম অনুভূতিকে।

হাঁ, মানুষের মতো কাজ করেছে বটে সে! ওরা সব আসবে যাবে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবে কত কথা, আদরে-সোহাগে ছেয়ে দেবে সোন্নেচ্‌কা মারমেলাদোবাকে, বেচারী যখন ভয়ের গল্প শুনে ব্যাকুল হয়ে এসে দেবে ধরা বুকের কাছটিতে—তারপর? তারপর যা হবার তাই! সব্বাই তা জানে। ফুঃ! কিন্তু তার কাছে, এই লিখোনিনের কাছে, যে কথা সেই কাজ।

আরও ঘেঁষে এসে লিউব্‌কার কোমর জড়িয়ে ধরে লিখোনিন, চোখে তার মমতা-ভরা, প্রায় যেন প্রেমেরই, দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় সে তো এতক্ষণ লিউব্‌কাকে দেখছিল বাপ কি ভাইয়ের চোখে।

লিউব্‌কার কিন্তু চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে ; পাছে সত্যি-সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে, তাই থেকে থেকে বেচারা ডাগর ডাগর চোখ করে চাইছে। ঠোঁট দু-খানায় কিন্তু এখনও সেই সরল শিশুর মতো অবোধ, ক্লান্ত, মৃদু হাসিটুকু।

'লিউব্‌কা লক্ষ্মীটি আমার! মানিক আমার! চিরদুঃখিনী মেয়ে! চেয়ে দেখ, কি সুন্দর চারদিক, চেয়ে দেখ, লক্ষ্মীটি, ঐ যে সামনে ঊষার উদয়। প্রভাতের আর দেরি নেই! এ তোমারই জীবন-প্রভাত, লিউবোচ্‌কা! তোমার নবজীবনের সূর্যোদয়। নির্ভয়ে তুমি আমার এই সবল বাহুতে ভর দিয়ে এসে দাঁড়াও। আমি তোমায় সৎপথে নিয়ে যাব, উত্তীর্ণ করে দেব জীবনের জয়যাত্রা-পথে, জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবে তুমি।'

আড়চোখে লিখোনিনকে চেয়ে দেখে লিউব্‌কা! 'মদের নেশা কাটেনি এখনও,' মমতাভরে মনে মনে ভাবে সে—'তা হোক গে যাক, ছেলেটি কিন্তু বেশ দরদী আর ভালোমানুষ গোছের! তবে একটু যেন সাদামাঠা ধরনের।' তারপর আধো-ঘুমন্ত মৃদু হাসি হেসে অভিমানের সুরে বলে সে—'হুঁ! আমায়ও ঠকাবে, তার ভুল নেই! তোমরা পুরুষ মানুষরা সব্বাই সমান। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সুখটি আদায় করে নিয়ে, শেষে আর চিনতে পার না!'

'আমি? অ্যাঁ? আমি কি তাই করতে পারি!'—খালি হাতখানা দিয়ে নিজের বুকে এক কিল মেরে দরদভরে বলে ওঠে লিখোনিন, 'আমায় তুমি ভুল বুঝেছ তবে। কোন অসহায় মেয়েকে ঠকাবার মতো স্বভাবই নয় আমার। সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার মনকে আমি শিক্ষিত করে তুলব, দৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত করে দেব তোমার, আর জীবনে তুমি যে-সব দুঃখকষ্ট পেয়েছ তা যাতে ভুলতে পার সেই চেষ্টাই করব চিরদিন।

আমি হব তোমার বাবা, তোমার ভাই। তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ নিরাপদ করে রাখব আমি! আর যদি কখনও তুমি কাউকে সত্যিই বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবে ভালোবাসতে পার, তবে আমি আজকের এই ক্ষণটিকে এই বলে মনে মনে স্মরণ করব যে, এই দিনে এমনই এক সময়ে আমি এই ঘোরতর নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে এনেছিলাম তোমায়।'

এই ওজস্বিনী বক্তৃতা শেষ হতে গাড়োয়ান বেচারা বিজ্ঞের মতো চুপি চুপি এমনই হাসতে শুরু করে দেয় যে তার সে মুখ-টিপে-হাসার চোটে পিঠখানা কেবলই ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। এ-রকম বক্তৃতা চুপচাপ করে প্রায়ই শুনতে হয় ঠিকে-গাড়ির গাড়োয়ানদের। লিউব্‌কা ভাবল লিখোনিন কি জানি কেন চটে গেছে তার উপর, নয়ত আগে থাকতেই তার কোন ভাবী নাগরের কথা ভেবে হিংসেয় জ্বলতে শুরু করেছে। সজাগ হয়ে ওঠে সে; অবোধ মিনতি-ভরা ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে ফিরে চায় তার দিকে, তারপর তার কোমরে-জড়ানো হাতখানা আস্তে করে ছুঁয়ে বলতে থাকে, 'রাগ করো না, প্রাণ, তোমায় ছেড়ে আর কখ্‌খনো ভালোবাসতে যাব না আমি। এই কথা দিলাম তোমায়, ভগবান সাক্ষী! কথা দিচ্ছি, কখ্‌খনো তা করব না! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমি জানি তুমি আমায় যত্ন-আত্তি করতে চাইছ? তুমি বুঝি ভাবছ আমি তা বুঝি না? কেন, তুমি এমন পছন্দসই, চমৎকার ছোকরা! আর হ্যাঁ, যদি হতে বুড়ো, গেঁয়ো—'

'আহা! আমার কথা ঠিক ধরতে পারনি তুমি,' চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন। তারপর ফের সেই গুরুগম্ভীর কায়দায় শুরু করে দেয় নরনারীর সমানাধিকার, শ্রমের মর্যাদা, ন্যায়নীতি, স্বাধীনতা, প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান, এই সব নিয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা।

এত কথার একটি বর্ণও বোধগম্য হয় না লিউব্‌কার। কেবলই তার নিজেকে দোষী মনে হয়, তাই একেবারে আগাগোড়া সঙ্কুচিত হয়ে বিষণ্ণ হৃদয়ে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে বেচারা। আর একটু হলে বোধ হয় সেই পথের মধ্যেই কেঁদে ভাসিয়ে দিত সে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার আগেই গাড়ি এসে দাঁড়ায় লিখোনিনের ডেরায়।

'এই যে বাড়ি এসে গেছি,' বলে ওঠে লিখোনিন, 'এই গাড়োয়ান, রোকো, রোকো।'

তারপর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে একহাত লিউব্‌কার দিকে বাড়িয়ে খুব খানিকটা দরদ-ভরা সুরে আবৃত্তি না করে থাকতে পারে না সে—

শূন্য এ ভবনে মম শান্ত দ্বিধাহীন,
এস আজি গৃহলক্ষ্মী, হও সমাসীন!

বুড়ো গাড়োয়ানের মুখে আবার সেই অতলস্পর্শী মৃদু হাসির ছটা—ভবিতব্যের নিগূঢ় ইঙ্গিত!

১০

লিখোনিন যে ঘরটায় থাকত তা ছিল সাড়ে পাঁচতলায়। সস্তা একখানা পায়রার খোপ যেন! শীতকালে যেমন শীত, গ্রীষ্মকালে তেমনি গরম! ধীরে ধীরে অতিকষ্টে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থকে লিউব্‌কা, ভয় করে এই বুঝি ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়। আর সারাক্ষণ লিখোনিন সাহস দিয়ে চলে তাকে—'লক্ষ্মীটি, ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, না? এস, আমার গায়ে ভর দিয়ে উঠবে এস। আমরা একটানা ওপরের দিকেই চলেছি, অ্যাঁ! কেবল ঊর্ধ্বে আর ঊর্ধ্বে! এই তো মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক—নয়? এস আমার সাথী, আমার বোনটি, আমার গায়ে ভর দিয়ে চলবে এস!'

লিউব্‌কার অবস্থা হয় হিতে বিপরীত। একা নিজেকেই টেনে তুলতে পারছে না

সে, তার উপরে আবার লিখোনিন! তবুও যদি বকবকানি ওর থামত একটুখানি, ভারি বেসুরো লাগছে এখন।

যাক, তবুও শেষটায় ঘরে এসে পেঁছনো গেল, তাই রক্ষে! দোরে চাবি নেই, থাকতও না কখনও। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার, জানালার পর্দাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে। ঘরের ভিতরে ইঁদুরের আর কেরোসিনের গন্ধে মাখামাখি, কালকের তরিতরকারির ঝোল মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে; ময়লা বিছানার চাদর, তামাকের কুটকুটে ধোঁয়া—সব যেন মেশামেশি হয়ে রয়েছে। সেই আধো-আলো-আঁধারে ঠিক ঠাহর হয় না, কিন্তু কে-একটা লোক পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে যেন।

পর্দাটা একটু তুলে দিল লিখোনিন। গরিব ছাত্রদের থাকবার ঘরের সর্বত্রই যা দুর্দশা এখানেও ঠিক তাই—এবড়ো-খেবড়ো বিছানা, তায় কম্বলখানা কুঁচকে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে; টেবিলের একখানা পায়া কোথায় যে তার পাত্তা নেই; একটা বাতিদান, কিন্তু মোমবাতির চিহ্ন নেই সেখানে; মেঝেয় সিগারেটের টুকরোর ছড়াছড়ি; আর বিছানার উলটোদিকে দেয়ালের কোল ঘেঁষে পুরোনো ভাঙ্গা পাটাতনের উপরে কে-এক ছোকরা হাঁ করে পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে।

'ওঠ, ওঠ, হেই নিয়েরাত, উঠে পড় চটপট!'—ছোকরার পাঁজরে ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচাতে লাগল লিখোনিন, 'এই প্রিন্স।'

'উঁম্—ম্—'

'গুষ্টিসুদ্ধ জাহান্নমে যা! স্বর্গে যেন ঠাঁই না হয় কোনদিন! নন্দনবন চোখে না পড়ে কোন জন্মে! ওঠ, উঠে পড়, জানোয়ার কোথাকার! এই কিন্‌টোস্কা!—'

'কেন মিছেমিছি কষ্ট দিচ্ছ বেচারাকে, লক্ষ্মী?' লিখোনিনের হাত ধরে মিনতি করে বলল লিউব্‌কা—'হয়ত বড্ড ঘুম পেয়েছে ওর, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বোধহয়। ও ঘুমোক একটু। তার চেয়ে আমি বরঞ্চ বাড়ি চলে যাই এখন। গাড়িভাড়ার জন্যে একটি আধুলি দিতে পারবে তো? কাল আমার কাছে এস—কেমন, লক্ষ্মীটি আমার?'

লিখোনিন একটু অবাক হল, লজ্জাও পেল। আর একজন ঘুমন্ত লোকের উপরে এই শ্রান্ত-ক্লান্ত মেয়েটির এতখানি দরদ, ভারি অদ্ভুত বোধ হল তার। কিন্তু সে শুধু ক্ষণেকের জন্যে। পর-মুহূর্তেই কি জানি কেন মনে মনে একটু বিরক্তও হয়ে উঠল সে। কিছু না বলে, নিয়েরাতের যে-হাতখানা ঝুলে পড়ে মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছিল—একটা আধপোড়া সিগারেট তখনও আটকে রয়েছে দু আঙ্গুলের ফাঁকে—সেখানা শক্ত করে ধরে কড়া গলায়ই বলে উঠল সে—'শোন্, এই নিয়েরাত, পষ্টাপষ্টি বলছি তোকে। বুঝলি, এই, গোল্লায় যা তুই, শোন্, আমি একা আসিনি, সঙ্গে একটি মেয়েছেলে আছে। এই শুয়ার!'

মুহূর্তের মধ্যে ভোজবাজি খেলে গেল যেন; যে ছিল শুয়ে, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল সে, হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে মেয়েটিকে দেখে থ হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম আঁটতে লেগে গেল, তারপর বিড়বিড় করে বলল—'আরে, লিখোনিন যে! তোর জন্যেই তো অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অচেনা সখীকে একটু পাশ ফিরে দাঁড়াতে বল না ভাই!'

তারপর তাড়াতাড়ি কোটখানা গায়ে চাপিয়ে দু-হাতের আঙ্গুল দিয়ে লম্বা লম্বা চুলগুলো পাট করে নিয়ে যথাসম্ভব সভ্যভব্য হয়ে বসল। মেয়েছেলে মাত্রেরই যা চিরকালের স্বভাব লিউব্‌কাও দেয়ালে টাঙানো আর্শিখানার দিকে এগিয়ে গিয়ে খোঁপাটা একটু ঠিক করে নিল। চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করল নিয়েরাত—মেয়েটি কে?

'যে-ই হোক, তোর তাতে কি?' চেঁচিয়ে জবাব দিল লিখোনিন—'চল, তবে

বাইরে যাই। খুলে বলছি সব। হ্যাঁ, কিছু মনে করো না লিউবোচ্‌কা, এই এক মিনিটের জন্যে। এখুনি ফিরে এসে তোমার সব বিলিব্যবস্থা করে দিয়ে ফের একদম হাওয়া হয়ে যাব।'

'কেন, আর ঝঞ্ঝাট করে দরকার কি?' উত্তর দিল লিউব্‌কা। 'বেশ চলবে আমার ওই পাটাতনটার ওপরে। তুমিও এই বিছানায়ই শুয়ে পড় এসে।'

'না গো না, দেবী আমার, সেটা ঠিক মানানসই হয় না আর। এখানে আমার এক সতীর্থ রয়েছে। আমি তারই ওখানে গিয়ে শোব। এখুনি ফিরে এলাম ব'লে।'

দুই ছাত্রই বেরিয়ে চলে গেল।

'কিবা অর্থ এ স্বপ্নের! কোথা হতে এল নেমে মোহন মূরতি?' স্বপ্নালস চোখ দুটি মেলে জিজ্ঞেস করল নিয়েরাত—'কোত্থেকে এই ঘাগরাপরা সাথীটিকে কুড়িয়ে পেলি রে?'

পরম-বিজ্ঞের মতো মুখ করে মাথা নাড়ল লিখোনিন। দিনের আলো ফুটে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গতানুগতিকতার কথা ভেবে আত্মসম্বিৎ ফিরে এসেছিল তার। ইতিমধ্যেই সে অনুভব করছিল কাজটার অন্তর্নিহিত বৈসাদৃশ্য, এর অনাবশ্যকতা। তাই নিজের প্রতি আর এই যে মেয়েটিকে সে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে তার উপরেও কেমন যেন একটু বিরূপ হয়ে উঠছিল সে মনে মনে। কাজটার দুরূহ দায়িত্ব, বন্ধুবান্ধবদের অর্থপূর্ণ হাসি, অবান্তর প্রশ্ন, পরীক্ষার সময়কার নানা রকমের ব্যাঘাত, সব কথাই এখন ভবিতব্যের মতো তার অন্তরে উদয় হচ্ছে একে একে। তবুও নিয়েরাতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই মনে মনে সে নিজের ভীরুতার জন্য লজ্জিত হয়ে পড়ল। তাই প্রথমে নিরুৎসাহ ভাব নিয়ে শুরু করলেও শেষটায় একদম রাশ ছেড়ে দিয়ে মেতে উঠল সে—'দেখ, প্রিন্স, ভুল করছিস তুই। এ ওই ঘাগরাপরা সাথী নয় রে, এ হল গিয়ে—এই—আমরা ক-জন সতীর্থ মিলে গিয়েছিলাম ইয়াম্‌কাতে, মানে, যাইনি ঠিক, বলতে গেলে একবার ঘুরপাক খেয়ে এলাম আনা মারকোব্‌নার ওখান থেকে—'

'কারা কারা রে?' উৎসাহভরে জিজ্ঞেস করল নিয়েরাত।

'তা দিয়ে কি করবি তুই? তোলপাইগীন ছিল, রামেশিস ছিল, একজন সাব-প্রফেসরও ছিলেন—ইয়ারশেঙ্কো, বোরিস সোবাসনিকোব, এই রকম আরও জনকয়েক—সবার নাম মনে পড়ছে না এখন। সারাটা দিন তো কেটেছে নৌকো বেয়ে, তারপর ভাঁটিখানায় ঢুঁ মারা গেল, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম একপাল শুয়োর যেন ঐ ইয়াম্‌কার দিকে। তুই তো জানিস আমি হচ্ছি খুব পিটপিটে লোক। আমি শুধু বসে বসে মদে চুরচুরে হয়ে উঠতে লাগলাম আমার একজন চেনা সাংবাদিকের সঙ্গে। এদিকে, আর সব্বাই তো এক এক করে পাপের পথে পা বাড়াল। আর তাই ভোরবেলার দিকে কি জানি কেন মনটা আমার ভারি মুষড়ে পড়ল। এই সব দুঃখিনী মেয়েদের দেখে প্রাণ কেঁদে উঠল। মনে পড়ল, আমাদের বোনেরা আমাদের কতখানি স্নেহ, ভালোবাসা, আর রক্ষণাবেক্ষণের পাত্রী; আমাদের মেয়েদের কি অসীম শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে ঘিরে রাখি আমরা। বলুক তো কেউ একটা কর্কশ কথা তাদের, দিক না একবার গায়ে হাত, অসম্মান করুক দিকিনি, তখুনি দাঁত দিয়ে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব না! তাই নয় কি?'

'উঁ—ম্?'—কতকটা প্রশ্নচ্ছলে, কতকটা আরও কিছু শোনবার আশায়, তার চোখের দিকে চেয়ে শুধু একটা শব্দ করল নিয়েরাত।

'তারপর মনে হল—কেন, যে-কোন বদমাইশ লোক, যে-কোন একটা বাজে ইতর লোক, যে-কোন এক বুড়োহাবড়া এসে তো দিব্যি স্বচ্ছন্দে এদের যে-কোন মেয়েকে কেবল একটা খেয়ালের বশে, ইচ্ছে হয় এক মুহূর্তের জন্যে, ইচ্ছে হয় সারারাতের

জন্যে, নিয়ে চলে যেতে পারে; আর অসীম অবহেলায় হাজারো বারের পর ফের আর-একবার নারীত্বের সেই বস্তুটিকেই কলুষিত কলঙ্কিত করে রেখে চলে যায় যা হল মানবজীবনের অমূল্যসম্পদ—প্রেম।—বুঝতে পারছ—নিগৃহীত ক'রে, পদদলিত করে চলে যায়, বিনিময়ে অর্থ দিয়ে মূল্য ধরে দিয়ে যায়, নিশ্চিন্ত মনে পকেটে হাত গুঁজে শিস দিতে দিতে পথ চলে সে। আর সব চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা এই যে, এ ওদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েটির কাছেও এ আর কিছু নয়, লোকটির কাছেও নয়। অন্তরের অনুভূতি গেছে মরে, আত্মার দিব্যজ্যোতি পড়েছে ম্লান হয়ে। তাই নয় কি? তবুও এদের প্রত্যেকটি মেয়ের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে চলেছে একটি করে অপার্থিব ভগিনী, এক-একটি সতীলক্ষ্মী জননী। অ্যাঁ? এই কি সত্যি নয়?'

'অ্যাঁ?'—শুধু একটা শব্দ করে উঠল নিয়েরাত।

'তাই ভাবলাম—লম্বাচওড়া কথায় লাভ কি! সভাসমিতিতে যত সব ভণ্ডামির বক্তৃতা, গোল্লায় যাক সে সব। রসাতলে যাক গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ, আইনকানুন, মাগদালেন আশ্রম, আর এই সব আড্ডায় গিয়ে ধর্মগ্রন্থ বিতরণ। জাগ্রত হতে হবে আমায়, করতে হবে প্রকৃত সৎ লোকের কাজ, এই নরককুণ্ড থেকে অন্তত একটি মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব; সুদৃঢ় ভূমিতে হবে তার স্থিতি; দান করব শান্তি, যোগাব প্রেরণা, বিতরণ করব দয়া আর দাক্ষিণ্য।'

'হুঁ—ম্!'—বিচিত্র মুখভঙ্গি করল নিয়েরাত।

'অ্যাঁ, প্রিন্স! মনের মধ্যে তোর সদাসর্বদা খেলছে যত নষ্টামি। কিন্তু বুঝে দেখ, আমি কোন মেয়েমানুষের বিষয়ে কথা কইছি না, কথা কইছি একটি মানুষের বিষয়; রক্তমাংসের কথাই এ নয়, এ হচ্ছে গিয়ে আত্মার কথা।'

'বেশ, বেশ, আত্মারাম, চলুক! তারপর?'

'তারপর, যেই না ভাবা সেই না কাজ! আজই নিয়ে এলাম মেয়েটিকে আনা মারকোব্নার ওখান থেকে। আপাতত থাকবে ও আমারই কাছে। পরে ভগবান যা করেন। গোড়ায় একটু লিখতে পড়তে শেখাব; তারপর ওর জন্যে একটা ছোট্ট দেখে খাবারের দোকান করে দেব, নয়ত ধর, এই মুদিখানা একটা। বন্ধুবান্ধবরা যে সাহায্য করতে বিমুখ হবে তা মনে করি না। দেখ, ভাই প্রিন্স, মানুষের প্রাণের—প্রত্যেকেরই প্রাণের—প্রয়োজন হল মমতা, আন্তরিকতা। আর দেখিস তখন এক বছর, কি দু-বছরের মধ্যেই সমাজের মধ্যে আবার ফিরে আসবে মেয়েটি—একটি সচ্চরিত্র, শ্রমশীল, সুযোগ্য সদস্য রূপে, কুমারীর মতো শুচিশুভ্র অন্তর নিয়ে, বিচিত্র মহৎ সম্ভাবনার বীজ বহন ক'রে। —ও তো কেবল দেহদানই করেছে, অন্তরাত্মা তো রয়েছে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।'

জিব দিয়ে শুধু চুকচুক শব্দ করতে লাগল প্রিন্স।

'এর মানে কি রে, এঁড়ে-খচ্চর?'

'একটা সেলাইয়ের কল কিনে দে না ওকে, অ্যাঁ?'

'বিশেষ করে সেলাইয়ের কল কেন? বুঝতে পারলাম না, ভাই!'

'কেতাবে ওই রকমই লেখে কি না, আত্মারাম, তাই। যেই না নায়ক উদ্ধার করল এক চিরদুঃখিনী হতভাগীকে, অমনি দিল কিনে একটা সেলাইয়ের কল।'

'ভাঁড়ামি রাখ এখন,' চটে গিয়ে হাত-ঝাপটা দিয়ে তাকে বিদায় করে দেবার ভঙ্গিতে বলল লিখোনিন, 'সঙ এয়েছেন আর কি।'

নিয়েরাত খেপে গেল। চোখ দুটো তার উঠল জ্বলে, কথার মধ্যে স্পষ্ট বেরিয়ে এল ককেসিয়ান টান, বলতে লাগল সে—'না গো ভাঁড়ামি নয় গো, আত্মারাম! এ দুয়ের একটা-না-একটা ঘটবে ঘটবেই। কিন্তু যাই ঘটুক ফল সেই একই। হয়, তুমি মাস পাঁচেক ওকে নিয়ে থাকবার পর ফের দূর দূর করে রাস্তায় বের করে দেবে, আর ও

তখন ফের সেই বেশ্যাবাড়িতে ফিরে যাবে, কি পথে পথে ব্যবসা চালিয়ে বেড়াবে। এ হতেই হবে! নয়, তুমি ওকে নিয়ে না থাকতে পার বটে, কিন্তু ওর ওপর যত রাজ্যের হাতের কাজ, কি মাথার কাজের এমনি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ওর অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে গড়ে তুলতে চাইবে যে, বিরক্তির চোটে একদিন তোমায় ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে হয় ও পথে এসে দাঁড়াবে, নয় গণিকালয়ে ফিরে যাবে। এ-ও সত্যি কথা। অবিশ্যি আরও একটা ব্যাপার ঘটলেও ঘটতে পারে। তুমি হয়ত ঠিক ভাইয়ের মতো, কি সেই নাইট ল্যান্সেলটের মতো, যাই হোক, ওর জন্যে খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছ, আর ও এদিকে গোপনে গোপনে আর কারুর সঙ্গে নটঘট শুরু করে দিয়েছে। আরে আত্মারাম, জেনেই রাখ আমার কাছ থেকে যে ওই যে মেয়েমানুষ—একবার যখন ও মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে, তখন চিরদিনই ও মেয়েমানুষ। আর সে লোকটাও দিনকয়েক ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে মাস তিনেক কাটতে না কাটতেই দূর করে ওকে দেবে ছেঁটে ফেলে—হয় রাস্তায়, নয় বেশ্যালয়ে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল লিখোনিন। ঠিক মনের মধ্যে থেকে নয়, কিন্তু অন্তরের কোন অন্তস্তল থেকে, চেতনার অগম্য গহন গোপন প্রদেশ হতে হঠাৎ এই ধরনের একটা ভাব তার মধ্যে উদয় হল যে নিয়েরাত যথার্থই বলেছে। কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা নেড়ে, হাত ছুঁড়ে, বিজয়ী বীরের মতো বলে উঠল সে—'এই বলে রাখলাম দেখ, আজ থেকে ছয়মাস পরে কথা ফিরিয়ে নিতে হবে তোমায়, আর খেসারত বাবদ, বুঝলি রে বোকাপাঁঠা কোথাকার, এক ডজন বোতল ক্যাথেটাইন মদ দিয়ে আমার তুষ্টি বিধানের জন্যে পুজো দিতে হবে তোকে তখন।'

'ওয়া! বহুৎ খুব!'—প্রিন্সের হাতখানা এসে সজোরে লিখোনিনের হাতের উপরে পড়ে সশব্দে তাল ঠুকে দিল—'মেরে দিলকে খুশ! কিন্তু আমার কথা যদি ফলে যায়—তুই খাওয়াবি আমায়?'

'তাই সই! আচ্ছা, আসি তবে, প্রিন্স! কার ওখানে শুতে যাচ্ছিস, অ্যাঁ?'

'এই তো এই বারান্দায়, সোলোবিয়েবের ওখানে! তবে হ্যাঁ, তুই কিন্তু, ভাই সেকেলে নাইটদের মতো তোর মহীয়সী রোজামন্দ্ আর তোর নিজের মাঝখানটায় একখানা দু-ধার তরোয়াল রেখে শুতে ভুলিস না যেন—বুঝলি?'

'খ্যাপা না পাগল! আরে, আমি যে নিজেই সোলোবিয়েবের ওখানে রাত কাটাব ঠিক করেছিলাম। যাক গে, দেখি, পথে বেরিয়ে পড়ি তো এখন, তারপর যেখানে হোক একটা আস্তানা বেছে নিলেই চলবে—তা সে জাইতেবিচ, স্ট্রাম্প, যার কাছেই হোক গে যাক। বিদায় প্রিন্স!'

'আরে, দাঁড়া, দাঁড়া!'—নিয়েরাত পিছু ডাকল তাকে—'আসল কথা যে বলতেই ভুলে গেছি—পার্ৎজান বেকায়দা।'

'বটে? তাই না কি?'—অবাক হল লিখোনিন, সঙ্গে সঙ্গে বেশ তোয়াজ করে লম্বা একটা হাই তুলে ফেলল সে।

'হ্যাঁ। তবে ভয়ের কিছু নেই; খানকয়েক বে-আইনী বইপত্তর আর কি কি যেন সব। এক বছরের বেশি ফাটক হবে না।'

'ও কিছু নয়; ও, বাবা, চিম্‌ড়ে ছোঁড়া, বেড়ে কাটিয়ে দিতে পারবে'খন।'

'ঠিক বলেছিস, চিম্‌ড়ে ছোঁড়া,' সায় দিল প্রিন্স।

'বিদায়!'

'আসি তবে, নাইট গ্রুনওয়াল্‌দ্‌জ?'

'এস, আমার কাবার্দিনিয়ান মন্দাঘোড়া!'

১১

একা পড়ে রইল লিখোনিন। সারারাত জেগে কাটিয়ে, মনের মধ্যে এসেছে তার একই সঙ্গে অবসাদ আর উন্মাদনা। প্রাত্যহিক জীবনের সীমারেখা পার হয়ে এসেছে যেন সে, প্রতিদিনের পরিচিত জীবনযাত্রার ছবি ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেছে কোন্ সুদূরে— মন তার উদাসীন। অথচ তারই সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাধারায়, তার অন্তরাবেগে, ফুটে উঠেছে এক অপার্থিব নির্মলতা, শান্ত নির্লিপ্ত পরিচ্ছন্নতা, আর অন্তরের অন্তস্তলে বয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন বৈরাগ্যের ফল্গুধারা—স্বচ্ছ পরিনির্বাণের পরম আকুতি।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে লিখোনিন। আশেপাশে, পায়ের নিচে, কত লোক ঘুমোচ্ছে অকাতরে—ভোরের ঘুম! গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে তাদের বুক ওঠানামা করছে তালে তালে, মুখচোখে কি কঠিন তামসিকতা—মৃতের চেয়েও বীভৎস ঘুমন্ত মানুষের মুখ?

হঠাৎ লিউব্‌কার কথা মনে পড়ে গেল তার। তাই তো! একবার চট করে গিয়ে দেখে আসা দরকার কেমন আছে বেচারা। সকালবেলার জন্যে চায়ের ব্যবস্থাটাও ওরই সঙ্গে সঙ্গে করে আসতে হয় এখন। তবুও নিজেকে বোঝাল সে—না, ও-সব কথা তো ভাবছে না সে মোটেই। তাড়াতাড়ি এসে রাস্তায় নেমে পড়ল সে।

একটি চাষী রমণী পথ চলেছে। কাঁধে তার দুধের বাঁক। যুবতী নয়, বয়স হয়েছে—রগের কোলে মিহি রেখা, নাকের পাশ দিয়ে মুখ অবধি গভীর ভাঁজ, তবুও গাল দুটিতে গোলাপী আভা, ছোট ছোট চোখ দুটিতে চটুল হাসি। বাঁকের ভারে আর চলার স্বচ্ছন্দ গতিতে তালে তালে নিতম্ব দুটি ডাইনে-বাঁয়ে দুলে দুলে উঠছে—ঢেউ খেলানো ভঙ্গিটির মধ্যে কেমন একটা বিলোল লালসার মাধুরী জড়িয়ে আছে যেন।

'ঢঙী মেয়েমানুষ, রঙ্গে ভঙ্গে জীবন কাটিয়ে এসেছে এতদিন,' মনে মনে ভাবল লিখোনিন। হঠাৎ কিন্তু ঠিক তাকেই পাবার জন্যে দুর্বার কামনার সঞ্চার হল তার মনে—এই যে একটি নারী, সম্পূর্ণ অপরিচিত, গ্রাম্য, বিগতযৌবনা, হয়ত নোঙরা আর ইতরও হবে, কিন্তু তবুও যেন একটি ফলন্ত পাকা আপেল ফল মাটিতে খসে পড়েছে, কীটদষ্টও যে হয়নি তা নয়, তা বুঝি বেশ-একটু কিছুকালই হয়ে গেল মাটিতে পড়ে রয়েছে এটি। তবুও তার বর্ণ-বৈভব, তার মদির রস-সৌরভ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি এখনও।

হৈ-হৈ করতে করতে সামনে দিয়ে চলে গেল একখানা শবযাত্রার গাড়ি—খালি গাড়ি, সামনে একজোড়া ঘোড়া, পিছনে বাঁধা আর এক জোড়া। মশালচি আর কবর খোঁড়ার লোকজন সব মিলে মদে চুরচুর হয়ে গলা ফাটিয়ে আবোল-তাবোল গান গাইছে। 'শব-শোভাযাত্রার জন্যে তাড়াহুড়ো করে চলে লোকগুলো, কিংবা হয়ত শেষ করেই ফিরছে এখন, কে জানে?'—মনে মনে ভাবল লিখোনিন—'মালদার লোক বটে সব!'

বড় রাস্তায় এসে পথের ধারে একখানা কাঠের বেঞ্চিতে বসে পড়ল লিখোনিন। দুধারে সারি সারি শত বৎসরের পুরোনো চেস্টনাট-গাছ—ডালপালা মেলে ক্রমে ক্রমে কাছাকাছি হতে হতে শেষটায় একেবারে একখানি সুদীর্ঘ সবুজ তীরের মতো হয়ে পরস্পরের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, নববসন্তের দিনটিতে সে ঠিক এখানে এই আসনটার উপরেই এসে বসেছিল। শান্ত বিনম্র সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছিল যেন তার চোখের সামনে—ঠিক যেন হাস্যমুখী ক্লান্ত কুমারী মেয়ে। গাছে গাছে গোলাপী ফল ধরেছে—কে যেন এসে মনের ভুলে আজ ঘরে ঘরে বড়দিনের দেওয়ালি সাজিয়ে রেখে চলে গেছে। 'হায়, আজ যেখানে ফলে ফলে পাক ধরেছে, কাল সেখানে ছিল থরে থরে বাসন্তী ফুলের রঙিন মেলা,' লিখোনিন ভাবতে লাগল বসে বসে—'কোথায় গেল সে ফুলের ডালা! আবার বসন্ত আসবে, চলে যাবে আবার! হায়,

যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!' হঠাৎ খেয়াল হল তার চোখ জ্বালা করে জল এসে গেছে কখন।

উঠে পড়ল লিখোনিন। বিশ্ববিধাতার নিজহাতে গড়া এই পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখছে সে যেন আজ—দেখছে তিল তিল করে এই বুঝি প্রথম তার জীবনে। হনহন করে পাশ দিয়ে কাজে চলে গেল একদল রাজমিস্ত্রী—ছবির মতো যেন।

নিউ কিষেনেব্স্কী মার্কেট পেরিয়ে আসতে হল তাকে। হঠাৎ খাবারের গন্ধ নাকে আসতে মনে হল তার, দুপুরের পর থেকে এখনও খায়নি কিছু সে, তখুনি খিদে পেয়ে গেল তার। এককালে প্রায়ই যখন উপোস করে থাকতে হত, তখন এখানে এসেই রুটি-তরকারি কিনে খেত সে। এক টুকরো সসেজের দাম পড়ত দশ কোপেক, আর একখানা রুটি ছিল দু কোপেক।

বাজারের পথ লোকে লোকারণ্য। দূর থেকেই কানে এল তার বাজনার শব্দ। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে দেখে একদল পসারিনী নিজেদের মধ্যেকার নিত্য-নিয়মিত ঝগড়াঝাঁটি গালমন্দ ভুলে সখী সেজে নাচনা-গাওনা নিয়ে মেতে উঠেছে কাল সন্ধ্যা থেকে। রাতভোর চলেছে মাতামাতি। আসরের ঠিক মাঝখানটিতে বছর পঁয়তাল্লি-শেকের এক মেয়েমানুষ, দেখতে তখনও বেশ সুন্দরী রয়েছে সে, ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে চলেছেঃ

ঐ বাজে, প্রাণ, সারেঙ্গী ঐ!
—বঁধু পথের 'পরে,
মা দিয়েছে দোরে কাঁটা,
বেরোই কেমন করে!

লিখোনিন চিনত তাকে। এই সেই মেয়েছেলেটি যার কাছে টানাটানির দিনে ধারে মাল পেত সে। মেয়েমানুষটি চিনতে পারল তাকে। বোঁ করে ছুটে এসে একেবারে জড়িয়ে ধরল তাকে, বুকের ভিতরে চাপতে চাপতে সোজাসুজি একেবারে তার ঠোঁটের উপরে নিজের ভিজে, গরম মোটা মোটা ঠোঁট-জোড়া চেপে ধরে বারবার চুমু খেতে খেতে হয়রান করে দিল বেচারাকে। তারপর দুহাত বাড়িয়ে এক হাতের চেটো দিয়ে আরেক হাতের চেটোয় তাল ঠুকে আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে গদগদ সুরে বলতে লাগল সে—'প্রাণ আমার, জীবনসর্বস্ব আমার, বঁধু আমার! মদ খেয়েছি বলে ক্ষমা করো এবারটির মতন তোমার এ অভাগী স্ত্রীকে। কি হয়েছে তাতে? একটু আমোদ করছি বই তো নয়!'

আবার বোঁ করে ছুটে এল সে লিখোনিনের হাতে চুমু খাবে ব'লে; বলতে বলতে এল—'আমি তো জানি, কত কোমল তোমার প্রাণ, আর পাঁচজনের মতো কঠিন নও তুমি। কই! তোমার হাতখানা এগিয়ে দাও, প্রাণের প্রাণ আমার গো! আমি যে তোমারই ওই মিষ্টি হাতখানায় চুমু দিতে চাই গো! না গো না! চাই গো, চাই গো আমি, চাই গো তোমায়!'

'সে কি কথা গ্রাইসেরা মাসী!' হঠাৎ কেন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল লিখোনিন—'এস, তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা দুটিতে এই ভাবে চুমু খাই এখন। কি মিষ্টি তোমার ঠোঁট দুখানা বাছা!'

'আহা, প্রাণবল্লভ আমার! সোনার চাঁদ আমার! নয়নমণি আমার গো!' গলে গেল গ্রাইসেরা—'দাও, ঠোঁট-দুটি এগিয়ে দাও গো তবে! হামি দিই, তবে!',

উন্মত্ত হয়ে লিখোনিনকে তার বিশাল বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুমোয় ভিজিয়ে দিল সে একেবারে। তারপর তার জামার হাতা ধরে টানতে টানতে আসরের ঠিক মাঝখানটিতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিল। আর নিজে হেলে-দুলে কোমর বেঁকিয়ে

বেঁকিয়ে তালে তালে ধপাধপ করে তার চারদিকে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে চলতে লাগল মেয়েটা ঃ

আউ! ফের লেব তোয়, হেই পারাস্কা
—খেয়ালখুশির দায়,
বলি, আরে রে ছুটে আয়!
ঘাগরাতলায় মাকড়া পোষা,
কোঁচার তলায় হুল,
উঃ! চুলবুল চুলবুল!

তারপর বাজনাদারদের বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে, দেখতে দেখতে ধপ্ ধপাধপ করে শুরু করে দিল সে খুদে রুশীয়ানদের দুর্দান্ত 'গোপাক' নাচঃ

আরে, আরে, চুক্!
বাড় বেড়েচে বড্ড দেখি তোর!'
ইল্লৎ তুই,
নোঙরা কেন কল্লি জামা তোর!
তাই তো বটে! প্রিস্কো আমার
কারিস নে রে রাগ,
ভিজে যদি গিয়েই থাকিস,
মুছেই নে না দাগ!
তা না না না তা না না না
তা না না না তাগ্ —
ঘাপটি মেরে ঘুমোয় খিমা
চুপটি করে শুয়ে,
মদ্দা কসাক শুয়েলো দ্যাখ,
মাদীর পাশে ভুঁয়ে।
স্যায়না মেয়ের বায়না,
কয় না কথা, কয় না,—
হ্যাঁলা, কারিস কেন ছল?
হ'রে রসে ঢল মল!
তাই রে না না, নাইরে তা না,
তাইরে না না তল—

লিখোনিনের মাথায় খুন চেপে গেছে ততক্ষণে। হঠাৎ মহা উৎসাহে সঙ্গিনীকে ঘিরে বোকাপাঁঠার মতো তড়াক তড়াক করে লাফাতে শুরু করে দিল সে—যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ঘুরন্ত একটা গ্রহের উপগ্রহ। লিখোনিন এসে যখন ঢোকে এ আসরের মাঝখানে তখন সকলেই হ্রেষাধ্বনি করে তার অভ্যর্থনা করেছিল। এখন তাকে ধরে টেবিলে বসিয়ে ভদ্‌কা আর সসেজ খাইয়ে দেওয়া হল। নিজের গরজেই এক ভবঘুরেকে দিয়ে আনিয়ে নিল সে বীয়ার, আর গেলাস হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে করল তিন-তিনটে বাজে বক্তৃতা—একটা হল উক্রাইনের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে, আর-একটা হল খুদে রুশীয়ার মেয়েদের রূপ আর ঘরকন্নার প্রশংসা করতে গিয়ে তাদের তৈরি সসেজের মাহাত্ম্য-কীর্তন, আর তেসরা দফায় চলল দক্ষিণ-রুশীয়ার ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে এক বক্তৃতা। সারাক্ষণ লিউকেরিয়ার পাশটিতে বসে তার কোমর হাতে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিল লিখোনিন; কিন্তু অমন লম্বা হাতখানায়ও তার নাগাল পাচ্ছিল না। লিউকেরিয়া কিন্তু

টেবিলের তলায় তার আগুনের মতো গরম, গোদা নরম হাতখানা দিয়ে এমন জোরে লিখোনিনের হাত চেপে ধরল যে বেচারার হাতে ব্যথা হয়ে গেল একেবারে।

বেশ চলছে সব। হঠাৎ কি নিয়ে যেন দুইজন পসারিনীর মধ্যে বেধে গেল ঝগড়া—একেবারে যেন দুই মোরগের লড়াই। কোমরে হাত দিয়ে মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়েছে দুজন, আর দুজনই দুজনকে উদ্দেশ করে সবচেয়ে বাছা-বাছা অকথ্য গালমন্দ করে চলেছে যত।

'নেকী, একচোখী, কুত্তীর বাচ্চী।'—চেঁচাচ্ছে একজন, 'তুই আমার এখানকারও যুগ্যি নস।' বলেই অপর পক্ষের দিকে পিছন ফিরিয়ে কোমরের তলায় থাবড়া মেরে দেখিয়ে দিল সে—'এই যে, এখানকার, ঠিক এইখানকার!'

'ফের মিছে কথা বলছিস তুই, কুটনী মাগী কোথাকার! আমি ঠিকই আছি রে, ঠিকই আছি আমি!'

সুযোগ বুঝে উঠে পড়ল লিখোনিন—হঠাৎ কি-একটা কথা যেন মনে পড়ে গেছে তার।

'তুমি একটু বসো, লিউকেরিয়া মাসী, আমি এই এলাম ব'লে।' এক ছুটে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ল সে।

'ও কত্তা! কত্তা গো! যত শীগগির পার ফিরে এস কিন্তু! এখ্খুনি! কথা আছে তোমার সঙ্গে!' চেঁচিয়ে উঠল তার পার্শ্ববর্তিনী।

পথের বাঁকে এসে খানিকক্ষণ মনে মনে হাতড়ে বেড়াল সে—কি এমন জরুরী কাজ হাতে আছে তার যা এখুনি, একেবারে এই মুহূর্তেই, করা চাই তার! অন্তরের অন্তস্তলে জেগেই ছিল কথাটা, তবুও তা স্বীকার করতে গড়িমসি করতে লাগল সে কেবলই।

রীতিমতো বেলা হয়ে গেছে এখন। রাস্তায় রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হয়েছে। ফুলওয়ালীরা পথের ধারে নানারকম ফুলের ডালা সাজিয়ে নিয়ে বসে গেছে।

লিখোনিনের গোপন চিন্তাটা রূপ পেল এতক্ষণে।—'এতক্ষণে লিউব্‌কা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে নিশ্চয়,'—মনে মনে ভাবল সে, 'আর না-ই বা যদি জেগে থাকে, আমি গিয়ে পাটাতনটার ওপর একটু গড়িয়ে নিই গে যাই।'

কেরোসিনের বাতিটা তখনও বারান্দার উপরে ধোঁয়াচ্ছে পড়ে পড়ে। উপর থেকে আলো প্রায় আসছেই না বললে হয়। দরজা শুধু ভেজানোই আছে। নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকে পড়ে লিখোনিন।

জানালার খড়খড়ির পাখি দিয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছে ভোরের আবছা আলো। মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরম লোভীর মতো লিউব্‌কার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে থাকে লিখোনিন। গরম হয়ে শুকিয়ে এসেছে ঠোঁট দুখানা তার, জিভ দিয়ে চাটছে সে বারবার। হাঁটু দুটো কাঁপছে থর থর করে, আহা!

হঠাৎ তীরের মতো একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে যায় তার, 'একবার জিজ্ঞেস করে দেখি কোন-কিছু চাই কি না ওর।'

চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে লিউব্‌কা—একখানা খালি হাত পাশে এলিয়ে পড়েছে, আর-একখানা রয়েছে বুকের উপরে নেতিয়ে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে লিখোনিন। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠা-নামা করছে তালে তালে। সুস্থ তরুণ দেহের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, ঘুমের মধ্যেও রয়েছে একটি বিশুদ্ধতা—মদিরা সুরভি যেন! তার খোলা হাতখানির উপরে সন্তর্পণে আঙুল বুলিয়ে দেয় লিখোনিন, স্তনপ্রান্তে দেয় মৃদু চাপ। 'এ কি করছি আমি?'—অন্তর থেকে কানে আসে তার বিবেকের অস্ফুট আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন জবাব দিয়ে ওঠে তার হয়ে—'কই, কিছুই করছি না

তো আমি! একবারটি শুধু খবর নিতে এসেছি, ভালো ঘুম হচ্ছে তো, চা-টা কিছু চাই কি!'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় লিউব্‌কার, চোখ চায় সে, ফের চোখ বোঁজে, সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলে চায় আবার। লম্বা, বেশ লম্বা এক আড়মোড়া ভেঙে, মিষ্টি অবোধ হাসি হেসে, তপ্ত সবল বাহুলতা দিয়ে লিখোনিনের গলা জড়িয়ে ধরে সে।

'মধু আমার! প্রাণ আমার!'—গদগদ মনমাতানো সুরে কুজন করে ওঠে যেন—'তোমার জন্যে বসে বসে কতক্ষণ কেটে গেল, রাগও হতে লাগল শেষে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, আর সারারাত ধরে শুধু তোমায়ই দেখেছি ঘুমের মধ্যে এতক্ষণ। এস, কাছে এস লক্ষ্মীটি আমার, এস আমার মানিক।' বুকের কাছে টেনে নেয় তাকে লিউব্‌কা।

প্রায় কোন বাধাই দেয় না লিখোনিন; সারা দেহ তার শীতে থরথর করে কাঁপছে যেন, দাঁতে দাঁত লেগে ফিসফিস করে শুধু একটানা প্রলাপ বকে চলেছে বুঝি—'না, এই, লিউবা, অমন করে না—সত্যি, অমন করতে নেই, লিউবা—আহা, থাক এখন ওসব, লিউবা—দুঃখো না আর আমায়—মুখ দেখাতে পারব না যে আমি—ছেড়ে দাও, এই, লিউবা, দোহাই তোমার!—'

'বোক্‌-কা আম্‌-মার।' সোহাগে সুখে মাতোয়ারা হয়ে হেসে উত্তর দেয় লিউব্‌কা—'এস আমার কাছে, সুখটি আমার গো!'—সঙ্গে সঙ্গে লিখোনিনের শেষ ক্ষীণ বাধাটুকুও অবহেলায় ঘুচিয়ে দিয়ে, তার মুখখানা নিজের মুখের উপরে চেপে ধরে সে, উত্তপ্ত গভীর চুম্বন এঁকে দেয় সেখানে—জীবনে এই বুঝি তার একটিমাত্র আন্তরিক চুম্বন—একমাত্র সম্বল, এই প্রেম, এই শেষ।

'ওরে, পাষণ্ড! করছিস কি তুই?'—কোন্‌ এক পরম বিজ্ঞ সাধুপুরুষ বলে ওঠে যেন লিখোনিনের অন্তরের মধ্যে—কিন্তু সে হচ্ছে তার বিবেকের অলীক ছায়ামূর্তি।

'এখন তবে? ঠাণ্ডা হতে পেরেছ তো একটু?'—মমতাভরে শেষবারের মতো লিখোনিনের ঠোঁটে চুমু দিয়ে জিজ্ঞেস করে লিউব্‌কা, 'ছোট্ট পড়ুয়াটি আমার গো!'

১২

তারপর? নিদারুণ মর্মপীড়া আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজের আর লিউব্‌কার—বোধ করি সারা জগৎটারই—প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষ নিয়ে পাটাতনটার উপরে এসে ধপ্‌ করে আছড়ে পড়ে লিখোনিন, আর মনে মনে লজ্জায় মরে গিয়ে দাঁত কড়মড় করতে থাকে। নাঃ, ঘুমের মাথা খেয়েছে সে আজ—লিউব্‌কাকে সঙ্গে করে এনে কি ভুলই করেছে! 'কিন্তু এখন সবই সমান,'—মনে মনে ভাবতে লাগল সে—'একবার যখন কথা খসিয়েছি মুখ থেকে তখন এর শেষ অবধি না দেখে ছাড়ছি না। হ্যাঁ, তাই বলে এই যা ঘটে গেল এখন, এ আর ঘটছে না ফের। হায়রে! ক্ষণিকের মতিভ্রমে এ সংসারে কারই বা না পা পিছলেছে একবারও?—কিন্তু কাল সকালে কি করে মুখ দেখাব ওর কাছে?'

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল তার। একটার পর একটা করে খালি সিগারেটই পুড়িয়ে চলল সে, আর মাঝেমাঝে উঠে এসে ঢকঢক করে জল খেতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক সময় যেন প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলেই জোর করে সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সে; সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল একেবারে।

ফের যখন ঘুম ভাঙল তার, দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন—বেলা দুটো কি তিনটে

হবে বুঝি। খানিকক্ষণের জন্যে ভোম হয়ে রইল বেচারা, হতবুদ্ধির মতো ঠোঁট চাটতে আর ঘরখানার চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগল সে। রাতের বেলায় এত যে কাণ্ড ঘটেছে তার একবর্ণও মনে এল না তার। হঠাৎ লিউব্‌কার দিকে চোখ পড়তেই চেয়ে দেখে, মাথা নিচু করে বিছানার উপরে উঠে বসে আছে সে, হাত দুখানা হাঁটুর কাছে পড়েছে এলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা মনে পড়ে গেল তার, বিরক্ত আর হতবুদ্ধি হয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করে গোঙানি শুরু করে দিল সে। নিজের দিকে তলিয়ে দেখেই বুঝতে পারল বুঝি, রাতের ভুলচুকের দিকে ভোরের আলোয় চোখ মেলে চেয়ে দেখা কি কঠিন কাজ!

'ঘুম ভেঙেছে তোমার, লক্ষ্মীটি!' মমতাভরে জিজ্ঞেস করল লিউব্‌কা। তারপর উঠে এসে তার পায়ের কাছটিতে বসে আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'আমি কিন্তু অনেকক্ষণ হল জেগে বসেছিলাম। তোমায় ডাকতে সাহস হচ্ছিল না। এমন ঘুমুচ্ছিলে তুমি।' বলে এগিয়ে এসে তার গালে চুমু খেল লিউব্‌কা। মুখে বিরক্তি টেনে এনে আস্তে করে সরিয়ে দিল তাকে লিখোনিন।

'থাক থাক, লিউবোচ্‌কা। ওসব করতে নেই।' বলে উঠল সে—'বুঝতে পারলে —কোনই দরকার নেই, কখ্‌খনও না। কাল রাতে যা হয়ে গেছে সে হল একটা দৈব দুর্বিপাক। ধর, না হয় আমারই দুর্বলতা। না, তার চেয়েও দোষের কথা—বোধ হয় ক্ষণিকের একটা নীচতা। কিন্তু, মাইরি বলছি, বিশ্বাস কর আমায়, আমি কখ্‌খনও এ কথা ভাবিনি যে তোমায় আমার রক্ষিতা করে রাখব! তোমায় দেখতে চাই বান্ধবী, ভগ্নী, সাথীর মতন।—যাক, ও কিছু নয়, সবই ঠিক হয়ে যাবে, অভ্যাস হয়ে আসবে। শুধু মনের মধ্যে পাপ না ঢুকলেই হল। যাক বাছা, জানালার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে একটুখানি চোখ ফেরাও দিকি, চট করে ঠিকঠাক হয়ে নিই আমি।'

ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে, মুখখানা গোমড়ামতন করে, জানালার সামনে উঠে এসে লিখোনিনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল লিউব্‌কা। বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সখিত্ব এ-সব লম্বা-চওড়া বুলির একবর্ণও ঢুকল না তার সাদাসিধে বুদ্ধি আর পাড়াগেঁয়ে সরল প্রাণে। বরং একজন ছাত্র—যা তা নয়, একেবারে একজন শিক্ষিত লোক, কে জানে কালে হয়ত হবে একজন ডাক্তার কি উকিল কি জজসায়েব, সে এসে নিয়েছে তার ভার—এই কথাটাই তার প্রাণ মাতিয়ে তুলেছিল।—আর, এই এখুনি কিনা, দিব্যি সুখটি আদায় করে নিয়ে কেটে পড়তে চাইছে! এরা সবাই সমান, এই ব্যাটাছেলেগুলো!

লিখোনিন উঠে তাড়াতাড়ি চোখেমুখে একটু জলের ছিটে দিয়ে এসে জানালাগুলো খুলে দিল। তারপর লিউব্‌কার কাছে এসে সদয়ভাবে তার কাঁধ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, 'কিচ্ছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি—যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। তবে ভবিষ্যতের জন্যে এ একটা শিক্ষা হয়ে রইল।—তোমার এখনও চা খাওয়া হয়নি, লিউবোচ্‌কা?'

'না, সারাক্ষণ তো তোমারই জন্যে বসেছিলাম। তা ছাড়া কার কাছে যে চাইতে হয় তাও জানি না। আর তুমিও তো বেশ আছ গো! সেই যে বেরিয়ে গেলে তোমার বন্ধুর সঙ্গে, ফিরেও এলে, দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেও খানিকক্ষণ—শুনতে পেলাম সবই। কিন্তু কই, চলে যাবার সময় বলেও গেলে না তো একটি বার, তা কি ঠিক হয়েছে তোমার?'

বেশ মজা লাগল লিখোনিনের, কোন রকম রাগ না করে ভাবল সে, 'এই তো, সাংসারিক কলহের সূত্রপাত!'

লিউব্‌কার সাদাসিধে নিরীহ অভিমানী মুখখানার দিকে চেয়ে আর নিজে যে সে পুরুষমানুষ, সমস্ত দায়িত্ব যে তার একারই, এ-কথা ভেবে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল লিখোনিন। দোর গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে নোঙরা অন্ধকার ঘুরঘুট্টি বারান্দার দিকে চেয়ে হাঁকল সে—

'আল্-একজান্ দ্রা—একবাটি সামোভা-র! দু-খানা রুটি-ই, মাখ-ন, আর সসেজ! আর ছোট্ট এক বোতল ভদ্‌কা!'

বারান্দায় চটির চটাচট আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে দূরে থাকতে থাকতেই এক বুড়ীর গলার আওয়াজ আসতে লাগল—'এত হাঁকডাক কিসের? হাঁকডাক কেন, অ্যাঁ? হো, হো, হো, লড়ুইয়ে ঘোড়া চেঁচিয়ে আস্তাবল মাথায় করে তুলেছে যেন! দেখতে শুনতে আর ছোট্টটি নেই বাপু; ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছ এখন, তবুও রাস্তার হ্যাংলা ছোঁড়াগুলোর মতো হালচাল আর গেল না! হ্যাঁ, কি চাই এখন?'

বলতে বলতে বুড়ী এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। এই হল আলেকজান্দ্রা, ছাত্রাবাসের পুরোনো ঝি, ছাত্রদের বন্ধু আর মহাজন; বছর পঁয়ষট্টির বুড়ী, কুঁদুলে আর খিটখিটে।

কি কি চাই ফের বলে, লিখোনিন এক-রুবলের একখানা নোট ছুঁড়ে দিল তার হাতে। বুড়ী তবুও যায় না, ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আর রাগত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে ঘরের মধ্যে কে-একটা মেয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে।

'কি হল তোমার আবার, আলেকজান্দ্রা, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে?'—হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল লিখোনিন—'না কি, চেয়ে চেয়ে দেখে আশ মিটছে না বুঝি আর? বেশ শোনাই তবে—ও হল আমার খুড়তুতো বোন, আপন খুড়তুতো বোন—লিউবোব।'* এক মুহূর্তের জন্যে সামান্য একটু থতমত খেয়ে গেল লিখোনিন, তখুনি ফের শুরু করল—'লিউবোব বাসিলিয়েব্‌না। কিন্তু আমার কাছে খালি শুধু লিউবোচ্‌কা। যখন এই এত্তটুকু ছিল,'—লিখোনিন টেবিল থেকে দেড় বিঘত প্রমাণ জায়গা দেখিয়ে দিল, 'তখন থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি ওকে। আর যা দুষ্টু ছিল, কানমলা চড়চাপড় কত যে খেয়েছে তখন! তবে হ্যাঁ, পোকামাকড়ও ধরে দিয়েছি কত!—তা, যাকগে—তুমি এখন যাও দিকিনি, জড়ভরত আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী কোথাকার। এই যাবে আর আসবে—বুঝলে?'

বুড়ী তবুও নড়তে চায় না। দরজার দিকে ফিরেছে কি না ফিরেছে, আড়চোখে লিউব্‌কার দিকে বিষদৃষ্টিতে চেয়ে বিড়বিড় শুরু করে দিয়েছে, 'হেঁ', আপন খুড়তুতো বোন! এ-রকম ঢের আপন খুড়তুতো বোন জানা আছে সবার। কাশ্‌তোনোবায়া স্ট্রীটে পালে পালে ঘুরে বেড়ায় মাগীরা। আর, এই মন্দা-কুকুরের পালের এততেও যদি আশ মেটে!'

'নে, নে, বুড়ী কুত্তী! কাজে যা এখন, ঘেউ ঘেউ করিস না!' চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন—'নইলে তোর সেই পেয়ারের পড়ুয়া ত্রিয়াজোব-এর মতো তোকে ধরে পুরো একটি দিন আর এক রাত পোশাক-কুঠরিতে তালা দিয়ে আটকে রাখব'খন।'

আলেকজান্দ্রা চলে গেল। কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি তার থপথপে চটির শব্দ আর বিড়বিড় বকুনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যেতে লাগল। ছাত্রদের সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পরিচর্যা করে আসছে। তাদের অনেক কিছুই গায়ে মাখে না সে—মাতলামি, তাস পেটানো, কেলেঙ্কারি, হৈ-হল্লা করে নাচনা গাওনা, এমন কি ধার-দেনা পর্যন্ত। কিন্তু, আহা! নিজে বেচারী হল গিয়ে চিরকুমারী, তাই একটি জিনিস তার উপবাসী অন্তরাত্মা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না—সে হচ্ছে ওই ব্যাভিচার।

* প্রেম

১৩

—'চমৎকার!—সুন্দর—!—অপরূপ!'—খোঁড়া টেবিলখানার চারপাশে ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লিখোনিন—'আহা! কতকাল যে শুদ্ধাচারে ভদ্দরলোকের মতো ঘরসংসারে বসে চা খাইনি!—বসো, লিউব্‌কা, লক্ষ্মীটি আমার, আজ থেকে ঘরগেরস্থালির ভার নিলে তুমি।—নিজের হাতে চা ঢাল দিকিনি!'

বড্ড যেন বাড়াবাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে লিখোনিন; ঠিক ভরসা পাচ্ছে না বেচারা লিউব্‌কা। তবুও আস্তে আস্তে মনের মেঘ কেটে এল তার, মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার। কিন্তু চা তো ভালো তৈরি করতে জানে না সে। ওদের সেই কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে চা ছিল মস্ত শৌখিন বড়মানুষি খাবার—তা-ও আবার বিশেষ কোনও গণ্যমান্য অতিথি এসে পায়ের ধুলো দিলে, কি পালপার্বণের দিনে, বাড়ির কর্তা নিজে এসে সকলকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে চা খেতে বসতেন। তারপর মফস্বল শহরে এসে লিউব্‌কা শুধু পেটভাতায় যখন প্রথম এক পুরুত-ঠাকুরের বাড়িতে, পরে এক বীমার দালালের ওখানে (ইনিই ওকে প্রথম বেশ্যাবৃত্তির পথে নামান) ঝিগিরির কাজ নেয়, তখন গিন্নিঠাকরুনরা তার জন্যে শেষ-ছাঁকুনির একটুখানি জুড়িয়ে-যাওয়া চা ফেলে রেখে দিতেন শুধু। তাই কাঁচ কাঁচ ছেলেমেয়েরা যেমন ডান-বাঁয়ের তফাত বুঝতে গলদঘর্ম হয়ে ওঠে, চা-তৈরির মতো সিধে কাজটা নিয়েও লিউব্‌কার এখন হল সেই জ্বালা। তার উপর আবার লিখোনিনের হৈ-চৈ-এর ঠেলায় বেচারা আরও ঘাবড়ে যেতে লাগল।

'বুঝলে, লক্ষ্মীটি, চা-তৈরি হল গিয়ে একটা মস্ত বড়ো বিদ্যে! মস্কো থেকে শিখে পড়ে না এলে চলে না—চীনেরা কি চা-তৈরির বোঝে কিছু? আরে, ওরা হল গিয়ে কাফের, শুদ্ধাচারে চা-তৈরির বুঝবে কি?—প্রথমে শুকনো টি-পটটা সামান্য একটু গরম করে নিতে হয় তারপর—' বকবক করেই চলেছে লিখোনিন।

লিউব্‌কার মিষ্টি মুখখানা একটু ম্লান হয়ে আসে, কাতর হয়ে বলে সে—'দোহাই তোমার! রাগ করো না।—চা-তৈরি আমি দুদিনেই শিখে নেব। দেখ, আমি বেশ চটপটে আছি কিন্তু।—আচ্ছা, তোমার নাম তো বাসিল বাসিলিচ্—নয়? আমায় কেন এত পর পর ভাবছ বল তো, বাসিল বাসিলিচ্ আমার? এখন তো আর অচেনা নই আমরা, অ্যাঁ?'

মমতাভরে চায় লিউব্‌কা তার মুখের দিকে। বাস্তবিক, আজই ভোরে, তার এই স্বল্পপরিসর অথচ বিসদৃশ জীবনে এই প্রথম, একজন পুরুষের কাছে দেহদান করেছে সে স্বেচ্ছায়—নিজের দিক থেকে তাতে করে কণামাত্র সুখও সে পায়নি বটে, তবুও কেবল কৃতজ্ঞতা আর অনুকম্পার বশেই স্বেচ্ছায় সে আত্মদান করেছে—অর্থের প্রত্যাশায় নয়, বাধ্যতার বশে নয়, বহিষ্কার বা গোলযোগের ভয়েও নয়—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত আজকের তার এই আত্মদান। তার চির-অম্লান নারী-হৃদয় যা সততই প্রেমের আহ্বানে উৎফুল্ল হয়ে সাড়া দিয়ে ওঠে, সূর্যমুখী যেমন প্রতি-নিয়ত সূর্যের দিকে মুখ না ফিরিয়ে বাঁচে না, এখন তা কানায় কানায় ভরে উঠেছে বিশুদ্ধ মমতায়।

কিন্তু লিখোনিনের হঠাৎ যেন গলায় কাঁটা বেঁধে,—এই-যে একটি মেয়ে, গতকালও যে ছিল তার সম্পূর্ণ অচেনা অজানা, দৈবাৎ সে আজ হয়ে পড়েছে তার রক্ষিতা, সে কথা মনে হতেই কেমন একটা বিদ্বেষ অনুভব করতে থাকে সে মেয়েটির প্রতি। সংসার পাতার সুখ শুরু হল এবার'—কথাটা আপনা থেকেই মনে আসে তার। তবুও চেয়ার ছেড়ে উঠে, লিউব্‌কার কাছে গিয়ে, তার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে তাকে বুকের কাছটিতে; তারপর তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—না বুঝে ছলনা করেই বলে বুঝি—'বাছা আমার, ছোট্ট আদরের বোনটি আমার, কাল রাত্তিরে যা ঘটে গেছে সে আর ঘটবে না কিছুতেই। তার জন্যে সব দোষই আমার; চাও তো বল আমি নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করতে

রাজি আছি সেজন্যে। হঠাৎ যে কি হল, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেমন করে কি যেন একটা হয়ে গেল—একেবারে হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে—বিশ্বাস কর আমায়, বিশ্বাস করো গো লক্ষ্মীটি আমার! আমি নিজে একবারও ভাবতে পারিনি যে এমন একটা কাণ্ড ঘটবে। বিশ্বাস কর, বহুকাল অন্তরঙ্গভাবে কোন নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি।—একটা বীভৎস মূর্তির অসংযত পশু জেগে উঠেছিল আমার মধ্যে—আর—কিন্তু, হা ভগবান! আমার অপরাধ কি তাই বলে এমনই গুরুতর? মনের জোরে সাধুসজ্জন মহাপুরুষদের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না আমার, তবু তাঁরাও রক্তমাংসের দুর্বার প্রলোভন জয় করতে না পেরে পতিত হয়েছেন। তবুও তুমি চাইলে সাক্ষী রেখে শপথ করে বলছি আমি, ও-রকমটি আর কখনও ঘটবে না।—হল এবার?'

কেবলই তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে লিউব্‌কা। ঠোঁট দুটো তার সামান্য একটু বাইরের দিকে ঝুলে পড়ে, অবনত চক্ষুপল্লব কাঁপে থর থর। কচি মেয়েটি যেন—কিছুতেই মানবে না কোন কথা এমনিভাবে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে সে—'হ্যাঁ বেশ, বুঝতে পাচ্ছি, আমায় নিয়ে সুখী হতে পারছ না তুমি কিছুতেই। বেশ তো, সোজাসুজি তাই বলে দাও না কেন তবে, শুধু আমার গাড়িভাড়াটা দিয়ে দাও, আর সামান্য কয়েকটা পয়সা বেশি, এই, যা তোমার খুশি। রাতের মজুরি তো দিয়েই আসা হয়েছে। আমি ফিরে যাই—যেখান থেকে এসেছি সেখানে।'

মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে লিখোনিন, ঘরের মধ্যে লাফাতে লাফাতে বলতে শুরু করে সে—'আহা, তা নয়, তা নয়! একটু বুঝে দেখতে চেষ্টা করো লিউবা! ভোরবেলা যা ঘটে গেছে তাই নিয়েই চলতে গেলে—ও হল পাশবিকতা, আত্মসম্মান-জ্ঞান যার আছে তার পক্ষে অনুচিত কাজ। ভালোবাসা হচ্ছে গিয়ে মন, প্রাণ, চিন্তাধারা, রুচি—এ-সব জিনিসের পরিপূর্ণ মিলন, শুধু দেহের মিলন নয়। ভালোবাসা হচ্ছে এক বিপুল মহান অন্তরাবেগ, নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতির মতোই শক্তিশালী, বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খাওয়া নয়। তোমার আমার মধ্যে তেমন কোন ভালোবাসা নেই, লিউবোচ্‌কা। যদি কখনও তা আসে, তবে তোমার আমার দুজনের পক্ষেই সে হবে অপরিসীম আনন্দের বস্তু। কিন্তু এখন আমি হচ্ছি তোমার বন্ধু, তোমার বিশ্বস্ত সাথী, এই জীবনের পথে। সেই যথেষ্ট, তাতেই সব চলবে—আর, মানসিক দৌর্বল্য থেকে যদিও মুক্ত নই আমি, তবুও নিজেকে আমি সৎলোক বলেই জানি!'

মুষড়ে পড়ে লিউবকা। 'ও বুঝি ভাবছে আমি চাই ও বিয়ে করুক আমায়? কিন্তু তা তো চাইনি আমি একটিবারও।'—বিষণ্ণ হৃদয়ে ভাবে সে, 'এ ভাবেই তো বেশ থাকতে পারা যায়। কতজন তো আছে এভাবে শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে। আর শুনতে পাই বে-থা করার চেয়ে ঢের সুখেই আছে তারা। দোষ কি এতে এমন? শান্তিতে নিরিবিলি ভদ্রভাবে দিন কাটবে—ওর মোজা সেলাই করে দেব, ঘর ধোয়াপোঁছা করব, রান্না করে খাওয়াব—অবিশ্যি সাদামাঠা খাবারগুলো শুধু। একদিন অবিশ্যি ও যাবে বিয়ে করতে কোন-এক বড়লোকের মেয়েকে। তা বেশ, তাই বলে তো আর আমায় ন্যাংটা করে রাস্তায় বের করে দেবে না। একটু বোকা ধরনের বটে ছেলেটি, বকবকও করে বড্ড বেশি, কিন্তু লোকটি বেশ ভালো—তা এক আঁচড়েই বুঝতে পারা যায়। যেমন তেমন করেই হোক তখন একটা ব্যবস্থা আমার জন্যে ও করেই দেবে। আর, কে জানে, হয়ত আমাকে মনেও ধরতে পারে ওর একদিন, সয়েও যেতে পারে আমাকে! তা আমি বাপু, সাদাসিধে মেয়েমানুষ, দুরন্তপনা করতে পারি না, কখ্‌খনও কারও কথায় ভুলে ওর সঙ্গে ছল-চাতুরী খেলব না। লোকে বলে, ওই করেই না কি বাধে যত গণ্ডগোল।—শুধু ওকে এ-সব কিছুটি টের পেতে দেব না। কিন্তু ও ঠিক আবার আমার সঙ্গে শুতে আসবে, হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই আসবে—ভগবান যেমন সত্যি এ-ও ঠিক তেমনি সত্যি।'

লিখোনিনও চিন্তিত হয়ে ওঠে, চুপচাপ বসে বিষণ্ণ মনে ভাবতে থাকে সে—কি ভীষণ গুরু দায়িত্ব নিয়েছে মাথায়, শক্তিতে কুলোলে হয় এখন। হঠাৎ কে যেন এসে বাইরে থেকে দোরে টোকা দেয়; দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে সে, চেঁচিয়ে বলে—'ভেতরে এস।' দুজন ছাত্র এসে ঘরে ঢোকে—সোলোবিয়েব আর নিয়েরাত।

'এই গৃহের অভ্যন্তরভাগে'—ঢুকতে ঢুকতেই আর্চডীকনের ভঙ্গিতে তামাশা শুরু করে দেয় সোলোবিয়েব—'যেখানে এ'রা সবাই সদ্ভাবে, শান্তিতে, নিষ্পাপে বসবাস করে আসছেন—', কিন্তু সুর মেলে না। তবুও মাঠে-মারা-যাওয়া তামাশাটাকে টেনেবুনে বজায় রাখবার জন্যে বলতে থাকে সে—'গুরুদেবগণ—কিন্তু এ কি! এ যে দেখছি—দেখছি—আঃ, কি পাপ—এ যে হল সোনিয়া। নাঃ, আমারই ভুল—নাদিয়া—অ্যাঁ, ঠিক হয়েছে!—লিউবা, আনা মারকোব্‌নার বাড়ির লিউবা—ঠিক—!'

লজ্জায় কান অবধি গরম হয়ে ওঠে লিউবার, চোখে এসে যায় জল, দু হাতে মুখ ঢাকে বেচারা। লিখোনিন ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কড়া ভাবে থামিয়ে দেয় সোলোবিয়েবকে—'ঠিকই বলেছ, সোলোবিয়েব। ঠিকুজির ভুল হয়নি তোমার। ইয়াম্‌কার লিউব্‌কাই বটে। আগে ছিল বেশ্যা। তাই বা কেন? কাল পর্যন্তও ছিল তাই, কিন্তু আজ থেকে—আমার বন্ধু, আমার বোন। আমি চাই আমার ওপরে যাদের সামান্য একটু আস্থাও আছে তারা সবাই যেন এই চোখেই দেখে ওকে। নইলে—'

'ব্যস, ব্যস, ভাই! ঢের হয়েছে'—মোটকা সোলোবিয়েব চট করে এসে লিখোনিনকে জড়িয়ে ধরে বুকের ভিতর—'ঝোঁকের মাথায় একটা বোকামি করে ফেলেছি। আর হবে না। এস আমার দুঃখিনী বোন!' বলে লিউব্‌কার দিকে হাত বাড়িয়ে তার ছোট্ট কচি হাতখানা সজোরে চেপে ধরে সে—'আমাদের এই ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছ, সে ভালোই হয়েছে। আমাদের ছন্ন-ছাড়া জীবনে শ্রী ফিরে আসবে আবার, আদবকায়দা সভ্যভব্য হয়ে উঠবে।—আলেকজান্দ্রা, বী-য়ার।'—চেঁচামেচি বাধিয়ে দেয় সে, 'আমরা অসভ্য বর্বর হয়ে উঠেছি, খিস্তিখেউড়, মাতলামো, কুড়েমি, কত রকমের দোষে ডুবে আছি। আর তার একমাত্র কারণ হল নারী-সাহচর্যের অভাব। আবার তোমার হাতে হাত মেলাচ্ছি—তোমার ছোট্ট সুন্দর হাতখানিতে।—বী-য়ার।'

'আসছি, আসছি,'—দরজার বাইরে থেকে আলেকজান্দ্রার অসন্তুষ্ট গলা শোনা যায়—'চেঁচিয়ে মরছ কেন? ক-বোতল চাই, অ্যাঁ?'

সোলোবিয়েব সে-কথা বুঝিয়ে বলবার জন্যে বারান্দায় উঠে যায়। খুশি হয়ে তার দিকে চেয়ে হাসে লিখোনিন। সে-ও যাবার পথে বন্ধুভাবে লিখোনিনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে যায়। আর দু-জনও বুঝতে পারে সোলোবিয়েবের চক্ষুলজ্জার মর্ম।

'কাজের কথায় এস এখন সব,' ফিরে এসে সাবধানে একখানা মান্ধাতার আমলের চেয়ারের উপরে বসে বলতে শুরু করে সোলোবিয়েব—'আমায় দিয়ে তোমাদের কোন উপকার হতে পারে কি? শুধু আধঘণ্টা সময় দাও আমায়, কফিখানায় গিয়ে একেবারে ওখানকার সেরা দাবাড়েকে এক মিনিটে সাবড়ে দিয়ে আসি তাহলে। এক কথায়, আমি এখন তোমাদের হুকুমের গোলাম।'

সোলোবিয়েবের হরেক রকম গুণের মধ্যে এ-ও ছিল একটা—দাবা-খেলায় তার জুড়ি ছিল না। অতি-বড় পেশাদার দাবাড়েরও তার সামনে হৃৎকম্প উপস্থিত হত—এ যেন ছিল তার আজন্মের সহজাত সংস্কারের মতন। অথচ খেলায় তার স্পৃহা ছিল না মোটেই। খেলত সে শুধু বন্ধু-বান্ধবদের তাগিদে। কি অপর কারও গরজে।

'ভারি মজার লোক তো আপনি।'—একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে হাসতে হাসতে বলে ওঠে লিউব্‌কা। সোলোবিয়েবের খোশমেজাজি চাল আর কথাবার্তা বলবার

অদ্ভুত ধরনটা ও ঠিক মনের মধ্যে মেনে নিতে না পারলেও, ছেলেটির মধ্যে কি যেন একটা ওর সরল প্রাণকে তার দিকে টানতে থাকে।

'থাক, থাক! এখন তার কোন দরকার নেই,' উত্তর দেয় লিখোনিন, 'এখনও বেড়ে শাঁসালো আছি আমি। বরঞ্চ চল, এখন কোন একটা আড্ডাখানায় গিয়ে বসি গে যাই। তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু শলাপরামর্শ আছে। যাই হোক না কেন, তোমরাই হলে এখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর দেখতে যতটা সাদাসিধে বোকা বলে মনে হয় তা নও মোটেই। তারপর আমাকে বেরুতে হবে ওর একটা ব্যবস্থা করতে—মানে, লিউবার পাশপোর্টখানার তদ্বিরে। আমার জন্যে ততক্ষণ তোমরা বসে অপেক্ষা করো। দেরি হবে না তেমন। এক কথায়, বুঝতেই তো পারছ এখন, কাজটা কি ধাঁচের, হাসি-তামাশা করে সময় নষ্ট করবার ফুরসত নেই এখন। আমি চাই,'—আবেগে গলা কেঁপে ওঠে লিখোনিনের, নিজেরই সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে না তো সে?—'আমি চাই তোমরাও আমার এ দায়িত্বের ভাগ নাও কিছু। নেবে তো?'

'আলবাৎ!' তাল ঠুকে বলে ওঠে প্রিন্স (কিন্তু শোনায় যেন 'বুর্বাক'!), আর কি জানি কি ভেবে লিউব্‌কার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে চেয়ে গোঁফে চাড়া দিতে থাকে সে। চোখের কোণে চেয়ে দেখে লিখোনিন প্রিন্সের দিকে। সোলোবিয়েব কিন্তু সরল প্রাণেই বলে, 'তাই ঠিক। একটা খুব বড় রকমের কাজে হাত দিয়েছ তুমি, লিখোনিন। প্রিন্স রাত্তিরেই বলেছে আমায় সব কথা। বেশ তো, ক্ষতিটা কি এতে? তারুণ্য রয়েছে কিসের জন্যে তবে—সৎকাজে ছেলেমানুষিই না করলে যদি?—বোতলটা আমার হাতে দাও, আলেকজান্দ্রা, আমিই খুলছি—তুমি খুলতে গেলে বিপদ বাধিয়ে বসবে শেষটায়।—নবজীবনের পথে, লিউবোচ্‌কা, থুড়ি—লিউবোব—লিউবোব—'

'নিকোলোব্‌না। যাক, যা মুখে আসে তাই বলেই ডাকবেন আমায়—লিউবা, লিউবাই সই।'

'তাই বেশ, লিউবা। এস তবে, প্রিন্স আলিবর্দী!'

'জয় হোক।'—বলে দুজনে গেলাস ঠোকাঠুকি করে বীয়ারে চুমুক দিতে শুরু করে। তারপর গেলাসখানা হাত থেকে নামিয়ে রেখে জিভ দিয়ে গোঁফের ডগা চেটে নিয়ে বলতে থাকে সোলোবিয়েব, 'আর এও বলছি, ভাই লিখোনিন, তোমার জন্যে গর্ব হচ্ছে আমার; নমস্কার তোমায়! তুমি, শুধু তুমি ছাড়া, আমাদের মধ্যে আর কেউই এমন নিরহঙ্কার—অনর্থক বাগাড়ম্বর না করে, সত্যিকারের রুশীয় বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে পারত না।'

'থাক, থাক!—এর মধ্যে বীর্যবত্তাটা আবার দেখতে পেলে কোথায়?'—বিরস মুখে বলে লিখোনিন।

'বটেই তো।'—সায় দেয় নিয়েরাত, 'তুই খালি বলিস আমিই নাকি রাতদিন আবোলতাবোল বকে থাকি, দেখ দিকিনি, নিজেই এখন কেমন বাজে বকতে শুরু করেছিস!'

'ও কিছু নয়!'—জবাব দেয় সোলোবিয়েব, 'এর চেয়ে ঢের ঢের লম্বাচওড়া হলেও তাতে কিছু এসে যেত না আজ! যাক, আমাদের এই চিলেকুঠী-সঙ্ঘের একজন প্রবীণ সদস্য হিসেবে আমি এই সর্বসমক্ষে ঘোষণা করছি যে, আজ থেকে লিউবা অত্র সঙ্ঘের একজন মাননীয়া সদস্যার পদে বৃতা হলেন।' তারপর সোজা উঠে এসে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে, কথার মধ্যে খুব খানিকটা দরদ ঢেলে দিয়ে বলে ওঠে সেঃ

'শূন্য এ ভবনে আজি দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন,
এস এস গৃহলক্ষ্মী, হও সমাসীন।'

লিখোনিনের মনে পড়ে যায়, আজ ভোরে সে নিজেও ঠিক এই কথাগুলোই আবৃত্তি

করে নাটকীয় ভঙ্গিতে লিউব্‌কাকে এনে ঘরে তুলেছিল। লজ্জায় চোখ বোঁজে বেচারা।

'থাক, থাক, ঢের হয়েছে; আর ভাঁড়ামি করতে হবে না। আসুন তবে ভদ্র-মহোদয়গণ! সাজগোজ সেরে বেরুবে চল, লিউবা।'

১৪

সেখান থেকে দূরে নয় ছাত্রদের খানাঘর, 'চড়াই পাখীর নীড়,' শ-দুয়েক পায়ের মধ্যেই। হাঁটতে হাঁটতে লিউব্‌কা সবার অগোচরে খালি টানছে লিখোনিনের জামার হাতা ধরে, আর তাই করে করে ওরা দুজন পড়েছে দলছাড়া হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে। সোলোবিয়েব আর নিয়েরাত চলেছে আগে আগে।

'সত্যি সত্যিই ঠিক করেছ তবে, বাসিল বাসিলিচ্ লক্ষ্মীটি আমার?' মমতাভরা কালো চোখ দুটি তুলে চায় লিউব্‌কা তার মুখের দিকে। 'আমায় নিয়ে তামাশা করছ না তাহলে?'

'তামাশার কি থাকতে পারে এতে, লিউবোচ্‌কা? আমি কি নরাধম যে তামাশা করতে যাব এমন একটা ব্যাপার নিয়ে? আবার বলছি আমি, আমি তোমার বন্ধু, ভাই, সাথী, সবার বাড়া। যাক, এ নিয়ে আর বেশি কথা বলে লাভ কি? তবে আজ ভোরের দিকে যা ঘটে গেছে সে আর কখনও ঘটবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তুমি। আজই আমি তোমার জন্যে আলাদা একখানা ঘর ভাড়া করছি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে লিউব্‌কা। অবশ্য লিখোনিনের সাধু সংকল্পের কথায় ক্ষুণ্ণ হয় না সে,—সত্যি কথা বলতে কি, এ-বিষয়ে বিশেষ কোন আস্থাও নেই ওর। ওর অন্ধ সংকীর্ণ অন্তরে একথা ও কখনও ধারণাই করতে পারে না যে, নরনারীর পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে এক সম্ভোগ ছাড়া আর-কিছু আবার থাকতে পারে। এ ছাড়া জীবনে ও শুধু অনুভব করেছে গৃহীতা বা পরিত্যক্তা নারীর আদিম অসন্তোষ। আনা মারকোবনার বাড়িতে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে এ মনোভাব; সম্প্রতি তা নির্জীব হয়ে পড়লেও, ক্রোধ আর আন্তরিকতার অভাব নেই তার মধ্যে; সময় সময় গর্বিত প্রতিযোগিতার রূপ ধরে তা আত্মপ্রকাশও করে থাকে সেখানে। এই যে সোলোবিয়েব—লিউবার চেনা আর পাঁচজন ছাত্রের মতো বৈঠকখানা ঘরে সবার সামনে, কি, শুধু মেয়েদের সম্মুখেই, মেয়েছেলেদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, যদিও সে এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে,—তবুও তাকে বরঞ্চ বুঝতে পারে লিউব্‌কা—বিশ্বাসও করতে পারে অনায়াসে—স্বেচ্ছায়ই যেন। চোখেমুখে মাখানো রয়েছে ওর কেমন একটা হাসিখুশি ভাব, আন্তরিক সরলতা।

'চড়াইয়ের নীড়ে' কিন্তু লিখোনিনের খুব খাতির, কারণ তার মতো ধীরস্থির, দেনা-পাওনা নিয়ে হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ না-করা ছেলে, ছাত্রদের মধ্যে বড়ো-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই তাকে নিয়ে খাতির করে একটা আলাদা কুঠরিতে বসানো হল। সেখানে গিয়ে বসবার পথে হঠাৎ শিমানোব্‌স্কী নামে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই তাকেও সঙ্গে নিতে হল। 'আমায় নিয়ে সঙ্ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি?'—মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবে লিউব্‌কা। সামান্য একটু ফাঁক পেয়ে লিখোনিনের কানে কানে বলে বেচারী, 'এত লোক ঢোকাচ্ছ কেন গো, লক্ষ্মীটি! লজ্জা করছে যে আমার। ভিড় সইতে পারি না আমি।'

'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়, বোন'—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে লিখোনিন, 'এরা সব চমৎকার লোক, বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব। ওরা তোমায় সাহায্য করবে, আমাদের দুজনকে

সাহায্য করবে। মাঝেমাঝে ঠাট্টা-তামাশা করবে, গ্লগাল ছাড়বে, রাগ করো না তাতে। মন কিন্তু ওদের সব খাঁটি সোনা।'

'তবুও ভারি অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আমার; লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ওরা সব্বাই জানে কোত্থেকে তুমি কুড়িয়ে এনেছ আমায়।'

'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। কেন, জানলেই বা সব।'—সস্নেহে বলতে থাকে লিখোনিন, 'পুরোনো কথা ভেবে ঘাবড়াচ্ছ কেন এত? লুকিয়ে কি হবে? এক বচ্ছরের মধ্যেই দেখো সব সঙ্কোচ কেটে যাবে তোমার, লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবে তুমি—'হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।' এস, ভেতরে এস, লিউবোচ্কা।'

পরিবেশন শুরু হয়; যার যা খুশি সে তাই ফরমাশ করতে থাকে; তবুও এক শিমানোব্স্কী বাদে আর সবার মনের মধ্যেই কেমন একটা অস্বস্তির ভাব যেন। অবশ্য ওই শিমানোব্স্কীর উপস্থিতিটাই হচ্ছে এর একটা কারণ। ফিটফাট ছোকরাটি, গোঁফ-দাড়ি কামানো, ঝাঁকড়া চুল, পাঁশ-নে চোখে, হামবড়া ভাব—যেন মস্ত কেউকেটা লোক একজন। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে কেউ নেই তার, কিন্তু ছাত্ররা সবাই বেশ সমীহ করে চলে তাকে, মূল্য দেয় তার মতামতের। কেন তা কেউই বোঝে না বটে, কিন্তু আসলে সে হচ্ছে গিয়ে ওর ওই সবজান্তা মুখভঙ্গি আর হামবড়া ভাবের জন্যেই।

খাওয়া-দাওয়া যখন মাঝপথে এসে পে'ৗছেছে তখন এক এক করে মুখ ফুটতে লাগল সবার; শুধু এক লিউব্কাই রইল চুপচাপ বসে। কথাবার্তার জবাবে সংক্ষেপে 'হাঁ', 'না' দিয়েই কাজ সারতে লাগল, খাবার-দাবারও ছু'ল না প্রায় কিছুই। সবচেয়ে বেশি বকবক করতে লাগল লিখোনিন, সোলোবিয়েব, আর নিয়েরাত। লিখোনিন কথা বলছে বিচক্ষণ কাজের লোকের মতো, সাগ্রহ বাক্যবিন্যাসের মধ্যে কি যেন একটা বাস্তব, গোপন, অস্বস্তিকর, বেদনাদায়ক তথ্য চাপা দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সে। সোলোবিয়েব ছেলেমানুষের মতো খুশিতে মেতে উঠছে, কথা বলতে বলতে উল্লাসের আতিশয্যে থেকে থেকে টেবিল চাপড়াচ্ছে সে; আর নিয়েরাত কথা বলছে কেমন একটা সংশয় নিয়ে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কি ভেবে ফিরে চাইছে শিমানোব্স্কীর মুখের দিকে। নিজে কিন্তু সে বিশেষ মতামত প্রকাশ করছে না, শুধু হামবড়া ভাব নিয়ে মাথা তুলে পাঁশ-নের ভিতর দিয়ে এর-ওর দিকে চোখ তুলে চাইছে বারবার।

শেষে টেবিলের উপর আঙ্গুল ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল সে, 'তো, লিখোনিন যা করেছে তা বেশ চমৎকার, সৎসাহসের কাজই বলতে হবে। আর এই যে প্রিন্স আর সোলোবিয়েব তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে এ-ও খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি বলি কি, আমাদের বান্ধবীকে তাঁর নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী চলতে দেওয়াই কি ঠিক নয়?' তারপর লিউব্কার দিকে ফিরে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বল দেখি, বাছা, কি জান তুমি, কি কি রকম কাজ করতে পারবে? এই ধর যেমন সেলাই, বোনা, এম্ব্রয়ডারি, কি এই রকমের আর-কিছু?'

রাঙা হয়ে ওঠে লিউব্কা; চোখ নিচু করে টেবিলের তলায় আঙ্গুল মোচড়াতে মোচড়াতে চাপা গলায় জবাব দেয়, 'ও-সব কিছু জানি না।'

হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে লিখোনিন, 'আমরা যে ভুল পথে চলেছি হে সব! ওরই সামনে ওর বিষয় আলোচনা করে ভারি অস্বস্তিতে ফেলেছি ওকে। দেখ দিকিনি—লজ্জায় কথা কইতে পারছে না বেচারা। ওঠো লিউব্কা, তোমায় বাড়ি পে'ৗছে দিয়ে আছি গে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে আসব। তারপর কথাবার্তা হবে'খন। কেমন?'

'আমার জন্যে ভেব না কিছু,'—অস্পষ্ট স্বরে জবাব দেয় লিউব্‌কা 'যা বলবে তাই করব আমি, বাসিল বাসিলিচ্‌। শুধু আমার এখন বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন?'

'সেখানে একা একা কেমন লাগবে। আমি না হয় পার্কে ঢোকবার রাস্তায় কোন-একটা বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করি গে ততক্ষণ।'

'ওহো, বুঝতে পেরেছি!'—মনে পড়ে যায় লিখোনিনের, 'আলেকজান্দ্রার জন্যে ভয় করছে বুঝি। দাঁড়াও, বুড়ী হতভাগীকে দেখাচ্ছি মজা! তা হোক, চল যাই, লিউবোচ্‌কা!'

বেচারী উঠে ভয়ে ভয়ে সকলের দিকে হাত বাড়ায়; তারপর লিখোনিনের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসে লিখোনিন। ওর অনুপস্থিতিতে বন্ধুরা মিলে যে ওর কথা আলোচনা করেছে তা ভেবে ভারি অস্বস্তি বোধ হতে থাকে ওর। খানিকক্ষণ সকলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইবার পর, টেবিলে হাত রেখে বলে সে—'তোমরা সবাই আমার বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু,'—আড়চোখে চট করে একবার শিমানোব্‌স্কীর দিকে চেয়ে নেয়, 'তা ছাড়া সবাই দায়িত্বশীল ভদ্রলোকও বটে। আমি তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা করছি। স্বীকার করি যে, কাজটা করে বসেছি ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়েই করেছি।'

'সেটাই তো আসল কথা' কথার পৃষ্ঠে বলে ওঠে সোলোবিয়েব।

'চেনা-অচেনা লোকেরা সব এর জন্যে কি বলবে না-বলবে সে কথা ভাবি না। কিন্তু মেয়েটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য—মাপ কর, এত বড় কথাটা মুখ থেকে চট করে বেরিয়ে গেল বলে—মেয়েটিকে উৎসাহ দিতে, বেঁচে উঠতে সাহায্য করতে, কখনও পেছ-পা হব না আমি। অবশ্য আমি ওর জন্যে সস্তায় ছোটখাট একখানা ঘর ভাড়া করতে পারি, আপাতত খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও করতে পারি; কিন্তু তারপর? তারপর কি করা যেতে পারে সে-ভাবনাই কঠিন হয়ে উঠেছে আমার কাছে। টাকাকড়ির কথা নয়, সে আমি যেমন করে হোক যোগাড় করতে পারব দরকার মতো,—কিন্তু বসে বসে শুধু খাওয়া-দাওয়া করবে, কাজকর্ম কিছুই করবে না, এভাবে থাকতে বাধ্য হলে বেচারাকে কুঁড়েমিতে পেয়ে বসবে, উৎসাহ উদ্যম সব হারিয়ে বসে থাকবে। আর তার ফল কি হতে পারে সে তো জানাই আছে তোমাদের। তাই ওকে এখন কি কাজ দেওয়া যায় সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। একটু চিন্তা করে দেখ, ভাইসব; যা-হোক একটা কিছু পরামর্শ দাও।'

'ও কি কাজ করতে পারবে আগে সেটা জানা দরকার,'—উত্তর দেয় শিমানোব্‌স্কী, 'ওখানে এসে ঢোকবার আগে একটা-না-একটা কিছু করত নিশ্চয়ই।'

হতাশার ভঙ্গিতে দু হাত বাড়িয়ে বলে লিখোনিন, 'সে কিছুই নয়। সামান্য একটু-আধটু সেলাই-ফোঁড়াই জানে শুধু—পাড়াগাঁয়ের মেয়েছেলে মাত্রই যেমন জানে। আর বল কেন, বেচারা তখনও পনের বছর পেরোয়নি, এমন সময় এক সরকারি কেরানী ওকে বার করে আনে। ও শুধু জানে ঘর ঝাঁট দিতে, ধোয়া-মাজা করতে, আর যদি চাও তো সামান্য এটা-সেটা রেঁধে দিতে! আর-কিছু নয়, বোধ হয়।'

'এ আর এমন কি!' জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে শিমানোব্‌স্কী।

'তার ওপর আবার নিরক্ষর।'

'এ আর এমন বড় কথা কি!' বলতে লাগল সোলোবিয়েব, 'আরে, যদি একটি সুশিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে, কিংবা, তার চেয়ে আরও খারাপ, যদি একটি অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীকে নিয়ে কারবার করতে হত আমাদের, তবে আমরা যা করতে চাইছি তাতে ফল হত হিতে বিপরীত—একেবারে মাঠে মারা যেত সব চেষ্টা। এখানে বরং আমরা পেয়েছি আ-ফলা ক্ষেত, আ-ছোঁয়া, আ-চষা জমি।'

'হিঃ-হিঃ!'—দুদিকেই তাল রেখে হাসতে শুরু করে দেয় নিয়েরাত।

সোলোবিয়েব কিন্তু তামাশা করেনি, তাই একেবারে খেপে গিয়ে প্রিন্সের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন, 'শোনো প্রিন্স, যে-কোন বিশুদ্ধ ভাব, যে-কোন শুভকর্মকে বিসদৃশ অশ্লীল করে তোলা যেতে পারে। তাতে কোন মুন্সিয়ানা নেই। আমরা যা করতে চাইছি, তা নিয়ে যদি জানোয়ারের মতো অমন দাপাদাপি কর তো সিধে পথ দেখতে পার।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি নিজেও তো একটু আগে ঘরের মধ্যে—,' অপ্রতিভ হয়ে জবাব দেয় প্রিন্স।

সঙ্গে সঙ্গেই রাগ পড়ে যায় সোলোবিয়েবের; বেশ মোলায়েম হয়ে বলে সে, 'তা, হ্যাঁ, বোকার মতো নেচে উঠেছিলাম বটে, সে জন্যে দুঃখিত আমি। এখন সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি যে, লিখোনিন চমৎকার ছেলে, মহাপ্রাণ ব্যক্তি। আমার দিক থেকে সব কিছু করতেই রাজি আমি। ফের বলছি, লিখতে আর পড়তে জানাটা হল গৌণ বিষয়। খেলাধুলোর ভেতর দিয়েই তা শিখে ফেলতে পারা যায়। আর এই রকমের নিপাট মন দিয়ে, ইস্কুলে না গিয়ে, স্বেচ্ছায় লিখতে পড়তে আর হিসেবপত্তর রাখতে শেখা হচ্ছে গিয়ে পানসুপুরি চিবিয়ে খাবার মতোই সিধে কাজ। তবে হ্যাঁ, একটা কিছু হাতের কাজ শেখা দরকার, যাতে করে পেট চালাবার ব্যবস্থা হতে পারে। তা সে কত রকমের কাজই তো রয়েছে হে, তার যে-কোন একটা আয়ত্ত করতে দু-হপ্তার বেশি লাগে না।'

'যথা?' জিজ্ঞেস করে প্রিন্স।

'এই ধর যেমন—ধর যেমন—বেশ তো, ধরই না ওই নকল ফুল তৈরির কাজ। হ্যাঁ, তার চেয়েও ভালো হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই ফুলের দোকানে হিসেবপত্তর রাখার কাজ। চমৎকার কাজ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

'রুচি থাকা চাই,'—নিস্পৃহভাবে বলে শিমানোবৃস্কী।

'রুচিই বল আর ক্ষমতাই বল, জন্মগত নয় কিছুই। নইলে মনীষার উদ্ভব দেখতে পেতে শুধু সুশিক্ষিত ভব্য সমাজে; আর চিত্রকর জন্মাত শুধু চিত্রকরের ঘরেই, গায়ক জন্মাত গায়কের ঘরে। কিন্তু তা তো দেখতে পাই না আমরা। যাক গে, তর্ক করতে চাই না। বেশ তো, ফুলওয়ালী না হোক, আরও তো কত কি রয়েছে। ধর, এই বেশিদিন আগে নয়, একটা দোকানে আমি দেখেছি একটি মেয়েকে ছোট্ট একটা পা-দিয়ে-চালানো কল নিয়ে বসে কাজ করতে।'

'বাব্বা! আবার সেই কল!' হেসে ফেলে প্রিন্স।

'চুপ কর, নিয়েরাত!'—শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে লিখোনিন, 'লজ্জা নেই তোমার!'

'আহাম্মক কোথাকার।' ধমক দিয়ে ওঠে সোলোবিয়েব। তারপর বলতে থাকে সে, 'কলটা সামনে-পেছনে চলে, আর একটা চৌকো মতন পাটাতনের ওপর পাতলা ক্যাম্বিশের টুকরো বিছিয়ে, তার ওপর মেয়েটা কি-একটা-যেন কল চালিয়ে দিচ্ছে ঠিক ধরতে পারলাম না, আর কি করে যেন রঙ-বেরঙের ছাপা সিল্ক তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে তা থেকে—কত রকমের ডিজাইন—পুকুরে ফুল ফুটেছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে, এই রকম কত কি, একেবারে জীবন্ত ছবি সব! তাই ইচ্ছে করেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কলটার দাম কত। শুনলাম দাম এই এমনি সেলাই-এর কলের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি হবে, তবে কিস্তিবন্দীতেও কিনতে পারা যায়। আর যারাই সেলাই-এর কল একটু-আধটু চালাতে জানে তারাই অনায়াসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এটা চালাতেও শিখে নিতে পারে। নানান রকমের নতুন নতুন ডিজাইনও পাওয়া যায়। আর পর্দা, আলোর ঢাকনা, অ্যালবাম, এই রকমের ছাই-পাঁশের জন্যে বিক্রিও হয় খুব, পয়সাও আছে মন্দ নয়।'

'তা এ-ও একটা ব্যবসা বটে,'—দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তিতভাবে বলে লিখোনিন। 'তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভেবেছিলাম ওকে একটা খুব ছোট মতন খাবারের দোকান করে দেব—সস্তা অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ছাত্রদের অনেকেরই তো খাওয়া-দাওয়ার কোন বাছবিচার নেই; তা ছাড়া তাদের খাবার জায়গারও দস্তুরমতো অভাব রয়েছে। তাই একটু চেষ্টাচরিত্র করলেই হয়ত আমাদের চেনাশোনা সব ছাত্রকেই সেখানে ভিড়িয়ে আনতে পারব।'

'তা ঠিক,'—সায় দেয় প্রিন্স, 'তবে সে হবার নয়। জানই তো আমরা সবাই খেতে আরম্ভ করব ধারে, আর আমরা সব কি মেকদারের খদ্দের সে তো জানাই রয়েছে। এ-কাজ চালাতে হলে চাই ধড়িবাজ গোছের লোক। আর সে যদি মেয়েছেলে হয়, তবে তার থাকা চাই শানিত ক্ষুরধার জিহ্বা, তবুও তার পেছনে থাকা দরকার একজন ব্যাটা-ছেলের। সত্যি বলতে কি, লিখোনিন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে চোখ রাখতে পারবে না, কখন কে এসে দিব্যি আরামে খেয়ে-দেয়ে সুড়ুৎ করে গা-ঢাকা দিয়ে পালাল।'

লিখোনিন তার দিকে, কঠোর দৃষ্টিতে চায় কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁশ-নেটা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে ধীরে সুস্থে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে, বলতে শুরু করে শিমানোবস্কী, 'তোমাদের উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ সে-বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ কি তোমরা? খাবারের দোকান খুলতে গেলে, কি অন্য কোন ব্যবসা চালাতে হলে চাই টাকা, চাই অপরের সহায়তা—এক কথায় পৃষ্ঠপোষকতা। বেশ, টাকার না হয় ব্যবস্থা হল—সে বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত, লিখোনিন। কিন্তু এভাবে গোড়া থেকেই সব রকম ব্যবস্থা করে আঁটঘাট বেঁধে দিয়ে, ব্যবসায় নামালে তার ফল কি হতে পারে—ওই গা-ঢিল দেওয়া, অবহেলা, আর শেষ অবধি ব্যবসার উপরেই বিতৃষ্ণা এসে যাওয়া ছাড়া? 'হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।' নাঃ, যদি বেচারী মেয়েটাকে তোমরা সত্যিই সাহায্য করতে চাও তবে এখুনি যাতে ও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে তার ব্যবস্থা কর।'

'তবে এখন ও কি করবে তোমার মতে?'—অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে সোলোবিয়েব, 'বাসনপত্তর মাজাঘষার কাজ?'

'নয়ই বা কেন?'—শান্তভাবে জবাব দেয় শিমানোবস্কী, 'বাসন-পত্র মাজা, কাপড়-চোপড় কাচা, রান্না-বাড়া করা, এই সব। শ্রমের দ্বারা মানুষ উন্নতই হয়ে ওঠে হে।'

মাথা নাড়ে লিখোনিন, 'খুব খাঁটি কথা। জ্ঞানীর মতোই কথা বলছে শিমানোবস্কী। বাসন-পত্তর মাজাঘষা, রান্না-বাড়া করা, ঝি-এর কাজ, ঘর-সংসার দেখা—কিন্তু, প্রথম কথা হচ্ছে. এ-সব কাজ ওকে দিয়ে হবে কিনা সন্দেহ; দ্বিতীয় কথা, এর আগে ঝি-এর কাজ ও করে এসেছে, আর তাতে করে মনিবদের লম্বাচওড়া বোল-চাল, দোরের আড়ালে, কি খোলা বারান্দার ফাঁকে তাঁদের হাত-টিপুনি, এ-সব জিনিসের যে কি সুখ তা-ও চোখে দেখে আসতে হয়েছে বেচারাকে। কেন, তোমার কি এ-কথা জানা নেই যে, এই ঝি-দের মধ্যে থেকেই শতকরা নব্বই জন বেশ্যাদের দলে ভিড়ে থাকে? তাই একেবারে প্রথম ধাক্কাতেই বেচারী লিউবা আবার তাহলে ফিরে যাবে যেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছি সেখানে—যদি তার চেয়েও অবশ্য খারাপ কিছু না ঘটে। কারণ ওটা তো ওর কাছে এক রকম গা-সওয়াই হয়ে গেছে, এমন কিছু ভয়ের কথা বলেও মনে হবে না তখন। চাই কি মনিবঠাকুরের ব্যবহারের পর ওটাই বরং পছন্দসই বলেও মনে হতে পারে ওর কাছে। আর এতখানি চেষ্টাচরিত্র করে একটা প্রাণীকে এক নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে আনার পর তাকে আর-একটা নরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া কি উচিত হবে আমাদের?'

'ঠিক!' সায় দিয়ে ওঠে সোলোবিয়েব।

'যা ভালো বোঝ কর তবে।'—অবহেলাভরে জবাব দেয় শিমানোব্‌স্কী।

'তবে আমার কথা বলতে গেলে,'—আরম্ভ করে প্রিন্স, 'বন্ধু হিসেবে আর কৌতূহলবশতও বটে, এ পরীক্ষার ফলাফল জানতে আর তাতে যোগদান করতে আমি প্রস্তুত আছি। তবে আজও ভোরে তোমায় আমি সাবধান করে দিয়েছি, লিখোনিন, আর এখনও বলছি যে, এ-রকম পরীক্ষা এর আগেও ঢের ঢের হয়ে গেছে, আর তার সব ক-টাই—অন্তত ব্যক্তিগতভাবে যে-ক-টার খবর রাখি আমরা সে-ক-টা কেলেঙ্কারিতে পর্যবসিত হয়েছে। আর যে-ক-টার খবর আমরা এর-ওর মুখে শুনেছি শুধু, সেগুলোর যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। তবে তুমি যখন কাজটায় হাত দিয়েইছ তখন চালিয়ে যেতে থাক—আমরাও রয়েছি তোমার পেছনে।'

টেবিলে একটা চড় মেরে বলে ওঠে লিখোনিন, 'না! শিমানোব্‌স্কীর কথাও অনেকটা ঠিক—কাউকে 'হাঁটি-হাঁটি-পা-পা' করে হাত ধরে নিয়ে বেড়ানোয় বিপদ আছে। তাই বলে আর কোন পথও তো খুঁজে পাচ্ছি না। প্রথমে আমি ওর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব, যা হোক একটা সহজ দেখে কাজের ব্যবস্থাও করে দেব, দরকারী মালমসলা কিনে এনে দেব। তারপর দেখা যাক কি হয়। আর ইতিমধ্যে ওর সামান্য একটু শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করা দরকার। ওর অন্তঃকরণটি কিন্তু ভারি সুন্দর। এ-বিশ্বাসের মূলে কোন যুক্তি নেই আমার, তবে আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত, অনেকটা যেন প্রত্যক্ষই করেছি বলা চলতে পারে।—এই নিয়েরাত! ভাঁড়ামি নয়! চুপ!'—বিবর্ণ হয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন, 'ঢের সয়েছি তোর পেজোমি। এতদিন জানতাম তোর সদ্বিবেচনা আছে, হৃদয় আছে। ফের যদি অসভ্যের মতো রসিকতা করিস তো তোতে-আমাতে চিরকালের মতো এখানেই শেষ!'

'আরে, এই কোন কিছু ভেবে বলিনি ভাই—সত্যি, আমি—আরে একেবারে ফোঁস করে উঠলি যে? বেশ, আমি একটু ফুর্তি করি তা যদি না চাস তো এই আমি চুপ করলাম। দে ভাই, দেখি তোর হাতখানা, লিখোনিন। আয়, এক চুমুক খাওয়া যাক তবে।'

'বেশ, বেশ, আর লাগিস না আমার পেছনে। এই যে, তোর কল্যাণ হোক! শুধু ফের ছেলেমানুষি করিস না বুড়ো মেড়া কোথাকার! হ্যাঁ, যা বলছিলাম, শিমানোব্‌স্কী যেমন যথার্থই বলেছে, যদি তেমন কোন ব্যবস্থা করা যায় যাতে করে ওকে কারও গলগ্রহ হয়ে না থেকে ও নিজেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করব না। যা যা শেখানো যেতে পারে তার সব-কিছুই শেখাব ওকে; থিয়েটারে নিয়ে যাব, কথকতা, বক্তৃতা, যাদুঘর সর্বত্র নিয়ে বেড়াব; পড়ে শোনাব, গানবাজনা শোনবার আর শুনে তা বুঝতে শিখতেও সাহায্য করব। অবশ্য একা আমি অত শত করে উঠতে পারব না; তোমাদেরও সাহায্য চাই। তারপর ভগবান যা করেন।'

'তা বেশ!'—সায় দেয় শিমানোব্‌স্কী, 'কাজটা নতুনই বটে, পুরোনো একঘেয়ে নয়। তা অজানাকে জানব আমরা কি ক'রে—কে জানে তুমি লিখোনিন, হয়ত কালে একটি মুমুক্ষু প্রাণীর মুক্তিপথের গুরু হয়েই দাঁড়াবে! আমিও ওতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।'

'আমিও! আমিও!—অপর দু-জনও সোৎসাহে বলে ওঠে। তারপর সেই টেবিলে বসেই ছাত্র চারজন মিলে লিউব্‌কার শিক্ষাদীক্ষার জন্যে এক অভূতপূর্ব বিরাট কর্মপন্থা স্থির করে ফেলল।

•

সোলোবিয়েব নিল ব্যাকরণ আর লিপিচাতুর্য শিক্ষা দেবার ভার। যাতে একঘেয়ে

পড়াশ্নায় বেচারার বিরক্তি ধরে না যায়, আর তার সাফল্যের প্রস্কারস্বরূপও বটে, সে তাকে সহজবোধ্য দেশী ও বিদেশী উপন্যাস পড়েও শোনাবে। লিখোনিন নিজের হাতে রাখল অঙ্ক, ভূগোল, আর ইতিহাস শিক্ষা দেবার ভার।

প্রিন্স এবার আর তার অভ্যাসমতো রসিকতা না করে খোলাখ্লি ভাবেই বলল, 'আমি, ভাই, কিছ্ই জানি না; যেট্কুও বা জানি সে-ও খ্ব ভালো করে নয়। তা হোক, আমি ওকে জর্জিয়ন কবি র্স্তাবেল্লির অপর্প কাব্য 'ব্যাঘ্র-চর্মের' প্রত্যেক পংক্তি পড়ে তর্জমা করে শোনাব। আমি তেমন ভালো, গ্র্মশাই নই। তাই বলে, বীণা, ম্যান্ডোলিন, আর ব্যাগপাইপ বাজাতে আমার চেয়ে কেউ ভালো শেখাতে পারবে না।'

নিয়েরাত আন্তরিকতার সঙ্গেই কথা বলেছিল; তাই লিখোনিন আর সোলোবিয়েব খ্ব খ্শি হয়ে হাসছিল বসে বসে। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে শিমানোব্স্কী ওকে সমর্থন করতে লেগে গেল, 'প্রিন্স যথার্থ কথাই বলছে। যাই হোক না কেন, যে-কোন একটা বাজনায় হাত এসে গেলে তাতে করে সৌন্দর্যজ্ঞান ব্দ্ধি পায়; আর জীবনে তা কাজেও লাগে। আর আমি আমার দিক থেকে—ঠিক করেছি তর্ণীটিকে কার্ল মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল' আর মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস পড়ে শোনাব। তা ছাড়া রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আর অর্থনীতি, এ-সবও শেখাব।'

শিমানোব্স্কীর ভারিক্কি চাল যদি ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়ে না থাকত তবে বাকি তিনজন ওর ম্খের ওপরেই হেসে কুটোপাটি হয়ে পড়ত। এখন ওরা শ্ধ্ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার ম্খের দিকে। তাতে কিন্তু একট্ও বিচলিত না হয়ে সে বলেই চলল, 'আর হ্যাঁ, ওকে আমি রসায়ন আর পদার্থবিজ্ঞানের যে-সব পরীক্ষা বাড়িতেই করা চলে তা সব করে দেখিয়ে দেব। এ-সব যেমন উপভোগ্য, তেমনি শিক্ষাপ্রদ, আর মন থেকে কুসংস্কারের জাল সম্লে উৎপাটিত করে দেয়। প্রসঙ্গক্রমে প্থিবীর গঠন আর পদার্থের লক্ষণ এ-সবও কিছ্ কিছ্ ব্যাখ্যা করে ব্ঝিয়ে দেব। আর কার্ল মার্ক্স-এর কথা যদি বল, তবে স্মরণ রেখ যে, য্গান্তকারী গ্রন্থমালা পণ্ডিতের কাছেও যেমন, একটি অশিক্ষিত চাষার কাছেও তেমনি সহজবোধ্য—যদি তা হৃদয়গ্রাহী ভাবে তার কাছে উপস্থাপিত করা যায়। মহৎ ভাব মাত্রই যার-পর-নাই সরল।'

লিখোনিন পার্কের যেখানটিতে লিউব্কাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেখানটিতেই বেঞ্চির উপরে সে বসে ছিল। বেচারা বড়ই অনিচ্ছায় উঠে ওর সঙ্গে বাড়ি চলল। লিখোনিন যেমন আন্দাজ করেছিল, আলেকজান্দ্রাকে বেচারার ভারি ভয় —প্রাত্যহিক জীবনের সত্যের সঙ্গে কতকাল হল যোগ হারিয়ে বসে আছে লিউব্কা। কত রকমের অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা কঠিন তার জীবন! তা ছাড়া লিখোনিন যে ওর অতীতের কথা কিছ্ই ল্কিয়ে রাখতে চায় না, এই চিন্তাটাও দ্র্বহ হয়ে উঠেছিল ওর কাছে। কিন্তু বেচারা এতকাল আনা মারকোব্নার ওখানে থেকে নিজের সত্তা একেবারেই হারিয়ে বসেছে, যে-কোন অজানা অচেনা লোকের আহ্বানে সাড়া দেওয়াই অভ্যাস হয়ে গেছে এখন ওর; তাই একটি কথাও না বলে লিখোনিনের অন্সরণ করল লিউব্কা।

এদিকে ধড়িবাজ আলেকজান্দ্রা করেছে কি—ইতিমধ্যে কোন্ এক ফাঁকে গিয়ে বাড়ির কর্তাকে জানিয়ে দিয়ে এসেছে যে, লিখোনিন কোত্থেকে একটা আইব্ড়ো মেয়েকে কুড়িয়ে এনে তার সঙ্গে একই ঘরে সারারাত কাটিয়েছে। কর্তামশাই ভারি কড়া লোক; ভাড়াটে-দের সঙ্গে ব্যবহার করেন—যেন এক বিধ্বস্ত নগরে প্রবেশ করেছেন এসে কোন এক বিজয়ী বীর। ওরই মধ্যে যা-একট্ ভয় করে চলেন তিনি সে ওই ছাত্রদের, তাদের কাছেই মাঝেমাঝে ভারি জব্দ হতে হয় তাঁকে। যা হোক, শেষ অবধি নিজের ঘরখানা থেকে খানকয়েক ঘর ছাড়িয়ে, সেই একই ছাদের তলায় লিউব্কার জন্যে ছোট্ট একখানা কামরা তখন-তখনই ভাড়া করে লিখোনিন বাড়িওয়ালাকে শান্ত করল।

'তা হোক, মঁসিয়ে লিখোনিন কালই অবশ্য অবশ্য আপনি ছাড়পত্রখানা এনে দাখিল করবেন,'—যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন তিনি, 'আপনাকে অনেক কাল থেকে চিনি আর মান্যগণ্য ভদ্রলোক বলেই জানি, তাই শুধু আপনারই খাতিরে এ কাজ করলাম। জানেনই তো, দিনকাল কি খারাপ পড়েছে। কেউ যদি লাগানি-ভাঙানি করে, তবে আমার চাকরি তো যাবেই, চাই কি দেশছাড়াও করতে পারে আমায়। বড্ড কড়াকড়ি করছেন ওঁরা আজকাল।'

সন্ধ্যার সময় লিউব্‌কাকে নিয়ে প্রিন্স-পার্কে বেড়াতে গেল লিখোনিন; তারপর অভিজাত-মহলের বাজনা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। লিউব্‌কাকে ওর ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে, বাপের মতো ওর কপালে আশীর্বাদী চুম্বন দিয়ে, দোরগোড়া থেকেই বিদায় নিল সে। তারপর কাপড়চোপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে একখানা আইনের বই পড়তে শুরু করেছে, এমন সময় বিড়ালের মতো দোর আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ লিউব্‌কা এসে ঢুকে পড়ল তার ঘরের ভিতর।

'প্রিয় আমার! প্রাণ আমার! আবার তোমায় বিরক্ত করতে এসেছি, মাপ করো। সুচ-সুতো আছে তোমার কাছে? তাই বলে রাগ করো না আমার ওপর ; এখনি চলে যাচ্ছি আমি।'

লিউবা! মিনতি করছি তোমায়, এখনি নয়, এই মুহূর্তেই চলে যাও তুমি। শেষ অবধি বলছি, যাও তুমি!'

'প্রিয় আমার, মানিক আমার!' বিসদৃশভাবে অথচ করুণ সুরে বলতে থাকে লিউব্‌কা, 'সারাটা দিন আমায় কেবলই গর্জে বেড়াচ্ছ কেন তুমি?' সঙ্গে সঙ্গে চট করে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারের মধ্যে এসে লিখোনিনের কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে সে।

'না, লিউবা, এ হতে পারে না আর।'—দশ মিনিট বাদে, দোরের পাশে দাঁড়িয়ে, কম্বলে সারা অঙ্গ ঢেকে, বলতে থাকে লিখোনিন, 'কালই আর-একটা বাড়িতে ঘরভাড়া করে রেখে আসব তোমায়। আর এ-ও বলছি, ফের এ-রকমটি ঘটতে দিয়ো না আর। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন, বিদায় এখন! আর কথা দিয়ে যাও আমায় যে আমাদের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতন শুধু, আর-কিছু নয়।'

'কথা দিলাম, বন্ধু ; দিলাম, দিলাম, দিলাম!'—হেসে ছেলেমানুষের মতো তিন সত্যি করে লিউব্‌কা ; তারপর চট করে প্রথমে তার ঠোঁটে, পরে তার হাতে চুমু দিয়ে দেয়।

শেষ চুম্বনটি ছিল তার সম্পূর্ণ সহজাত ব্যাপার; হয়ত লিউব্‌কার নিজের কাছেও একেবারে অপ্রত্যাশিত। জীবনে এ যাবৎ ও এক ওই ধর্মযাজক ছাড়া আর-কোন লোকেরই হস্তচুম্বন করেনি কখনও। হয়ত এর দ্বারা ও প্রকাশ করতে চেয়েছে লিখোনিনের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা, তার কাছে তার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—সে যেন ওর জীবনদেবতা!

১৫

রুশীয়ার সুধীজনদের মধ্যে বিস্তর চমৎকার লোক রয়েছেন—রুশীয়ার মাটিতে জন্ম তাঁদের, রুশীয়ারই কৃষ্টিতে মানুষ তাঁরা—বীরের মতো মরণের মুখোমুখি দাঁড়াতে লেশ-মাত্র দ্বিধা নেই তাঁদের অন্তরে, একটা আদর্শের জন্যে আজীবন অচিন্তনীয় দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা-যাতনা, সবই অক্লেশে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সামান্য একটা দারোয়ানের হুমকিতেই তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন, মাটির সঙ্গে মিশে যান হয়ত এক ধোপানীর

মুখের সামনে, আর যদি কখনও থানায় যেতে হয় কোন কাজে, তবে তো আর কথাই নেই! লিখোনিন ছিল অবিকল এই ছাঁচে গড়া একটি মানুষ। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছে সে ; মনে পড়ে গেল, আজই তো লিউব্‌কার ছাড়পত্রখানার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর হাত পা যেন পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধুল। তার উপর আবার ছিপ্ ছিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে।—'নাঃ, দুর্দৈব আর কাকে বলে! বেছে বেছে এমন সময়টিতেই বৃষ্টি!'—আস্তে আস্তে জামাকাপড় পরতে পরতে ভাবল লিখোনিন।

ইয়ামস্কায়া ওর ওখান থেকে তেমন যে কিছু দূর তা নয়—এক মাইলেরও কম। আর ও-দিকে যে ও যেতও না কখনও তা-ও নয়, তবে এর আগে দিনের বেলা কখনও যাবার দরকার হয়নি বটে। রাস্তায় এসে বেচারার মনে হতে লাগল—ঠিকেগাড়ির গাড়োয়ান, পুলিসের লোক, সবাই কৌতূহলী হয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে, বুঝে নিয়েছে তারা ওর গন্তব্যস্থান কোথায়। অস্বস্তি! সেখানে গিয়ে ও কি কি বলবে, তারপর থানায় গিয়েই বা কি বলবে, বারবার মনে মনে আউড়ে চলে বেচারা। আর যতবারই ও গোড়া থেকে শুরু করে ততবারই তা মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। আঃ, কি জ্বালা!

'মেয়েটিকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রাখবার কোন অধিকার নেই তোমার!'

'বেশ তো! তা সে নিজেই এসে বলুক না কেন।'

'তা, আমি তো তারই নির্দেশমাফিক কাজ করছি।'

ক্রমে আনা মারকোব্‌নার বাড়িতে এসে পেঁছিয় লিখোনিন। দরজা-জানালা সব বন্ধ, ঘুমিয়ে আছে যেন বাড়িখানা। আশেপাশের সব বাড়িগুলোও তাই। সারা রাস্তাটাই জনশূন্য, খাঁ খাঁ করছে সব। মহামারীর প্রকোপে উচ্ছন্ন হয়ে গেছে বুঝি অত বড় অঞ্চলটা, ঘরদোর বন্ধ করে পালিয়েছে যেন সবাই। ভয়ে ভয়ে গিয়ে ঘন্টা নাড়ে লিখোনিন।

একজন ঝি মেঝে ধোয়াপোঁছা করছিল ; সে এসে সামনে দাঁড়াল।

'জেন্‌কার সঙ্গে দেখা করতে চাই'—ভয়ে ভয়ে বলে লিখোনিন।

'তা, এই মিস জেনী তো এখন লোক নিয়ে আছেন। এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি গো ওনাদের।'

'বেশ, তামারাকে ডেকে দাও তবে।'

সন্দিগ্ধ চোখে চায় ঝি তার দিকে, তারপর বলে, 'মিস তামারা—জানি না—মনে হচ্ছে যেন তিনিও লোক নিয়ে আছেন। তা কি চাই গো আপনার—বসতে এয়েছেন, না আর-কিছু?'

'আঃ, সে যাই হোক গে! ধরই না হয়, বসব।'

'জানি না বাপু। দেখে আসিগে। বসুন গো একটু তবে।'

আবছা অন্ধকারে একা একা পায়চারি করতে থাকে লিখোনিন।—'নাঃ, অনর্থক এ কৌতুককর নাটকীয় ব্যাপারে হাত না দেওয়াই উচিত ছিল আমার!'—মনে মনে তোলপাড় করতে থাকে সে, 'সারা য়ুনিভার্সিটিতে একটা আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছি আমি এখন। দেখছি নেহাত শয়তান এসে ভর করেছিল আমার কাঁধে। কালও তো ও চলে আসতে চেয়েছিল এখানে ; রেহাই পেতাম তা হলে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে এখন। তা কাল আরও দেরি হবে, পরশু আরও। তা এখনও বোধ হয় সময় আছে। আর নয়ই বা কেন? একদম ছ্যাবলা মেয়ে, অপরিণত, হয়ত ওদের আর সবার মতো মাথাপাগলাও একটু। নাঃ, আস্ত একটা জানোয়ার, জানে শুধু আকণ্ঠ গিলতে আর লোকের সঙ্গে শুতে। উঃ! কি পাপ!' চোখ বোঁজে লিখোনিন, 'হায় রে! যদি প্রলোভনে না ভুলতাম সেদিন!' তারপর নিজেকেই নিজে উদ্দেশ করে বলতে থাকে সে, 'দু-দুবার পা হড়কেছে এরই ভেতর ; চলল তাহলে এই রকম—'

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বিপরীত চিন্তাধারাও বইতে থাকে তার মাথার মধ্যে দিয়ে—'তা

হোক, মরদ আমি! মরদ কী বাত, হাতি কী দাঁত! যে চিন্তা করে এ-কাজ করেছি তা খুবই মহৎ, উদার, অপার্থিব। মনে তো পড়ে তখনকার সেই অপরূপ উন্মাদনা যখন আমার চিন্তাধারা কর্মের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করল। কি বিশুদ্ধ, প্রচণ্ড অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল অন্তরে তখন! নাকি সে ছিল শুধুই চিত্তবিকার, মত্ততার খেয়াল, রাত্রি-জাগরণ, ধূমপান, আর উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনার ফল?'

সঙ্গে সঙ্গে তার মনের গহনে ভেসে ওঠে লিউব্‌কার মুখখানা—অবোধ, সরল, মমতা-মাখা মুখখানা, যেন কতকালের কতদিনের চেনা সে-মুখ, অসীম আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন তার সঙ্গে,—তবুও বিরাগ আসে কেন অকারণে?

'আমি কি কাপুরুষ?'—মনে মনে গর্জে ওঠে লিখোনিন, 'কই, এতদিন তো পরোয়া করে চলনি কাউকে! আজ তবে কি হয়েছে তোমার, লিখোনিন? এই-যে একটি অপরূপ ভাব, একটি মানবাত্মা নিয়ে গবেষণা, শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে বিফল, ভেবে দেখ, তার গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছ তুমি—কিন্তু তার জন্যে কৈফিয়ত দিতে যাবে তুমি কার কাছে? কার কাছে? জেগে ওঠ লিখোনিন! তৃণবৎ অগ্রাহ্য করতে শেখ লোকনিন্দা!'

ঘরে এসে ঢোকে জেনী—আলুথালু কেশ, ঘুমন্ত ভাব, পরনে সাদা হাফ-ঘাগরার উপরে রাতের কোর্তা।

'আ-আ!' হাই তুলে লিখোনিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় সে, 'কেমন আছ, পড়ুয়া মশাই! নতুন জায়গায় গিয়ে তোমার লিউবোচ্‌কার লাগছে কেমন? একবার নিয়ে যেয়ো আমায় নেমন্তন্ন ক'রে। না কি নিরিবিলি মধুমাস যাপন করছ এখন, অ্যাঁ? বাইরে থেকে সাক্ষীসাবুদ নেই বুঝি কেউ?'

'বাজে কথা থাক এখন, জেনেচ্‌কা। আমি এসেছি পাশপোর্টের তদ্বিরে।'

'ও—! পাশপোর্ট,'—ভাবতে বসে যায় জেন্‌কা, 'তা, এখানে তো নেই পাশপোর্ট, বাড়িউলীর কাছ থেকে তোমায় নিয়ে যেতে হবে একখানা টিকিট। বুঝলে, আমাদের এই বেশ্যে মাগীদের যে টিকিট থাকে তাই, তারপর থানায় গেলে সেখানা বদলে আসল বইখানা দিয়ে দেবে ওরা। কিন্তু আমি থাকলে আবার হবে হিতে বিপরীত। বাড়িউলী কি দারোয়ানের কাছে এ নিয়ে দরবার করতে গেলে আর আস্তটি রাখবে না আমায়। তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর। ঝিকে দিয়ে বাড়িউলীকে বলে পাঠাও যে একজন খদ্দের এয়েছে, পুরোনো লোক, জরুরী কাজে তার সঙ্গে তোমায় সাক্ষাৎ আলাপ করতে হবে। আমায় কিন্তু মাপ করতে হবে—সটকে পড়ছি আমি, রাগ করো না, মিনতি করছি। জানই তো—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু এখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন? ক্যাবিনেট-ঘরে গিয়ে বস গে যাও। আমি বরং বীয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানে। না, কি কফি? না, আর-কিছু, অ্যাঁ?'—দুষ্টুমি-ভরা চোখে বলে, 'না, কি কোন ছুঁড়ীকে দেব পাঠিয়ে, অ্যাঁ? তামারা তো কাজে ব্যস্ত এখন, তা বোধহয় নিউরা কি ভেরকাকে হলেই চলবে—কেমন?'

'থাম, জেনী! এসেছি একটা জরুরী কাজে, আর তুমি কিনা—'

'বেশ, বেশ আর বলব না! আর বলব না! এমনি ঠাট্টা করে বলছিলাম শুধু। তা দেখছি, বেশ নিষ্ঠা মেনে চল তুমি। খুব ভালো বলতে হবে তোমায়। এস তবে।'

তাকে ক্যাবিনেট-ঘরে এনে বসায় জেনী। তারপর ভিতর থেকে জানালা খুলে দিতেই সকালবেলার সোনালী আলোয় ভিতরটা হেসে ওঠে। 'ঠিক এইখানটিতে বসেই আরম্ভ হয়েছিল,'—বিষণ্ণ হৃদয়ে মনে পড়ে লিখোনিনের।

'আমি চলে যাচ্ছি,'—বলে ওঠে জেন্‌কা, 'মাগীর সামনে কিন্তু একদম নুয়ে পড়ো না—সাইমনের সামনেও নয়। যতটা পারবে, হুমকি লাগাবে ওদের। এখন দিনের বেলা, ওরা কিস্‌সুটি করতে পারবে না তোমায়। যদি তেমন তেমন দেখ, সিধে শাসিয়ে দেবে

যে এখনি তুমি গভর্নরের কাছে গিয়ে নালিশ করবে ওদের নামে। বলবে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওদের এ-সব বন্ধ হয়ে যাবে, আর দেবে শহর থেকে তাড়িয়ে। খালি ধমক-ধামক লাগাবে, দেখবে, একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে পড়েছে তোমার সামনে। আচ্ছা, আসি এখন, জয় হোক তোমার!'

জেনী চলে যায়। মিনিট দশেক পরে এমা এডোয়ার্ডোব্না এসে ঘরে ঢোকেন। লিখোনিন উঠে করমর্দন করে তাঁর সঙ্গে, গোদা হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে ঘৃণাভরে ভাবে লিখোনিন, জাহান্নমে যাক! শয়তানীর হাতখানার মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কত শত খুনখারাপিই না লেখাজোখা আছে!

ইয়াম্কাতে আসবার সময় টাকাকড়ির সঙ্গে সঙ্গে লিখোনিন পকেটে একটা রিভলভারও এনেছিল লুকিয়ে—কি জানি যদি দরকার লাগে! কিন্তু এখন দেখা গেল ও-জিনিসটির কোনই দরকার ছিল না, কিন্তু যেমনটি ভেবে এসেছিল ও, কাজ হাসিল করাটা তার চেয়ে ঢের সহজ অথচ ক্লান্তিকর আর নীরস ভাবে সমাধা করতে হল—অপ্রীতিকরও হয়ে উঠল অনেক বেশি।

'আসুন, মশাই!' অবহেলাভরে বেশ একটু ভারিক্কি চালে বলেন বড় খবর-গিরনী ঠাকরুন; তারপর নিজের পর্বতপ্রমাণ দেহভার নিচু-মতন একখানা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে শুরু করেন তিনি, 'পয়সা দিলেন মশাই মোটে একটি রাতের জন্যে, তারপর আরও এক রাত আর একটা দিন কাবার করে দিলেন মেয়েটাকে নিয়ে। তার ওপর, আরও পঁচিশ রুবল ধারেন আপনি। কোনও ছুঁড়ীকে যখন আমরা এক-রাতের জন্যে ছেড়ে দিই তখন নিয়ে থাকি দশ রুবল, আর চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে পঁচিশ রুবল। ওই হচ্ছে মাশুল, আর কি! সিগারেট খাবেন না?' কেসটা এগিয়ে দেন তিনি, লিখোনিনও পুতুলের মতো তুলে নেয় একটা সিগারেট।

'আমি কিন্তু আলাদা বিষয়ে কথাবার্তা কইতে এসেছিলাম।'

'ও! তা সে আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি সব। বোধ করি মশায় ছুঁড়ীদেরকে, মানে এই লিউব্কাদের, নিজের কাছে নিয়ে রাখতে চান—তা ওই কি বলে যেন, এই 'উদ্ধার' করতে ছুঁড়ীদেরকে—অ্যাঁ? বেশ, বেশ, বেশ! অমন কাণ্ড ঢের ঢের হয়ে থাকে এখানে। বাইশটে বচ্ছর কাটাচ্ছি আমি এই বেউশ্যে বাড়িতে, জানি আমি বোক্চন্দর ছেলে-ছোকরাদের এ সব কাণ্ডকারখানা। তবে বলে দিচ্ছি, কিস্সু লাভ নেই ওতে।'

'তা লাভ হয় কি না হয়, সে আমি বুঝব এখন'—নিজের হাতের আঙ্গুলগুলোর দিকে চোখ রেখে, মন-মরার মতো উত্তর দেয় লিখোনিন; হাঁটু দুটো কাঁপছে তখন তার।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, সে আপনিই বুঝবেন, পড়ুয়া মশাই'—চাপা হাসিতে দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে এমা এডোয়ার্ডোব্নার থলথলে গাল দু-খানা আর প্রকাণ্ড থুতনিটা—'আপনাকে আমি দিল থেকে সোহাগ জানাচ্ছি, পেয়ার-পিরিত জোটে যেন আপনার নসিবে। কিন্তু ওই হতভাগী লিউব্কাকে বলবেন, এখানে যেন ফের নাক গলাতে না আসে ছুঁড়ী, আপনি যখন কুকুরছানাটির মতো দূর দূর করে রাস্তায় খেদিয়ে দেবেন মাগীকে। খিদেয় কঁকিয়ে কঁকিয়ে মরুক ছুঁড়ী বেড়ার ওধারে পড়ে, নয়ত যায় যেন মরতে সেপাইদের ওই সব আধ-রুবলের আড্ডাখানায়!'

'ভয় নেই, সে কোনদিন ফিরবে না। আমি ওর সার্টিফিকেটখানা নিতে এসেছি, চটপট দিয়ে দিন।'

'সার্টিফিকেট? বেশ তো! চান তো এখনি দিচ্ছি বের করে। শুধু ওর ধার-দেনা যা রয়েছে তা মিটিয়ে দিয়ে যান। একবার চোখ চেয়ে দেখুন, এই যে ওর জমা-

খরচের খাতা। ইচ্ছে করেই সঙ্গে করে এনেছি। আগেই আঁচ করেছি কিনা, কি নিয়ে কথাবার্তা হবে আপনার সঙ্গে।' বুকের ভিতর থেকে বইখানা তুলে ধরে এমা—ছোট্ট একখানা বই, মলাটের উপরে লেখা রয়েছে—'মিস আইরিন্‌ বোখশেন্‌কোবার জমাখরচ, আনা মারকোব্‌না সোইবেশ পরিচালিত গণিকালয়,—নং ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীট।' বইখানা টেবিলের ও-পাশে এগিয়ে দেয় এমা। খাতা খুলে লিখোনিন প্রথমে ছাপানো হরফে লেখা নিয়মাবলীর কতকটা পড়ে দেখে। লেখা রয়েছে, বইখানার দু-কপি রাখতে হবে, একখানা থাকবে বাড়িউলীর কাছে, আর-একখানা গণিকাটির কাছে; আয়ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব দু-খানা বইতেই তুলতে হবে; চুক্তিমতো গণিকাটি থাকা, খাওয়া, আলো, জ্বালানি, বিছানাপত্র, এ-সব পাবে আর তার জন্যে বাড়িউলীকে যে ভাড়া দিতে হবে, তা তার আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না কোনমতেই। বাকি টাকা দিয়ে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে বেশভূষা করতে হবে; বাইরে বেরোবার জন্যে তার থাকা চাই অন্তত দু-দফা পোশাক-আশাক। স্ট্যাম্প দিয়ে বাড়িউলীকে টাকা নিতে হবে; মাসে মাসে জমাখরচের হিসেব তৈরি করতে হবে। ধারদেনা সত্ত্বেও যদি কোন গণিকা কখনও গণিকালয় ত্যাগ করতে চায় তবে বাড়িউলী সাধারণ ঋণ-আইনের শর্তমাফিক তার দেনার জন্যে মুচলেকা নিয়ে আর সব মকুব করতে বাধ্য।

এই শেষের শর্তটার উপরে আঙুল বুলিয়ে দেখিয়ে, মহা উৎসাহে বলে ওঠে লিখোনিন, 'এই যে দেখুন, যে-কোন সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার অধিকার রয়েছে ওর। কাজে কাজেই যখন খুশি সে এই নরককুণ্ড থেকে, যেখানে আপনাদের অত্যাচার—' বকবক করেই চলে লিখোনিন। ধীরে-সুস্থে এমা থামিয়ে দেয় তাকে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বেশ ভালো করেই জানা আছে আমার। বেশ তো, যাক না চলে; কিন্তু যাবার আগে ধারদেনাটা শোধ করে দিয়ে যাবে তো!'

'হাতচিঠে দিলে হবে? তাই দেবে ও।'

'ফুঃ! হাতচিঠে দেখাচ্ছে! পয়লা নম্বর, ও লিখতে পড়তে জানে না; দোসরা নম্বর, ওর হাতচিঠের দাম কি? এক থোক থুথুর সামিল, তার বেশি নয়। তবে যদি একজন নির্ভরযোগ্য লোককে জামিন দিতে পারে, আমার বলবার কিছুই থাকবে না।'

'কই, আইনে তো জামিন-টামিনের কথা কিছু বলছে না।'

'আইনে অনেক কিছুই বলে না! আইনে এ-কথাও বলে না যে মালিকদের না জানিয়ে কোন ছুঁড়ীকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া চলে।'

'অতশত বুঝি না। ওর টিকিটখানা আমায় দিতেই হবে।'

'তেমন বোকা পেলে আমায়, অ্যাঁ? কোন মান্যগণ্য ভদ্রলোক আর পুলিসকে নিয়ে এস এখানে। পুলিস বলুক যে তোমার বন্ধুটি শাঁসালো লোক; তিনি দাঁড়ান তোমার জামিন; তা ছাড়া পুলিস বলুক যে, তুমি ছুঁড়ীকে দিয়ে ব্যবসা চালাতে, কি তাকে আর কোথাও বেচে দিতে যাচ্ছ না—তারপর যা অভিরুচি তোমার! ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে এস, বাছা।'

'গোল্লায় যাক!' চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন, 'কিন্তু আমি যদি জামিন হই, আমি নিজে! আমি যদি হাতচিঠেয় সই দিই সিধেসিধি—'

'দেখ ছোকরা! তোমাদের ওই সব য়ুনিভার্সিটিগুলোতে কি যে লেখাপড়া হয় তা জানি না, তাই বলে আমাকে কি তুমি এমনই আহাম্মক পেলে নাকি গো? ভগবান করুন, তোমার পরনে যে ন্যাতাকাঁথা রয়েছে তার বাড়বাড়ন্ত হোক। ভগবান করুন, আজীবন দোকানপসার থেকে এ'টোকাঁটা কিনে খাবার ক্ষমতা থাকে যেন তোমার; আর তুমিই না বলছ হাতচিঠে দেবে! আমার মাথা খারাপ করবার যোগাড় করছ কেন বসে বসে?'

খেপে যায় লিখোনিন, পকেট থেকে টাকার থলি বার করে ঝনাৎ করে রাখে টেবিলের উপর। 'বেশ তো, এখ্নি নগদ টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমি!'

'তা, সে হল আলাদা কথা,' মিঠে করে বলে এমা, তবুও সন্দেহ তার ঘোচে না, 'একবার একটু কষ্ট করে তোমার পিরিতের রাঁড়ের জমাখরচের খাতাখানা উল্টে দেখবে কি?'

'মুখ সামলে কথা ক, ঘাটের মড়া কোথাকার!'

'বেশ, মুখ বুজেই রইলাম, মুখ্যুর সর্দার!' দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয় এমা। খাতাখানা খুলে দেখতে থাকে লিখোনিন—রুল-টানা পাতাগুলোর বাঁদিকে জমার ঘর, ডানদিকে খরচের। পড়তে থাকে লিখোনিন—

১৫ই এপ্রিল—জমা—১০ রুবল; ১৬ই—৪ রুবল; ১৭ই—১২; ১৮ই—অসুস্থ; ১৯শে—অসুস্থ; ২০শে—৬ রুবল; ২১শে—২৪ রুবল।

'কি সর্বনাশ!'—ভয়ে, ঘৃণায়, না ভেবে থাকতে পারে না লিখোনিন, 'বার জন লোক এক রাতে!'

মাসের শেষে জমার ঘরে অঙ্ক দাঁড়িয়েছে : মোট ৩৩০ রুবল।

'বাপ্‌স্! কি পাপ! একশো প'য়ষট্টি বার লোক বসিয়েছে একটি মাসে!'—মনে মনে হিসেব করতে থাকে লিখোনিন, পাতাও উলটে চলে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ডানদিকের ঘরগুলো দেখতে বসে সে, 'লেস দেওয়া লাল সিল্কের পোশাক—৮৪ রুবল; পোশাকউলী এল্‌দোকিমোবা; প্রভাতী পোশাক, আটপৌরে, লেস দেওয়া—৩৫ রুবল, পোশাকউলী এল্‌দোকিমোবা। সিল্কের মোজা ৬ জোড়া—৩৬ রুবল।' 'গাড়িভাড়া, মেঠাই, সুগন্ধি'—'মোট ২০৫ রুবল।' তারপর ৩৩০ রুবল থেকে বাড়িউলীর প্রাপ্য বাবদ কেটে নেওয়া হয়েছে ২২০ রুবল; রইল ১১০ রুবল। তা থেকে পোশাক-আশাক, জিনিসপত্র কেনাকাটা, এ-সবের জন্যে ১১০ থেকে দাম কেটে নেবার পর ধার রয়েছে ৯৫ রুবল, আর গত বছরের ৪১৮ রুবলের জের টেনে এনে এ যাবৎ মোট ধার এসে দাঁড়িয়েছে ৫১৩ রুবলে।

দমে যায় লিখোনিন। প্রথমটায় জিনিসপত্রের দর-টর নিয়ে খানিকটা আপত্তি জানাবার চেষ্টা করে। সুবিধে হয় না।

'তোমার এই পোশাকউলীটি একটি খাঁটি রক্তচোষা।'—গর্জে ওঠে লিখোনিন, 'ষড় আছে তোমার সঙ্গে।'

লিখোনিন যতই উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করতে থাকে, এমা এডোয়ার্ডোব্‌না ততই যেন তামাশা দেখে বসে। শেষে বলে সে, 'দেখ, এ-সব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। বেশি চেল্লাচিল্লি করো না, নইলে দারোয়ানকে ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিইয়ে বের করে দেব!'

বিস্তর বাগবিতণ্ডা ঝুলোঝুলির পর শেষে একটা রফা করতে হল লিখোনিনকে। নগদ ২৫০টি রুবল গুনে দিয়ে, বাকিটার জন্যে হাতচিঠে লিখে, রেহাই পেতে হল তাকে—তা-ও আবার য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট দেখিয়ে প্রমাণ করার পর যে এ বছরই পাশ করে ও আইনের ব্যবসায় নামবে।

টিকিটখানা আনতে গেল এমা। একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ লিখোনিনের চোখে পড়ল কাঁচের ফ্রেমে বাঁধাই পুলিসী আইনের ছাপানো বিজ্ঞাপনটির উপরে। জিনিসটা এই প্রথম নজরে পড়ল তার। কৌতূহলী হয়ে সে পড়ে দেখতে গেল। সরকারি কেতায় লেখা—নির্লজ্জ ব্যবসাদারী ভাষায় কুৎসিত সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়, মেয়েদের গুপ্ত প্রসাধন, সাপ্তাহিক ডাক্তারি পরীক্ষা আর তার জন্যে যে-অবস্থায় তাদের সব থাকতে হবে, এই সব বিষয়ের নির্দেশ।

লিখোনিন পড়তে লাগল—কোন গণিকালয় গির্জাঘর, ইস্কুলকলেজ, আদালত, এ-সব স্থানের একশ পায়ের মধ্যে থাকতে পারবে না, মেয়েছেলে বাদে আর কেউ কোন গণিকালয় রাখতে পারবে না। বাড়িউলী আর মেয়েদের মধ্যে সদ্ভাব রেখে চলতে হবে; খদ্দেরের সঙ্গে বেশ্যাদের ভদ্র ব্যবহার করতে হবে; কোন বেশ্যা কখনও গর্ভপাত করতে পারবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। 'কি উ'চু নৈতিক আদর্শ রে!'—বীতশ্রদ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবে লিখোনিন।

শেষ অবধি এমা এডোয়ার্ডোব্‌নার সঙ্গে কারবার মেটে বটে! রসিদ লিখে এমা টিকিট আর রসিদখানা একসঙ্গে এগিয়ে দেয় লিখোনিনের দিকে, আর লিখোনিনও টাকাটা গুনে আস্তে আস্তে এগিয়ে দেয় এমার দিকে—দুজনেই সাবধানে খরতর দৃষ্টি রাখে দুজনের উপরে, কেউই কাউকে একতিল বিশ্বাস করতে পারে না। লিখোনিন কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, এমা আসে দোরগোড়া অবধি তাকে এগিয়ে দিতে। রাস্তায় এসে নেমে পড়েছে লিখোনিন, এমা সি'ড়ির উপরে দাঁড়িয়ে। গলা বাড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে এমা, 'ছোকরা, হেই ছোকরা!'

ফিরে দাঁড়ায় লিখোনিন—'আবার কি?'

'একটা কথা আছে। শোন, তোমার লিউব্‌কা, বুঝলে, ওটা হল একদম বাজে মাল, চোর আর গর্মীরুগী। আমাদের সেরা খদ্দেররা কেউই পুছত না ওকে,—বুঝলে? যাক, ভালোই হয়েছে যে তুমি এসে ওকে নিয়ে চলে গেলে, নইলে দু দিন বাদে আমরাই ওকে তাড়িয়ে দিতাম এখান থেকে। থাকত ও আমাদের দারোয়ানের সঙ্গে, কারবার চালাত, পুলিস, দারোয়ান, ছি'চকে চোর, এদের সঙ্গে। তোমার এ বৈধ বিয়েতে অভিনন্দন জানাচ্ছি গো!'

'উঃ! বিচ্ছু!' হুঙ্কার দিয়ে ওঠে লিখোনিন।

'উজবুক কোথাকার!' গালাগাল দিয়ে ঝনাৎ করে দোর বন্ধ করে দেয় এমা।

একখানা গাড়ি ডেকে লিখোনিন চলে থানার দিকে। কাগজখানা এতক্ষণে উলটে-পালটে দেখে সে। এই সেই প্রসিদ্ধ 'হলদে টিকিট!' তাতে লেখা আছে লিউব্‌কার নাম, বাপের নাম, পদবী, আর পেশা লেখা রয়েছে—'বেশ্যাবৃত্তি।' আর এক পিঠে আছে বেশ্যাদের চালচলন, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এই সব বিষয়ে নানা রকমের সংক্ষিপ্ত বিধিনির্দেশ। 'যে-কোন খদ্দেরের,'—পড়ে দেখে লিখোনিন, 'বেশ্যাটির কাছ থেকে তার শেষবারের ডাক্তারি পরীক্ষার সার্টিফিকেটখানা চেয়ে দেখবার অধিকার রয়েছে।'

'আহা, বেচারী মেয়েরা!'—বিষণ্ণ হৃদয়ে ভাবে লিখোনিন, 'কি-ই না করা হয়ে থাকে তোমাদের প্রতি! যত রকমের অন্যায় অবিচার হতে পারে তার সবই—যাতে করে সব তাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শেখ তোমরা—সেই কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মতো।'

থানায় এসে জেলার দারোগা সাহেব বার্‌কেশের সঙ্গে দেখা হল। হ্যাঁ, দারোগা তো বার্‌কেশ দারোগা!

'কি চাই হে তোমার, ছাত্র-বাবাজী?'

সংক্ষেপে তার উদ্দেশ্য বিবৃত করে লিখোনিন।

'আর তাই আমি মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়ে রাখতে চাই—তা আপনার কাছে আমায় এখন কি বলে মুচলেকা দিতে হবে—ঝি বলে, না এমনি আত্মীয় বলে—কি করে করতে হয় এ-সব?'

'তা ধরই না এই বাঁধা রাঁড়, কি বউ বলেই হল'—তাচ্ছিল্যভরে জবাব দেন বারকেশ; মনোগ্রাম-করা রুপোর সিগারেট-কেসটি নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, 'আমার দ্বারা কিছুই হতে পারে না—অন্তত এখনি তো নয়ই। যদি বিয়ে করবার মতলব

থাকে ছ‍ুড়ীকে, তো তোমার য়ুনিভার্সিটির কর্তাদের কাছ থেকে যথানিয়মে অনুমতি-পত্র এনে দাখিল করতে হবে। আর যদি পেটভাতায় নিয়ে গিয়ে রাখতে চাও তো একবার বুঝে দেখতে চেষ্টা কর এর মধ্যে যুক্তিটা কোথায়? তুমি একটা ছুঁড়ীকে এক কুস্থান—থেকে বের করে আনতে চাইছ, তার সঙ্গে অন্যায়ভাবে সহবাস করবে ব'লে।'

'ঝি হয়ে থাকবে সে, তবে,' উত্তর দেয় লিখোনিন।

'তা ঝি-ই না হয় হল! তোমার বাড়িওয়ালাকে দিয়ে তবে একটা এফিডেভিট দাখিল করতে হবে, কেন না—মনে হচ্ছে—নিজের কোন ঘরদোর নেই তোমার। তা হলেই হল, বাড়িওয়ালাকে এফিডেভিটে বলতে হবে, ঝি পোষবার ক্ষমতা রয়েছে তোমার। তা ছাড়া আরও দলিলপত্র চাই—তুমি নিজে যে-লোক বলে পরিচয় দিচ্ছ, বাস্তবিকই যে তুমি সে-ই লোক, তারই বা প্রমাণ কি? এই ধর, যেমন, তোমার জেলা থেকে একখানা দলিল, য়ুনিভার্সিটি থেকে একখানা—এই রকম আর কি! তা তোমার নাম বোধ করি রেজিষ্ট্রি করাই আছে? না, কি বে-আইনি ভাবে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছ তুমি, অ্যাঁ?'

'না, আমার নাম রেজিষ্ট্রি করাই আছে,'—উত্তর দেয় লিখোনিন। ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে সে।

'তা বেশ! কিন্তু সেই তরুণী মহিলাটি যাঁর জন্যে এমন কষ্ট ভোগ করছ তুমি?'

'না, এখনও রেজিষ্ট্রি হয়নি, তবে টিকিটখানা আমি পকেটে করেই এনেছি। দয়া করে সেখানা বদলে যদি তার আসল ছাড়পত্রখানা ফিরিয়ে দেন, তবে এখনি তার নাম রেজিষ্ট্রি করে ফেলব আমি।'

হাত দু-খানা ছড়িয়ে একবার আড়ামোড়া ভেঙ্গে নেয় বার্‌কেশ, তারপর ফের সিগারেট-কেসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, 'কিছুই করবার জো নেই, ছাত্র-বাবাজী, একেবারে কিচ্ছুটি নয়, যতক্ষণ না সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করা হচ্ছে। আর ছুঁড়ীটার কথা হচ্ছে কি জান, তার তো থাকবার ঠাঁই নেই কোথাও, এখনি গ্রেপ্তার করে তাকে পুলিসের হেফাজতে পাঠানো হবে—যদি না সে যেখান থেকে এসেছে সেখানটিতেই ফিরে যেতে চায়। আচ্ছা, সসম্মানে নমস্কার জানাচ্ছি এখন!'

টুপি মাথায় দিয়ে দোরের দিকে মুখ ফেরায় লিখোনিন; কিন্তু চট করে একটা সুবুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাবও উদয় হয় তার মনে। পেটের ভিতর থেকে যেন বমি ঠেলে আসে তার, হাতের চেটো ঘেমে নেয়ে ওঠে একেবারে; পায়ের আঙ্গুলগুলো দপদপ করতে থাকে। ফিরে এসে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে কিন্তু গলার সুরে বেশ একটুখানি সরস ভাব টেনে এনে বলে সে, 'মাপ করবেন, দারোগা সাহেব। আসল কথাটাই ভুলে গেছি, আমাদের দু-জনেরই চেনা এক ভদ্রলোক আপনার কাছে তাঁর একটা সামান্য ধার শোধ করতে দিয়েছেন আমায়।'

'হুম্! চেনা ভদ্রলোক?' নীল চোখদুটো মেলে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে জিজ্ঞেস করে বার্‌কেশ, 'কে তিনি?'

'বার—বারবারিসোব।'

'ও, বারবারিসোব? বটে, বটে, বটে! হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে!'

'তবে দয়া করে নিন রুবল দশটা!'

মাথা নাড়ে বার্‌কেশ, 'জান, তোমার এই বারবারিসোব, থুড়ি, আমাদের এই বারবারিসোব—ইনি হলেন গিয়ে আস্ত একটি শুয়োর। মোটে দশটি রুবল ধারে না সে আমার কাছে, ধারে পুরো একটি শতকের সিকি ভাগ। কোথাকার পাজি ওটা! পঁচিশ পঁচিশটে রুবল, মশাই, তা ছাড়া খুচরোও আরও কিছু। তা খুচরোটা আমি অবশ্য ধরছি না তার ধারের মধ্যে। পয়মন্ত হোক সে ভগবানের কৃপায়! জান, এ হল গিয়ে

বিলিয়ার্ড খেলার ধার। একেবারে খুনে ডাকাত লোকটা, খেলেও বেইমানি করে।—তা, বাবাজী, বের করো হাতড়ে আরও পনেরোটা রুবল।'

'তা, আপনিও তো দেখছি কম ঘুঘু নন, দারোগা সাহেব,'—টাকাটা বের করতে করতে বলে লিখোনিন।

'রক্ষে কর, বাবা!'—একেবারে ভালোমানুষটি সেজে বলতে শুরু করেন দারোগা সাহেব, 'বউ, ছেলেপিলে—জানই তো, বাবাজী, কি মাইনে পাই আমরা—এই যে, এস বাবাজী, এই তো পাশপোর্টখানা। রসিদ সই করো এখন।—কল্যাণ হোক!'

অবাক কাণ্ড! পাশপোর্টখানা যে শেষ অবধি তার পকেটে এসেছে, জ্ঞান হতেই লিখোনিনের অস্থির চিত্ত শান্ত হয়ে আসে; নতুন করে উৎসাহও জাগে তার প্রাণে।

'যাক, সবচেয়ে কঠিন কাজটা সমাধা হ'ল তবে,'—তাড়াতাড়ি পথ চলতে চলতে ভাবে সে, 'আসল কাজের পত্তনী হল এতক্ষণে! দৃঢ় হও, লিখোনিন, ঝিমিয়ে পড়ো না ফের! যে কাজে হাত দিয়েছ তুমি, অপূর্ব, মহৎ সে-কাজ। সৎকর্মে পুরস্কারের আশা করতে নেই। তবে কাল তোমার শিক্ষিত ভদ্রলোকের সামনে অতটা নেতিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। একটু ছেলেমানুষি আর বিচক্ষণতার অভাব দেখা গেছে. আর যাই হোক না কেন, সাত তাড়াতাড়ি সব ফাঁস না করাই ভালো ছিল। তা হোক গে যাক, সময়ে সব দোষই শোধরানো যায়—'

যেন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে পাশপোর্টখানা এনে লিউব্‌কাকে খুলে দেখায় লিখোনিন। তেমনি কিছু অবাক হয় না সে, উৎফুল্ল হয়েও ওঠে না মোটে। লিখোনিন বেশ একটু আশ্চর্যই বোধ করে। লিউব্‌কা শুধু খুশি হয় লিখোনিনকে ফিরে পেয়ে। বোধ করি বেচারার আদিম সরল অন্তরাত্মা ইতিমধ্যেই তার উদ্ধারকর্তার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল—কে জানে! একেবারে লিখোনিনের ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে লিউব্‌কা। লিখোনিন ধরে ফেলে তাকে, শান্তভাবে—প্রায় তার কানে কানেই—জিজ্ঞেস করে, 'লিউব্‌কা, বল দেখি—সত্যি কথা বলতে ভয় পেয়ো না, যা-ই কেন না হোক তা —এই এখুনি ওরা বলল আমায়, তোমাদের বাড়িতে, যে তোমার নাকি কি-একটা ব্যামো আছে—জানই তো ওই যাকে বলে খারাপ রোগ। বল আমায়, যদি আমার ওপরে কিছু-মাত্রও আস্থা থেকে থাকে তোমার, তবে বল আমায় লক্ষ্মীটি, কথাটা সত্যি না মিথ্যে?'

রাঙা হয়ে ওঠে লিউব্‌কা, দু-হাতে মুখ ঢেকে পাটাতনটার উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে বেচারা! 'প্রাণ আমার! বাসিল বাসিলিচ! বাস্‌সিঙ্কা আমার! ভগবান সাক্ষী! ভগবান সাক্ষী! কখ্‌খনো ও-সব কিচ্ছু হয়নি আমার গো! বড্ড ভয় ছিল আমার ওতে। ভারি সাবধানে থাকতাম আমি। এত ভালোবাসি তোমায়! নিশ্চয়ই বলতাম তোমায় তাহলে।' লিখোনিনের হাত দু-খানা ধরে বারবার তার ভিজে মুখের উপরে চেপে চেপে ধরতে থাকে বেচারা—অনর্থক মিথ্যে দোষে দোষী কচি মেয়েটি যেন হাপুস নয়নে কেঁদে প্রাণপণে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চায়।

লিখোনিনের অন্তরাত্মা বুঝি তার কানে কানে বলে—বাস্তবিক নির্দোষ এ মেয়েটি।

মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে শান্ত সুরে বলতে থাকে লিখোনিন, 'বিশ্বাস করছি তোমায়, বাছা! আর পাগলামি করে না, কাঁদে না, ছিঃ! শুধু ফের যেন আমাদের দুর্বলতার প্রশ্রয় না দিই আমরা। যা হয়ে গেছে—হোক গে যাক। ফের যেন অমনটি আর না হয়।'

'তুমি যা চাইবে তাই করব আমি,' লিখোনিনের হাতে, জামার কাপড়ে, বার বার চুমু খেতে খেতে ছোট্ট মেয়েটির মতো আধো-আধো সুরে বলতে থাকে লিউব্‌কা. 'ফের যদি অমন করে বিরক্ত করি তোমায়, তবে যা খুশি করো আমায়।'

তবুও সে-রাতেও ফের ধরা দিতে হয় প্রলোভনের দায়ে। তারপর প্রতিরাতেই। শেষে আর এ পতনদশা লিখোনিনের অন্তরে দাহ সৃষ্টি করে না, একরকম অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে যায় ব্যাপারটা, পশ্চাত্তাপের জ্বালা জুড়িয়ে ছাই হয়ে যায় শেষে।

১৬

লিখোনিনকে কিন্তু প্রশংসাই করতে হয়। লিউব্‌কা যাতে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে থাকতে পারে তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে। এ সাড়ে-পাঁচমহলা পায়রার খোপ ছেড়ে দিতে হল তাকে—অসুবিধার জন্যে ততটা নয়, আলেকজান্দ্রার দিনকে-দিন দাপটের ঠেলায় যতটা। শহরের শেষপ্রান্তে গিয়ে সস্তা অথচ সুবিধেমতো দেখে, মাসিক নয় রুবল ভাড়ায়, দুটো কামরা আর একখানা রান্নাঘর-ওয়ালা ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে নতুন ঘর-সংসার পেতে বসল সে লিউব্‌কাকে নিয়ে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঢের দূরে পড়ে গেল বটে লিখোনিন, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য আর সহনশক্তির উপর অগাধ আস্থা তার, প্রায়ই বলে সে, 'দু-দু-খানা ঠ্যাং রয়েছে আমার, সে কি শুধু শুধু বসে থাকবার জন্যে?'

তা দৌড়াদৌড়িও তাকে কম করতে হয় না। তাসের বাজি জিতে পুঁজিপাটা যা করেছিল, তা এই লিউব্‌কার পাশপোর্ট সংগ্রহ করতে আর নতুন সংসারের জন্যে এটা-ওটা-সেটা কেনাকাটা করতেই হাওয়া হয়ে গেল। ফের বাজি রেখে তাসখেলা শুরু করে লিখোনিন, কিন্তু শীগগির বুঝতে পারে সে—তাসের তারা উল্কাবাজি খেলতে শুরু করেছে এবার।

এতদিনে লিখোনিন আর লিউব্‌কার আসল সম্পর্কটা বেমালুম ধরা পড়ে গেছে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে। তবুও তাদের সামনে বন্ধুত্ব আর ভ্রাতৃত্বের ভোল বজায় রেখে কথা বলতে চায় সে,—বোঝে না এ-ভাবে অনর্থক ভান করা আর মিছে কথা বলাটা তার পক্ষে বোকামির চূড়ান্ত হচ্ছে; কিংবা হয়ত বুঝেও সুর পালটাতে চক্ষু-লজ্জায় ওর বাধে। তা ওদের দু-জনের মাখামাখির মধ্যে লিখোনিন সর্বদাই গৌণ অংশে অভিনয় করে চলে, লিউব্‌কার তরফ থেকেই প্রথম ধাক্কা আসে—আদর, সোহাগ, যা-কিছু। তা লিউব্‌কা লিউব্‌কাই রয়ে গেছে এখনও, কি জানি কেন লিখোনিন একদম ভুলে বসে আছে যে পাশপোর্টে তার আসল নাম লেখা রয়েছে—আইরিন।

এই তো সেদিনও যে-লিউব্‌কা নিরাসক্তভাবে—কিংবা যথার্থ বলতে গেলে, জ্বলন্ত উন্মাদনার ভান করে—দৈনিক দলে দলে লোকের কাছে দেহদান করেছে, মাসে মাসে বসিয়েছে শত শত লোক, সে-ই আজ তার সমস্ত নারীত্ব নিয়ে, প্রেম নিয়ে, ঈর্ষা নিয়ে, একান্তভাবে লিখোনিনের অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে—কায়মনোবাক্যে তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে। প্রিন্সকে ওর খুব মজা লাগে, সোলোবিয়েবকে মনে ধরেছে আমুদে লোক বলে, শিকানোবস্কীর প্রচণ্ড মুরুব্বিয়ানায় ওর প্রাণে অপরিসীম আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু লিখোনিন ওর কাছে হল একাধারে দেবতা ও প্রভু, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে যা হচ্ছে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস, লিখোনিন হল ওর পার্থিব সম্পদ, ওর দৈহিক আনন্দ।

দেখা যায়, যে-পুরুষ জীবনটাকে একবার পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করে এসেছে, কামকলার নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ ছারখার হয়ে গেছে যে, জীবনে আর কখনও সে দৃঢ়, একনিষ্ঠ ভাবে ভালোবাসতে পারে না—তার সে-ভালোবাসায় কখনও একই সঙ্গে আত্ম-ত্যাগ, পবিত্রতা, আর দুর্বার অমোঘ শক্তি দেখতে পাওয়া যায় না। মেয়েদের বেলায়

কিন্তু এ-রকম কোন বিধান নেই, কোন সীমারেখাও টানা চলে না। আর লিউব্‌কার জীবনে এখন বিশেষ করেই যেন অভিব্যক্ত হয়ে উঠল এই বাধাবন্ধনহীন প্রেমের লীলা। লিখোনিনের সামনে আনন্দে ধুলোয় গড়াগড়ি যেতে পারে সে, পারে তাকে ক্রীতদাসীর মতো সেবাশুশ্রূষা করতে; কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে চায় সে লিখোনিন যেন একান্ত তারই থাকে—এই যে টেবিলখানা, ওই যে পোষা কুকুরছানাটি, এই তার নিজের গায়ের রাতের ব্লাউজখানা, এ-সব জিনিসের চেয়েও তার একান্ত নিজের করে পেতে চায় সে লিখোনিনকে। এই সর্বগ্রাসী প্রেমের মধ্যে যাক হারিয়ে প্রেমাস্পদের নিখিল সত্তা, হোক তার আত্মাহুতি। লিউব্‌কার এই দুরন্ত দুর্বার প্রেমে পরিপূর্ণ ভাবে সাড়া দিয়ে উঠতে পারে না লিখোনিন, বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে সেদিনকার সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর অকস্মাৎ দুর্বার নদীস্রোতের মতো দু-কূল প্লাবনে। সে মাঝেমাঝে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বসে মনে মনে ভাবে—'প্রতি সন্ধ্যায় আমায় চিরসুন্দর যোসেফের অভিনয় করতে হয়। তবু সে-ও একদিন কামনাময়ী নারীর হাতে পরিধানের অন্তর্বাসখানি ছেড়ে রেখে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে পেরেছিল। আমি কবে কাঁধের এ জোয়াল থেকে রেহাই পাব?'

তা ছাড়া তার নিজের আর লিউব্‌কার প্রতি বন্ধুদের ভাবের জন্যেও মনে মনে বিষণ্ণ বোধ করে লিখোনিন। ওদের চির-অবারিত দ্বারে ভিড় করে আসে তারা সব পতঙ্গ বহিমুখ যেন। লিউব্‌কার সঙ্গে তাদের কথাবার্তায়, তাদের গলার সুরে, তাদের হাবভাবে, বুঝি সে আন্তরিক সম্ভ্রমের ভাবটি ফুটে ওঠে না, যা বন্ধুপত্নী, বন্ধুর প্রণয়িনী, কিংবা বন্ধুর ভগ্নীর প্রতি তরুণদের পক্ষে একান্ত সঙ্গত। লিউব্‌কার প্রতি তাদের মৌখিক ভদ্রতার আড়ালে লিখোনিন বুঝি তাদের অন্তরের আসল ভাবখানা স্পষ্ট বুঝতে পারে—'এই তো নিয়ে আসা হয়েছে তোমায় এক কুস্থান থেকে, নি-খরচায় সস্তা আমোদ লাভের জন্যে। এই তো সেদিনও তুমি দশে দশে, শতে শতে লোক বসিয়ে এসেছ শুধু অর্থের বিনিময়ে। যাই কর না কেন, তুমি সেই যে পণ্যনারী ছিলে আজও তাই-ই রয়েছ। তোমার পূর্বতন কর্মের কলঙ্ক-কালিমা ধুয়ে-মুছে যাবে না আর-কিছুতেই। এক রাতের জন্যে তোমায় তু তু করে ডেকে নিয়ে যাওয়া, সে আর এমন বেশি কথা কি? একটি মুহূর্তও ইতস্তত না করে দিব্যি চলে আসবে তুমি পিছু পিছু—আসতে বাধ্য যে তুমি!'

বোধের অতীত কেমন যেন এক পরম বিরাগ নিয়ে বসে বসে ভাবে লিখোনিন—বন্ধুরা তাকেও কোথাকার কে-এক এই লিউব্‌কার সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলে নীরবে অপমান করে চলেছে। আর তারই জন্যে মনে মনে লিউব্‌কার প্রতি কেমন একটা গোপন বিদ্বেষের বিষে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে সে অন্তরে অন্তরে। কত অসম্ভব রকমের মুক্তির পথই না মনে মনে সে কল্পনা করে; কোন কোন কৌশল তার এমনই অসাধু প্রকৃতির যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই, নয়ত পরের দিনই সে-সব কথা মনে করে অপরিসীম লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে সে নিজেরই কাছে।

'নৈতিক আর মানসিক অবনতি শুরু হয়েছে আমার', আতঙ্কগ্রস্ত মনে বসে বসে ভাবে লিখোনিন। দু-হপ্তার মধ্যেই ঝিমিয়ে আসে লিউব্‌কাকে নিয়ে লিখোনিনের যত-সব কল্পনা। ধরা দেয় সে লিউব্‌কার আদরে সোহাগে—অত্যাচারের হাতে যেন নীরবে আত্মসমর্পণ করে।

এতদিনে লিউব্‌কা কিন্তু স্বস্তি পেয়েছে, পায়ের তলায় ফিরে পেয়েছে কঠিন মাটি। চোখের সামনে দিনকে-দিন চেহারা ফিরে যায় তার—সদ্য কালও যে ছোট্ট ফুল-কলিটি ছিল শুকনো, বর্ষার জল পেয়ে রাতারাতি সে বুঝি আজ তাজা পাপড়ি মেলতে শুরু করে দেয়। কোমল মুখখানা থেকে মেচেতার দাগগুলো তার সব উঠে গেছে, দাঁড়কাকছানার মতো কালো চোখ দুটিতে সেই যে সদাসর্বদা কেমন একটা অবোধ ভীরু

গ্রস্ত ভাব জেগে থাকত, সেখানে দেখা দিয়েছে এখন খুশির ঝিকিমিকি। লিখোনিন কিন্তু বুঝতে পারে না অতশত, বন্ধুদের প্রশস্তি শুনে ভাবে—'মস্করা করছে ছোঁড়ারা।'
গিন্নি হিসেবে কিন্তু তেমন সুবিধের নয় লিউবকা, রাঁধাবাড়ায় যুত করে উঠতে পারে না। ভালোবাসে শুধু ঘরদোর ধোয়াপোঁছার কাজ।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে লিখোনিন কিস্তিবন্দীতে ওকে মোজা বোনার একটা কল কিনে দিল। দৈনিক নাকি তিন রুবল আয় হতে পারে সেটা দিয়ে। ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই তিন বন্ধুতে শিখে ফেলল কল-চালানো, পারল না শুধু লিউবকা। অথচ নকল ফুল তৈরির কাজটা, বলতে গেলে, নিজেরই চেষ্টায় শিখে নিলে ও চট ক'রে। তবে হপ্তায় এক রুবলের বেশি উপায় হয় না তাতে; তবুও তাই হল ওর ভারি গর্বের বিষয়। প্রথম দিনের আধ-রুবল রোজগার দিয়ে লিখোনিনকে একটা সিগারেট-কেস কিনে দিল লিউবকা।

ক্রমে ওদের সংসারটা ছাত্রদের কাছে যেন এক পরম রম্য শান্তিতীর্থ হয়ে ওঠে। আর তার আসল কারণই হল এই অবোধ অকর্মার ঢেঁকি মেয়েটার আন্তরিক ব্যবহার, তার সস্নেহ নীরব আতিথেয়তা, পরম প্রীতি। পরে বিষণ্ণ কৃতজ্ঞ অন্তরে মনে মনে স্মরণ করত লিখোনিন—সামোভারের চারদিক ঘিরে তাদের সেই জমজমাট সান্ধ্য আসরটি—তর্কের খৈ ফুটছে সবার মুখে, চোখে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন, আর তার মাঝখানটিতে লিউবকার বিরামবিহীন নম্র নীরব সেবা। বিচ্ছেদের পর লিউবকার উপরে লিখোনিনের বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু এই তো ঘটে থাকে সচরাচর।

বড়ই দুরূহ হয়ে ওঠে লেখাপড়ার কাজটা। এই সব স্বয়ং-সিদ্ধ গুরুমশাইদের শিক্ষানীতি আর শিক্ষাপদ্ধতি বিপরীত দিকে চলে। লিউবকা বেচারা হিসেবপত্র করে একগণ্ডা দু-গণ্ডা, এক কুড়ি দেড় কুড়ি করে—তা প্রায় পুরো একশ অবধি সে অক্লেশে চলতে পারে। তবুও সেদিক দিয়ে মাড়াবে না লিখোনিন, জোর-জবরদস্তি করে শেখাবেই তাকে সংখ্যাপদ্ধতি। ফল হয় না কিছুই, আর চটেমটে চেঁচামেচি লাগিয়ে দেয় লিখোনিন, লিউবকা বেচারা ভিজে চোখের পাতা মেলে অবাক হয়ে ভয়ে চুপটি করে চেয়ে বসে থাকে শুধু। অথচ যোগ আর গুণের অঙ্ক চটপট শিখে ফেলে সে, বিয়োগ আর ভাগ নিয়েই যত গোল বাধে। এদিকে আবার মাথা-ঘোলানো যত-সব মৌখিক ধাঁধার উত্তর নিমেষে বলে দেয় লিউবকা, কিন্তু ভূগোল পড়তে বসে বুঝবেও না, মানবেও না কিছুতে যে পৃথিবী গোলাকার। আর এত বড় এই মাটির পৃথিবীটা যে বোঁ বোঁ করে শূন্যে ঘুরে চলেছে সে-কথা শুনে তো হাসির চোটে দম বন্ধ হয়ে মরবার যোগাড় আর কি! অথচ—তা বোধ করি ওর চাষীসুলভ সংস্কারের জন্যেই হবে—ঘরে-বাইরে সর্বত্র ও নিখুঁতভাবে দিঙ্‌নির্ণয় করতে পারে লিখোনিন লাগেই না ওর কাছে। আলাদা আলাদা নকশা এক-আধবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েই কিন্তু চমৎকার মনে রাখতে পারে ও। 'কোন্‌টা ইতালি?'—জিজ্ঞেস করে লিখোনিন। 'এই যে, বুটজুতোর পাটিখানা',—পট করে আপেনাইন উপদ্বীপের উপরে আঙুল বুলিয়ে মহা উল্লাসে দেখিয়ে দেয় লিউবকা। 'সুইডেন আর নরোয়ে?'—'এই যে, ছাত থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে একটা কুকুর।' 'বল্টিক সাগর?'—'এক বিধবা হাঁটু গেড়ে বসে আছে।' 'কৃষ্ণসাগর?' —'এই জুতোর পাটিটা।' 'স্পেন?'—'এই টুপিপরা মুটকী মাগী।' এই রকম সব। ইতিহাস নিয়েও সুবিধে হয় না। এ কথাটা একদম লিখোনিনের মাথায়ই আসে না যে, ওর সরল শিশু-মন গল্পের কাঙাল; তার বদলে নাম আর সন-তারিখের তালিকায় বিব্রত করে তোলে সে লিউবকাকে। এদিকে একটুতেই আবার চটে যায় লিখোনিন; আর এই যে একটি মেয়ে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তার প্রতি গোপন অথচ সতত

বর্ধিষ্ণু বিরাগবশত ক্রমশই সে অতি অল্পেই পড়াশোনার সময় খেপে উঠে সব ভেস্তে দিতে লাগল।

গুরুমশাই হিসেবে নিয়েরাত ঢের ভালো। ওর বীণা আর ম্যান্ডোলিন ঝোলানো পড়ে থাকে এদের খাবার ঘরে। ম্যান্ডোলিনের খনখনে আওয়াজের চেয়ে বীণাযন্ত্রের মিঠে নরম সুরই লিউব্‌কার প্রাণ টানে বেশি ক'রে। তাই নিয়েরাত এলেই বীণাখানি সযত্নে ঝেড়ে-পুঁছে নিয়েরাতের হাতে তুলে দেয় লিউব্‌কা। নিয়েরাতও সেটা নিয়ে বসে বসে খানিকক্ষণ ধরে সুর বাঁধে, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে, পায়ের উপরে পা তুলে দিয়ে, আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, আর ভরাট গলায় চড়া সুরে গান ধরেঃ

চু-চ্চু-চু চুমকুড়ি!
　থুড়ি।
শিউরে ওঠে প্রাণ।
নিশুত রাত, নিথর বায়,
　আকাশ কম্পমান।
যুগল প্রাণের মিঠে, রে ভাই,
　সবার বাড়া ধন,
শান্তিবারির ছিটে, রে ভাই,
　চুমো এ মোহন।
　ওরে আমার প্রাণ।
এক লহমার মিলন লাগি
　করে যে আনচান।

গাইতে গাইতে চোখ বুজে, হাত নেড়ে, মাথা দুলিয়ে, নানা রকমের ভাবভঙ্গি দেখায় নিয়েরাত। নিজের গানে নিজেরই ভাব লেগে যায় বুঝি তার। হঠাৎ কখন আবার স্থাণুর মতো একেবারে পাথর হয়ে গিয়ে স্বপ্নালস মদির চোখে লিউব্‌কার চোখে চোখে চেয়ে বিঁধে দেয় তাকে। অসংখ্য গাথা, রসের ছড়া, সাবেক কালের হাসির গান জানা আছে নিয়েরাতের। সেগুলোর মধ্যে কারাপটকে নিয়ে আর্মেনিয়ানদের মধ্যেকার সেই যে চলতি ছড়াটা—তাই হল লিউব্‌কার সব চেয়ে পছন্দঃ

কারাপটের ছিল সে এক তাক,
ছিল তাতে মিঠে সে এক চাক,
চাকে ছিল আঁকা সে এক পট—
তারি গুমর করত কারাপট।

এই রকমের অগুনতি ছড়া মুখস্থ নিয়েরাতের; তার সব কটাই আবার শেষে একই আখর দিয়ে শেষ হয়ঃ

সাবাস, সাবাস, কাতেন্‌কা,
　কাতেরিন পেত্রোব্‌না;
মাথায় চুমু দাও গো আমায়,
　গালে দিয়ো না!

নিয়েরাত গায়, আর কারাপটের বিষয় নিয়ে মুখে-চোখে এমন একটা ভয়ানক আশ্চর্যের ভাব দেখায় যে, হাসতে হাসতে বুকে-পিঠে খিল ধরে যায় লিউব্‌কার, চোখে জলও এসে যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রিন্সের সামনে যখন সঙ্কোচ কেটে এল তখন লিউব্‌কা তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইতে লাগল—দু-জনের গলার মিলও হয় ভারি চমৎকার। ভারি মিহি আর সুরেলা এই লিউব্‌কার গলা, তাতে তার অতীত জীবনের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আর পেশাদারি আতিশয্যের ছাপ নেই মোটেই। আর

—ভগবানেরই আশীর্বাদ বলতে হবে—তার আছে গানের ধুয়ো ধরে চলবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। শেষটায় তাদের পরিচয়ের শেষদিকে এমনও দিন এল যখন লিউব্‌কাকে আর প্রিন্সকে গাইবার জন্যে খোসামোদ করতে হয় না, প্রিন্সই বরং ওর খোসামোদ করে—পল্লীগাথা শোনবার লোভে। তা লিউব্‌কার নিজেরও জানা আছে বিস্তর পল্লীগাথা। টেবিলের উপরে কনুই রেখে, পল্লীরমণীদের ঢঙে হাতের চেটোয় মাথা কাত করে উঁচিয়ে সযত্নে বীণার সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে বসে লিউব্‌কাঃ

ক্যামনে আমার রাত হবে গো ভোর,
ফেলে গেছে পরাণ-বঁধু মোর!
হায়, পোড়ামুয়ে বেরিয়ে গেল গাল—
বলি, —অ কালামু' মদোমাতাল!

'মদোমাতাল' কথাটার উপর ঝোঁক দিয়ে দুঃখীর মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটাকে একদিকে কাত করে তাল ঠোকে প্রিন্স, আর লিউব্‌কার সঙ্গে সঙ্গে শেষের কলিটা একত্রে গেয়ে চলে—বীণাযন্ত্রের কম্পমান বিলীয়মান ধ্বনির সঙ্গে তান রেখে এমন ভাবে এসে শেষ হয় গানখানা যে ধরতেই পারা যায় না ঠিক কোন্‌খানে এসে তা নীরবতায় লীন হয়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল হয় ওই জর্জিয়ান কবি রুস্তাভেল্লির 'শার্দুলচর্ম' নিয়ে। কাব্যখানার সমস্ত মাধুর্য লুকিয়ে আছে তার ওই গ্রাম্য শব্দ-ঝঙ্কারের মধ্যে। সুর করে পড়তে বসে প্রিন্স, আর লিউব্‌কা হাসি চাপতে না পেরে শেষটায় হি-হি করে লুটিয়ে পড়ে একেবারে। চটে গিয়ে ধপ করে বইখানা বন্ধ করে দেয় প্রিন্স, গালমন্দ শুরু করে; আবার শেষ অবধি মিটমাটও হয়ে যায় দুজনে!

কখনও কখনও আবার নিয়েরাতের ঘাড়ে চাপে বোকাপাঁঠার মতো যত রাজ্যের দুষ্টুমির ভূত। ভাবখানা দেখায়, এই বুঝি ধরবে জড়িয়ে লিউব্‌কাকে; বসে বসে চোখ মারে তাকে, আর নাটকীয় ভঙ্গিতে বিহ্বল অবশ স্বরে বলতে থাকে, 'প্রেয়সী আমার! আল্লার গুলবাগিচার সেরা ফুল! সুধাভরা ঠোঁট দুখানি তোর! শিক-কাবাবের খোসবু তোর শ্বাস-প্রশ্বাসে! আয়, তোর ওই অধরের সুধা-পাত্র হতে মহানির্বাণ-সুধা পান করি! আয় রে আমার তিফ্‌লিশিয়ান ছাগসুন্দরি!' রকম-সকম দেখে হাসতে শুরু করে দেয় লিউব্‌কা, শেষে রাগ করে নিয়েরাতের হাতে থাবড়া মারতে মারতে শাসায় —লিখোনিনকে বলে দেবে সব।

'ব্‌-বাঃ! লিখোনিন?'—হাত দুখানা সটান মেলে দিয়ে বলে ওঠে প্রিন্স, 'লিখোনিন আবার কে? আমার বন্ধু, সাঙাত। তাই বলে ও কি জানে লোফ্‌ফী কাকে বলে? তোমরা সব উত্তুরে লোক, কি বুঝবে তোমরা লোফ্‌ফীর? শুধু আমরা, জর্জিয়ানরাই জানি এ কি চীজ! দেখ তবে, লিউব্‌কা!' তারপর হাত মুঠ করে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এমন দুর্দান্তের মতো চোখ পাকাতে পাকাতে, দাঁত কড়মড় করতে করতে সিংহের মতো গর্জাতে থাকে যে, তামাশা দেখছে জেনেও ছেলেমানুষের মতো ভয় পেয়ে ছুটে পালায় লিউব্‌কা পাশের ঘরে।

অবশ্য পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মতো যেখানে সেখানে প্রেম করে বেড়ানোয় প্রিন্সের আপত্তি নেই বিশেষ, কিন্তু তবুও ওর জর্জিয়ান মায়ের বুকের দুধের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নৈতিক দৃঢ়তা। বন্ধুপত্নীর শুচিতা ওর কাছে হল অলঙ্ঘনীয় বস্তু। তা ছাড়া এ-ও বোধ করি বুঝত ও—আর এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই সব প্রাচ্যদেশের লোকেদের মধ্যে রয়েছে এক রকমের অদ্ভুত মানসিক অনুভূতি। যার ফলে ও অনায়াসেই বুঝে নিয়েছিল যে, যদি একটি মুহূর্তের জন্যেও ও লিউব্‌কাকে প্রণয়িনীর চোখে দেখে তবে এই মনোরম শান্ত গৃহস্থালির

চমৎকার সান্ধ্য-জীবনটি, যাতে এতখানি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ও আজকাল, চিরদিনের মতো হারাতে হবে ওকে। এ অপরূপ বস্তুটি হারাতে ও সম্পূর্ণ নারাজ; কারণ প্রায় সারা য়ুনিভার্সিটিময়ই যদিও সে সবাইকে তুই-তোকারি করে বেড়ায় তবুও এই দূর প্রবাসে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করে প্রিন্স।

সোলোবিয়েবই কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দলাভ করে থাকে এই পড়াশুনোর ব্যাপারে। এই বিশালবপু, বলবান, উদাসীন মানুষটি কেমন করে যেন অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে নারীত্বের গুপ্ত, অনধিগম্য, অপরূপ মায়া-মমতার জালের মধ্যে এসে জড়িয়ে পড়ে। শেষে ছাত্রীটিই কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে, আর গুরুমশাই অবনত শিরে তা মেনে চলতে থাকেন। অন্যান্য অনেক ছেলেমেয়ের মতো লিউব্‌কাও পড়বার আগেই লিখতে শিখে ফেলেছে। করেও কত রকমের ছেলেমানুষি। তাতে সোলোবিয়েব কোনই বাধা দেয় না। এই দেড় মাসের মধ্যেই ওর বিরাট, প্রশস্ত, বলবান হৃদয়খানা বাঁধা পড়ে যায় এই হঠাৎ-পাওয়া অবলা ভঙ্গুর প্রাণীটির কাছে—এ যেন হল, বিশালকায় এক হস্তীর একটি ক্ষীণজীবী, অসহায়, মুরগির ছানার উপরে সতত সশঙ্ক, উদার, অবোধ মমতা।

বই পড়া হল মস্ত বড়ো একটা আমোদ দুজনের কাছেই। আর তাতেও লিউব্‌কারই পছন্দমতো বই বাছাই করা হয়ে থাকে। 'ডন কুইক্‌জোট'খানা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না লিউব্‌কা, কিন্তু মহা উল্লাসে 'রবিনসন ক্রুসো'খানা আগাগোড়া শুনে নিল বসে বসে, আর বহুকাল পরে ক্রুসোর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্যটায় কেঁদে ভাসিয়ে দিল একেবারে। ডিকেন্সের গল্পও বেশ ভালো লাগে ওর, তাঁর হাসিমস্করার রসও গ্রহণ করতে পারে ও অনায়াসে। শেকভের গল্পও পড়ে ওরা। আপনা থেকেই লিউব্‌কা তাঁর পরিকল্পনার সৌন্দর্য, তাঁর হাসি আর অশ্রুর অন্তর্নিহিত মাধুর্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্পে ভারি মুগ্ধ হয়ে ওঠে লিউব্‌কা—দেখে তখন হাসিও পায়, মায়াও হয়। সোলোবিয়েব একবার ওকে পড়ে শোনায় শেকভের একটা গল্প। তাতে একটি ছাত্র জীবনে প্রথম যায় গণিকালয়ে, আর পরদিন বেচারা তার জন্যে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে। সোলোবিয়েব ভাবতেই পারেনি, গল্পটা লিউব্‌কার মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করবে—সারাক্ষণ হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে, হাত রগড়াতে রগড়াতে, কেবলই বলতে থাকে লিউব্‌কা—'হা ভগবান্! কোত্থেকে এত শত জানতে পারলেন উনি, এমন খুঁটে খুঁটে বলেছেন সব কথা। এ যে ছত্রে ছত্রে ঠিক আমাদেরই কথা লেখা সব!'

একবার আব্বে প্রেভোস্ত-এর লেখা, 'মানোঁ লেকুৎ আর গ্রিউ-র শেভালিয়ের-এর ইতিহাস' নামে একখানা প্রাচীন প্রেমকাহিনী লিউব্‌কাকে পড়ে শোনায় সোলোবিয়েব। সোলোবিয়েব নিজেও এই প্রথম পড়ছিল বইখানা। গল্পটায় প্লটের অভাব, সাদাসিধে বলার ধরন, পুরাতন রচনাশৈলী, সব মিলে মোটেই ভালো লাগছিল না তার। লিউব্‌কা কিন্তু এই বিসদৃশ অথচ সুন্দর উপন্যাসখানার রহস্যমধুর, করুণ, মর্মস্পর্শী, চটুল ঘটনাসমাবেশ শুধু কান দিয়েই নয়, সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে লাগল।

'সেন্ট ডেনিসে আসিয়া আমাদের বিবাহের কথা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গেল,'—পড়ে চলেছে সোলোবিয়েব, 'ধর্মনীতির বন্ধন খসিয়া পড়িল; এইভাবে অজ্ঞাতসারে আমাদের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।'

'কি করল ওরা?'—অস্বস্তিভরে হাতের কাজ ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে লিউব্‌কা, 'পুরুতঠাকুর সবাইকে বাদ দিয়ে? এমনি এমনিই?'

'তাই তো।'—উত্তর দিল সোলোবিয়েব, 'হয়েছে কি তাতে? অবাধ প্রেম, এই আর কি! এই যেমন তোমার আর লিখোনিনের মধ্যে।'

'আ, আমার কপাল! এ হল গে আলাদা কথা। জানোই তো কোত্থেকে ও কুড়িয়ে এনেছে আমায়। কিন্তু এ তো হচ্ছে নিখুঁত মেয়ে। ছেলেটার পক্ষে অমন কাজ করা নষ্টামির একশেষ, বাপু! দেখেই নিও ছুঁড়ীটাকে ভাসিয়ে দেবে শেষে। আহা, হতভাগী!'

কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা শুনতে শুনতেই লিউব্‌কার সমস্ত মনপ্রাণ ঘুরে যায় বঞ্চিত নায়কটির প্রতি।

'যাহা হউক, মঁসিঁয়ে দ্য ব-এর এই তস্করের ন্যায় আগমন ও পলায়ন আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।—'না, না মানোঁ কি আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে? ইহাও কি সম্ভব!' বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম, 'সে তো জানে, তাহাকে আমি কত ভালবাসি'।'

'আহা, বেচারা! বেচারা!' সহানুভূতিতে ভরে ওঠে লিউব্‌কা, 'কেন বুঝতে পারছ না তোমার মানোঁ ওই বড়লোকটার বাঁধা হয়ে আছে। উঃ, মুখপুড়ী!'

গল্পটা যতই এগিয়ে চলতে থাকে লিউব্‌কার আগ্রহও ততই বেড়ে চলে।

'সোলোবিয়েব, লক্ষ্মীটি, কে এই লেখক?'

'একজন ফরাসি পুরোহিত।'

'রাশিয়ান নয় তবে?'

'না, ফরাসি, বললামই তো।'

'পুরুত বললে না? এত কথা জানতে পারলেন কি করে তবে?'

'এমনিতেই জেনেছিলেন! মানে, প্রথমে ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। জীবনে অনেক কিছুই দেখেছিলেন তিনি। পরে আবার সন্ন্যাস ত্যাগ করে চলে আসেন।'

গ্রন্থকারের জীবনী পড়ে শোনায় সোলোবিয়েব। মনোযোগ দিয়ে আগাগোড়া শোনে লিউব্‌কা; মাঝেমাঝে মাথা নাড়ে; যেখানটা বুঝতে পারে না, ফিরে জিজ্ঞেস করে নেয়; তারপর শেষ হয়ে গেলে গম্ভীরভাবে বলে ওঠে, 'ও, এই তবে উনি! ভারি চমৎকার লিখেছেন কিন্তু। তবে মেয়েটা এত নীচ কেন? কত ভালোবাসতেন উনি তাকে, সারা মন-প্রাণ দিয়ে; আর তাকেই কিনা ঠকিয়ে এয়েছে আজীবন?'

'তা, আর কি করবে, লিউবোচ্‌কা? মেয়েটাও ওঁকে ভালোবাসত বই কি! তবে ছিল বড্ড দেমাকি, নাচুনির একশেষ, আর ছন্নমতি। চাইত শুধু সাজগোজ, গয়নাগাটি, এই সব আর-কি।'

জ্বলে ওঠে লিউব্‌কা, 'আমি হলে মুখ খেঁতলে দিতাম হতচ্ছাড়ীর! এর নাম ওর ভালোবাসা! কাউকে যদি ভালোবাসিস তবে সে তোকে ইচ্ছে করে যা দেবে তাই মাথায় করে রাখবি তুই। সে যদি জেলে যায়, তুইও যাবি তার সঙ্গে সঙ্গে। সে যদি হয় চোর তুই হবি চুরনী। সে যদি হয় ভিখিরি, তুই হবি ভিখিরিণী। ভালোবাসাই যদি থাকে তবে এক টুকরো বাসি রুটিতেই পেট ভরবে তোর। ও মাগী ছিল হতচ্ছাড়ী, একলসেঁড়ে। আমি হলে মুখ দেখতাম না শয়তানীর।'

উপন্যাসখানা শেষ করতে অনেক দিন লাগে লিউব্‌কার। শুনতে বসলেই হু হু করে কেঁদে ফেলে বেচারা, আর তখনই পড়া বন্ধ করে দিতে হয়।

কারাকক্ষে প্রণয়ীযুগলের দুর্দশার কাহিনী, মানোঁর আমেরিকায় নির্বাসন আর দ্য গ্রিউ-র স্বেচ্ছায় তার অনুসরণ, এ-সব ঘটনা এমন ভাবে লিউব্‌কার কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে বেচারা শেষটায় মন্তব্য প্রকাশ করতেও ভুলে যায়। মরুপ্রান্তরে মানোঁর শান্ত সুন্দর মরণের কথা শুনতে শুনতে, বুকে হাত রেখে পাথর হয়ে চেয়ে বসে থাকে শুধু প্রদীপের দিকে। তারপর যখন পর পর দু-দিন ধরে দ্য গ্রিউ হতভম্ব হয়ে ঠার

বসে রইল তার প্রেয়সীর প্রাণহীন দেহের পাশে, শেষে যখন তার তরোয়ালের ডগা দিয়ে মানোঁর জন্যে কবর খুঁড়তে বসল—সে-সব কথা শুনে এমন করে ডুকরে কেঁদে ওঠে লিউবকা যে সোলোবিয়েব তো দস্তুরমতো ভয় খেয়ে ছুটে যায় জল আনতে। কান্না থামার পরও অনেকক্ষণ অবধি বসে বসে ফোঁপাতে থাকে বেচারা, আর তারই মধ্যে ঘন ঘন নিশ্বাস টানতে টানতে বলে চলে, 'আহা! কি দুঃখী ওরা! কি অদেষ্ট ওদের! সোলোবিয়েব, লক্ষ্মীটি, এই কি সংসারের নিয়ম? যে-ই একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যে হল ভালোবাসা অমনিই কি ভগবান তাদের এমনি করে শাস্তি দিলেন? কেন এমনটি হয়, লক্ষ্মীটি? কেন হয় গো?'

১৭

কিন্তু শিমানোবস্কীর মুরুব্বিয়ানা আর নীরস শিক্ষাপদ্ধতি অসহ্য অত্যাচারের সামিল হয়ে ওঠে লিউবকার কাছে। এই মুরুব্বিয়ানারই জোরে কিন্তু সে নিজের এতখানি পসার জমিয়ে ফেলেছিল ছাত্রদের মধ্যে, এরই জোরে নবাগতদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করত সে। ছাত্রদের সকল রকমের কাজের সে ছিল একজন বিশিষ্ট পান্ডা, তাদের অর্থ-ভান্ডারের একজন প্রধান পুরোহিত।

লিউবকার হৃদয়-মন যেন ওর নখদর্পণে। স্থির করল, প্রথমেই শুরু করবে রসায়ন আর পদার্থতত্ত্ব দিয়ে। 'ওর কাঁচা মেয়েলি মন থ মেরে যাবে তা হলে,'—মনে মনে গবেষণা করল সে, 'তখন সে আমারই প্রতি সমস্ত মনোযোগ দেবে। তারপর সমস্ত কুসংস্কার, সব বাধাবন্ধ পার করে নিয়ে যাব ওকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রহস্যজাল উদ্ঘাটন করবার দিকে।'

শিক্ষাপদ্ধতিতে তার কোন সামঞ্জস্য ছিল না,—হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে খালি লিউবকাকে চমক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করত। একবার ও নিয়ে এল বারুদভর্তি একটা নকল সাপ। তাতে আগুন লাগিয়ে দিতেই সাপটা পট পট করতে করতে ঘরময় কিলবিল করে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। মোটেই অবাক হল না লিউবকা, বলল—'এ তো আতশবাজী!' তারপর একদিন মস্ত বড়ো একটা বোতল, খানিকটা রাঙতা, আর-একটু রজন আর একটা বেড়ালের লেজ দিয়ে তৈরি করল শিমানোবস্কী একটা 'লীডেন জার'; যৎসামান্য হলেও, বিদ্যুৎস্ফুরণ হতে লাগল তা থেকে। শক্ খেয়ে চটে গেল লিউবকা, 'এ সব কি শয়তানি!'

তারপর একদিন অক্সিজেন তৈরি করে দেখাল শিমানোবস্কী। খুশি হয়ে হাত-তালি দিতে লাগল লিউবকা, 'আর একটু, প্রফেসর মশাই, আরও একটুখানি!' তারপর অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে লিউবকাকে বলল বোতলটার মুখ মোমবাতির আগুনে ধরতে। দুম্ করে প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল ঘরখানা, ছাত থেকে খানিকটা চুনবালি খসে পড়ল। ভয়ে আধমরা হয়ে গেল লিউবকা, কিন্তু সামলে উঠেই গম্ভীর-ভাবে বলল, 'ক্ষমা করবেন কিন্তু, এ-খানা আমার নিজের ফ্ল্যাট। আমিও বেশ্যেমাগী নই, মানমর্যাদা আছে। আমার বাড়িতে এ রকম নষ্টামি করতে দেব না আমি।'

ফলিত বিজ্ঞানে সুবিধা করে উঠতে পারল না শিমানোবস্কী—পড়ল এবার দর্শনশাস্ত্র নিয়ে। একদিন খুব ভারিক্কি চালে, যার পর আর কথাই উঠতে পারে না এমন ভাবখানা দেখিয়ে, সে বলল ভগবান বলে কিছু নেই, এখুনি প্রমাণ করে দেবে সে। দপ করে জ্বলে উঠল লিউবকা, সোজা দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বলল—এই কিছুদিন আগেও সে যদিও এক বেশ্যা ছিল তবুও এমন অধর্মের কথা মুখ বুজে সইবে না সে, বেশি

বাড়াবাড়ি করলে বলে দেবে সব বাসিল বাসিলিচকে। 'তা ছাড়া এও বলে দেব,'—কাঁদো কাঁদো সুরে বলতে লাগল সে—'আমায় লেখাপড়া শেখাবার বদলে আপনি খালি যা-তা নিয়ে বক-বক করেন বসে বসে, আর সারাক্ষণ আমার হাঁটুতে হাত দিয়ে বসে থাকেন। ভদ্র ব্যাভার নয় এ-সব।' বলেই সাঁ করে সরে এল লিউব্‌কা গুরুমশাইয়ের পাশ থেকে—সেদিনের সেই মূক ভীরু লিউব্‌কা।

তবুও হাল ছাড়ে না শিমানোব্‌স্কী—লিউব্‌কার চিত্তবৃত্তি আর কল্পনাশক্তি উসকে দেবার চেষ্টা করে। ক্ষুদ্র অ্যামিবা থেকে আরম্ভ করে নাপোলেয়ঁ অবধি জীবনের ক্রমবিকাশ-ধারা ব্যাখ্যা করে বোঝায় তাকে, মন দিয়ে শোনে সব লিউব্‌কা। কিন্তু সারাক্ষণ চোখ দুটিতে তার করুণ মিনতি ফুটে ওঠে—'থামুন দয়া করে!' মার্কস্-এর ব্যাখ্যায়ও সুবিধে হয় না কিছুই—অনর্থক বাগাড়ম্বর বলে মনে হয় সব লিউব্‌কার কাছে।

তাই বলে শিমানোব্‌স্কী যে মেয়েছেলে পটাতে পারে না তা নয়। তার মুরুব্বিয়ানার ভাব, ভারিক্কি কথাবার্তা সরল বিশ্বাসপ্রবণ মনের উপরে ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দীর্ঘদিনের বন্ধনের মধ্যেও অনায়াসে নাক গলাতে পারে সে। তাই লিউব্‌কার শান্ত সুদৃঢ় প্রত্যাখ্যান তাকে ক্রমেই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করে তুলতে থাকে। বিশেষ করে যা তাকে খেপিয়ে তোলে সে হচ্ছে—দুদিন আগেও যে ছিল সর্ব-ভোগ্যা, মাত্র দুটি রুবলের বিনিময়ে একই রাতে পর পর বহু লোককে যে প্রেম বিতরণ করে এসেছে, সেই মেয়েটিরই আজ যৌন লালসার প্রতি হঠাৎ এই লোকদেখানো নিরাসক্তি। 'তাই আর কি!'—মনে মনে ভাবে শিমানোব্‌স্কী, 'এ কিছুতেই হতে পারে না। ভড়ং করছে আমার সামনে, বোধ হয় আমিও ওর ঠিক জায়গাটিতে ঘা দিতে পারছি না।'

আর দিনকে-দিন ক্রমেই আরও খুঁতখুঁতে আর কড়া হয়ে উঠতে থাকে শিমানোব্‌স্কী। লিউব্‌কা একবার নালিশও করল লিখোনিনের কাছে, 'বড্ড কড়াক্কড়ি লাগিয়ে দিয়েছেন উনি, বাসিল বাসিলিচ। কি যে সব বলেন একটি বর্ণও বুঝতে পারিনা তার; ওঁর কাছে পড়ব না আর।'

কোনোরকমে শান্ত করে তাকে লিখোনিন; কিন্তু শিমানোব্‌স্কীর সঙ্গে কথাও হয় তার। অত্যন্ত শান্ত সংযত ভাবে জবাব দেয় শিমানোব্‌স্কী, 'বেশ তো হে ভায়া, আমার শিক্ষাপ্রণালী যদি তোমার কি লিউব্‌কার অপছন্দ হয় তবে না হয় বাদই দাও আমায়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওর শিক্ষার মধ্যে সত্যিকারের নিয়মনিষ্ঠা আনা। কোন বিষয় ও বুঝতে না পারলে আমি জোর করে বসিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিই, চেঁচিয়ে পড়তে বলি। পরে অবশ্য এর দরকার থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে এ ছাড়া আর পথ নেই। একবার মনে করে দেখ, লিখোনিন, পাটিগণিত থেকে বীজগণিতে প্রবেশ করতে কি বেগই না পেতে হয়েছিল আমাদের। আর আমাদেরই বা কেন ওরা তবে ব্যাকরণ পড়াল, সোজাসুজি গল্প আর পদ্য লিখতে বললেই তো হত!'

আর ঠিক তার পরের দিনই, দেয়ালে টাঙানো বাতিটার ছায়ার নিচে, লিউব্‌কার শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়ে, তার বুক আর বগলের কাছে মুখ এনে দেহসৌরভের ঘ্রাণ নিতে নিতে বলে চলে সে, 'আঁক একটা ত্রিকোণ—এই তো হ্যাঁ, এমনি ক'রে, এমনি ভাবে। ওপরে লেখ 'প্রেম।' শুধু প লিখলেই চলবে, তলায় লেখ ন আর ন। মানে হ'ল 'নরনারীর প্রেম'।'

তারপর সিদ্ধপুরুষের মতো অবিচল কঠোর ভাবখানা ধরে যত সব কদর্য কথা উদ্গার করতে থাকে শিমানোব্‌স্কী। শেষে হঠাৎ বলে ওঠে, 'দেখ, লিউবা! কামলালসা হল ঠিক এই পানাহার আর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতো।' সঙ্গে সঙ্গে লিউব্‌কার উরুতে জোরে একটা টিপুনি দিয়ে বসে সে। থতমত খেয়ে, পাছে ও চটে যায় সেই ভয়ে, আস্তে আস্তে পা সরিয়ে নেয় লিউব্‌কা।

'ধরো, দৈবাৎ একদিন বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার সময় হল না তোমার, কোন খাবারের দোকানে গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে এলে তুমি; তাতে কি দোষ ধরবেন তোমার মা-বোন, কি তোমার স্বামী? প্রেমের ব্যাপারেও ঠিক তাই। একটা দৈহিক আনন্দ উপভোগ মাত্র। হয়ত অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তীব্রতর এ আনন্দ—তা ছাড়া আর-কিছু নয়! তোমায় পেতে চাই আমি নারী রূপে। আর তুমিও—'

'আঃ, থামুন মশাই,'—বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিতে যায় লিউব্‌কা, 'সারাক্ষণ ধরে সেই একই কথা নিয়ে এত মাতামাতি করে চলেছেন কিসের জন্যে? অন্য কথা পাড়ুন এখন। কতবারই তো বলা হয়েছে আপনাকে—না, না, না। ভাবছেন, আপনি কি চান তা বুঝি না আমি? কিন্তু কিছুতেই আমি বিশ্বাস ভাঙতে পারব না। বাসিল বাসিলিচ আমার অশেষ উপকার করেছে, তাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, পুজো করি—আর আপনি? আপনার বুকনিতে গায়ে জ্বালা ধরে যায় আমার।'

আর একবার শিমানোবস্কী এক কান্ড বাধিয়ে ফেলে লিউব্‌কাকে লজ্জায় অপমানে খেপিয়ে তুলল একেবারে। লিখোনিন যে একটি এই রকমের মেয়েকে কুড়িয়ে এনে তার চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা করেছে—এ-কথা য়ুনিভার্সিটির ছাত্রীদেরও কানে উঠেছিল। শিমানোবস্কী একদিন তাদের কয়েকজনকে নিয়ে এল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল লিউব্‌কা। পরিচয়ের বেলায় ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করল তাদের চারজনকে। সবাইকে চা আর জ্যাম খাইয়ে পরিতুষ্ট করল, এমন কি ছাত্রী চারজনের মুখের সিগারেটে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিতেও ভুল হল না তার। কিন্তু তাদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের সামনে বসল না। একটি মেয়ের হাত থেকে রুমালখানা খসে মাটিতে পড়তেই সে ছুটে তা তুলে দিতে এগিয়ে গেল। আর ছাত্রীরা বেশ করুণার চোখে দেখতে লাগল তাকে।

একটি ছাত্রী অনবরত তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল—পরম অবহেলা তার চোখে। 'কই, আমি তো কখনও ওর পাকা ধানে মই দিই নি,'—অস্বস্তিভরে মনে মনে ভাবল লিউব্‌কা। আর-একজন নির্বোধের ভাব দেখিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ওকে, 'আচ্ছা বল দেখি, বাছা, কে সে পাপিষ্ঠ, যে এই...প্রথমে তোমার—এই, তা বুঝতেই তো পারছ?'

চট্ করে লিউব্‌কার চোখের সামনে দিয়ে তার পূর্বতন সাথী জেন্‌কা আর তামারার ছবি ভেসে গেল। কেমন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে জানে ওরা, কি সাহস আর কত বুদ্ধি ওদের! এদের চেয়ে ঢের ঢের বুদ্ধিমতী ওরা! হঠাৎ কিছু না ভেবে-চিন্তে তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে উঠল লিউব্‌কা, 'তা, অনেকেই ছিল, একসঙ্গে। মনেও নেই সব। কোল্‌কা, মিৎকা, বোলোদ্‌কা, সেয়েজাকা, জোর্জিক, গ্রোস্কা, পেৎকা, তা ছাড়া ওই কুজ্‌কা আর গুসকা একদল সুদ্ধ। কিন্তু এ কথা জানতে এত আগ্রহ কেন আপনাদের?"

'কেন—না—মানে, তোমার ওপরে দরদবশেই জিজ্ঞেস করছি!'

'তা আপনার কোনও প্রণয়ী আছে?'

'মাপ কর, কি বলছ বুঝতে পারছি না।—কই, যাবে না সব?'

'তার মানে কি বুঝতে পারছেন না? কখন কোন ব্যাটাছেলের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছেন কি?'

'কমরেড শিমানোবস্কী!' তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল কঁদুলে মেয়েটি, 'আগে বুঝতে পারিনি, এমন একজনের কাছে নিয়ে আসবেন আপনি আমাদের। ধন্যবাদ! চমৎকার হয়েছে!'

লিউব্‌কা ছিল সেই প্রকৃতির মেয়ে—যারা মুখটি বুজে সয়ে থাকে ঢের, কিন্তু তার

পরমুহূর্তেই লজ্জাভয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে। সদাসর্বদা এমন ভিতভিতে স্বভাবের সেই লিউব্‌কাকে চেনাই যায় না তখন আর।

'কিন্তু আমি জানি,' ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে লিউব্‌কা, 'আমি জানি, আমিও যা আপনারাও তাই! তবে আপনাদের বাপ আছে, মা আছে, আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে আর যদি দরকার হয় আপনারা পেট খসাতেও পারেন—অনেকেই তা করে থাকেন। কিন্তু আপনারা যদি পড়তেন আমার জায়গায়, পেট ভরাবার উপায় যদি না থাকত, আর ছোট একটা মেয়ে তখনও সংসারের কিছুই বোঝে না সে, লিখতে পড়তে পর্যন্ত জানে না, আর চারধারে তার পুরুষমানুষের ভিড়—হ্যাংলা মদ্দা-কুকুরের পাল সব—তাহলে আপনাদেরও শেষে গিয়ে উঠতে হত এই রকম কোন-একটা খেলাঘরে। আমার মতো এক হতভাগীর সামনে এসে এ-রকম চাল-দেখানো লজ্জার কথা—হ্যাঁ, তাই!'

শিমানোব্‌স্কী পড়ল মহাবিপদে। কোনরকমে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের নিয়ে তো এখনকার মতো বিদায় হয়ে গেল সে। তবুও লীলাখেলার তার শেষ হয়নি তখনও।

ইতিমধ্যে অনেকদিন থেকেই লিউব্‌কা নালিশ করে আসছে লিখোনিনের কাছে যে শিমানোব্‌স্কীকে তার ভারি অসহ্য লাগে। লিখোনিন এ-সব মেয়েলী খুঁটিনাটির কথায় কানও দেয় না; শিমানোব্‌স্কীর অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যে কথার চাতুরি তাকে বেশ করেই পেয়ে বসেছিল। এদিকে আবার, লিউব্‌কার সঙ্গে সহবাসের বোঝা তার কাছে অনেক-দিন থেকেই ভারি পাপের পসরার মতো হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই মনে মনে ভাবত সে, 'মেয়েটা আমার জীবনটাই মাটি করে দিচ্ছে; অপদার্থ বনে যাচ্ছি আমি দিনকে-দিন—শুধু মান-অভিমান, হাসি-কান্নাতেই ডুবে আছি। এর পরিণতি হল লিউব্‌কাকে বিয়ে করা, আর তারপর যা হোক একটা চাকরিবাকরি জুটিয়ে নিয়ে কোন এঁদো মফস্বলে গিয়ে পড়ে পড়ে পচা। কোথায় গেল আমার জীবনস্বপ্ন, আমার উচ্চাশা, মানুষের কল্যাণে আত্মবিনিয়োগ?' সময় সময় বেশ বিড়বিড় করেই ও এই সব কথা, বসে বসে বকে, চুলও ছেঁড়ে! তাই লিউব্‌কার নালিশের কথায় মন না দিয়েই হঠাৎ খেপে ওঠে সে, চেঁচায়, পা ঠোকে মেঝেয়। আর বেচারী লিউব্‌কা তখন চুপটি করে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে এসে কেঁদে কেঁদে মনের জ্বালা জুড়োয় একা একা।

আজকাল এই রকম ঝগড়াঝাটির পর আবার যখন মিল হয় তখন প্রায়ই লিউব্‌কাকে বলে লিখোনিন, 'দেখ, লিউবা লক্ষ্মীটি, আমরা দুজনে ঠিক খাপ খাচ্ছি না। শোন, এই একশ রুবল দিচ্ছি তোমায়, সিধে বাড়ি চলে যাও। তোমার আত্মীয়-স্বজনরা তোমায় ঠাঁই দেবেখন। সেখানে থাক গে মাস ছয়েক; তারপর আমি গিয়ে দেখা করব। সেখানে গেলে বিশ্রামও পাবে তুমি, আর শহরের এই যে পাঁক জড়িয়ে গেছে তোমার দেহে মনে, তা-ও নিঃশেষে ধুয়ে পুঁছে যাবে ততদিনে। তখন তুমি কারুর সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে—একাই পারবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে।'

কিন্তু যে-মেয়ে জীবনে ভালোবেসেছে এই প্রথম, আর মনে মনে ঠিক জেনেছে এই তার একমাত্র ভালোবাসা, এই শেষ, তাকে কি আর কিছুতে বোঝানো যায়? সে কি বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা মানতে পারে? যুক্তি-তর্কের ধার ধারে কিছু? শিমানোব্‌স্কীর প্রতি একটা শ্রদ্ধাবনত ভাব সত্ত্বেও কেমন করে শেষে আন্দাজ করে ফেলল লিখোনিন—লিউব্‌কার সঙ্গে তার সম্পর্কটা আসলে কি। আর নিজে ছাড়া পাবার আগ্রহে, অথচ বোঝাটা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলবার অক্ষমতার দরুন সময় সময় কুশ্রী একটা চিন্তাকে মনে মনে আঁকড়ে ধরতে চায় সে, 'শিমানোব্‌স্কী তো ওকে পেলে খুশিই হয়। আর ওর পক্ষে শিমানোব্‌স্কীই হোক, আমিই হই, কি আর কেউই হোক, সবই তো সমান। আচ্ছা, সব কথা শিমানোব্‌স্কীকে বেশ করে বুঝিয়ে বলে ওকে ভিড়িয়ে দিই না কেন?

কিন্তু তা যেন হল, বেহদ্দ মেয়েটা যে যাবে না কিছুতেই, বরং একটা কাণ্ডকারখানা না বাধিয়ে বসে শেষটায়। আরও একটা উপায় আছে। ওরা দুজন যখন একত্র থাকবে তখন হঠাৎ এসে পড়ে হৈ-চৈ করে উঠলে কেমন হয়! খুব খানিকটা উদারতা দেখিয়ে—গোটা কয়েক টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তারপর—একেবারে পিঠটান!'

প্রায়ই আজকাল বাড়ি ফেরে না লিখোনিন—একাদিক্রমে দিনকয়েক বাইরে বাইরেই কাটায়। ফিরে এলেই হয় নানা রকমের মেয়েলী প্রশ্ন, কান্নাকাটি, কত কি! তারপর ফের ক্ষমাভিক্ষা, আদর সোহাগ; শেষে নতুন করে ব্রহ্মচর্যের সঙ্কল্প গ্রহণ করে লিখোনিন, নতুন করে পাপে ডোবে ফের। আর প্রত্যেকবার পতনের পরই তিক্তকণ্ঠে বলে সে, 'শপথ করে বলছি—পাশবিকতার আমার এখানেই ইতি।'

লিখোনিন যখন বাইরে যায়, লুকিয়ে লক্ষ্য করে লিউব্‌কা। যে-দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সে তার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ওর প্রতীক্ষায়। লিখোনিনের চিঠিপত্র খুলে দেখে, পড়তে পারে না, শুধু লুকিয়ে রেখে দেয় রান্নাঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্রের মধ্যে। এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে বেচারা যে রাগারাগির সময় সালফিউরিক এসিডের ভয়ও দেখায় সে লিখোনিনকে।

'গোল্লায় যাক ও', মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে ভাবে লিখোনিন, 'শুধু একবার কাছা-কাছি হলেই হয় দুজন। তাই নিয়ে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসব যে দুজনই ভয় খেয়ে যাবে একদম।' তারপর কি কি বলবে, মনে মনেই তালিম দেয় সে বসে বসে, 'ওঃ এই! —বুকে করে রেখেছিলাম তোমায়, তার এই প্রতিদান?—আর তুমি, আমার প্রাণের দোসর, আমার একটিমাত্র সুখ তা-ও সইল না তোমার!—আহা, না, না; থাক, থাক, এ ভাবেই থাক দুজন; কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হই আমি। দেখছি, আমিই তোমাদের সুখের কাঁটা! তোমাদের ভালোবাসায় বিঘ্ন ঘটাতে চাই না আর!'

আর অবিকল এই স্বপ্নই কি না শেষটায় সফল হল!

সেদিন ছিল সোলোবিয়েবের পড়াবার দিন। ভারি খুশি হয়ে উঠেছে সোলোবিয়েব —কোথাও না ঠেকে লিউব্‌কা পড়া দিতে পেরেছে সেদিন—'মিখির একটি সুন্দর লাঙ্গল আছে, সিসোইরও একটি সুন্দর লাঙ্গল আছে—একটি পাখী—একটি দোলনা—শিশুরা ঈশ্বরকে ভালোবাসে।'—আর এর পুরস্কারস্বরূপ সোলোবিয়েব পড়ে শোনাল তাকে 'বণিক্ কালাশ্‌নিকোব ও কিরিবেইয়েকিচ' আর 'সম্রাট্ চতুর্থ ইভানের দেহরক্ষী' নামে দুটো গল্প। খুশিতে হাততালি দিয়ে আর্ম-চেয়ারটার মধ্যে গা দুলিয়ে ওঠে লিউব্‌কা ছোট্ট মেয়েটির মতন। কিন্তু সোলোবিয়েবের সেদিন ছিল কি-একটা কাজের তাড়া। তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে লিউব্‌কা দেখে—দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে শিমানোব্‌স্কী। মুহূর্তেই শুকিয়ে গেল ওর মুখ। আজকাল কিছুতেই ও যেন সইতে পারে না তাকে।

শিমানোব্‌স্কী এসেই বক্তৃতা শুরু করে দিল—'মানুষ স্বয়ংসিদ্ধ, স্বাধীন, মুক্ত। তার কাছে নেই কোন বিধিনিষেধ, নেই পাপপুণ্য,—ন্যায়-অন্যায়, নীচতা, কিছুই নেই। ইচ্ছে করলে সে স্বয়ং ভগবান হয়ে উঠতে পারে, ইচ্ছে করলে নরকের কীটও হতে পারে —সবই সমান তার কাছে।'

আজ ঠিক করে এসেছিল শিমানোব্‌স্কী যে এর পর কামশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে বসবে, কিন্তু অধৈর্য হয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় সে লিউব্‌কাকে বুকের মধ্যে, তারপর বর্বরের মতো নিপীড়ন করতে থাকে তাকে। 'আদরে সোহাগে মত্ত হয়ে উঠবে লিউব্‌কা,' —মনে মনে ভাবে সে, 'আর স্বেচ্ছায়ই ধরা দেবে তখন।' চুমু খাবার জন্যে ওর মুখখানা নিয়ে কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দেয় শিমানোব্‌স্কী, আর লিউব্‌কা চেঁচামেচি করতে করতে কেবল থুথু ছিটোতে থাকে ওর মুখে। চক্ষুলজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে যায় লিউব্‌কার।

'বেরিয়ে যা, নচ্ছার, শয়তান, হতচ্ছাড়া, শুয়ার, নোঙরামুখো! মুখ ভেঙে দেব তোর।'

গণিকালয়ের ভুলে-যাওয়া চোখা-চোখা বুলি সব বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে ফের। শিমানোব্স্কীর চোখ থেকে পাঁশ-নেটা খসে পড়েছে, মুখে যা আসছে তাই বলে চলেছে সে, 'প্রেয়সী আমার—কি দোষ এতে—এক মুহূর্তের একটু সুখ বই তো নয়! —তুমি আর আমি পরমানন্দে এক হয়ে মিশে যাব!—কেউ জানতে পারবে না!—তুমি আমার হও!'—ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ঘরে এসে ঢোকে লিখোনিন।

'বটে!'—নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অভিনেতার মতো হাত দুখানা অবশভাবে পাশে এলিয়ে দেয় সে। থুতনিটা প্রায় বুকের সঙ্গে নেতিয়ে পড়ে কাঁপতে থাকে তার। মর্মস্পর্শী ভাষায় বলতে শুরু করে দেয়, 'সব-কিছুই আশা করতে পারতাম, শুধু এইটি কখনও আশা করিনি। তোমায় ক্ষমা করতে পারি, লিউবা—তুমি হলে নরকের কীট; কিন্তু তুমি, শিমানোব্স্কী—শ্রদ্ধা করতাম তোমায়—যাক গে, এখনও মনে মনে জানি তোমায় সৎলোক ব'লে। কিন্তু নিজেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, বিবেকের নির্দেশের চেয়ে রিপুর উত্তেজনা সময় সময় কত প্রবল হয়ে ওঠে। যাক, এই পঞ্চাশটা রুবল রেখে যাচ্ছি—লিউবার জন্যে; তুমি যে একদিন তা শোধ করে দেবে তাতে সন্দেহ নেই আমার। ওর একটা বিধিব্যবস্থা করে দিও। তুমি বিজ্ঞ, হৃদয়বান, সৎলোক, আর আমি—('একটি পশু'—কে যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলে ওঠে তার কানে কানে) আমি চলে যাচ্ছি, এ অত্যাচার সহ্য করবার শক্তি নেই আমার। সুখী হও!' টান মেরে পকেট থেকে টাকার থলিটা বের করে ধপ করে টেবিলের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় লিখোনিন। তারপর দুহাতে চুলের মুঠি ধরে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। দোরগোড়ায় এসে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'তোমার পাশপোর্টখানা আমার ডেস্কের মধ্যে রয়েছে।'

তবুও, ওর পক্ষে কেটে পড়ার এই হল প্রশস্ত পথ। আর এতদিন ধরে যে-স্বপ্ন ও দেখে এসেছে মনে মনে, ঘটনার পরিণতিও হল কিনা অবিকল সেই ভাবেই!

তৃতীয় খণ্ড

১

জেন্‌কার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে সব কথা খুলে বলে লিউব্‌কা।

লিউব্‌কার বিশ্বাস, লিখোনিন ওকে ফুসলে বার করে নিয়ে গিয়েছিল; তারপর বোকা পেয়ে যতটা পেরেছে রস নিঙড়ে নিয়ে, ছোবড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এখন। সত্যি, লিখোনিনকে ভালোবেসে ফেলেছে লিউব্‌কা। লিখোনিনের সঙ্গে ওদের ওই সব এলোখোঁপা মেয়েদের মেশামিশিতে লিউব্‌কার বেজায় হিংসে দেখে, একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে নোঙরা ষড়যন্ত্র করে তাকে পাঠিয়ে দিল—আর যেই না সেই বদমাইশ ছোঁড়াটা এসে জড়িয়ে ধরেছে ওকে, অমনি আচমকা বাস্‌কা এসে ঢুকে খুব একচোট হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, তারপর তেড়ে বার করে দিল ওকে রাস্তায়।

তারপর কি করেই যে দিন কেটেছে লিউব্‌কার! সঙ্গী নেই, সাথী নেই, একা, অসহায় নির্জন এক রাস্তার উপরে ছোট্ট বাজেমার্কা এক হোটেলের চিলেকুঠিতে গিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে মাথা গ‍ুঁজে পড়ে রইল বেচারা। তা সেখানেই কি নিস্তার আছে নাকি! সবে যেদিন পা দিয়েছে সেখানে, সেদিনই কোত্থেকে এক ঘুঘু, পুরোনো ঘোড়েল মিনসে এসে, বলা নেই, কওয়া নেই জিজ্ঞেসটি পর্যন্ত না ক'রে, ওকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার ফন্দি আঁটল। তাই সেখান থেকেও সরতে হল তখন। তারপর এসে পড়ল কিনা এক কুটনী মাগীর পাল্লায়।

তবুও যে লিউব্‌কা দ্বিতীয় বারের পতন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলবার জোর পেয়েছিল সে শুধু তার ওই আন্তরিক ভালোবাসার গুণে। সাহস করে খবরের কাগজ-গুলোতে গোটাকয়েক বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিল—কোন ভদ্রপরিবারে পেটভাতায় কাজ করতে রাজি আছে ব'লে। তা একে তো নেই ওর কোন পরিচয়পত্র; তাই শুধু মেয়েদেরই সঙ্গে দেখা করে করে কাজ খুঁজে বেড়ানো ছাড়া গতি ছিল না ওর। এক আঁচড়েই বুঝে নিল তারা—এ হল তাদের সেই চিরকেলে শত্রু, তাদের স্বামী, ভাই, বাপ, ছেলেদের মনভুলানি মেয়ে। তাই তেমন সুবিধে হল না কোথাও।

দেশে ফেরারও পথ নেই। সবাই জেনে ফেলেছে এতদিনে কোন্‌পথে সে পা বাড়িয়েছে। কেন, এই তো তার নিজের গ্রাম থেকেই তো কত লোক এসে চাক্ষুষ দেখে গেছে ওকে আনা মারকোব্‌নার ওখানে। নাঃ, তার চেয়ে বরং গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।

এদিকে আবার টাকাকড়ির বিষয়ে লিউব্‌কা হল বড্ড বেহিসেবি—পাঁচ বছরের মেয়েটি যেন। দুদিনেই ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে গেল, অথচ বেশ্যালয়ে ফিরে যেতে ভয়ও করে, ঘেন্নাও হয়। কিন্তু পথে পথে ঘুরে খদ্দের যোগাড় করা হল একেবারে হাতের পাঁচ, পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় সব। শেষে সেই পথই ধরল লিউব্‌কা।

সন্ধ্যেবেলায় বড় রাস্তার ধারে ওকে চলতে ফিরতে দেখে, পুরোনো ঘাগী বেশ্যারা এক নজরেই চিনে নিল ওকে। যখন-তখনই কেউ-না-কেউ একেবারে ওর পাশটিতে এসে ঘেঁষে দাঁড়ায়, মন-ভোলানো মিঠে গলায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেয়, 'কি গো মেয়ে, একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ যে বড়? এস, সই পাতাবে এস। একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো যাবে'খন। 'আর হ্যাঁ, তা ছাড়া আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোয় লাভ আছে, বাছা। ইনস্পেক্টারদের সব চিনি আমি।'

'কিসের ইনস্পেক্টার?' জিজ্ঞেস করে লিউব্‌কা।

'কেন, ওই যে সব মাছিধরা পুলিস, যিনি টিকিটের ছুঁড়ীদের সব ধরে ধরে চালান দেয়। চিনবে কি করে ওদের? থানায় নিয়ে গিয়ে তোমার ছাড়পত্তরখানা নেবে কেড়ে, তার বদলি দেবে ওই বেউশ্যে মাগীর টিকিট। আর নাও, সামলাও ঠেলা এখন, হপ্তায় হপ্তায় ছোট থানায় হাজরে দিতে। —তা হলদে টিকিট থাকলেই কি নিস্তার আছে নাকি লা? খুশি হলেই ধরে নিয়ে যাবে। তারপর দু-হপ্তার জেল। বলবে—মাতলামো করছিলে, নয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক ডাকছিলে। মানে দু-হপ্তার রোজগারের দফা গয়া।' এবার আসল কথা পাড়ে মেয়েটি—'তাই বলছিলাম কি, তুমি বরঞ্চ আমাদের সঙ্গে এস। আমাদের যে বাড়িউলী আছে সে লোক ভালো। আর আমরা তো মোটে তিনজন আছি, আর একজনের জায়গা কি হবেনি বাছা?'

তা, মেয়েটি মেয়ে ফুসলাতে জানে বটে। আরম্ভ করে বাড়িউলীর প্রশংসা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাখ্যান, খুশিমতো চলাফেরার সুবিধের কথা। বলে, 'তা বাড়িউলীকে নুকিয়ে খদ্দেরের কাছ থেকে বাড়তি আদায়ও হয়, বাছা!' তারপর বসে নিন্দে করত ঐ সব বাড়ির মেয়েদের—'ও তো সরকারি খোঁয়াড়, কচি-খুকীদের পাঠশালা।' লিউব্‌কা জানে

এসব নিন্দার দাম কত। ঐ সব জায়গার মেয়েরাও আবার এই সব পথচারিণীদের লক্ষ্য করে নাক সিঁট্‌কে বলে, 'ঘেয়ো কুত্তী!'

তা শেষ অবধি যা হবার তাই হয়। অন্ধকার, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে, লিউব্‌কা আবার নেমে পড়ে সেই দেহের বেসাতি করতে। এবারকার ব্যবসায় তার প্রথম খদ্দের হলেন দিব্য সুবেশ এক বুড়ো ভদ্রলোক—দেখে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেই মনে হয় তাঁকে, কিন্তু পয়লা নম্বরের অসভ্য বাঁদর একটি। যথারীতি তাঁর মনোরঞ্জন করে, পাবার বেলায় একটি রুবল মোটে পেল বেচারী—আপত্তি করতে সাহসে কুলোল না। পরের বার এসে দিব্যি সুখটি আদায় করে নিয়ে, 'টাকা ভাঙিয়ে আনছি' বলে সেই যে কেটে পড়লেন—আর দেখা মিলল না তাঁর।

আর এক ছোকরাও তারপর একদিন ঠিক ঐ কাণ্ডই করেছিল। খুব সাজগোজ করে এসে নিয়ে গেল ওকে এক হোটেলে। সেখানে বসে লম্বা-চওড়া গুলগাল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল সে হচ্ছে কোন্ এক আর্লের ছেলে—মানে, ঐ যাকে বলে অবৈধ সন্তান আর কি, আর নিজেরও তার শহরময় নাম ডাক রয়েছে সেরা বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় ব'লে; তা, লিউব্‌কাকে কিছুটি ভাবতে হবে না, তাকে ও কায়দাদুরুস্ত 'লেডি' বানিয়ে দেবে'খন। তারপর আসল কাজ সেরে নিয়ে সে-ও ধরল ঐ বুড়োর পথ। মাঝ থেকে লিউব্‌কার কপালে জুটল ওদের ওখানকার সেই ট্যারাচোখো দারোয়ানটার হাতে বেদম প্রহার, বেচারার মুখ টিপে ধরে চুপটি করে অনেকক্ষণ মনের সাধে পিটিয়ে চলল সে। শেষে যখন বুঝল, দোষটা ঠিক লিউব্‌কার নয়, ছোকরাটাই একটি কানাকড়িও না ঠেকিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, তখন বেচারার মনিব্যাগটা টেনে বার করে তা থেকে ওর শেষ সম্বল এক রুবল আর খুচরো যে ক-টা পয়সা ছিল সব ঢেলে উপুড় করে নিল, আর বন্ধকী বলে কেড়ে রেখে দিল ওর টুপিটা আর জামা একটা।

আর একটি বাবু—বয়স প্রায় বছর প'য়তাল্লিশ হবে, সাজগোজের তত বালাই নেই—এসে লিউব্‌কার দেহখানা নিয়ে—তা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হবে—নানা রকমে ডলাই-মলাই করে, যাবার সময় দিলেন মোটে আশি কোপেক দক্ষিণা। আপত্তি করল লিউব্‌কা; খেপে গেলেন প্রেমিকবর, সিধে নাকের ডগায় ঘুঁষি বাগিয়ে তেড়ে এলেন তিনি, 'ফের যদি ট্যাঁক ট্যাঁক করবি তো দেব থোঁতামুখ ভোঁতা করে। পুলিস ডাকব। বলব, যখন ঘুমুচ্ছিলাম তখন পকেট মেরেছিস্। কি? করব তাই? অনেকদিন থানায়-টানায় যাওয়া হয়নি—না? তাই এত তেল!' এ-রকম প্রায়ই ঘটে।

শেষে যখন লিউব্‌কার নতুন বাড়িওয়ালারা—এক মাঝি আর তার বউ—ঘর থেকে বের করে দিল ওকে, এমন কি ওর ছেঁড়া কম্বলখানা পর্যন্ত টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়, তখন কোন গতিকে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বেচারা সারারাত না ঘুমিয়ে পথে পথে কাটাল। ভোর হলে লজ্জার মাথা খেয়ে গেল লিখোনিনের কাছে, কিন্তু গিয়ে দেখে লিখোনিন নেই, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে কোথায়। 'আর নয়!'—হতাশ হয়ে ভাবল সে এবার, 'নাকে খত দিয়ে আবার সেই পুরোনো খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকি গে যাই।'

'জেনী, জেনেচ্‌কা, লক্ষ্মীটি আমার! তোর বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, প্রাণে দয়ামায়া আছে। তুই, ভাই, আমার হয়ে বল একবার এমা এডোয়ার্ডোব্‌নাকে। তোর কথা শুনবে সে!'—অনুনয় করতে থাকে লিউব্‌কা, চোখের জলে ভিজিয়ে দেয় ওর আদুড় গা, বার বার চুমু দেয় ওর কাঁধের উপরে।

'কারুর কথা শুনবে না সে।' ম্লানমুখে উত্তর দেয় জেন্‌কা, 'কেনই যে মরতে গেলি পোড়ারমুখোর সঙ্গে!'

'কেন, জেনেচ্‌কা, তুই-ই তো বলেছিলি যেতে!'—ভয়ে ভয়ে বলে লিউব্‌কা।

'আমি বলেছিলাম—আমি বলেছিলাম যেতে! আমি কি মরে গেছি যে দিব্যি মিছে কথা বলে যাচ্ছিস আমার নামে! থাকগে! চল্ দেখি।'

লিউব্‌কার ফেরবার খবর এমা এডোয়ার্ডোব্‌না আগেই পেয়েছিল। যখন এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে লিউব্‌কা বাড়ির উঠোন পার হচ্ছিল তখন তাকে দেখতেও পেয়েছিল সে। তা লিউব্‌কাকে আবার ফিরে নিতে আপত্তি নেই তার। তবে, হ্যাঁ, ফিরিয়ে নেবার আগে কিছুটা উচিত শিক্ষা হওয়া চাই তো মাগীর!

'কি,' গর্জে ওঠে এমা। থতমত খেয়ে তো-তো করতে থাকে লিউব্‌কা।

'তোমায় আবার ফিরে নিতে হবে এখানে! কোথায় কোন্ ঘাটের মড়ার সঙ্গে পথে ঘাটে রঙ্গরস করে এসে, এখন চাইছ ফের একটি নামকরা জায়গায় ঢুকতে! বেরো, বেরো এখান থেকে রুশী কুত্তী!'

এমার হাতখানা ধরে চুমু দিতে যায় লিউব্‌কা। এক হ্যাঁচকা টানে হাত ছিনিয়ে নেয় এমা, তারপর বিকৃত মুখে নিচের ঠোঁট কামড়ে, বেশ তাগ কষে সটান এক চড় বসিয়ে দেয় তার গালে। উলটে পড়ে লিউব্‌কা তার পায়ের কাছে। তখনি আবার উঠে বসে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে গোঙাতে গোঙাতে বলে, 'দোহাই তোমার! দুটি পায়ে পড়ি, মেরো না গো, মেরো না আর!' বলতে বলতেই আবার সটান মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে যায় বেচারা। রীতিমতো প্রহার শুরু হয় তখন। ক্রমাগত প্রায় দু-মিনিট ধরে, কায়দা করে, বেছে বেছে ব্যথার জায়গাগুলো ঠিক করে নিয়ে পটাপট মারতে থাকে এমা। দাঁতে দাঁত চেপে মুখটি বুজে এতক্ষণ সব সহ্য করছিল জেন্‌কা, শেষে আর পারে না—হঠাৎ ছুটে এসে এমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, চুল ধরে টানতে টানতে পাগলের মতো চেঁচাতে থাকে, 'হতচ্ছাড়ী! খুনী! কুটনী মাগী! চোর!'

একসঙ্গে তিন-তিন জন মেয়েছেলের গলাবাজি চেঁচামেচির শব্দে ঘরদোর সব খন্‌খন্ ঝম্‌ঝম্ করতে থাকে। যে যেখানে ছিল, ছুটে আসে হন্তদন্ত হয়ে। বেধে যায় তুর্কিনাচন ঘরখানার মধ্যে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! কয়েদখানা, না পাগলা-গারদ!

সাইমন আর পাশের বাড়ির দুজন দরোয়ান মিলে এলোপাতাড়ি মারধোর চালাতে থাকে মেয়েদের উপর। ঘণ্টাখানেক বাদে হল্লা শান্ত হয়ে আসে। মেয়েদের কারুর উপরেই ঝাল ঝাড়তে কসুর করা হয় না, তবে জেন্‌কার ভাগেই পড়ে সবচেয়ে বেশি। এত মার খেয়েও, তাকে ফিরে না-নেয়া অবধি লিউব্‌কা কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেবলই কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। আর মার খেয়ে সেই যে জেন্‌কা তার ঘরে গিয়ে, পায়ের উপর পা দিয়ে গুম হয়ে বসে রইল তারপর আর নড়নচড়নটি নেই। জলটি পর্যন্ত মুখে দেয় না; যে কাছে আসে, তাকেই তেড়ে যায়। চোখে তার কালশিরা পড়ে গেছে, ছেঁড়া জামার তলায় ঘাড়ের উপর দগদগে চাবুকের দাগ—চামড়াও ছিঁড়ে গেছে অনেকটা। অন্ধকারে চোখ দুটো তার হিংস্র পশুর মতো জ্বলতে থাকে, নিজের মনে মনে কেবলই বলে চলে সে, 'এখুনি হয়েছে কি?—রোস, দেখিয়ে দিচ্ছি মজাখানা! ঢের দেখতে বাকি এখনও—উ—উঃ, মানুষখেকো—'

কিন্তু আবার যখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, ছোট খবরগিরনী হাঁক দিয়ে যায় দোরগোড়ায়, 'সাজগোজ করে নাও, মেয়েরা!—বৈঠকখানায় গিয়ে বসো!' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে জেন্‌কা, হাতমুখ ধুয়ে সাজগোজ করে নেয়, চোখের কালশিরায় লাগায় পাউডার, ছড়ে-যাওয়া জায়গাটায় লাগায় ক্রীম, তারপর ম্লানমুখে, তবুও গরবিনীর মতো, বাইরের ঘরে এসে বসে সে—জর্জরিত দেহ, অলৌকিক বহ্নিজ্বালা চোখে!

লোকে বলে, যারা আত্মহত্যা করে, শেষের ক-দিন তারা মন কেড়ে নেয় সবার—হয়ে ওঠে পরম প্রিয়। জেন্‌কাকেও দেখায় এখন ঠিক তেমনি—যারই চোখ পড়ে তার উপর, সে-ই আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না বুঝি। আর, সব চাইতে আশ্চর্যের

বিষয় এই যে জেন্‌কার মৃত্যুর জন্যে প্রকারান্তরে দায়ী হয়ে রইল কিন্তু তার পরম স্নেহের পাত্র সেই মিলিটারি ইস্কুলের ছেলেটি—কোলিয়া প্লাদিশেব।

২

ফুটফুটে লাজুক হাসিখুশি ছেলেটি এই কোলিয়া প্লাদিশেব—সবে গোঁফের রেখাটি দেখা দিয়েছে। তারই সঙ্গে গত বছর সারা শীতকালটা বাৎসল্যরসের চর্চা করে এসেছে জেন্‌কা, কখনও বা পুতুলও খেলেছে। মনে মনে লজ্জায় মরে গিয়ে ও যখন বেরিয়ে যেত এই নরককুণ্ড থেকে, তখন জেন্‌কা কোনদিন ওর হাতে গুঁজে দিত একটা আপেল, কোনদিন হয়ত একজোড়া বন্‌-বন্‌ বা এই রকম আর-কিছু।

এবার যখন সে ফিরে এল, বেশ বড়সড়টি হয়ে উঠেছে। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা বাড়িয়েছে সে—ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে বেশ, বুক-পিঠের গড়নও শক্ত হয়ে উঠেছে। মিলিটারি ইস্কুলের পড়া শেষ হয়েছে তার। বাড়িতেও কদর বেড়ে গেছে। বড়দের সামনে সিগারেট খাবার অনুমতিও সে পেয়েছে। বাড়ি থেকে মাসে মাসে তার জন্যে পনের রুবল করে হাত-খরচাও বরাদ্দ হয়ে গেছে।

আর এইখানে—এই আনা মারকোব্‌নার এখানেই—প্রথম পেয়েছিল সে নারী-দেহের স্বাদ—পেয়েছিল ঐ জেন্‌কাকে।

অকলঙ্ক নিষ্পাপ ছেলেদের অধঃপতন এই সব গণিকালয়ে অথবা পথচারিণীদের দিয়ে যতটা ঘটে থাকে, এমন আর-কিছুতেই নয়। তবুও শুধু ছেলে-ছোকরারাই নয়, বুড়োরা পর্যন্ত তাঁদের প্রথম পতনের জন্যে প্রায়ই দায়ী করে থাকেন বাড়ির ঝি কি দাইকে—বলেন, ওদেরই কেউ-না-কেউ নাকি প্রথম মায়াজাল পেতেছিল। হায় রে, মিথ্যাভাষণ!

দেখা যায়, ছেলেবেলায় যে-মিথ্যা কথা বলে বাহবা পেয়ে এসেছি আমরা, বারবার তার পুনরাবৃত্তি করতে করতে শেষে নিজেরাই ভুলে যাই যে ওটা বানানো কথা—আমাদের জীবনের একটা ইতিহাস হয়ে ওঠে সেটা। কোলিয়ার বেলায়ও ঠিক এইটিই ঘটেছিল—বন্ধুদের কাছে কালক্রমে সে ফলাও করে বর্ণনা করতে আরম্ভ করে, কি করে তার কে-এক কাকী না মামী কে-একজন তাকে নাকি প্রথম নষ্ট করে। অবশ্য একথা ঠিক যে, তার বর্ণনা-অনুযায়ী এরূপ এক মোহিনী আত্মীয়ার সান্নিধ্য তার জীবনে ঘটেছিল—তবে সে-সান্নিধ্য আগাগোড়াই ছিল তার কল্পনার জগতে, নিঃসঙ্গ একক যৌন আবেশের সকরুণ, ভীরু, কুফলপ্রসূ মুহূর্তগুলিতে—যা এ-সংসারে যাবতীয় পুরুষই যদি না হয়, তবে অন্তত শতকরা নিরানব্বই জনই অন্তরে অন্তরে অনুভব করে এসেছেন।

এভাবে নয় কি সাড়ে নয় বছর বয়স থেকেই কোলিয়া যৌন-উত্তেজনা অনুভব করে এসেছে; বোঝেনি—এর পরিণাম কি ভয়াবহ। আর, তার দুর্ভাগ্যবশত তখন এমন কোন শিক্ষিতা মহিলা তার পাশে ছিলেন না যিনি বাজে সংস্কার না মেনে তাকে সহজ-বোধ্য উদাহরণ দিয়ে, উপমা দিয়ে, বুঝিয়ে দিতে পারতেন ভালোবাসা কি। আর তখনকার দিনে শিক্ষকদের কাছ থেকে বা শিক্ষায়তন থেকে এমনটি আশা করাও যেত না।

বাড়ির আদর-যত্নের প্রতি টান, মা বোন দাই মা-এর স্নেহমমতার প্রতি আকর্ষণ, সব যেন হঠাৎ রূঢ়ভাবে ছিন্ন হয়ে গেল বোর্ডিং-এ এসে। তার বদলে দেখা দিল ফুটফুটে ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে (যেমন হয়ে থাকে মেয়েদের প্রতিষ্ঠানের সখীদের

নিয়ে) আনাচে-কানাচে ফিস্‌ফাস্‌ করা, অন্ধকারে গলাগলি করে মেয়েদের সঙ্গে মাখা-মাখির যত সব অসম্ভব ইতিহাস নিয়ে কানাকানি করা। এ-সব হল অংশত বালকবয়সের রূপকথার নেশা আর অংশত যৌন-জাগরণের সূচনা। তার উপর যত সব বাজে বই-পড়ার নেশা—ঠিক মদের নেশার মতো, নিষিদ্ধ বস্তুর সম্মোহন।

আসলে কিন্তু এই সব গল্প কি অশ্লীল ছবি এদের মনে ঠিক রসের খোরাক যোগায় না—এ-সব নিয়ে ওরা খুব খানিকটা মজা পায় শুধু, ভারি একটা খেলা, চোরাই মালের খবরদারি করার মতো। ওদের লাইব্রেরিতে পুশ্‌কিন আর লেরমোন্‌তোব্‌-এর অনেক ভালো ভালো বই ছিল; ওস্ত্রোব্‌স্কির সমস্ত কৌতুক-রচনাও ছিল; আর ছিল তুর্গেনেভ্‌-এর প্রায় সব বই; এগুলোই কোলিয়ার জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করল। সকলেই জানেন, অপরাজেয় কথাশিল্পী তুর্গেনেভ্‌-এর হাতে প্রেম হয়ে উঠেছে হতাশার স্বচ্ছ আবরণে-ঘেরা এক অপার্থিব লোভনীয় বস্তু—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, নিষিদ্ধ অথচ লোভনীয়। তাঁর কুমারী-নায়িকারা পূর্বরাগের আবেশে বেপথু, অনুরাগের আবির্ভাবে চঞ্চল—অপরিসীম লজ্জায় ম্রিয়মাণ; থেকে থেকে শিউরে ওঠে তারা, রাঙিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। বিবাহিতা আর বিধবারা আবার সে ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলেছে আর-এক ভাবে—তারা বহুদিন সংগ্রাম করতে থাকে কর্তব্যের সঙ্গে, আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে, অথবা জনমতের বিরুদ্ধে। তারপর, আহা! সহসা পদস্খলন, চোখের জলে ভেসে যায় সব। নয়ত, তারা বরণ করে নেয় সমাজের সঙ্গে সংগ্রামের পথ; কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত মুহূর্তটিতে সহসা দৈবের বশে নায়ক বা নায়িকার জীবনাবসান—বুঝি জীবনদেবতার শুধু একটি করুণ নিশ্বাসের অভাবে সুপক্ব জীবনফলটি পড়ি পড়ি করেও বৃন্তচ্যুত হতে পারে না আর! তবুও তাঁর নায়ক-নায়িকারা সকলেই পিয়াসী হৃদয়ে ছুটে চলেছে এই কলঙ্কময় প্রেমের দিকে—হাসছে কাঁদছে তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে, হারিয়ে ফেলছে নিখিল বিশ্ব। আমরা বড়রা যেভাবে এ-সব জিনিসকে নিয়ে থাকি, ছোটরা তা পারে না। তাই নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহের বশে তারা মনে করে—বড়রা বুঝি কি-একটা পরম লোভনীয় সামগ্রী তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে।

তা কোলিয়ার চোখে পড়েও গেল একদিন এক লুকোচুরির খেলা! কি-একটা কাজে যেন ছুটে এসে সে বাবার ঘরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় তার চোখে পড়ল—ঘরের ভিতর থেকে অ্যাপ্রন্‌-এ মুখ ঢেকে বেরিয়ে আসছে তাদের বাড়ির ঝি ফ্রোসিয়া—লাল টুকটুকে সদাই হাসিখুশি মেয়েটি, আর কি বাঁধুনি তার শরীরের। বিস্মিত কোলিয়া ঘরে ঢুকে দেখে—তার বাবার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। খাঁড়ার মতো লম্বা নাকটা উঁচিয়ে রয়েছে তার উপর।—'বাঃ রে, বাবাকে দেখাচ্ছে যেন তুর্কি-মোরগ'—মনে মনে ভাবল সে। আর এই তো সেদিন বাবার দেরাজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ সে বের করে ফেলল একগোছা অশ্লীল ছবি।

শুধু তাই বা কেন। ওই যে পল এডোয়ার্ডোবিচ নামে নব-কার্তিকটি আসেন মাকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় নিপার নদী থেকে নৌকো করে বেড়িয়ে আনবার জন্যে, মায়ের আমার তখন সাজগোজের কি ঘটা! ঝি-চাকরদের সঙ্গে কথা কইবার সময় কি খনখনে মায়ের গলার আওয়াজ, আর তখন তা কোন্‌ যাদুমন্ত্রে মিহি মোলায়েম করে আনে মা—ঐ তো ঐ পল এডোয়ার্ডোবিচ যখন আসে!

আর কোলিয়ার দাদাটিই বা কি কম? মিলিটারি ইস্কুলে পড়া শেষ করে ভালো কাজ পেয়েছে সে; ছুটিতে এসেছে বাড়িতে, এমন সময় চোখ পড়ে যায় তার বাড়ির ঝি নিউসার উপর। খাসা মেয়েটি, পোশাক বদলালে ভ্রম হয় অভিনেত্রী কি রাজ-কুমারী, নয়ত রাজনৈতিক কর্মী ব'লে। আদর করে সবাই তাকে ডাকে অ্যানিতা ব'লে! মেয়েটিরও মন গলে গেল। মা কিন্তু বুঝলেন সবই; নিজের মনকে বোঝালেন—তা

মন্দ কি। বোরেন্‌কা যে কোন বেশ্যা বা পথে-পথে-ঘোরা মাগীর পাল্লায় পড়েনি সেটাই তো বাঁচোয়া। ওর চেয়ে নিউসার মতো নিষ্পাপ, সরল শান্ত মেয়ের সঙ্গে—তা মন্দ নয়।

কোলিয়া তখন রাতদিন থাকত পাহাড়-পর্বত ডিঙোনোর কল্পনায় মেতে। 'কৃষ্ণ-শার্দুল' নামে এক জংলী সর্দারের মতন যত-সব অসম্ভব কাণ্ড করতে পারাটাই ছিল তার সে-বয়সের একমাত্র কাম্যবস্তু। তবুও মনোযোগ দিয়ে দাদার প্রণয়ের বিচিত্র গতি সে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। শেষে, মাস ছয়েক পরে একদিন সে দরজার আড়াল থেকে শুনতে পেল—অ্যানিতাকে মা কি অসভ্য ছোটলোকের মতো গালাগাল করছে। মেয়েটা তখন মাস পাঁচেকের পোয়াতী। নির্বিঘ্নেই মিটে যায় সব—ছুঁড়ীটা যদি টাকা নিয়েই চলে যেতে রাজি হয়। তা সে যাবে না, বলে—চাই না টাকা; বড় দাদাবাবুকে ছেড়ে থাকব কি ক'রে? তা কি কখনও থাকতে দেওয়া যায় নাকি? তাই তো পুলিস ডাকিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হল তাকে। যা ভাগ্।

ইস্কুলে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়বার সময়ই কোলিয়ার অনেক বন্ধু 'বিষবৃক্ষের ফল' খেয়েছিল। এটাকে তারা মস্ত একটা বাহাদুরি বলেই মনে করত। আর এ-সব গল্প বেশ প্রাণ খুলেই বলাবলি করত তারা নিজেদের মধ্যে—কোথায় লাগে তার কাছে দেনিস দাদিদোবের আমলের পল্টনদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কাহিনী।

তারপর কোলিয়াও একদিন গিয়ে উঠল আনা মারকোব্‌নার বাড়িতে। উঃ! আজও তার মনে পড়ে সেদিনকার সে-কথা—সেই অজানা আশঙ্কা, দুরুদুরু বুক, তারপর সাহস সঞ্চয়ের জন্যে পেট ভরে ঢক ঢক করে মদ গেলা। তারপর বড় হল-ঘরটায় আলোর বন্যায় ভেসে চলেছে গোলাপী, নীল, বেগুনী, রঙ-বেরঙের সাজে ফুল-পরীদের দল, আহা! কোলিয়ার এক বন্ধু একটি মেয়েকে কানে কানে কি যেন গিয়ে বলে। মেয়েটি কোলিয়ার কাছে ছুটে আসে—'হ্যাঁ গা, কোলের কার্তিকটি আমার, এখনও স্যায়না হওনি তুমি? —এস, যাই—সব শিখিয়ে পড়িয়ে স্যায়না বানিয়ে দিই তোমায়।'

এ-ধরনের সোহাগ নতুন নয় এখানে; বাড়ির দেয়ালগুলোরও বুঝি তা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারপর আর কি। সে-কথা মনে করতেও আজ ভয় করে কোলিয়ার, আবছামতো মনে পড়ে শুধু—প্রদীপটা থেকে আলোর রেখাটা কেবলই বুঝি গোল হয়ে ঠিকরে পড়েছিল; আর চুমুর পর চুমু—দীর্ঘ, বিলম্বিত। বিহ্বল স্পর্শসুখ—তারপর অকস্মাৎ তীরের মতো কি-একটা ব্যথা, যাতে করে মানুষ যুগপৎ আনন্দে মরে যেতে চায়, আর চেঁচিয়েও উঠতে যায় আতঙ্কে। তারপর? অবাক হয়ে চেয়ে দেখে কোলিয়া—বিবর্ণ হাতখানা তার থর থর করে কাঁপছে তখন, পোশাকের বোতামটাও আঁটতে চাইছে না যে!

অবশ্য সবাই অনুভব করে থাকে রতিক্রিয়ার পর এ অবসাদ। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত আত্যন্তিক, সুগভীর আনন্দবোধ অনতিকালেই মন থেকে মুছে গিয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুকাল অবধি—সময় সময় আজীবনও—তা একটা ক্লান্তি ও গ্লানিবোধের আকার নেয়। কোলিয়াও তাই অল্পকালের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে অবসাদে। তার সাহসও বেড়ে চলে, নারী-রহস্যের দ্বার খুলে যায় শেষে। আর তাই ভারি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সে এখন, যখন তার আগমনে সব মেয়েরা, বিশেষ করে ভেরকা, হাঁক দিয়ে ওঠে—'ওরে তোর ভাবের মানুষ এয়েছে রে, জ্বেনেচ্‌কা।'

কাল্পনিক একজোড়া গোঁফের ডগায় মাতব্বরের ভঙ্গিতে তা দিয়ে এ-কথা সঙ্গী-সাথীদের কাছে গল্প করতে ভারি ভালোবাসে ছোকরা।

৩

আগস্টের এক সজল সন্ধ্যা। রাত ন-টা বাজে। আনা মারকোব্‌নার বৈঠকখানাঘর প্রায় খালি। দরজার পাশে টেলিগ্রাফ-আপিসের এক কেরানী মুটকী কিটির্‌ সঙ্গে একটু রসালাপের চেষ্টা করছে। আর আছে বুড়ো রলি-পলি—লম্বা লম্বা ঠ্যাং মেলে এর-ওর কাছে গিয়ে রসের গল্প শুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

কোলিয়া গ্লাদিশেব এসে ঘরে ঢোকে। দোরগোড়ায় দেখেই চিনতে পারে ভেরকা, হাততালি দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জেন্‌কা, জেনেচ্‌কা, দেখ্‌ সে এসে, ভাবের মানুষ এয়েছে রে তোর—সেই খোকা জাঁদরেল—মাইরি, নব-কার্তিকটি যেন।'

জেন্‌কা বৈঠকখানায় ছিল না, সে তখন রেল-কোম্পানির এক হেডগার্ডের পাল্লায় পড়েছিল।

কোলিয়া গ্লাদিশেব কিন্তু একা আসেনি আজ, সঙ্গে আছে ওই ইস্কুলের আর-একটি ছেলে—পেত্রোব, এই প্রথম বেশ্যাবাড়ির সিঁড়ি মাড়াল সে আজ।

দুজন বৈঠকখানায় গিয়ে ঢোকে। বুকে সাহস আনবার জন্যে ঠেসে মদ খেয়েছে পেত্রোব, পা টলছে, মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে একদম। ভেরকা আর তামারা এসে আগলে বসে তাদের।

'কই? একটু ধোঁয়া-টোয়া হোক, কেলে-সোনা আমার।'—পেত্রোবকে বলে ভেরকা আর সঙ্গে সঙ্গেই—যেন এমনি হঠাৎ ছেলেটির—পায়ের সঙ্গে নিজের তপ্ত উরুখানা ঠেকিয়ে দেয় আর বলে ওঠে, 'মাইরি, কি সুন্দর তোমায় দেখতে।'

'কিন্তু জেনী কোথায়? আর কাউকে নিয়ে ব্যস্ত নাকি?'—তামারাকে জিজ্ঞেস করে কোলিয়া।'

তামারা তার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। অস্বস্তি বোধ করে কোলিয়া চোখ ফিরিয়ে নেয়।

'বালাই, ষাট্‌! তা হতে যাবে কেন? আজ সারাটা দিন বেচারার মাথা ধরে রয়েছে। বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় গিন্নিদি ভেতর থেকে দরজা খুলেছে আর হঠাৎ বেচারা কপালে চোট পেয়েছে। তাইতে মাথা ধরে গেছে তার। আহা, সারাটা দিন মাথায় জলপটি দিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু, কেন? সবুর সইছে না বুঝি? আর একটু বসো, এখুনি এসে পড়বে। ভারি খুশি হবে আজ ওকে পেয়ে।'

ততক্ষণে পেত্রোবকে নিয়ে পড়েছে ভেরকা, 'যাদুমণি, মানিক আমার, ওরে আমার মনচোরা! বড্ড ভালোবাসি আমি এই সব কেলে-সোনাদের; কি যে ভালোবাসতে পারে তোরা।' বলতে বলতে মিহি গলায় হঠাৎ গান জুড়ে দেয় সেঃ

ওরে আমার কেলেসোনা
আমার নয়নতারা,
বেচতে কি তুই পারিস আমায়,
—করতে পাগলপারা!
না, না, না,
থুড়ি বেচতে যে মানা!
কত সইলি যাতনা,
কত করলি ভাবনা;
জানি আমায় দিবি কিনে
শাড়ি গহনা।

'হ্যাঁ গা, তোমার নামটি কি, ভাই?'

'জর্জ,' ভারী গলায় উত্তর দেয় পেত্রোব।

'জোজিক! জোরোচ্‌কা, আহা, বেশ নামটি তো!'

তারপর হঠাৎ তার কানের কাছে মুখটি নিয়ে এসে দুষ্টু হাসি হেসে বলে ওঠে ভেরকা, 'জোরোচ্‌কা, কাছে এস মাইরি।'

লজ্জা পেয়ে যায় পেত্রোব, অসহায়ের মতো বলে বসে—'জানি না যাও—ও যদি বলে তবে—'

হো-হো করে হেসে ওঠে ভেরকা, 'এই দেখ। কচি খোকাটি আমার গো! বলে কিনা 'ও যদি বলে তবে।' তার চাইতে বরং যাও, দাই-মাকে জিজ্ঞেস করে এস গে।—দুধলো দাই-মাকে, বুঝলে? শুনলি ভাই তামারা, আমি ডাকছি ওকে—চল শুতে যাবে'খন। আর ও বলে কি না 'বন্ধু যদি বলে তবে'। তা বেশ, বেশ। ওগো বন্ধুবর, তুমি বুঝি মানুষ করছ ওকে?'

'বিরক্ত করো না, খবরদার বলছি।' ইস্কুলের ছেলেদের মতো ভারী গলায় শাসিয়ে ওঠে পেত্রোব।

এমন সময় এসে হাজির হয় রলি-পলি, আর সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয় বকবকানি, 'হে, বালসেনা-যুগল, হে বিদগ্ধজনকুসুম, আপনারা শষ্প-ভূমিতে বিচরণশীল এই অকিঞ্চিৎকর বৃদ্ধটিকে একটি সুপেয় ধূমযষ্টি দান করবেন কি? দরিদ্র আমি। অহো ভাগ্যম্‌। তথাপি শষ্পম্‌ পরমোপাদেয়ম্‌।'

তারপর সিগারেটটা হাতে পেয়েই কোমরে হাত দিয়ে ডান পা বেঁকিয়ে গান জুড়ে দেয় রলি-পলিঃ

এমন দিনও গেছে আমার
ভোজ দিয়েছি যখন-তখন।
মদের নদী বইয়ে দিতাম;
আর রুটির কণাও পাইনে এখন
'সারাতোব্‌'-এ যেতেম যখন
সেলাম পেতাম দরজাতে।
আর আজ যদি হায়, সেখানে যাই—
গলাধাক্কা হবে খেতে॥

তারপর আবার হঠাৎ গান থামিয়ে বুকে করাঘাত করতে করতে রলি-পলি ফের বক্তৃতা শুরু করে দেয়, 'হে ভদ্রমহোদয়দ্বয়। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা হচ্ছেন ভাবীকালের সৈন্যাধ্যক্ষ স্কোবেলেব আর গুরকো। আমার মৃদু করাঘাতে আপনাদের হৃদয়ের রত্ন-খচিত স্বর্ণ-কপাট উন্মুক্ত হোক—কিছু অর্থসাহায্য করুন পরমাত্মার নামে।'

'তার আগে এ'দের সেই 'ঝিকিমিকি' খেলাটা দেখাতে হবে কিন্তু,' বলে ওঠে কিটি ঘরের ও-পাশ থেকে, 'এমনি ফাঁকি দিয়ে পয়সা মিলবে না, হুঁ। বুঝলে গো হাঁদা উট?'

'যো হুকুম।'—উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রলি-পলি। তারপর ছোট্ট একটা ভণিতা করেই খেলা জুড়ে দেয়—'জুন-মাসের আকাশে আধিপত্য করছেন আমাদের সূয্যিমামা। মাঠঘাট সব ফুটিফাটা।' মিষ্টি হাসিতে কুঁচকে ওঠে রলি-পলির সঙের মতো মুখখানা, চোখ দুটো তার অর্ধচন্দ্রাকৃতি—'দিগ্বলয়রেখার কাছে দেখা দেয় এক টুকরো কালো মেঘ; দেখতে দেখতে মেঘের পরে মেঘ জমে আসে আকাশে; নীল আকাশের মুখে কে যেন দেয় কালি ঢেলে।'—রলি-পলির হাসি-হাসি মুখখানা আস্তে আস্তে গম্ভীর

হয়ে আসে—'অন্ধকারে মুখ লুকোন সূয্যিমামা; ঘনঘটা আকাশে।' মুখখানাকে কঠোর করে তোলে রলি-পলি, ভয়াবহ তার চেহারা—'ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে চড়্‌বড়্‌ করে। সেই সুরে সুর মিলিয়ে একখানা খালি চেয়ারের পিঠে আঙুল দিয়ে সে বাজাতে থাকে—'দূরে দেখা যায় ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ—।' বাঁ গাল আর চোখের পাতা নাচিয়ে ঝিকিমিকি খেলা দেখায় রলি-পলি—'ঝমাঝম বৃষ্টি শুরু হয়; তারপর আকাশ চিরে চোখ ধাঁধিয়ে খেলে যায় মস্ত বড় একটা ঝিলিক।' অদ্ভুত কৌশলে এক সঙ্গে ভ্রূ, চোখ, নাক, আর ঠোঁটের নাচনে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা খেল দেখিয়ে দেয় রলি-পলি। 'কড়-কড়-কড়-কড়াৎ। একশ বছরের বুড়ো এক ওকগাছের মাথার উপরে ভেঙে পড়ে বাজ।' সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্‌ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে রলি-পলি; তড়াক করে তখুনি আবার উঠে দাঁড়ায়—'ক্রমে ঝড়বৃষ্টি আসছে কমে, বিদ্যুতের ঝিলিক পড়ছে থেমে, মেঘ যাচ্ছে সরে—গুড়-গুড়-গুড়-গুড়; মেঘের ফাঁকে সূয্যিমামা মারছে উঁকি।' মুখ বাড়িয়ে হাসে রলি-পলি—'এই যে, ফের দিনের আলো উঠেছে ফুটে।'—রলি-পলির মুখেও ফুটে ওঠে কৌতুকময় মোহন মৃদুহাসি।

গ্রাদিশেব আর পেত্রোব প্রত্যেকে তাকে বিশ কোপেক করে পুরস্কার দেয়। রলি-পলি হাত পেতে নেয়, সঙ্গে-সঙ্গেই বাতাসে হাত দুলিয়ে বলে ওঠে—'ফুসমন্তর ফুঃ।' কোথায় পয়সা!

'ভারি অন্যায় তোমার তামারোচকা,' রাগের ভান করে বলে সে, 'গরিব বুড়োর পয়সা ক-টা চুরি করতে লজ্জা হল না তোমার? এখানে লুকিয়ে রেখেছ কেন বল তো?' একটা হ্যাঁচকা টান মেরে পয়সা ক-টা যেন তামারার কানের ভিতর থেকেই বের করে নিয়ে আসে সে। তারপর ছোকরাদের বলে, 'এখুনি আসছি; আমাবিহনে চারদিক অন্ধকার দেখবেন না যেন। নমস্কার।'

'রলি-পলি, এই পনের কোপেক দিয়ে আমায় মিষ্টি কিনে এনে দাও না। এই যে ধর।'—পয়সা ছুঁড়ে দেয় ছোট ফর্সা মান্‌কা। রলি-পলি তা লুফে নেয়, তারপর টুপিটা কায়দা করে মাথায় চাপিয়ে সঙের মতো একটা সেলাম ঠুকে একদম অদৃশ্য হয়ে পড়ে।

ধামড়ী হেনরিয়েটা কোলিয়াদের কাছে আসে, একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে বলে 'বসে বসে ছুঁড়ীদের সঙ্গে গজালি না করে এসো না ভাই, নাচি একটু।'

'বেশ তো।'—উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কোলিয়া।

বাজনা বেজে ওঠে। দল বেঁধে নাচ শুরু করে দেয় মেয়েরা। সেবারে শীতকালেই কোলিয়া দেখে গেছে সবচেয়ে ভালো নাচতে পারে তামারা। তাই ও গিয়ে তামারার সঙ্গে নাচতে থাকে। নাচের ফাঁকে চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান গার্ডসাহেব।

ভেরকা কিন্তু পেত্রোবকে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। মদের নেশা তার কেটে গিয়ে এখন মনমরা হয়ে পড়েছে সে।

নাচ থামলে পর কোলিয়া আর তামারা পাশাপাশি এসে বসে একটেরে। 'কই জেনেচ্‌কা তো এল না এখনও?'—কোলিয়া ফের জিজ্ঞেস করে। ভেরকার দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় তামারা। চোখ নিচু করে ইশারায় জানিয়ে দেয় ভেরকা —লোকটা চলে গেছে।

'দেখি, নিজেই গিয়ে ডেকে আনি ওকে'—জবাব দেয় তামারা।

'কেন? জেন্‌কার জন্যে এত হামলে মরছ কেন? আমায় নিলেই তো পার।'—বলে ওঠে ধামড়ী হেনরিয়েটা।

'আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে,' উত্তর দেয় কোলিয়া।

তখনও পোশাক পরেনি জেন্‌কা। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে পাউডার ঘসছে মুখে।

'কি গো তামারোচ্‌কা?' জিজ্ঞেস করে সে।

'তোর সেই খোকা জাঁদরেলটি এয়েছে। বিরহে হাঁপিয়ে মরছে যে।'

'ওঃ. গত বছরের সেই প‍্যাঁচকে ছোঁড়াটা?—মরুক গে যাক।'

'আর সে কচি-খোকাটি নেই রে। দিব্যি বড়সড়টি হয়েছে এখন। আর যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপ, আর ঢ্যাঙাও হয়ে উঠেছে কতখানি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।—কি, রাজি নাকি? না, আমিই—'

আরশির মধ্যে কুঁচকে ওঠে জেনকার ভ্রূ—'না পাঠিয়ে দে তাকে। বলগে, আমার বড্ড মাথা ধরেছে।'

'তাই বলেছি। বলেছি, দরজার পাল্লা হঠাৎ মাথায় লেগে চোট পেয়েছে। তবে কথা কি জানিস—মজুরি পোষায় কি এতে জেনেচ্‌কা?'

'সে ভাবনা তোর নয়—বুঝলি, তামারা?'

'এও কি সম্ভব যে তুই একটুও দুঃখিত নোস—এই এতটুকুও নয়?'

'তবে আমার জন্যেও তুই দুঃখিত নোস?'—ঘাড়-গর্দান-জোড়া ক্ষত-চিহ্নটার উপরে হাত বুলিয়ে নেয় জেন্‌কা—'তোর নিজের জন্যেও তোর দুঃখ নেই? হতভাগী লিউব্‌কার জন্যে নেই? নেই পাশ্‌কার জন্যে? তোর দেখছি রক্তমাংসের শরীর নয়, একতাল মাংসপিণ্ড শুধু।'

তামারা শুধু হাসে—চতুর রাগের হাসি—'না রে জেন্‌কা, আসল কাজের বেলায় তা নই আমি। যাক, সে তুই পরে বুঝতে পারবি। এখন এ নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। আচ্ছা, গিয়ে বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

নীল বাতিটা নামিয়ে রেখে, রাতের কোর্তা পরে শুয়ে থাকে জেন্‌কা। একটু পরে ঘরে ঢোকে কোলিয়া। তার পিছনে পিছনে পেত্রোবকে টানতে টানতে নিয়ে আসে তামারা। যোসিয়াও আসে, ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বলে—'বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো। দুটি যুবতী আর দুটি সুপুরুষ। বোতল-টোতল হবে নাকি?' কোলিয়ার পকেটে রয়েছে প্রায় পঁচিশ রুবল; দিলদরিয়া মেজাজে জিজ্ঞেস করে, 'ভালো মাল আছে তো?'

'কি যে বলেন।'—যোসিয়া জবাব দেয়, 'সেরা মাল সব পাবেন এখানে। ফরাসী লাফিৎ পর্যন্ত। মেয়েরা আবার লেমোনেড দিয়ে লাফিৎ খেতে ভারি ভালোবাসে।'

'দাম কত?'

'পয়সা দিয়ে বুঝি দর যাচাই! এ-সব ভালো ভালো বাড়িতে সব বাঁধা দর। এক বোতল লাফিতের দাম পাঁচ রুবল আর চার বোতল লেমোনেডের দাম দু-রুবল। মোট সাত রুবল।

'ঢের হয়েছে, যোসিয়া।'—জেন্‌কা থামিয়ে দেয় তাকে, 'এদের ছেলেমানুষ পেয়ে কেন যা-তা ঠকিয়ে নিচ্ছ? মোট পাঁচ রুবলই যথেষ্ট। এ'রা আজেবাজে লোক নন—বুঝেছ?'

তা কোলিয়াই যেন লজ্জা পেয়ে যায় বেশি। একখানা দশ-রুবলের নোট টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'যাকগে, এ নিয়ে এত কথা কেন? যা বললে—আন গে যাও।'

'তা এ নিয়েই যখন এয়েছি বাপু, বসবার দরুন দামটাও তো কেটে নিতে হবে আমায়। তা আপনারা মশাইরা কি ঠিকে বসতে এয়েছেন, না রাত কাবার করে যাবেন এখানে? জানেন তো দর—ঠিকে বসতে দু-রুবল; রাতকাবারী দশ।'

'বেশ, বেশ ঠিকেই বসবেন ওঁরা, ঠিকেই বসবেন'—জ্বলে ওঠে জেন্‌কা, 'এটুকুতে বিশ্বাস করতে পার আমাকে।'

মদ আসে। কি জানি কি খেয়ালের মাথায় খাবারও আনিয়ে ফেলে তামারা। ছোট্ট

মান্‌কাকে ডাকিয়ে আনায় জেন্‌কা। নিজে কিন্তু সে দাঁত দিয়েও কাটে না কিছু, ওঠেও না বিছানা থেকে, সারাক্ষণ একখানা শাল চাপা দিয়ে শুধু মুখটি বের করে পড়ে থাকে। চোখ দুটো তার কোলিয়ার ওই সুন্দর রোদে-পোড়া মুখখানার উপরে—কি চমৎকার পৌরুষের ভাব ফুটে উঠেছে মুখখানায়। চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না জেন্‌কার।

জেন্‌কার বিছানার উপরে এসে বসে কোলিয়া, ওর হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে, লক্ষ্মীটি?'

'এমন কিছু নয়—মাথায় গুঁতো লেগে মাথাটা ধরেছে একটু।'

'ওদিক থেকে মন ফেরাতে চেষ্টা কর, কমে যাবে এখুনি।'

'গেছেও কমে। এই যে তোমায় দেখতে পেয়েছি, অনেকটা ভালো বোধ করছি এখন। এদিক মাড়াওনি কেন গো এতদিন?'

'সময় পাইনি মোটে। ক্যাম্পের যা খাটুনি। সন্ধ্যেবেলা মনে হত পা দু-খানা আর নেই।'

'আহা বেচারা।'—হঠাৎ বলে ওঠে ছোট্ট ফর্সা মান্‌কা, 'এই সব কচি কচি সোনা-মণিদের কোন্ প্রাণে খাটায় ওরা এমন করে? তোমার মতো যদি একটি ভাই কি ছেলে থাকত আমার, বুক ফেটে যেত তবে। এই যে, এস ভাই, কল্যাণ হোক।'—গেলাস ঠোকাঠুকি করে নেয় ওরা।

জেন্‌কা খালি এক দৃষ্টে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে কোলিয়াকে।

'তুমি—জেন্‌কা?'—একটা গেলাস এগিয়ে দেয় কোলিয়া।

'ইচ্ছে করছে না,' মন-মরার মতো উত্তর দেয় জেন্‌কা। তারপর সবার দিকে ফিরে বলে, 'নাও গো, মেয়েরা সব, গেলাকোটা, গালগল্প তো হয়েছে এখন, বসে বসে আর হেদিয়ে যেয়ো না।' উঠে পড়ে সবাই।

'রাত কাটাবে আজ আমার সঙ্গে?'—সবাই চলে গেলে জিজ্ঞেস করে জেন্‌কা, 'ভয় নেই, বাছা; পকেটে কম থাকে তো বাকিটা আমিই দিয়ে দেব'খন। কি চমৎকার দেখতে তোমায় যে। তোমার জন্যে বেউশ্যে মাগীও খরচা পোয়াতে গায়ে মাখে না—না?' হেসে ওঠে জেন্‌কা।

চমকে ফিরে চায় গ্লাদিশেব। ওর অনভ্যস্ত কানেও জেন্‌কার গলার আওয়াজ কেমন যেন শোনায় আজ—তাতে না আছে বিষাদ, না আছে মায়া, না আছে বিদ্রূপ।

'না পিয়ারী, মন চাইছে থাকতে; কিন্তু দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে যে।'

'সে জন্যে কেউ ভাববে না। বেশ তো বড়সড়টি হয়ে উঠেছ এখন। এখনও কি কথা শুনে চলতে হবে নাকি সবার? তা বেশ, যা ভালো বোঝ কর।—আলোটা নিবিয়ে দেব? না, এ-রকমই জ্বলবে? শোবে কোন্‌দিকে—দেয়ালের দিকে না ধারের দিকে?'

'হলেই হল একটা দিক।'—কাঁপা গলায় জবাব দেয় কোলিয়া। সঙ্গে সঙ্গে জেন্‌কার বিশুদ্ধ তপ্ত দেহখানা ধরে জড়িয়ে ঠোঁট বাড়িয়ে মুখখানা এগিয়ে নিয়ে আসে ওর মুখের দিকে। আস্তে করে সরিয়ে দেয় জেন্‌কা।

'থাক। পরে হবে। একটু ধৈর্য ধর; প্রাণ ভরে চুমু খাবার ঢের সময় পাব'খন দুজনে। এই শুধু এক লহমা একটুখানি চুপটি করে শোও দিকিনি। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে—চুপচাপ—নড়োচড়ো না—।'

জেন্‌কার আদেশ মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করে। যন্ত্র-চালিতের মতো চুপটি করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কোলিয়া—হাত দুখানা রাখে মাথার নিচে। পাশ ফেরে জেন্‌কা, কনুই বেঁকিয়ে হাতের ওপরে মাথা রাখে উঁচু ক'রে তারপর সেই আধো-আলোয় প্রাণ ভরে দেখতে থাকে সে কোলিয়ার দেহখানাকে—শুভ্র, বলিষ্ঠ, পেশীবহুল দেহখানা তার;

কত স্পষ্ট শরীরের ভাঁজগুলো। কি চমৎকার গড়ন বুকের মাঝখানটির, কি সুন্দর সুবিন্যস্ত পঞ্জরাস্থি সব। উরু দু-খানি যেমন মাংসল তেমনি কঠিন। ক্ষীণ কটিতট। মুখ আর ঘাড়ের অর্ধেকটা তামাটে হয়ে এসেছে, ঘাড়ের মাঝখানটিতে স্পষ্ট তামাটে দাগ —ক্রমে কাঁধ আর বুকের শুভ্রতায় গেছে বিলীন হয়ে।

চোখ মিটমিট করে চায় গ্লাদিশেব। জেন্‌কার এই অপলক স্থিরদৃষ্টি তার মুখে বুকে, সারা অঙ্গে—মাকড়সার জাল বুনে সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে যেন।

শিউরে ওঠে সে। চোখ চেয়ে মনে হয়—কোন্ অপরিচিতার একজোড়া ডাগর ডাগর কালো চোখ প্রেতের মতো নিমেষহারা চেয়ে আছে তার দিকে—কত কাছে।

'কি দেখছ তুমি, জেনী? ভাবছই বা কি?'

'বাছা আমার গো।...কি যেন তোমার নাম—কোলিয়া, না?'

'হ্যাঁ?'

'রাগ করো না, কোলিয়া—শুধু একটা খেয়াল, লক্ষ্মীটি, ফের চোখ বোজ দিকিনি —না, ভালো করে বন্ধ কর, আরও ভালো—হ্যাঁ, এবার হয়েছে। আলোটা বাড়িয়ে দিই। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে তোমায়। যদি জানতে কত সুন্দর তুমি—এই যে ঠিক এখন—এই মুহূর্তটিতে। এর পর তুমি হয়ে উঠবে বর্বর, আর তোমার গা দিয়ে বেরুতে থাকবে বোঁটকা গন্ধ। এখন কিন্তু পাচ্ছি তোমার গায়ে পশমী আর দুধের গন্ধ—আর বনফুলের গন্ধও বুঝি মিশে আছে তার সঙ্গে। বন্ধ কর, চোখ বন্ধ কর।'

আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে এসে বসে জেন্‌কা—তার সেই আধো-শোয়া আধো-বসা ভঙ্গিতে। দু'জনেই নীরব। খানকয়েক কামরা পেরিয়ে ভেসে আসে পিয়ানোর টুং টাং সুর। শোনা যায় কার যেন কাটা-কাটা হাসির আওয়াজ; আরেক দিক থেকে আসে কি একটা হাল্কা গান, আর গাল-গল্পের টুকরো টুকরো কথা। দূরে রাস্তা দিয়ে গড়গড় করতে করতে চলেছে একখানা গাড়ি।

'এইবার ওর শরীরে ঢুকিয়ে দেব রোগ।'—মনে মনে ভাবে জেন্‌কা, 'যেমন দিয়ে আসছি আর পাঁচজনকে।' আর-একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয় সে—কোলিয়ার আপাদমস্তকে। আহা। ভাঁজ-করা হাত দু-খানার মাংসপেশীগুলো সত্যিই কেমন ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু মায়া হচ্ছে কেন ওর ওপরে? বড্ড সুন্দর ব'লে?'—মনে মনে তোলপাড় করতে থাকে জেন্‌কা, 'নাঃ, মায়ামমতা সব বিসর্জন দিয়েছি তো কবে। তবে? ছেলেমানুষ বলে? তাই তো, এই সেদিন ফিরে যাবার বেলা আদর করে ওর পকেটে গুঁজে দিয়েছি আপেল।'

'কোলিয়া।'—শান্তকণ্ঠে ডাক দেয় জেন্‌কা, 'চোখ চাও এবারটি।'

চোখ চায় কোলিয়া, জেন্‌কার দিকে পাশ ফেরে, দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে টেনে এনে শেমিজের ফাঁক দিয়ে চুমো খেতে যায় ওর বুকে। ফের তাকে নিরস্ত করে জেন্‌কা।

'না, না; রসো একটু—কথাটা শেষ করতে দাও আমায়—এই এক মিনিট শুধু। বল তো বাছা, আমাদের কাছে আস কেন তোমরা?'

'কি বোকা মেয়ে!' হাসতে থাকে কোলিয়া, 'কেন আবার? আমি কি পুরুষ নই? তা মনে তো হয়, সে বয়েস আমার হয়েছে যখন পুরুষমাত্রেরই মধ্যে জেগে ওঠে —কি বলব—একটা প্রয়োজন—এই নারীর জন্যে।'

'প্রয়োজন। শুধুই প্রয়োজন? তার মানে যেমন প্রয়োজন আমার বিছানার তলায় ঐ প্রস্রাবপাত্রের?'

'না, তা কেন? তোমার ভারি ভালো লাগে আমার—সেই প্রথম দিন থেকেই, তা হ্যাঁ, বলতে কি, ভালোবেসেও ফেলেছি যেন একটু—অন্তত, আর কাউকে নিয়ে তো থাকিনি কখনও।'

'বেশ, কিন্তু প্রথমবার? সে-ও কি ছিল প্রয়োজন?'

'না, তা নয় বোধ হয়; তবে কেন কি জানি, ঠিক বুঝতে পারতাম না। কিন্তু নারীসঙ্গের কামনা হয়েছিল—বন্ধুরা সব মাথা বিগড়ে দিয়েছিল, অনেকে আসতও এখানে—তাই আমিও এলাম শেষে—'

'তা যেন হল। কিন্তু সেদিন লজ্জা করেনি তোমার?'

এ আবার কি কথা। ধাঁধায় পড়ে যায় সে, বিরক্তও হয় বুঝি, বুঝতেও পারে—একেবারে আজেবাজে বকুনি নয় এ, গভীর অর্থ আছে এর মধ্যে।

'লজ্জা—না, লজ্জা ঠিক করেনি, তবে এই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মনটাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে মদ খেয়েছিলাম সেদিন।'

ফের এক কাতে শুয়ে পড়ে জেনী, কনুইয়ের উপরে মাথা রেখে এক-একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চায় ওর দিকে।

'আচ্ছা, বলো দিকিনি, প্রাণ'—কোলিয়ার কানের কাছে মুখটি এনে ফিসফিস করে বলে জেনী, 'আর-একটি কথার জবাব দাও আমায়। এই যে পয়সা দিয়ে গেলে সেদিন, ওই দুটো পাপ-রুবল—বুঝলে—প্রেম কেনার জন্যে দিলে, যাতে করে আমায় আদর করতে হয়েছে তোমাকে, চুমু খেতে হয়েছে, সারা দেহটি তোমায় সঁপে দিতে হয়েছে—তার জন্যে পয়সা দিতে লজ্জা হল না তোমার? হয়নি কোনদিন?'

'হা ভগবান! এ-সব কি বলছ তুমি আজ। তা সবাই তো পয়সা দিয়ে থাকে। আমি না দিলে আর কেউ দিত—সে একই কথা নয় কি?'

'আচ্ছা কোলিয়া, কারও প্রেমে পড়েছ কখনও? সত্যি কথা বল। বেশ তো, আন্তরিক ভালোবাসা না হয় না-ই হল, এমনিই হল না হয়—মনে প্রাণে প্রেম করেছ কখনও? ফুল তুলে দিয়েছ, হাত ধরাধরি করে বেড়িয়েছ চাঁদের আলোয়? হয়নি এ-সব কিছু?'

'তা, হ্যাঁ।'—অচঞ্চল ভারী গলায় জবাব দেয় কোলিয়া, 'তা কৈশোরে কে-ই বা না করেছে এমন চ্যাংড়ামো। সব্বাই করে থাকে ওসব—'

'কে সে? নিকট-সম্পর্কের বোন নিশ্চয়ই? লেখাপড়া জানা মেয়ে? বোর্ডিং ইস্কুলের ছাত্রী? আছে তো এমন মেয়ে? নেই কি?'

'তা, হ্যাঁ, তাই তো—সবারই থাকে এমন আত্মীয়।'

'বেশ, তাকে তুমি স্পর্শও করতে না, করতে কি? ছেড়েই দিতে তাকে, কেমন? আচ্ছা, সে যদি বলত, 'নাও আমায়, কিন্তু দুই রুবল চাই আমার'—কি বলতে তুমি তাকে?'

'সত্যি, জেন্‌কা।'—কোলিয়া রাগ করে এবার, 'আমি মোটেই তোমার এই মাথা-মুণ্ডু কথাগুলোর মানে খুঁজে পাচ্ছি না। কি বলতে চাও তুমি? বল তো চলে যাই; পোশাক পরি গে যাই।'

'না, না। যেও না, কোলিয়া, যেও না। আর-একটি কথার জবাব দিয়ে যাও,—শেষ প্রশ্ন আমার, সত্যিই শেষ প্রশ্ন।'

'হায় রে!'

'আচ্ছা, মনে করো তোমাদের পরিবার অত্যন্ত গরিব হয়ে পড়েছে। লেখাটেখা নকল করে, কি ছুতোর-কামারের কাজ করে, কোনরকমে তোমাকে সংসার চালাতে হচ্ছে। আর তোমার বোন বিপথে পা দিয়েছে—এই আমাদের সবাকার মতো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বোন, তোমার আপন বোন—এক বদমাইশের পাল্লায় পড়েছে সে, ফিরছে—হাত বদলা-বদলি হতে হতে—কেমন লাগবে তখন তোমার?'

'যত সব বাজে কথা।—এ হতেই পারে না।'—কোলিয়া থামিয়ে দেয় ওকে, 'থাকগে —ঢের হয়েছে; চললাম আমি।'

'তাই, তাই বরং যাও। অন্তত এটুকু দয়াও কর আমায়। ঐখানে ঐ বাক্সের মধ্যে আছে দশটা রুবল। নিয়ে যাও তুমি—ঐ দিয়ে তোমার মায়ের জন্যে কিনে দিয়ো একটা সোনাবসানো পাউডারের বাক্স আর তোমার ছোটবোন যদি কেউ থেকে থাকে তো তার জন্যে একটা পুতুল। বলো, এক খানকি মাগী চিরজন্মের মতো এ সংসার ছেড়ে চলে গেছে—তারই স্মৃতিচিহ্ন এ সব। যাও বাছা।'

তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে কোলিয়া, মেঝের উপরে সিধে হয়ে দাঁড়ায় —যেন নগ্ন, সুঠাম, অপরূপ তরুণ যৌবনের প্রতিমূর্তি।

'কোলিয়া।'—স্নিগ্ধ আকুল সোহাগ-সজল স্বরে কূজন করে ওঠে জেন্‌কা, 'কোলেচ্‌কা।'

ফিরে চায় কোলিয়া, আচমকা ছোট্ট একটু দমকা শ্বাস টেনে নেয়—হাঁপিয়ে উঠেছে বুঝি। এ কি। সজল চোখে উঠে দাঁড়িয়েছে জেন্‌কা—যেন মমতাভরা বিষাদময়ী নারীর নীরব ভর্ৎসনার প্রতিমূর্তিটি। সুন্দর, অপরূপ। জীবনে এমনটি দেখেনি সে কোনদিন —ছবিতেও নয়। বিছানার পাশে বসে পড়ে সে, আবেগভরে জড়িয়ে ধরে জেন্‌কাকে, মমতাভরে বলে, 'আর ঝগড়া করে না জেন্‌কা।'

লতিয়ে পড়ে জেন্‌কা ওর বুকে, দু-হাত মেলে কাঁধ জড়িয়ে ধরে ওর, মাথা এলিয়ে দেয় ওর বুকের উপরে। নীরবে কেটে যায় কতক্ষণ।

'কোলিয়া'—হঠাৎ বিরস মুখে জিজ্ঞেস করে জেনী, 'ব্যামোর ভয় করে না তোমার?'

শিউরে ওঠে কোলিয়া। হিম হয়ে যায় বুকের ভিতরটায়। তখনি কোন উত্তর যোগায় না তার মুখে।

'ভয়। তা ভয়ের কথাই তো বটে।'—আমতা আমতা করে বলে শেষে—'ভগবান রক্ষা করুন আমায়। তা আমি তো শুধু তোমার কাছেই আসি, শুধু তোমারই কাছে। তেমন তেমন হলে বলতে বটে তুমি।'

'তা বলতাম বটে।'—চিন্তিতভাবে কথার জের টেনে বলে জেনী, 'আচ্ছা, সিফিলিস রোগটা কেমন—শুনেছ কখনও।'

'শুনেছি বই কি।—নাক খসে পড়ে।'

'না কোলিয়া, শুধু নাকই নয়। সারা শরীরটাই পচতে থাকে,—হাড় পর্যন্ত। কোন কোন ডাক্তার বলে এ রোগ সারে। বাজে কথা! সারে, না ঘোড়ার ডিম। দশ, বিশ, ত্রিশ বছর ধরেও কোন কোন লোক পচতে থাকে। যে-কোন মুহূর্তে পক্ষাঘাত হতে পারে। কারুর মস্তিষ্ক-বিকৃতিও ঘটে। এ রোগ যাদের হয়েছে, তারা সবাই জানে যে পানাহার, চুম্বন, এমন কি নিশ্বাসে পর্যন্ত এ-বিষ ছড়ায় তারা। আর যারা তার নিকটতম তাদেরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এ-বিষ—বোন, বউ, ছেলে—যাদের ব্যামো হয়েছে তাদের সন্তানরা হয়ে থাকে বিকৃতাঙ্গ, ক্ষয়রোগী, হাবা।—কোলিয়া, কোলিয়া—এই হচ্ছে ঐ রোগের আসল পরিচয়। আর কোলিয়া'—সটান সিধে হয়ে দাঁড়ায় জেন্‌কা, শক্ত করে চেপে ধরে তার কাঁধ দুখানা, মুখখানা নিয়ে আসে নিজের মুখ-বরাবর; গভীর বিষাদ-মাখা, অলোকসামান্য চোখ দুটির চাউনিতে ধাঁধা লেগে যায় কোলিয়ার। এই যে কোলিয়া, শোন তবে। আজ মাসাধিক কাল আমারও হয়েছে ঐ সর্বনাশা রোগ। তাই, তাই তোমাকে আমি চুমু খেতে দিইনি, বন্ধু।'

'যাঃ, ঠাট্টা করছ তুমি। খালি খালি খেপাচ্ছ আমায়, জেনী।'

'ঠাট্টা! এস তবে—দেখ।'

সোজাসুজি কোলিয়াকে দাঁড় করিয়ে দেয় জেনী, তারপর একটা দেশলাই জেবলে

বলে, 'মন দিয়ে চেয়ে দেখ, হাঁ করছি আমি।' দেখে শিউরে ওঠে কোলিয়া। 'ঐ যে দেখলে সাদা সাদা দাগ আলজিবের মধ্যে, ঐ সেই কালব্যাধি,'—মুখ বন্ধ করে জেনী। 'বুঝলে—নাও, এবার পোশাক পরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।'

বাক্‌রোধ হয়ে আসে কোলিয়ার। কোনদিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে যায় সে, উলটোপালটা করে ফেলে সব, কাঁপে হিহি করে।

'বড্ড বেঁচে গেলে আজ!'—মাথা নিচু করে বলতে থাকে জেন্‌কা, 'কপাল ভালো যে ভালোমানুষের মেয়ের হাতে পড়েছিলে এসে। আর কারও পাল্লায় পড়লে রক্ষে ছিল না আজ। জেনে রেখ—তোমরা যারা আমাদের সতীত্ব নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দিয়েছ সমাজ-সংসার থেকে, তারপর দুটি রুবলের বিনিময়ে এসে এক-এক বার দর্শন দান করে যাও, বুঝলে, তাদের উপরে, ভেব না, কিছুমাত্র দরদ আছে আমাদের।'—হঠাৎ সগর্বে মাথা উঁচিয়ে বলে জেন্‌কা, 'হ্যাঁ, কায়মনোবাক্যে ঘৃণা করি আমরা তোমাদের, বিন্দুমাত্র মায়ামমতা নেই তোমাদের প্রতি।'

মাঝপথেই পোশাক পরতে ভুলে যায় কোলিয়া, ধপ্‌ করে বসে পড়ে বিছানার উপরে, দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে—কচি ছেলেটি যেন, 'হা ভগবান।'—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকে সে, 'কি কঠোর সত্য এ।—কি নিদারুণ। কেন, আমাদের চোখের সামনেই তো ঘটেছে এমন কাণ্ড; আমাদের এক ঝি ছিল, নিউসা—ঝি শুধু—সবাই তাকে ডাকত অ্যানিতা ব'লে—চমৎকার মেয়েটি—আর আমার দাদা থাকত তাকে নিয়ে—আমারই দাদা—একজন মিলিটারি অফিসার—সে চলে গেলে দেখা গেল মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা, আর মা তাকে তাড়িয়ে দিলেন—হ্যাঁ, দূর করে দিলেন একেবারে—ছেঁড়া ন্যাতা যেন—কোথায় এখন সে? আর বাবা—বাবা তিনিও যে একজন—ঝি—ঝিকে নিয়ে—'

আর থাকতে পারে না জেন্‌কা, অর্ধনগ্ন অবস্থায়ই উঠে দাঁড়ায়। কোলিয়ার সামনে এসে জেন্‌কা—সেই মুখরা কটুভাষিণী, নাস্তিক জেন্‌কা—ধীর গম্ভীর ভাবে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে গভীর মমতা আর কৃতজ্ঞতাভরে ক্রুশচিহ্ন আঁকে। আশীর্বাদ উচ্চারণ করে—'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বাছা আমার।'

তারপর ছুটে গিয়ে দোর খুলে হাঁক দেয় সে, 'গিন্নিদি।'

'গিন্নিদি ভাই, দেখ দিকিনি, তামারা আর ছোট মান্‌কার মধ্যে যাকে পাও ডেকে দাও তো।'—হুকুম করে জেন্‌কা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি যেন বলে কোলিয়া, শুনেও শোনে না জেন্‌কা।

'যত শীগগির পার পাঠিয়ে দাও,—বুঝলে?'

'এইযে দিচ্ছি পাঠিয়ে।'

'ও-সব আবার কেন, জেনী? ডাকছ কেন ওদের? বলবে নাকি সব?'

'দাঁড়াও একটু—ভয় নেই, লজ্জা দেব না তোমায়।'

একটু পরেই ইস্কুলের মেয়ের পোশাক পরে মান্‌কা এসে দাঁড়ায়, 'আমায় ডাকছিস জেনী? কেন? ঝগড়া হয়েছে বুঝি?'

'না, মান্নেচকা, ঝগড়া হয়নি। মাথাটা বড্ড ধরেছে। তুই বরং ওর সঙ্গে থাক আমার বদলি। কেমন?'

'থাক, থাক, ঢের হয়েছে, জেনী লক্ষ্মীটি।' আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে বলে ওঠে কোলিয়া, 'বুঝতে পারছি সব। আর দরকার নেই কিছু। মেরে ফেলো না আমায় আর।'

'কি গো, ব্যাপার কি?'—কিছু বুঝতে না পেরে খেলাচ্ছলে হাত দুলিয়ে জিজ্ঞেস করে মান্‌কা।

'না। কিছু নয়। যা এখন তুই। এমনি ঠাট্টা করছিলাম।' অগত্যা ভালোয় ভালোয় বিদায় করে দেয় ওকে জেন্‌কা।

দুজনেই পোশাক পরে এসে দাঁড়ায় দরদালানের দোরের কাছে। মুখে কথা নেই। বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকে শুধু এ ওর মুখের দিকে। বহুক্ষণ কেটে যায়। ঠিক বুঝতে পারে না কোলিয়া, প্রাণ দিয়ে অনুভব করে শুধু, জীবনে আজ তার মহাবিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে।

শেষে সে-ই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে; জেনীর হাতখানি ধরে বলে, 'আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর, জেনী।'

'হ্যাঁ বাছা।—হ্যাঁ, আমার মানিক।—হ্যাঁ—হ্যাঁ—'

মায়ের মতো সস্নেহে কোলিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে জেনী, তারপর আলগোছে ঠেলে দেয় ওকে বারান্দার দিকে; ঘরে ঢুকে দরজাটা একটু ফাঁক করে ডেকে জিজ্ঞেস করে ফের, 'কোথায় চললে এখন?'

'বন্ধুকে নিয়ে সোজাসুজি বাড়ি চলে যাব।'

'যা ভাল বোঝ কর।—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বাছা।'

'ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।'—জেনীর দিকে হাত বাড়িয়ে ফের বলে ওঠে সে।

'বলেইছি তো, ধন, ক্ষমা করেছি।—আর, আমায়ও ক্ষমা করো তুমি। আর যে দেখা হবে না তোমায় আমায়।'

ঝনাৎ করে দোর বন্ধ করে দেয় জেনী।

একা—একা এখন সে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে কোলিয়া; পেত্রোব তামারাকে নিয়ে যে ঘরে ঢুকেছে, কি করে তা খুঁজে বের করে এখন? যাক, ঐ যে ছোট গিন্নি যোসিয়া ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছে এদিকে। জিজ্ঞেস করতেই খ্যাঁক করে ওঠে সে, 'আ, মোলো যা, তোমায় নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার ফুরসুত নেই, বাপু। ঐ যে, ধারের তেসরা নম্বরী ঘর।'

দরজায় গিয়ে ঘা দেয় কোলিয়া। ভিতরে কেমন যেন একটা হুটোপাটি আর ফিস-ফাস কথার শব্দ। ফের ধাক্কা দেয় সে, 'দোর খোল কেরকোবিউস। আমি সোলিতেরোব।'

ছদ্মনাম দুটো—ঠিক আত্মগোপনের জন্যে ততটা নয়, যতটা হল রোমাঞ্চকর গুপ্তচর কাহিনীর অনুকরণে রহস্যপ্রিয়তার জন্যে।

'এখন আসতে পাবে না তুমি।'—দোরের পিছনে শুনতে পাওয়া যায় তামারার গলা, 'কাজে ব্যস্ত আমরা।'

'মিছে কথা।'—প্রতিবাদ করে ওঠে পেত্রোব, 'এসো তুমি।'

দোর খুলে ফেলে কোলিয়া। ভিতরে ঢুকে দেখে, পোশাক পরে চেয়ারের উপরে বসে আছে পেত্রোব, চোখমুখ লাল, মনমরা হয়ে পড়েছে একেবারে, ছোট্ট ছেলেটির মতো ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ নিচু করে বসে আছে বেচারা।

'বেশ বেছে বেছে বন্ধু একটি যোগাড় করে এনেছ বটে।'—ক্রোধভরে শ্লেষ করে বলতে থাকে তামারা, 'ভেবেছিলাম দরদী পুরুষ, এখন দেখছি একেবারে একটি কচি খুকী। ধর্ম নষ্ট হতে দুঃখে মরে যাচ্ছেন একেবারে। আহা, কি রত্নই কুড়িয়ে পেয়েছ! তা নিয়ে যাও, ফেরত নিয়ে যাও রুবল দুটো।' হঠাৎ পেত্রোবের উপরে হম্বিতম্বি শুরু করে দেয় সে। 'যাও, বরং কোন গরিব-দুঃখী ঝি-টিকে দান করো। ছুঁচো কোথাকার।'

'কেন গালমন্দ করছ আমায়?'—চোখ না তুলেই বলে পেত্রোব, 'আমি তো গালমন্দ করিনি তোমায়। তুমিই দেখছি শাপশাপান্ত শুরু করলে। এই তো তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কাটিয়েছি, তুমি নাও ও দুটো রুবল। আর তুই-বা কেমন গ্রাদিশেব—থুড়ি, সোলিতেরোব? আমি ভেবেছিলাম ভালো মেয়ে, কিন্তু সারাক্ষণ খালি চুমু খেতে চেষ্টা করছে আর কি যে সব করছে তা ভগবানই জানেন—'

রাগের মধ্যেও হেসে ফেলে তামারা, 'ও, আমার বোকা ছেলে। আহা, রাগ করো না—নিচ্ছি তোমার টাকা। কিন্তু দেখ, আজই সন্ধ্যেবেলায় এর জন্যে অনুতাপ হবে তোমার। থাক, নাও, এস ভাব করি এখন। দাও, হাতখানা এগিয়ে দাও—এই আমি যেমন দিয়েছি।'

'চলো যাই, কেরকোবিউস,' বলে গ্লাদিশেব, 'আসি, তামারা।' তামারা ছেলে দুটিকে এগিয়ে দিতে যায়।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে আঁতকে ওঠে কোলিয়া—বৈঠকখানা-ঘরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের স্তব্ধ। গা-ছমছমে ভাব। মাঝেমাঝে পায়ের শব্দ আর চাপা গলায় দ্রুত কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসে।

প্রথমে এসে যে-ছবিটার নিচে তারা বসেছিল, সেখানে বাড়ির প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে, আর নিচের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে। ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে মাথা গলিয়ে কোলিয়া দেখে, মেঝেয় কাত হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়ে আছে রলি-পলি! মুখখানা নীল—একেবারে যেন কালিবর্ণ—হয়ে গেছে।

'কি হ'ল হঠাৎ?' আতঙ্কে শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করে কোলিয়া।

জবাব দেয় নিউর্কা—ফিসফিস করে ত্রস্তস্বরে বলে, 'কি জানি! মান্কার জন্য মিষ্টি কিনে এনে, আমাদের আরমেনিয়ান ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে লাগল, হঠাৎ হাসতে হাসতে এল জোর একটা কাশির টান, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে—একেবারে চুপ।—বাব্বা। আমি আবার মড়া দেখতে পারি না।'

'দাঁড়াও। দেখি কপালে হাত দিয়ে। হয়ত বেঁচে আছে।'

এগোতে যায় কোলিয়া, কিন্তু সাইমনের আঙ্গুলগুলো একেবারে লোহার সাঁড়াশির মতো বেঁধে এসে ওর কনুইয়ের উপরটায়, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে ওকে পিছনে।

'নেই, নেই, দেখবার কিস্সুটি নেই আর,'—ধমক দিয়ে ওঠে সাইমন, 'যান এখন, চলে যান মশাইরা এখান থেকে। এখুনি পুলিস আসবে, সাক্ষী মানবে সব আপনাদের। যত রাজ্যের খিটকেল তখন! ভূতের বাপের ছেরাদ্দ এই মিলিটারি ছোঁড়াদের নিয়ে।'

ঠেলতে ঠেলতে ওদের পোশাক-কুঠরিতে নিয়ে যায় সাইমন, ওভারকোট দুটো গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে, 'যান, দৌড়ে পালান। টিকিটি যেন দেখতে না পাই ফের। এর পর এলে আর ঢুকতে দিচ্ছি না। বুড়ো কুত্তাটাকে মদের পয়সা খয়রাত করেছিলেন আপনারা—আর তাই কোঁক কোঁক করতে করতে একদম পটল তুলল সে চোখের সামনে।'

'বটে। বড্ড ওস্তাদি ফলাচ্ছ যে দেখি।'—হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গ্লাদিশেব।

'মানে? ওস্তাদি ফলাচ্ছি তার মানে?—গর্জে ওঠে সাইমন, 'এক ঘুঁষিতে নাকখানা এমনি থেঁতলে দেব যে বাপমায়ের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব। এখনি পালা। নইলে ঘাড়-গর্দান এক হয়ে যাবে।' ভ্রূহীন চোখের পৈশাচিক দৃষ্টির সামনে, মিইয়ে পড়ে মিলিটারি ছাত্র দুটি।

দুটো লোক এসে ঘরে ঢোকে—সাইমনের পেশাদার সাঙাত দুজন।

'কি? রলি-পলির ভবলীলা নাকি সাঙ্গ হয়েছে?'—বেশ স্ফূর্তির ঝোঁকে জিজ্ঞেস করে তাদের একজন।

'হ্যাঁ, একদম শেষ,' জবাব দেয় সাইমন, 'এখন লাশ টেনে রাস্তায় ফেলতে হবে, নইলে ভূত হয়ে উৎপাত করবে। গোল্লায় যাক শালা! লোকে ভাববে মদ খেয়ে মাতলামো করতে করতে রাস্তায় অক্কা পেয়েছে।'

'তবে তোর—অ্যাঁ—তোর কম্ম নয় তা হলে?'

'বুর্বাকের মতো কথা শোন একবার। আরে, একটা অছিলা তো চাই! এমন নিপাট ভালোমানুষটি—ভেড়ার ছানা আর কি। সত্যি সত্যিই আয়ু ফুরিয়েছিল শালার।'

'তা, শালা মরবার আর ঠাঁই খ্‌বুজে পেল না! এর চাইতে খারাপ আর কিছ্‌ব মাথায় আসেনি ব্‌বঝি?'—জিজ্ঞেস করে দ্বিতীয় জন।

'যা বলেছিস, সাঙাত।'—জবাব দেয় প্রথম জন, 'বেড়ালি রে সঙটি সেজে, মজলি এসে পাপের হাটে। যাক, চল্ এখন, যাবি না?'

সামরিক ছাত্র দ্‌বজন প্রাণপণে অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে ছ্‌বটে চলে। রলি-পলির ভূত তাদের তাড়া করেছে ব্‌বঝি!

কোলিয়া গ্রাদিশেব। শোন শোন। যখন তুমি বড় হবে, তোমার কি মনে থাকবে আজকের এই আগস্ট-রাতের কথা? তোমার ছেলের কাছে এ-কাহিনী বলতে পারবে তুমি?

৪

সকালে নেমেছে ইলশে-গ্‌বঁড়ি ব্‌বৃষ্টি। বড্ড একঘেয়ে; মন্দ লাগে না তব্‌ব। প্লাতোনোব এসে দিনমজ্‌বরের দলে ভিড়ে, একটা বন্দরে তরম্‌বজের বজরা খালাসের কাজে গিয়ে লেগেছে। ভারি ভালোবাসে সে এই রকম নিশ্চিন্ত ভবঘ্‌বরের জীবন।

তা কাজটা বেশ লাভজনকও বটে। দলের সর্দার জাবোরোত্‌নি লোকটা খ্‌বব ওস্তাদ, মনিবকে জাপিয়ে-জাপিয়ে মজ্‌বরির হার বেশ চড়িয়ে নিয়েছে—দৈনিক এক-একজন এখন উপায় করেছে চার র্‌ববল অবধি। জাবোরোত্‌নির কিন্তু তাতেও মন ওঠে না, লোকজনদের কাজে খালি তাড়া দেয়—যাতে করে দিনে পাঁচ র্‌ববল মজ্‌বরি আদায় হতে পারে।

খাবার ছ্‌বটি হয়েছে এখন। খেতে বসবে প্লাতোনোব। কে-এক ছোঁড়া, খালি পা, ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে; ছ্‌বটে এসে বলে, 'তোমাদের মধ্যে কার নাম প্লাতোনোব?'

'আমার নাম।'

'হোই হোথা গির্জের পেছনে এক স্যায়না মেয়েছেলে ডাকতেছে তোমায় গো—এই যে চিঠি।'

'হ্‌ব্‌ব-উ-উ!'—হ্রেষারব করে ওঠে দলস্‌বদ্ধ সবাই।

'কই, দেখি চিঠিখানা।' হাত বাড়ায় প্লাতোনোব।

জেন্‌কার চিঠি, কাঁচা হাতে লেখা, গণ্ডায় গণ্ডায় বানান ভুল, 'সেরেজোাই ইবানিচ, বীরক্‌ত করছি ক্ষমা কর। জর্‌বড়ি কতা আচে। মাস্তর দশ মিনিটের যন্নে এস। য়ানা মারকোবনার বারির 'জেনকা'।'

উঠে দাঁড়ায় প্লাতোনোব, জাবোরোত্‌নিকে বলে, 'এখ্‌বনি আসছি, কাজ শ্‌বর্‌ব হবার আগেই ফিরে আসব।'

'যাচ্ছ, যাও!'—আলস্যভরে বিদ্রূপের স্‌বরে অন্‌বমতি দেয় সর্দার, 'তবে এ-সব কারবারের জন্যে রাতই তো রয়েছে হে। —যাও, যাও, কে আর ধরে রাখতেছে তোমায়। তবে কাজের বেলায় না এলে তোমার রোজ কিন্তু কাটা যাবে। হাতের নাগালে যাকে পাব তারে নিয়েই কাজ চালাব; আর যতগ্‌বলো তরম্‌বজ সে ফাটাবে, সব তোমার নামে উশ্‌বল যাবে, কয়ে দিলাম।—আরে, তুমিও যে এমন হ্‌বমদো মিনসে তা জানতাম না মাইরি।'

গির্জার পিছনে অপেক্ষা করছিল জেন্‌কা—নেহাত সাদাসিধে পোশাক পরনে; তব্‌বও দ্‌বর থেকে দেখেই এ-কথা না ভেবে পারল না প্লাতোনোব, 'বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো জেন্‌কাকে। একবার যার চোখ পড়বে, বারবার পিছ্‌ব ফিরে না তাকিয়ে থাকতে পারবে না সে কিছ্‌বতেই।'

'কেমন আছ জেন্‌কা?' জেন্‌কার হাত ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে প্লাতোনোব, 'তা এমন সময় কি মনে করে?'

জেন্‌কার মুখখানা বিষণ্ণ, গম্ভীর। গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে—দেখেই বুঝতে পারল প্লাতোনোব।

'আমার এখনো খাওয়া হয়নি, জেনী। চল, কাছেই একটা সরাইখানা আছে; সেখানে বসে খেতে খেতে নিরিবিলি সব শুনব। তুমিও দাঁত দিয়ে কেট কিছু কিছু—কি বল?'

'না, আমি কিছু খাব না।'—ধরাগলায় জবাব দেয় জেনী, 'বেশিক্ষণ আটকাব না তোমায়। একটা পরামর্শ চাই শুধু—আর কার কাছে যাব বল, কেউ তো নেই আমার।'

'বেশ, বেশ। চলো তবে। যা বলবে তাই শুনব। তোমায় বড্ড ভালোবাসি, জেন্‌কা।'

বিষণ্ণ কৃতজ্ঞ চোখে চায় জেন্‌কা, 'তা জানি, সেরজাই ইবানিচ, তাই তো এলাম তোমার কাছে।'

'টাকার দরকার নাকি? খুলেই বল না। হাতে এখন বেশি কিছু নেই বটে, তবে দল থেকে চাইলেই আগাম পেয়ে যাব।'

'না, তা নয়। চল ওখানে গিয়েই সব বলছি।'

সরাইখানায় এসে নিরিবিলি বসে দুজনে। খাবার আনতে হুকুম দিয়ে জিজ্ঞেস করে প্লাতোনোব, 'বল, জেনী, কি বলবে। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কি যেন হয়েছে তোমার।'

রুমাল বের করে খুঁটতে থাকে জেন্‌কা, মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে একমনে। ওর অসহায় অবস্থা দেখে প্লাতোনোবই ফের কথা পাড়ে, 'অমন দোমনা হচ্ছ কেন, জেনী? আমি তো তোমাদের পর নই। সব শুনলে হয়ত সৎ পরামর্শই দিতে পারব। নাও, আর গড়িমসি না করে কি বলবে বল।'

'সত্যি। কিন্তু কি বলব ঠাওর করতে পারছি না। মানে, আমার অসুখ করেছে, সেরজাই—কালব্যাধিতে ধরেছে আমায়। বুঝেছ কথাটা?'

'তারপর?'

'ব্যামোটা অনেকদিনই হয়েছে; এক মাসের উপর হবে। 'ত্রিনীতি'র দিন প্রথম টের পাই।'

কপালটা একবার রগড়ে নেয় প্লাতোনোব, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিনই জনকয়েক ছাত্রের সঙ্গে আমি তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম—না?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, সেরজাই।'

'আহা, জেন্‌কা!' বিষণ্ণ ভর্ৎসনার স্বরে বলে প্লাতোনোব, 'তাই বুঝি দুজন ছেলের এই রোগ হয়েছিল। তোমার কাছ থেকেই তা হলে—'

'হতে পারে। কি করে জানব? সেদিন আমার সঙ্গে কে ছিল? দাঁড়াও মনে পড়েছে—লম্বাটে গোছের একটি ছেলে; চোখে পাঁশ-নে; তোমার পেছনে সে কেবলই লাগছিল—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে হল সোবাসনিকোব। সে-ই বটে। তা সেটা কিছু নয়, শৌখিন ফুলবাবু একটি। তবে আর-একটি ছেলের জন্যে বাস্তবিকই দুঃখ হয়—ঐ রামেশিস। ডাক্তাররা সব যখন বলল, এ রোগ আর সারবে না, দেশে গিয়ে তখন আত্মহত্যা করল। লিখে রেখে গিয়েছিল—'আমি আর মানুষের মধ্যে গণ্য নই। ক্ষণিক মোহের বশে ভালো না বেসেও একটি নারীতে উপগত হয়ে যে পাপ করেছি, স্বহস্তে তার শাস্তি গ্রহণ করলাম।' সত্যি! দুঃখ হয় তার জন্যে, জেন্‌কা।'

নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে জেন্‌কার, 'আমার কিন্তু এতটুকুও দুঃখ হয় না।'

প্লাতোনোব বলে, 'দুঃখ হয় না তোমার? কেন? অবশ্য আত্মহত্যা আমিও পছন্দ করি না। তবুও তার এ মৃত্যুর সামনে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াই আমি। উদার, বিচক্ষণ, সহৃদয় ছেলে ছিল সে। নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না।'

'অতশত বুঝি না আমি।'—রূঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে জেন্‌কা, 'সবাইকে ঘৃণা করি আমি। শুধু একবার ভেবে দেখ দির্কিন—আমি কি। সমাজের আস্তাকুঁড় বই তো নই? সত্যি, প্লাতোনোব, এই যে হাজার হাজার লোক আমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এসেছে এতদিন, যদি পারতাম, ওদের লোহার শিক গরম করে ছেঁকা দিতাম—'

'তোমার বিদ্বেষ আর অহংকার বড়ো বেশি, জেনী।'—শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় প্লাতোনোব।

'না, এমনটি ছিলাম না আমি। তবে হ্যাঁ, এমন হয়ে পড়েছি। দশ বছর বয়স হতে-না-হতে আমার নিজের মা আমায় বেচে দেয়; সেই থেকে খালি হাত-ফেরতা হয়ে হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কই, কেউ তো আমায় মানুষ বলে মানল না কোনদিন? সবার কাছেই ঘৃণ্য জীব, জঞ্জাল আমি —ভিখারি, চোর, খুনে-ডাকাতেরও নিচে। একটা জল্লাদও আমায় দেখে করুণার চোখে, তাচ্ছিল্যের ভাবে। আমি হলাম গিয়ে বাজারে বেউশ্যে। বুঝেছ, সেরজাই, কি ভয়ঙ্কর কথা—'বা-জা-রে'। তার মানে, আমার বাপ নেই, জাতজন্ম বলেও কিচ্ছু নেই,—স্রেফ 'বা-জা-রে'। আচ্ছা, কেউ কি একবারও এসে ভেবেছে—না, এ-ও একটা মানুষ, এরও দুঃখদরদ আছে, বোধশক্তি আছে। কাঠখড়ের পুতুলটি নয় এ। তবুও এই সব মেয়েদের মধ্যে বোধ হয় একা আমিই আমাদের এই পঙ্কিল জীবনের ভয়াবহ দুরবস্থার কথা বুঝি। সত্যি, প্লাতোনোব, আর কেউ কিচ্ছু বোঝে না; জ্যান্ত মাংসপিণ্ড সব। আমার এ বিদ্বেষের চেয়ে সে আরও খারাপ।'

'ঠিকই বলেছ, জেনী। কিন্তু এর তো কোন জবাব নেই। কেউ তোমার—'

'না, না, কেউ নয়, কেউ নয়।—মনে পড়ে তোমার সেই-যে এক ছোকরা এসে লিউব্‌কাকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল?'

'মনে পড়ে বই কি। তা কি হয়েছে তার?'

'কি আর হবে।—এই তো সবে কাল বেচারী জলে ভিজে, ছেঁড়া জামা গায়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির। দিয়েছে তাড়িয়ে—'

'এও কি সম্ভব!'

'তাই বোঝ, একবার। সত্যি, প্লাতোনোব, এ অবধি শুধু একজন পুরুষমানুষই চোখে পড়েছে আমার, যে দুঃখদরদ বোঝে, যার প্রাণে মায়ামমতা আছে—মন্দা কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক প্রবৃত্তি নেই যার, সে হচ্ছ তুমি। কিন্তু তাহলে কি হবে? তুমি হচ্ছ আলাদা জাতের মানুষ। কেমন যেন। খালি টো টো করে বেড়াচ্ছ—কিসের খোঁজে কে জানে। দোষ নিয়ো না, সেরজাই, তুমি একটি কচিখোকা। আর তাইতেই তো আসতে পেরেছি তোমার কাছে—'

'যাক, কি বলছিলে বল, জেনেচ্‌কা—'

'আর তাই, যখন ব্যামোটা ধরতে পারলাম, রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম। ভাবলাম—এই তো শেষ, তবে আর দুঃখ কিসের, আশাভরসা কেন, সবই তো ফুরিয়েছে। এতদিন যা সয়ে এসেছি তার বদলে আমারও কি কিছু দেবার নেই? এ সংসারে কি বিচার নেই? প্রতিশোধের জ্বালাও কি প্রাণ ভরে মেটাতে পারব না? স্নেহ, ভালোবাসা কিছুই তো পেলাম না এ জীবনে—বাড়ির যত্ন-আত্তি রূপকথা আমার কাছে। ওরা আসে, খেঁকি কুকুরের মতো তু তু করে কাছে ডাকে, আদর করে পিঠ চাপড়ায়, তারপর বুটশুদ্ধ মাথায় লাথি—যাঃ, ভাগ। ওদেরই মতো মানুষ আমি, তাকে ওরা করে তুলেছে কিনা ঘর-

পোঁছার ন্যাতা, ওদের পঙ্কিল লালসা-নির্গমের নর্দমা। তবু ওদেরই দেওয়া এ-রোগ মাথা পেতে নিতে হবে?—উঃ। কিন্তু কেন? আমি কি ক্রীতদাসী? বোবা? ভারবাহী জন্তু?—তাই, প্রাতোনোব, তখন আমি ঠিক করলাম সবাইকে দেব এ-রোগ—ছেলে, বুড়ো, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত—কাউকে বাদ দেব না। সব—সব—সব।'

প্রাতোনোব অনেকক্ষণ হল খাওয়া বন্ধ করে বসেছিল,—একদৃষ্টে চেয়েছিল জেন্‌কার মুখের দিকে। জীবনে কত দুঃখ, কত কদর্য বীভৎসতা, কি হিংস্রতাও, তো দেখে এসেছে সে, তবুও এমন পুঞ্জীভূত তীব্র ঘৃণা—এমন প্রচণ্ড বিদ্বেষ আর কখনও বুঝি দেখেনি; আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বসেছিল সে। জেন্‌কার কথা শেষ হতে সামলে নিয়ে বলল, 'একজন নামকরা লেখক এ রকম একটা ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন; প্রুশিয়ানরা একবার ফরাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে। তারপর পুরুষদের ধরে ধরে গুলি করে মারতে থাকে, আর মেয়েদের ওপরে বলাৎকার করে। ঘরবাড়ি লুটপাট করে, মাঠ জ্বালিয়ে দিয়ে দেশ ছারখার করে দিতে থাকে তারা। তখন একটি সুন্দরী ফরাসী রমণী স্বেচ্ছায় যৌন রোগ গ্রহণ করে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে দলে দলে জার্মান সৈনিকদের অঙ্কশায়িনী হয়ে তাদের মধ্যে ছড়ায় ঐ কালব্যাধি। হাসপাতালে মরবার সময় মেয়েটি গর্বে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সব কথা খুলে বলে যায়। তা, তারা ছিল শত্রুপক্ষ, দেশকে পদদলিত করেছিল, হত্যা করেছিল ওর ভাইদের।—কিন্তু তুমি, তুমি জেনেচ্‌কা!—'

'তার আগে জিজ্ঞেস করি, সেরজাই, ধর্ম সাক্ষী করে বলো দিকিনি। যদি পথের ওপরে দেখতে পাও একটি শিশু ধুলোয় গড়াচ্ছে, কেউ হয়ত পাশবিক অত্যাচার করে গেছে তার ওপরে—ধর না হয়, তার চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছে, কান দুটো কেটে নিয়ে গেছে, আর যদি জানতে পার লোকটা এই মুহূর্তে তোমারই পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তবে তিনি ঠিক সেই মুহূর্তটিতে স্বর্গ থেকে চেয়ে রয়েছেন তোমার দিকে—তবে তুমি, তুমি তখন কি করবে সেরজাই?'

'বলতে পারি না; হয়তো খুন করে ফেলব তাকে।'

'আবার 'হয়ত' কেন? নিশ্চয়ই। আমি জানি, বুঝতে পারছি তোমার মনের কথা। বেশ, এখন ভেবে দেখ, আমাদের প্রত্যেকের ওপরেই শিশুকালে এ-ধরনের অত্যাচার হয়েছে। কেন, সেরজাই, তুমিই তো সেদিন বলেছিলে—আমরা সব শিশু। আর এ কথা ভেব না, সেরজাই, যে একা আমার ওপরে অত্যাচারেরই প্রতিশোধ নিচ্ছি আমি। না, তা নয়। আমি আমাদের সবার ওপরে অত্যাচারেরই প্রতিশোধ নিচ্ছি। বল, ঠিক করছি কিনা?'

'কি জানি, জেনেচ্‌কা? কি করে বলি বল?'

'কিন্তু তাও আসল কথা নয়। এতদিন মনে আমার দুঃখ ছিল না, নির্বিকার চিত্তে এ বিষ ছড়িয়ে চলেছিলাম। কিন্তু কাল একটি ছেলেকে দেখে হঠাৎ কেন যেন বড়ো মায়া হল—মনে হল এ তো এক হাবাকে ঠকিয়ে পয়সা নেওয়ার সামিল, অন্ধকে আঘাত করার মতো, ঘুমন্ত লোকের গলায় ছুরি বসানো। ছেড়ে দিলাম তাকে, কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল সে। সংসারময় যে এ রোগ ছড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে আসছিলাম এতদিন, তা ভেঙে গেল। এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি আমি। তুমি তো কত জান, দেখেছ শুনেছও কত; আমার ভবিষ্যতের সন্ধান বলে দাও, সেরজাই।'

'বুঝতে পারছি না, জেনেচ্‌কা। জানলে বলতাম বই কি। কিন্তু এ আমার বুদ্ধির অতীত, বিবেকেরও নাগালের বাইরে।'

'কিন্তু আমিও যে বুঝতে পারছি না, সেরজাই।'—বিমূঢ়ভাবে আঙুল মটকায় জেনী। 'তবে যা ভেবে এসেছি এতদিন—সব ভুল। এখন শুধু একটি পথই খোলা রয়েছে আমার জন্যে। আজই সকালে—'

'না, না, জেনী! দোহাই তোমার!—ও-সব করতে যেও না,' ব্যাকুল হয়ে ওঠে প্লাতোনোব, 'পথের সন্ধান যদি জানা থাকত আমার, তা যত দূরেই হোক না কেন, বলতে ভয় পেতাম না। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই। তবে হ্যাঁ, একটা পথ বাতলে দিতে পারি। তা এর চেয়ে কম নিষ্ঠুর নয়; বরং তাতে করে বোধ করি তোমার ক্রোধের অনেক শান্তি হবে।'

'কি?'—শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে জেনী। উত্তেজনার পর ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে এখন সে।

'শোন, এখন তোমার রূপযৌবন আছে। সত্যি, তুমি বড় সুন্দরী, জেনী। ইচ্ছে করলে লোককে বিভ্রান্ত করে দিতে পার। কিন্তু জান না বোধ হয় কি প্রচণ্ড শক্তি এর। অনায়াসেই তুমি ইয়াম্‌কা থেকে চলে যেতে পার; ইচ্ছে করলে নিজে রোগমুক্তও হতে পার। তোমার একটি অঙ্গুলি-হেলনে শত শত লোক ছুটে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়বে—তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকবে, পোষাপ্রাণীর মতো। লাগাম কষে ধরবে তখন, হাতে তুলে নেবে চাবুক। ধ্বংস কর তাদের! দেখ, জেনী, এ-সংসারটা তো মেয়েদেরই হাতে। কাল যে ছিল ঝি, যাত্রাদলের সখী, আজ সে হয়ত লক্ষ টাকার মালিক। প্রায় নিরক্ষর নারীও একটা সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী হয়েছে। রাজপুত্রও বিয়ে করেছে পথচারিণীকে কিংবা তার আগেকার রক্ষিতাকে। জেনেচ্‌কা, তোমারও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার অসীম ক্ষেত্র রয়েছে; আমি তখন দূর থেকে দেখে তোমায় তারিফ করব। তুমি, তুমি হলে সেই ধাতুতে গড়া—শিকারী বাজপাখী, সর্বনাশী—'

'না, সেরজাই,' ম্লানহাসি হেসে বলে জেন্‌কা, 'আমিও ভাবতাম তাই—কিন্তু আমার ভেতরটা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একেবারে, আর-কোন শক্তি নেই, সাধ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। ভেতরটা আমার আজ একদম ফাঁপা, পচা। এক এই প্রতিহিংসা ছাড়া আর-কিছুই নেই আজ। তা সে প্রতিহিংসাও আজ আমারই মতো পঙ্গু, সেরজাই। আবার একটি ছোট ছেলে চোখে পড়বে, আবার মায়া হবে, আবার দেব নিজেকে শাস্তি।—না, না, তার চেয়ে এই ভালো, এই ভালো!'

নীরব হয়ে পড়ে জেনী। প্লাতোনোবও নির্বাক—কি বলবে সে? বলবার কি আছে। কেটে যায় কতক্ষণ।

হঠাৎ উঠে পড়ে জেনী; প্লাতোনোবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বিদায়, সেরজাই ইবানোবিচ্‌! ক্ষমা কর, সময় নষ্ট করলাম তোমার— ।'

'তাই বলে কিছু করে বসো না, জেনেচ্‌কা! মিনতি রাখ—'

চকের বাইরে এসে বিদায় নেয় দুজনে। হঠাৎ পিছু ডাকে জেন্‌কা। ফিরে আসে প্লাতোনোব।—'কাল আমাদের বৈঠকখানা ঘরে রলি-পলি হঠাৎ মারা গেছে; লাফালাফি করছিল, হঠাৎ পড়ে যায়, আর ওঠে না—কোনো কষ্ট পায়নি। আচ্ছা, সেরজাই, আর একটা কথা—শেষ প্রশ্ন আমার—ভগবান আছেন, না, নেই?'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্লাতোনোব, 'কি বলব? জানি না তো। মনে হয় আছেন, তবে আমরা যে-ভাবে কল্পনা করে থাকি তেমনটি নন তিনি। আরও জ্ঞানবান, আরও ন্যায়বান তিনি—'

'আর পরলোক? মরণের পরপার? মানে, এই যেমন শুনতে পাই, এর পর স্বর্গ, না নরক? না, সব ফাঁকা? সুষুপ্তি? চির অন্ধকার-নিলয়?'

চুপ করে থাকে প্লাতোনোব, চোখ তুলে চাইতে পারে না জেনীর দিকে। 'কি জানি!'—শেষ অবধি কোনরকমে বলে ওঠে সে, 'তোমায় মিছে কথায় ভোলাতে চাই না, জেনী।'

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে জেন্‌কা ; করুণ বাঁকা হাসি হাসে, 'ধন্যবাদ! তোমার ভালো হোক! এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আচ্ছা, বিদায়।'

প্রাতোনোব একেবারে ঠিক সময়টিতেই ফিরে এল। 'যাক, সময়মতো এসে পড়েছ তাহলে',—খেঁকিয়ে ওঠে জাবোরোত্‌নি, 'আর-একটু দেরি হলেই দিতাম ঘাড় ধরে বের ক'রে। যাও, জায়গায় গিয়ে বসগে, যাও!' পরে নরম হয়ে বলে, 'তা, তুমি তো বেড়ে কাজের লোক, সেরেজ্‌কা। তবে যদি রাতের বেলা হত ; তা নয়, দেখলে সব, ও কিনা দিনদুপুরেই যায় ঘোমটার আড়ে খেমটা নাচ নাচতে—'

৫

শনিবারটা হচ্ছে ডাক্তারী পরীক্ষার দিন। বাড়িময় সাজ সাজ রব ; এসেন্স-সাবানের শ্রাদ্ধ ; পরনে সব ধোপদুরস্ত শৌখিন আন্ডারওয়ার। রাস্তার দিকের জানালা সব বন্ধ। মেয়েগুলো সব ভয়ে মরে, যদি কোন রোগ বেরিয়ে পড়ে, অজান্তে। ও মা, কি ঘেন্না! কি লজ্জা! আর, ওরে বাবা, সেই হাসপাতাল! কেবল বড় মান্‌কা, জো, আর হেনরিয়েটা—ঘাগী বুড়ো মেয়েরা সব—দিব্যি নিশ্চিন্দি। বড় মান্‌কা তো খোলাখুলিই বলে, 'ও-সব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে, বাপু।'

জেন্‌কা আজ সকাল থেকেই কেমন মনমরা হয়ে আছে ; ভাবছে কি যেন। ছোট মান্‌কাকে উপহার দিয়েছে একটা সোনার ব্রেসলেট, নিজের ফটো-বসানো লকেটওয়ালা হার একগাছা, আর কাঁধে ঝোলাবার রুপোর ক্রুশ একটা। তামারাকে গছিয়ে দিয়েছে দুটো আঙটি—স্মারক হিসেবে।

'আমার আন্ডারওয়ারখানা আনুশ্‌কা ঝিকে দিয়ে দিস্, তামারা ; যেন ভালো করে কেচে নিয়ে আমার কথা ভেবে পরে।'

তামারার ঘরেই বসে আছে দুজনে। সকালবেলায়ই মদ আনিয়েছে জেন্‌কা ; আস্তে আস্তে তাই গেলাসের পর গেলাস খেয়ে চলেছে সে। অবাক হয়ে ভাবছে তামারা—যে-জেন্‌কা দুচোখে মদ দেখতে পারে না, নেহাত উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো একটু-আধটু ঠোঁটে ছোঁয়ায় কালেভদ্রে, সে আজ মাতাল হবে নাকি!

'তুই আজ কি আরম্ভ করেছিস, জেন্‌কা? মরবি, না বিবাগী হবি ঠিক করেছিস?'

'হ্যাঁ রে, ছেড়েই যাব তোদের। বড়ো শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তামারোচ্‌কা।'

'তা, কে-ই বা আর সুখের মুখ দেখল এখানে, বল্?'

'না, তা নয়। ঠিক যে শ্রান্তি তা নয়, কিন্তু কেন যেন সব কিছু অর্থহীন হয়ে পড়েছে আমার কাছে। এই যে তোকে দেখছি, এই যে টেবিলটা, আমার হাত-পা, সবই সমান ঠেকছে, সবই যেন নিরর্থক—, এই পুরোনো ছবির মতো সব। ঐ যে সেপাইটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? কে যেন ওর কলে চাবি দিয়ে দিয়েছে, তাই ও পুতুলের মতো ঘুরছে ফিরছে। বৃষ্টিতে ভিজছে ও—ভিজুক! একদিন তো মরতেই হবে। ও মরবে, আমি মরব, তুই মরবি, তামারা। তা এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? ভয়ই বা কি?'

চুপ করে জেন্‌কা, এক চুমুক মদ খেয়ে নেয় ; তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, 'আচ্ছা, তামারা, তোকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু তুই এখানে এলি কি ক'রে? তুই তো আমাদের কারুর মতো নোস। এত জানিস শুনিস—ফরাসী ভাষা অবধি—সেই যে! অথচ তোর কথা আমরা কিছুই জানি না। তুই কে, বল্ তো!'

'জেনী, লক্ষীটি, এমন কিছুই নয় সে—আর পাঁচজনেরই মতো জীবন—বোর্ডিং

স্কুলে পড়েছি, গুরুমা ছিলাম ; উপাসিকার দলে গাইতাম ; চাঁদমারি চালিয়ে এসেছি ; এক ঠগের সঙ্গে মিশে বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছিলাম, সার্কাসের দলের সঙ্গে ঘুরেছি—মেয়েমদ্দ সেজে খেলা দেখাতাম। চমৎকার বন্দুক ছুঁড়তে পারতাম আমি। তারপর এসে ঢুকি এক মঠে। দু-বছর ছিলাম সেখানে। অনেক কাণ্ডকারখানার মধ্যে দিয়ে এসেছি—সব মনেও পড়ে না। আর হ্যাঁ, চুরিও করেছি—'

'অনেক কিছুই করেছিস তা হলে—দাবার বোড়ের মতো!'

হ্যাঁ। তা মেঘে মেঘে বেলাও তো কম হল না। আচ্ছা, বল্ তো কত বয়েস হবে আমার ?'

'কত আর ? বাইশ—চব্বিশ!'

'না, আমার মানিক! গত হপ্তায় বত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছি। এখানে সবচেয়ে বুড়ী মেয়ে হচ্ছি আমি। তবে কোন কিছুই গায়ে মাখি না—মদও খাই না, আর শরীরের খুব যত্ন নিই আমি। আর সব চাইতে বড় কথা—কাউকে নিয়েই মেতে উঠি না কখনও—'

'কেন, সেন্কা ?'

'সেন্কা—ও আলাদা জিনিস। আর জানিসই তো, মেয়েমানুষের প্রাণ বড্ড আড়-বুঝো, বোকা—ভালোবাসা নইলে কি বাঁচে রে! তবুও ঠিক যে ভালোবাসি ওকে তা নয়। এমনিই, মানে, মনকে চোখঠারা আর কি! তা, সেন্কাকে শীগ্গিরই আমার দরকারও হবে।'

হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠে জেন্কা, 'কিন্তু, এখানে এলি কি করে? এই নরকে? এত বুদ্ধিশুদ্ধি, এমন চেহারা, এমন বলিয়ে-কইয়ে...'

'সে বলতে গেলে আজ আর ফুরোবে না—আর জানিসই তো বড্ড কুঁড়ে আমি। তা ভাই, এখানে এসেছি মানের দায়ে, একটি ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি বিপ্লবে। জানিসই তো মেয়েমানুষের প্রাণ, ভাবের মানুষ যেখানে যাবে, সেও পিছু নেবে ছায়ার মতন। বিপ্লবে বিশ্বাস ছিল না আমার, তবু না গিয়ে পারলাম না। চমৎকার দেখতে-শুনতে ছিল সে, বলিয়ে-কইয়েও বেশ। শেষ অবধি সে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সঙ্গীদের নাম ফাঁস করে দিল পুলিসের কাছে। আসলে সে ছিল গোয়েন্দা। তাকে তখন ওরা খুন করে ওর জারিজুরি সব বের করে দিল, আমারও ভুল ভাঙ্গল। কিন্তু আমার তখন লুকিয়ে থাকা দরকার—পাশপোর্ট বদলালাম। ওরা সব পরামর্শ দিল—হলদে টিকিটের আড়ালে লুকোনো সবচেয়ে সোজা—সেই থেকে শুরু হয়েছে এখানকার পালা। তা, এখানেও চরে বেড়াতে এসেছি শুধু, সময় হলেই কেটে পড়ব।'

'কোথায় ?'

'কেন,পৃথিবীতে কি জায়গার অভাব! ভালোবাসি আমি জীবনকে—তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াই।—কিন্তু জানিস, জেনেচ্কা, চুরি-বিদ্যেতে বড্ড টান আমার—সাহসের কাজ, ভয়ের কাজ, কঠিন, আর কেমন যেন নেশা আছে ওতে। এই খেলাতেই প্রাণ টানছে আমার। আমি বেশ সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, আর শিক্ষিতা মহিলার মতো ভাব ধরতে পারি, ভুলে যা সে-সব। একেবারে আলাদা রে আমি, একদম আলাদা জাতের।'—হঠাৎ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে তামারার, 'আমার মধ্যে শয়তানী বাসা বেঁধে আছে রে!'

'তবুও তোর প্রাণে আশা আছে, কিন্তু আমার ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । পঁচিশ বছর বয়স হল আমার, বুড়ী হয়ে গেছি, এক পা কবরে। যদি হিসেব করে চলতাম—উঃ!'

'কি যে বলিস, জেনী! তোর মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্য। তোর আছে সেই অদ্ভুত শক্তি যার সামনে পুরুষরা স্বেচ্ছায় এসে নতশির হয়। তুই-ও বেরিয়ে পড় এখান থেকে । আমার সঙ্গে নয়—সর্বদাই একাকিনী আমি—নিজেই বেরিয়ে পড় তুই।'

নীরবে দুহাতে মুখ ঢাকে জেন্‌কা।

'নাঃ, সব গেছে,' অনেকক্ষণ পরে বলে ওঠে সে, 'ফতুর হয়ে গেছি আমি, কপাল পুড়েছে আমার, আমি আর আমাতে নেই! আঁ'—হতাশার ভঙ্গী করে জেন্‌কা, নিজেকেই ডেকে বলে, 'নে জেনেচ্‌কা, আর একটু মদ খা! আয়, একটু লেবুর রস চুষবি আয়! থুঃ, কি বিশ্রী! আন্নুশ্‌কাটা যত সব বাজে মাল আনে কোত্থেকে রে বাবা! খালি পয়সা জমাচ্ছে ছুঁড়ি! বললে বলেঃ 'জমাচ্ছি বিয়ের জন্যে। আমার বর আমায় যখন নিখুঁত মেয়েটি পাবে কি সুখীই হবে সে! তার ওপর আবার কয়েক শ টাকা!' মেয়েটা সুখী—আমার বাক্সে কয়টা টাকা আছে, তা ওকে দিয়ে দিস, ভাই তামারা!'

'তোর মতলবখানা কি বল্ তো?'—তীক্ষ্ম ভর্ৎসনার সুরে জিজ্ঞেস করে তামারা, 'মরতে যাচ্ছিস নাকি, না আর-কিছু?'

'না, এমনি বলছি, ভালোমন্দ যদি একটা কিছু ঘটে, হাসপাতালেও তো নিয়ে যেতে পারে!—আর, হ্যাঁ, সত্যিই যদি একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে রোখ চাপে আমার, তবে তুই কি তাতে বাধা দিবি, তামারোচ্‌কা?'

স্থির, গম্ভীর, শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তামারা তার দিকে। জেনীর চোখ দুটো বিষণ্ণ—শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেন। প্রাণের আগুন নিবে গেছে সে-চোখ থেকে।

'না।'—ধীরে ধীরে দৃঢ়কণ্ঠে বলে তামারা, 'যদি ভালোবাসার জন্যে হত বাধা দিতাম, টাকার জন্যে হলে, বলে-কয়ে বুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করতাম। কিন্তু এমনও বিষয় আছে যাতে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারও। অবিশ্যি, সাহায্য আমি করব না; কিন্তু ধরেও রাখব না।'

যোসিয়ার গলা শোনা যায়—'ডাক্তার এয়েছে গো! তৈরি হয়ে নাও!'

'তুই যা, তামারা। আমি কাপড় ছেড়ে আসি গে, ভাই। এর মধ্যে যদি ডাক পড়ে—ডাকিস আমায়।'

তারপর চলে যেতে যেতে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে তামারাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চলে যায় জেনী।

সরকারি ডাক্তার ক্লিমেনকো একটা ছোট টেবিলের ওপরে যন্ত্রপাতি আর ঔষধপত্র সব গুছিয়ে রাখছেন। পাশে টিকিটগুলো সব জমা হয়েছে। মেয়েদের পরনে শুধু সেমিজ। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আনা মারকোব্‌না নিজে, তার পিছনে এমা এডোয়ার্ডোব্‌না আর যোসিয়া।

বয়স হয়েছে ডাক্তারবাবুর। চোখে পাঁশ-নে লাগিয়ে নামের ফর্দ ধরে হাঁক দেন—'আলেকজান্দ্রা বুদ্‌জিনস্কায়া!'

এগিয়ে আসে নীনা—লজ্জায় রাগে ভ্রূ কোঁচকানো; টেবিলের ওপরে উঠে শোয়। পাঁশ-নের ভিতর দিয়ে কুঁচকে দেখেন ডাক্তারবাবু 'ঠিক আছে, যাও।' তারপর ওর টিকিটের উলটো পিঠে লেখেন তিনি, '২৮শে আগস্ট, সুস্থ।'

'বোশচেন্‌কোবা আইরিন।'

এবার লিউব্‌কার পালা। এই দেড় মাস বাইরে কাটিয়ে এসে অভ্যাস বদলে গেছে তার। ডাক্তারবাবু হাত দিয়ে তার সেমিজখানা তুলে দেন বুক অবধি; আনকোরা মেয়েটির মতো মরমে মরে যায় সে, লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে একেবারে।

তারপর জো-এর পালা। তারপর ছোট মান্‌কার। তামারারও হয়ে যায়। পরে নিউর্‌কা—গনোরিয়া হয়েছে তার। তখনি হাসপাতালে পাঠাবার হুকুম হয়।

একের পর এক পরীক্ষা চলতে থাকে। আজ বিশ বছর ধরে হপ্তায় হপ্তায় এ কাজ চালিয়ে আসছেন ডাক্তারবাবু, হাত পেকে গেছে, কোন রকম চাঞ্চল্য নেই, কৌতূহল নেই,

কিছুই নেই—রয়েছে শুধু খোলা তলপেট, খালি পিঠ, আর হাঁ-করা মুখ। পরে এদের কাউকে রাস্তায় দেখলে চিনতে পারবেন না তিনি।

'সুসাম্না রেইৎজিনা!'

কেউ এগিয়ে আসে না টেবিলের ধারে।—মেয়েরা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি আর ফিসফাস শুরু করে দেয়।

'জেন্‌কা—কোথায় জেন্‌কা।'—মেয়েদের মধ্যে সে তো নেই। তামারা এগিয়ে আসে, 'এখানে নেই সে। এখনও তৈরি হয়ে নিতে পারেনি। আমি গিয়ে ডেকে আনছি, ডাক্তারবাবু।'

দৌড়ে যায় তামারা। কিন্তু কই, ফেরার নামটিও তো করে না। এমা এডোয়ার্ডোব্‌না চলল তখন; তারপর যোসিয়া; তারপর অন্য ক-জন মেয়ে; শেষে আনা মারকোব্‌না নিজে।

'ছোঃ! এ কি কেলেঙ্কারি!'—দরদালান দিয়ে যেতে যেতে বলে এমা, 'সব সময়ই এই জেন্‌কা আর জেন্‌কা! আর পেরে উঠি না, বাপু।'

কিন্তু জেন্‌কা কোথাও নেই—তার নিজের ঘরেও নয়, তামারার ঘরেও নয়। আর সব ঘরও খুঁজে দেখা হল, আনাচে কানাচে সব। কিন্তু কই সে!

'পায়খানায় গিয়ে বসে নেই তো?'—আন্দাজ করে জো।

তা হবে! ভিতর থেকে দোর বন্ধ। এমা গিয়ে দোরে ঘুঁষি মারে, 'জেনী, বেরিয়ে এসো শীগগির! এ কি পাগলামো?' উত্তর নেই। গলা চড়ায় তখন, 'কি রে শুয়ারনী, শুনতে পেলি? আয়, এখনি বেরিয়ে আয়—ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে।'

তবুও কোন উত্তর নেই। সবাই এ ওর মুখের দিকে চায়—সবার মনে একই ভয় । দরজার হাতল ধরে টানে এমা, খোলে না।

'সাইমনকে ডাক দে!'—আনা মারকোব্‌না হুকুম করে।

সাইমনকে ডাকা হল। একটা কিছু ঘটেছে—সবার মুখ দেখেই বুঝল সে। তাই তার বিদ্যে ফলাবার জন্যে ডাক পড়েছে। সব কথা শুনল সে। তারপর দরজার হাতল ধরে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দিল এক চাড়। হাতলখানা হাতেই রয়ে গেল। 'দেখি, একখানা রুটি-কাটা ছুরি।'—তারপর দরজার ফাটল দিয়ে ছুরিখানা গলিয়ে দিয়ে হুড়কো খুলে ফেলল সে।

ভিতরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে জেন্‌কা!

মুখখানায় কে যেন লাল-নীল কালি ঢেলে দিয়েছে। জিব বেরিয়ে পড়েছে, আর জিবের উপরে কেটে বসেছে দুপাটি দাঁত। যে-আলোটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তা মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

কে যেন কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের পাল কাঁদতে কাঁদতে দরদালান দিয়ে পড়ি-মরি করে ছুটে এল।

হৈ-চৈ শুনে ডাক্তারবাবুও এলেন—ধীরে সুস্থে। তাঁর এতদিনকার ডাক্তারী জীবনে এ সব কান্ড দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে। মানুষের দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণাবেদনা, মৃত্যু—কিছুই আর বিচলিত করতে পারে না তাঁকে।

জেন্‌কার প্রাণহীন দেহ নামিয়ে এনে তারই ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারবাবু কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া শুরু করলেন। খানিকক্ষণ বাদেই সে-চেষ্টা ছেড়ে দিতে হল, 'নাঃ! পুলিসকে খবর দাও।'

আবার আসে বারকেশ। নির্জনে বসে বাড়িউলীর সঙ্গে অনেকক্ষণ অবধি কি-সব ফিসফাস হয়; তারপর আবার তার পকেটে গিয়ে ঢোকে একশ রুবলের একখানা নোট।

পাঁচ মিনিটেই জবানবন্দী তৈরি হয়ে যায়। গাড়ি ডেকে মাদুর চাপা দিয়ে ময়না-তদন্তের জন্যে লাশ চালান দেওয়া হয়।

এমা এডোয়ার্ডোব্‌নাই সর্বপ্রথম কুড়িয়ে পায় টেবিলের উপর থেকে জেন্‌কার লেখা চিঠি। কাঁচা হাতের গোল গোল লেখা, কিন্তু দেখে বেশ বোঝা যায়—শেষ-মুহূর্তেও লিখতে গিয়ে হাত কাঁপেনি তার, 'আমার মিত্তুর যন্নে কেউ দায়ী নয়। আমি মরছি, কেন না আমায় রোগে ধরেছে, আর লোকেরা সব শয়তান, আর বেঁচে থাকা কষ্টকর। আমার জিনিসপত্তর কাকে কি দেওয়া হবে তামারা সব জানে। খুঁটিয়ে বলে গেছি তাকে।'

তামারা আরও ক-জন মেয়ের সঙ্গে সেখানেই ছিল। এমা ঘুরে দাঁড়ায় তার দিকে, চোখে তার ক্রুর ঘৃণা, ফিসফিস করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'তবে রে হতচ্ছাড়ি, সবই জানতিস তুই। জানতিস, তবে বলিসনি কেন রে মাগী—'

অভ্যাসমতো পিছু হেলে তাগ কষে এমা—তামারাকে মারবে ব'লে। হঠাৎ হাঁ হয়ে চোখ গোল গোল করে সেই ভাবেই থমকে যায়। মেঝে থেকে আস্তে আস্তে চকচকে লোহার কি-একটা তুলে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে তার নাকের ডগায় তুলে ধরে তামারা—গুলি করবে নাকি?

৬

সেদিনই সন্ধ্যায় আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল—সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি চলে এল এমা এডোয়ার্ডোব্‌নার হাতে।

অবশ্য এ নিয়ে অনেকদিন থেকেই কানাঘুষো চলছিল। কিন্তু তা বলে জেন্‌কার ঐ অপমৃত্যুর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই! হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েরা সব। এমাকে চেনে তারা। তা ছাড়া এও জানে, যে-পনের হাজার রুবলে এমা কিনে নিল সব, তার তিন ভাগের এক ভাগ হল বার্‌কেশের; সে-ও এখন হয়ে দাঁড়াল একজন ভাগীদার। অনেক দিন থেকেই এমার সঙ্গে মন কাড়াকাড়ির কারবার চলে আসছে তার।

সত্যি, একেবারে জলের দরে বেচে দিল সব আনা মারকোব্‌না। তা সে শুধু ঐ বার্‌কেশের ভয়েই নয়; আনা নিজেও আর পেরে উঠছিল না—বুড়ো হয়ে পড়েছে সে, প্রথম যৌবনের সে দেহবিলাসিনীর শক্তি আর নেই।—যাক্‌! এ ভালোই হল। ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে জমা এক লক্ষ কুড়ি হাজার রুবল। আর ঐ তো একটি মাত্র মেয়ে বার্ডি; দুদিন বাদে বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়ে যাবে। শেষ জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে আরামেই কাটবে আনার।

তা ছাড়া এই যে রলি-পলির আকস্মিক মৃত্যু, তারপর জেন্‌কার এই অপমৃত্যু—নাঃ, এ তো ভালো লক্ষণ নয়! সরে দাঁড়ানোই ভালো এখন। কেন, এ তো অনেকেই জানে কোন বাড়িতে আগুন লাগবার আগে, কি কোন জাহাজডুবি হবার আগে সেখানকার ইঁদুরগুলো সময় থাকতেই পালিয়ে যায়। আনাও তাই করল। ভালোই করেছিল। কারণ জেন্‌কার ঐ অপমৃত্যুর পর থেকেই পর পর নানারকমের দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল সারা ইয়াম্‌কায়। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমেই মারা গেল আনা নিজে। তাই হয়। ত্রিশ বছরের একটানা কজের পর শান্তিতে কাটানো অনেকেরই ভাগ্যে জোটে না। তারপর এক মাসের মধ্যেই গেল ইসাইয়া সাবিচ।

আনার একমাত্র উত্তরাধিকারী হল বার্ডি। বাড়ি আর শহরতলীর জমি বিক্রি করে নগদ টাকা করে নিল সে। তারপর মনের মতো দেখে বিয়েও করল একটি। তার ধারণা, তার বাবার ছিল মস্ত বুড়ো এক গমের কারবার। হায় রে!

সেদিনই জেনীর মৃতদেহ মর্গে চালান হয়ে গেছে। তবুও সন্ধ্যাবেলায় এমার

আদেশে মেয়েদের সেই নিয়মিত সাজগোজ করে বসতে হল। খানিক বাদে এমা স্বয়ং এসে ঢুকলেন বৈঠকখানা ঘরে—যেন রাজরানী এসেছেন দরবারে। বক্তৃতা শুরু হ'ল, 'শোন সব! আমি চাই—উঠে দাঁড়াও সব! আমি যখন কথা কইব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে সব। বুঝলে?'

এ আবার কি! সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। নতুন রাজ্যের নতুন নিয়ম। উঠে দাঁড়ায় সবাই; কি করবে বুঝতে পারে না কেউ।

'হ্যাঁ, শোন! আজ থেকে তোমরা আমায় কর্ত্রী ঠাকরুনের মতো মান্য করে চলবে। বুঝলে?—এই প্রতিষ্ঠান এখন আমার, এমা এডোয়ার্ডোব্না টিচ্‌নার। আশা করি আমার বাধ্য থাকবে তোমরা। আর আমিও তোমাদের মায়ের মতোই দেখব। তবে হ্যাঁ কুঁড়েমি, মাতলামো, এ-সব আমি সহ্য করব না। অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা এ-সবও আমার দু'চোখের বিষ—আমার ইচ্ছে 'ত্রেপেল'কে হার মানানো। আমি চাই শুধু গণ্যমান্য অতিথিরাই এখানে আসুন। আমাদের মেয়েরা সব হবে সুন্দরী, মধুরভাষিণী, বিনয়ী, স্বাস্থ্যবতী, আনন্দময়ী। আসবাবপত্র আরও বাড়াতে হবে—মনে রেখ, পয়সাওয়ালা প্রবীণ লোকেরা পেশাদারী প্রেম পছন্দ করেন না। তাঁরা চান প্রেমকলা। সে বিদ্যে তোমরা শিখবে। 'ত্রেপেল'-এ প্রতিবারের দক্ষিণা হচ্ছে তিন রুবল আর সারা রাতের জন্যে দশ। আমি এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তোমরা প্রতিবারের জন্যে পাবে পাঁচ রুবল আর সারারাতের জন্যে পঁচিশ। তোমাদের রোজগার থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে তোমাদেরই ভবিষ্যতের জন্যে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে; টাকা সুদে বাড়বে। তারপর যদি কোন মেয়ে কোন ভদ্রলোককে বিয়ে করতে চায় সে তখন অনায়াসে তার সে টাকা নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবে।—তবে ঐ যে বললাম, কুঁড়েমি, অবাধ্যতা, ঢলাঢলির জন্যে হবে কঠোর শাস্তি। আমার যা বলবার বললাম।—নীনা, শোন এদিকে। তোমরাও সব পর পর এস।'

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে নীন্‌কা। তার ঠোঁটের কাছে হাতের আঙুল এগিয়ে দেয় এমা; রাজরানীর মতো হুকুম করে—'চুমু দাও।'

থতমত খেয়ে যায় নীন্‌কা; কিন্তু চট করে সামলে নিয়ে চুমু দিয়ে সরে যায়। তারপর জো, হেনরিয়েটা, ভান্দা—একে একে আসে সবাই; চুমু দেয়, সরে যায়। একা শুধু তামারাই আরশির দিকে পিছন ফিরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই আরশি—জেন্‌কা প্রায়ই যেটায় মুখ দেখত।

কটমট করে চায় এমা তার চোখে চোখে। তামারা তবুও অবিচল। হাত নামিয়ে দিয়ে বলে এমা—'আর তামারা, তোমার সঙ্গে আলাদা দু-একটা কথা বলতে চাই আমি, এস।'

দুজনে আলাদা একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে। হাত বাড়িয়ে সামনে বসবার একটা জায়গা দেখিয়ে দেয় এমা। দুজনেই চুপচাপ। কেউই যেন কাউকে ঠিক ভরসা পায় না—দুজনেই দুজনকে চোখে চোখে রাখে।

শেষে এমাই কথা বলে—'তুমি ঠিকই করেছ, তামারা। তুমিও যে ঐ সব ভেড়ীর পালের মতো এসে হাতে চুমু দাওনি তাতে তুমি সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। আর আমিও তোমায় চুমু দিতে দিতাম না। যদি তুমি কাছে আসতে, আমি তোমার হাত ধরে সকলের সামনে তোমায় আমার প্রধান সহকারী বলে ঘোষণা করতাম—'

'ধন্যবাদ—'

'না। বাধা দিয়ো না। আগে আমি বলি—পরে তোমার যা বলবার বলো। আচ্ছা, কাল কেন হঠাৎ তুমি একটা রিভলবার আমার দিকে উঁচিয়ে ধরেছিলে? সত্যিই কি গুলি করতে?'

'বরং তার উলটো, এমা এডোয়ার্ডোব্‌না,'—সসম্মানে জবাব দেয় তামারা, 'উল্‌টে আমারই বরং মনে হয়েছিল আপনিই আমায় মারবার জন্যে হাত উঠিয়েছিলেন।'

'আচ্ছা, তামারোচ্‌কা! তুমি কি বলতে পার, তোমার গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা, কোনদিন তোমাকে একটা শক্ত কথা বলেছি আমি? আমি জানি তুমি এই সব রুশীয়ান মাগীদের মতো বাজে মেয়েমানুষ নও। তুমি বিদুষী, বুদ্ধিমতী; আদব-কায়দায় রীতিমতো দুরস্ত; লেখাপড়া আমার চাইতেও বেশি জান, গান-বাজনাতেও মন্দ নও। সত্যি কথা বলতে কি—হ্যাঁ, সত্যি বলব তাতে কি হয়েছে—আমি তোমাকে ঐ যাকে বলে ভালোই বেসে ফেলেছি। আর, আর তুমিই চাও কিনা আমায় খুন করতে! হায় রে!'

'আপনি ভুল বুঝেছেন, এমা এডোয়ার্ডোব্‌না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, জেন্‌কার বালিশের তলা থেকে আমি ঐ রিভলবারটা কুড়িয়ে পাই। পেয়ে আপনার কাছে নিয়ে আসি। আপনি তখন তার সেই চিঠিখানা পড়ছিলেন, তাই কোন কথা বলিনি। তারপর চিঠির থেকে আপনি মুখ তুলতেই রিভলবারটা আপনার দিকে এগিয়ে ধরি—আপনাকেই দেবার জন্যে। বলতে চেয়েছিলাম—'দেখুন, কি পেয়েছি।' সত্যি, এখনও আশ্চর্য লাগছে জেন্‌কার কাছে রিভলবার থাকতে ও গলায় দড়ি দিয়ে মরল কেন?'

এমার মুখচোখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, 'ও, তাই বুঝি! হা ঈশ্বর! আমার কি ভুলটাই না হয়েছিল! তামারা, লক্ষ্মী আমার, তোমার ছোট্ট, সুন্দর হাত দু-খানা রাখ আমার বুকে! এসো, বুকে এস, চুমু দিই!' দু-হাত বাড়িয়ে দেয় এমা, তামারাকে জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে কতক্ষণ। বেচারার প্রাণ যায় আর কি! আস্তে আস্তে ঘৃণাভরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তামারা।

—'হ্যাঁ, এখন কাজের কথা হোক!' এমা আরম্ভ করল, 'তুমি আমার প্রধান সহকারী হবে। আমার লভ্যাংশের শতকরা পনের ভাগ তোমার। তাছাড়া সামান্য কিছু মাইনেও; ত্রিশ, চল্লিশ—আচ্ছা যাক, পঞ্চাশ রুবলই মাসে। ঠিক তো? আমার স্থির বিশ্বাস—আমার অন্তরের আশাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে তুমি ছাড়া আর কেউই সত্যিকারের সাহায্য করতে পারবে না আমায়। এ ছাড়া, তুমি—যখন খুশি উঁচুদরের খদ্দেরদের ঘরে বসাতে পারবে। ইচ্ছে করলে রুই-কাৎলাও খেলাতে পারবে। এই যেমন আমরা জার্মানে বলে থাকি—তা জার্মান জান তো, অ্যাঁ?'

দুজনে তখন জার্মান ভাষায় কথাবার্তা শুরু করে; ভারি খুশি হয় এমা, চমৎকার জার্মান বলে তামারা। 'বেশ, আপনার কথামতোই চলব।'—সায় দেয় সে।

'আর একটা কথা—ঐ ভাবের মানুষের কথা বলছি। তোমায় তার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হতে বলছি না। তবে সে এখানে যত না আসে ততই ভালো। তুমি তার সঙ্গে বাইরে বেরুতে চাও তো ছুটি দেব; তবে যত তাকে এড়িয়ে চলতে পারবে ততই মঙ্গল। তোমারই ভালোর জন্যে বলছি। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর—তিন-চার বছর। তখন এই ব্যবসা আরও ফেঁপে উঠবে। তোমারও দু-পয়সা হবে। তখন তোমাকে আমার পুরো অংশীদার করে নেব। তখনও তোমার যৌবন থাকবে; আর তখন তোমার যত ইচ্ছে পুরুষমানুষ চাও—কিনো। সে-বয়সে আর প্রেম-পাগলামি থাকে না। তখন তোমায় পছন্দ করার বদলে তুমিই বরং পুরুষমানুষ পছন্দ করতে পারবে। বুঝলে কিছু?'

চোখ নামিয়ে মুচকি হাসে তামারা, 'খাঁটি কথা বলেছেন, এমা এডোয়ার্ডোব্‌না। বেশ, আমি তাকে এখানে আসতে দেব না।'

'বেশ! বেশ! এস তবে, চুমু দিয়ে কথা পাকা করে নিই।'

আবার সেই কঠিন চুম্বন, সুদৃঢ় আলিঙ্গন। তামারার নত চোখ, কোমল ভালো-মানুষের মতো মুখখানা দেখে ছোট্ট খুকীটি বলে ভুল হয়।

'আপনার সব কথাই তো রাখলাম,' শেষে মুক্তি পেয়ে তামারা বলে, 'আমারও একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে। অবশ্য তাতে কিছু ক্ষতি নেই আপনার। আমাদের সবাইকে জেন্‌কার সঙ্গে গোরস্থানে যেতে অনুমতি দেবেন কিন্তু।'

মুখখানা যেন কেমন হয়ে যায় এমার।—'বেশ তো, যেও। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু গিয়ে কি লাভ হবে? গেলে সে আর কি ফিরে আসবে? শুধু শুধু মন খারাপ করা। তার ওপর জান তো, যারা অপমৃত্যুতে মরে তাদের কবর হয় না, গোরস্থানের কাছেই একটা নোঙরা খাদের মধ্যে ফেলে দেয় বুঝি।'

'তা হোক্। তবু যাব। আপনি রাগ করবেন না কিন্তু। তবে কথা দিচ্ছি, এই আমার একটিমাত্র ভিক্ষা। এর পর থেকে একান্ত আপনারই অনুগত হয়ে চলব—কথা দিলাম।'

'যাও। তোমায় 'না' বলতে পারি না।' দরজা খুলে হাঁক দেয় এমা, 'সাইমন!'

সাইমন আসে। 'শ্যাম্পেন আন—বেশ ঠাণ্ডা দেখে।' সাইমন চলে গেলে বলে, 'এস তামারা, নতুন ব্যবসার আরম্ভে একটু মদ খাওয়া যাক।'

'বেশ! সত্যি, এমা এডোয়ার্ডোব্‌না, আপনি আমার জীবনপথে নতুন আলোকপাত করলেন। আজ আমায় নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, দেবী!'

শ্যাম্পেন খাওয়া হল।—'দেবী! আর একটি অনুরোধ!'

'বল।'

'আমাকে অনেকটা খবরগিরনীর মতো থাকতে হবে বোধ করি?'

'না, খবরগিরনীর মতো নয়, আমার সহকারী হয়ে থাকবে তুমি।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন দরকার হলে রুই-কাৎলাও খেলাতে হবে।'

'কেন? পারবে না?'

'পারব না কেন! দিব্যি বড়োলোকের বাড়ির যুবতী সুন্দরী পরিচারিকা সেজে লোক মজাব। তা পারব।'

'সত্যি, তামারা, তুমি এত বুদ্ধিমতী!'

'তা তো হল! কিন্তু সে-ভাবের সাজপোশাক দরকার তো।'

'সেজন্যে কত লাগবে?'

'ধরুন দু-শ রুবল।'

'দু-শ কেন—তিনশ নাও।'

আনন্দে ঢলে পড়ার ভান করে এমার গায়ে চুমু দেয় তামারা।

'যাক্! প্রিয়সখীর মৃতদেহ কবর দেওয়ার একটা হিল্লে হল।'—ফিরে যেতে যেতে মনে মনে ভাবে তামারা।

লোকে বলে মানুষ নাকি মরেই আশীর্বাদ করে যায়। তা বুঝি সে-রাতে খদ্দেরের ভিড় সামলানো দায় হয়ে উঠল শেষে—এমনটি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

তামারার পদোন্নতিতে মেয়েরা সব কেমন যেন ভড়কে গেল। শেষে সময় বুঝে তামারা ছোট মান্‌কাকে আলাদা ডেকে চুপি চুপি বলল, 'দেখ্ মান্‌কা, আমি খবর-গিরনী হয়েছি বলে তোরা যেন সব ঘাবড়ে যাসনা। নেহাত বাধ্য হয়েই ভেক নিতে হয়েছে। কিন্তু আসলে আমি তোদের যে তামারা সেই তামারাই আছি। বুঝলি?'

৭

পরদিন রবিবার। মরবার ফুরসত নেই তামারার। আনুষ্ঠানিক ভাবে যথারীতি

প্রিয়বান্ধবী জেন্কার শেষকৃত্য সম্পাদন করতে হবে—যেমন আর পাঁচজনের হয়ে থাকে। কোন বাধাই মানবে না সে।

সে ছিল সেই অদ্ভুত ধাতের মানুষ যারা বাইরে খুব নির্বিরোধ, কিন্তু ভিতরে যাদের ধিকিধিকি জ্বলছে উদ্যমের ছাই-চাপা আগুন,—অনাবশ্যক উৎসাহের আতিশয্যে অনর্থক শক্তিক্ষয় করতে রাজি নয় যারা, কিন্তু সদাসর্বদাই রয়েছে যেন একচোখ মেলে ঘুমিয়ে, কাজের বেলায় নিমেষের মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে সব বাধাবন্ধ অবহেলায় দু-পায়ে মাড়িয়ে যারা দুস্তর কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে জানে।

বেলা বারটা নাগাদ তামারা একটা গাড়িতে করে পুরোনো-পাড়ায় এল। একটা বাজেমার্কা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেখানে ঢুকল। ভিতরে এসে এক ছোকরাকে জিজ্ঞেস করল, 'সেন্কা কি আসেনি এখনও?'—'না, মাদাম! সারা রাত কোথায় আড্ডা মেরে এখন বোধ হয় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে! ডেকে আনব?'

তামারা কাগজ-পেন্সিল চেয়ে নিয়ে কি যেন লিখে আধ রুবল বকশিস দিয়ে ছেলেটাকে সেন্কার কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর সে এল শহরের সব চাইতে সেরা হোটেলে 'ইয়োরোপ'-এ রোবিন্স্কায়ার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করা বড় সোজা কথা নয়। নিচের দারোয়ান বলল, 'মনে হচ্ছে এলেনা ভিক্তোরব্না এখন বাড়ি নেই!' কিন্তু তামারার দোর ধাক্কাধাক্কিতে তাঁর খাস-দাসী এসে বলল—'আছেন বটে। কিন্তু মাদামের মাথা ধরেছে; এখন দেখা হবে না।'

অগত্যা তামারা একখানা চিঠি লিখে দাসীর হাতে দিল—'আশা করি মনে আছে একদিন কোন-একটি বাড়িতে—নাম করতে নেই—আপনি যখন দারগোমাইঝস্কির ব্যালাড গানটা শেষ করলেন, একটি মেয়ে আপনার সামনে নতজানু হয়ে কেঁদেছিল। আমি আসছি তারই কাছ থেকে। আপনি সেদিন তাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিলেন! কিন্তু হায়! আজ সে সব বন্ধনের বাইরে—সে মৃত! ইচ্ছে করলে তার স্মৃতিরক্ষার্থে একটি কাজ আপনি করতে পারেন। আশা করি বিরক্ত হবেন না। আর আমি হচ্ছি সেই মেয়েটি যে আপনার সঙ্গিনী ব্যারনেস্-কে কতকগুলি অপ্রিয় সত্যকথা শুনিয়েছিল। সে-সত্যভাষণের জন্যে আমি আজও অনুতপ্ত—ক্ষমাপ্রার্থী।'

'এটা দাও গে তাঁকে।' আদেশ করল তামারা।

দু-মিনিট পরেই দাসী এসে বলল, 'মাদাম স্মরণ করেছেন। তবে মাপ চাইছেন যে আনুষ্ঠানিক বেশভূষায় সাক্ষাৎ করতে তিনি এখন অপারগ।'

মন্ত্রোচ্চারণের মতো কথাগুলো আবৃত্তি করে তামারাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল সে; তারপর তামারা এসে ঘরে ঢুকলে বাইরে এসে দোর বন্ধ করে দিল।

এক বিরাট পালঙ্কের ওপরে শুয়ে আছেন রোবিন্স্কায়া। গায়ে তাঁর দামী তুর্কি-কম্বল, আশেপাশে একরাশ রেশমী বালিশ, কিংখাবে মোড়া নরম তুলতুলে পাশবালিশ, রুপালী রোমবস্ত্রে সযত্নে আবৃত পা দু-খানি, আঙ্গুলে আঙ্গুলে মনোহর মরকত মণি-খচিত।

তাঁর মন আজ ভালো নেই। একে কাল সকালে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটু মন-কষাকষি হয়েছে; তারপর সন্ধ্যায় থিয়েটারে গানের পর যতটা হাততালি তিনি আশা করেছিলেন ততটা পাননি। উপরন্তু একটা কাগজের প্রতিনিধি—গোরু যেমন বোঝে জ্যোতিষবিদ্যা, তিনিও তেমনি বোঝেন শিল্পকলা—কাগজে এক প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বী টিটালোবার প্রশংসা ক'রে। কাজেই মাথা ধরবে না তো কি!

'কেমন আছ?'—থিয়েটারি ঢঙে করুণ সুরে জিজ্ঞেস করেন তিনি, 'বসো ঐখানে। দেখে খুশি হলাম। শরীরটা বড় খারাপ; তাই কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।'

সে উন্মত্ত দুঃসাহসিক নৈশ-অভিযানের কথা স্পষ্ট মনে আছে রোবেনস্কায়ার; মনে আছে তামারার চমকপ্রদ, অবিস্মরণীয় মুখশ্রী। কিন্তু এখন, এই অবসাদের মধ্যে, শারদ দ্বিপ্রহরের এই ক্লান্তিকর রসলেশহীন সুস্পষ্ট দিবালোকে, অনর্থক অনাবশ্যক বাহাদুরির কাজ বলে মনে হতে লাগল সে-রাতের সেই অভিযানকে। অথচ সেই নিশি-ডাকা পাগলা রাতে, নিজের প্রতিভার পরমা শক্তিতে গরবিনী জেনীকে পর্যন্ত যখন তাঁর কাছে নতজানু হতে বাধ্য করেন তিনি, তখন কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা ছিল সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আর আজও যে এখন অলস শ্রান্তিভরে অবহেলার সঙ্গে স্মরণ করছেন তিনি বিগতদিনের সে-কাহিনী, এর মধ্যেও রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতা। বিস্তর নামকরা শিল্পীর মতো তিনিও সদাসর্বদা অভিনয় করে চলেছেন নিজেকে নিয়ে; কোন সময়ই যেন নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না তিনি। নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে যেন যাচাই করে চলেছেন দূর থেকে—দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি দিয়ে।

বালিশের উপর থেকে অলস কাতর ভাবে পেলব হাতখানি তুলে রাখলেন তিনি কপালের উপরে; মরকত মণির গভীর রহস্যঘন দীপ্তিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল ঘরময়।

'পড়লাম তোমার চিঠিতে, বেচারী—কি যেন নাম তার? একদম ভুলে গেছি দেখ!'

'জেনী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেনী।—কি হয়েছিল?'

'ডাক্তারি পরীক্ষার সময় কাল সকালে গলায় দড়ি দিয়েছে—'

চমকে উঠলেন গায়িকা, 'বলো কি! অমন সুন্দর মেয়েটি! হায় রে! কেন? কি, হয়েছিল কি?'

'আপনি তো তার রোগের কথা জানেন। সে আপনাকে বলেছিল।'

'ও, মনে পড়েছে। তা আমি তো বলেছিলাম তাকে চিকিৎসা করাতে। আজকাল চিকিৎসায় ও-সব রোগ তো সারে শুনেছি। বড় দুঃখের কথা। বেচারা!'

'আমি তাই এসেছি আপনার কাছে, এলেনা ভিক্তোরাব্না। তাই আপনাকে বিরক্ত করলাম। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—'

'বল, কি করতে হবে?'

'তা আমি নিজেই জানি না। ওরা তাকে লাশ-কাটা ঘরে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে তদন্ত শেষ না হলে বোধ হয় লাশ কাটা হবে না, আর আমরাও চাই না যে তার দেহ নিয়ে কাটাকাটি, ছেঁড়াছেঁড়ি হয়। আজ রবিবার। কাল পর্যন্ত হয়ত ওরা অপেক্ষা করতেও পারে। ইতিমধ্যে চেষ্টাচরিত্র ক'রে—'

'আচ্ছা বেশ! আমার বোধ হয় কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে জানা-শোনা আছে। আমার ডায়েরি খুলে দেখতে হবে—'

'তা ছাড়া আমি তার কবরের ব্যবস্থা করতে চাই। অবশ্য, খরচা আমিই দেব।—তাকে আমি বড় ভালোবাসতাম।'

'আচ্ছা, তা সাহায্য করতে রাজি আছি, যদি কিছু দিয়ে—'

'না, না! অশেষ ধন্যবাদ! আমি চাই তাকে খ্রীস্টীয় প্রথায় আরও পাঁচজনের মতো কবরস্থ করতে—কুকুর-বেড়ালের মতো নয়। আমি তাই এসেছি আপনার সাহায্য ভিক্ষা করতে—'

গায়িকা এ বিষয়ে ক্রমে বেশ মনোযোগী হয়ে উঠলেন যেন। ভুলে গেলেন মাথা-ব্যথার কথা। নাটকের চতুর্থ অঙ্কের ক্ষয়রোগগ্রস্তা নায়িকা যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠল। অন্তত নিজের নাম কেনার জন্যেও জেনীর একটা ব্যবস্থা করবেন রোবিনস্কায়া। নাম!

নাম কে না চায়? রোবিনস্কায়াও চাইতেন—সারা জগৎ তাঁর দিকে চেয়ে থাকুক মুগ্ধ হয়ে, বিস্মিত হয়ে।

'আচ্ছা, যেদিন আমি আর ব্যারনেস গিয়েছিলাম তোমাদের ওখানে, সেদিন আর একজন কে যেন—'

'কে? ও হ্যাঁ, একজন ভদ্রলোক সবশেষে জেনীর হাতে চুমু দিয়ে বলেছিলেন বটে দরকার হলে খবর দিতে। কিন্তু কি নাম তাঁর, তা তো জানি না। জেনীর ঘরেও সে রকম কোন ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পাইনি।'

'আচ্ছা, দাঁড়াও, আমার যেন মনে আসছে!—ও, হ্যাঁ! রিয়াজানোব—হ্যাঁ—হ্যাঁ—উকিল আর্নস্ট আঁদ্রেবিচ্ রিয়াজানোব! দাঁড়াও দেখছি—'

রোবিনস্কায়া টেলিফোনে ডাকলেন, 'সেণ্ট্রাল ১৮-৩৫—ধন্যবাদ—হ্যালো, আর্নস্ট আঁদ্রেবিচ্‌কে একটু ফোনে দিন তো—গায়িকা রোবিনস্কায়া—ধন্যবাদ—হ্যালো—কে? আর্নস্ট আঁদ্রেবিচ্?—এখন ব্যস্ত নাকি?—বাজে কথা ছাড়—শোন, দরকারি কথা—মিনিট পনেরর মধ্যে একবার এখানে আসা দরকার। না—না—হ্যাঁ—আসতেই হবে—শরীরটা ভালো নেই—মাথাধরা—না, একটি মহিলা,—এলেই সব দেখতে পাবে—শীগগির আসা চাই-ই কিন্তু—ধন্যবাদ—বিদায়!'

'আসছে সে। ভারি চালাক আর ওস্তাদলোক। তার কাছে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই। ভালো কথা—তোমার নাম?'

লজ্জা পেয়ে যায় তামারা, 'নাম? নাম এমন কিছু নয়, এলেনা ভিক্তোরবনা। আপনি আমাকে তামারা বলেই ডাকবেন।'

'তামারা! বেশ নাম তো! তুমি তামারা, আমার সঙ্গে আজ প্রাতরাশে বসবে। রিয়াজানোবও আসছে।'

'না, না। দেরি হয়ে যাবে তাহলে।'

'বেশ। অন্য একদিন খেয়ো তবে। সিগারেট চাই?'—সোনার সিগারেট-কেস্ এগিয়ে ধরেন রোবিনস্কায়া।

রিয়াজানোব এলেন। তামারা এর আগে এত ভালো করে তাঁকে লক্ষ্য করেনি। আজ দেখল তাঁর দীর্ঘ দেহ, টানা টানা যুগ্ম-ভ্রু, মাথার পিছন দিকে আঁচড়ানো চুল, সুন্দর চেহারা। জ্যোতির্ময় চোখ দুটি যেন মনের কথা টেনে বের করে আনে, মন কেড়ে নেয়। হাজার লোকের মধ্যেও তাঁকে চিনে নিতে দেরি হয় না।

'কপাল যদি না পুড়ত আমার'—মনে মনে ভাবে তামারা, 'তবে সানন্দে এমন এক-জনের পায়েই জীবন সঁপে দিতে পারতাম আমি—দয়িতের পায়ের তলায় ছিন্নকুসুমের মতো।'

রিয়াজানোব এসে রোবিনস্কায়ার হাতে চুমু দিলেন। তারপর তামারাকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে অচেনা নও। সেই পাগল-করা সন্ধ্যার কথা মনে আছে আমার। মনে আছে তোমার সেই ফরাসী বুলি। সত্যি, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। তোমার সে-স্বর, কথা-বলার সে ভঙ্গি আজও আমার কানে বাজে।—হ্যাঁ, এলেনা ভিক্তোরব্‌না।' একটা চেয়ারে বসে রোবিনস্কায়াকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কি কাজে লাগতে পারি আমি?'

নিজের কপাল টিপে ধরেন রোবিনস্কায়া, 'আর রিয়াজানোব, আমি গেছি। মাথা আমার গেল। তামারাই বলুক সব। সে বড় ভীষণ! আমি পারব না বলতে—'

জেনীর মৃত্যুর বিবরণ তামারা বেশ করে গুছিয়েই বলল।

'বেশ। বেশ। তাই হবে।'—ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন রিয়াজানোব, 'মৃতদেহের সমাধি যাতে ভলো করে হয়—এই তো? তা আমি চেষ্টা করব যাতে হয়। সত্যি, তুমি দেখছি তার প্রকৃত বান্ধবী ছিলে। নইলে কে এতটা করে?—আচ্ছা, দাঁড়াও, মনে করি'—নিজের কপালে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আইনের ১৭৮ নম্বর ধারা; হ্যাঁ, ঠিক। বলছে ঃ 'যদি কেহ আত্মহত্যা করে, তাহার আত্মার জন্য কোনরূপ প্রার্থনা করা হইবে না। অবশ্য যদি সে সময় সে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় না থাকে, তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।'—আচ্ছা তামারা, তুমি বললে তো যে ডাক্তার, মানে সরকারি ডাক্তার—জেনীকে দড়ি কেটে নামিয়েছিল? তা ডাক্তারের নাম কি?'

'ক্লিমেনকো।'

'চিনি বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তোমাদের মহল্লায় পুলিস-দারোগা কে এখন?'

'বারকেশ।'

'বারকেশ? লাল-দাড়ি, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা?'

'হ্যাঁ।'

'তাকেও চিনি তাহলে। সেই মহাপুরুষ। প্রায় আট-দশবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ধরতে পারিনি যাকে—পিছলে বেরিয়ে গেছে। বেশ, এবার দেখা যাবে।—তা জেনীর দেহ কখন কবরস্থ করতে চাও তোমরা?'

'যত শীগগির হয়।'

'বেশ। দেখি, আজই যাতে হয়। তবে কথা দিতে পারছি না। এক কাজ কর—আমার এই ডায়েরিতে—ত-এর ঘরে তোমার নাম-ঠিকানাটা লিখে দাও। ঘণ্টা-দুই বাদে তোমায় খবর দেব।—ভালো কথা, যদি কিছু মনে না কর, জিজ্ঞেস করি, টাকা দরকার?'

'না। অশেষ ধন্যবাদ। সমাধির খরচ আমিই দেব।—আচ্ছা, আমি তবে আসি। আসি, এলেনা ভিক্তোরোবনা। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।'

চলে গেল তামারা। কিন্তু সোজা বাড়ি ফিরে গেল না। গেল কেথলিকেস্কায়া ষ্ট্রীটের এক কফিখানায়। সেখানে সেনকা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দেখতে মন্দ নয়। করিতকর্মা লোক; চোর-ছ্যাঁচড়ের সর্দার; সবজান্তা নিশাচর।

'কেমন আছ তামারোচ্কা? অনেকদিন দেখিনি। মন খারাপ হয়ে উঠেছিল। কফি খাবে?'

'না। আগে কাজ। কাল জেনীকে মাটি দিতে হবে। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।'

'খবরের কাগজে পড়লাম বটে।—কি, হয়েছিল কি?'

'এখুনি পঞ্চাশ রুবল চাই আমার।'

'হায় প্রেয়সি, একটি কোপেকও যে নেই এখন।'

'নেই—যোগাড় করো।'

'আজ রবিবার। ব্যাংক বন্ধ যে।'

'তা জানি না।'

'কিন্তু হঠাৎ এত দরকার কেন, সুন্দরী?'

'আরে বোকা, কবর দেবার খরচ কই?'

'ও। বেশ। সন্ধ্যেবেলায় টাকা পাবে। তোমার কথা না রেখে কি পারি, প্রাণের সখী।—আজ যাব নাকি?'

'না, না। এখন এস না আমাদের ওখানে, সেনেচ্কা—লক্ষ্মীটি আমার। এখন আমি খবরগিরনী হয়েছি।'

'ও বাব্বা। তাই নাকি। ও-সবের তুমি কি জান?'

'হতে হয়েছে, ভাই। তবে এ খেলা শীগগিরই শেষ হবে। তখন যতবার ইচ্ছে এস আমার কাছে—যা ইচ্ছে করো আমায় নিয়ে। কোন বাধা দেব না।'

'বেশ। তবে তাই-ই।'

'দুঃখু করো না, সেন্‌কা। বড় জোর একটা সপ্তাহ। ভালো কথা—সেই গুঁড়ো পেয়েছ?'

'গুঁড়ো কোথায়—সে তো দানা-দানা গো।'

'তা হোক। জলে দিলেই গলে যাবে তো?'

'আলবাৎ। স্বচক্ষে দেখেচি বাবা।'

'তা তো হল। কিন্তু সেন্‌কা, ও গুঁড়োতে সে মরে যাবে না তো?'

'না, না। একটু ভিরমি লাগবে শুধু। তাড়াতাড়ি শেষ করো, তামারা। তারপর, তোমায় আমায় লম্বা পাড়ি—যেথায় আমারে নিয়ে যাবে তুমি—যাব গো আমি।'

'বেশ, বেশ, শীগগিরই হবে।'

'আমিও প্রস্তুত। একবারটি শুধু চোখ ঠারবে তুমি, ব্যস। সঙ্গে থাকবে শুধু গুঁড়ো, যন্ত্রপাতি আর পাশপোর্ট। তারপর খেল্ খতম, প্রিয়ে তামারা।'

হঠাৎ সেন্‌কা—সচরাচর সংযত হলেও এখন স্ফূর্তির ঝোঁকে—তামারাকে জড়িয়ে ধরতে যায়। বেগতিক দেখে চট করে এড়িয়ে যায় তামারা। 'কি যে কর সেনেচ্‌কা একঘর লোকের মাঝে! একটু সংযমী হও—বুঝলে! তারপর আমি তো রইলামই তোমার—ভয় কি! আসি তবে—আাঁ!' কফিখানা থেকে বেরিয়ে যায় তামারা।

৮

পরদিন সোমবার বেলা দশটায় একখানা ঠিকে গাড়িতে চড়ে মেয়েরা সব শহরের লাশঘরে গেল। গেল না শুধু হেনরিয়েটা—নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে। ভীতু নীন্‌কাও গেল না, আর গেল না পাশকা। দুদিন ধরে পাশকা আর বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, চুপ করে পড়ে আছে, কিছু জিজ্ঞেস করলে বোকা-হাসি হাসে শুধু। খেতে না দিলে চায়ও না। আবার খাবার এনে দিলে হ্যাংলার মতো গেলে। সব ভুলে গেছে। ডেকে, মনে করিয়ে দিয়ে, সব করাতে হচ্ছে। এমা কাজেই পাশকার ঘরে আর লোক বসায়নি—যদিও পাশকার খোঁজ পড়েছে কয়েকবার। এমন ওর মাঝেমাঝে হয়, আবার সেরেও যায়। তাই এবারও সেরে যাবে আশা করে এমা। পাশকা প্রতিষ্ঠানের একটি রত্ন, আবার অন্যদিকে চরম নিষ্ঠুরতারও শিকার।

লাশঘরটা একটা ছাই রঙের বাড়িতে। মেয়েরা সব এক-এক করে গাড়ি থেকে নেমে সসঙ্কোচে গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। ভিতরের ঘর তালাবন্ধ। দারোয়ানের খোঁজ করতে হল। তামারা ডেকে আনল এক খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা বুড়োকে। লোকটা তালা খুলে দরজার পাল্লা ঠেলে দিতেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে গেল। বদ্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ আর ধুপধুনো আর মড়ার গন্ধ মিশে মেয়েদের নাকে ভক্ করে এসে ঢুকল; সবাই পিছিয়ে গিয়ে পা ঘেঁষে একপাশ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তামারাই দারোয়ানের পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢোকে।

ঘরটা আধো-অন্ধকার। কয়েকটা কফিন দাঁড় করানো রয়েছে। একটা আছে ঘরের মাঝখানে প'ড়ে; ঢাকনাটা পাশেই পড়ে রয়েছে। 'কোন্‌টা আপনাদের?'

নাকে নস্যি গংজে লোকটা, জিজ্ঞেস করে, 'মংখ চেনা আছে তো?'

'হ্যাঁ!'

'বেশ। দেখে নিন তবে। আমি এক-এক করে সবগংলো দেখাচ্ছি।—এটা নাকি?' একটা কফিনের ঢাকনা খোলে লোকটা। এক বংড়ীর মংতদেহ। ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক। নীলবর্ণ মংখ। বাঁ চোখটা বন্ধ। ডান চোখে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে—জ্যোতিহারা।

'এটা নয় তবে? আচ্ছা, আরও আছে।' দারোয়ান একে-একে সব কফিনের ডালা খংলতে লাগল। দেখা গেল মংতদেহগংলো সব পথের ভিখারীদের—রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া।

তামারার মনে হতে লাগল, ঘরের ভিতরের ঐ পংতিগন্ধময় হাওয়া যেন তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গিয়ে বাসা বেঁধেছে।

'আচ্ছা, দারোয়ান, আমার পায়ের তলায় প্যাঁট-প্যাঁট করে কিসের শব্দ হচ্ছে বল তো।'

'ও কিছং নয়। পোকা। মড়াগংলোর গায়ে ব্যাটারা দিব্যি বাসা করে আছে। হ্যাঁ, তা যাকে খংজছেন সে মেয়ে, না মদ্দ?'

'মেয়ে।'

'এগংলো নয় তবে?'

'না।'

'তবে চলংন, ময়না-তদন্তের ঘরে যাই। কবে এনেছে তাকে?'

'শনিবারে!'—থলি থেকে পয়সা বের করে বলে তামারা, 'শনিবার দিনের বেলা। এস, দোক্তা কিনে খেও।'

'ঠিক হয়েছে—শনিবারে এয়েছে? গায়ে কি ছিল?'

'এমন কিছং নয়। একটা নীল রঙের জামা।'

'ও, তা হলে ২১৭ নম্বরের লাশটা হবে বোধ হয়। কি নাম?'

'সংসান্না রেইংজিনা।'

'আচ্ছা, দেখছি।'—দারোয়ান দরজার দিকে চেয়ে বলে, 'আপনাদের মধ্যে কে সাহসী, আসংন। যদি সে পরশং এসে থাকে তবে ভগবান যেমনটি করে পাঠিয়েছিলেন তেমনটিই পড়ে আছে। জামা পরাতে হবে। দংজন লোক চাই। আসংন কে কে আসবেন?'

তামারা মান্‌কাকে হংকুম করে, 'তুই আয়, ভয় নেই বোকা—আমি তো সঙ্গে আছি। তুই যাবি না তো কে যাবে? আয়।'—বেচারী মান্‌কা এতক্ষণ ভয়ে কুঁকড়ে দরজা ধরে চংপটি করে দাঁড়িয়েছিল।

'আমি, আমি যাব—যাচ্ছি। চল—তাতে আর কি—'

কাছেই ময়না-তদন্তের ঘর। আরও ছয় ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচেয় নেমে গিয়ে একটা অন্ধকার কুঠরি আছে—সেখানে। দারোয়ান ছংটে গিয়ে কোথা থেকে মোমবাতি আর একটা ছেঁড়া খাতা নিয়ে আসে। আলো জংবালতেই দেখা যায় পায়ের কাছে পাথরের মেঝেতে সারি সারি মড়া সাজানো। গায়ের রঙ সব হলদে হয়ে গেছে। কোনটার মাথার খংলি ফাটা—মংখে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। কারংর মংখবিকৃতি হয়ে আছে—দাঁত বের করা।

'এগিয়ে চলংন—পরশংদিন এয়েছে তো—শনিবারে কি নাম বললেন?'

'রেইংজিনা, সংসান্না।'

'রেইং-জিনা, সং-সান্না, রেইং-জিনা সং-সা-ন্না—।—যা বলেছি—দংশো সতের নম্বর।' একটা মংতদেহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। পায়ের তলায় লেখা ২১৭।

'দাঁড়ান। বারান্দায় নিয়ে যাচ্ছি। তারপর, দেখি এর জামাটামা কোথায়!'

বুড়ো হলে হবে কি, দারোয়ান অনায়াসে জেন্‌কার প্রাণহীন দেহটার পা দুটো ধরে নিজের কাঁধের উপর উঠিয়ে নিল। মড়ার মাথা ঝুলতে লাগল। যেন আলুর বস্তা কাঁধে নিয়ে চলেছে লোকটা।

বারান্দায় একটু একটু আলো আসছে। দারোয়ান যেই বোঝাটা মাটিতে নামাল, দুহাতে চোখ ঢাকল তামারা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেঁদে উঠল মান্‌কা।

'যদি কিছু দরকার থাকে বলুন।'—দারোয়ান বলল, 'লাশকে জামা পরাতে চান তো জামা দিতে পারি; সোনালী কাপড়ে সাজাতে চান তো তাও দিতে পারি। মালা দিতে পারি, সঙ্গে মূর্তি চান তো দিতে পারি; জুতো পর্যন্ত—সব-কিছুই কিনতে পাওয়া যায় এখানে।'

তামারা তাকে টাকা দিল। মান্‌কাকে এগিয়ে দিয়ে সে তার পিছনে পিছনে খোলা বাতাসে এসে দাঁড়াল।

একটু পরে দুটো মালা আনা হল। একটা তামারার; তাতে টিকিট ঝুলিয়ে লেখাঃ 'জেনীকে—তার বন্ধু'। আর-একটা মালা পাঠিয়েছেন রিয়াজানোব। লাল রঙের টিকিট; তাতে সোনালী লেখাঃ 'দুঃখের আগুনেই শুদ্ধি আমাদের'। বিশেষ কাজের জন্য আসতে পারেননি বলে দুঃখ করে একটা চিঠিও পাঠিয়েছেন।

তারপর তামারার আমন্ত্রণে শহরের শবযাত্রার সেরা গায়কদল এল। গায়কদলের পাণ্ডাটি মেয়েদের মধ্যে ভেরকাকে দেখে অবাক হয়ে মুচকি হাসল একটু। গায়কদলের পিছনে দু-ঘোড়ার-শব-শোভাযাত্রার গাড়ি—তামারাই ভাড়া করে এনেছে। তাদের সঙ্গে সাতজন মশালচী। একটি সাজানো কফিনও এনেছে তারা। তাতে সযত্নে জেন্‌কার মৃতদেহ রেখে সোনালী কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হল। তারপর মাথার কাছে একটি আর পায়ের কাছে দুটি মোমবাতি জেবলে দেওয়া হল।

মোমবাতির কম্পিত শিখায় জেন্‌কার মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মুখের নীলবর্ণ প্রায় মুছে গেছে এখন। ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত একটু দেখা যায়, দু-পাটি দাঁতের মধ্যে জিবের ডগাটুকু এখনও রয়েছে চেপে। গলায় দুটো দাগ, দু-গাছা হারের মতো—একটা লাল, আর-একটা কালো। লাল দাগটা সাইমনের সেই চামড়া ছিঁড়ে নেবার দাগ, আর কালো দাগটা গলায় দড়ি দেবার দাগ। তামারা এগিয়ে এসে জেন্‌কার জামার কলার দুটো এক করে সেফটিপিন দিয়ে এঁটে দাগ দুটো বন্ধ করে দেয়।

পুরোহিত এলেন—চোখে সোনার চশমা, মাথায় টুপি। লম্বা মুখের রঙ হলদেটে। উপস্থিত লোকদের নমস্কারের প্রতি-নমস্কার করতে করতে এলেন তিনি। তামারা এগিয়ে যায় তাঁর দিকে।

'ফাদার। এখানে সবারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি এক সঙ্গে হবে—না আলাদা করে হবে?'

'একসঙ্গেই হয়ে থাকে সাধারণত। তবে বিশেষ অনুরোধে এবং বিশেষ ব্যবস্থায় আলাদা আলাদা করে পারলৌকিক কৃত্য শেষ করা হয় বই কি। কিসে মারা গিয়েছিল তোমার বান্ধবী?'—পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন।

'আত্মহত্যা করেছিল, ফাদার।'

'হুঁ, আত্মহত্যা। চার্চের নিয়মানুসারে আত্মহত্যা করলে খ্রীস্টীয় প্রথায় তার সৎকার হয় না, তা জান না বোধ হয়। তবে হ্যাঁ, এর ব্যতিক্রমও আছে—'

'আমার কাছে পুলিস আর ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে। ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আত্মহত্যা করেনি। ওর মাথা খারাপ ছিল তখন।'

দুখানা কাগজ পুরোহিতের সামনে এগিয়ে দেয় তামারা, তার উপরে দশ রুবলের

তিনখানা নোট। সার্টিফিকেট দুখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রিয়াজানোব।—'আমার অনুরোধ, ফাদার, প্রকৃত খ্রীস্টীয় প্রথায় যেন ওর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বড় চমৎকার স্বভাব ছিল ওর—বড়ই দুঃখ পেয়ে গেছে। দয়া করে আপনি একটু গোরস্থানে চলুন; সেখানে একটু পৃথক ভাবে উপাসনা করবেন।'

'গোরস্থানে যেতে পারি, কিন্তু সেখানে আমার তো কিছু করবার নেই। সেখানকার আলাদা পুরোহিত আছেন। আর গেলেও আবার গাড়িতেই ফিরতে হবে তো—তার ভাড়াটাও—'

ফিরতি ভাড়া আদায় করে ধুপধুনো শোধন করে নিলেন পুরোহিত ঠাকুর, তারপর ধুনুচি হাতে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। শেষে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন তিনি, 'পরম কল্যাণময় ভগবান, অনাদি অনন্ত অব্যয়! শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।'

গান হল—'জয় জয় ভগবান করুণা-নিদান!' আর 'ওগো জগৎ-পিতা!'

মোমবাতি বিতরণ করা হল। তারপর প্রার্থনা—দেবদূতদের সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে যেনঃ 'শান্তি দাও, হে জগদীশ্বর! তোমার এই সেবিকাকে পুণ্যাত্মাদের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত স্বর্গে স্থান দাও! চিরনিদ্রায় অভিভূতা তোমার সেবিকার আত্মার শান্তি হোক! তার সকল অপরাধ ক্ষালন কর, প্রভু!'

এ প্রার্থনা অজানা নয় তামারার। তবু আজ বহুদিন পরে, তা শুনে তিক্ত বিষাদের হাসি ফুটে ওঠে তার ওষ্ঠপ্রান্তে। মনে পড়ে যায় জেন্‌কারই সেই ক্ষিপ্ত হতাশাভরা অবিশ্বাসের কথা—আজীবন পাপে ডুবে থাকলেও কি ক্ষমা করবেন পতিতপাবন পরম দয়ালু মহাপ্রভু? হে প্রভু! মানিনি তোমার নির্দেশ। তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক এনেছি, তবুও অনিচ্ছুক এ স্বৈরিণীকে ক্ষমা করতে পারবে কি তুমি, হে করুণানিদান, হে চির-সান্ত্বনা?

'ওরে জেন্‌কা রে।'—কে যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে। ছোট মান্‌কা হাঁটু গেড়ে বসে রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদছে। তাকে কাঁদতে দেখে আর সব মেয়েরাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

'শুধু তুমিই মৃত্যুঞ্জয়। তুমিই মানবকে সৃষ্টি করেছ। আমরা পৃথিবীর ধুলোয় গড়া, আবার ধুলোয় মিশে যাব। তাই আমায় সৃষ্টি করে বলে দিয়েছ—তোমায় ধুলো দিয়ে গড়েছি, ধুলোয় মিশে যেতে হবে।'

শুনতে শুনতে যেন পাথর হয়ে গেছে তামারা, একদৃষ্টে চেয়ে আছে জেন্‌কার পাণ্ডুর মুখখানার দিকে।

—'তোমায় ধুলো দিয়ে গড়েছি, ধুলোয় মিশে যেতে হবে। আর কিছু হবে না। আর কিছু?'—মনে মনে ভাবে সে।

যেন তারই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করে গেয়ে ওঠে উপাসক দল, 'ধূলিতে মিশাবে মানবজাতি—'

তারপর গান হয় 'চিরন্তনী স্মৃতি'। গান-শেষে ফুঁ দিয়ে সব মোমবাতি নিবিয়ে দেওয়া হল। পোড়া ধূপের রঙে নীল হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল দীপ্তশিখার দীর্ঘশ্বাসের মতো ধূম্রজাল। শেষ বিদায়ের প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করলেন পুরোহিত। তারপর নেমে এল বিষন্ন নীরবতা। একমুঠো ধুলো নিয়ে ক্রুশচিহ্নের আকারে তা নিক্ষেপ করলেন তিনি শবদেহের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে চললেন সেই মহামন্ত্রঃ

—'মহাপ্রভুর এ জগৎ, তারই পরিপূর্ণতা এ নিখিল বিশ্বে আর যা-কিছু বাস করে এর মধ্যে।'

মেয়েরা সব গোরস্থানে রওনা হল। সেখানে যেতে হলে ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীটের মুখ পড়ে মাঝখানে, আর তার মধ্যে দিয়ে গেলে প্রায় অর্ধেক রাস্তা কম হাঁটতে হয়। কিন্তু সেখান দিয়ে শবদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না বড় একটা; ঘোরা পথেই যায় সবাই। তবুও ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীটের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখানকার প্রায় সব মেয়ের—যে যেমন অবস্থায় ছিল এসে ভিড় করে রাস্তার ধারে দাঁড়াল। চোখের জল ফেলল সবাই; ক্রুশচিহ্ন বুকে আঁকল।

আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে এল। শীতের সূর্য নীল রঙের মিনা করে তুলল যেন হিমেল আকাশকে। শেষ ঘাসটুকুও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবুজের আভায়, সোনালী আর লালে ঝকঝক করতে লাগল ঝরা পাতার রাশ। আর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ শীতল বাতাসে উঠতে লাগল গম্ভীর বিষন্ন মধুর ধ্বনিঃ

'হে ভগবন্, হে সর্বশক্তিমান্, হে অজর অমর, করুণাধারা বর্ষণ কর আমাদের উপরে।'

কবর খুঁড়ে বসানো হল কফিন। গোরস্থানের পুরোহিত এক কোদাল মাটি দিলেন। তারপর আরও মাটি। আর ধুলো। ধুলো দিয়ে গড়া—ধুলোয় মিশে গেল!

'হয়ে গেল! 'সাঙ্গ আজি ধুলাখেলা, সাঙ্গ অভিমান!'—অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে তামারা, 'চলে গেল জেন্‌কা। তবুও ওর এ কবর আমাদের এ জীবন্ত কবরের চাইতে ভালো। তবু দুঃখ হয়, সে চলে গেল; আর তাকে আমাদের মধ্যে ফিরে পাব না। এস, তার আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করে আমরা বাড়ি ফিরে যাই।'

তারপর যেন অর্ধ-স্বগত ভাবেই সে বলে ওঠে, 'আমাদেরও আর বেশিদিন তাকে ছেড়ে থাকতে হবে না। আমরা সব ঝড়ে উড়ে যাব—ছড়িয়ে পড়ব দিগ্বিদিকে। ঐ দেখ সূর্য, ঐ নীল আকাশ। কি মধুর বাতাস! মাকড়সার জাল উড়ে চলেছে হাওয়ায় ভেসে। শুধু আমরাই, এই বেশ্যারাই, হচ্ছি পথের আবর্জনা।'

সবাই ফিরে চলে। হঠাৎ পথের বাঁকে একটা থামের আড়াল থেকে লম্বা-চওড়া একজন ছাত্র বেরিয়ে এসে লিউব্‌কার জামার হাতা ধরে টান দেয়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে লিউব্‌কা—সোলোবিয়েব! মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার।

'চলে যাও—যাও চলে!'—দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে সে।

'লিউবা—লিউব্‌কা—অনেক খুঁজেছি তোমায়—পাইনি। আমায় বিশ্বাস কর—লিখোনিনের মতো নই আমি। আমি তোমার জন্যে—হ্যাঁ, তোমার জন্যে—'

'যাও বলছি—'

'লিউব্‌কা, খেলা করছি না আমি। ভুল বুঝো না। তোমায় বিয়ে করব আমি।'

'বটে!'—বলেই সটান সোলোবিয়েবের গালে এক চড় কষে দেয় লিউব্‌কা, 'এই নাও তোমার পাওনা।'

স্তম্ভিত হয়ে যায় সোলোবিয়েব। করুণ মিনতি তার চোখে।

'কই, যাও এখান থেকে—দু-চোখের বিষ তোমরা সব!' সে রাগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জল্লাদ, শুয়োরের বাচ্চা।'

দু-হাতে মুখ ঢেকে পাগলের মতো পিছু ফিরে অদৃশ্য হয়ে যায় সোলোবিয়েব।

৯

তামারার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবিকই বুঝি ফলে যায়! জেনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দুটি

সপ্তাহের মধ্যেই এমা এডোয়ার্ডোব্‌নার বাড়ির উপর দিয়ে এত রকমের কল্পনাতীত দুর্ঘটনা ঘটে গেল যে তা বুঝি গুনে শেষ করা যায় না।

পরদিনই পাশকাকে পাঠাতে হল পাগলা-গারদে। তার আর মাথার ঠিক নেই। আর সত্যিই—পাগলা-গারদে সেই যে তাকে খড়ের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হল, সেখান থেকে একবারও আর নড়েনি বেচারা। আর শেষটায় সেখানেই সে মারা যায় মাস ছয়েক পরে।

তারপর এল তামারার পালা। দিন পনের সে খবরগিরনীর কাজ করেছিল, তা বেশ ভালোভাবেই। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আর পাত্তা মিলল না তার।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে শহরের একজন মান্যগণ্য বয়স্ক ধনী ব্যক্তির সঙ্গে বছর-খানেক ধরেই তার বেশ একটুখানি মাখামাখি চলছিল। লোকটা ছিল পয়সাওয়ালা । প্রথম আলাপ হয়েছিল স্টীমারে করে বেড়াতে যাবার সময়। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, রহস্য-ময়ী তামারার পক্ষে প্রবীণ রসিক পুরুষটিকে ফাঁদে ফেলতে বেগ পেতে হয়নি মোটেই । তামারা অবশ্য নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখেছিল। ভাবখানা ধরেছিল এই যে, সে যেন এক মধ্যবিত্ত ঘরের কুলবধূ। স্বামী জুয়াড়ি, সংসারে সুখ নেই, সন্তানও নেই। প্রথম বিদায়ের দিনে সে লোকটির সঙ্গে একত্র সন্ধ্যাযাপনের প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং ভবিষ্যতেও সে দেখা করতে চায়নি। তবে ছদ্মনামে তাদের মধ্যে প্রেমপত্রের বিনিময় চলত বটে।

তারপর একদিন দয়িতের আহ্বান সে আর অগ্রাহ্য করতে পারল না। প্রিন্সপার্কে গেল অভিসারে। কিন্তু আর কোথাও তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হল না কিছুতেই।

এভাবে পাকা শিকারীর মতো শিকারকে নিয়ে তামারা খেলাল বহুদিন। অবশেষে, একদা গ্রীষ্মে—ভদ্রলোকের স্ত্রী-পুত্র তখন বিদেশে—তামারা এল তাঁর বাড়িতে । এখানেই তার প্রথম আত্মসমর্পণ। প্রেমিকবর দেখলেন—প্রেয়সীর চোখে জল। বিবেক-দংশন নাকি? তাই তো!—আদর, চুম্বন, প্রেমালিঙ্গন। বেশি বয়সের প্রেম শেষে এমনই বেপরোয়া হয়ে দাঁড়াল যে লোকলজ্জা ভুলে গেল।

প্রণয় প্রগাঢ় হয় বিরহে। তাই তামারা বহুদিন পর পর এসে ভক্তকে দর্শন দান করে যায়। ফুলের তোড়া উপহার দিলে নেয় বটে। কিন্তু কোন দামী উপহার সে নেয় না। তাই প্রেমের বিনিময়ে পয়সা দিতে ভদ্রলোকের সাহস হয়নি কোনদিন। একদিন তিনি তামারার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করার কথা পাড়েন। উত্তরে তাঁর দিকে এমন করে চেয়ে রইল তামারা যে শেষে থতমত খেয়ে, তার হাতে চুমু দিয়ে ক্ষমা চেয়ে রক্ষা পেতে হয় তাঁকে।

ক্রমে তামারা তার প্রেমিকের আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারটি জেনে নিল। সারা সপ্তাহে যে-টাকা আমদানি হয়, প্রেমিকপ্রবর শনিবারে তা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসেন, যাতে রবিবারটা নিশ্চিন্তে আমোদ-প্রমোদে কাটানো যায়। এক শুক্রবারে লোক মারফত একখানি চিঠি পেলেন তিনি—'ওগো আমার প্রিয়তম, আমার রাজা সলোমন! আমি তোমার সুলামিথ, তোমার দ্রাক্ষাকুঞ্জের সাকী! আমার চুমু নাও! প্রিয়, আজ আমার ছুটি—আমার সুখের দিন। আমার 'সে' আজ বিশেষ কাজে দুদিনের জন্যে বাইরে গেছে। এ সুযোগ কি বৃথা যাবে, প্রাণেশ? সারাসন্ধ্যা, সারারাত্রি, কি বিরহে কাটবে?—আর কেবিন নয়, হোটেল নয়, রেস্তরাঁ নয়—তোমারই কুঞ্জে হবে আমাদের মিলন। রাত দশটা-এগারটায়। সেই সঙ্গে শীতলসুরা আর মিঠে বাদাম। মনের রাজা! মন যে আর মানা মানে না! কামনার মোহন স্পর্শে আমি আমা-হারা। আমার আলিঙ্গন নাও!—তোমারই ভ্যালেন্তিনা!'

রাত এগারটায় এল তামারা। কথায় কথায় উঠল টাকার কথা। নিজের আর্থিক অবস্থা দেখাবার জন্যে তিনি তাঁর সিন্ধুক খুলে দেখালেন প্রেয়সীকে। 'ও-সব দেখতে চাই না!'—প্রিয়তমের গলা জড়িয়ে ধরে বলে তামারা। 'অর্থই অনর্থের মূল। ও রত্নের চাইতে এই রত্ন ঢের ভালো। এস, ভলদ্যা, মদ খাই। মদের পর চলবে আমোদ আর প্রমোদ। প্রণয়ের প্রস্রবণ। দুলব দুজনে প্রেমের দোলায়। এস!'

'এ কি! মদটার স্বাদ তো ভালো নয়'—ভলদ্যা বললেন।

'হতে পারে। রাইনের মদের স্বাদ একটু উগ্র।'

আর খেতেও হল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনি ঘুমে ঢলে পড়লেন। ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করে দেখল তামারা। নাঃ, যেন একেবারে মরণ-ঘুম!

মোমবাতি জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে বড় হলঘরে যায় তামারা—সেখান থেকে সিঁড়িতে। নিঃশব্দে বাইরের দরজা খুলে দেয়। সেন্‌কা এসে ঢোকে—ভদ্রবেশে। হাতে চামড়ার থলি।

'সব ঠিক?'

'ঘুমুচ্ছে। এই যে চাবি।'

দুজনে সিন্ধুকের ঘরে যায়। টর্চ জ্বালিয়ে দেখে সেন্‌কা চারধারে। তারপর? প্রেমিক-রত্নকে ফেলে প্রেমিকা তার আসল রত্ন কুড়িয়ে নিল থলি ভর্তি ক'রে। তারপর রাস্তায়। গাড়ি ভাড়া করে শহরের বাইরে। তাদের নতুন পরিচয় হল—স্তাবিনিস্কি-দম্পতি।

এরপর অনেকদিন আর কোন খবর পাওয়া যায়নি তাদের। শেষে সেন্‌কা একটি বড় রকমের চুরিতে মস্কোতে ধরা পড়ে গেল। তামারাও। বিচার হল। জেল হল দুজনেরই।

তামারার পর ভেরকার পালা। অনেকদিন থেকেই এক মিলিটারি কেরানীর সঙ্গে তার প্রেমলীলা চলছিল। লোকটার নাম ডাইলেক্‌টরস্কি। কিছুদিন থেকে ভেরকা লক্ষ্য করে আসছে প্রেমিকের প্রেমনদীতে ভাঁটা পড়েছে। সব সময়েই যেন আনমনা ভাব। অভিমানে ভরে ওঠে ভেরকা; প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করে তোলে। কিন্তু উত্তর পায় রহস্যে-ভরা।

শেষে সঠিক উত্তর পেল একদিন। আপিসের টাকা ভেঙেছেন প্রেমিকবর; হাজার তিনেক টাকা। দিন পাঁচেকের মধ্যেই সে টাকার হিসেব হবে—খোঁজ পড়বে তখন। তারপর অপমান—আদালত—জেল। কেঁদে ফেললেন প্রেমিকবর, 'হায় রে। আমার মা। তাঁর কি হবে? এ খবর কি সহ্য করতে পারবেন তিনি? না, না—এর চাইতে মরণ ভালো।'

সে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে কেঁদে কেঁদে বলল, 'হ্যাঁ, আমি আত্মহত্যাই করব!'

'না, না! ও করতে নেই! লক্ষ্মীটি আমার!'

'তা হয় না। প্রাণ বড়, না মান বড়?'

'প্রিয়—'

'আর বাধা দিও না—'

'আমার প্রাণ দিলে যদি হয়—বন্ধু!'

'তুমি কেন দেবে?—সখী, তবে বিদায়—'

'আমাকেও সঙ্গে নাও তবে! নাও—নাও!'

সন্ধ্যেবেলায় ডাইলেক্‌টরস্কি একটা ব্যয়বহুল হোটেলে এসে একখানা ঘর ভাড়া নিল। আর তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র! তারপর পড়ে থাকবে শুধু তার আর ভেরকার মৃত-দেহ! অতএব পকেটে মাত্র এগারটা কোপেক, তবুও হুকুম হল—দু-বোতল শ্যাম্পেন আর ফল-মূল। ডাইলেক্‌টরস্কি ঠিক করেছিল, সে নিজে গুলি করে মরবে। বেশ হবে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব তার জন্যে কতই না কাঁদবে। তার উপর ভেরকা যখন

বলল—সে-ও সহমরণে যাবে, তখন তার মনের জোর আরও বেড়ে গেল। সুন্দরী ভেরকা. তার কোঁকড়ানো চুল এলোমেলো করে আবেগভরে প্রিয়তমের গালে একটি চুম্বন দিয়ে বলেছিল, 'তুমি যদি মরতে পার, আমি পারব না? এ তো সুখের মরণ।'

অবশেষে এল সেই চরম মুহূর্ত। ডাইলেক্‌টরস্কি বলল, 'প্রিয়ে, জীবন আমরা ভোগ করেছি। নয় কি? তবু জিজ্ঞেস করি, মরতে গিয়ে কোন দুঃখ বা অনুতাপ হচ্ছে কি?'

'না গো, না।'

'তবে—প্রস্তুত।'

'হ্যাঁ।'—ভেরকার মুখে হাসি।

'তবে দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখ বন্ধ করো।'

'না, না। এভাবে নয়। তুমি আমার কাছে এস। আমার চোখে চোখ রাখ, ঠোঁটে রাখ তোমার ঠোঁট। আমি তোমায় চুমু খেতে থাকব, আর তুমি ওদিকে—হ্যাঁ, তাই কর। ভয় পেয়ো না। দেখ তো আমি ভয় পাইনি। এস, দাও, চুমু দাও।।'

সেইভাবেই ডাইলেক্‌টরস্কি ভেরকাকে হত্যা করল। তারপর যখন নজর পড়ল তার মৃতদেহের উপর, বুঝতে পারল তার পৈশাচিক কীর্তি—আশঙ্কায় কেমন যেন হয়ে গেল সে। ভেরকার অর্ধনগ্ন দেহ তখনও বিছানার উপর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ডাইলেক্‌টরস্কির পা-দুটো যেন অবশ হয়ে গেল। তবু তার মনে ছিল এবার আর-কি করতে হবে। তাই নিজের পাঁজরখানা টান করে নিয়ে সেখানে রিভলভারের নল বসিয়ে ঘোড়া টিপল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ভেরকার সারা দেহে খেলে গেল জীবনের শেষকম্পন।

ভেরকার এই নাটকীয় মৃত্যুর দুসপ্তাহ পরে ছোট মান্‌কার জীবনেও যবনিকা পড়ল। একদিন মান্‌কার এক অতিথি মদ খেয়ে মাতলামো করতে করতে খালি মদের বোতলটা মান্‌কার মাথায় বসিয়ে দিল। দিয়েই মাতালের নেশা গেল ছুটে। সুতরাং দে-ছুট সেখান থেকে।

এ-রকমের আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল সারা ইয়াম্‌কায়।

শেষ পর্যন্ত এল এক মর্মান্তিক আঘাত। সৈন্যদের কীর্তি সেটা।

দুজন সৈনিক এক রুবলের একটি গণিকালয়ে গিয়ে ফুর্তি করবার পর দক্ষিণা দিতে পারেনি বলে নিজেরাই পেয়ে এল উত্তম-মধ্যম দক্ষিণা। রাত দুপুরে রক্তাক্ত দেহে কোনরকমে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেভাবেই, ছেঁড়া পোশাকে, তারা ফিরে এল নিজেদের ব্যারাকে। অন্যান্য সৈনিক বন্ধুরা সব শুনল। তারপর বোধ হয় আধঘণ্টাও যায়নি, প্রায় একশো সৈন্য এসে ইয়াম্‌স্কায়ার প্রতিটি গণিকালয়ের মধ্যে ঢুকে লুটপাট অত্যাচার শুরু করে দিল। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল পথে-জুটে-যাওয়া বদমায়েশ, গাঁটকাটা, গুণ্ডারা। বাড়ির জানালার কাঁচগুলো সব ঝন-ঝন-ঝনাৎ করে ভেঙে পড়তে লাগল। পিয়ানোগুলো ধাক্কা মেরে ফেলে চুরমার করা হল। পালকের বিছানা ছিঁড়ে পালকগুলো সব রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে লাগল। গণিকাদের ধরে ধরে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় বের করে দিল রাস্তায়। তিন-তিনটে দারওয়ানকে তো মারতে মারতে মেরেই ফেলল। আসবাব-পত্র, সিল্কের পোশাক, সব কোথায় কি হয়ে গেল। পাড়ার মদের দোকানগুলোতে পর্যন্ত তছনছ শুরু হল।

এ ধরনের পৈশাচিক অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ড চলল প্রায় সাতঘণ্টা ধ'রে। শেষ পর্যন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ অন্যান্য সৈন্যের ও দমকলের সাহায্য নিয়ে এই বিশৃঙ্খলা থামালেন। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আগুন নেবানো হল। সারা শহর চাঞ্চল্যে ভরে উঠল।

এক সপ্তাহ পরে গভর্নর হুকুম দিলেন ইয়াম্‌স্কায়ার সব গণিকালয় বন্ধ করে দেওয়া হোক। বাড়িউলীদের এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হল তল্পিতল্পা গুটোবার জন্যে।

এভাবে উৎখাত হয়ে উৎপীড়িত, শ্রীহীন, বয়স্কা বাড়িউলীরা যত তাড়াতাড়ি পারে সব গুছোতে লাগল। বেচারীদের দেখলে মনে দুঃখ হয়। একমাস পরে ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীটের নামটুকুই শুধু লোকের মনে ক্ষীণ স্মৃতি হিসেবে জেগে রইল। কিছুদিন বাদে সে-নামও মুছে গেল। নতুন নামকরণ হল। কে আর চায় এই নামের কলঙ্ক!

আর সেই হেনরিয়েটা, মুটকী কিটি, লিউব্‌কারা সব গেল কোথায়? কোথায় আবার। শহরের জনস্রোতে মিশে গেল তারা। আর এরই মধ্যে দিয়ে সমাজে দেহ-পসারিনীদের একটি নতুন শ্রেণী জন্ম নিল—যারা পথে পথে ঘুরে শিকার ধরে বেড়ায়। তাদের সে নতুন জীবন-যাত্রার কাহিনীও করুণ এবং নানা বৈচিত্র্যে ভরা।

জননী এবং তরুণদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই উপন্যাসের লেখক সে-কাহিনীও একদিন শোনাবার আশা রাখেন।

পার লাগেৰ্কভিস্ট

বারাব্বাস

অনুবাদক

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পার লাগেৰ্কভিস্টের জন্ম ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মে। লাগের্কভিস্ট আধুনিক সুইডিশ সাহিত্যের একজন প্রধান কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি নিজেকে বলেছেন—'একজন বিশ্বাসী যার ধর্ম নেই, একজন ধর্মপ্রাণ নাস্তিক।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী বিনষ্টির পরে ইউরোপে যাঁরা নতুন মূল্যবোধ খুঁজতে তৎপর হয়েছিলেন, লাগের্কভিস্ট তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রথমদিকের রচনায় 'এক্সপ্রেশনইজম'-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাৎসী অভ্যুত্থানের সরব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি সুইডেনের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে সুইডিস অ্যাকাডেমির সভ্য হন। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে 'বারাব্বাস' উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

উপন্যাসে নোবেল প্রাইজ পেলেও সমকালীন সুইডেনে নাট্যকার হিসেবে লাগের্কভিস্টের প্রতিষ্ঠা ছিল আরও ব্যাপক। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে 'মডার্ন থিয়েটার: পয়েন্টস অফ ভিউ এন্ড অ্যাটাক' লিখে হেনরিক ইবসেনের প্রতি তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। অনেকগুলো নাটকও তিনি লিখেছিলেন। 'বারাব্বাস' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তিনি ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে।

'বারাব্বাস' উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। এ-উপন্যাসে দেখানো হয়েছে একজন অপ্রেমী মানুষ কেমন করে বিশ্বাসে সুস্থিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত মানবিকতার পটভূমিতে বারাব্বাসের এ অন্বেষণ তাকে তীব্র আত্মিক অনুভূতিতে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত হল—

'এমন কোনো ভাষায় লাগের্কভিস্ট যদি সাহিত্য রচনা করতেন, পশ্চিমি পাঠকসাধারণের পক্ষে যা খানিকটা সহজে বোঝা সম্ভব, তবে যে তিনি এ-যুগের অন্যতম সর্বজনস্বীকৃত চিন্তা-নায়কের সম্মান লাভ করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই অন্তহীন অন্ধকারের থেকে যাঁরা আমাদের পথ দেখিয়ে অন্য কোন মহত্তর লোকে নিয়ে যেতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা বড় অল্প। আর লাগের্কভিস্ট সেই অল্পসংখ্যকদেরই অন্যতম। সমকালীন মানব-মন যে-দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, নিজেকে তার থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি। অল্পপরিসর এই অনুবাদ-গ্রন্থখানির থেকেই সে-কথা উপলব্ধি করা যাবে। বুঝতে পারা যাবে, স্বকীয় জীবন-দর্শনের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা সত্ত্বেও আমাদের এই সমস্যার সঙ্গে তিনি পরিচিত। এ-সমস্যা যে কতখানি সর্বনাশা, তাও তিনি জানেন। মানব-নিয়তির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সঙ্গে এবং যে-অন্ধবুদ্ধি নিয়ে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে আর নিজেদের সমস্যাগুলিকে আমাদের বিচার করতে হয়—তারও সঙ্গে, এখানে তিনি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।

তাঁর এই গ্রন্থখানি এক দুর্জ্ঞেয় রসে আপ্লুত। আত্মার নিগ্রহে, বিশ্বাসের আলোড়নে এবং মানব-মনের অগ্রগতির সঙ্গে নিশ্চিত সমধর্মিতায় মানবজীবন এবং তার নিয়তির এক আশ্চর্য রহস্য এখানে উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের মৌলিক জীবন-নাট্যের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং মুমূর্ষু মানব-মনের আর্তনাদ এখানে সমান পরিস্ফুট। মৃত্যুর মুহূর্তে সে তার আত্মাকে এক নীরন্ধ্র তমিস্রার হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

শিল্পকর্মের দিক থেকে বারাব্বাসে এক চূড়ান্ত উৎকর্ষের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ-বই সঙ্কেতে সমৃদ্ধ, নিষ্ঠায় বলিষ্ঠ, আঙ্গিকে নিরাভরণ।

পার লাগের্কভিস্টের নিজস্ব চিন্তাধারা এখানে তার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এ শুধু নিছক একখানি সাহিত্যগ্রন্থই নয়; সমকালীন ভাবনাবুদ্ধি এখানে এক দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুশরীর লাভ করেছে একথা বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।'

ক্রুশের গায়ে কিভাবে তাঁদের বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং কারাই-বা তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হয়েছিলেন তখন, সবাই তা জানেন। দাঁড়িয়েছিলেন মাতা মেরী, মেরী ম্যাগ-ডালেন, ভেরোনিকা, সিরিনের সাইমন আর এরিমেথিয়ার যোশেফ। সাইমন তাঁর ক্রুশটিকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। যোশেফ তাঁর শবদেহকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দেন। ঢালু প্রান্তরের একপাশে, আর-একটু নিচে, আর-একজন লোকও দাঁড়িয়েছিল; মাঝখানে ক্রুশটিতে বিদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির উপরে তার দুই চক্ষু নিবদ্ধ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে গিয়েছে। লোকটির নাম বারাব্বাস। তাকে নিয়েই এই বই।

বারাব্বাসের বয়স মাত্র তিরিশ, চেহারা শক্তসমর্থ। গায়ের রং ফ্যাকাশে, লালচে দাড়ি, চুল কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূযুগলও কালো। চোখ দুটি গর্তে-বসা; মনে হয় আত্মগোপন করতে চাইছে। চোখের একটু নিচে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। দাড়িতে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় এখন আর তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এ তো গেল তার চেহারার কথা। চেহারার দাম আর কতটুকু!

শাসনকর্তার প্রাসাদের কাছ থেকে শুরু করে সারাটা পথ সে জনতাকে অনুসরণ করে এসেছে, তবে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সে মিশিয়ে দেয়নি। বরং খানিকটা দূরে দূরেই ছিল। ক্রুশবাহী লোকটি হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে-ও তা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল তৎক্ষণাৎ। তা নইলে তারই উপরে হয়ত ক্রুশটিকে চাপিয়ে দেওয়া হত। বাকিটা পথ সাইমন সেই ক্রুশ বহন করে নিয়ে এসেছে। জনতার মধ্যে খুব বেশি পুরুষকে সে দেখেনি শুধু ঐ রোমান সৈন্যগুলোকে ছাড়া। বাদবাকি আর সবাই প্রায় স্ত্রীলোক। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকটির সঙ্গে সঙ্গেই তারা আসছিল। হা-ঘরে একদল ছেলেও জুটে গিয়েছিল সেই সঙ্গে। কাউকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়, ছেলেগুলোও ঠিক জুটে যায় তখন। খানিকটা আমোদ পায় হয়ত। কিন্তু খুব বেশি দূর তারা আসেনি। একটু বাদেই ক্লান্ত হয়ে খেলতে ফিরে গিয়েছিল। যাবার আগে পিছনের সেই লোকটির দিকে অবাক হয়ে তারা তাকিয়েছিল একবার। সেই লোকটি, যার ঠিক চোখের নিচেই গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। জনতার ঠিক পিছন-পিছনই সারাটা পথ সে অতিক্রম করে এসেছে।

সে এখন বধ্যভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে, মাঝখানের ক্রুশটিতে বিদ্ধ লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নেবার শক্তি তার নেই। সত্যি বলতে কি, সে এখানে আসতে চায়নি। জায়গাটাকে সে অশুচি এবং অপবিত্র বলেই মনে করে। কেউ যদি এখানে আসে তো তার আত্মার খানিকটা অংশ এখানে থেকেই যায়। যেমনটি আসে তেমনটি আর ফেরে না। সর্বত্র মড়ার মাথার খুলি, হাড়গোড়, আর ভাঙা ক্রুশের ছড়া-ছড়ি। ক্রুশগুলোকে কেউ ছোঁয় না; তাই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। সে-ই বা এসে দাঁড়িয়েছে কেন? ক্রুশবিদ্ধ ঐ লোকটিকে সে চেনে না। চিনবার কোন দরকারও তার নেই। তাকে তো মুক্তিদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে এসেছে কেন?

মুমূর্ষু সেই লোকটির দিকে সে তাকিয়ে ছিল। মাথাটা তার সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। মৃত্যু আসন্ন। চেহারা দেখে শক্তিশালী পুরুষ বলে মনে হয় না। শীর্ণ শরীর। হাত দু'খানি কমনীয়। কখনও কোন পরিশ্রমসাধ্য কাজ বোধ হয় ও করেনি।

আশ্চর্য লোক। চিবুকে হালকা একগুচ্ছ দাড়ি; শিশুর মতো নীরোম বক্ষ। লোকটিকে তার ভালো লাগেনি।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ওকে দেখবামাত্রই বারাব্বাসের মনে হয়েছিল, কি-যেন একটা রহস্য এই লোকটিকে এসে আশ্রয় করেছে। রহস্যটা যে ঠিক কি, তা সে বলতে পারে না। অনুভব করতে পারে মাত্র। এমন লোক সে দুটি দেখেনি। হতে পারে, অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দৃষ্টি তার ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তার বোধ হয় মনে হয়েছিল, লোকটির চারদিকে যেন আশ্চর্য এক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। খানিক বাদেই সেই আলোক-চক্র মিলিয়ে গেল। বারাব্বাসের দৃষ্টি ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে; চারপাশের অন্যান্য জিনিসকেও সে তখন দেখতে পাচ্ছে। সে যাই হোক, লোকটি যে খানিকটা রহস্যময়, এ-অনুভূতি তার এখনও কাটেনি। এ-লোক আর-পাঁচজনের মতো নয়। ও-যে বন্দী, ওকেও যে ঠিক বারাব্বাসেরই মতো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তা যেন ভাবাও যায় না। ব্যাপারটার তাৎপর্য সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তার অবশ্য কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তা সত্ত্বেও তার অবাক লাগল, এমন লোককে কেউ মৃত্যুদণ্ড দেয়? লোকটি যে নির্দোষ, বারাব্বাসের তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

লোকটিকে তারপর ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হল। আর বারাব্বাসের শৃঙ্খল-মোচন করে দিয়ে বলা হল যে, তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তার এতে কোন হাত ছিল না। যা ওরা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে। দুজনের মধ্যে কোন্ জনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, সে বিষয়ে ওদের ইচ্ছেই চূড়ান্ত। বারাব্বাসের কপাল ভালো, সে তাই ছাড়া পেয়ে গেছে। তাদের দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তারপর ঠিক হল যে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাকেই যে ছেড়ে দেওয়া হবে, বারাব্বাস তা ভাবতেও পারেনি। ওরা এসে তার শৃঙ্খলমোচন করে দিল। অন্য লোকটিকে তখন তোরণপথে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার চারদিকে সান্ত্রীদের কড়া পাহারা, পিঠে তার ক্রুশ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শূন্য তোরণপথে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে ছিল বারাব্বাস। প্রহরী এসে তাকে একটা ঠেলা দিয়ে তারপর গর্জন করে উঠল, 'হাঁ করে দেখছিস কি! যা, পালা!' সম্বিৎ ফিরে এসেছিল বারাব্বাসের। সে-ও তারপর ঐ তোরণপথেই বেরিয়ে এসেছিল। অন্য লোকটি তখন ক্রুশ বহন করে অগ্রসর হচ্ছে। বারাব্বাস তার অনুসরণ করতে লাগল। কেন—সে জানে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সে যে ওর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখছে, তা-ও না। তার এতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

ঐ যে যারা ঐ ক্রুশের চারপাশে এসে সমবেত হয়েছে, আসতে তাদের কেউ বাধ্য করেনি। স্বেচ্ছায় ওরা এসেছে। কিন্তু এই জায়গাটা ভারী অপবিত্র। না এলেও ওরা পারত। লোকটার ওরা কে? আত্মীয়বান্ধব বোধ হয়। অশুচি এই বধ্যভূমিতে এসেও ওদের এতটুকুমাত্র ক্ষোভ নেই। বারাব্বাসের অবাক লাগল।

উনিই বোধহয় মা। লোকটার সঙ্গে ওঁর চেহারার কিন্তু কোন মিল নেই। কিন্তু শুধু মা-র কেন, কারুরই কোন মিল নেই ওঁর সঙ্গে। মা-র চেহারা চাষীমেয়ের মতো। তেমনি কঠিন, তেমনি বিষণ্ণ। সারা মুখ তাঁর অশ্রুপ্লাবিত। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে সারাক্ষণ তিনি সেই অশ্রু মার্জনা করে চলেছেন। কাঁদছেন, তবু নিঃশব্দ। অন্যান্যরাও শোকপ্রকাশ করছে। মা-র শোক অন্যরকম। অন্যান্যরাও ওই লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। মা তাকিয়ে আছেন অন্যভাবে। উনিই যে মা, বারাব্বাসের আর তাতে এতটুকুমাত্র সন্দেহ নেই। মা-র দুঃখই সব থেকে বেশি। কিন্তু চোখে যেন তাঁর একটি ভর্ৎসনাও ফুটে উঠেছে। ছেলেকে তিনি ভর্ৎসনা করছেন হয়ত—সে কেন এই শাস্তি ডেকে নিল? যতই ভালমানুষের মতো লাগুক, নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে। গুরুতর কোন অপরাধ।

তা নইলে আর প্রাণদণ্ড হবে কেন? মা-র ধারণা, ছেলে তাঁর নির্দোষ। সব মা-ই তাই মনে করেন। ছেলে তাঁদের শত অপরাধ করুক, সে-অপরাধকে তাঁরা অপরাধ বলেই গণ্য করেন না।

বারাব্বাসের মা নেই। বাবাও না। বাপ-মা-র কথা সে শোনেওনি কখনও। আত্মীয়স্বজনও তার নেই। তাকে যদি আজ ক্রুশবিদ্ধ করা হত তো এমন করে কেউ অশ্রুমোচন করত না। সারাক্ষণ ওরা বুক চাপড়াচ্ছে। এত বড় শোক যেন আর পায়নি কখনও। সারাক্ষণ ওরা কাঁদছে। সে কান্নার বিরাম নেই।

ডানদিকের ক্রুশটিতে যাকে বিদ্ধ করা হয়েছে, বারাব্বাস তাকে চেনে। সে-ও ওকে দেখেছে বোধহয়। কি ভাবছে ও কে জানে। হয়ত ভাবছে, বারাব্বাস ওর মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। হয়ত, বারাব্বাস এতে খুশিই হয়েছে। না, অতশত ভেবে সে আসেনি। তবে হ্যাঁ, ওকে ক্রুশবিদ্ধ করাতে তার আপত্তিও নেই। শয়তানটার মরাই ভালো। যে-কারণে ওকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, সে-কারণে অবশ্য নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

মাঝখানের লোকটির দিকে সে আর তাকিয়ে নেই; অন্য একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু বারাব্বাসের বদলে যাকে আজ ক্রুশবিদ্ধ করা হল, সে ঐ মাঝের লোকটি। তার জন্যেই সে এসেছে এখানে। কি-যেন একটা ক্ষমতা আছে ওর। আর সেই ক্ষমতাই যেন বারাব্বাসকে এই অপবিত্র বধ্যভূমিতে টেনে নিয়ে এসেছে। ক্ষমতা? কই দেখে তো তা মনে হয় না! বরং মনে হয়, ভারি দুর্বল। পাশাপাশি তিনজনকে ক্রুশবিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ওর যন্ত্রণাই সবচাইতে বেশি। আর দু'জনও কষ্ট পাচ্ছে অবশ্য। তবে ওর মতো অতটা নয়। মাঝখানের ওই দুর্বল লোকটির থেকে তারা ঢের বেশি শক্তিমান। সে তুলনায় ওকে ভারি করুণ দেখাচ্ছে। ঘাড় খাড়া করে রাখবার মতোও আর শক্তি নেই, মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে।

অতি কষ্টে একটু মুখ তুলে চাইল। দুর্বল নীরোম বক্ষ। শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। শুকনো ঠোঁটের উপরে জিভটাকে শুধু বুলিয়ে নিল কয়েকবার। তারপর গোঙাতে লাগল। কি যেন বলতে চায়। খুব তেষ্টা পেয়েছে বোধহয়। গড়ানো ঢালু জমি; তার একটু নিচের দিকে সান্ত্রীরা সব বসে রয়েছে। পাশা খেলছে। লোকগুলো সব মরতে বড় সময় নেয়। যতক্ষণ বেঁচে আছে, পাহারা দিতে হবে। সান্ত্রীরা তাই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তেষ্টায় লোকটা গোঙাচ্ছে; তারা তবু নির্বিকার। আত্মীয়দের মধ্যেই একজনকে এগিকে আসতে হল শেষপর্যন্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একজন তখন উঠে দাঁড়াল। জলের কলসীর মধ্যে খানিকটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে নিল সে, তারপর একটা লাঠির ডগায় করে সেই ভিজে ন্যাকড়ার পুঁটলিটাকে সামনে এগিয়ে দিল। বিস্বাদ নোংরা জল। দেখেই লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রহরীটি তখন হাসছে। সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা সে খুলে বলল। তারাও সব হাসতে লাগল তখন। শয়তান।

একটা বীভৎস যন্ত্রণায় লোকটা হাঁপাচ্ছে। আত্মীয়বন্ধুরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিরুপায় নৈরাশ্যের দৃষ্টি। আর বেশি দেরি নেই। মৃত্যু আসন্ন। যত তাড়াতাড়ি এখন মৃত্যু আসে, বারাব্বাস ভাবল, ততই ভালো। তা হলে আর এই যন্ত্রণা ওকে সহ্য করতে হয় না। এবারে ওর মৃত্যু আসুক। মৃত্যু এলে বারাব্বাস আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না, তৎক্ষণাৎ সে চলে যাবে। এ নিয়ে আর সে চিন্তাও করবে না কোনদিন।

আর সেই পাহাড়ের উপরে হঠাৎ এক অদ্ভুত অন্ধকার নেমে এল। সূর্য মুছে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর তারই মধ্যে সেই ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির আর্ত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল:

—ভগবান! তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে কেন?

মৃত্যুপথযাত্রীর সেই আর্ত কণ্ঠ যেন বড়ই ভয়ঙ্কর শোনাল। কথাটার মানে কি? আর এই মধ্যাহ্নকালেও চারদিক অত অন্ধকার হয়ে গেল কেন? বারাব্বাস কোন কারণ খুঁজে পেল না। পাশাপাশি তিনটি ক্রুশ। অন্ধকারের মধ্যে তারা হারিয়ে গেছে। প্রতি-মুহূর্তেই যে একটা বিপদ এগিয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ। সান্ত্রীরা সব ভয়ে লাফিয়ে উঠল, বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরল তাদের অস্ত্র। ঐ অস্ত্রই তাদের একমাত্র সম্বল। বর্শা-হাতে তারা দাঁড়িয়ে রইল, ফিসফাস কথা কইতে লাগল নিজেদের মধ্যে। বোঝা গেল ওরা ভয় পেয়েছে। একটু আগের সেই হাসির আর এখন চিহ্নমাত্র নেই। সংস্কারের কাছে ওরা পরাজয় স্বীকার করেছে।

বারাব্বাসও ভয় পেয়েছে। ধীরে ধীরে ফের আলোর চিহ্ন ফুটে উঠতেই সে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। চতুর্দিক আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। খুব ধীরে ধীরে। যেন ভোর হল। পাহাড়ের উপরে, অলিভ গাছের পাতায় পাতায় তার ছোঁয়া লাগল। পাখিরা সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল; তারা ফের গান গেয়ে উঠল। ঠিক যেন ভোর হয়েছে।

আত্মীয়বন্ধুরা সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কান্না নয়। আর বিলাপ নয়। ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটির দিকে তারা তাকিয়ে আছে। সান্ত্রীরাও। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। সবাই নির্বাক।

বারাব্বাসের এবার ছুটি। যেখানে খুশি সে চলে যেতে পারে। যা হবার হয়ে গেছে। সূর্য উঠেছে। সব-কিছুই তাই আগের মতোই স্বাভাবিক। লোকটি মারা গেল। তাই বুঝি সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

বারাব্বাস এবারে বিদায় নেবে। লোকটি মারা গেছে, তারও আর দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই। থাকবার কোন মানেও হয় না। যাবার আগে সে দেখল, ক্রুশ থেকে তার দেহটিকে ওরা নামিয়ে এনেছে। দুজনে মিলে সেই দেহের উপরে সাদা একটুকরো কাপড় বিছিয়ে দিল। তারপর সেই শবদেহটিকে তারা সযত্নে বহন করে নিয়ে চলল। লোকটিকে ওরা আলতো-হাতে ধরে রয়েছে, পাছে আবার ব্যথা লাগে। বারাব্বাসের অবাক লাগল। লোকটি তো মরেই গেছে, তবে আর এই সতর্কতা কেন? এরা সব আশ্চর্য মানুষ! মা-র চোখে আর জল নেই। অশ্রুহীন চোখে তিনি তাঁর ছেলের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর সেই বাদামি-কঠিন মুখে যত না দুঃখ, তার চাইতেও ঢের বেশি দুঃখ তাঁর হৃদয়ে। তিনি যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন। কোন-কিছুই আর বুঝে উঠতে পারছেন না। বারাব্বাস তাঁর দুঃখ বুঝল। শোকার্ত সেই মিছিল ততক্ষণে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। পুরুষরা বহন করে নিয়ে চলেছে সেই মৃতদেহ, মেয়েরা তাদের পিছনে-পিছনে হাঁটছে। একটি মেয়ে যেন কি বলল মা-কে, তারপর আঙ্গুল তুলে বারাব্বাসকে দেখিয়ে দিল। চলতে চলতেই মা ফিরে তাকালেন। একটা নিরুপায় দুঃখ আর খানিকটা ভর্ৎসনা যেন তাঁর দুই চক্ষুর মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে। সে দৃষ্টি ভুলবার নয়। মিছিল এগিয়ে চলল। সামনেই গলগথার সড়ক। সেখানে গিয়ে তারা বাঁ-দিকে মোড় নিল।

পিছন-পিছন এগিয়ে চলল বারাব্বাস। মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান। তাকে তাই কেউ দেখতে পেল না। খানিক এগিয়েই একটি উদ্যান। পাহাড়ের গা কেটে সেখানে একটি গহ্বর রচনা করা হয়েছে। মৃতদেহটিকে সেই গহ্বরের মধ্যে তারা নামিয়ে দিল; তার পাশে দাঁড়িয়ে সবাই প্রার্থনা করল কিছুক্ষণ। তারপর বিরাট একখণ্ড পাথর নিয়ে এসে গহ্বরের মুখ রুদ্ধ করে দিয়ে তারা চলে গেল।

বারাব্বাস তখন সেই সমাধি-ভূমির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইল, প্রার্থনা জানাল না। সে পাপী; পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করেনি। তার প্রার্থনা তাই কেউ

গ্রহণ করবে না। আর তা ছাড়া মৃত লোকটিকে সে চেনেও না। একটা অচেনা লোক, তার জন্যে সে প্রার্থনা জানাতে যাবে কেন? নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর জেরুসালেমের পথে রওনা হয়ে গেল।

গেট অব ডেভিড থেকে খানিকটা পথ এগোতেই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল বারাব্বাসের—মেয়েটি তার চেনা। উপরকার ঠোঁটটি ঈষৎ চেরা তার। রাস্তার ধারের একটা বাড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটায় সে এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখাল যেন বারাব্বাসকে দেখতেই পায়নি। বারাব্বাসের সেটা চোখ এড়াল না। বুঝল—এখানে যে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে মেয়েটি তা আশাই করে নি। সে বোধহয় ভেবেছিল, বারাব্বাসকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তার কাছে গিয়ে পৌঁছল। আবার দেখা হল তাদের। অথচ এর কোন দরকার ছিল না। তার সঙ্গে ফের কথা বলতে যাবারও কোন দরকার ছিল না বারাব্বাসের। নিজের আচরণে সে নিজেই অবাক হল। মেয়েটিও বিস্মিত হয়েছে, মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। চাউনিটা লাজুক।

অথচ কি-যে তারা চায়, কেউই তা খুলে বলল না। মেয়েটি এখন কোথায় যাবে, গিলগলের থেকে সে কোন খবর পেয়েছে কিনা, বারাব্বাস তাকে এইটুকুই শুধু জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি সে-কথার জবাব দিল বটে, তবে অত্যন্তই সংক্ষেপে। বারাব্বাস দেখল, উত্তর দিতে গিয়ে তার কথাগুলি একটু জড়িয়ে-জড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবেই ও কথা বলে, বারাব্বাস তা জানে। আপাতত ও কোথাও যাচ্ছে না। আজকাল ও থাকে কোথায়, তাও বারাব্বাস জিজ্ঞেস করেছিল। মেয়েটি তার জবাব দিল না। পোশাক তার শতছিন্ন, পা দুখানি অনাবৃত, ধূলিধূসর। এরপর আর কথা জমল না। পাশাপাশি তারা নীরবে পথ চলতে লাগল।

রাস্তার ধারেই একটি বাড়ি। দরজা খোলা। ভিতর থেকে একটা হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। বাড়িটাকে তখনও তারা ছাড়িয়ে যায়নি, স্থূলাঙ্গিনী একটি মেয়ে হঠাৎ প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। চেঁচিয়ে সে ডাকল বারাব্বাসকে। মেয়েটি মদ খেয়েছে, টলছে। পাগলের মতো সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। বোঝা গেল, বারাব্বাসকে দেখে তার খুব ফুর্তি হয়েছে। ঝামেলা না বাড়িয়ে বারাব্বাস যদি এখন ভিতরে গিয়ে ঢোকে, তাহলেই সে খুশি হবে। সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে; বারাব্বাস তাই একটু ইতস্তত করতে লাগল। মোটা মেয়েটি আর কথা বাড়াল না; দুজনকেই সে জাপটে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। দুটি পুরুষ আর তিনটে মেয়ে এতক্ষণ ভিতরে বসে জটলা করছিল। বারাব্বাসকে দেখে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল তারা। জায়গাটা ঈষৎ অন্ধকার। বারাব্বাস তাই প্রথমটায় তাদের দেখতে পায়নি। অন্ধকারটা একটু সয়ে আসতেই ঘরের চেহারাটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। মাঝখানে একটি টেবিল। তার চারপাশে তারা গোল হয়ে বসে আছে। বারাব্বাসকে তারা আদর করে কাছে টেনে বসাল। একই সঙ্গে সবাই কথা বলতে চায়, কারুর কথাই তাই বুঝতে পারা যায় না। এইটুকু শুধু বোঝা গেল যে, তারা খুব খুশি হয়েছে। বারাব্বাসের সামনে তারা একপাত্র মদ এগিয়ে দিল। তারপর ফের কথা বলতে শুরু করল। বারাব্বাসকে যে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তার জায়গায় যে আর-একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, এইটেই তাদের আনন্দের কারণ। আর সেই আনন্দের তোড়ে তারা উচ্ছল হয়ে উঠল। যে যার পাত্রে মদ ঢেলে নিল আবার। বন্ধুদের ধারণা হয়েছে, বারাব্বাস খুব ভাগ্যবান পুরুষ, তাকে স্পর্শ করলে তাদেরও নির্ঘাত কপাল খুলে যাবে। একটি মেয়ের আর তর সইল না। বারাব্বাসের জামার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সে তার রোমশ বক্ষ স্পর্শ করল। মোটা মেয়েটি তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সশব্দে হেসে উঠল সে।

চুপচাপ মদ্যপান করল বারাব্বাস। বিশেষ কোন কথা বলল না। অদ্ভুত একটা শূন্যতা এসে তাকে আশ্রয় করেছে। সামনের দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত। মুখে কোন কথা নেই। চোখ দুটি গাঢ়-বাদামি, গর্তে-বসা। দেখে মনে হয়, আত্মগোপন করতে চাইছে। স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। সবাই একটু অবাক হল তাতে। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই তার এরকম ভাবান্তর হয়। বন্ধুরা তা জানে।

পানপাত্র নিঃশেষ হতেই মেয়েরা সেটি ফের পূর্ণ করে দিল। চুপচাপ সে মদ খেয়ে যেতে লাগল। মুখে কোন কথা নেই।

বন্ধুরা আর স্থির থাকতে পারল না। কি হয়েছে তার? অমন গুম হয়ে বসে আছে কেন? বারাব্বাসের উপরে তাদের প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল। স্থূলাঙ্গিনী সেই মেয়েটি এসে নিরস্ত করল তাদের। দু-হাতে সে বারাব্বাসের কণ্ঠ বেষ্টন করে দাঁড়াল। তারপর বন্ধু-বান্ধবদের দিকে তাকিয়ে বলল যে, বারাব্বাসের এই নিস্তব্ধতায় তাদের অবাক হবার কোন কারণ নেই। দীর্ঘদিন সে বন্দী হয়েছিল, প্রায় মারা গিয়েছিল বললেই চলে। প্রাণদণ্ডে যাকে একবার দণ্ডিত করা হয়, মৃত্যুকে সে অবধারিত বলেই জানে। তারপর তাকে যদি মুক্তিও দেওয়া হয়, সে আর স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। বারাব্বাসকেও মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সে মারা গিয়েছিল বললেই চলে। সে আর সেই স্বাভাবিক মানুষ নেই। তার এই কথায় সবাই হেসে উঠল। মেয়েটি তখন আর রাগ সামলাতে পারল না; সাফ জানিয়ে দিল যে, ফের যদি তারা ওরকম হাসে তো একমাত্র বারাব্বাস আর তার সঙ্গের মেয়েটিকে ছাড়া বাদবাকি সবাইকে সে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। এই নতুন মেয়েটিকে সে চেনে না, তা সত্ত্বেও তাকে তার ভালোই লেগেছে। মেয়েটি একটু বোকা-বোকা অবশ্য; কিন্তু তা হোক। লোক দুটি একটু চুপ করে ছিল। এ-কথায় তারা ফের হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির তোড়টা একটু থিতিয়ে আসবার পর ফিসফাস কথা শুরু হল আবার। বারাব্বাসকে তারা জানিয়ে দিল যে, আজ রাতেই তারা ফের পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে। অন্ধকারটা একটু ঘনিয়ে আসবার পরেই তারা রওনা হবে। এখানে তারা একটি ভেড়া বলি দিতে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, ভেড়াটির একটু খুঁত রয়েছে। সেটিকে তাই বিক্রি করে দিয়ে তার জায়গায় তারা দুটি পায়রা বলি দিয়ে এসেছে। পকেটে তাদের আরও কিছু পয়সা ছিল, তাই একটু ফুর্তি করতে এসেছে এখানে। বারাব্বাসকে তারা তাদের নতুন আস্তানার ঠিকানা দিয়ে দিল। তারপর বলল, সে যেন সেখানে যায়। জায়গাটা সে চিনতে পেরেছে তো? যাবে তো সেখানে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল বারাব্বাস; দ্বিতীয় প্রশ্নের সে জবাব দিল না।

বারাব্বাসের জায়গায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, আর-একটি মেয়ে ইতিমধ্যে তার সম্পর্কে কি-যেন কথা বলতে শুরু করেছিল। পথ-চলতি মেয়েটি তাকে একদিন দেখেছে। সবাই বলাবলি করছিল, লোকটা নাকি অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছে, সে নাকি খুব ভবিষ্যদ্বাণী করে বেড়ায়। আরও নাকি কি-সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। তা সে তো অনেকেই করে, তাতে আর ক্ষতি কি! লোকটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু-একটা গুরুতর অপরাধ করেছে। তা নইলে তাকে, আর যাই হোক, ক্রুশবিদ্ধ করা হত না। লোকটার চেহারাও তার মনে আছে। নিতান্তই অস্থিচর্মসার। আর-একটি মেয়ে বলল লোকটাকে সে দেখেনি বটে, তবে তার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে। সে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, এখানকার মন্দির একদিন ধসে পড়বে। আর-একটা বিরাট ভূমিকম্পে এই জেরুসালেম নাকি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, খুব বড় রকমের একটা অগ্নিকাণ্ড হবে তারপর; স্বর্গ আর পৃথিবী, দুই-ই তাতে ভস্ম হয়ে যাবে। বদ্ধ পাগল! এই পাগলামির জন্যেই লোকটাকে বোধহয় ক্রুশবিদ্ধ করা হল।

আর-একটি মেয়ে তখন বলল যে, লোকটা নাকি গরিব-দুঃখীদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করত। আর তাদের প্রায়ই নাকি বলত যে, মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যাবে। শুধু গরিবই নয়, বেশ্যারাও নাকি সব স্বর্গলাভ করবে। লোকটা অন্তত তাই বলেছিল। কথা শোন একবার! হাসতে হাসতে সবাই গড়াগড়ি খেতে লাগল। তারাও স্বর্গলাভ করবে! লোকটা বলে কি!

বারাব্বাস এতক্ষণ একমনে তাদের কথা শুনে যাচ্ছিল। তার সেই ভাবান্তর এখন একটু-একটু কেটে এসেছে। মুখে তবু হাসি নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াতেই মোটা মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে ধরল। জোর করে ফের বসিয়ে দিল তাকে। তারপর বলল, ক্রুশবিদ্ধ লোকটি যে কে, তা নিয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। যে-ই হোক, মরে সে এতক্ষণে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তার বদলে বারাব্বাস যে মুক্তিলাভ করেছে, এতেই সে সুখী।

বারাব্বাসের সঙ্গিনী সেই ঠোঁট-কাটা মেয়েটি এতক্ষণ জবুথবু হয়ে বসেছিল। আলাপ-আলোচনায় তার তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। আসলে কিন্তু সারাক্ষণ সে একটা চাপা-উত্তেজনা নিয়ে সেই মৃত লোকটির বর্ণনা শুনে গিয়েছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল: বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখে তাকিয়ে রইল তার সঙ্গীর দিকে। সারা মুখ তার ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। চাপা ফ্যাসফেসে গলায় সে চিৎকার করে উঠল:

—বারাব্বাস! তুমি বারাব্বাস!

তেমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়, বারাব্বাসকে সে তার নাম ধরে সম্বোধন করেছে মাত্র। কিন্তু অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন? ব্যাপারটা কারুর বোধগম্য হল না। তবে সবাই বুঝল যে, বারাব্বাসও এতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। দৃষ্টি তার অস্থির হয়ে উঠেছে। যেন এখন পালাতে পারলেই বাঁচে। সবাই একটু বিস্ময় বোধ করল। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু যা-ই ঘটুক, তাদের তাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সুতরাং তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে যাওয়াও অর্থহীন। আর তাছাড়া, বন্ধু হিসেবে বারাব্বাস যতই চমৎকার হোক, একটু যে খামখেয়ালী তাতে সন্দেহ নেই। সব সময় তাই ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারা যায় না।

মেয়েটি ততক্ষণে আবার জড়সড় হয়ে বসে পড়েছে। তবে দৃষ্টি তার বারাব্বাসের উপরেই নিবদ্ধ। চোখ দুটিতে যেন আগুন জ্বলছে।

মোটা মেয়েটি এক সময়ে উঠে গিয়ে বারাব্বাসের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এল। আহা বেচারা! অনাহারে রয়েছে নিশ্চয়ই। কয়েদে কি আর ওকে খেতে দিয়েছে কিছু। শয়তানরা ওকে না-খাইয়েই রেখেছে। বারাব্বাসের সামনে সে তার খাবারের পাত্রটা এগিয়ে দিল। সামান্য কিছু রুটি, নুন, আর এক-টুকরো শুকনো মাংস। বারাব্বাস তা ছুঁল কি ছুঁল না। অল্প-কিছু মুখে দিয়ে বাকিটা সে তার সঙ্গিনীর দিকে এগিয়ে দিল। আর মেয়েটিও যেন ক্ষুধার্ত পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই খাবারের উপর। গোগ্রাসে সেগুলো গলাধঃকরণ করল। তারপর ঘরের থেকে সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

বন্ধুরা সব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। কে এই মেয়েটা, কে? বারাব্বাস কোন জবাব দিল না। নিজের ব্যাপারে ও বরাবরই একটু চাপা। বন্ধুরা তা জানে। তারা তাই চুপ করে রইল।

বারাব্বাসই কথা কইল প্রথম। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল—লোকটা সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করত, বলছিলে না? কি রকম অদ্ভুত কাণ্ড? আর সে প্রচারটাই-বা করত কি?

মেয়েরা বলল, লোকটা নাকি অসুস্থ লোকদের সারিয়ে তুলত। ভূতপ্রেত তাড়িয়ে দেবার মতোও নাকি ক্ষমতা ছিল তার। শোনা যায়, মরা মানুষকেও সে বাঁচিয়ে তুলেছে।

তবে হ্যাঁ, কথাটা যে কদ্দূর সত্যি, তা তারা জানে না। খুব সম্ভব সত্যি নয়। কি-যে সে প্রচার করত, সে-সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা নেই। একজন অবশ্য এ-সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছে। আর এ-গল্পটাও নাকি ঐ-লোকটাই চারদিকে ছড়িয়ে বেড়িয়েছিল। বিয়ে না কি-একটা উপলক্ষে একজন একবার বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করে। কিন্তু কেউই নাকি তার বাড়িতে ভোজ খেতে আসেনি। এত খাবার নষ্ট হয়ে যাবে? লোকটা আর উপায় না দেখে রাস্তার থেকে সব গরিব দুঃখীদের জুটিয়ে আনল। ভগবান তাতে খুব চটে গিয়েছিলেন। না কি তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন বোধ হয়! মোট কথা, কি যে ঠিক হয়েছিল, তা আর এখন তার মনে নেই।

চুপচাপ বারাব্বাস সব শুনে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা তার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে। তারপর একটি মেয়ে যখন বলল যে, লোকটা নিজেকে এই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা বলে মনে করত, তখন আর তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। চুপচাপ বসে বসে সে তার দাড়ির মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে লাগল; মনে হল যেন এক গভীর সমস্যার মধ্যে সে ডুবে গিয়েছে। অস্ফুট কণ্ঠে আপনমনেই সে বলল—ত্রাণকর্তা! না, না, নিশ্চয়ই তা নয়—।

তার এক বন্ধুও এ-কথায় সায় দিয়ে বলল যে, ত্রাণকর্তা হলে আর ওকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হত না; সান্ত্রীরাই সব মারা পড়ত। ত্রাণকর্তা যে কাকে বলে, তা সে খুব ভালো-ভাবেই জানে। আর-একজনও বলল—ঠিক। সেক্ষেত্রে সে ক্রুশের থেকে নেমে এসে সবাইকে হত্যা করত।

—যা বলেছ। ত্রাণকর্তাকে কি আর ক্রুশে বিঁধিয়ে মারা যায়? যত সব বাজে কথা!

চিবুকে হাত রেখে চুপ করে বসে রইল বারাব্বাস। দৃষ্টি তার মাটির উপরে নিবদ্ধ।—না, ত্রাণকর্তা নয়। অসম্ভব।

—নাও হে বারাব্বাস, বিড়বিড় না করে এখন একপাত্র খেয়ে নাও দেখি।

বলেই তার এক বন্ধু তার পাঁজরে একটা খোঁচা মারল। এটা তার রসিকতা সন্দেহ নেই, তবে বারাব্বাস তা গায়ে মাখল না। পাশেই মদের ভাঁড়। সেটাকে নিঃশেষ করে সে ফের মাটিতে নামিয়ে রাখল। মেয়েরা সেটাকে ভরে দিল আবার। আবারও তা নিঃশেষ হল। নেশা ধরে গিয়েছে বারাব্বাসের, তবে তার ভাবান্তরটা এখনও কাটে নি। লোকটা তাকে আর-একটা খোঁচা দিয়ে বলল—ওসব ভাবনা-চিন্তা এখন রাখ, মদ খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নাও দেখি। আরে বাপু, কোথায় এতক্ষণ ক্রুশের উপরে ঝুলে মরতে, তার বদলে দিব্যি এখানে বসে ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে ফুর্তি করছ। এইটেই কি ভালো নয়? নাকি এতেও তোমার শান্তি নেই? বন্ধু হে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছ সেইটেই হচ্ছে আসল কথা।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, বারাব্বাস বলল—তাতে আর সন্দেহ কি!

দুই চক্ষুর মধ্যে তার যে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটি ছড়িয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তা মুছে আসতে লাগল। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে; মদ্যপানের ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা কথা কইতে লাগল। বন্ধুরাও একটু নিশ্চিন্ত হল তাতে। কিন্তু সেই কথাবার্তার মধ্যেই বারাব্বাস তার বন্ধুদের হঠাৎ অদ্ভুত একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসল। সূর্যের সমস্ত আলো যে আজ নিভে গিয়েছিল, বারাব্বাস শুধোল, তা নিশ্চয়ই তারা লক্ষ্য করেছে? হঠাৎ অমন অন্ধকার হয়ে গেল কেন?

—অন্ধকার? কিসের অন্ধকার? বন্ধুরা সব অবাক হয়ে বলল, কই, কোথাও তো অন্ধকার হয় নি? না-কি হয়েছিল? কখন?

—সে কি! দুপুর বেলা সব যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তোমরা তা লক্ষ্য করনি?

যত সব বাজে কথা। হো হো করে সবাই হেসে উঠল। বিস্মিত হয়ে গেল বারাব্বাস; এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বন্ধুরা তাকে স্পষ্ট জানাল যে, কোথাও তারা অন্ধকার দেখতে পায়নি। আর শুধু তারা বলেই নয়, জেরুসালেমের প্রতিটি লোককে বারাব্বাস জিজ্ঞেস করে দেখুক, সবাই সেই একই উত্তর দেবে। তার কি সত্যিই মনে হয়েছিল যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে? ভর দুপুরেই? কি আশ্চর্য! তবে হ্যাঁ, একটা কথা। দীর্ঘদিন সে অন্ধকূপে বন্দী হয়েছিল, তাই বোধ হয় অমন অন্ধকার দেখে থাকবে। তাছাড়া আর এর অন্য-কোন কারণ নেই। মোটা মেয়েটিও তাদের কথায় সায় দিয়ে বলল যে, কারাগার থেকে আচমকা বাইরে বেরিয়ে এসেছে কিনা, সূর্যের আলোতে তাই তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সেইটেই স্বাভাবিক। বারাব্বাস তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখে তার একটা সংশয় ফুটে উঠেছে। সংশয়টা ধীরে ধীরে নিভে এল। মনে হল সে একটু আশ্বস্ত হয়েছে। এতক্ষণে সে একটু সোজা হয়ে বসতে পারল। হাত বাড়িয়ে সে তার পাত্রটি কাছে টেনে নিয়ে মুহূর্তে সেটি নিঃশেষ করল। তারপর সামনে এগিয়ে ধরল। সে এখন আরও মদ চায়; আরও। সকলেই পানোন্মত্ত। বারাব্বাসও। এতক্ষণে তার একটু নেশা জমে উঠেছে। এ-নেশাটা যেন অন্য রকমের। আগে যেমন মদ্যপান করত, এখনও করছে। তার সেই বিষণ্ণ ভাবটিও আর নেই। খুব বেশি কথা বলছে না অবশ্য। তবে বলতে চাইছে। কারারুদ্ধ অবস্থায় কি দুঃখে তার দিন কাটত, তাই নিয়েই দু-একটা গল্প করছে। ওঃ, সে ভারি দুঃখের দিন! যন্ত্রণায় তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে সে বেঁচে গেল, এইটেই অবাক কাণ্ড। একবার ধরা পড়বার পর কি আর কাউকে ওরা ছেড়ে দেয়? নেহাত কিনা তার কপাল ভালো, তাই সে ছাড়া পেয়ে গেছে। যে-লোকটাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, তার জায়গায় অবশ্য এক-জনকে ছেড়ে দেবার কথা। কিন্তু সে-একজন যে বারাব্বাসই হবে তা কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? ভাগ্যই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভাগ্য! তাতে আর তার সন্দেহ নেই। আর তাই বন্ধুরা যখন আনন্দে তার পিঠ চাপড়াতে লাগল, হুল্লোড় করতে লাগল তার চতুর্দিকে, তার আর তখন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা রইল না। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার, পাত্রের পর পাত্র সে নিঃশেষ করে চলল। যত নেশা, ততই আনন্দ। যত আনন্দ, ততই উন্মাদনা। গরম পড়েছে। গাত্রাবাস খুলে ফেলে সে তাই মাটির উপরে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আনন্দে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পাশের মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে সে কাছে টেনে নিল। মেয়েটি হেসে উঠল; বারাব্বাসের কণ্ঠালিঙ্গন করল সে। মোটা মেয়েটি তাকে সরিয়ে দিল। তারপর বলল যে, হ্যাঁ, এতক্ষণে বারাব্বাস ধাতস্থ হয়েছে; সুস্থ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন বন্দী-জীবন যাপনের জন্যে মন তার অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে তার অবসাদ কাটল। বারাব্বাসের সারা মুখ সে চুমুতে ভরে দিল; আদর করে তার ঘাড়ের উপরে মৃদুমন্দ কয়েকটি টোকা মেরে তারপর তার লালচে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে লাগল। এতক্ষণে বারাব্বাস স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সবাই তাতে সুখী। যেটুকু-বা সঙ্কোচ ছিল এতক্ষণ, তা-ও আর রইল না। মদ খেয়ে তারা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে; সর্বশরীরে নেশা আর আনন্দের একটা তীক্ষ্ণ আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে তারা অস্থির হয়ে উঠল। মাসের পর মাস তারা মদ খায়নি, স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে আসেনি। লোকসানটাকে তাই এখন বেশ চড়া হারে পুষিয়ে নিচ্ছে। আর বেশি সময় নেই, একটু বাদেই তারা পাহাড়ে ফিরে যাবে। জেরুসালেমে আসার আনন্দটাকে তাই তারা পূর্ণ করে নিতে চায়। শুধু তাই নয়, তার উপরে আবার বারাব্বাস ছাড়া পেয়েছে; আনন্দটা আজ পুরোমাত্রায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঝাঁঝালো কড়া মদে তাদের শিরায়-শিরায় আগুন জ্বলে উঠেছে। মোটা মেয়েটি বাদে বাদবাকি আর

সব কটি মেয়েকেই তারা একের পর এক ভিতরের দিককার একটি পর্দার আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। খানিক বাদে যখন ফিরে এল, তখন তাদের জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে; মুখ রক্তবর্ণ। যে-যার মদের পাত্র নিয়ে ফের তারা কলরবে মত্ত হয়ে উঠল। আনন্দটাকে তারা পুরোমাত্রায় সম্ভোগ করতে চেয়েছিল; তা-ই করেছে।

উৎসব যখন সাঙ্গ হল, চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। লোক দুটি উঠে দাঁড়াল। এবারে তারা বিদায় নেবে। পশুচর্মের গাত্রাবাসে সর্বাঙ্গ আবৃত করে নিয়ে সবাইকে তারা তাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাল। তারপর বেরিয়ে গেল। রাস্তা তখন প্রায় অন্ধকার। মেয়ে তিনটিও একটু বাদেই পর্দার পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। নেশায় তারা টলছে, সর্বাঙ্গ অবসন্ন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল। এ-ঘরে তখন আর অন্য-কেউ নেই। শুধু সেই স্থূলাঙ্গিনী মেয়েটি, আর বারাব্বাস। মেয়েটি বলল, তাদেরও একটু আনন্দ করা উচিত। বারাব্বাসের উপর দিয়ে যন্ত্রণার যে ঝড়ঝাপটা গিয়েছে, তাতে তার এখন একটু আনন্দেরই প্রয়োজন। শুধু কি কারাবাসের যন্ত্রণা? আর একটু হলেই তার মৃত্যু ঘটত। তার এখন তাই আনন্দ করাই দরকার। মেয়েটি তাকে ছাদের উপরে নিয়ে গেল। তালপাতার ছাউনি দিয়ে সেখানে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। এটি তার গ্রীষ্মাবাস। সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়ল তারা। মেয়েটি একটু আদর করল বারাব্বাসকে। বারাব্বাস তাতে উন্মত্ত হয়ে উঠল। এত আনন্দ, এ-যেন সে ছেড়ে যেতে চায়নি। চতুর্দিকের কোন-কিছুর সম্পর্কেই তাদের আর তখন এত-টুকুমাত্র চেতনা নেই। অর্ধেক-রাত এভাবেই কাটল।

মেয়েটি তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। বারাব্বাস শুধু জেগে রইল। চোখে তার ঘুম নেই, দৃষ্টি তার আকাশের দিকে নিবন্ধ। এতক্ষণে তার আবার মনে পড়ল সব। বধ্যভূমিতে আজ যা-কিছু ঘটেছে সবই তার মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই মানুষটিকে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে আজ প্রাণ দিয়েছে। আর সেই অন্ধকার! সত্যিই কি আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল? তার কোন ভুল হয়নি তো? নাকি শুধু গলগথায় অন্ধকার নেমেছিল? তাই হবে বোধ হয়। এখানে তাই ওরা কিছুই টের পায়নি। সান্ত্রীরা যে তখন ভয়ে চমকে উঠেছিল, বারাব্বাসের তা স্পষ্ট মনে আছে। না-কি তা-ও ভুল? সবই কি সে ভুল দেখল? আশ্চর্য! আবার তার সেই লোকটির কথা মনে পড়ল। ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটি। বারাব্বাসের ঘুম এল না। চুপ করে সে শুয়ে রইল। মাথার উপরে তালপাতার ছাউনি; তার মধ্য দিয়ে আকাশ দেখা যায়। তারাহীন অন্ধকার আকাশ। নীরন্ধ্র অন্ধকার।

শুধু গলগথায় নয়, চতুর্দিকেই এখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

পরের দিন শহর ঘুরতে বার হয়ে শত্রু-মিত্র অনেকের সঙ্গেই দেখা হল বারাব্বাসের। প্রায় সকলেই তাকে দেখে বিস্মিত হল। দু-একজন তো এমন ভাব দেখাল যেন তারা ভূত দেখেছে। বারাব্বাসের সেটা মোটেই ভালো লাগল না। এরা কি জানে না যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? তার জায়গায় যে আর-একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, তা এরা বুঝবে কখন?

প্রখর রৌদ্রে চারদিক ঝলমল করছে। চোখে তার আলো সয় না; বারাব্বাসের তাই অস্বস্তি লাগতে লগল। এতদিন সে এক অন্ধকূপে বন্দী হয়ে ছিল, চোখ দুটি তাই হয়ত নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে। নয়ত আলো সয় না কেন? ছায়ায় ছায়ায় সে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা মন্দিরের দিকে চলে গেছে। একটু এগিয়েই সারি সারি কয়েকটি স্তম্ভ। সেগুলিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে একটি তোরণের তলায় গিয়ে বসল। জায়গাটা ছায়াবৃত। মনে হল, তার চোখের সেই যন্ত্রণার যেন এতক্ষণে একটু উপশম হয়েছে।

বারাব্বাস দেখল অপরিচিত কয়েকজন লোক তার আগেই সেখানে এসে বসে আছে। নিজেদের মধ্যে কি-যেন তারা বলাবলি করছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, তাকে দেখে তারা খুশি হয়নি। এমনিতেই তারা নিচু গলায় কথা কইছিল, স্বরটিকে এবারে আরও নিচুতে নামিয়ে আনল। মাঝে মাঝে চোরা-চাউনি হানতে লাগল তার দিকে। মাথামুণ্ড কি-যে ওরা বলাবলি করছে, কিছুই বোধগম্য হল না তার। ছাড়া-ছাড়া এক-আধটা কথা শুধু শুনতে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। বোধ হয় কোন শলা-পরামর্শ করছে। করুক। বারাব্বাসের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। লোকগুলোর মধ্যে একজন তার সমবয়সী হবে। তাঁরও মুখে লালচে দাড়ি। চুল পর্যন্ত লালচে। চুলগুলি বেশ দীর্ঘ, আর কোঁকড়ানো; দাড়ির সঙ্গে এসে মিশে গেছে। মুখখানা ভরাট, আর বেশ গোলগাল। সব মিলিয়ে একটু ভারিক্কি গোছের চেহারা। হাত দুটি রুক্ষ, বেশ-ভূষা অপরিচ্ছন্ন। কারিগর বোধ হয়। মোট কথা, যে-ই হোক, আর যা-ই হোক, বারাব্বাসের তাতে লাভ কি? কিছুমাত্র লাভ নেই। তা সত্ত্বেও সে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। চেহারায় তাঁর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই; তবু। তবে হ্যাঁ, বারাব্বাস ভাবল, চোখ দুটি ভারি নীল।

লোকটি যেন কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন; দেখে শুনে অন্তত তা-ই মনে হয়। আর সবারও সেই একই অবস্থা। পরিচিত কেউ বোধ হয় মারা গিয়ে থাকবে; তাই নিয়েই বোধহয় কথাবার্তা কইছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। বারাব্বাস তাতে বিস্মিত হল। ছিঃ-ছিঃ, পুরুষ হয়েও এরা এত দুর্বল? সে জানত মেয়েরাই শুধু কাঁদে। পুরুষরাও যে কাঁদতে পারে তা তার জানা ছিল না। এতদিনে জানল।

তখনও ওরা কথা কয়ে চলেছে। যাকে নিয়ে তাদের এই আলোচনা, মাত্র কালই নাকি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। কালই—?

কে সে? কে? উৎকণ্ঠ হয়ে উঠল বারাব্বাস, আর-কিছু যদি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু না, ততক্ষণে ওরা ফের গলা নামিয়ে নিয়েছে।

চারদিকে লোকজনের ভিড়। চিৎকার, হট্টগোল। সব কথা তাই তার কানে গেল না। কিন্তু যে-টুকু গেল তাতেই সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, সেই লোকটির সম্পর্কেই ওরা কথা কইছে। সেই লোকটি বারাব্বাসের বদলে যে কাল—

কি আশ্চর্য! একটু আগে সে নিজেও যে ঠিক এই চিন্তাই করছিল। এই সেই জায়গা, এখানেই সর্বপ্রথম সে তাকে দেখতে পায়। আর ঐ যে জায়গাটি, লোকটা ওখানে ক্রুশের ভারে নুয়ে পড়েছিল। তা-ও তার মনে আছে। আর তাই ঘুরে ফিরে সেই একটি লোকের কথাই সে চিন্তা করে চলেছে। কিন্তু ওরাও কি সেই একই লোকের কথা বলাবলি করছিল এতক্ষণ? কি আশ্চর্য! তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কি? আর ওরা অত ফিসফিস করেই বা কথা বলছে কেন? লোহিতশ্মশ্রু ওই ভারিক্কি লোকটির কথাই শুধু মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়, বাদবাকি কারুর কথাই না।

ওরা কি—ওরা কি সেই অন্ধকারের সম্পর্কেও কিছু বলছে? কাল সেই লোকটা যখন মারা গেল, চারদিক তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়েও কি ওরা আলোচনা করছে?

উৎকণ্ঠার অস্থির হয়ে উঠল বারাব্বাস। তার এই অস্থিরতা তাদের চোখ এড়াল না। তৎক্ষণাৎ তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। বহুক্ষণ আর-কোন কথা নেই। বারাব্বাস বেশ স্পষ্টই বুঝতে পরল যে, চোরা-চাউনি হেনে তারা তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। তারপর কি-যেন বলাবলি করল তারা, বারাব্বাস তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারল না। খানিক বাদে ভারিক্কি লোকটির কাছ থেকে তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। সবসুদ্ধ তারা চারজন। চারজনের একজনকেও বারাব্বাসের ভালো লাগল না।

এবারে আর অন্য কেউই নেই। তারা দুজন শুধু বসে আছে। সে আর ভারিক্কি সেই লোকটি। বারাব্বাসের ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু কিভাবে যে আলাপ শুরু করবে, সেইটেই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। লোকটিকে দেখে চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়। আপন মনেই তিনি ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, মাথা নাড়ছেন। খুব সরল লোক নিশ্চয়ই। মনের ভাব তাই গোপন রাখতে পারছেন না। বারাব্বাস আর থাকতে পারল না—সরাসরি তাঁকে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করল। প্রশ্ন শুনে তিনি বারাব্বাসের দিকে তাকালেন। চোখ দুটি নীলাভ। মনে হল, একটু বিস্মিতও বা। খানিকক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপর জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন বারাব্বাসকেঃ

—তুমি কি জেরুসালেমেই থাক?

—না, এখানে নয়।

—কিন্তু তোমার কথা শুনে তো তা-ই মনে হয়।

বারাব্বাস তখন বলল যে তার বাড়ি এখান থেকে খুব দূরে নয়, কথাবার্তায় তাই হয়ত জেরুসালেমের টান এসে গিয়ে থাকবে। সে থাকে পূর্বদিকের ঐ পাহাড়ে।

শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। জেরুসালেমের লোকদের তিনি বিশ্বাস করেন না। বিন্দুমাত্রও না। এরা সব ডাকাত; শয়তানিতে এদের জুড়ি নেই। বারাব্বাস তা শুনে একগাল হাসল। বলল যে, তারও সেই একই কথা।

—কিন্তু আপনি কোথাকার লোক তা তো বললেন না?

—আমি? আমার বাড়ি অনেক দূরে।

বলতে বলতে তাঁর নীলাভ চোখ দুটি ফের উদাস হয়ে উঠল। বারাব্বাসকে তিনি জানালেন যে, নিজের গ্রাম ছেড়ে তাঁর এখানে আসবার কিছুমাত্রও ইচ্ছে ছিল না। শুধু এই জেরুসালেমেই নয়, কোনখানেই তিনি যেতে চাননি। তা সত্ত্বেও তাঁকে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কি করবেন তিনি, তাঁর এতে কোন হাত ছিল না। বলে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আর কি কখনও তাঁর বাড়ি ফেরা হবে? বড় ইচ্ছে ছিল, জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। তা কি আর তাঁর ভাগ্যে ঘটবে?

বারাব্বাসের বড় আশ্চর্য লাগল। প্রশ্ন করলঃ

—কেন, আপনার বাধা কোথায়? ইচ্ছে করলেই তো আপনি বাড়ি ফিরতে পারেন। পারেন না?

—না।

—সে কি! যেতেই যদি চান তো আপনাকে আটকে রাখবে কে? নিজের ইচ্ছেটাই তো হল আসল কথা।

—না। চিন্তিত বিষণ্ণ গলায় তিনি বললেন—তা সত্যি নয়।

—কিন্তু এখানে থেকেই বা আপনার লাভ কি?

চট করে তিনি তার কোন জবাব দিলেন না। একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ধীরে ধীরে বললেনঃ

—আমার প্রভুর তাই ইচ্ছে।

—প্রভু!—বারাব্বাস যেন চমকে উঠল।

—হ্যাঁ, আমার প্রভু। তা তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?, তুমি কি তাঁকে চেন না?

—না।

—সে কি! সত্যিই তাঁকে চেন না নাকি? গলগথার পাহাড়ে কাল তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তাও শোনোনি?

—ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে! কই, জানি না তো। কিন্তু কেন, ক্রুশবিদ্ধ করা হল কেন?

—এ তাঁর ভাগ্য।

—ভাগ্য! তাতে কি বলা হয়েছিল যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে?

—হ্যাঁ। আর শুধু তাই নয়, নিজেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একদিন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েই মৃত্যুবরণ করবেন। ধর্মগ্রন্থেও তার উল্লেখ ছিল।

—তাই নাকি? বারাব্বাস যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু জানাল যে, ধর্মগ্রন্থ সে কখনও পাঠ করেনি। তাই এ-সব জানে না।

—আমিও পড়িনি। তবে শুনেছি সেখানে এর উল্লেখ আছে।

হবেও বা, বারাব্বাস ভাবল। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার খটকা গেল না। এমন কি তিনি করেছিলেন যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করবার প্রয়োজন হল? ব্যাপারটা তার অদ্ভুত লাগছে।

—আমারও লাগছে। কেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করতে গেলেন, আমিও তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মরলেনই যদি তো অমন বীভৎসভাবে মরতে গেলেন কেন? তবে হ্যাঁ, একটা কথা। নিজেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এভাবেই তাঁকে মরতে হবে। এ-মৃত্যু তাঁর ভাগ্য। ভাগ্যকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

বিষণ্ণভাবে তিনি মাথা দোলাতে লাগলেন। তারপর অস্ফুট গলায় বললেনঃ

—এ তিনি নিজেই জানতেন। বহুবার তিনি বলেছেন যে, আমাদের মঙ্গলের জন্যেই তাঁকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, আমাদের কল্যাণের জন্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

—আমাদের জন্যে? বারাব্বাস এবারে চোখ তুলে চাইল। দৃষ্টিতে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

—হ্যাঁ, আমাদেরই জন্যে। আমাদেরই জন্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি নির্দোষ, নিষ্পাপ। তা সত্ত্বেও যে তিনি এই তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে তারপর এই বীভৎস মৃত্যুকে বরণ করলেন, এ শুধু আমাদেরই জন্যে। তিনি অপরাধী নন, অপরাধী আমরাই। অপরাধের শাস্তি মৃত্যু। আমাদেরই তাই মরবার কথা। নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তিনি সেই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাদের সকল অপরাধের শাস্তি তিনি তাঁর নিজের উপরেই তুলে নিয়েছেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বারাব্বাস। দৃষ্টি তার পথের দিকে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টি শূন্য, অর্থহীন।

—তাঁর কথার তখন অর্থ বুঝতে পারিনি। এখন পারছি। সব-কিছুই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

—আপনি তাঁকে খুব ভালোভাবেই চিনতেন বুঝি? বারাব্বাস শুধোল।

—হ্যাঁ, খুব ভালোভাবেই চিনতাম। গোড়া থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

—আপনারা বুঝি একই জায়গার লোক?

সে-কথার তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনেই বলে চললেন—যখনই যেখানে তিনি যেতেন, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছি।

—কেন?

—কেন? তাঁকে একবার দেখলে পর আর এ-প্রশ্ন তুমি করতে না।

—তার মানে?

—মানে আর অন্য কিছুই নয়, তাঁর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে ক্ষমতা অলৌকিক। যখনই যাকে তিনি বলেছেন 'আমাকে অনুসরণ কর', তৎক্ষণাৎ সে তাঁকে

অনুসরণ করেছে। তাঁর সেই নির্দেশ কেউ কখনও অমান্য করতে পারেনি। সে এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁকে তুমি চেন না। চিনলে তুমিও সেই ক্ষমতার খানিকটা পরিচয় পেতে। বিনা বাক্যব্যয়েই তোমাকে তখন তাঁর অনুসরণ করতে হত।

বারাব্বাস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল:

—তা যদি সত্যি হয় তো তিনি এক আশ্চর্য লোক ছিলেন বলতে হবে। কিন্তু, তাই-বা কেমন করে মেনে নিই? অতই যদি ক্ষমতা ছিল তো তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা পড়লেন কেন?

—ঐখানেই তোমার ভুল হচ্ছে। এ ভুল আমিও করেছিলাম। তার জন্যে এখন আমার অনুশোচনার অন্ত নেই। ব্যাপারটাকে পরে আমি বেশ ভালোভাবে বিচার করে দেখেছি। আর-পাঁচজন জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গেও এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে; তাঁর এই বীভৎস মৃত্যুর তাৎপর্য যে কি, তা নিয়ে তাই আর এখন আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। এই যে মৃত্যু, এ তিনি আমাদের জন্যেই বরণ করে নিয়েছেন। আমাদের কল্যাণেই নিজে নিরপরাধ হয়েও তিনি নরকযন্ত্রণা সহ্য করেছেন। কিন্তু হ্যাঁ, একদিন তিনি আবার ফিরে আসবেন; পূর্ণ গৌরবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি আজ মৃত। কিন্তু সেদিন তিনি পুনর্জীবন লাভ করবেন। এ আমরা জানি।

—মৃত হয়েও পুনর্জীবন লাভ করবেন! কি বলছেন আপনি? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—কিছুমাত্র না। অনেকের ধারণা, আগামীকাল সকালেই তিনি পুনর্জীবিত হয়ে উঠবেন; তার কারণ, মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনেই তাঁর নবজন্মলাভের কথা। তিনি নিজেই নাকি এ-কথা বলে গেছেন। বলেছেন যে, মাত্র তিনদিন তিনি নরকে অবস্থান করবেন; তারপর আবার ফিরে আসবেন। আমি অবশ্য নিজের কানে এ-কথা শুনিনি। কিন্তু তাতে কি, আর-পাঁচজন শুনেছেন। আগামীকাল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে—।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বারাব্বাস মাথা নাড়ল।

—তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না।

—কেমন করেই বা হবে? তুমি তাঁকে চেন না, তাই অবিশ্বাস করছ। চিনলে করতে না। আমরা তাঁকে চিনি, তাই বিশ্বাস করি। না-করবার কোনও কারণ নেই। অন্যের মৃতদেহে যিনি প্রাণসঞ্চার করতে পারেন, নিজে বেঁচে-ওঠা কি তাঁর কাছে খুব দুঃসাধ্য কাজ?

—মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার! তাও কি তিনি করেছেন নাকি?

—বিলক্ষণ; এ আমার স্বচক্ষে দেখা।

—সত্যি?

—সত্যি। ইচ্ছে করলে তিনি সবই করতে পারেন। সে ক্ষমতা তাঁর আছে। নিজের স্বার্থেও সেই ক্ষমতাকে তিনি কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি; কোনদিনই করেননি। সেইটেই এক আশ্চর্য রহস্য। এতই যদি তাঁর ক্ষমতা ছিল তো অন্যের হাতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন কেন? এ বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ। আমিও এ নিয়ে ভেবে দেখেছি, কিন্তু কোন কুলকিনারা করে উঠতে পারিনি।

—সত্যিই কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ফের বেঁচে উঠবেন?

—নিশ্চয়ই করি। এ আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস। তিনি যে ফের বেঁচে উঠবেন, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। আবার তিনি ফিরে আসবেন, আবার তিনি পূর্ণ-মহিমায় আবির্ভূত হবেন। এ শুধু আমার কথাই নয়—যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা পণ্ডিত,

তাঁরাও এ-কথা বিশ্বাস করেন। সে এক পরমলগ্ন আর সেই পরমলগ্ন থেকেই এক নবযুগের সূচনা হবে। মানবপুত্র তখন আপন হাতে তাঁর রাজ্যভার তুলে নেবেন।

—মানবপুত্র?

—হ্যাঁ, নিজেকে তিনি সেই নামেই অভিহিত করেছিলেন।

—মানবপুত্র—!

হ্যাঁ, তাই। তবে অনেকে আবার বিশ্বাস করেন যে—কিন্তু না, তা আমি বলতে পারব না।

বারাব্বাস এবারে আরো খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

—কি তাঁরা বিশ্বাস করেন?

—বিশ্বাস করেন যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরেরই পুত্র।

—ঈশ্বরেরই পুত্র?

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তাও কি কখনও সত্যি হয়? শুনে আমার ভয়-ভয় করত। তার চাইতে বরং যেমনটি তিনি ছিলেন তেমনটিই যদি ফিরে আসেন, তাহলেই আমি সব চাইতে খুশি হব।

বারাব্বাস ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

—যত সব বাজে কথা। ঈশ্বরপুত্র হলে কি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা যেত? ঈশ্বরপুত্র! আপনিও কি তাই বিশ্বাস করেন নাকি?

—না। সে-কথা আমি আগেই বলেছি। চাও তো আমি আবার বলতে পারি।

বারাব্বাস সে-কথায় কান দিল না। সে এখন অত্যন্তই উত্তেজিত। উত্তেজনায় তার চোখের নিচের সেই কাটা-দাগটি এখন লাল হয়ে উঠেছে। একটানা সে বলে যেতে লাগলঃ

—এ যারা বিশ্বাস করে তারা পাগল, তারা বদ্ধপাগল! যত সব বুজরুকি! ঈশ্বরপুত্র! এখানকার এই গাঁয়ে-গঞ্জে তিনি ধর্মপ্রচার করতে এসেছেন! যত সব অসম্ভব কথা।

—না না, অসম্ভব হবে কেন! খুবই সম্ভব। আমি নিজে অবশ্য বিশ্বাস করি না; কিন্তু এও জানি যে এটা অসম্ভব কিছু নয়। তুমি ভাবছ এত জায়গা থাকতে তিনি এখানে এলেন কেন? কেমন, এই তো? তা কোথাও-না-কোথাও তো তাঁকে আসতেই হত? না হয় এখানেই এলেন, এখান থেকেই তাঁর কাজ শুরু করলেন! না না, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

বারাব্বাসের ইচ্ছে হল হো হো করে সে হেসে ওঠে; কিন্তু হাসল না। তার এখন বড় অবসন্ন লাগছে। গায়ে তার পশুচর্মের জামা, অধৈর্য হয়ে সে তার কাঁধের কাছটাতে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

—শুধু তা-ই নয়, তাঁর মৃত্যুর সময় যে-সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে সে-কথাটাও একবার ভেবে দেখ।

—কিসের আশ্চর্য ব্যাপার?

—সে কি, তুমি জান না? চারদিক যে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, কেউ তোমায় তা বলেনি?

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল বারাব্বাস। সত্যিই তাহলে অন্ধকার নেমে এসেছিল?

—আর শুধু অন্ধকারই নয়, ভূমিকম্পও হয়েছিল তখন। গলগথা পাহাড়ের উপরে ক্রুশটাকে যেখানে পোঁতা হয়েছিল, সে-জায়গাটা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গিয়েছে।

—হতেই পারে না। এ আপনি বানিয়ে বলছেন। কি করে আপনি জানলেন

যে জায়গাটা ফেটে গেছে? আপনি কি তা চাক্ষুষ দেখেছেন? আপনিও কি সেখানে ছিলেন নাকি? ওকি, অমন চুপ করে রইলেন কেন?

হঠাৎ সেই লোকটির মুখের চেহারা যেন আমূল পালটে গেল। মনে হল তিনি লজ্জা পেয়েছেন, অস্বস্তি বোধ করছেন। বারাব্বাসের দিকে একবার তাকিয়েই তিনি তাঁর চোখ নামিয়ে নিলেন। ম্লানকণ্ঠে বললেনঃ

—নিজে আমি কিছুই দেখিনি। সত্যি-মিথ্যে কিছুই আমি জানিনে।

বহুক্ষণ আর তিনি কথা কইলেন না, চুপ করে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে লাগল। তারপর একসময় বারাব্বাসের গায়ের উপর তিনি হাত রাখলেন। ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুটস্বরে তিনি বললেনঃ

—তিনি আমার প্রভু। কিন্তু এই বীভৎস মৃত্যুকে যখন তিনি বরণ করে নেন তাঁর সেই নিদারুণ যন্ত্রণার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। ভয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলাম। কারণ আমি ভীরু। প্রাণভয়টাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। আর শুধু তা-ই নয়, তিনি যে আমার প্রভু তা-ও আমি অস্বীকার করেছি। কি করে তিনি আমায় ক্ষমা করবেন? আমার এই পাপের জন্যে যখন তিনি কৈফিয়ত চাইবেন, কি উত্তর আমি দেব?

লজ্জায় তিনি মুখ ঢেকে ফেললেন; নিরুদ্ধ একটা আবেগে তাঁর সর্বশরীর আন্দোলিত হতে লাগল।

—এ পাপ আমি কেন করলাম? কেমন করে করলাম?

বহুক্ষণ পর তিনি মাথা তুললেন। বারাব্বাস দেখল তাঁর সেই আয়ত নীল চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

—কি আমার দুঃখ, তুমি জানতে চেয়েছিলে। এবারে জেনেছ। আমি যে কেমন লোক, তাও জেনেছ। আমার ঈশ্বর আর আমার প্রভুও তা জানেন। আমি ভীরু। আমি অপরাধী। আমার এই অপরাধ কি তাঁরা ক্ষমা করবেন?

বারাব্বাস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে জানাল যে, নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁকে ক্ষমা করবেন। তার অন্তত তা-ই বিশ্বাস। এ-কথা সে অত ভেবেচিন্তে বলেনি; বললে তিনি খুশি হবেন তাই বলল। আর তাছাড়া অনুতপ্ত এই লোকটিকে তার ভালোই লেগেছে; যদিও, কেন যে তাঁর এই অনুতাপ, তা সে জানে না। এমন কোন অপরাধ তিনি করেননি যে এত মুষড়ে পড়তে হবে। আত্মরক্ষার জন্যে তিনি তাঁর সঙ্গীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কে না করে?

বারাব্বাসের হাত দুটিকে তিনি তাঁর মুঠোয় তুলে নিলেন। তারপর অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় তাকে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেনঃ

—সত্যিই কি তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন? সত্যি বলছ তুমি?

রাস্তা দিয়ে একদল লোক যাচ্ছিল তখন। লোহিতশ্মশ্রু দীর্ঘকায় সেই লোকটিকে দেখে তারা কাছে এগিয়ে এল। বারাব্বাসের উপরে তাদের নজর পড়েনি প্রথমটায়। এবারে পড়ল। মনে হল তারা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বিস্ময় কাটতেই তারা চেঁচিয়ে উঠলঃ

—এ-কি, এ আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন? একে কি আপনি চেনেন না?

—শান্ত গলায় তিনি বললেনঃ

—না। একে আমি চিনি না। তবে হ্যাঁ, এ বড় দয়ালু মানুষ, দু-দণ্ড কথা কয়ে আমি বড় শান্তি পেয়েছি।

—সে-কি, এ যে সেই লোক! এরই বদলে যে আমাদের প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে!

বারাব্বাসের হাত দুটি তাঁর মুঠোর মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি সরে দাঁড়ালেন। হাত দুটিকে তিনি মুক্ত করে দিলেন। মনে হল তিনি ভয় পেয়েছেন। তাঁর সেই ভীতত্রস্ত ভাবটিকে যেন আর লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। অন্যেরাও ভয়ত্রস্ত; তবে সেই ভয়কে তারা লুকিয়ে রাখেনি। রাখবার কোন চেষ্টাও করেনি। উত্তেজনায় তারা হাঁপাচ্ছে। বারাব্বাসকে তারা পরিহার করতে চায়। সে এখন চলে গেলেই তারা বাঁচে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল; লজ্জায় কুণ্ঠায় সে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ—দূর হও নাস্তিক! দূর হও!

এরই জন্যে বোধহয় অপেক্ষা করছিল বারাব্বাস। জামাটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সে গিয়ে রাস্তায় নামল। নিঃসঙ্গ রৌদ্রদগ্ধ পথ। একা একা সে সামনে এগিয়ে চলেছে! একবারও সে পিছনে তাকাল না।

ঠোঁট-কাটা সেই মেয়েটির সে-রাতে ঘুম এল না। একটু বাদেই রাত পোহাবে, সূর্য উঠবে। কি-এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে তখন, নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তাই চিন্তা করতে লাগল। আজ আর সে ঘুমোবে না; সারারাত সে জেগে থাকবে।

ডাঙ্ গেটের বাইরে একটা গর্ত-মতন জায়গা; খড়কুটোর শয্যা পেতে সে সেখানে শুয়ে আছে। আশেপাশে রুগ্ন ভিখারীদের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেও তাদের শান্তি নেই। কুষ্ঠরোগী একটি ভিক্ষুকও থাকে সেখানে। ব্যাধির যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, সে আর তখন শুয়ে থাকতে পারে না; যন্ত্রণায় উঠে দাঁড়ায়। তার ঘণ্টাটি থেকে তখন টুং টাং শব্দ ভেসে আসে। মেয়েটি এখন সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চতুর্দিকে স্তূপীকৃত আবর্জনা; বাতাসে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেছে। গন্ধটা আগে অসহ্য লাগত, দম আটকে আসত। এখন আর আসে না। সব-কিছুই এখন তার সহ্য হয়ে এসেছে। কারুরই বোধ হয় আর-কোন অসুবিধে হয় না।

—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—

কি হবে? রোগীরা সব সুস্থ হয়ে উঠবে; অভুক্তরা সব খেতে পাবে। কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায়না। এ-ও কি সম্ভব? স্বর্গের দরজা খুলে যাবে, দেবদূতেরা সব পৃথিবীতে নেমে এসে সবাইকে খাদ্য বিলিয়ে যাবে। সবাইকেই? সবাইকে না হোক, গরিবদের তারা খাওয়াবেই। বড় লোকেরাও অবশ্য অভুক্ত থাকবে না। আর যারা গরিব, সত্যিই যারা ক্ষুধার্ত, দেবদূতেরা এসে তাদের খাইয়ে যাবে। এখানে এই ডাঙ্ গেটের সামনেকার এই জমির উপরে সাদা আর বিরাট একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হবে। তার উপরে পরিবেশন করা হবে খাদ্য। তারপর সবাই খেতে বসবে। সবাই। কেউই তার থেকে বাদ যাবে না। বিশ্বাস করাটা একটু শক্ত। কিন্তু শক্তই-বা কেন? সব-কিছুই তখন পালটে যাবে, কোন-কিছুই আর এই আজকের মতো থাকবে না। কোন-কিছুই না।

তার এই পোশাকটাও কি তখন পালটে যাবে? হয়ত সাদা হয়ে যাবে, কিংবা হয়ত নীল। ঈশ্বরপুত্র পুনর্জীবন লাভ করবেন; তাই এক নতুন যুগের সূচনা হবে। পালটে দেবেন, সব-কিছুকেই তিনি পালটে দেবেন।

শুয়ে শুয়ে সে তাই চিন্তা করতে লাগল।

কাল—কাল সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—। তার ভাগ্য ভালো যে কথাটা সে শুনতে পেয়েছে।

কুষ্ঠরোগীর ঘণ্টাধ্বনি এবার কাছে এগিয়ে এসেছে। লোকটাকে সে চেনে। দিনের বেলায় কেউ তাকে এখানে আসতে দেয় না। শুধু যে তাকেই দেয় না তা নয়, কাউকেই

না। উপত্যকার নিচের দিকে খানিকটা জায়গা তাদের জন্যে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই তারা থাকে। রাত্তিরে সে লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে উঠে এসেছে। লোকটি এখন একজন সঙ্গী চায়; জীবন্ত মানুষের সান্নিধ্য চায়। মেয়েটিকেও সে-কথা সে একদিন বলেছিল। তারার আবছা আলোয় তাকে আসতে দেখা যাচ্ছে।

মৃত্যুপুরী—সে জায়গা কেমন? সেখানেই তিনি এখন রয়েছেন। লোকে অন্তত তাই বলে। কেমন চেহারা জায়গাটার? সে তা জানে না।

পাশে যে-লোকটি শুয়ে আছে, সে শুধু বৃদ্ধই নয়, অন্ধও। ঘুমের মধ্যে সে একবার ককিয়ে উঠল। খানিক এগিয়ে রুগ্ন একটি যুবক। শুয়ে শুয়ে সে হাঁপাচ্ছে। সারাক্ষণ তার সেই শ্বাস-টানার শব্দ শোনা যায়। তার পাশে গ্যালিলির এক বুড়ী। একটা হাত তার অনবরত শুধু কাঁপে। ওর উপরে নাকি কিসের ভর হয়েছে। আশপাশের লোকদের ধারণা, ঝরনার কাছ থেকে যদি কেউ খানিকটা কাদামাটি এনে তাদের শরীরে তা ছুঁইয়ে দেয়, তাহলেই তারা ভালো হয়ে উঠবে। আবর্জনার থেকে এরা খাবার খুঁটে খায়। এরা ক্ষুধার্ত। কিন্তু তাতে কি? কাল থেকেই এদের দুঃখ ঘুচবে। ঘুমের মধ্যেও এরা এখন গোঙাচ্ছে। কাল থেকে আর গোঙাবে না। সব যন্ত্রণার তখন অবসান হবে, মেয়েটির আর আজ তাই কিছুমাত্র দুঃখ নেই।

স্বর্গ থেকে দেবদূতেরা সব নেমে আসবে। তাদের নিশ্বাস লেগে ঝরনার জল পবিত্র হয়ে উঠবে। যে-জলে অবগাহন করলে কোন রোগেরই আর-কোন চিহ্ন থাকবে না। কুষ্ঠরোগীরাও কি ভালো হয়ে উঠবে? নিশ্চয় উঠবে। কিন্তু—কিন্তু তাদেরও সেই ঝরনার জলে স্নান করতে দেওয়া হবে তো? সত্যিই দেওয়া হবে? কেউ তাদের কোন বাধা দেবে না? ভাবতেই যেন কেমন অবাক লাগে। ভারি অবাক লাগে।

কিংবা, এমনও হতে পারে, ঝরনার জলে হয়ত কিছুই হল না। তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না বোধ হয়। স্বর্গের দূতেরা হয়ত বাতাসে ভর দিয়ে এই গে-হিনম উপত্যকা, শুধু এই উপত্যকাই নয়—সারা পৃথিবীটাকেই একবার প্রদক্ষিণ করে আসবে। আর তাদের পাখার অবিশ্রান্ত ঝাপটে হাওয়ায়-হাওয়ায় যে ঝড় উঠবে, সেই ঝড়ের নিশ্বাসে বোধ হয় রোগ শোক আর দুর্ভাগ্য—কোন-কিছুরই আর-কোন চিহ্ন থাকবে না।

শুয়ে শুয়ে সে তাই ভাবতে লাগল সারাক্ষণ। ঘুম এল না।

প্রথম যেদিন সে ঈশ্বরপুত্রকে দেখেছিল, সেই দিনটির কথা এখন তার মনে পড়ছে। অত করুণা সে আর কারুর কাছে পায়নি। ইচ্ছে করলেই সে তাঁকে তার দুঃখমোচনের জন্যে অনুরোধ করতে পারত। তা সে করেনি। করতে চায়ওনি। অনায়াসেই তিনি তাকে সারিয়ে তুলতে পারতেন; সে-ক্ষমতা যে তাঁর ছিল, তা সে জানে। তবু সে তাঁকে বিরক্ত করেনি। সত্যিই যারা দুঃখী, সত্যিই যারা দুঃস্থ, তাদের সকলকেই তিনি সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি মহৎ। সে কেন তাঁকে তার নিজের কথা বলে বিরক্ত করতে যাবে? এজন্যেই সে কোন উপকার চায়নি।

তাঁর কথাগুলি তার এখন মনে পড়ছে, আর লজ্জা হচ্ছে। রাস্তার একপাশে ধুলোর মধ্যেই সে নতজানু হয়ে বসেছিল; দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। শান্ত গলায় বললেন:

—তুমিও কি আমার কাছে আশ্চর্য-কিছু প্রত্যাশা কর?

—না প্রভু, না। আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। অন্য আর-কোন প্রত্যাশাই আমার নেই।

শুনে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। বিষাদ-শান্ত দৃষ্টির আলোকে তার সবটুকু বেদনা তিনি মুছিয়ে দিলেন। তারপর তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন:

—তুমি আমার সাক্ষী রইলে।

অদ্ভুত! সব-কিছুই তার অদ্ভুত লাগছিল। কথাটার মানে কি? সাক্ষী রইলে! কিসের সাক্ষী। কিসের হয়ে সে সাক্ষ্য দেবে? কেমন করে দেবে? অবিশ্বাস্য।

তার কথাগুলিকে উপলব্ধি করতে তাঁর এতটুকুও অসুবিধে হয়নি। কেনই-বা হবে? তিনি যে ঈশ্বরপুত্র।

সবই তার আবার মনে পড়ছে এখন। তাঁর চোখের সেই ম্লান-বিষণ্ণ দৃষ্টি, তাঁর হাতের সেই মধুর সৌরভ, তা-ও।—নীল আকাশের দিকে সে এখন তাকিয়ে আছে; আর তার বিস্ফারিত দুই চোখে এসে নক্ষত্রের ছায়া পড়ছে। আঃ, এ-যে অনেক নক্ষত্র! বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার পর সে অনেক নক্ষত্র দেখেছে। অনেক, অনেক।—আচ্ছা, ওই নক্ষত্রগুলি আসলে কি? সে তা জানে না। শুধু জানে যে ঈশ্বরই ওদের সৃষ্টি করেছেন। মরুভূমির উপর যে-আকাশ, সে-আকাশে অনেক নক্ষত্র; পাহাড়ের উপরে যে আকাশ সেখানেও। গিলগলের পাহাড়েও। সে-রাতে কিন্তু সেখানে একটিও নক্ষত্র ছিল না। একটিও না।

তার আবার এখন বাড়ির কথা মনে পড়ছে। দু-পাশে দুটি দেবদারু গাছ, মাঝ-খানে তাদের বাড়ি। মাথার উপরে এক তীব্র অভিশাপ নিয়ে সে যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছিল, মা তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তারই দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কি করবেন তাঁরা, এছাড়া তাঁদের আর-কোন উপায় ছিল না। তারপর থেকেই তার এই দুর্দশার শুরু। বসন্তাগমে খেত-খামার তখন সবুজ হয়ে উঠেছে। সে-কথাও তার এখন মনে পড়ল। মনে পড়ল যে তার মা তখন ছায়াচ্ছন্ন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন; যে-লোকটি সেই অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করেছিল, তার কাছ থেকে যেন আত্মগোপন করতে চাইছিলেন তিনি।

কিন্তু এখন আর তা নিয়ে কোন দুঃখ নেই; সব-কিছুই এখন সহ্য হয়ে এসেছে।

অন্ধ লোকটি ততক্ষণে ঘুমের থেকে জেগে উঠেছে। কুষ্ঠরোগীর সেই ঘণ্টাধ্বনি বোধ হয় কানে পৌঁছেছে ওর।

—দূর হ! দূর হ এখান থেকে!—অন্ধকারেই সে চেঁচিয়ে উঠল—দূর হ! এখানে তোর কি দরকার?

ধীরে ধীরে, রাত্রির আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে, মিলিয়ে গেল সেই ঘণ্টাধ্বনি। অন্ধ তখন ফের শুয়ে পড়ল। কিন্তু চুপ করল না, চোখের উপরে হাত রেখে সে বিড়বিড় করতে লাগল।

মৃত্যুর পরে শিশুরাও কি সেই মৃত্যুপুরীতে গিয়ে পৌঁছয়? তা-ই বোধ হয়। কিন্তু যারা ভূমিষ্ঠই হয়নি, মাতৃজঠরেই যারা মারা গেছে, তারা? তারাও কি যায় নাকি সেখানে? না না, তা সম্ভব নয়। তারা কি অত যন্ত্রণা সইতে পারে? তাদের নিশ্চয়ই নেয় না। না কি, তাদেরও নিয়ে যায়? সে তা জানে না—কিছুই জানে না।

—তোমার সন্তান অভিশপ্ত হোক—।

নতুন যুগের সূর্যোদয় হতে চলেছে। এবারে নিশ্চয়ই তারা শাপমুক্ত হবে। হয়ত-বা তারা—কে জানে তা সত্যি কিনা—

তোমার—সন্তান—অভিশপ্ত হোক।

মনে পড়তেই সে শিউরে উঠল। আজকের এই রাত্রি কি আর পোহাবে না! কত দেরি সেই সূর্যোদয়ের!—মনে হল যেন যুগযুগান্তকাল সে এই বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে আছে, সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছে।—রাত্রি কি প্রায় শেষ হয়ে এল? তাই হবে। মাথার উপরকার নক্ষত্রগুলি এখন বহুদূরে সরে গেছে; বাঁকা চাঁদ গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। শহরের প্রাচীরটিকে এখান থেকে আবছা-আবছা দেখা যায়। এবার নিয়ে

তিনবার সেখানে সে মশাল জবলে উঠতে দেখেছে। তার মানে, শেষবারের মতো ওখানে প্রহরী-বদল হল। রাত্রি তাহলে শেষ হয়ে এসেছে। শেষ রাত্রি—।

মাউণ্ট অব অলিভের উপরে প্রভাতী তারাটি তার চোখে পড়ল। উজ্জবল ঝকঝকে নক্ষত্র, ঈষৎ বড়। ও-নক্ষত্রটি সে চেনে। কিন্তু আজ যেন ওটাকে বড় বেশি উজ্জবল দেখাচ্ছে। এত দীপ্তি সে আর কখনও দেখেনি। হাত দুটিকে সে তার শীর্ণ বুকের উপরে জড়ো করে আনল; তারপর যুক্তকরে ওই প্রভাতী তারাটির দিকেই সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দু-চোখে তার এক আশ্চর্য আভা জবলে উঠেছে।

তারপরেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, দ্রুতপায়ে কয়েক-পা সামনে এগিয়ে গিয়েই নিবিড় অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

রাস্তার ওপাশে একটি কাঁটাঝোপ; বহুক্ষণ ধরে একটি লোক সেখানে আত্মগোপন করে বসে রয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছিল সে-জায়গাটিকে ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সেদিকেই সে তাকিয়ে আছে। লোকটি আর অন্য-কেউই নয়, বারাব্বাস। মনে মনে সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আজকের এই রাত্রি বুঝি আর শেষ হবে না।

মৃতের পক্ষে যে পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয় তা সে জানে। তা সত্ত্বেও সে অপেক্ষা করছে। ব্যাপারটাকে সে আজ যাচাই করে নেবে। রাত থাকতে থাকতেই সে এখানে চলে এসেছে, কাঁটাঝোপের আড়ালে বসে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছে। নিজের আচরণে সে নিজেই ঈষৎ বিস্মিত। কেন সে এল এখানে? কি তার এমন দরকার পড়েছিল? যা-ই হোক, আর তা-ই হোক, তার তাতে কি? সে কেন এই উদ্ভট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে!

একটু বাদেই সেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটবার কথা। বারাব্বাস তাই আশা করেছিল অনেকেই তা দেখতে আসবে। সেইজন্যেই সে লুকিয়ে আছে; অন্য কেউ তাকে দেখে ফেলুক, তা সে চায় না। কেউই কিন্তু আসেনি, কেউই না। বারাব্বাসের কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল।

কিন্তু না, ওই তো, তার একটু সামনেই, রাস্তার ঠিক মাঝখানেই যেন কে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে। কি আশ্চর্য, সে তো কারুর পায়ের শব্দ শোনেনি। তাহলে ও এল কখন? স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না; তবে পোশাক দেখে মনে হয় স্ত্রীলোক। প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে বসে রয়েছে। অস্পষ্ট আর ধূসর একটি ছায়ামূর্তি।

ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। একটু বাদেই সূর্যের প্রথম রশ্মি এসে সমাধি-স্থানের উপরে বিদ্ধ হল। সমাধি-গহবর শূন্য, উন্মুক্ত। যে-বিরাট পাথরখণ্ডটি দিয়ে তার মুখ আটকে রাখা হয়েছিল, কে যেন সেটি সরিয়ে দিয়েছে।

এ-ও কি সম্ভব! স্তম্ভিত হয়ে গেল বারাব্বাস। নির্বাক স্তব্ধ চোখে সে শুধু সেই শূন্য গহবরের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে ওখানে সমাহিত করা হয়েছিল, তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। বিরাট ওই পাথরখণ্ডটি দিয়ে সমাধি-গহবরের মুখ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তা-ও দেখেছে। তাহলে?

একটু বাদেই তার হুঁশ হল। আসলে এ কিছু অলৌকিক কাণ্ড নয়। তার এখানে আসবার অনেক আগেই নিশ্চয় ওই পাথরটিকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমাধি-গহবরও নিশ্চয়ই এইমাত্র শূন্য হয়নি, বহুক্ষণ ধরেই শূন্য পড়ে আছে। কারা যে ওই পাথরটিকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, আর কারাই-বা তার মৃতদেহটিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তাও সে এবারে অনুমান করতে পারল। এ নিশ্চয়ই তাঁর শিষ্যদেরই কাণ্ড! রাতের অন্ধকারেই যে তারা কাজ হাসিল করে গেছে, তাতে আর

কোন সন্দেহ নেই। স্বচ্ছন্দে এখন তারা রটিয়ে বেড়াবে যে, প্রভু তাদের পুনর্জীবন লাভ করেছেন।

কথা ছিল, আজ সূর্যোদয়ের সময়েই সেই অলৌকিক কান্ড ঘটবে। তার শিষ্যরাই সে-কথা বলেছিল। অথচ নিজেরাই তারা আসেনি। কেন আসেনি, বারাব্বাস তা স্পষ্টই বুঝতে পারল। বুঝতে পারল যে, শিষ্যেরা এবারে সাধু সাজতে চাইছে।

এক-পা এক-পা করে বাইরে বেরিয়ে এল বারাব্বাস। সমাধি-গহ্বরটিকে সে আর-একটু কাছে গিয়ে দেখবে। অস্পষ্ট সেই ছায়ামূর্তিটি তখনও পথের উপরেই বসে রয়েছে। আর এক-পা এগিয়েই সে অবাক হয়ে গেল। কি আশ্চর্য!—এ-যে সেই ঠোঁট-কাটা মেয়েটি! বারাব্বাস আর এগোল না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। নিষ্পলক বিহ্বল চোখে মেয়েটি সেই শূন্যগহ্বর সমাধির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অন্য আর-কিছুকেই, অন্য আর-কাউকেই সে দেখতে পাচ্ছে না। ঠোঁট দুটি অল্প একটু খোলা; উপরের ঠোঁটের কাটা দাগটিকে এখন অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মেয়েটি তাকে দেখতে পায়নি।

বারাব্বাস যেন লজ্জা পেল। এমনভাবে যে ওকে দেখতে পাওয়া যাবে, তা সে ভাবতেই পারেনি। আর-একটি দিনের কথাও তার মনে পড়ল হঠাৎ; সে-দিনও কিন্তু মেয়েটির মুখ ঠিক এমনিই বিহ্বল দেখাচ্ছিল। আর বারাব্বাসও সেদিন ঠিক আজকের মতোই লজ্জা পেয়েছিল।—নাঃ, সে-সব কথা নিয়ে সে আর আজ মাথা ঘামাবে না।

মেয়েটিও এবার তাকে দেখতে পেয়েছে; দু-চোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে। সে যে এখানে আসবে মেয়েটি তা বোধ হয় আশাই করেনি। বারাব্বাস নিজেই কি পেরেছিল? নিজেই কি সে কিছু কম বিস্মিত?

বারাব্বাস যদি এমন একটা ভান করতে পারত যে সে কিছুই জানে না, নেহাতই ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে, জায়গাটার নাম পর্যন্ত সে জানে না, এমনকি এখানে যে কারুর সমাধি আছে তাও না,—তাহলে হয়ত সে খুশিই হত। কিন্তু ভান করা কি এতই সোজা? যদিই-বা করে, মেয়েটি কি তা বিশ্বাস করবে? করবে না। বারাব্বাস তা জানে। তা সত্ত্বেও সে তার চোখে-মুখে খানিকটা নিরীহভাব ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করল:

—এ কি তুমি! তুমি যে ওখানে বসে রয়েছ?

প্রশ্নটা তার কানেই গেল না। এমন কি, সে একটু নড়ল না পর্যন্ত। বিহ্বল বিস্ফারিত তার চক্ষু, দৃষ্টি তার সমাধি-গহ্বরের দিকে নিবদ্ধ। সেদিকে তাকিয়েই ধীরে ধীরে—যেন আত্মগতভাবে, সে একসময় বলে উঠল:

—ঈশ্বরপুত্র পুনর্জীবন লাভ করেছেন।

সামান্য কয়েকটি কথা। কিন্তু আশ্চর্য, তাতেই যেন বারাব্বাসের কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। কি একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি যেন তার শিরায় শিরায় জড়িয়ে উঠছে। তা সে চায় না, তা সে চায় না। মুহূর্তকাল সে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটু সামলে উঠে এগিয়ে গেল সেই সমাধি-গহ্বরের দিকে। শূন্যগহ্বর সমাধি; মৃতদেহের কোন চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নেই। কিন্তু তাতে কি! এ সে আগেই টের পেয়েছিল। ফিরে এসে দেখল মেয়েটি তখনও সেই একইভাবে রয়েছে; ভক্তি আর আনন্দে সারামুখ তার উদ্ভাসিত। বারাব্বাসের দুঃখ হল। বোকা মেয়ে, এদের কারসাজিটা সে বুঝতে পারেনি। কারসাজিটা বারাব্বাস ধরিয়ে দিতে পারে—এখ্‌খুনি দিতে পারে। কিন্তু থাক। এমনিতেই সে তাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে। আর দুঃখ দেবে না। আর তাই—যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবেই সে শুধোল:

—ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটি বুঝি বেঁচে উঠেছে? কেমন করে বাঁচল?

বিস্মিতভাবে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বারাব্বাস কি কিছুই জানে না? একটু আগেই স্বর্গের থেকে অগ্নিবসন এক দেবদূত এখানে নেমে এসেছিলেন। দুবাহু তাঁর সম্মুখে প্রসারিত। বাহু তো নয়, যেন বর্শাফলক। আর সেই বর্শাফলক এসে ওই সমাধিস্থানের উপরে বিদ্ধ হল; উন্মুক্ত হল তার আবরণ। এই অলৌকিক দৃশ্য সে তার নিজের চোখেই দেখেছে। কেন বারাব্বাস কি তা দেখতে পায় নি!

বারাব্বাস বলল—সে দেখতে পায় নি।

অস্বাভাবিক কোন-কিছু যে তাকে দেখতে হয়নি বারাব্বাস তাতে নিশ্চিন্ত বোধ করল। চোখ দুটি তার সেরে উঠেছে তাহলে। নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে। তার প্রমাণ আগের মতো আর তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবারে। সে আর সেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটির ইচ্ছার বশীভূত নয়, সে এবারে মুক্ত। মেয়েটি কিন্তু উঠল না; সেই একইভাবে, প্রার্থনার ভঙ্গিতেই সে বসে রইল। একটু আগেই সে যা দেখেছে তারই স্মৃতিতে তার দুই চক্ষু দীপ্তিময়।

বহুক্ষণ বাদে সে উঠে দাঁড়াল। যে-পথটি এখান থেকে শহরের দিকে চলে গেছে, সেই পথেই তারা পাশাপাশি হেঁটে চলল কিছুক্ষণ। পথে আর তাদের বিশেষ কিছু কথা হল না। তবে যেটুকু হল, তার থেকেই বারাব্বাস বুঝতে পারল যে, ক্রুশবিদ্ধ সেই মানুষটির ঐশ্বরিক ক্ষমতায় মেয়েটির প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মেছে; মেয়েটি তাঁকে ঈশ্বরপুত্র বলে উল্লেখ করেছে। কি সে প্রচার করত কথাপ্রসঙ্গে বারাব্বাস তা একবার জিজ্ঞেস করেছিল। মেয়েটি তার কোন জবাব দেয়নি; প্রশ্নটাকে সে এড়িয়ে গেছে।

পথের মোড়ে এসে তারা থেমে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। মেয়েটি যাবে গে-হিনম উপত্যকার পথে, আর বারাব্বাস যাবে গেট অব ডেভিডের দিকে। সেখানে সেই পথের উপর দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে আবারও বারাব্বাস তাকে একই প্রশ্ন করলঃ

—কি সে প্রচার করত? কি?

একমুহূর্ত চুপ করে রইল মেয়েটি। লাজুকের মতো বারাব্বাসের দিকে একবার তাকিয়েই সে তার চোখ নামিয়ে নিল। তারপর তার সেই অদ্ভুত গলায় বললঃ

—পরস্পরকে ভালোবাস।

বলে সে আর দাঁড়াল না।

জেরুসালেমে তার কোন কাজ নেই, তা সত্ত্বেও সে সেইখানেই রয়ে গেল। কেন, তা সে জানে না। নিজেকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছে বারাব্বাস, কিন্তু কোন জবাব পায়নি। কাজকর্মেও তার কিছুমাত্র মন নেই। সে এখন শুধু উদ্দেশ্যহীনের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুবান্ধবরা তাকে তাদের পাহাড়ের আস্তানায় যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিল; তাও সে যায়নি। তার এই দেরিতে যে তারা বিস্ময়বোধ করেছে, বারাব্বাস তা জানে। জানে, তবু যায় না। এ এক অদ্ভুত রহস্য; এবং এ-রহস্যের সে নিজেও কোন কূল-কিনারা খুঁজে পায়নি।

স্থূলাঙ্গিনী সেই মেয়েটি ভেবেছিল, তারই টানে বোধ হয় বারাব্বাস এখান থেকে নড়তে পারছে না। সে ভুল তার ভেঙে গেছে। তাতে তার একটু অভিমান হয়েছিল প্রথমটায়। পরে সে বুঝতে পেরেছে যে, মান-অভিমানের এখানে প্রশ্নই ওঠে না। পুরুষমাত্রেই অকৃতজ্ঞ; বিশেষ করে সেই সব পুরুষ, অনায়াসেই যারা তাদের বাঞ্ছিত বস্তুটিকে পেয়ে গেছে। অভিমানকে আমল না দেবার আর-একটা হেতু, শয্যাসঙ্গী হিসেবে বারাব্বাসকে তার অত্যন্তই ভালো লাগে। এমন পুরুষকেই আদর করে সুখ। আর তাছাড়া, তার উপরে যদিও বারাব্বাসের এখন আর তেমন টান নেই, অন্য আর কারুর প্রতিও যে নেই, তা সে জানে। কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না, কখনও করেনি; এবং যে-পুরুষ অন্য-কোন মেয়ের প্রতি আসক্ত নয়, সে যদি একটু দুঃখও দেয় তো ক্ষতি কি!

এক-এক সময় অবশ্য নিজেকে ভারি অসহায় মনে হয়, কেমন যেন কান্না পায় তখন। তা থাক, কান্নাতেও কি সুখ থাকতে পারে না! জীবনে অনেকবার, অনেকের সঙ্গেই মেয়েটি প্রেমে পড়েছে; দুঃখ পেয়েছে। প্রেমকে সে আর তাই তাচ্ছিল্য করে না।

কিন্তু কেন যে বারাব্বাস জেরুসালেমেই রয়ে গেল, কেন যে সে এমন ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ায়, অনেক ভেবেও সে তার কোন হদিস পায়নি। বারাব্বাস, আর যাই হোক, অকর্মণ্য নির্জীব পুরুষ নয়। বরং বলা যায় অত্যন্ত কর্মঠ। তার সেই কর্মঠ জীবনে কোন বিপদকেই সে এতদিন বিপদ বলে গ্রাহ্য করেনি। সেই লোক এখন চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে আছে, নিষ্কর্মার মতো সময় কাটাচ্ছে। এ ভারি অস্বাভাবিক।

সেই অদ্ভুত ঘটনার পর থেকে, ক্রুশবিদ্ধ হতে-হতে ছাড়া পেয়ে যাবার পর থেকেই, তার এই ভাবান্তর ঘটেছে। গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে মেয়েটি তাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতেই সে একসময়ে হেসে উঠল। বারাব্বাস কি তার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে এখন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না?

ক্রুশবিদ্ধ লোকটির শিষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয় বারাব্বাসের। সাক্ষাৎকারটা স্বেচ্ছাকৃত নয়, আকস্মিক। রাস্তাঘাটে কিংবা হাটে-বাজারে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলেই দুদণ্ড তাদের সঙ্গে কথা কইতে সাধ যায়, সেই লোকটি আর তার অদ্ভুত আদর্শের সম্পর্কে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করে। পরস্পরকে ভালোবাস—? বারাব্বাস আর আজকাল মন্দিরের ওদিকে যায় না, আশপাশের বড় রাস্তাগুলিও সে পরিত্যাগ করেছে। সে এখন শুধু শহরের নিচের দিককার এই গলিঘুঁজিতেই সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। এখানকার এই কর্মব্যস্ত কারিগর আর ফেরিওয়ালারা ভারি সরল মানুষ। আর এদের মধ্যে অনেকেই যে সেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটির ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী, তা-ও বারাব্বাস জানতে পেরেছে। তোরণের নিচে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাদের চাইতে এরা অনেক ভালো। এই দরিদ্র লোকগুলিকেই তার বেশি ভালো লাগে। তাই বলে এদের কথাবার্তায় যে তার কিছু আস্থা জন্মেছে তা নয়। কি যে বলে লোকগুলি, আর কেমন বোকার মতন বলে, বারাব্বাসের তা ঠিক বোধগম্যই হয় না। এদের দৃঢ় বিশ্বাস, এদের প্রভু পুনর্জীবন লাভ করেছেন এবং শীগগিরই তিনি স্বর্গ থেকে সদলবলে নেমে এসে এখানে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সবার মুখেই সেই একই কথা। তার থেকে বারাব্বাসের এই ধারণাই হল যে, এ তাদের শেখানো বুলিমাত্র। তবে হ্যাঁ, তিনি ঈশ্বর-পুত্র কিনা—এদের মধ্যেও তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ সে-কথায় বিশ্বাস করে, কেউ করে না। বিশ্বাস না করবার একটা মস্ত বড় কারণ, অনেকেই স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছে, তাঁর সঙ্গে কথাও কয়েছে। ঈশ্বরপুত্রকে দেখা যায়? না-কি তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াই এত সহজ? আর শুধু তা-ই নয়, একজন আবার বলল যে, সে তাঁকে একজোড়া জুতোও তৈরি করে দিয়েছিল। তার জন্যে তাঁর পায়ের মাপ নিতে গিয়ে সে তাঁকে স্পর্শও করেছে। যে-লোককে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়,—মন তাঁকে আর যাই হোক ঈশ্বরপুত্র বলে মানতে চায় না। অনেকেই তাই মানে না। অনেকে আবার মানেও। তারা বিশ্বাস করে যে, স্বর্গের সিংহাসনে ঈশ্বরের পাশেই তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করবেন। তার আগে এই পাপ-পৃথিবী অবশ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

কেমন ধরনের মানুষ এরা?

বারাব্বাসের বিশ্বাস আর তাদের বিশ্বাস যে এক নয়, বেশিদিন তা চাপা রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই তারা সতর্ক হয়ে গেল। কেউ-কেউ আবার আর-এক ধাপ এগিয়ে প্রায় খোলাখুলিভাবেই তাকে জানিয়ে দিল যে, তাকে আর তারা পছন্দ করতে পারছে না। বারাব্বাসের কাছে এটা নতুন-কিছু নয়; তা সত্ত্বেও তাদের এই সন্দেহে সে ঈষৎ দুঃখিত হল। আগে আর কখনও হয়নি। অবিশ্বাস আর অবহেলা তার একরকম গা-সওয়াই

হয়ে গিয়েছিল। চিরকালই সবাই তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে, তার থেকে দূরে সরে থেকেছে। সে কি তার চেহারার জন্যে, না কি তার চোখের নিচের গভীর ওই ক্ষত-চিহ্নটির জন্যে—যার কারণ পর্যন্ত কেউ জানে না? না কি তার গর্তে-বসা ওই চোখ দুটির জন্যে, ভালো করে যা কারুর ঠাহর পর্যন্ত হয় না? তা সে যে-কারণেই হোক, লোকে তাকে ভয় করে। তা নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামায়নি। এ-সব দুঃখ সে গায়েই মাখত না।

এই প্রথম সে দুঃখবোধ করল।

যাদের আচরণে তার এই দুঃখ, তারা ওদিকে আরও সতর্ক হয়ে গেছে। পরস্পরের তারা কাছাকাছিই থাকে; একই বিশ্বাসের বন্ধনে তারা এখন ঐক্যবদ্ধ। বাইরের কাউকে তারা বিশ্বাস করে না, কাছে ঘেঁষতে দেয় না। নিজেদের মধ্যেই মাঝে মাঝে তারা ভোজ-সভার আয়োজন করে; সবাই মিলে বড় একখানি রুটি ভেঙে নিয়ে তারপর খেতে বসে। কে বলবে এরা একই পরিবারের লোক নয়! আর এই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবার ব্যবস্থাটাও বোধ হয় তাদের ধর্মবিশ্বাসের, তাদের সেই 'পরস্পরকে ভালোবাসার'ই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। 'পরস্পরকে ভালোবাস'। বাইরের কাউকে কি এরা ভালোবাসে? বলা বড় শক্ত।

তার মানে এই নয় যে, বারাব্বাসও এই একত্র-ভোজের অনুষ্ঠানে গিয়ে বসতে চায়। না, তা সে চায় না। যে-কোন বন্ধনেই হোক না কেন, কারুর সঙ্গেই সে একসূত্রে বাঁধা পড়তে রাজি নয়। সে যা সে তাই; নিজের এই স্বাতন্ত্র্যকেই সে ভালোবাসে।

অথচ আশ্চর্য এই যে, তা সত্ত্বেও সে আবার তাদেরই সঙ্গে গিয়ে মেলামেশা করতে শুরু করল।

এমন কি, এমন একটা ভান করতেও তার দ্বিধা হল না যে, তাদেরই সঙ্গে সে যোগদান করতে চায়। নেহাত কিনা তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, তাই। তা নইলে সে অনেক আগেই যোগ দিত। শুনে তারা আনন্দ জানিয়ে বলল, যে-আদর্শ তাদের প্রভু প্রচার করে গেছেন বারাব্বাস যাতে তা ঠিকমতো বুঝতে পারে তার জন্যে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। বলল বটে, কিন্তু খুশি যে তারা হয়নি, বারাব্বাসের তা বুঝতে বাকি রইল না। ব্যাপারটা এরপর অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। নতুন কাউকে দলে পেলে তাদের খুশি হবারই কথা। অথচ বারাব্বাসের ক্ষেত্রে তারা খুশি হতে পারছে না। এই না-পারার দুঃখে তারা নিজেরা যতখানি ম্রিয়মাণ বোধ করল, তাদের উপেক্ষায় বারাব্বাসও ঠিক ততখানিই। কেন তারা তাকে বিশ্বাস করছে না? কি এর কারণ? বারাব্বাস জানে। লজ্জায় উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সে চলে এল। ক্ষোভে-দুঃখে তার চোখের নিচের সেই ক্ষতচিহ্নটি ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে।

বিশ্বাস করবে! নিজের চোখে সে যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখেছে, কেমন করে সে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করবে! তিনি যে পুনর্জীবন লাভ করেননি, করতে পারেন না, সে-বিষয়েও বারাব্বাস দৃঢ়নিশ্চিত। সব-কিছুই একটা মনগড়া ব্যাপার; একটা কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর অন্য-কিছুই নয়। এদের প্রভু বলেই কোন কথা নেই, কারুর পক্ষেই কখনও পুনর্জীবনলাভ সম্ভব নয়। বারাব্বাসকে যে তারা মুক্তিদান করেছে, তাঁর তাতে কোন হাত ছিল না। যে-কাউকেই তারা ছেড়ে দিতে পারত। তাকেই যে দিয়েছে এ তার সৌভাগ্য। ঈশ্বরপুত্র! অসম্ভব! আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তা-ই তিনি ছিলেন, তবে তো বলতে হয় যে স্বেচ্ছায়ই তিনি প্রাণ দিয়েছেন। এ-কি ভয়ঙ্কর ইচ্ছা! এ-কি ভয়ঙ্কর অবসাদ এ-ইচ্ছার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে! অবসাদ! এ-এক বীভৎস অবসাদ। তাঁর কি তাহলে যন্ত্রণা-ভোগেরই বাসনা হয়েছিল? তিনি তো ঈশ্বরপুত্র; তাই যদি হয় তো এই যন্ত্রণাকেও তো তিনি

অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। এড়াতে তিনি চাননি। তীব্রতম যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন। সে-ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়েছে; নিজের প্রাণের বিনিময়ে বারাব্বাসের জন্যে তিনি মুক্তি এনে দিয়েছেন। নিরুচ্চার কণ্ঠে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, একে তোমরা মুক্তি দাও, পরিবর্তে আমাকেই তোমরা ক্রুশবিদ্ধ কর। কিন্তু না, আর যাই হোন, ঈশ্বরপুত্র তিনি নন। হওয়া অসম্ভব।

এ এক আশ্চর্য উপায়ে তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন। অপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি তার প্রয়োগ করেছেন। দৃশ্যত মনে হয়, তাঁর এতে কোন হাত ছিল না। ছিল না কি? অদৃশ্যত ছিল। অন্যের সিদ্ধান্তে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি, সে-সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাবারও প্রয়াস পাননি। সবই সত্যি। কিন্তু বারাব্বাসকে মুক্তি দিয়ে তার পরিবর্তে এই যে তাঁকে হত্যা করা হল, তাঁরই ইচ্ছা যে এর মধ্যে নিহিত নয় কে তা বলবে!

এরা বলছে তাদেরই জন্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। সত্য হলেও সেটা গৌণ। মুখ্যত বারাব্বাসের জন্যেই তিনি প্রাণ দিয়েছেন। এরা তাঁর নিকট-সঙ্গী, বারাব্বাস নিকটতর। সম্পূর্ণ পৃথক এক বন্ধনে সে তাঁর সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে। এরা অবশ্য তাকে পরিহার করতে চায়। তা করুক। তাতে তার কিছুই যায় আসে না। কেন না, যন্ত্রণার থেকে, মৃত্যুর থেকে, মুক্তিদানের ব্যাপারে তাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সে-ই তাঁর নির্বাচিত পুরুষ। সে-ই তো সেই ভাগ্যবান। স্বয়ং ঈশ্বরপুত্রের নির্দেশে, তাঁরই প্রাণের মূল্যে সে মুক্তিলাভ করেছে। এ-ই তিনি চেয়েছিলেন। এরা তা জানে না।

বারাব্বাস কি এদের এই 'ভ্রাতৃত্ব' আর এই 'ভোজ-অনুষ্ঠান' আর এই 'পরস্পরকে ভালোবাসা'র তোয়াক্কা করে? কিছুমাত্র না। সে যা, সে তা-ই। নিজের এই স্বাতন্ত্র্যকেই সে ভালোবাসে। ঈশ্বরপুত্রের কাছেও সে তার এই স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়নি, এদের মতো সে বিকিয়ে দেয়নি নিজেকে। সে অত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে না, অত প্রার্থনাও জানায় না।

স্বেচ্ছায় কেউ মৃত্যুবরণ করে! অযথা কেউ যন্ত্রণা ভোগ করতে চায়! ভাবতেও তার বিশ্রী লাগল। মনশ্চক্ষুতে সেই দুর্বল মানুষটির ছবি ভেসে উঠল। হাত দুখানি শীর্ণ, অসহায়ভাবে দুদিকে ঝুলে পড়েছে। যন্ত্রণায় কণ্ঠরুদ্ধ; শুধু একটু জল-চাওয়া ছাড়া অন্য আর-কোন কথাই তিনি বলতে পারেননি। আর এই যন্ত্রণা তিনি নাকি নিজের ইচ্ছাতেই বরণ করে নিয়েছেন। ইচ্ছা! এ কি বীভৎস ইচ্ছা! বারাব্বাসের এসব ভালোলাগে না, লাগেনি। এরা কিন্তু তাঁকেই শ্রদ্ধা করে তা নয়; তাঁর সেই অকথ্য যন্ত্রণা, তাঁর সেই ভয়াবহ মৃত্যু—সব-কিছুই এদের কাছে একটা শ্রদ্ধার ব্যাপার। মৃত্যুকেও ওরা ভালোবাসে। বীভৎস, বীভৎস! সারাটা মন যেন তার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। এদের সঙ্গে আর তার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই—সম্পর্ক রাখবেও না। এদের সঙ্গে না, এদের প্রভুর সঙ্গেও না। সব-কিছুই তার এখন বিস্বাদ লাগছে।

না, মৃত্যুকে সে ভালোবাসে না। মৃত্যুকে সে ঘৃণা করে। অনন্তকাল সে বাঁচতে চায়। আর এই প্রবল জীবনতৃষ্ণার জন্যেই বোধ হয় তার মৃত্যু হয়নি। কত লোকই তো ছিল; বেছে বেছে ঠিক তাকেই-বা কেন ছেড়ে দেওয়া হল? ধরা যাক, তিনি ঈশ্বরেরই পুত্র। তা হলে তো বলতে হয়, সবই তিনি জানতেন। বারাব্বাস যে মরতে চায় না, যন্ত্রণাভোগেরও যে তার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই, তাও জানতেন বলেই বারাব্বাসের জায়গায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তার পরিবর্তে এটুকুই শুধু তিনি চেয়েছিলেন যে, বারাব্বাস তাঁর সঙ্গে গলগথার পাহাড় পর্যন্ত যাবে, সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করবে। তাকে দিয়ে তিনি তাঁর সেই অনুক্ত ইচ্ছা পূর্ণ করিয়ে নিয়েছেন। শুধুমাত্র মৃত্যুর প্রতিই নয়, মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখতেও তার অসীম বিতৃষ্ণা।

তা সত্ত্বেও সে গলগথার পাহাড়ে গিয়েছে; গিয়ে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে।

তারই জন্যে যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাতে আর তার সন্দেহ নেই। তার সম্পর্কেই তিনি তাঁর নিরুচ্চার নির্দেশ জানিয়েছিলেন, 'একে তোমরা মুক্তি দাও, পরিবর্তে আমাকেই তোমরা ক্রুশবিদ্ধ কর।'

কুমোর-গলি থেকে বেরিয়ে এসে তার পর এ-সবই চিন্তা করছিল সে। এদের সঙ্গে সে যোগদান করতে চেয়েছিল, এরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বারাব্বাস প্রতিজ্ঞা করল, কোনদিনই আর সে আসবে না এখানে।

সে প্রতিজ্ঞা রইল না। পরের দিনই সে এল আবার। এসে স্পষ্টই বুঝতে পারল, নিজেদের আচরণে এরা এখন লজ্জা বোধ করছে। বারাব্বাসকে যে তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল, তার জন্যে তারা দুঃখ প্রকাশ করল। তারপর বলল, তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের কোন্‌খানটা বারাব্বাসের বোধগম্য হচ্ছে না তা যদি সে খুলে বলে তাহলে তারা তা তাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

বারাব্বাস বলতে যাচ্ছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে একটা হেঁয়ালির মতো লাগছে। তা অবশ্য বলল না। বলল যে, পুনর্জীবনে সে বিশ্বাস করে না। মরা মানুষ কি কখনও বেঁচে উঠতে পারে? তার এই কথা শুনে তারা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল। তারপর যিনি সব চাইতে বুড়ো, বারাব্বাসকে তিনি বললেন যে, সত্যিই তাঁদের প্রভু মৃতকেও জীবনদান করেছেন। মৃত্যুর পর আবার বেঁচে উঠেছে এমন কাউকে কি বারাব্বাস দেখতে চায়? যদি চায় তো তাঁরা দেখাতে পারেন। তবে হ্যাঁ, সন্ধ্যার আগে তা সম্ভব হবে না। তার কারণ, সে-লোকটির বাড়ি একটু দূরে। যদি তাকে দেখতে চায় তো কাজকর্ম চুকিয়ে তারপর সন্ধ্যা নাগাদ তাঁরা সেখানে তাকে নিয়ে যাবেন।

বারাব্বাস একটু হকচকিয়ে গেল। এতখানি সে ঠিক আশা করেনি। সে ভেবেছিল বড়জোর এরা তর্ক করবে, যুক্তি দেখাবে। যুক্তিতর্কের পথে না গিয়ে সরাসরি যে এরা দৃষ্টান্ত-প্রমাণ দাখিল করে বসবে তা সে ভাবতেও পারেনি। এ যে একটা মন-গড়া ব্যাপার, মস্ত বড় একটা বুজরুকি, যাকে এরা পুনর্জীবিত বলছে সে যে আসলে মরেই নি, তাতে অবশ্য তার সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও সে ভয় পেয়ে গেল। লোকটির সঙ্গে সে দেখা করতে চায় না, দেখা করতে সে বিন্দুমাত্রও উৎসুক নয়। কিন্তু এতখানিই সে এগিয়ে এসেছে যে এখন আর তা বলা যায় না। এদের প্রভু যে কত শক্তিশালী তা উপলব্ধি করবার জন্যেই বারাব্বাসকে তারা এই সুযোগ এনে দিয়েছে। তার জন্যে, ভান করে হলেও, তার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

সারাটা দিন তার এক গভীর উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাটল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে তারপর সে যখন কুমোর-গলিতে ফিরে এল আবার, তখন প্রায় সন্ধ্যা; কাজকর্ম চুকিয়ে তারা তখন দোকানপাট বন্ধ করছে। সেখান থেকে রওনা হয়ে শহরের ফটকগুলি একে একে পার হয়ে তারা মাউন্ট অব অলিভের দিকে এগোতে লাগল। সে, আর অল্পবয়সী একটি ছেলে। এই ছেলেটিই তাকে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সেই লোকটির কাছে নিয়ে যাবে।

পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি গ্রাম; আর তার উপকণ্ঠেই সেই লোকটির বাড়ি। ঘরের বাইরে চিক টাঙানো। বারাব্বাসের সঙ্গী সেই চিকটিকে সরিয়ে দিতেই লোকটিকে দেখা গেল। ঘরের মধ্যেই তিনি বসে আছেন। হাত দুটি টেবিলের উপর প্রসারিত; দু-চোখে এক আশ্চর্য শূন্যতা। তারা যে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, এ যেন তিনি টেরই পাননি। বারাব্বাসের সঙ্গী তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে তবেই তাঁর হুঁশ হল। ধীরে ধীরে

তিনি মাথা তুলে চাইলেন। তারপর এক অদ্ভুত নিস্তরঙ্গ গলায় বসতে বললেন তাদের। বারাব্বাস লক্ষ্য করল যে, তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ওঠা-নামা নেই। সঙ্গী ছেলেটি তাঁকে জানাল, তারা জেরুসালেমের কুমোর-গলি থেকে এসেছে। কি জন্যে এসেছে, তাও জানাল।

বারাব্বাস তাঁর ঠিক সামনা-সামনি বসেছে। লোকটির শুধু কণ্ঠস্বরই নয়, চেহারাও অদ্ভুত। বিবর্ণ অস্থি-কঠিন মুখ; গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে, কুঞ্চিত। এমন রিক্ত নিষ্প্রাণ চেহারা সে আর দেখেনি। মুখ তো নয়, যেন মরুভূমি। মরুভূমির মতোই সর্বরিক্ত একটি কাঠিন্য সেখানে ফুটে উঠেছে।

সঙ্গী ছেলেটির প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, সত্যিই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। চারদিন চাররাত্রি তিনি কবরের মধ্যে ছিলেন; তারপর তাঁদের প্রভুই তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছেন। পুনর্জীবন লাভের পর তাঁর দৈহিক আর মানসিক শক্তিও তিনি ফিরে পেয়েছেন। এতটুকুও তারতম্য হয়নি। তাঁকে বাঁচিয়ে তুলে প্রভু তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রমাণ করেছেন যে তিনি ঈশ্বরপুত্র। বিবর্ণ নিষ্প্রাণ চোখে বারাব্বাসের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন।

তারপরেও কথা হল কিছুক্ষণ। তাঁদের প্রভু আর তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার সম্পর্কেই তাঁরা কথাবার্তা বললেন। বারাব্বাস তাঁদের এই আলোচনায় যোগ দেয়নি; সে শুধু সব শুনে যাচ্ছিল। সঙ্গী ছেলেটি একসময় উঠে দাঁড়াল। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে বলল যে, সে এবারে তার বাবা আর মার সঙ্গে দেখা করতে যাবে—এই গ্রামেই তাঁরা থাকেন।

বারাব্বাসের ইচ্ছে ছিল না, সে এখানে একলা পড়ে থাকে। অদ্ভুত এই লোকটির সামনে তাকে এখন একা-একা বসে থাকতে হবে। ভাবতেই তার ভয় হল। কিন্তু বিদায়ই বা নেয় কিভাবে! চট করে কোন অজুহাতও তার মাথায় এল না। একদৃষ্টে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন—সে দৃষ্টি নির্জীব, বিবর্ণ। সে চোখে কোন ভাষা নেই। বারাব্বাসের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। নির্বাক ওই চোখ দুটি তাকে টানছে। সে এখন পালাতে পারলেই বাঁচে। তাও সে পারছে না।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ; কারুর মুখেই কোন কথা নেই। তারপর একসময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

—আমাদের প্রভুকে কি তুমি বিশ্বাস কর না? বিশ্বাস কর না তিনি ঈশ্বরেরই পুত্র?

একটু ইতস্তত করল বারাব্বাস; তারপর বলল ঃ

—না।

এ ছাড়া আর কি-বা বলতে পারত! মিথ্যাও যদি বলত তো নির্বাক ওই দৃষ্টির কি তাতে কিছুমাত্রও পরিবর্তন হত? কিছুমাত্র না। তা সে জানে। জানে বলেই সে সত্যি কথাটা বলল। না, তাঁদের প্রভু যে ঈশ্বরপুত্র তা সে বিশ্বাস করে না।

লোকটি তাতে ক্ষুণ্ণ হলেন না। অল্প একটু মাথা দুলিয়ে বললেন ঃ

—শুধু তুমি নও, অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কাল আমার মা এখানে এসে-ছিলেন; তিনিও করেন না। অথচ তা সত্য! তিনি যে আমাকে পুনর্জীবন দান করেছেন তাও সত্য। তাঁরই ক্ষমতার আমি সাক্ষ্য বহন করছি।

বারাব্বাস বলল, সেইজন্যেই এত সহজে তিনি তাঁর প্রভুর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী হতে পেরেছেন। তিনি যে পুনর্জীবন লাভ করেছেন, এ-জন্যে তাঁর চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

তিনি বললেন, কৃতজ্ঞতার তাঁর সীমা নেই। প্রভু তাঁকে নবজীবন দান করেছেন,

মৃত্যুপুরী থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি রোজই তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকেন।

মৃত্যুপুরী! বারাব্বাস যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপতে লাগল।—মৃত্যুপুরী!—সে জায়গা কেমন? আপনি সেখানে ছিলেন? কেমন জায়গা সেটা?

—কেমন জায়গা? বারাব্বাসের প্রশ্নেরই তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। তার জিজ্ঞাসাটা যেন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি।

—হ্যাঁ, কেমন? কেমন জায়গা? কিছুই কি তার আপনি বুঝতে পারেননি? বুঝতে হয়নি?

বারাব্বাসের এই উৎকণ্ঠ অস্থিরতাকে তিনি একটিমাত্র কথায় নিভিয়ে দিলেন। বললেন ঃ

—না, কিছুই আমাকে বুঝতে হয় নি। আমি মারা গিয়েছিলাম মাত্র এবং যে মারা যায় সে জানে যে, মৃত্যু আসলে কিছুই না।

—কিছুই না?

—না।

বারাব্বাস তাঁর দিকে তাকিয়েই রইল। অদ্ভুত এক বিস্ময়ে দুই চক্ষু তার বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

—মৃত্যুপুরী বলতে কি বোঝায়, তুমি জানতে চাও। কিছুই বোঝায় না। সে-জায়গা আছে, কিন্তু নেইও।

বারাব্বাস তবু তাকিয়ে রইল। নিষ্প্রাণ কঠিন ওই চোখ দুটি তাকে টানছে, তাকে টানছে। নিজের দৃষ্টিকে যে সে ফিরিয়ে নেবে অন্যদিকে, তেমন শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নেই।

—সে-জায়গা আছে, কিন্তু নেইও। আসলে তা কিছুই নয়। কিন্তু একবার যারা সেখানে গেছে তারা জানে যে, কিছু না-হয়েও তা সব-কিছু এবং অন্য আর-কোন কিছুই তখন কিছু নয়।

একটুক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন ঃ

—তুমি বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করেছে। কেন করেছ আমি জানি না। অন্য আর-কেউ কখনো এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। জেরুসালেমের থেকে কাউকে-না-কাউকে প্রায়ই আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের কাছে আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। শুনে যাঁদের প্রত্যয় হয়, আমাদের এই ধর্মবিশ্বাসে তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনেকেই এভাবে দীক্ষা নিয়েছেন। প্রভুর কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। আর এখন এভাবেই আমি তাঁর ঋণ পরিশোধ করে চলেছি। প্রায় প্রত্যেকদিনই কেউ-না-কেউ এখানে আসেন। পুনর্জীবনলাভের কথা তাঁদের আমি বলেছি, মৃত্যুপুরীর কথা নয়। কেউ তা নিয়ে কোন প্রশ্নও করেননি আমাকে। তুমিই প্রথম করলে।

সারা ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে তিনি একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর খাবার বের করে আনলেন খানিকটা। একখণ্ড রুটি, আর একটু নুন। রুটিটাকে ভেঙে নিয়ে খানিকটা অংশ তিনি নিজের জন্যে রাখলেন; বাকিটা এগিয়ে দিলেন বারাব্বাসকে। নিজের অংশটুকুতে তিনি নুন মাখিয়ে নিলেন; তাঁর অনুরোধমতো বারাব্বাসও মাখাল। কি এক গভীর উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপছে। অনুজ্জ্বল ম্লান আলো। তা থেকে বিষণ্ণ, মধুর একটি শান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। চুপচাপ তারা খেতে বসল; কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

কই, বারাব্বাসের সঙ্গে একত্র-আহারে তো এঁর কোন আপত্তি হল না! কুমোর-গলির লোকদের মতো এঁর অত বাছ-বিচার নেই। সবাই এঁর কাছে সমান, তুল্যমূল্য। তবুও তার অস্বস্তি লাগতে লাগল। তিনি যখন তাঁর হলদে-কঠিন আঙ্গুলে করে বারাব্বাসকে তার রুটির টুকরো এগিয়ে দিলেন, আর সেই রুটি যখন সে মুখে তুলল, বারাব্বাসের মনে হল যেন সারা মুখ তার শবাস্বাদে ভরে উঠেছে।

সে যাই হোক, বারাব্বাসের সঙ্গে তাঁর একত্র-আহারের অর্থ কি? নিশ্চয়ই এর কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। কি সেই তাৎপর্য?

খাওয়া শেষ হলে বারাব্বাসকে তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন; প্রার্থনা জানালেন যে তার জীবন শান্তিময় হোক। তার উত্তরে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলল বারাব্বাস, দ্রুত বেরিয়ে এল। বাইরে অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারের মধ্যেই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রাস্তা নেমে গেছে। কি এক চিন্তা যে তাকে পীড়ন করছে সারাক্ষণ, তা সে জানে না।

স্থূলাঙ্গিনী সেই মেয়েটি সে রাতে অবাক হয়ে গেল। বারাব্বাস যেন আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দসম্ভোগে সম্প্রতি তার এতখানি আগ্রহ সে আর দেখেনি। মনে হল যেন একটা অবলম্বন চায় বারাব্বাস, কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়। সে-ই তো সেই অবলম্বন, সে-ই আশ্রয়। শুয়ে শুয়ে মেয়েটি স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্ন দেখল যেন কেউ তার প্রেমে পড়েছে।

পরের দিন আর বারাব্বাস কুমোর-গলির দিকে গেল না; চুপচাপ সলোমন-তোরণের কাছে গিয়ে বসে রইল। কিন্তু কুমোর-গলিরই কে যেন ওখান দিয়ে আসছিল। বারাব্বাসকে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, এবারে তার সন্দেহভঞ্জন হয়েছে তো? মরা মানুষকেও যে বাঁচিয়ে তোলা যায়, তা নিয়ে আর তার কোন সন্দেহ নেই নিশ্চয়ই! বারাব্বাস বলল, লোকটি যে মারা গিয়েছিলেন আর তাঁদের প্রভুই যে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছেন আবার, তা সে মেনে নিচ্ছে। কিন্তু একটা কথা—পুনর্জীবনদানের শক্তি তাঁর আছে যদিও, অধিকার নেই। মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলে তিনি অন্যায় করেছেন।

এ কি অসম্মানজনক কথা! লোকটি আর-কোন কথা বলতে পারল না; সারা মুখ তার ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। বারাব্বাসও আর-কিছু বলল না। অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সে।

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। কুমোর-গলিই শুধু নয়, কলু-পাড়া, চামার-গলি, তাঁতি-মহল্লা—সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ল। বারাব্বাসও তা বুঝতে পারল। দুদিন বাদেই সে কুমোর-গলিতে গিয়েছিল; গিয়ে দেখল যে, কেউই আর তাকে বিশ্বাস করছে না, সবাই এখন তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। কেমন যেন থমথমে একটা আবহাওয়া। বারাব্বাসের সঙ্গে যে তাদের কোন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি তা ঠিক, তবে সন্দেহটাকে এবারে তারা খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এত ঘন ঘন সে এখানে আসছে কেন? কি চায় সে? তাদের সঙ্গে তার মেলামেশারই বা উদ্দেশ্য কি? সে কি কারুর গুপ্তচর? একজন তো আবার স্পষ্টই তা জিজ্ঞেস করে বসল। লোকটি একটু খর্বাকৃতি, মাথা-জোড়া টাক। বারাব্বাস তাকে এর আগে কখনো দেখেনি। প্রশ্ন শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোন কথাই সে বলতে পারল না। শুধু দেখল যে, ক্রোধে আর উত্তেজনায় লোকটি অস্থির হয়ে উঠেছে। লোকটিকে সে চেনে না। দেখে মনে হয়, কাপড়-চোপড় রঙ করাই এর পেশা।

বারাব্বাস বুঝল যে, তার কথায় এরা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এদের ধর্মবিশ্বাসে তাতে আঘাত লেগেছে। বুঝল যে এরা আর তার প্রতি বিন্দুমাত্রও প্রসন্ন নয়। কেউই আর তার-

সঙ্গে মেশে না, কথা কয় না। সকলেই তাকে এখন সন্দেহ করতে শুরু করেছে। কে সে, তারা জানতে চায়।

এবং যা অনিবার্য তা-ই একদিন ঘটল শেষ পর্যন্ত। কথাটা প্রায় দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে সবাই শুনল যে, এ-ই সেই লোক! এঁরই পরিবর্তে তাদের প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, এরই জায়গায় ঈশ্বরপুত্র প্রাণ দিয়েছেন। বারাব্বাস। এ-ই সেই বারাব্বাস।

ঘৃণা আর বিদ্বেষ যেন তাকে তাড়িয়ে ফিরতে লাগল। ক্রোধে আর ক্ষোভে তারা তখন উন্মত্তপ্রায়। বারাব্বাস ততক্ষণে আত্মগোপন করেছে; সে আর এখানে ফিরে আসবে না। কোনদিনই না। তবু তাদের শান্তি নেই।

—বারাব্বাস! এ-ই সেই বারাব্বাস!

সেই যে বারাব্বাস বাড়িতে এসে ঢুকেছে, বড় একটা আর বেরোয়নি তারপর। ঘরের একপাশে একটি পর্দা টাঙানো; চুপচাপ তার পিছনে সে শুয়ে থাকে, আর কি-যেন ভাবে। কারুর সঙ্গেই সে আর এখন কথা কয় না, স্থূলাঙ্গিনী সেই মেয়েটির সঙ্গেও না। বাড়িতে খুব যদি হৈ-হল্লা হয় তো চুপচাপ সে ছাতের উপরকার সেই ঘরটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গোলমাল থামলে তারপর নিচে নেমে আসে। দিনের পর দিন এইভাবে কাটতে লাগল; বারাব্বাসের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। আহারে পর্যন্ত তার মন নেই। সামনে যদি কেউ খাবার এগিয়ে দেয় তো খায়, তা নইলে সে খায় না পর্যন্ত। কোন-কিছুর সম্পর্কেই আর তার কোন আগ্রহ নেই; সব-কিছুর সম্পর্কেই নির্লিপ্ত, বীতস্পৃহ।

কি যে হয়েছে তার, অনেক ভেবেও মেয়েটি তার কোন হদিস পেল না। অথচ বারাব্বাসকে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার মতো সাহস তার নেই। এইটুকু শুধু সে বুঝতে পেরেছে যে, বারাব্বাস এখন একলা থাকতে চায়। তা-ই থাক। কোন কথারই সে জবাব দেয় না আজকাল, চুপচাপ শুধু ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর কি যেন ভাবে। কি যে ভাবে, মেয়েটি জানে না। বারাব্বাসের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?—গেছে? মেয়েটি জানে না।

হঠাৎ তার একটা সন্দেহের উদয় হল। বারাব্বাসের জায়গায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, বারাব্বাস তার শিষ্যদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করছে ইদানীং। মেয়েটির তা কানে গিয়েছিল। তারাই কোন মন্ত্র দেয়নি তো? তা-ই হবে বোধহয়। তাদের সঙ্গে এই মেলামেশার পর থেকেই বারাব্বাসের একটা স্পষ্ট ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। তারপর থেকেই সে গুম মেরে গিয়েছে। এ নিশ্চয়ই তাদের কাজ। নিজেরা তারা উন্মাদ; বারাব্বাসকেও তারা উন্মাদ বানিয়ে ছাড়বে। উন্মাদ, তাছাড়া আর কি! ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটিকে তারা তাদের ত্রাণকর্তা বলে মনে করে; মনে করে যে, তিনিই একদিন তাদের দুঃখ দূর করবেন। শুধু কি তাই? সেই ত্রাণকর্তাই নাকি একদিন এই জেরুসালেমের সিংহাসনে এসে বসবেন! পাগল—এরা সব বদ্ধ পাগল! আর তার বারাব্বাস কিনা শেষকালে এই পাগলদের সঙ্গে গিয়ে মেলামেশা করতে শুরু করল! ছি ছি, তার একটু লজ্জাও করল না? বারাব্বাসকেই ক্রুশবিদ্ধ করবার কথা ছিল। তা না করে সে-জায়গায় তাদের ত্রাণকর্তাকে করা হয়েছে। কেন এমন হল, কি এর হেতু, বারাব্বাসের যে এতে হাত ছিল না, তাদের কাছে তা তাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছে নিশ্চয়ই। আর তখন তাকে কায়দায় পেয়ে তারাও নিশ্চয়ই তাকে খুব খানিকটা মন্ত্র দিয়ে দিয়েছে। তাকে বুঝিয়েছে যে, তাদের প্রভু নির্দোষ, পবিত্র। বুঝিয়েছে যে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তা সত্ত্বেও

কিনা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল! বারাব্বাসও তাই হয়ত মরমে মরে আছে। এমন একজন মহামানবের প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে থাকবার লজ্জাতেই সে হয়ত আর কথা কইতে পারছে না। ভাবছে যে, এর চাইতে সে নিজে মরলেই ভালো ছিল। নাঃ, এই যে হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

না-মরার লজ্জাতেই সে এখন জীবন্মৃত! বোকা, বারাব্বাস একটা বোকা! আপন মনেই মেয়েটি হেসে উঠল। এ কি পাগলামি ওর মাথায় ঢুকেছে!

কিন্তু না, চুপ করে থাকাটা আর কোনমতেই ঠিক নয়। বারাব্বাসের সঙ্গে এ নিয়ে সে খোলাখুলি কথা কইবে। তাকে সব বুঝিয়ে বলবে।

বলা হল না। সঙ্কল্প ভেসে গেল। কি এক দুর্জ্ঞেয় কারণে বারাব্বাসের সঙ্গে কেউ কখনও তার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নিয়ে কথা বলবার সাহস পায়নি। মেয়েটিও না।

এবং তাই আগেরই মতো দিন কাটতে লাগল। দুর্ভাবনার অবসান হল না মেয়েটির; উলটে আরও আকাশ-পাতাল সাতশ রকমের চিন্তায় সে নিজেই প্রায় পাগল হয়ে উঠল। বারাব্বাসের কি অসুখ হয়েছে?—কঠিন কোন অসুখ? তা-ই হবে বোধহয়। অসম্ভব রোগা হয়ে গেছে সে; মুখখানি বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। ইলায়াহু একদিন ওর চোখের নিচে ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল। একমাত্র সেই ক্ষতচিহ্নটি ছাড়া রক্তের আর-কোন আভাস পর্যন্ত কোনখানে নেই! এই কি সেই দুর্দান্ত মানুষ? বিশ্বাস হতে চায় না। দেখলে এখন দুঃখ হয়। কারুর সঙ্গেই সে আর কথা কয় না, চুপচাপ শুয়ে থাকে। আর কি যেন ভাবে! বারাব্বাস! বারাব্বাসের মতো লোকের কিনা শেষে এই দশা হল!

ওর উপরে কারুর ভর হয়নি তো? তাই যদি হয়? এমন যদি হয় যে অন্য কারুর আত্মা ওর শরীরে এসে বাসা বেঁধেছে, যা-খুশি ওকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে? দেখে তো অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু সে-আত্মা কার? ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে মারা গেছে তারই নয় তো? তা-ই হবে। বারাব্বাসের সে অনিষ্ট করতে চায়। মৃত্যুর মুহূর্তে তার আত্মা তাই বারাব্বাসের উপরে এসে ভর করেছে। নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করা হয়েছে তাকে; আর এদিকে দোষী হওয়া সত্ত্বেও বারাব্বাসকে তার জায়গায় মুক্তিদান করা হয়েছে। বারাব্বাসের উপরে তাই সে প্রতিশোধ নিতে চায় হয়ত। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। তা-ই যদি না হবে তো ছাড়া পাবার ঠিক পর থেকেই বারাব্বাসের এই পরিবর্তন ঘটল কেন! প্রথম দিনেই তার এই পরিবর্তন মেয়েটির চোখে পড়েছিল; দিন-দিনই তার মাত্রাটা আরও বেড়ে চলেছে। নাঃ, আর কোন সন্দেহ নেই তার। একটা জায়গায় শুধু একটু গোল-মাল ঠেকছে। লোকটাকে তো গলগথার পাহাড়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, আর বারাব্বাস তো সেখানে যায়ওনি। তাহলে? বারাব্বাসের শরীরের মধ্যে সে যে তার আত্মাকে চালান করে দিয়েছে—কখন দিল? কেমন করেই বা দিল? মেয়েটি একটু অবাক হয়েছিল প্রথমটায়। তারপর দেখল যে এতে অবাক হবার কিছু নেই। লোকটার নাকি অসাধারণ সব ক্ষমতা ছিল। তাই যদি হবে তো দরকার হলে সে অদৃশ্যও হতে পারত নিশ্চয়ই; যেখানে খুশি এবং যখন খুশি, যেতে পারত। দূরে থাকা সত্ত্বেও বারাব্বাস তাই রেহাই পায়নি।

কিন্তু বারাব্বাস কি তা জানে? জানে যে ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটার আত্মা শেষকালে তারই শরীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে? মুক্তি পেয়েও যে মৃত্যু ঘটেছে বারাব্বাসের—আর মৃত্যুর পরেও যে সেই লোকটা এখনও বেঁচে রয়েছে, বারাব্বাসেরই দেহের মধ্যে এসে বেঁচে রয়েছে, বারাব্বাস কি জানে সে-কথা? জানে?

না বোধ হয়! সে হয়ত কিছুই টের পায়নি, পায় না। পায় না বলেই অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর-একজনের আত্মাকে সে এখন বহন করে বেড়াচ্ছে, বারাব্বাসের অনিষ্টসাধনই যার উদ্দেশ্য।

বারাব্বাসের জন্যে তার দুঃখ হল। আহা বেচারা! তার দিকে তাকালেও এখন কান্না পায় মেয়েটির। বারাব্বাসের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। কেমন করেই বা থাকবে। কোনদিকেই কি আর তার মন আছে এখন? কোনদিকেই না। মেয়েটির দিকে সে আর তাই তাকায় না পর্যন্ত। রাত্তিরেও তাকে আর তার দরকার পড়ে না। এই দুঃখটাই মর্মান্তিক। বারাব্বাস আর চায় না তাকে। তা সে বোঝেও। তবে কি না সে মূর্খ, এত অবহেলার পরেও সে তাই বারাব্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছে। বুক ফেটে তার কান্না পায় এক-এক সময়। কিন্তু কান্নাতেও আর সেই আবেগ নেই, সেই আনন্দ নেই। কাঁদতে আর তাই ভালো লাগে না। আশ্চর্য! এ কি সে কখনও ভাবতেও পেরেছিল?

বারাব্বাসকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে না? কেমন করে যাবে? কেমন করে সেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটির আত্মাকে দূর করে দিয়ে বারাব্বাসকে সে ফের সুস্থ করে তুলবে? কোন উপায়ই তার জানা নেই। এমন একজন শক্তসমর্থ মানুষ, সে কিনা শেষে এ-ই হয়ে গেল। নিজের আর তার কোন ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই; অন্যের আত্মার সে এখন বশীভূত। আর সে-আত্মা অত্যন্তই বলশালী, বারাব্বাসকে দিয়ে সে এখন যা-খুশি করিয়ে নিচ্ছে। মেয়েটি এমন-কিছু ভয়কাতুরে নয়। তা সত্ত্বেও তার ভয়-ভয় করতে লাগল।

না, ঠিক ভয়ও নয়। উপায়হীনতার একটা তীব্র অস্বস্তিই তাকে এখন অস্থির করে তুলেছে। মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী, পৃথুলা। বারাব্বাসই তার উপযুক্ত পুরুষ। আগে অন্তত ছিল। তখন সে ছিল স্বাভাবিক মানুষ; উদ্ভট এইসব চিন্তা তখনও তার মাথায় ঢোকেনি। কি ভাবছে বারাব্বাস? ভাবছে যে তারই আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। তা যে হয়নি, মেয়েটি তাতে সুখী। এছাড়া তার আর অন্য-কোন সান্ত্বনা নেই।

একা একা মেয়েটি তাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতেই সে একসময় বুঝল যে, সব-কিছুই আসলে তার কল্পনামাত্র। সত্যি-মিথ্যে কিছুই সে জানে না। কি-যে হয়েছে বারাব্বাসের, আদৌ তার উপরে কারুর ভর হয়েছে কিনা—তা-ও না। তবে হ্যাঁ, তার দিকে আর বারাব্বাসের কিছুমাত্র নজর নেই। অথচ সে বারাব্বাসকেই ভালোবাসে। তার এই উপেক্ষা সত্ত্বেও ভালোবাসে। এ তার মূর্খতা ছাড়া আর কি! দুচোখ তার অশ্রুতে ভরে উঠল। মনে হতে লাগল যে তার মতো অসুখী আর কেউ নেই।

ইতিমধ্যে দিনদুয়েক বারাব্বাস শহরে বেরিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতেই সে একদিন একটা বাড়িতে এসে হাজির হল। আসলে সেটা বাড়ি নয়, নিচু-মতন একটা গুদামঘর মাত্র! চেহারা দেখে অন্তত তাই মনে হয়। দেয়ালের গায়ে এখানে-ওখানে দু-চারটে ঘুলঘুলি—তা দিয়ে অল্প একটু আলো আসে। বাকি ঘর অন্ধকার। আর তার দম-আটকা বাতাসের সঙ্গে কাঁচা চামড়ার তীব্র একটা গন্ধ মেশানো। তাতে করে মনে হয় এটা চামড়ার গুদাম। অথচ এটা চামড়া-গলিও নয়। জায়গাটা হল কেড্রন উপত্যকার দিকে, তার ঠিক পাশেই একটা পাহাড়। এখানে আবার চামড়ার গুদাম ছিল কবে? বারাব্বাস একটু অবাক হল; তারপরেই সে বুঝল যে, পাহাড়ের উপরকার মন্দিরে যে-সমস্ত পশু বলি দেওয়া হয়, তারই চামড়া আগে এখানে শুকিয়ে নেওয়া হত। এখন আর হয় না। জায়গাটা এখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি কতকগুলি গামলা বসানো। গামলাগুলি শূন্য; তা সত্ত্বেও তার ভিতর থেকে উৎকট একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। মেঝের উপরে একরাশ জঞ্জাল।

বারাব্বাসকে কেউ দেখতে পায়নি। দরজার ধারে চুপচাপ এক কোণে সে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। ঘরের মধ্যে যারা এসে জমায়েত হয়েছে তারা সবাই প্রার্থনা-

রত। একদৃষ্টিতে বারাব্বাস তাদের লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সকলকেই সে দেখতে পাচ্ছে তা নয়; বলতে কি ঘুলঘুলির কাছে যারা বসে আছে, একমাত্র তাদেরকেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়—অন্য আর-কাউকেই না। তবে না-দেখেও বারাব্বাস বুঝল যে, এ ঘরের সব জায়গাতেই, এমন কি আনাচ-কানাচের অন্ধকারেও তারা ছড়িয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্য থেকেও তাদের মৃদু-মন্থর প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। কখনও কোন একটি জায়গায় দু-চার জনের প্রার্থনা একটু উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে, তারপর খাদে নামতে নামতে আবার মিলিয়ে যায়; শ্লথগম্ভীর একটিই গুঞ্জন জেগে থাকে। আর সেই মিলিত কণ্ঠ-গুঞ্জন। কখনো নিচু গ্রামের থেকে উঁচুতে, আরও উঁচুতে উঠে আসে। সারা ঘর যেন গমগম করে ওঠে তখন। মনে হয় যেন কি-এক আবেগে এরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, যেন কোন-কিছুর দিকেই এদের লক্ষ্য নেই। আর সেই উন্মত্ততার আবেগ একটু থিতিয়ে আসতে-না-আসতেই কেউ একজন উঠে দাঁড়ায়; তাদের প্রভু যে কত মহান, কত শক্তিশালী, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে তাই বর্ণনা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই সবাই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিস্তব্ধ, তবু উন্মুখ। মনে হয় যেন প্রত্যক্ষদর্শী এই লোকটির কথার থেকে তারা নতুনতর কোন শক্তি আর উদ্যম সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তারপর আবার প্রার্থনা।' আবারও সেই মিলিত কণ্ঠ-গুঞ্জন। আর তার দ্রুতলয় কণ্ঠের আঘাতে সারা ঘর ঝঙ্কৃত, পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; তারপর সে ভেসে যায়।

প্রার্থনার মধ্যে মধ্যে এতক্ষণ যারা উঠে দাঁড়িয়েছে, বারাব্বাস তাদের দেখতে পায়নি। এবার তার কাছের একজন দাঁড়াল। লোকটি মধ্যবয়সী, ঘর্মাক্তকলেবর। গাল দুটি গর্তে-বসা; তার উপর দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। কথা শেষ করে সে মেঝের উপরে শুয়ে পড়ল, কপাল দিয়ে সেখানকার মাটি স্পর্শ করল। তাদের প্রভুই যে সব-কিছু নন, তাঁরও উপরে যে একজন ঈশ্বর আছেন, হঠাৎ যেন সে-কথা তার মনে পড়েছে।

তার ঠিক পরেই দূরের থেকে আর-একজন উঠে দাঁড়াল। গলাটা মনে হল চেনা-চেনা। মুখের উপরে আলো এসে পড়েছে। দেখবামাত্রই বারাব্বাস তাকে চিনতে পারল। গ্যালিলির সেই লোহিতশ্মশ্রু লোকটি। অন্যান্যদের মতো তিনি উত্তেজিত নন, আপন ভাষায় ধীরে ধীরে শান্তকণ্ঠে তিনি কথা বলে যেতে লাগলেন। জেরু-সালেমের বাসিন্দারা এ-ভাষা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এরা কিন্তু করছে না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছে। কথাগুলির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, —তবু। প্রথমটায় তিনি তাঁর প্রভুর কথা বললেন। তাঁর শক্তি, তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তাঁকে যারা বিশ্বাস করে, তাঁরই জন্যে তাদেরকে নিপীড়ন এবং অত্যাচার সহ্য করতে হবে; প্রভুই সে-কথা বলে গিয়েছেন। সে-অত্যাচার যদি আসেই—আসবেই—শান্তচিত্তেই তাঁরা তাকে বরণ করে নেবেন; এবং সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁরা মনে রাখবেন যে, তাঁদের প্রভুকেও একদিন যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছে। তাঁর মতো অতখানি শক্তি অবশ্য তাঁদের নেই—তাঁরা দুর্বল, অক্ষম। তা সত্ত্বেও যন্ত্রণার সেই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও তাঁরা বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না, প্রভুকে তাঁরা অস্বীকার করবেন না। এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। বারাব্বাসের সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিল যে, কথা-গুলি যেন তিনি অন্যদের উদ্দেশেই শুধু নয়, নিজের উদ্দেশেও বলছেন। শ্রোতারা হয়ত আরও কিছু আশা করেছিল; দেখে বোঝা গেল, তারা হতাশ হয়েছে। তিনিও তা বুঝে থাকবেন হয়ত। একটুক্ষণ থেমে থেকে তিনি বললেন, প্রভু তাঁকে একসময় একটি প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন, সেটি আজ তিনি তাদের শোনাবেন। প্রার্থনা শুনে সবাই খুশি হ'ল, অনেকে দেখা গেল অভিভূত হয়ে পড়েছে। সারা ঘর প্রশংসামুখর, তারই মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে অভিনন্দন জানাতেও এগিয়ে এল। বারাব্বাস চিনতে পারল তাদের। এরাই তাকে একদিন বলেছিল, 'দূর হও নাস্তিক! দূর হও!'

আরও দু-একজন এরপর উঠে দাঁড়িয়ে তাদের প্রভু-সম্পর্কে দু-চার কথা বলল। সারা ঘরে এক তীব্র আনন্দ সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, ক্রমেই যেন তা আরও তীব্র, আরও ঘনীভূত হয়ে আসছে। আর সেই আনন্দের আবেগে উপবিষ্ট অবস্থাতেও দুলছে কেউ কেউ, সর্বাঙ্গ তাদের এক ছন্দোবন্ধ সুষমায় আন্দোলিত হচ্ছে। বারাব্বাসের মনে হল, এরা মন্ত্রমুগ্ধ। চুপচাপ সে সব দেখে যেতে লাগল।

কি এক বিস্ময় যে তার জন্যে জমা রয়েছে, তা সে তখন ভাবতেও পারেনি। আচমকা সে অবাক হয়ে গেল। ঠোঁটকাটা সেই মেয়েটি। ভিড়ের মধ্যে থেকে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাত দু-খানি তার শীর্ণ বুকের উপরে জড়ো করা; মুখখানি বিবর্ণ। আর সেই বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখের উপরে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সমাধিভূমির পাশে আকস্মিকভাবে সেই যে একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল, তারপর আর তাদের দেখা হয়নি। বারাব্বাসের মনে হল এই ক-দিনেই সে যেন আরও রোগা, আরও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। গাল দুটি গর্তে-বসা, দৃষ্টি বিস্ফারিত। পোশাকও শতছিন্ন। সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে, কেউই তাকে চেনে না। চেনে না বলেই মনে হল। মনে হল তারা বিস্ময়বোধ করছে। অথচ কেন যে এই বিস্ময় তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কি বলবে এই মেয়েটি!

সত্যিই তো, কি বলবে? এ প্রশ্ন বারাব্বাসেরও। মেয়েটি যেন বিব্রত বোধ করছে, কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কিছু বলুক আর নাই বলুক, বারাব্বাসের তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তা সত্ত্বেও তার অস্বস্তি লাগতে লাগল। কি বলবে ও?

স্পষ্টই বোঝা গেল মেয়েটি একটু ভয় পেয়ে গেছে। চোখ বুজে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারুর দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত তার নেই। যেন দু-চার কথা বলে এখন সে পালাতে পারলেই বাঁচে। এতই যদি ভয় তো এখানে না এলেই পারত। কি এমন ক্ষতি হত তাতে!

ঈশ্বরপুত্রের অলৌকিক শক্তি সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই কথাই সে আজ এখানে জানাবে। পৃথিবীর তিনি ত্রাণকর্তা। তাঁর অসীম শক্তিতে আস্থা জানিয়ে সে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করল। এমনিতেই মেয়েটি জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে, তার উপরে আবার এত লোক দেখে সে আজ ভয় পেয়ে গেছে। কোন কথাই তাই সে গুছিয়ে বলতে পারল না। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মনে হল, খুবই হতাশ হয়েছে তারা। অস্বস্তি বোধ করছে। দু-একজন তো লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে রইল। মেয়েটির শেষ ক-টি কথা বারাব্বাস শুনতে পেল—'প্রভু, তোমার হয়ে তুমি আমাকে সত্যজ্ঞাপন করতে বলেছিলে; তোমার আদেশই আমি পালন করলাম।' বলে সে এক কোণে বসে পড়ল। অন্যান্যদের উৎসুক দৃষ্টি থেকে সে এখন আত্মগোপন করতে পারলেই বাঁচে।

শ্রোতারা সব পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কিছুই প্রায় বলতে পারেনি মেয়েটি। তার এই অক্ষমতার জন্যেই যেন শান্ত-গম্ভীর এই অনুষ্ঠানের মর্যাদা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তা-ই হবে হয়ত। এরপর যে আর অন্য কিছু জমবে না, তা-ও সবাই জানে। সকলেই এখন সভাভঙ্গ করে বাড়ি যেতে চায়। বারাব্বাসকে যারা নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন, তাদেরই মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াল। লোকটি এদের নেতা-গোছের। উঠে দাঁড়িয়ে সে জানাল যে, আজকের মতো সভাভঙ্গ করা হচ্ছে। তারপর বলল, শহরের মধ্যে কোথাও মিলিত না হয়ে কেন যে তাঁরা সমবেত প্রার্থনানুষ্ঠানের জন্যে এমন একটি জায়গা বেছে নিয়েছেন, তা কারুর অজানা নয়। এরপর তাঁরা অন্য কোথাও মিলিত হবেন। কিন্তু ঠিক কোথায়, এখনও তা কিছু বলতে পারা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, প্রভুর আশীর্বাদে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্যেও যে নিরাপদ কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে তাতে তাঁদের সন্দেহ নেই। প্রভুই

তাঁদের সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তাঁরা তো নিরীহ মেষপালকমাত্র, প্রভুই তাঁদের রক্ষক। তাঁদের তিনি পরিত্যাগ করবেন না। এবং—

বাকি কথাগুলি বারাব্বাসের কানে গেল না। সে ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। এতক্ষণে তার স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার এখন কদর্য লাগছে।

দু-একদিনের মধ্যেই নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। বিচারের নামে সে এক বীভৎস অত্যাচার। ডাঙ্ গেটের সেই যে ছেলেটি, সারাক্ষণই যে হাঁপাত, অন্ধ-বুড়ো একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে জেরুসালেমের আদালতে গিয়ে তার নালিশ জানিয়ে এল। সেখানে গিয়ে সে বলল:

—ডাঙ্ গেটে আমাদের আস্তানার কাছে একটি মেয়ে থাকে; আশপাশের লোক-দের মধ্যে সে যা-তা সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে। বলছে, কে নাকি তার এক ত্রাণকর্তা আছেন, পৃথিবীকে তিনি পালটে দেবেন। আজকের এই পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করবেন, তারপর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই নতুন-পৃথিবীর অভ্যুদয় হবে। একমাত্র তাঁর কথা ছাড়া অন্য আর কারুর কথাই সেখানে খাটবে না। বলুন, এ কি মিথ্যে নয়? আর এই-সব মিথ্যে রটানো ছাড়া মেয়েটির আর অন্য-কোন কাজ নেই। এ মেয়ে সর্বনেশে। পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলে তবেই এর উপযুক্ত শাস্তি হয়। ঠিক কিনা!

বিচারক ধর্মবুদ্ধিপরায়ণ লোক। এটুকু শুনেই তিনি রায় দিতে রাজি নন। বুড়োকে তিনি সব খুলে বলতে বললেন। প্রথমত, এই ত্রাণকর্তাটি কে? বুড়ো তাতে বলল যে, অতশত সে জানে না। তবে হ্যাঁ, এই লোককে বিশ্বাস করবার অপরাধেই আরও অনেককে এর আগে হত্যা করা হয়েছে। মেয়েটিকে সে বলতে শুনেছে যে, এই ত্রাণকর্তাই তার প্রভু। প্রভু সবাইকে রক্ষা করবেন। কুষ্ঠরোগীদেরও তিনি দূরে সরিয়ে রাখবেন না। তাদের তিনি রোগমুক্ত করবেন, সুস্থ করে তুলবেন। আর পাঁচজনের মতো কুষ্ঠরোগীরাও তখন অবাধে সব জায়গায় যেতে পারবে। তা যদি হয় তো বড়ই ভয়ের কথা। এখন তবু তাদের সঙ্গে একটা করে ঘণ্টা থাকে, ঘণ্টার শব্দ শুনে সবাই সতর্ক হয়ে যায়। তা-ও যদি তখন না থাকে তো যে-কোন মুহূর্তেই তাদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে পারে—বিশেষ করে যারা অন্ধ তাদের কাছে এটা আরও আশঙ্কার কথা। এখন এই যে সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে মেয়েটি, এ কি অন্যায় নয়?

বিচারক ঈষৎ চিন্তিতভাবে তাঁর চিবুকের ডগায় মৃদু মৃদু টোকা মারতে লাগলেন; অন্ধ-বুড়ো তার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেল। তারপরেই তিনি প্রশ্ন করলেন:

—মেয়েটিকে কেউ বিশ্বাস করে?

—করে। বলতে কি, ডাঙ্ গেটের ওখানে একদল লোক আছে, এই ধরনের সব উদ্ভট কথা পেলে তারা আর অন্য-কিছুই শুনতে চায় না। সব চাইতে বেশি বিশ্বাস করে কুষ্ঠরোগীরা। সময় নেই অসময় নেই, মেয়েটি তাদের সঙ্গে গিয়ে মেলামেশা করছে। কুষ্ঠরোগীদের জন্যে যে আলাদা একটুখানি জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে, কয়েকবারই মেয়েটি সেখানে গিয়েছিল। এ নিয়ে আর এখন কানাঘুষোর অন্ত নেই। মেয়েটি নাকি তাদের কাছে গিয়ে নষ্ট হয়েছে। আগে আমি এ-সব কিছুই জানতাম না। হালে এ-সব কানে আসছে। মেয়েটির বিয়ে হয়নি এখনও; কিন্তু আর যা-ই হোক, ও-মেয়ে কুমারী নয়। লোকে তো বলে, একটি ছেলেও হয়েছিল; নিজেই ও তাকে হত্যা করেছে। তবে হ্যাঁ, সত্যি-মিথ্যে আমি জানি না। পাঁচজনে পাঁচকথা বলে; আর আমিও যখন কালা নই, দু-চারটে কথা আমার কানেও যায়। কানে আমি ঠিকই শুনতে পাই; চোখ দুটিই শুধু অন্ধ। অন্ধ হওয়া বড় দুর্ভাগ্য প্রভু, বড়ই দুর্ভাগ্য।

বিচারক সে-কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ক্রুশবিদ্ধ যে-লোকটিকে মেয়েটি ত্রাণকর্তা বলে রটিয়ে বেড়ায়, মেয়েটির মারফতে কি তার অনেক শিষ্যও জুটে গিয়েছে?

নিশ্চয়ই। তার কারণ প্রত্যেকেই চায় সেরে উঠতে। মেয়েটিও তাই রটিয়ে দিয়েছে যে, কানা হোক, খোঁড়া হোক—প্রত্যেককেই তিনি সারিয়ে তুলবেন। পৃথিবীর কোনখানেই আর তিনি কোন দুঃখ রাখবেন না। ডাঙ্ গেটে তো না-ই, কোনখানেই না। শুনে তার অঢেল শিষ্য জুটে গিয়েছিল। এখন অবশ্য তারা চটাচটি আরম্ভ করে দিয়েছে। মেয়েটি তাদের কথা দিয়েছিল যে, শীগগিরই আবার তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। এদিকে তাঁর দেখা নেই। সবাই তাই একটু বেঁকে বসেছে। মেয়েটিকে তারা সর্বক্ষণই কথা শোনাচ্ছে এখন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। এইটেই স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, কুষ্ঠরোগীরা অবশ্য এখনও বিশ্বাস করে তাকে। যেভাবে মেয়েটি তাদের কানে রাতদিন সব মন্ত্র ঢালছে, বিশ্বাস না করে আর উপায় কি! এমন কথাও সে তাদের বলেছে যে, কুষ্ঠরোগীদের তো এখন কেউ মন্দিরে ঢুকতে দেয় না, প্রভু তাদের মন্দিরেও নিয়ে যাবেন।

—কুষ্ঠরোগীদের? কি সর্বনাশ!

—হ্যাঁ, তাদেরকেও।

—মেয়েটি কি পাগল নাকি? পাগল ছাড়া কেউ বলে এ-কথা?

—মেয়েটি তো কিছু বলে না, তার প্রভুই তাকে দিয়ে বলান। প্রভুর নাকি অসীম ক্ষমতা। সব ইচ্ছাই তিনি পূর্ণ করতে পারেন, সব-কিছুকেই তিনি পালটে দিতে পারেন। কোন-কিছুই তাঁর অসাধ্য নয়; তিনি ঈশ্বরপুত্র।

—ঈশ্বরপুত্র!

—হ্যাঁ, তাই।

—মেয়েটি কি তাই বলে নাকি?

—শুধু কি বলে, এ তার দৃঢ় বিশ্বাস। আস্পর্ধার বহরটা একবার দেখুন; স্বচক্ষে যাকে সবাই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখেছে, সে কিনা ঈশ্বরপুত্র! আর মেয়েটিও কিনা স্বচ্ছন্দে তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে! শুধুমাত্র এই অপরাধেই ওর শাস্তি হওয়া উচিত। লোকটিকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করবার আদেশ দিয়েছিলেন, ভেবে-চিন্তেই দিয়েছিলেন। ঠিক কিনা।

—আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম।

—তবে তো আর কথাই নেই, সবই আপনি জানেন।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। বিচারক তাঁর চিবুকের ডগায় মৃদুমন্দ টোকা মারছেন। অন্ধ-বুড়ো তার শব্দ শুনে বুঝল যে, তিনি এখন চিন্তানিরত। তারপর একসময় সেই মৃত্যু-হিম স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি বললেন যে, মেয়েটির এই অদ্ভুত বিশ্বাসের জন্যে আদালতে ডেকে নিয়ে এসে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

মাথা নিচু করে অন্ধ-বুড়ো তাঁকে ধন্যবাদ জানাল। দেয়াল ধরে ধরে সে বাইরে আসবার চেষ্টা করছিল। অবস্থা দেখে তাকে সাহায্য করবার জন্যে বিচারক তাঁর একজন ভৃত্যকে ডেকে পাঠালেন। তারপর মেয়েটি যে সত্যিই অপরাধী, সে বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে শেষবারের মতো তাকে প্রশ্ন করলেনঃ

—মেয়েটির বিরুদ্ধে তোমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই তো?

—আক্রোশ! আক্রোশ কেন থাকবে? কারুর বিরুদ্ধেই আমার কোন আক্রোশ নেই। আমি অন্ধ, এদের আমি চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। আর শুধু এদের বলেই নয়, কাউকেই কখনও আমি দেখিনি। আক্রোশ কেন থাকবে? যা সত্যি, তাই শুধু আপনাকে জানালাম।

ভৃত্যটি তাকে বাইরে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এল। ফটকের বাইরে সেই ছেলেটি তখনও অপেক্ষা করছিল। অন্ধ-বুড়ো তার শ্বাস-টানার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে সে তার হাত ধরল গিয়ে। তারপর দুজনে মিলে ডাঙ্ গেটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

রায় দেওয়া হল, মেয়েটি অপরাধী; আর এই অপরাধের জন্যে তাকে হত্যা করা হবে। শহরের দক্ষিণ দিকে বিরাট যে-একটি গহ্বর রয়েছে, একটু বাদেই তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। রায় শুনবার জন্যে প্রচুর লোক আদালতে গিয়ে জমা হয়েছিল। সারাটা পথ তারা চিৎকার করতে করতে এসেছে। মন্দির-রক্ষী একজন কর্মচারীও তাঁর সান্ত্রীদের নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সান্ত্রীদের চুল এবং দাড়ি ফিতে-বাঁধা; পা থেকে কোমর পর্যন্ত অনাবৃত। প্রত্যেকের হাতেই ষাঁড়ের চামড়ার দীর্ঘ এক-একখানি চাবুক। চাবুক আস্ফালন করে তারা শান্তিরক্ষা করছে। সান্ত্রীদেরই একজন মেয়েটিকে সেই গহ্বরের মধ্যে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে এল। উত্তেজিত জনতাও ততক্ষণে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। গহ্বরের মধ্যে বড় বড় সব পাথর ছড়ানো; আর তার গায়ে চাপ-চাপ রক্তের দাগ। স্পষ্টই বোঝা যায়, ইতিপূর্বে তারা আরও অনেককে এইভাবে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'চুপ, চুপ।' মুহূর্তে সবাই শান্ত হয়ে গেল। আর সেই ভৌতিক নিস্তব্ধতার মধ্যে নগর-পুরোহিতের একজন সহকারী তাঁর ধীরমন্থর কন্ঠে রায় পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। মৃত্যুদণ্ডের কারণ বর্ণনা করে তারপর তিনি বললেন যে, মেয়েটির বিরুদ্ধে যে এসে অভিযোগ উত্থাপন করেছে তাকেই সর্বপ্রথম পাথর ছুঁড়তে হবে। অন্ধ-বুড়োকে তখন গহ্বরের ধারে নিয়ে যাওয়া হল। একজন তাকে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। কিন্তু বোঝা গেল যে, ব্যবস্থাটা তার মনঃপূত হয়নি।

—কেন, আমি কেন ওকে পাথর ছুঁড়তে যাব? আমি কেন? আমি তো ওকে দেখিনি পর্যন্ত—

সবাই তাকে বুঝিয়ে বলল যে, এইটেই হল আইন। আইনের নির্দেশ, এ কি অমান্য করা যায়? অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ো এগিয়ে এল তখন। কে একজন তার হাতে একখণ্ড পাথর তুলে দিতেই পাথরখানাকে সে সামনে ছুঁড়ে মারল। তারপর আবার, আবার। এবং প্রতিবারেই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে লাগল। সে অন্ধ, লক্ষ্যবস্তুকে সে দেখতেও পাচ্ছে না। কি করে সে লক্ষ্যভেদ করবে! এলোপাতাড়ি সে পাথর ছুঁড়ে যেতে লাগল শুধু। বারাব্বাস তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল দৃষ্টি তার মেয়েটির দিকে নিবন্ধ। এবারে সে চোখ ফিরিয়ে দেখল যে, বুড়োকে সাহায্য করবার জন্যে কে-একজন এগিয়ে এসেছে। লোকটির চেহারা রুক্ষ, কঠিন। আর তার কপালের একধারে চামড়ার একটি ছোট্ট খাপ লটকানো; তার মধ্যে আইনের নির্দেশনামা রয়েছে। লোকটি বোধ হয় একজন কলমচি। বুড়োর হাতের মধ্যে একখণ্ড পাথর তুলে দিয়ে হাতখানাকে সে সামনে এগিয়ে ধরল। টিপ ঠিক করে দিল। তারপর সজোরে নিক্ষিপ্ত হল সেই পাথর। এবং এবারেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। গহ্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি; চোখ দুটি উজ্জ্বল, বিস্ফারিত। সে জানে, মৃত্যু তার অবধারিত। সেই মৃত্যুর জন্যেই সে এখন প্রতীক্ষা করছে।

এত করেও যখন কিছু হল না, লোকটি অধৈর্য হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে বড় আর ধারালো একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিল সে, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সেই পাথর ছুঁড়ে মারল। এবারে আর সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। অল্প-একটু টলে উঠল মেয়েটি, তারপর আছড়ে পড়ে গেল। শীর্ণ দুর্বল হাত দুখানি তার সামনের দিকে প্রসারিত; অসহায়ের

মতো কি যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে। জনতা ওদিকে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চিৎকারে আর কান পাতা যায় না। লোকটির দিকে ফিরে তাকাল বারাব্বাস; দেখল যে, লক্ষ্যভেদের আনন্দে তার সারামুখ উদ্ভাসিত। পা টিপে বারাব্বাস তার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর তার জামাটা একটু তুলে ধরেই লম্বা একখানা ছুরি বসিয়ে দিল সে। এ-কাজে তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ব্যাপারটা কেউ টের পর্যন্ত পেল না। আর তা-ছাড়া সকলেই তখন পাথর-ছোঁড়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; টের পাবার তাই কথাও নয়।

কার্যোদ্ধার করে গহ্বরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল বারাব্বাস। টলতে টলতে মেয়েটি এগিয়ে আসছে; হাত দুখানি সামনে প্রসারিত। সেই অবস্থাতেই সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল:

—এসেছেন! তিনি এসেছেন!—আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি!—

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি। মনে হল যেন সে এক অলক্ষ্য পুরুষের বস্ত্রপ্রান্ত আঁকড়ে ধরেছে। অনুনয়কাতর কন্ঠে বলছে:

—প্রভু, কি করে আমি তোমার হয়ে সাক্ষ্য দেব বল! আমি অক্ষম। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা—

পাথরে-পাথরে রক্ত-মাখামাখি; তারই উপরে মেয়েটি আছড়ে পড়ল আবার। আর উঠল না।

হত্যা-পর্ব সমাপ্ত হবার পরে অবাক হয়ে সবাই দেখল যে, জনতার মধ্যেও যেন কে-একজন মরে পড়ে আছে। আর অন্য একজন লোকও হঠাৎ সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। অলিভ-অরণ্যের শাখায়-শাখায় তখন অন্ধকার নেমে এসেছে; সেই অন্ধকারের মধ্যে যে সে কোথায় মিলিয়ে গেল কেউ বুঝতেই পারল না। জনকয়েক সান্ত্রী অবশ্য তার পিছু নিয়েছিল, তাতে কোন লাভ হয়নি। ধরিত্রীই যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই আবার গা-ঢাকা দিয়ে ফিরে এল বারাব্বাস। গহ্বরের গা বেয়ে বেয়ে সে নিচে নেমে গেল। অন্ধকারে পথ ঠাহর হয় না, হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোতে হয়। একটু এগিয়েই সে মেয়েটিকে দেখতে পেল। স্তূপীকৃত পাথরের নিচে তার মৃতদেহ প্রায় চাপা পড়ে গেছে। সর্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মৃত্যুর পরেও বহুক্ষণ ধরে তার উপরে শিলা-বৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহটিকে তুলে নিয়ে গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল বারাব্বাস, তারপর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ঘন্টার পর ঘন্টা সে পথ হাঁটছে। কাঁধের থেকে মৃতদেহটিকে মাঝে মাঝে সে সামনে নামিয়ে রেখে একটু জিরিয়ে নেয়, তারপর ফের পথ চলতে শুরু করে। আকাশ এখন মেঘমুক্ত, নক্ষত্রগুলি সব ঝকঝক করছে। এতক্ষণ চাঁদ ছিল না, এবারে চাঁদও উঠল। মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল বারাব্বাস। আশ্চর্য এত যে ওরা পাথর ছুঁড়েছে, মুখখানি তবু বিক্ষত হয়নি। পান্ডুর, প্রায়-স্বচ্ছ মুখ। মৃত্যুর পরেও তার কোন বিকৃতি ঘটেনি। শুধু ঠোঁটের উপরকার সেই কাটা-দাগটি আর এখন চোখে পড়ে না। না পড়ুক, কিছুই আর তাতে যায় আসে না। সব-কিছুই এখন অর্থহীন।

এই মেয়েকেই বারাব্বাস একদিন প্রেম নিবেদন করেছিল। সেদিনকার কথা আজ আবার তার মনে পড়ল। মেয়েটিকে সে যখন—না, এ নিয়ে সে আর ভাববে না কিছু!—কিন্তু তাকে যখন সে তার ভালোবাসার কথা জানিয়েছিল, জানিয়েছিল যে সে তাকে নিজের মতো করে পেতে চায়, সারা মুখ তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বারাব্বাসের তা মনে আছে। অন্য আর-কেউ কখনও তাকে প্রেম নিবেদন করেনি। আর বারাব্বাসের প্রেমও যে মিথ্যে, নেহাতই মিথ্যে, তাও বোধ হয় সে জানত। জানত তবু খুশি হয়েছিল? নাকি জানত না? সে যাই হোক, যা-কিছু তার কাছে প্রার্থনা করেছে বারাব্বাস, পেয়েছে।

তার কাছে যা অপরিহার্য, যা না হলে সে বাঁচতে পারে না, মেয়েটি তা তাকে দিয়েছে। রোজই দিয়েছে। এতখানি সে হয়ত চায়ওনি। মেয়েটির গলা একটু কর্কশ, আর সেই কর্কশ গলায় সে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলত। বারাব্বাসের তাতে অসহ্য বিরক্তি লাগত এক-এক সময়। সে-কথা সে তাকে বলেও দিয়েছিল। বলেছিল যে, সে যেন অত বাজে না বকে। হাতের কাছে তখন আর অন্য-কোন মেয়ে ছিল না, বাধ্য হয়েই বারাব্বাসকে তখন এই মেয়েকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে। পা সারবার পরে সে আর ফিরেও তাকায়নি অবশ্য, তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ করেছে। তাছাড়া সে আর কি-ই বা করতে পারত!

সামনেই আদিগন্ত মরুভূমি; বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় তাকে ক্লান্ত, নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে। যে দিকেই চাও, সেই একই দৃশ্য, একই ক্লান্তি, একই শূন্যতা ছড়িয়ে আছে। বারাব্বাস তা জানে।

পরস্পরকে ভালোবাস—

মাথা নিচু করে আর-একবার সে মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে পথ চলতে শুরু করল।

উট আর খচ্চরে-হাঁটা পথ। জেরুসালেমের থেকে শুরু হয়ে জুডার মরুভূমির মধ্য দিয়ে এ-পথ মোয়াবাইট-ভূমিতে গিয়ে পড়েছে। পথ-চলতি ভারবাহী পশুর পিঠ থেকে পড়ে-যাওয়া টুকিটাকি দু-একটা জিনিস এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এক-আধটা কঙ্কালও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ধবধবে সাদা ক-খানা অস্থিমাত্র; ক্ষুধার্ত শকুনের দল তার উপর থেকে ঠুকরে ঠুকরে মাংস তুলে নিয়েছে। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। এতক্ষণ সে চড়াই ভেঙে এসেছে, সামনে এবারে উতরাই শুরু। পথও প্রায় শেষ হয়ে এল। ছোটখাট দু-একটা গহ্বর পার হয়ে এসে অল্পক্ষণের জন্যে থেমে দাঁড়াল বারাব্বাস। আর-একটা মরুভূমি তার সামনে। আগের চাইতে এটি আরও দুর্গম, আরও বন্ধুর। এটিও তাকে পার হতে হবে। পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবারে একটু জিরিয়ে নেবে। আর বেশি দেরি নেই। সামনের এই বালুরাশি পার হতে পারলেই তার যাত্রা শেষ।

জায়গাটা সে খুঁজে নিতে পারবে তো? নাকি এখানকার সেই বুড়োর কাছে একবার জিজ্ঞেস করে নেবে? না, তার দরকার নেই। যা করবার সে একাই করবে। কি দরকার তার অন্য কারুর কাছে গিয়ে? বুড়ো হয়ত এর অর্থই বুঝতে পারবে না। বারাব্বাস নিজেই কি পেরেছে? সত্যিই তো, সাতরাজ্য ডিঙিয়ে মেয়েটিকে সে এখানেই বা নিয়ে আসতে গেল কেন? কেন আবার, তার আত্মা এখানে শান্তিলাভ করবে, তাই। এই তার উপযুক্ত জায়গা। গিলগলে কি কেউ তাকে শান্তি দিত? দিত না। আর জেরুসালেমে পড়ে থাকলে তার এই মৃতদেহ এতক্ষণে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হত। সেই অসম্মান থেকে বাঁচাবার জন্যেই বারাব্বাস তার মৃতদেহ এখানে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। বাঁচাবার জন্যে? মৃতকে কি কেউ বাঁচাতে পারে? নাকি কোন দরকার হয় তার? সম্মান-অসম্মান সবই তো তার কাছে সমান। আর তাছাড়া এখানেই কি মেয়েটি শান্তি পাবে? এখানেও কি একদিন তাকে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হয়নি? একটিই মাত্র সান্ত্বনা আছে এখন। মেয়েটির মৃত-শিশুকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে; তাকেও এবারে সেই একই শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হবে। এই এখন তার একমাত্র শান্তি, তার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু এরই-বা কি মূল্য? কিছুমাত্র মূল্য নেই। সম্পূর্ণই নিরর্থক। বারাব্বাস তা জানে। জেনেও সে সেই অর্থহীন কাজই করে যাচ্ছে। কেউ তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। যে বেঁচে নেই, তাকে তুষ্ট করা বড় কঠিন।

জেরুসালেমে যাবার কি এমন দরকার পড়েছিল মেয়েটির! জনকয়েক উন্মাদ

মিলে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, পৃথিবীতে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়েছে, রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, সবাইকেই তাঁর জন্মভূমিতে গিয়ে মিলিত হতে হবে। এদের সঙ্গে গিয়ে না জুটলে কি তার চলছিল না? তার চেয়ে সে যদি সেই বুড়োর কথা মেনে চলত, এমনভাবে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হত না। বুড়ো এ-সব হুজুগে মেতে ওঠেনি। বলেছিল যে, এ-সব তার অনেক দেখা আছে। এ-রকম লোক-ঠকানো ত্রাণকর্তা সে অনেক দেখেছে। কে বলবে, এ-ও তেমন একজন নয়? মেয়েটি সে-সব শোনেনি। না শুনে উন্মাদদের সঙ্গে গিয়ে জুটেছিল।

আর তার ফলও সে হাতে-হাতেই পেয়েছে। বারাব্বাস তার মৃতদেহের দিকে তাকাল। চূর্ণবিচূর্ণ, রক্তাক্ত। সে কিনা তার ত্রাণকর্তার জন্য সব তুচ্ছ করেছিল! ত্রাণকর্তা! সত্যি?

সত্যি? সত্যিই কি তিনি এই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা? মানুষকে তিনি রক্ষা করবেন? তা-ই যদি হবে তো মেয়েটিকে তিনি রক্ষা করলেন না কেন? কেন তাকে এভাবে মরতে দিলেন? কই, বাঁচাতে পারলেন না তো!

ইচ্ছা করলেই পারতেন। ইচ্ছে করলেই মেয়েটিকে তিনি বাঁচাতে পারতেন। সে-ইচ্ছে তাঁর হয়নি। তার কারণ, নিজেরই হোক আর অন্যেরই হোক, যন্ত্রণাকেই তিনি ভালোবাসেন। ভালোবাসেন যে, অন্যেরা তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দিক, তাঁর হয়ে যন্ত্রণাভোগ করুক।—'তোমার হয়ে তুমি আমাকে সত্যজ্ঞাপন করতে বলেছিলে, তোমার আদেশই আমি পালন করলাম।'—'মৃত্যুর ওপার থেকেও তোমার জন্যে আমি সাক্ষ্য দিতে এসেছি।'

না, ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটিকে তার ভাল লাগেনি। সে তাঁকে ঘৃণা করে। তিনিই একে হত্যা করেছেন। মেয়েটি তাঁর জন্যে মৃত্যুবরণ করুক, এ-ই তিনি চেয়েছিলেন। মৃত্যুর থেকে তিনি ওকে বাঁচাতে চাননি। সকলের অলক্ষ্যে তিনি সেই বধ্যভূমিতে এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর-কেউ না জানুক, বারাব্বাস তা জানে। মেয়েটি যে তাঁর দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে তো তাঁর মমতালাভের জন্যেই। প্রাণপণ শক্তিতে সে তাঁর বস্ত্রের প্রান্তভাগ আঁকড়ে ধরেছিল, সেও তাঁর সাহায্যলাভের জন্যেই। সাহায্য তিনি করেননি। করতে পারতেন, তবু করেননি। আর এই নির্মম পুরুষই কিনা ঈশ্বরপুত্র। ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র! মানুষের ত্রাণকর্তা!

বারাব্বাসের যা করবার সে করেছে। প্রথম যে-লোকটি পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, ছোরা মেরে সে তাকে হত্যা করেছে। সে-টুকু যে করতে পেরেছে তাইতেই সে খুশি। তাতে অবশ্য কোন লাভ হয়নি। তার আগেই মেয়েটি আহত হয়েছিল। ছোরা মেরেও তাই কোন ফল হল না। না হোক, তবু সে তার কর্তব্য করেছে।

হাতের উলটো-পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে আপন-মনেই একবার হেসে উঠল বারাব্বাস। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মৃতদেহটি তুলে নিয়ে সে ফের উঠে দাঁড়াল। পথ চলতে তার এখন ক্লান্তি লাগছে।

একটু এগিয়েই সেই বুড়োর আস্তানা। দেখেই বারাব্বাস চিনতে পারল। কোথায় যে শিশুটিকে কবর দেওয়া হয়েছে, সেবারে এই বুড়োই তা তাদের চিনিয়ে দিয়েছিল। জায়গাটা তার এখন মনে নেই; তবে একবার যখন এসেছে, এবারেও ঠিক চিনে নিতে পারবে। ডানদিকে থাকে কুষ্ঠরোগীরা, আর সামনের দিকে সেই উন্মাদদের আড্ডা। না, অত দূরে নয়। আর-একটু এগিয়েই বারাব্বাস চিনতে পারল, এই সেই জায়গা। চাঁদের আলোয় অবশ্য অন্যরকম দেখাচ্ছে। তা দেখাক, এই যে সেই জায়গা, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এইখানেই এসেছিল তারা। বুড়োর কাছেই শুনেছে যে, মাতৃজঠরেই শিশুটি মারা গিয়েছিল। এ শিশু অভিশপ্ত, অপবিত্র। ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই বুড়ো তাই তাকে কবর দিয়েছে, কিছুমাত্রও দেরি করেনি। তোমার সন্তান

অভিশপ্ত হোক। মা তখন আসতে পারেনি; পরে সে মাঝে মাঝে এখানে এই কবরের পাশে এসে বসে থাকত।—সারাক্ষণই বুড়ো এইসব বলে যাচ্ছিল।

আর-একটু এগিয়েই চোখে পড়ল বারাব্বাসের। এটাই সেই কবর।

পাথরের ঢাকনাটাকে তুলে ধরে মেয়েটিকে সে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল তার মধ্যে। রক্তাক্ত হাত দু-খানিকে সযত্নে একটু গুছিয়ে রাখল। শেষবারের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ! তারপর সেই পাথরখানাকে ফের কবরের মুখে নামিয়ে দিল। বারাব্বাসের এবারে ছুটি। সামনেই তার ধু ধু মরুভূমি। চাঁদের আলোয় তার উপরে এক বিবর্ণ হলুদ ক্লান্তি ছড়িয়ে গেছে। মৃত্যুলোকের প্রতিচ্ছবি যেন। মৃত্যুলোক! এতক্ষণে সে মৃত্যুলোকে গিয়ে প্রবেশ করেছে। বারাব্বাসই পেণছে দিয়েছে তাকে। নিজের শিশু-সন্তানের পাশেই সে এখন চিরনিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু কি তাতে এসে যায়? কিছুই না। বারাব্বাসের যা কর্তব্য, সে করেছে। লালচে দাড়ির গুচ্ছে মৃদু-মৃদু টোকা মারতে মারতে আপন মনেই সে হেসে উঠল আবার।

পরস্পরকে ভালোবাস—

বারাব্বাস যখন তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে ফিরে এল, তার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রথমটায় কেউ তাকে চিনতেই পারল না। তার এই পরিবর্তনের খানিকটা আভাস তারা জেরুসালেমেই পেয়েছিল বটে, তবে তাতে খুব বিচলিত হয়নি। ভেবেছিল যে, দীর্ঘদিন বেচারা কারারুদ্ধ হয়ে ছিল, তারপর মরতে মরতে ছাড়া পেয়েছে—তাই হয়ত এই ভাবান্তর ঘটে থাকবে; ভেবেছিল যে, দু-একদিন বাদেই সে আবার সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠবে। বহুদিন কেটে গেছে তারপর, তবু সে তার স্বাভাবিকতা ফিরে পায়নি; বরং যে-পরিবর্তনের তারা আভাসমাত্র পেয়েছিল, সেইটিই এখন দৃঢ়মূল হয়ে তার উপরে চেপে বসেছে। কি এর কারণ, তারা জানে না। শুধু জানে যে বারাব্বাস আর এখন আগের সেই স্বাভাবিক মানুষটি নয়।

অবশ্য সত্যি বলতে কি, চিরকালই ওর হাবভাব একটু অদ্ভুত। এত অন্তরঙ্গতা, এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কেউ ওকে ঠিক চিনে উঠতে পারেনি, কোথায় যেন একটা ব্যবধান থেকে গেছে। কিন্তু তাই বলে কি আজকের এই অবস্থার সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে! সমস্ত পরিচয় ধুয়ে-মুছে দিয়ে সম্পূর্ণই অচেনা এক মূর্তিতে সে আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ কাউকে চেনে না, কখনও দেখেনি পর্যন্ত। লুট-তরাজের আঁটঘাট নিয়ে যখন তারা কথা বলতে আসে, সে-কথায় সে মনই দেয় না। পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক, কেমন যেন উদাসভাবে সে তাকিয়ে থাকে। সব-কিছু সম্পর্কেই সে এখন নিস্পৃহ, নির্বিকার। জর্ডন উপত্যকায় গিয়ে যখন তারা হানা দেয়, মরুযাত্রীদের উপরে লুটপাট চালায়, বারাব্বাস তাতে অংশগ্রহণ করে ঠিকই, তবে গা লাগায় না। তাই বলে যে বিপদে-বিঘ্নে ও কিছু ভয়গ্রস্ত, তা-ও নয়। আসলে ও এখন নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে, কোন-কিছুতেই ওর আর তেমন মন নেই। একদিন শুধু এই মনমরা ভাবটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল বারাব্বাসের। জেরিকো অঞ্চল থেকে কারা যেন সেদিন নগর-পুরোহিতের খাজনা নিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে তাদের মন্দির-রক্ষী দুজন প্রহরী। বারাব্বাস সেদিন প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল বললেই চলে; রক্ষী দুজনকে হত্যা করতে সেদিন ওর এতটুকু দ্বিধা হয়নি। অথচ এর কোন দরকার ছিল না; আক্রমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আত্মসমর্পণ করেছিল। তা সত্ত্বেও বারাব্বাস তাদের রেহাই দেয়নি। লোক দুজনকে সে টুকরো টুকরো করে কেটেছে, তারপর তাদের খণ্ড-বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের উপরে সে প্রায় উন্মত্তের মতোই থুথু ছুঁড়েছে। সে এক পৈশাচিক উল্লাস। বন্ধুদের সেটা ভালো

লাগে নি, বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। প্রহরীদের তারা ঘৃণা করে, নগর-পুরোহিত আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদেরও। কিন্তু তাই বলে কারুর মৃতদেহকে তারা অসম্মান করতে রাজি নয়। মৃতেরা পড়ে মন্দিরের এলাকায়, আর মন্দির হল ঈশ্বরের। মৃতকে অসম্মান করলে তাই ঈশ্বরকে অসম্মান করা হয়। বন্ধুরা সেদিন ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ঐ একদিনই। একদিন একটু ঝলসে উঠেই সে আবার নিভে গেছে। দলে থাকতে হলে প্রত্যেককেই কিছু-না-কিছু কাজ করতে হবে, সেইটেই নিয়ম। কাজে আর বারাব্বাসের উৎসাহ নেই; সে এখন নিয়মরক্ষা করে মাত্র। জর্ডন নদীর এক খেয়াঘাটে যেদিন রোমান পাহারাদারদের উপরে আক্রমণ চালান হল, সেদিনও তার কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। অথচ এই রোমানরাই বারাব্বাসকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিল। দলের আর সবাই সেদিন মেজাজে ছিল, তাই রক্ষে। প্রতিটি সৈন্যকে হত্যা করে তারা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, একটিকেও তারা পালাতে দেয়নি। অত্যাচারী এই রোমানদের যে বারাব্বাস ঘৃণা করে, তা তারা জানে; সে-ব্যাপারে তাদের এতটুকুও সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও যে সেদিন তার কোন উৎসাহ দেখা গেল না, তাতে তারা অবাক হয়ে গেছে। অবাক হবারই কথা। সে-রাতে যদি তারা এতটুকুমাত্র নিরুদ্যম হয়ে পড়ত, বারাব্বাসের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকত, তো আর কথা ছিল না। অবস্থা তাহলে সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াত।

কেন যে বারাব্বাস এমন পালটে গেল, তারা জানে না। এ-পরিবর্তন যেমন আকস্মিক, তেমনই বিস্ময়কর। দলের মধ্যে সে-ই সবচাইতে সাহসী। কোথায় কবে কি লুট করা হবে, কার উপরে আক্রমণ চালানো হবে, বারাব্বাসই তা ঠিক করত—এবং প্রতিবারই সে সফলকাম হত। মনে হত, কোন-কিছুই তার পক্ষে অসাধ্য নয়। তার অদম্য সাহসে, তার অদ্ভুত চাতুর্যে সবাই মুগ্ধ তখন। তারা প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে, যা-কিছুতেই সে হাত দিক না কেন, সাফল্য তার অবধারিত। সাহস আর বুদ্ধিবলেই সে তাদের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ মজা এই যে, কেউই তাকে ঠিক পছন্দ করত না। চিরকালই লোকটা একটু খেয়ালী ধরনের, একটু-বা স্বল্পবাক। দলের আর-পাঁচজনের সঙ্গে তাই ওর ঠিক খাপ খায়নি। তারাও কোনদিন ওকে বুঝে উঠতে পারত না। বুঝত না, কিন্তু বিশ্বাস করত। বারাব্বাসকে তারা ভালোবাসেনি—কিন্তু সম্ভ্রম করেছে, ভয় করেছে। আর এই সম্ভ্রম আর ভয়ের ভিতরেই দৃঢ়মূল একটি বিশ্বাস জন্মলাভ করেছিল যে, যা-কিছুই সে করুক, তাতেই সে সাফল্যলাভ করবে। যে ছিল সঙ্গীমাত্র, ধীরে ধীরে সে নেতা হয়ে দাঁড়াল।

সেই নেতাই এখন নিরুদ্যম, নেতৃত্বে তার স্পৃহা নেই। চুপচাপ সে গুহামুখে বসে থাকে; জর্ডন উপত্যকার ওপারে মর্মর সমুদ্র—সেই অলক্ষ্য সমুদ্রের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে-দৃষ্টি অদ্ভুত, সে-দৃষ্টি অর্থহীন। সে-চোখে চোখ পড়লেও যেন কেমন অস্বস্তি লাগে। বড় একটা কথাও বলে না আজকাল। যদি-বা বলে তো তখন তাকে এতই অন্যমনস্ক মনে হয় যে, অস্বস্তিটা তাতে আরও বেড়ে যায় মাত্র। মরতে মরতে লোকটা বেঁচে গেছে, তাই হয়ত এই পরিবর্তন ঘটে থাকবে। কিন্তু সত্যিই কি ও বেঁচে গেছে? মনে তো হয় না। মনে হয়, মারাই গিয়েছিল; মারা গিয়ে তারপর আবার ফিরে এসেছে।

এসে এখন অস্বস্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার এই প্রত্যাবর্তনে কেউ খুশি নয়। যতদিন সে নেতা ছিল, তার মূল্য ছিল। সে-মূল্য তারা দিয়েওছে। সেই নেতৃত্বেই সে এখন বীতস্পৃহ। তার আর-কোন মূল্যও তাই নেই। সে এখন অনাকাঙ্ক্ষিত, গলগ্রহমাত্র।

দুদিন আগেও বারাব্বাস তাদের নেতা ছিল; ছিল অসমসাহসী। লুটতরাজের

নিত্য-নতুন উপায় উদ্ভাবনে তার তুলনা পাওয়া যায়নি। বিনাবাক্যে তারা তখন তার নির্দেশ পালন করেছে। মৃত্যুকে সে তখন তুচ্ছ করে ফিরত। এ-সবই সত্যি। কিন্তু চিরকালই সে কিছু এত সাহসী ছিল না। ইলায়াহু যেদিন তার চোখের নিচে একখানা ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল, তার আগে পর্যন্তও ছিল না। সেদিন থেকেই সে সাহসী হয়ে উঠেছে।

তার আগে সে ছিল ভীরু, কাপুরুষ। সেই ভীরুতার খোলসের মধ্য থেকেই হঠাৎ একদিন তার পুরুষ-সত্তার অভ্যুদয় ঘটল। ইলায়াহু তাকে খুন করতেই চেয়েছিল। সে-চেষ্টা তার সফল হয়নি। সেদিনকার সেই মৃত্যুপণ-সংগ্রামে বারাব্বাসই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। ইলায়াহু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, প্রচণ্ড শক্তিশালী। কিন্তু তারুণ্যের ক্ষিপ্রতার কাছে সে সেদিন পরাভূত হয়েছে। যুদ্ধশেষে তার শ্রান্তক্লান্ত দেহটিকে দুহাতে কুড়িয়ে নিয়ে বারাব্বাস যখন তাকে এই পাহাড়ের চূড়োর উপর থেকে নিচের দিকে ছুঁড়ে মারল, শিউরে উঠেছিল সবাই। ইলায়াহু কি জানত না যে, এ-যুদ্ধে তার নিজেরই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটবে! জানত যদি তো আগ বাড়িয়ে সে লড়তে গিয়েছিল কেন? তার কারণ আর অন্য-কিছুই নয়, বারাব্বাসকে সে ঘৃণা করত,—অসম্ভব ঘৃণা করত, কিন্তু তারই বা কারণ কি? অনেক ভেবেও তারা এর কোন কারণ খুঁজে পায়নি; সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের কাছে একটা রহস্য বলে মনে হয়েছে।

সেদিনকার সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বারাব্বাসের সুপ্ত-সত্তার জাগরণ। সেদিন থেকেই সে তাদের নেতা। তার আগের দিন পর্যন্তও তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সে যেন ঘুমিয়ে ছিল; ছুরিকাঘাতের ওই তীব্রতাই তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে আর তাদের আলোচনার অন্ত ছিল না।

আসল কথাটা কিন্তু তারা জানত না। কেউই জানত না যে, বারাব্বাসের হাতে যার মৃত্যু ঘটেছে, যার সেই শোচনীয় মৃত্যুর কথা এখনও তাদের স্পষ্ট মনে আছে, সেই ইলায়াহুই হল বারাব্বাসের পিতা। বারাব্বাসের মা ছিল এক মোয়াবাইট নারী। বহুদিন আগে জেরিকোর রাস্তায় এক দস্যুদল তাকে অপহরণ করেছিল। সবাই মিলে তার দেহ-সম্ভোগের পর জেরুসালেমেরই এক পতিতালয়ে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। দুদিন বাদেই বোঝা গেল যে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। বুঝবামাত্র বাড়িওয়ালী তাকে তাড়িয়ে দেয়। মেয়েটি তখন সম্পূর্ণই নিরাশ্রয়। এই নিরাশ্রয়-অবস্থায় জেরুসালেমের রাস্তার উপরে তার একটি সন্তান হল। সন্তানের জন্মদানের খানিক বাদেই মেয়েটির মৃত্যু ঘটে। নবজাতকের পরিচয় পর্যন্ত তাই কেউ জানতে পারেনি। এইটুকু শুধু সবাই বুঝতে পারল যে, ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এর উপরে এর মায়ের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। স্বর্গ আর মর্ত্য এবং স্বর্গ-মর্ত্যের অধীশ্বরের প্রতি তীব্র ঘৃণাভরেই এর মা এর জন্মদান করেছে।

এই যে রহস্য, এ কেউ জানে না। গুহার ভিতরে বসে ফিসফাস যারা কথাবার্তা কইছে তারা তো না-ই, বারাব্বাসও না। চুপচাপ সে বসে রয়েছে। মোয়াবের অগ্নিদগ্ধ পর্বতমালার ওপারে যে আদিগন্ত জলরাশি ছড়িয়ে পড়ে আছে, লোকে যাকে বলে মর্মর-সাগর, সেদিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এইখানে এই পর্বতচূড়া থেকেই ইলায়াহুকে সে একদিন নিচে ফেলে দিয়েছিল। অথচ ইলায়াহুর কথাও সে এখন ভাবছে না। সে ভাবছে সেই ত্রাণকর্তার মায়ের কথা। ক্রুশবিদ্ধ সন্তানের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। দুই চক্ষু অশ্রুহীন, মুখ দেখে তাঁর দুঃখ বোঝা যায়নি। দুঃখের সেই যন্ত্রণাকে তিনি গোপন করে রেখেছিলেন। সবই এখন তার মনে পড়ছে; যাবার আগে ভর্ৎসনাভরা চোখে যে তার দিকে একবার তাকিয়ে

গিয়েছিলেন, তা-ও। কত লোকই তো ছিল,—তাদের দিকে না তাকিয়ে তিনি বারাব্বাসের দিকে তাকাতে গেলেন কেন? তাকালেন যদি, ভৎর্সনা করলেন কেন?

প্রায়ই এখন তার গলগথার কথা মনে পড়ে। গলগথার কথা, ক্রুশবিদ্ধ সেই মানুষটির কথা, তাঁর মায়ের কথা—

দূরে শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে বারাব্বাস। তার ওপারে মর্মর-সাগর। মোয়াবাইট-ভূমির সেই পাহাড় আর সেই সমুদ্রের উপরে এখন অন্ধকার নেমে আসছে।

সঙ্গীরা প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বারাব্বাসের হাত থেকে তারা এখন মুক্তি পেলেই বাঁচে। অকর্মণ্য এই গলগ্রহের কাছ থেকে আর তাদের বিন্দুমাত্রও উপকারের আশা নেই। দিবারাত্রি একটা লোক মুখ ভার করে বসে রয়েছে; দেখলেও যেন বিরক্তি লাগে। কোন কাজেই আর-কোন উৎসাহ পাওয়া যায় না। এমন লোকের যে এখানে কিছুমাত্রও প্রয়োজন নেই, সে এখন বিদায় হলেই যে তারা নিষ্কৃতি পায়, পষ্টাপষ্টিই সেটা এবারে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু কে যে তাকে গিয়ে জানাবে, সেইটেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আড়ালে যে যতই আস্ফালন করুক, সামনা-সামনি কেউ তাকে কিছু বলতে রাজি নয়। বারাব্বাসকে তারা ভয় করে, এখনও ভয় করে।

সুতরাং—এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক—গোপনে গোপনেই তাদের শলাপরামর্শ চলতে লাগল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল যে, তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বারাব্বাসকে তারা পছন্দ করে না, কখনও করেনি। লুটতরাজে যে আর আজকাল তেমন সুবিধে হচ্ছে না, দিনকয়েক আগেই যে দলের দুজন ধরা পড়েছে, এর জন্যেও ওই বারাব্বাসই দায়ী। বারাব্বাস অপয়া। আর এই অপয়া লোকটাকে যতদিন না তাড়াতে পারা যাচ্ছে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকেও ততদিন মুক্তি নেই। চাপা একটা আক্রোশে সবাই হিংস্র হয়ে উঠেছে, চোখে-মুখে তাদের আগুন ঝিকিয়ে উঠেছে। বারাব্বাস তা জানে না। আগের মতোই সে নির্বিকার। দেখে মনে হয়, ধীরে ধীরে সে এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির কাছেই যেন আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। অকর্মণ্য, অপয়া পুরুষ। কি করে ওর ওই অশুভ সান্নিধ্য থেকে এখন মুক্তিলাভ করা যায়।

আর, কি আশ্চর্য! ঘুম থেকে উঠে একদিন সবাই দেখল যে, বারাব্বাস নেই। নেই! কোথায় গেল সে? প্রথমটা তারা ভেবেছিল, পাগল হয়ে গিয়ে পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে; আর নয়ত কারুর অশুভ আত্মা তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কে জানে, সে আত্মা হয়ত ইলায়াহুর। আর এইভাবেই সে তার প্রতিশোধ নিয়েছে হয়ত। কিন্তু, তা-ই বা কি করে হয়! তাহলে তার মৃতদেহটা অন্তত খুঁজে পাওয়া যেত। পাহাড়ের নিচে, প্রতিটি ফাটলে আর প্রতিটি গহ্বরে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও তার মৃতদেহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বারাব্বাস নেই, তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

যেখানেই যাক, বারাব্বাস তাদের নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উপরে উঠে এল সবাই। চতুর্দিক তখন রৌদ্রময়।

বারাব্বাসের ভাগ্যে যে এরপর কি ঘটল তা কেউ জানে না। সে গেলই-বা কোথায়, আর বাকি জীবনটা তার কিভাবেই বা কেটেছে, কারুরই সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। কেউ কেউ বলে, এখান থেকে সে জুডা আর নয়ত সিনাইয়ের মরুভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল; সেখানে সেই নিঃসঙ্গ, নির্জনতার মধ্যেই তার অবশিষ্ট জীবন জীবন-রহস্য আর ভগবৎচিন্তায় অতিবাহিত হয়েছে। আবার কেউ-কেউ বলে, বারাব্বাস গিয়ে

বালাইও ছিল না তার। হোরাইজন তখন তরুণ যুবক—দিলদরিয়া রসিক নাগর; মেয়েটাকে সঙ্গে করে সে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল—ঘটলও অনেক রোমাঞ্চকর অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা পথে-প্রবাসে। মাসছয়েক যেতে-না-যেতেই কিন্তু তার অবসাদ এল—মেয়েটা হয়ে উঠল তার গলার কাঁটা। তা ছাড়া বহুদিন একত্র বসবাসের ফলে যা হয়ে থাকে—ঈর্ষা, অবিশ্বাস, জবরদস্তি, কান্না-কাটি সবই দেখা দিতে লাগল একে একে।—তারপর ক্রমে ক্রমে সে মারধোরও শুরু করে দিল মেয়েটাকে। প্রথমবার মার খেয়েই একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু তারপর থেকেই সে একদম ঠাণ্ডা আর ভারি বাধ্য হয়ে উঠল। এ তো জানা কথাই যে, প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরা কোন রকমের মধ্যপন্থা মানে না; হয় তারা হবে প্রচণ্ড মিথ্যুক, ছলনাময়ী, কপটী, বিকৃতচিত্ত—অন্তর হবে তাদের কুটিলতা আর কালিমায় অন্ধকার, নয় তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করবে, হয়ে উঠবে অন্ধ অনুরাগিণী, নির্বোধ, একেবারে একটি পোষা প্রাণী—বুঝবে না নিজের ভালোমন্দ, জানবে না ত্যাগ আর আত্মমর্যাদা-হানির মধ্যে ছেদ টানতে হয় কোথায়। এই মেয়েটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের; তাই সামান্য চেষ্টায়ই হোরাইজন কিছুদিন বাদে তাকে পথে নামাল—বেশ্যাবৃত্তির জন্যে। তারপর যেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পর মেয়েটা তার প্রথমরাতের রোজগার পাঁচটি রুবল এনে তার হাতে তুলে দিল, সেদিন থেকেই হোরাইজন অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল মেয়েটার প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা। আশ্চর্যের কথা এই যে, এর পর থেকে হোরাইজন যত মেয়েরই সংস্পর্শে এসেছে—আর এসেছে-গিয়েছেও তার হাত দিয়ে কত শত মেয়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই—সর্বদাই তাদের প্রতি তার এই পুরুষসুলভ বিতৃষ্ণা অটুটই রয়ে গেছে। বেচারা মেয়েটাকে তো সে যত রকমে পারে অপমান করতে শুরু করে দিল, সব চেয়ে ব্যথার বিষয়গুলো বেছে বেছে নিয়ে নানা রকমে আরম্ভ করল তার উপরে নৈতিক উৎপীড়নও। কথা বলতে পারত না মেয়েটা, নিঃশব্দে কাঁদত কেবল, আর শেষে নতজানু হয়ে সাইমনের হাতে খেত চুমো। তার এই নীরব নতি-স্বীকার হোরাইজনকে করে তুলত আরও অধৈর্য, মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত সে: একঘণ্টা কি দু-ঘণ্টা বাদেই কিন্তু ফিরে আসত মেয়েটা—শীতে কাঁপতে কাঁপতে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভিজে টুপি হাতে ক'রে, জামা-কাপড় থেকে সপ সপ করে জল ঝরছে হয়ত তখন। শেষে এক নরপিশাচ সাইমনকে পরামর্শ দিল মেয়েটাকে গণিকালয়ে বেচে দিতে। সাইমনও একটা নতুন পথের সন্ধান পেল।

বলতে কি, কাজটা বাস্তবিকই উতরোবে কিনা সে-বিষয়ে মনে মনে হোরাইজনের দারুণ সন্দেহই ছিল। কিন্তু শেষটায় দেখা গেল, এরই জন্যে যেন সব-কিছু বসে ছিল হাঁ ক'রে—এমন চমৎকার ভাবে কিছুই ওতরাতে পারে না কখনও।

খারকোবের এক গণিকালয়ে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করতেই বাড়িউলী রাজি হয়ে গেল। জানত সে সাইমনের কি রকম লোক বশ করবার ক্ষমতা আর কি রকম মজলিশি লোক সে। কিন্তু সব চাইতে মুশকিল হল মেয়েটাকে নিয়ে: সে সাইমনকে ছেড়ে কোথাও একদণ্ড থাকতে রাজি নয়; সাইমন পীড়াপীড়ি করাতে সে ভয় দেখাতে লাগল আত্মঘাতী হবে বলে, দেবে এসিড ছিটিয়ে সাইমনের চোখ দুটো কানা ক'রে, নয়ত পুলিসের কাছে গিয়ে নালিশ করবে—আর বাস্তবিকই সাইমনের এমন দু-একটা কাণ্ড-কারখানার কথা তার জানা ছিল যা ফাঁস হয়ে গেলে, চাই কি তার গলায় দড়িও পড়তে পারত। বেগতিক দেখে সাইমন অন্যপথ ধরল। হঠাৎ সে হয়ে উঠল প্রেমে গদগদ, একেবারে যেন প্রাণের দোসর—আদরে সোহাগে মাতিয়ে তুলল সে মেয়েটাকে আবার। তারপর হঠাৎ আবার একদিন ভারি বিমর্ষের ভান করে পড়ে রইল; মেয়েটা চিন্তিত হয়ে যতই তাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে, ততই সে যেন এড়িয়ে যেতে চায় তার প্রশ্ন;

কখনও হয়ত বেসামাল হয়ে এক-আধটা ভয়ের কথা মুখ থেকে খসিয়ে ফেলেই আবার তখনই চুপ মেরে যায়। শেষে শুরু করল সে এলোপাথাড়ি মিথ্যের ছড়াছড়ি—ভীষণ বিপদ তার সম্মুখে, অনিবার্য জেল—না, খালি জেল হয়ে চুকে গেলে এমন কি আর এসে যেত—ফাঁসিও হতে পারে, পারে কেন, হবেই নির্ঘাত! তবুও যদি মাসকয়েকের মতো গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যেত! হায়, কি ভুলই না করেছে সে! ওরই মধ্যে আবার বিশেষ জোর দিয়েই বলত সে কি-একটা মনগড়া ব্যবসার কথা—তাতে মন দিতে পারলে নাকি লক্ষপতি হতে পারে সে—এখনই! এত সব দেখে শুনে মেয়েটা বাস্তবিকই ভড়কে গেল। স্বভাবত সে ছিল মাতৃজাতি—প্রেমাস্পদের জন্যে তার অন্তরে সেই একান্ত নিঃস্বার্থ নারীসুলভ স্বগীয় শঙ্কার উদয় হল যার উৎস হচ্ছে নারীর অন্তরতম মাতৃত্ব। চোখের জলে সাইমনকে বিদায় দিল সে—তারপর দিন গুনতে বসল আবার কবে দেখা হবে! ইতিমধ্যে তার পাসপোর্টখানা বদলে একখানা হলদে টিকিট আনা হয়েছিল, হতভাগী জানতও না তার মানে কি। বাড়িউলীর কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবল দক্ষিণা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাইমন। চেয়েছিল সে দু-শ—তা পঞ্চাশেই বা ক্ষতি কি এমন? সবে তো মোটে হাতেখড়ি।

গণিকালয়েই বন্দী হয়ে রইল মেয়েটা। সাইমন তার কথা একদম ভুলে গেল—বছরখানেকের মধ্যেই সে নাকি শতচেষ্টায়ও আর তার মুখখানা মনে আনতে পারত না, কিংবা কে জানে ভানই করত বুঝি!

রুশীয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সাইমন এখন নারীদেহের একজন বড় ব্যবসাদার। সুদূর কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌ আর আর্জেন্তিনার সঙ্গে চলে তার কারবার। ওডেসার বেশ্যাপল্লী থেকে দলে দলে মেয়েমানুষ চালান দেয় সে কিয়েব-এ, কিয়েব থেকে খারকোব-এ, আবার খারকোব থেকে ওডেসায়। তা ছাড়া বড় বড় প্রাদেশিক রাজধানীতেও রয়েছে তার ঘাঁটি। বিরাট এক মক্কেলের দল জুটেছে এসে তার, তাদের মধ্যে রয়েছেন সমাজের অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি—লেফটেনাণ্ট গবর্নর এবং বড় বড় জমিদার আর বণিক গোষ্ঠীর লোক। সারা লাম্পট্য-জগৎটার নাড়ীনক্ষত্র, অন্ধিসন্ধি, গলিঘুঁচি, সমস্তই রয়েছে তার নখদর্পণে—জ্যোতিষীর কাছে যেমন থাকে তারা-ভরা ঐ আকাশখানার খবর। বাড়িউলী হাফগেরস্ত, দালাল, বাইজী, খেমটাওয়ালী—চেনে না সে হেন কেউ নেই অত বড় ঐ অঞ্চলটাতে। আর স্মরণশক্তি তার এমনই প্রখর যে কখনও খাতাপত্রে কিছু টোকাটুকি করতে হয় না তাকে—সে ভালোই বটে তার পক্ষে। হাজার হাজার মেয়ের নাম, তাদের ডাকনাম, বংশপঞ্জী, ঠিকানা, চেহারা, চালচলন, সবই একেবারে কণ্ঠস্থ তার। মক্কেলদের মধ্যে কে কি চায়, কার কেমন মর্জি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে সে; তাদের কেউ কেউ চায় যত সব বিশ্রী নোঙরামি, কেউ কেউ হচ্ছে অনাঘ্রাত অপাপবিদ্ধ কুমারীর জন্যে মুক্ত-হস্তে ব্যয় করতে উৎসুক, অপর কারও কারও লোভ নাবালিকাদের প্রতি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মেয়ে যোগাড় করা বড় কঠিন, আর বেশ ভয়ের কথাও বটে, কিন্তু এতে করে এক-এক দাঁওয়ে লাভও হয় হাজার হাজার টাকা। সকল রকমের চাহিদারই যোগান দিতে হয় তাকে—কামকলায় কেউ হচ্ছে নির্মম-নিষ্ঠুর, কেউ বা দুঃখবিলাসী, আবার কারও ঝোঁক হল যত সব অস্বাভাবিক রকমের যৌন বিকৃতির দিকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাত সে ক্বচিৎ কখনও—শুধু যখন বড় রকমের দাঁও মারবার নিশ্চয়তা থাকত তখনই। এ জন্যে বারকয়েক জেলও খাটতে হয়েছে তাকে। তাতে তার ব্যবসায়ের ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হয়েছে; বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে তার সাহস, বুদ্ধি, আর আগ্রহ। এ পর্যন্ত সে বারবার পনর বার বিয়ে করেছে; প্রত্যেক বারই করে নিতে পেরেছে বেশ চলনসই গোছের যৌতুক গ্রহণের ব্যবস্থা। তারপর বলা নেই কওয়া নেই সুবিধে বুঝে একদিন একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে সে, পাত্তা মেলার উপায় রেখে যায়নি কিছুই

আর যখনই সম্ভব হয়েছে তখনই বউকে দিয়েছে বেচে—হয় কোন গোপন আড্ডাখানায়, নয় কোন কায়দাদুরস্ত গণিকালয়ে। কনের বাপ-মা পুলিসে ডায়েরি করে, হুলিয়া বার করিয়ে, তার টিকির নাগালও পায়নি; তখন হয়ত নানান ছদ্মনামে সে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ যাবৎ সে এতগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করে এসেছে যে, সময় সময় আসল নামটার উপরে তার নিজেরই মনে ঘোর সন্দেহ জাগে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার এ-কারবারে অন্যায় বা গর্হিত কিছুই দেখতে পায় না সে। মাছমাংস, আটাময়দা, কাঠকুটো, এই রকম আর পাঁচটা মালের কারবারের মতোই মনে করে সে এটাকে। নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মেও মতি আছে তার। সময়ে কুলোলে প্রতি শুক্রবারে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই সে যায় সমাজে উপাসনা করবার জন্যে। আর যখন যেখানেই থাকুক না কেন, প্রত্যেকটি পাল-পার্বণ নিয়মমতো মেনে চলে সে। সংসারে আছে তার শুধু এক বুড়ী মা আর কুঁজো বোন একটি—তারা থাকে ওডেসায়। নিয়মমত ভাবে না হোক, প্রায়ই সে কিছু-কিছু করে তাদের টাকা পাঠায়—তা সে কুর্ক্স, ওয়ার্জা, সামারা, যেখান থেকেই হোক না কেন। ব্যাংকেও জমে উঠেছে তার প্রচুর টাকা, আর কেবলই বেড়ে চলেছে তা; সুদটুকু পর্যন্ত তাকে ছুঁতে হয় না কখনও। কিন্তু লোভ কি অর্থ-লালসা কাকে বলে তার কিছুই জানে না সে। এ-কারবারে ব্রতী হয়েছে সে শুধু এক ওই কারবারটার বিশেষ কদর, বিপদের ভয়, আর আত্মশ্লাঘার জন্যে। মেয়েমানুষের সম্পর্কে সে হল একেবারে উদাসীন; তবে সে তাদের বোঝেও বেশ, তাদের দর যাচাই করার একজন মস্ত বড় জহুরী—এ যেন সেই ময়রার মতন যে মিঠাইমণ্ডার ভালোমন্দ বেশ বোঝে কিন্তু তার নিজের সে-সবে ধরে গেছে অরুচি। যে-কোন মেয়েকে ভুলিয়ে বশ করতে, ফুসলিয়ে বের করে আনতে, তাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করিয়ে নিতে, একটুও বেগ পেতে হয় না তাকে; মেয়েরাও যেন তার ডাক শুনলেই সাড়া দিয়ে এসে জমায়েত হয়, আর তার হাতে এসে নাচে সব যেন কলের পুতুল! মেয়েদের প্রতি তার ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা আর আত্মপ্রত্যয় রয়েছে যাতে করে চোখের নিমেষে তারা বশ হয়ে পড়ে—বদমাইশ ঘোড়া যেমন জব্দ হয় জবরদস্ত সওয়ারের সামান্য একটি মুখের কথায়, চোখের চাউনিতে, কি গায়ে হাত-বুলুনিতে।

নিজের মতো থাকলে মদ সে কখনই খায় না, দলে পড়লেও খায় খুব কমই। খাওয়াদাওয়াতেও তার কোন আগ্রহ নেই। যা-কিছু দুর্বলতা রয়েছে তার স্বভাবে সে হল ওই এক পোশাক-আশাক নিয়ে—সাজে সে সদাসর্বদা পরিপাটী, ফুলবাবুটি যেন।

বউকে নিয়ে সোজা চলে এল সে হার্মিটেজে। দুজনেরই সাজগোজের খুব পরিপাটী। সাইমনের হাতে রুপো-বাঁধানো এক বেতের ছড়ি, হাতলে বসানো রয়েছে এক নগ্ন নারীমূর্তি।

বিশালকায় এক দ্বারী জিজ্ঞেস করল, 'এখানে থাকবার ছাড়পত্র নিশ্চয়ই আছে আপনার কাছে।'

'আঃ, জাভার! বারবার সেই একই কথা—ছাড়পত্র!' বলে স্ফূর্তির ঝোঁকে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল সাইমন, 'সবসুদ্ধ দিন তিনেক থাকব। কাউন্ট ইপাটিয়েবের সঙ্গে দেনাপাওনার চুক্তিটা হয়ে গেলেই সোজা চলে যাব। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে থাক তোমরা। আর দেখ, তোমার জন্যে কেমন একটা খেলনা এনেছি ওডেসা থেকে। ভারি খুশি হবে দেখে।'—বলেই চট করে লোকটার থাবার মধ্যে গুঁজে দিল সে একটি মোহর। তারপর ঘরে ঢুকে সব ঠিকঠাক করে নিয়েই চাকরকে ডেকে একসঙ্গে একেবারে ছ-ছ-জোড়া জুতো বের করে দিয়ে বলল, 'ওরে, সব

ক-জোড়া এখনই পালিশ করে নিয়ে আয়, একেবারে যেন আর্শির মতো ঝকঝক করতে থাকে—বুঝলি? তোর নাম তিমোথী—না? তবে তোরও তো আমায় চিনতে পারার কথা। তা দেখ, তিমোথী, আমার কাছে কাজ করলে সে অমনি যাবে না। সাবধান, মনে থাকে যেন একেবারে আয়নার মতো পালিশ হওয়া চাই।'

৪

তিনদিন ত্রিরাত্রের বেশি হোটেল-হারমিটেজে থাকেনি হোরাইজন; তারই মধ্যে দেখা করেছে সে আন্দাজ শ-তিনেক লোকের সঙ্গে। তার পদার্পণে শহরময় যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। তার কাছে আসত চাকরবাকরদের কাজ জুটিয়ে দেবার আপিসের মালিকরা, সস্তা হোটেলের কর্ত্রীরা, মেয়েমানুষের দালালিতে চুল পাকিয়েছে এমন সব লোক, আরও কত কে!

এখানে এসে পৌঁছুবার ঠিক পরদিনই সে গেল ছবিওয়ালা মেৎজের-এর দোকানে সঙ্গে তার এক গৌরাঙ্গী মেয়ে—বেলা। তার সঙ্গে নানান ছাঁদে শুয়েবসে খানকয়েক ছবি তোলাল সে। প্রত্যেকটি ছবির জন্যে পেল সে তিন রুবল দক্ষিণা; মেয়েটাকে কিন্তু শুধু এক রুবল দিয়েই বিদায় করে দিল। তারপর গেল সে বারসুকোবার সঙ্গে দেখা করতে।

এই বারসুকোবা মেয়েমানুষটা আসলে ছিল যাকে বলে 'বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী' তার জুড়ি মেলে শুধু এক দক্ষিণ-রুশীয়াতেই; না ছিল সে পোল, না-ছিল ক্ষুদে রুশীয়ান, বয়সও মন্দ হয়নি তার, তবে তারই মধ্যে এত টাকা কামিয়ে ফেলেছে সে, দিব্বি কোত্থেকে বেশ সুশ্রী আর ভালোমানুষ গোছের এক পোলকে বর বলে ধরে নিয়ে এসে পুষছে, আর দুজনে মিলে চালাচ্ছে এখন একটা নাচের মজলিশ। হোরাইজন আর বারসুকোবা পুরোনো বন্ধুর মতোই আলাপ করতে লাগল; তাদের সে-সব কথাবার্তার মধ্যে না-ছিল ভয়ডর, না-ছিল লাজলজ্জা, কি বিবেকবুদ্ধির বালাই!

'মাদাম বারসুকোবা, তোমায় আমি খাসা মালের যোগান দিতে পারি—তিন-তিনটে মেয়ে, একটি হল শ্যামবর্ণ, ভারি শান্ত; আর-একটা বেশ ছোট্টখাট্ট ফর্সা মেয়ে, বুঝতেই পারছ সব তাতেই রাজি সে। আর একটা হচ্ছে এক 'রহস্যময়ী নারী', খালি হাসে, কোন কথা কয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে ঢের কাজ আদায় হবে,—আর হ্যাঁ, সুন্দরীও বটে মেয়েটা।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে বসে বসে মাথা নাড়ছিল মাদাম বারসুকোবা। 'তুমি কি বোকা বানাতে চাও আমায়, মি. হোরাইজন? সেবার যা করেছিলে এবারও কি সে-রকম কিছু করতে চাও?'

'হায় ভগবান! এই করেই দিনগুজরান করি আমি, আর আমিই তোমায় ঠকাব! যাক গে, আসল কথা সেটা নয়। তোমায় আমি একটি বেশ লেখাপড়াজানা মেয়েও দিচ্ছি। তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো। খুব সম্ভব সমজদার লোকই খুঁজে পাবে তুমি।'

চতুরের হাসি হাসে বারসুকোবা। 'ফের একটি বউ?' জিজ্ঞেস করে সে।

'না, বনেদী ঘরের মেয়ে।'

'না বাপু, পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে আবার।'

'কি যে বল! তোমার কাছে তো বেশি দাম চাইতে পারি না। মোটে এক হাজার রুবল পেলেই তিনটেকে ছাড়তে পারি।'

'বটে? তবে সিধে কথায় এস—পাঁচ-শ।—আর ঝক্কি পোয়াতে পারব না, বাপু।'

'দেখ, মাদাম বারসুকোবা, এই আমাদের নতুন কারবার নয়। তোমায় ঠকাব না

আমি, সিধে নিয়ে আসছি আমি মেয়েটাকে, কিন্তু মিনতি করে বলছি ভুলে যেও না যে তুমি আমার মাসী, আর বরাবর ঠিক সেই চালেই চলবে তার সামনে। তিন দিনের বেশি থাকব না আমি শহরে।'

খুশির হাসিতে একসঙ্গে দুলতে থাকে মাদামের বুক, পেট, আর থুতনি—'খুঁটি-নাটি নিয়ে দরদস্তুর করব না আমরা—বিশেষ যখন আমরা কেউ কাউকেই ঠকাব না। আজকাল মেয়েদের চাহিদা খুব। তা তুমি একটু মদ খাবে?'

'ধন্যবাদ!'

তারপর তারা অন্য কথা পাড়ে। যথা, 'বছরে কত আয় হয় তোমার?'

'কত আর, বার থেকে কুড়ি হাজার। তা ঘোরাঘুরিতেও তো কত খরচ হয়ে যায়!'

'কিছু জমাতে পার না?'

'যৎসামান্য। বছরে মোটে দু-তিন হাজার।'

'আমার তো ধারণা ছিল তার বেশি—দশ-বিশ হাজার—'

কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? মনে মনে সাবধান হয়ে ওঠে হোরাইজন।

আনা মিখাইলোব্না (বারসুকোবা) বিদ্যুতের ঘণ্টা টিপে পরিচারিকাকে ডেকে কয়টা ক্রীমরোল আর এক বোতল শ্যাম্পেন আনতে বলে দেয়; হোরাইজনের রুচি-অরুচি জানা আছে তার। তারপর জিজ্ঞেস করে সে, 'তুমি মি. শেপ্‌শেরোবিচ্‌কে চেন?'

একেবারে যেন লাফিয়ে ওঠে হোরাইজন। 'শেপ্‌শেরোবিচ্! হা ভগবান! কে না চেনে তাঁকে! মানুষ নন তিনি—একেবারে একটি দেবতা, অদ্ভুত প্রতিভাশালী লোক।' খেপে ওঠে হোরাইজন, ভুলে যায় যে তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে সে—'শুধু একটিবার ভেবে দেখ গত বছর কি করেছেন শেপ্‌শেরোবিচ্। কব্‌নো, বিল্‌নো আর ঝিতুমির থেকে একেবারে ত্রিশ-ত্রিশজন মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি সিধে আর্জেন্তাইনে। প্রত্যেকটি বেঁচে দিলেন তিনি এক-এক হাজার রুবলে—দেখ হিসেব ক'রে, মাদাম,—মোট হল ত্রিশ হাজার রুবল। তাতেই কি ঠাণ্ডা হয়েছেন নাকি শেপ্‌শেরোবিচ্? এই টাকা দিয়ে, তাঁর যাতায়াতের খরচা মেটাবার জন্যে, জনকয়েক নিগ্রো মেয়েকে কিনে আনলেন তিনি; তারপর দিলেন তাদের বিলি করে মস্কো, পিতার্সবার্গ, কিয়েব, ওডেসা, আর খারকোব-এ। তবে জানই তো মাদাম, মানুষ নন তিনি, একেবারে একটি শকুনি। হ্যাঁ, তবে ওই একটা লোকই যে ব্যবসা বোঝে।'

সোহাগ করে হোরাইজনের হাঁটুর উপরে হাত রাখে বারসুকোবা; এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে, তাই বেশ সহৃদয়তা মাখানো সুরে বলে—'আমিও বলি কি মি.—হ্যাঁ, তোমার এবারকার নামটি কি জানি না তো—'

'হোরাইজন, ধরই না—'

'আমি, ভাই বলি কি, মি. হোরাইজন, তুমি জনকয়েক কুমারী মেয়ের যোগাড় করতে পার? এদের চাহিদা আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে। টাকার কথা ভেব না, তাতে এলাব না আমরা। এই হল এখনকার দস্তুর। দেখ, হোরাইজন, তোমার এই সব মেয়ে-মক্কেলদের ফের একেবারে আগেকার মতো অক্ষত অবস্থায়ই ফেরত পাবে তুমি। বুঝতেই তো পারছ—এ হচ্ছে একটু ইত্‌রোমো আর কি—ঠিক এর মানেও বুঝি না বাপু—'

নিচের দিকে চেয়ে, কপালটা একটু রগড়ে নিয়ে হোরাইজন বলে, 'দেখ, আমার এক বউ আছে—তুমি প্রায় তা আন্দাজ করেই ফেলেছ দেখছি।'

'তাই। আবার 'প্রায়' কেন?'

'খুলে বলতে লজ্জাই করছে যে! সে—কি বলব গিয়ে—সেটি এ যাবৎ আমার বিয়ের কনে হয়েই রয়েছে—।'

খুশিতে হেসে গড়িয়ে পড়ে বারসুকোবা। 'দেখ, হোরাইজন, আমি একদম ভাবতেই পারিনি যে, তুমি এমন নরকের কীট হতে পার। বেশ তো, তোমার বউকেই দাও না আমাদের কাছে। সে ঐ একই কথা! কিন্তু এও কি সম্ভব যে তুমি ছোঁওনি তাকে?'

'এক হাজার?' গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করে হোরাইজন।

'আঃ, কি আপদ! বেশ তো, হাজারে বেজার নই আমি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, সামাল দিতে পারব তো তোকে?'

'বাজে কথা?' দৃঢ়স্বরে বলে হোরাইজন—'এ কথা ভুলে গেলে চলবে কেন যে তুমি হলে আমার মাসী, আর তোমার কাছে বউকে রেখে যাচ্ছি। একবার ভেবে দেখ—মেয়েটা একেবারে পোষা মেনি বেড়ালটির মতো ভালোবাসে আমায়। তাকে যদি বল যে আমারই ভালোর জন্যে তাকে এই এই করতে হবে তো তার দিক থেকে কোনই কথা উঠবে না।'

ব্যস! আর কিছুই বলা-কওয়ার দরকার রইল না। মাদাম বারসুকোবা একখানা প্রমিসরি নোট নিয়ে এসে বহু কষ্টে তার উপর নিজের নাম, বাপের নাম, আর এর আগের বার তার নিজের যে নাম ছিল তা লিখে হোরাইজনের হাতে দিল। প্রমিসরি নোটখানা অবশ্য বানানো। তবে চোর-ছ্যাঁচড়দের মধ্যে কথার খেলাপ হয় না। এ-সব কারবারে কেউ ঠকায় না কাউকে। ঠকালে অনিবার্য মৃত্যু। কয়েদখানায়ই হোক, পথেঘাটেই হোক, কি বেশ্যাবাড়িতেই হোক—সবখানেই এই একই নিয়ম।

পরমুহূর্তেই, যেন এক গুপ্তদুয়ার ভেদ করে বিভীষিকা-মূর্তির মতো সেখানে হঠাৎ এসে আবির্ভূত হলেন এক তরুণ পোল—গোঁফজোড়া উঁচু করে পাকানো তাঁর। লোকটা হল গিয়ে মাদাম বারসুকোবার প্রাণের দোসর, আর তাদের সেই নাচঘরের মালিক। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে মদ খেতে লাগল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে হতে লাগল এটা-সেটা নিয়ে দু-একটা কথা—বিশেষ করে ব্যবসা-সংক্রান্ত গোলযোগের কথা। তারপর হোরাইজন হোটেলে নিজের ঘরে টেলিফোন করে বউকে ডেকে আনল। এসে পোঁছুলে পর তার সঙ্গে মাসী আর মাসীর কুটুমের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, গোপন রাজনৈতিক কারণে এখুনি আমার শহর ছেড়ে যেতে হচ্ছে।' তারপর মমতাভরে সারাকে চুমু খেয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, দিব্যি গটগট করে বেরিয়ে গেল সে।

৫

হোরাইজনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই (ভগবান জানেন লোকটার আসল নাম কি!) ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের একে একে সব কিছুই যেন যেতে লাগল উলটে। শুরু হল প্রচণ্ড রদবদল, ওলটপালট। ত্রেপেল থেকে চালান হয়ে মেয়েরা সব আসতে লাগল আনা মারকোব্‌নার আস্তানায়, আবার সেখান থেকে অনেকে এসে ঠেকল হয়ত কোন এক-রুবলের বাড়িতে, আর এক-রুবলের বাড়ি থেকে চালান হয়ে এল সব আধ-রুবলের বাড়িতে। উঁচুতে উঠতে পেল না কেউই, নিচুতেই নামতে লাগল সব একে একে। এই রকমের প্রত্যেকটি রদবদলে হোরাইজন উপায় করত পাঁচ থেকে এক শ করে রুবল। লোকটার উৎসাহ ছিল যেন প্রায় ঐ ইমাত্রার জলপ্রপাতেরই মতো।

দিনের বেলা। আনা মারকোব্‌নার বাড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছে হোরাইজন, আর পায়ের উপর পা রেখে এক পা দোলাচ্ছে অনবরত। সিগারেটের ধোঁয়ার জন্যে চোখদুটো টেরা করে বলে উঠল সে, 'মানে কথাটা হচ্ছে—সেই একই। সোন্‌কাকে নিয়ে কি আর করবে তোমরা? এসব সভ্য-ভব্য জায়গায় ঠাঁই নেই ওর। তার বদলে ওকে

যদি ভাঁটার টানে ছেড়ে দাও তো তোমরা ছাঁকা একশটি রুবল এখনি কামাতে পার, আমিও পাই গোটা পাঁচশেক রুবল। আচ্ছা, খোলাখুলিই বল না আমায়, ওকে কে আর এমন পোঁছে এখানে আজকাল?'

'মি. শাৎস্কি, তোমার সঙ্গে কথায় পারবে কে বলো! কিন্তু বুঝে দেখ, মেয়েটার জন্যে মায়া হয় আমার। এমন লক্ষ্মী মেয়েটি—'

ভাবতে লাগল হোরাইজন। একটা সময়োপযোগী প্রবচন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে।

'টোল টোল টুলুনি, সাবড়ে দে রে এখুনি।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাদাম শোইবেস, এ মাল এখন একদম অচল।'

ইসাইয়া সাবিচ্ দেখতে ছোটখাট, রোগা-পটকা, ঘ্যানঘেনে বুড়োমানুষটি হলে কি হয়, দরকারী কাজের বেলায় ভারি একবগ্‌গা লোক সে। হোরাইজনের কথায় সায় দিয়ে বলল সে, 'এ তো সিধে কথা। সত্যিই, একদম অচল হয়ে পড়েছে ছুঁড়ীটা। ভেবেই দেখ না, আন্নেচ্‌কা, মাগীর পোশাক-আশাকে খরচা পড়ছে পঞ্চাশ রুবল, মি. শাৎস্কি নেবেন পাঁচিশ, আর বাদবাকি পঞ্চাশ রুবল তোমার আর আমার। ভগবানের অপার মহিমা, ছুঁড়ীর দায় থেকে রেহাই পাওয়া গেল—অন্তত ওর জন্যে আর খরচ পোয়াতে হবে না।'

এই রকম হতে হতে বেচারী সোন্‌কা শেষে এক-রুবলের বাড়ি থেকে বদলি হয়ে এল আধ-রুবলের এক বাড়িতে। সেখানে যত রাজ্যের সব ইতর লোক খেয়ালমাফিক মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সারারাত। এ-সব ক্ষেত্রে যা হচ্ছে একান্ত প্রয়োজন তা হল অপরিমিত স্বাস্থ্য আর অসম্ভব রকমের স্নায়বিক শক্তি। এক রাতে থেক্‌লা বলে পর্বতপ্রমাণ এক মেয়েমানুষ—তা ওজনে কিছু না হোক কম-বেশি আড়াই মণ তো হবেই—এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়—সেখানেই কি একটা দৈহিক গ্লানি লাঘব করবে বলে। এমন সময় বাড়িউলী সে-দিক দিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে 'গিন্নীদি, ভাই শোনো—ছত্রিশ নম্বরের খদ্দের!—ভুলে যেও না যেন।' দেখেশুনে সোন্‌কা বেচারীর হাত-পা তো পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধুল।

তা সোন্‌কার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তাকে বিশেষ কেউ বিরক্ত করে না এখানে। এখানকার পক্ষেও সে ছিল বড্ড সাদাসিধে। বড় কেউই একটা তার ডাগর ডাগর চোখ দুটির দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। নেহাত আর কেউ হাতের কাছে না থাকলেই লোকে এসে তাকে নিয়ে যায়।

নেমান সেখানে এসেও খুঁজে বের করল তাকে, আর সেই থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সে এখানেই আসে। কিন্তু ভীরুতাই হোক, আর হিব্রু রুচির জন্যেই হোক, কিংবা কে জানে হয়ত দৈহিক ঘৃণাবশতই হবে, মেয়েটিকে সে এ বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখতে চেষ্টাও করেনি কোনদিন। সারারাত ধরে তার পাশটিতে গিয়ে বসে থাকে সে, আর দৈবাৎ কখনও কোন খদ্দের এসে সোন্‌কাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলে, আগের মতোই তার ফিরে আসার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে বসেও থাকে। আর সোন্‌কা ফিরে এলেই হয় সেই চিরন্তন দৃশ্যের অবতারণা—ঈর্ষা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার। তবু প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সে মেয়েটিকে, আর দিনের বেলায় ওষুধের দোকানের কোণটিতে বসে বড়ি তৈরি করতে করতে একটানা তারই কথা ভেবে ভেবে সারা হয়ে যায় বেচারা।

৬

শহরতলির ক্যাবারে। ঢুকতেই রঙ-বেরঙের বিজলি-বাতি দিয়ে তৈরি একটি কৃত্রিম পুষ্পস্তবক, তারপর দুধারে এইরকম আলো দিয়ে তৈরি চওড়া আর্চ—আস্তে আস্তে সরু

হয়ে একেবারে বাগানের মাঝখানটিতে এসে শেষ হয়েছে। আর-একটু এগিয়ে এলে হলদে বালি-ছড়ানো চওড়া এক স্কোয়ার; বাঁদিকে একটি খোলা মঞ্চ, একটা থিয়েটার আর এক চাঁদমারি; সোজা নাক-বরাবর হল গিয়ে মিলিটারি ব্যান্ডের এক আস্তানা (ঝিনুকের মতো করে তৈরি), আর সারি সারি বীয়ার আর ফুলের স্টল; ডাইনে রেস্তরাঁর লম্বা চাতাল। উঁচু উঁচু থামের গায়ে গোল গোল বিজলি বাতি; তা থেকে আলো এসে পড়ায় নিচে ছোট্ট স্কোয়ারখানিকে ফ্যাকাশে, সাদা-ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে। তারের জাল দিয়ে ঘেরা ঘষা-কাঁচের গায়ে গায়ে মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসে পড়েছে দেওয়ালি পোকা, আর নিচে মাটির উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এলো-মেলো হয়ে নড়াচড়া করছে তাদের ছায়া। ক্ষুধার্ত মেয়েদের দল ভারি শৌখিন কায়দায় কিম্ভূত-কিমাকার বেশে সেজে, বলতে গেলে আদুড় গায়েই, জোড়ায় জোড়ায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সেখানে—তাদের কেউ-বা চোখেমুখে একটা নিরুদ্বেগ হাসিখুশির ভাব টেনেবুনে বজায় রাখবার চেষ্টা করছে, কেউ-বা করছে মানিনীর ভান, কেউ কেউ দেখাচ্ছে অগম্যা নারীর অসন্তোষের ঠাট,—কিন্তু চলাফেরা করছে সবাই ক্লান্ত পায়ে—টেনে টেনে।

রেস্তরাঁর সবগুলো টেবিলই এখন জোড়া; তার উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু কাঁটা-চামচে-প্লেটের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ আর পাঁচমিশালী ভাষায় গালগপ্পের ঢেউ। নাকে আসছে পাকশালার মোগলাই খানার খোসবু। মাঝখানটাতে একটা একটু উঁচু-মতন জায়গাতে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছে রেস্তরাঁর একদল রুমানিয়ান বাজনদার; পরনে তাদের লাল রঙের ফ্রক, গায়ের রঙ ময়লা, দাঁতের পাটি সব মড়ার মতো সাদা, মুখের গড়ন দেখলে মনে হয় মুখময় লম্বা লম্বা রোঁয়াভর্তি একপাল বনমানুষকে বেশ করে পমেড মাখিয়ে রোঁয়াগুলো পাট করে নামিয়ে দিয়ে সেখানে এনে কে যেন ছেড়ে দিয়ে গেছে। বাজন-দারদের পালের গোদা সামনের দিকে ঝুঁকে নানা ঢঙে অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বেহালা বাজাচ্ছে—আর অসভ্যের মতো এমন মিঠে-মিঠে করে চোখ ঠারছে সকলের দিকে চেয়ে যে লোকটাকে দেখে মনে হয় আস্ত একটি পুরুষ-বেশ্যা। আর এই অনাবশ্যক অপরিমিত আলোর খেলা, সুরের মেলা, মহিলাদের প্রসাধনের বৈচিত্র্যে, সুগন্ধির তীব্র সৌরভ—সব-কিছু মিলে একাকার হয়ে এক বিরক্তিকর, নির্বোধ, উন্মত্ত বিলাসের অযথা প্রলাপ সৃষ্টি করছে।

উপরে সমস্ত হলঘরখানার চারদিক ঘিরে খোলা গ্যালারি। তারই সামনে মাঝে-মাঝে এক-একটা নিরালা কুঠরির দরজা—যেন ছোট-ছোট অলিন্দের সামনে এক-একটি ঘরের দুয়ার। এই রকমেরই একটা কুঠরিতে বসে চারজন—দুজন মহিলা আর দুজন ভদ্রলোক; একজন হলেন রুশীয়ার বিখ্যাত বাইজী রোবিনস্কায়া—বেশ দোহারা গড়ন, সুন্দরী, মিশরীদের মতো টানা টানা সবজে চোখ, লম্বাটে লালচে লালসাদীপ্ত মুখখানি, বাঁকা ঠোঁটের কোণে পরুষভাব। আর-একজন হচ্ছেন ব্যারনেস তেফ্‌তিঙ, দেখতে ছোট-খাট, চমৎকার, ফ্যাকাশে মতন—বাইজীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ান তিনি। পুরুষ দুজনের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত উকিল রিয়াজানোব, আর-একজন হচ্ছেন বোলোদিয়া শ্যাপলিন্‌স্কি—তরুণ, ধনবান, বিলাসী লোক, শৌখিন গীত-রচয়িতা, লিখেছেনও গোটাকয়েক মিঠে-মিঠে ছড়া আর হাল-আমলের বিষয় নিয়ে বিস্তর নক্সা। শহরময় সে-সব লেখার চলতিও হয়েছে বেশ।

ঘরের মধ্যে দেয়ালের গায়ে লাল রঙের পালিশ আর সোনালী রঙের নকশা। টেবিলের উপরে শামাদানে জ্বলছে আলো আর তার ক্ষীণ সোনালী আভা এসে মদের পাত্রের উপরে পড়ে ঝিকমিক করছে। বাইরে দরজার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে সরাবখানার একজন ওয়েটার। আর পরিচালক মশায় ডানহাতের কড়ে আঙুলে এক টুকরো হীরে-বসানো আঙটি পরে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে এসে মাঝেমাঝে এ-দরজায়

সে-দরজায় থমকে দাঁড়াচ্ছেন আর এক কান বাড়িয়ে মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছেন কি কাণ্ড চলেছে ভিতরে।

ব্যারনেস তাঁর অপেরা গ্লাসের ভিতর দিয়ে অলস দৃষ্টিতে নিচেকার ভিড় দেখছেন। রঙবেরঙের পোশাক-পরা মেয়েদের মধ্যে একই ছাঁদের পুরুষদের দেখে মনে হয় যেন একপাল বড় বড় কালো কালো গুবরে পোকা লেপটে রয়েছে সেখানে। রোবিনস্কায়া তাচ্ছিল্যভরে হলেও বেশ মনোযোগ দিয়েই স্ট্যান্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে দর্শকদের সবাইকে দেখছিলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠছিল শ্রান্তি, অবসাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় সেই রকমের এক পরম পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তি যা যে-কোন দৃশ্যেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। বাঁ হাতের লম্বা সুন্দর নরম আঙুলগুলো তাঁর সিঁদুরের মতো লাল মখমল-মোড়া বক্স-সীটের উপরে অলসভাবে বিছিয়ে পড়ে আছে, আর সে-আঙুলগুলোয় দুর্লভ মনোহর মরকতমণি এমনই হেলাভরে শোভা পাচ্ছে যে দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তেই বুঝি বৃন্তচ্যুত ফলের মতো তা আঙুল থেকে খসে পড়ে যাবে। হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করে দিলেন তিনি; হাসতে হাসতে বললেন—'দেখ, দেখ! কি অদ্ভুত দেখতে, বরং যথার্থ বলতে গেলে, কি অদ্ভুত কারবার! ঐ যে, ওখানে, যে লোকটা বাজাচ্ছে ওই 'সপ্তছিদ্র বাঁশরী মোর'।'

সবাই ফিরে চাইল সেদিকে। বাস্তবিক সে একটা দেখবার মতো কাণ্ডই ছিল বটে! রুমানিয়ান বাজনদারদের পিছনে মোটাসোটা এক গোঁফওয়ালা বুড়ো—হয়ত কোন এক মস্ত বড়ো সংসারের বাপ কি ঠাকুর্দা হবে—বসে প্রাণপণে একসঙ্গে জড়ানো সাত-সাতটা বাঁশি ফুঁ দিয়ে বাজাচ্ছে, কিন্তু যন্ত্রটাকে ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে চোখের নিমেষে ঘোরানো ফেরানো তার পক্ষে শক্ত বলে লোকটা করেছে কি—অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের মাথাটাকেই বোঁ করে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে চলেছে।

'চমৎকার কাণ্ড তো,' বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া—'আচ্ছা, শ্যাপলিন্স্কি, তোমার মাথাটা অমনি করে ঘোরাও তো দেখি।'

বোলোদিয়া শ্যাপলিন্স্কি গোপনে গোপনে রোবিনস্কায়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন; তাই তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে বেশ আগ্রহভরেই হুকুম তামিল করতে বসে গেলেন, কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই থেমে পড়ে বললেন, 'নাঃ, এ অসম্ভব, হয় বহুকালের অভ্যাস, নয় বংশগত ক্ষমতার দরকার এর জন্যে।'

ব্যারনেস এতক্ষণ অবধি বসে বসে একটা গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মদের পাত্রে জমা করছিলেন; এখন কষ্টে একটা হাই চেপে মুখখানা সামান্য একটু বেঁকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'কিন্তু, হা ভগবান! কি কষ্ট করেই না ওরা আসে আমাদের ক-তে একটু ফূর্তি করতে! ঐ দেখ—হাসি নেই, গান নেই, নাচ নেই। ঠিক যেন একপাল গরু-ছাগলকে জবরদস্তি করে তেড়ে এনে ঢোকানো হয়েছে এখানে।'

আলস্যভরে মদের গেলাস ঠোঁটে তুলে এক চুমুক দিয়ে রিয়াজানোব তাঁর মধুরকণ্ঠে উদাসীন ভাবে বললেন, 'তবে তোমার প্যারিস কি নিস-এ কি এর চেয়ে আমোদ বেশি? কেন, এ কথা মানতেই হবে যে তারুণ্য, হাসি, আনন্দ, সবই চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে গেছে মানুষের জীবন থেকে, ও-সব যে আর কখনও ফিরে আসবে তার সম্ভাবনাও বিশেষ কিছু নেই। আমার তো মনে হয়, আরও অনেকখানি ধৈর্য নিয়ে মানুষকে বিচার করা উচিত। এই যারা আজ সন্ধ্যায় এখানে এসে ঐ বসে আছে তাদের সবার হয়ত এই একটু সময়ের জন্যেই বিশ্রামের অবকাশ মিলেছে—কে জানে?'

'এই শুরু হল ওদের পক্ষ-সমর্থনের বক্তৃতা।' বলে উঠলেন শ্যাপলিন্স্কি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে।

চোখের পলকে রোবিনস্কায়া তাঁদের দুজনের দিকে ফিরে চাইলেন, টানা টানা চোখ

দুটি তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। এ ছিল তাঁর ক্রোধের নিশানা, তার সামনে রাজকুমারদেরও সময় সময় মতিভ্রম ঘটত। যা হোক, চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন তিনি—'তোমরা কি যে সব বলছ আমার মাথায় ঢুকছে না কিছুই। কেন যে এখানে এসেছি আমরা তা-ও বুঝতে পাচ্ছি না আমি। সারা দুনিয়ায় দেখবার মতো জিনিস তো আর খুঁজে পাই না। নিজের কথা বলতে, সেবিল, নাদ্রিদ,' আর সাঁ সেবাস্তিয়েন-এ আমি দেখে এসেছি ষাঁড়ের লড়াই—তা দেখে এক ধিক্কার ছাড়া আর কোন ভাবেরই উদয় হয় না অন্তরে। কুস্তি দেখেছি, মুষ্টিযুদ্ধ দেখেছি—কুশ্রী পাশবিকতা সে-সব। তারপর বাঘ-শিকারে যাবারও সুযোগ হয়েছিল আমার, ছিলাম আমি মস্ত বড় একটা শিক্ষিত শ্বেতহস্তীর পিঠের ওপরে হাওদার মধ্যে—এককথায় তোমাদের সবারই তো এ-সব জানা কথা। আমার সেই উদার, বহুবিচিত্র, কলরবমুখর জীবন যা আমি আজ পিছনে ফেলে রেখে এসেছি তা থেকে—'

'আহা, কি-যে সব বলছ, এলেনা ভিক্তোরোবনা!'—সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন শ্যাপলিনস্কি।

'স্তোকবাক্য ছাড় এখন, বোলোদিয়া! আমি জানি যে আমার দেহে যৌবনশ্রী এখনও অটুট রয়েছে; তবুও মাঝেমাঝে মনে হয় যেন একেবারে নব্বই বছরের খুনখুনে বুড়ীটি বনে গেছি—অন্তরাত্মা আমার এমনই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বেঁচে নেই—টিকে আছি শুধু। সারাজীবনে মাত্র তিনটি ঘটনা আমার অন্তরতম অন্তরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। প্রথমটা ঘটেছিল আমার বালিকা-বয়সে। একদিন পরম আতঙ্ক আর চরম ঔৎসুক্য নিয়ে দেখছিলাম, চোরের মতো পা টিপে টিপে একটা বেড়াল শিকার ধরবার জন্যে একটা মন্দা চড়াই পাখির দিকে এগিয়ে আসছে, আর চড়াইটাও সাবধানে তার গতিবিধির নিশানা রাখছে। আজও ঠিক করে বলতে পারি না কোন্‌টায় আমার মন টেনেছিল বেশি—বেড়ালের শিকার ধরবার কৌশল, না পাখিটার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবার কায়দা। চোখের পলকে উড়ে গিয়ে পাখিটা সামনের গাছের ডালের ওপরে বসে তার কিচিরমিচির ভাষায় বেড়ালটাকে উদ্দেশ করে এমন অকথ্য গালাগাল করতে লাগল যে, তার একটি বর্ণও বুঝতে পারলে লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম আমি। আর বেড়ালটা তখন, যেন তারই ওপরে কত অন্যায় করা হয়েছে এমন ভাবখানা করে, সিধে লেজ উঁচিয়ে এমন ভান করতে লাগল যে, ও আর এমন নতুন কি হয়েছে! আর-একবার এক অপেরাতে একজন নামকরা গায়কের সঙ্গে আমায় ডুয়েট গাইতে হয়েছিল।'

'কার সঙ্গে?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন ব্যারনেস।

'নামে কি এসে যায়? কি করবে নাম দিয়ে? যাক গে, দুজনে মিলে গাইতে গাইতে হঠাৎ আমার সারা অঙ্গ কাঁপিয়ে যেন প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল! দুজনের কণ্ঠস্বর কোন্‌ এক অভাবনীয়ের স্পর্শে কেমন যেন এক অশ্রুতপূর্ব ঐকতানে মিশে এক হয়ে গেল। অবর্ণনীয় সে অনুভূতি। আহা! সারাজীবনে বোধহয় একবারই এমনটি ঘটে থাকে। ভূমিকায় আমার এক জায়গায় কান্নার কথা ছিল, সেদিন সেখানে সত্যি-সত্যিই অকপটে অশ্রু বিসর্জন করেছিলাম আমি। যবনিকা পতনের পর তিনি যখন আমার পাশে এসে তাঁর বিশাল করপল্লব আবেগভরে আমার মাথায় বুলোতে বুলোতে মোহন উজ্জ্বল হাসি হেসে বললেন, 'চমৎকার! এমন গান জীবনে এই প্রথম গাইলাম আজ—,' তখন আমি—আমার মতো এমন মানিনীও তাঁর করপল্লবে চুম্বন এঁকে না দিয়ে থাকতে পারেনি সেদিন। তখনও আমার চোখের কোণে অশ্রুরাশি টলমল করছিল।'

আর তৃতীয় দফায়?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যারনেস, চোখ দুটো তাঁর ঈর্ষার জ্বালায় ধকধক করে জ্বলে উঠল।

উদাস কণ্ঠে উত্তর দিলেন গায়িকা, 'তৃতীয় দফা, আহা! সে হচ্ছে যার-পর-নাই

এক সাধারণ ব্যাপার। গত মরসুমের সময় আমি ছিলাম নিস-এ, সেখানে থাকতে একদিন ফ্রেজুজ-এর স্টেজে 'কারমেন'-এর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম—সেসিলে কেওন তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি এখন'—বলেই আন্তরিকতার সঙ্গে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন রোবিনস্কায়া, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'জানি না এ তাঁর সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কিন্তু মহিলাটি আর বেঁচে নেই।'

অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল রোবিনস্কায়ার মনোরম দুটি চোখ, আর গ্রীষ্মের সুখোষ্ণ প্রদোষ-অন্ধকারে আকাশের বুকে সন্ধ্যাতারার মতো তা থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল এক অপরূপ স্নিগ্ধ দীপ্তি। স্টেজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, অবশ পেলব আঙ্গুলে অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে চেপে ধরে রইলেন বক্স-সীটের আড়াল-দেওয়া পর্দাখানি, তারপর আবার যখন তিনি তাঁর বন্ধুদের দিকে মুখ ফেরালেন ততক্ষণে চোখের জল তাঁর শুকিয়ে গেছে—রহস্যমধুর, মদালস, বাসনাঘন ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠেছে সহজ হাসি-হাসি ভাব।

সস্নেহ সৌজন্যভরে জিজ্ঞেস করলেন রিয়াজানোব, 'কিন্তু, এলেনা ভিক্তোরোব্না, তোমার এতখানি সুযশ, তোমার অসংখ্য স্তাবকের দল, জনতার জয়রব—আর শেষ অবধি দর্শকদলকে যে আনন্দ পরিবেশন করে বেড়াও তুমি! এ-ও কি সম্ভব যে তোমারও মনে শান্তি নেই?'

'না, রিয়াজানোব, তা নেই,' ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন গায়িকা—'এর মূল্য যে কতটুকু তা তুমি আমার চাইতে কম জান না। কোথাকার এক কাঠখোট্টা লোক একটা, এসেছে হয়ত বন্ধুবান্ধবদের জন্যে পাশ ভিক্ষে করতে, আর ওরই সঙ্গে সঙ্গে, যদি জুটে যায় এনভেলাপে ভর্তি গোটা-পঁচিশেক রুবল। নয়ত ইস্কুলের ছেলেমেয়ের দল তোমার অটোগ্রাফ-করা ফোটোগ্রাফের জন্যে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে। কোথাকার এক বোকাপাঁঠা জেনারেল এসে আমার গানের মাঝে দম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন তাঁর হেঁড়ে গলায় কপোতকূজন করে, আর সর্বদাই—'ঐ যে উনি, হ্যাঁ, ঐ তো সেই বিখ্যাত গায়িকা'—লেগেই রয়েছে। তারপর রয়েছে বেনামী চিঠির তাড়া, স্টেজের পেছন দিক্‌কার লোকগুলোর ভাঁড়ামি—সব কথা কি বলে শেষ করা যায় নাকি! কেন, তুমিও নিজে সময়ে-সময়ে প্রায়ই পড়ে থাক নিশ্চয় যত সব খ্যাপাটে মেয়েমানুষের পাল্লায়?'

'তা বটে,' নিঃসংশয়ে জবাব দিলেন রিয়াজানোব।

'এ সবের না হয় এখানেই শেষ,' বলে চললেন রোবিনস্কায়া। 'তারপর আবার ধর যা হল সব চেয়ে ভয়ানক কাণ্ড—অভিনয় করতে করতে যখনই সত্যিকারের প্রেরণা এসেছে অমনি রূঢ়ভাবে এ সত্য মনের মধ্যে জেগে উঠেছে যে, লোকের সামনে আমি ভান করে চলেছি, খিঁচোচ্ছি মুখ। তারপর রয়েছে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাফল্য সম্বন্ধে আতঙ্ক —আর সেই চিরন্তন ভয়, এই বুঝি কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেল, এই বুঝি চেঁচিয়ে ফেললাম বেশি, এই বুঝি সর্দি লাগল! বাস্তবিক, বিখ্যাত হওয়ার দায়িত্ব অনেক!'

'কিন্তু শিল্পীর খ্যাতি!' উত্তর দিলেন উকিল মশায়; 'প্রতিভার শক্তি! বাস্তবিক এ হচ্ছে গিয়ে এক অপার্থিব শক্তি—যে-কোন পার্থিব রাজার রাজশক্তির ঊর্ধ্বে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, বন্ধু! কিন্তু মান-যশ দূর থেকে দেখতেই মিঠে—ততক্ষণই মিঠে যতক্ষণ সে বিষয়ে বসে বসে স্বপ্ন রচনা করছ তুমি। কিন্তু এর নাগাল পেয়েছ কি তা গলার কাঁটা হয়ে আটকেছে। আর তারপর এ-সব যখন তিলে তিলে ক্ষয় পেতে থাকে তখন কি যন্ত্রণাই না সইতে হয় তোমায়! হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমরা এই সব শিল্পীরা যেন সব সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী। ভোরবেলা উঠে ব্যায়াম, দিনের বেলা তালিম; তারপর নাওয়া-খাওয়া সারা হতে-না-হতেই অভিনয়ের জন্যে হাজরে দিতে যাওয়া। এই যে এখন তুমি আমি মিলে বসে যা করছি এই রকম এক-আধঘণ্টার

পড়াশোনা কি আমোদ-প্রমোদের জন্যে সময় পাওয়াও পরম সৌভাগ্যের কথা। আর তা-ই বা কি—এ সব আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে একেবারে গতানুগতিক ধাঁচের—'

ক্লান্ত অবহেলাভরে বক্সের রেলিঙের উপর থেকে আঙ্গুলগুলো সামান্য একটু নেড়ে মনের ভাব ব্যক্ত করলেন রোবিনস্কায়া।

এতক্ষণ এ-সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন বোলোদিয়া শ্যাপলিন্স্কি, এখন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন তিনি, 'আচ্ছা, বলতে পার, এলেনা ভিক্তোরভ্না, তোমার এই সব কল্পনা আর এই অবসাদ থেকে মন সরিয়ে নেবার জন্যে কি করতে চাও তুমি?'

প্রহেলিকাময় চোখদুটি তুলে তাঁর দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে, বুঝি একটু সলজ্জ ভাবেই, জবাব দিলেন রোবিনস্কায়া—'আগেকার দিনে লোকের কোন কুসংস্কার ছিল না, এখনকার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দে দিন কাটাত তারা। তখনকার দিনে হলে আমিও সমাজে আমার সত্যিকারের স্থানটি বেছে নিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারতাম। হায় রে, প্রাচীন রোম!'

এক রিয়াজানোব বাদে কেউই এ-কথার তাৎপর্য ধরতে পারলেন না। তাঁর মধুর কণ্ঠে অভিনয়ের ভঙ্গিতে একটি পুরাতন অথচ বহুপ্রচলিত লাতিন উক্তি উদ্ধার করে বলে উঠলেন তিনি—'বিফল যৌবন তব, হে মহাসম্রাট!'

'ঠিক বলেছ!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া—'সুচতুর ছেলে তুমি, রিয়াজানোব, তাই তো তোমায় এত পছন্দ আমার। মনের কথাটি চট করে ধরতে পার তুমি—যদিও মানতেই হবে এ-কথা, যে খুব উঁচুদরের মানসিক গুণ নয় এ। আর সত্যিই, দুটি প্রাণের মিলন হল, সদ্য গতদিবসের পরিচয়, আহার-বিহার করেছে তারা একসঙ্গে ব'সে, বলেছে মনের কথা, তারপর আজই হতে হবে তাদের একজনকে শেষ। বুঝতে পারছ—শেষ, চিরদিনের জন্যে জীবনের কাছ থেকে বিদায়—মৃত্যু। রইল না তাদের মধ্যে কোন দ্বেষ, কোন আশঙ্কা। এর চেয়ে বাস্তব, এর চেয়ে সমৃদ্ধ কোন দৃশ্য কল্পনায় আসে না আমার।'

'কি পাষাণ প্রাণ!' চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বলে উঠলেন ব্যারনেস।

'তা, এখন কি-ই বা আর করা যাবে! আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন বীরব্রতী দস্যু। যাক গে, এখন ওঠা যাক তবে।'

সবাই বাগানের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বোলোদিয়া শ্যাপলিন্স্কি তাঁর মোটরগাড়ি আনতে বলে পাঠালেন। এলেনা ভিক্তোরভ্না তাঁরই বাহুসংলগ্ন হয়েছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আচ্ছা, বল দেখি, বোলোদিয়া, ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে যখন তুমি থাক না, তখন তুমি যাও কোথায়?'

আমতা আমতা করতে লাগলেন বোলোদিয়া। তবে জানতেনও তিনি যে রোবিনস্কায়ার সামনে মিছে কথা বলার ক্ষমতা নেই তাঁর।

'মানে, সে তোমার পছন্দ হবে না শুনলে। এই ধর জিগানিতে—নৈশ প্রমোদাগারে—'

'আর কোথাও? আরও খারাপ কোন জায়গায়?'

'বাস্তবিক, ভারি মুশকিলেই ফেললে দেখতে পাচ্ছি। যেদিন থেকে তোমার প্রেমে পাগল হয়েছি—'

'ভাবের কথা রাখ এখন।'

'আহা, বলিই বা কি ক'রে?' লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি, সারা দেহ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। অতিকষ্টে শেষে বলেই ফেললেন—'তা, হ্যাঁ, মেয়েমানুষের কাছে তো বটেই। তবে, হ্যাঁ, এ-সব আমার নিজের গরজেই—'

দুষ্টুমি করে কনুইয়ের উপরে একটা চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রোবিনস্কায়া—'বেশ্যাবাড়ি?'

কোন জবাব দিলেন না বোলোদিয়া। রোবিনস্কায়া বলে উঠলেন—'তবে এখনই তোমার মোটরগাড়িতে করে আমাদের নিয়ে চল সেখানে, সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে চল। ব্যাপারটা একেবারে আমার অজানা। কিন্তু মনে থাকে যেন তোমারই ভরসায় যাচ্ছি সেখানে।'

আর দুজন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন বলে মনে হল; কেননা এলেনা ভিক্তোরভ্‌নাকে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। তাঁর প্রাণ যখনই যা চাইত তাই তিনি না করে ছাড়তেন না। তা ছাড়া তাঁদের সকলেই শুনেছিলেন আর বাস্তবিক জানতেনও বই কি যে, পিতার্সবার্গে মদের নেশার ঝোঁকে ভদ্রঘরের মেয়েরা, এমন কি বালিকারাও, শৌখিন বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে, এর চেয়েও ঢের ঢের জঘন্য রকমের খেয়াল চরিতার্থ করে থাকে।

৭

'দেখ,' বোলোদিয়াকে বললেন রোবিনস্কায়া ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে—'প্রথমে নিয়ে যাবে সেরা জায়গায়, তারপর মাঝারি গোছের একটাতে, শেষে সব চেয়ে জঘন্য স্থানে।'

'দেখ, এলেনা,' জবাব দিলেন শ্যাপলিন্‌স্কি—'তোমার জন্যে সবই করতে পারি। হুকুমে প্রাণও দিতে পারি আমি।—কিন্তু এ-সব জায়গায় তোমায় নিয়ে যেতে সাহস পাই না। ভয় হয় পাছে কেউ তোমায় অপমান করে বসে—'

'হা ভগবান!' অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া—'লণ্ডনে যখন জলসা চলছিল আমার, কত লোক যে তখন প্রেম নিবেদন করতে আসত আমায়; তখন কিন্তু বাছা বাছা সঙ্গীদের নিয়ে হোয়াইট শ্যাপেলের জঘন্যতম ডেরাডান্ডায় ঘুরে বেড়াতে দ্বিধা করিনি আমি। আমায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন দুজন লর্ড; কিছুতেই তাঁরা তাঁদের সামনে একজন নারীর অপমান সইতেন না। কিন্তু তুমি, বোলোদিয়া, তুমি বুঝি কাপুরুষদের দলের!'

দপ করে জ্বলে উঠলেন শ্যাপলিন্‌স্কি—'আহা, না, তা নয়, এলেনা ভিক্তোরভ্‌না। তোমায় আমি আগে থেকেই সাবধান করতে চেয়েছি, সে শুধু তোমায় ভালোবাসি ব'লে। নইলে যেখানেই যেতে চাও তুমি, সেখানেই নিয়ে যেতে প্রস্তুত আমি—একেবারে মরণের মুখে পর্যন্ত।'

ইতিমধ্যে তাঁরা ইয়ামকার সেরা গণিকালয়ের সম্মুখে—ত্রেপেলে—এসে পৌঁছুলেন। আইনজীবী রিয়াজানোব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'এই যে, চিড়িয়া-খানা পরিদর্শন শুরু হল দেখছি।'

তাঁদের নিয়ে গিয়ে একটা লাল রঙের কুঠরিতে বসানো হল; দেয়ালের গায়ে 'এম্পায়ার' স্টাইলে লরেল-স্তবক আঁকা—সোনালী নকশায়।

বল্টিক অঞ্চলের চারজন জার্মান মেয়ে এগিয়ে এল। তাদের প্রত্যেকেরই বেশ নিটোল গড়ন, পীনোন্নত পয়োধর, গৌরবর্ণ, পাউডার-ঘষা মুখ, ভারিক্কি চাল, আর সসম্ভ্রম ব্যবহার। আলাপ-পরিচয়ে সুর ধরতে চায় না প্রথমটায়। মেয়েরা ক-জন তো পাথরের মূর্তির মতো অচল হয়ে বসে রইল, যেন প্রাণপণে প্রমাণ করতে চায় যে তারা সব হচ্ছে অভিজাত ভদ্রমহিলা। শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলেন রিয়াজানোব, তাতেও ভাবান্তর ঘটল না তাদের। রোবিনস্কায়াই তখন এগিয়ে এলেন তাদের উদ্ধার করতে। তাদের মধ্যে যে ছিল সব চেয়ে মোটাসোটা, দেখতে একেবারে যেন আস্ত একখানা পাঁউরুটি, তার দিকে চেয়ে সৌজন্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তিনি—'বল তো দেখি, তোমার দেশ কোথায়? খুব সম্ভব জার্মানীতে—নয়?'

'আজ্ঞে না, মাদাম, রিগাতে।'

'তবে এখানে কাজে এসে ঢ়ুকলে কি ক'রে? দারিদ্র্যের জন্যে নয় বোধ হয়?'

'না, মাদাম, সেজন্যে নয় মোটেই। হান্‌স্‌, আমার হবু-বর, একটা রেস্তরাঁয় রসুইয়ের কাজ করে, এখন আমাদের আর্থিক অবস্থা ঠিক বিয়ে করার মতো সচ্ছল নয়। তাই খরচ-খরচা থেকে আমি যা বাঁচাতে পারি তা এক ব্যাঙ্কে জমা রাখছি, সে-ও তাই করছে। এভাবে দশহাজার রুবল জমা হলে আমরা বীয়ার-হল খুলব, আর ভগবানের আশীর্বাদে তখন আমাদের ছেলেপিলের মুখ দেখবার সৌভাগ্য হবে; দুটি মাত্র সন্তান—একটি ছেলে, একটি মেয়ে।'

'শোন, বাছা!' অবাক হয়ে বললেন রোবিনস্কায়া—'তুমি তরুণী, সুন্দরী, দু-দুটো ভাষা শিখেছ—'

'আজ্ঞে, তিনটে ভাষা মাদাম,' বেশ একটু গর্বভরেই বলে উঠল জার্মান মেয়েটি; 'লাতিনও জানি আমি। আমি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পড়া শেষ করে হাইস্কুলের তিন ক্লাস অবধি পড়েছি।'

শুনে বেশ একটু গরম হয়ে উঠলেন রোবিনস্কায়া। বললেন—'হ্যাঁ, তা হলেই দেখছ যে, এ-রকম শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে তুমি খাওয়াপরা বাদে ত্রিশ রুবল মাইনেতে ইচ্ছে করলেই কাজ পেতে পার, যেমন ধর ঘর-সংসার দেখবার কাজ, কারুর সঙ্গিনীর কাজ, কিংবা কোন একটা ভালো স্টলে সিনিয়র কেরানী কি ক্যাশিয়ারের চাকরি—আর তোমার হবু-বর —ফ্রিৎজ্‌—'

'হান্‌স্‌, মাদাম'

'হান্‌স্‌, সে যদি পরিশ্রমী আর হিসেবি হত তবে এই বছর তিন কি চারের মধ্যে তোমাদের পক্ষে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো একটুও কঠিন হত না। কি বল?'

'কিন্তু, মাদাম, একটু ভুল করছেন আপনি। আপনার খেয়াল নেই যে, এ সবগুলোর মধ্যে সব চেয়ে সেরা একটা কাজ পেলেও, আমি কষ্টেসৃষ্টে না-খেয়ে না-দেয়ে বড়জোর পনের কি কুড়ি রুবল জমাতে পারি মাসে মাসে। কিন্তু এখানে একটু সমঝে চললেই শ-খানেক রুবল হাতে থেকে যায় আমার, আর তখনি আমি খাতাপত্রসুদ্ধ ব্যাঙ্কে গিয়ে তা জমা দিয়ে আসি। তা ছাড়া আর-একটা কথাও ভেবে দেখুন মাদাম, কারুর বাড়িতে ঝি-গিরি করা কি লজ্জার কাজ! অষ্টপ্রহর মনিবদের সবার মন যুগিয়ে চলতে হবে। আর মনিব তো দিনরাত যত রকমের ন্যাকাপনা করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবেন, ছিঃ! ইদিকে তো আবার গিন্নী-ঠাকরুণের মুখভার, মুখনাড়া, আর গালাগাল। উঃ!'

'নাঃ,—ঠিক বুঝতে পারলাম না,' মেঝেতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিন্তিত সুরে টেনে টেনে বলতে লাগলেন রোবিনস্কায়া—'তোমাদের এখানকার—এই কি বলব, এ-সব জায়গায় মেয়েদের জীবনযাত্রার কথা শুনেছি আমি ঢের। লোকে বলে সে বড় ভয়ানক। শুনতে পাই অতি কদর্য,—বুড়োহাবড়া, কুৎসিত লোকদেরও মনোরঞ্জন করতে বাধ্য করা হয় তোমাদের, আর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তোমাদের পয়সাকড়ি সব টুইয়ে নেওয়া হয়ে থাকে—।'

'না মাদাম, কখ্‌খনো সে-সব করা হয় না—আমাদের প্রত্যেকেরই একখানা করে হিসেবের খাতা রয়েছে, তাতে খুঁটিনাটি সব জমাখরচের হিসেব লেখা থাকে। গত মাসে আমি পাঁচশ-র কিছু বেশি আয় করেছি। নিয়মমতো দুই-তৃতীয়াংশ খাওয়া-থাকা-পরা বাবদ বাড়িউলী ঠাকরুণকে দিতে হয়, তারপর তো দেড় শ থাকে, কি বলেন? তাই থেকে পঞ্চাশ রুবল পোশাক আর হাতখরচা, বাকি রইল এক-শ—ঐটেই আমি বাঁচাই। একে কি টুইয়ে নেওয়া বলে, মাদাম? যদিই বা আমি কাউকে অপছন্দ করি—সত্যিই এ রকম কুৎসিত কেউ কেউ আসে—বললেই পারি যে আমি অসুস্থ, তাহলেই আমার বদলে যাবে আন্‌কোরা মেয়েদের মধ্যে থেকে কেউ।'

'কিন্তু তারপর—কিছু মনে করো না—তোমার নামটি তো জানি না।'

'এল্‌জা।'

'লোকে যে বলে তোমাদের ওপর খুব জোরজবরদস্তি হয়ে থাকে—প্রহারও চলে নাকি সময়ে সময়ে—তোমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও নাকি অনেক ঘেন্নার কাজ করিয়ে নেওয়া হয়—সত্যি?'

'কখ্‌খনও নয়, মাদাম।' একটু যেন রাগতভাবেই উত্তর দিল এল্‌জা—'এখানে সবাই এক পরিবারের লোকের মতোই আছি; সবাই আমরা এক দেশের লোক, নয়ত আত্মীয়কুটুম, ভগবান করুন আমাদের মতো আরও দশটা পরিবার এইরকম মিলে-মিশেই থাকুক। সত্যি বটে, এই ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটে অনেক ঢলাঢলি, মারামারি, কেলেঙ্কারি হয়, কিন্তু সে-সব হল ঐ সব এক রুবলের বাসাতে। রুশ মেয়েরা পিপে পিপে মদ গেলে, আর তাদের প্রত্যেকেরই একটি-না-একটি নাগর থাকে, নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেও জানে না তারা।'

'বিচক্ষণ মেয়ে তুমি, এল্‌জা!' ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া, 'তা সবই তো যেন ভালো। কিন্তু দৈবাৎ যদি ব্যামো হয়? ছোঁয়াচে রোগ? তবেই তো মরণ—নয়? বুঝবে কি ক'রে?'

'আবার সেই একই উত্তর আমার—'না মাদাম।' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ না করে কাউকে আমি আমার বিছানা মাড়াতে দিই না—এভাবে অন্তত এক-শর মধ্যে প'চাত্তরটির বেলায় আমি ব্যামো-ফ্যামোর বালাই থেকে নিশ্চিন্দি।'

'চুলোয় যাক!'—হঠাৎ খেপে উঠে টেবিলে এক ঠোক্কর মেরে বসলেন রোবিনস্কায়া—'কিন্তু তারপর, তোমার আলবার্টের দশা কি হবে...'

'হান্‌স,' এল্‌জা ভয়ে ভয়ে শুধরে দিল তাঁকে।

'ও হ্যাঁ, ভুল হয়েছে—তোমার হান্‌স নিশ্চয়ই একথা ভেবে পুলকিত হয়ে ওঠে না যে, তুমি রয়েছ এখানে আর প্রতিরাতেই চলেছ তার বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে?'

এল্‌জা বাস্তবিকই চকিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর শান্ত করুণকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু মাদাম, আজও তো তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইনি আমি। সে হল ঐ-সব নষ্ট মাগীরা, বিশেষ করে ঐ-সব রুশ মাগীরা যাদের একটি করে ভাবের মানুষ থাকবেই থাকবে, আর তাদের জন্য এই রক্ত-জল-করা পয়সা তারা জলের মতো খরচ করবেই করবে। কিন্তু আমি অত নিচে নামব, ছোঃ!'

'উঃ, এর চেয়ে নিদারুণ অধঃপতনের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না!'—ঘৃণাভরে চেঁচিয়ে উঠলেন রোবিনস্কায়া, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'উঠুন, মশাইরা, এদের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়া যাক এখান থেকে।'

রাস্তায় এসে বোলোদিয়া বললেন—'দোহাই ভগবান! একটিতেই কি সাধ মেটেনি তোমার?'

'কি-ইতরমো! উঃ, কি ইতরমো!'

'তাই তো বলি কাজ নেই আর আমাদের এ রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে।'

'না, দেখতে হবে কোথায় এর শেষ।'

দশ পা দূরেই ছিল আনা মারকোব্‌নার আস্তানা।

কিন্তু এখানেই ছিল তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে চরম বিস্ময়। সাইমন তো তাঁদের ঢুকতেই দিতে চায় না, শেষে রিয়াজানোবের হাত থেকে গোটা কয়েক মোহর খসে এসে তার হতে পড়তে তবু একটু নরম হল সে। সবাই গিয়ে বসলেন একটা কুঠরিতে—ত্রেপেলের ঘরখানার মতোই প্রায় দেখতে। এমা এডোয়ার্ডোবনার হুকুমে মেয়েদের সব গাদাগাদি করে এনে ঢোকানো হল সেখানে। কিন্তু ফল হল ঠিক শাকসবজির বাগানে এক পাল ছাগল এনে ছেড়ে দিলে যেমনটি হয়ে থাকে প্রায় তেমনটি। সব চেয়ে মারাত্মক

ভুল হল জেন্‌কাকে এনে ঢোকানো—বদরাগী, খিটখিটে জেন্‌কা, উদ্ধত চোখদুটো থেকে তার ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুনের হল্‌কা। সবার শেষে এল তামারা—শান্ত, নম্র, ঠোঁটের কোণে মোনালিসার মতো সেই সলজ্জ, চটুল বক্রহাসি। শেষ অবধি ডেরার প্রায় সকলেই এসে জুটল ঘরের মধ্যে। রোবিনস্কায়া আর হিতে বিপরীতের ভয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন না—'এপথে পা বাড়ালে কেন?' অন্তঃপুরিকারাও তাঁকে মৌখিক ভদ্রতা দেখিয়ে অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করল না। এলেনা ভিক্তোরোব্‌না তাদের বললেন গান গাইতে, বিনা আপত্তিতে গান ধরল তারা—'সেই তো আবার এল রে সোমবার...'

তারপর আরও একখানাঃ

হায় পোড়া কপাল, কপাল আমার রে!
ভাঁটিখানা বন্ধডানা,
আমার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল যে!

ফের আবারঃ

ভুঁইফোঁড় সে ভবঘুরের
প্রাণের ভালোবাসা
যেমনি মিঠে তেমনি কড়া,
—খাসা, আহা, খাসা!
বেশ্যেমাগীর মড়াকান্না,
নেইকো চোখে জল,
সেরা চীজ সে এ-সংসারে,
নয় তবুও ছল।
হাঃ, হাঃ, হাঃ!
ঘরকন্না বাঁধল দুজন,
—কোথায় মেলে জুড়ি?
বরটি হলেন সিঁধেল চোর,
কনে বেশ্যে ছুঁড়ী!
হাঃ, হাঃ, হাঃ,!
রাত পেরুলো তে-পওর, ভাই,
—সিঁধ দিতে যায় বর,
ঠমকে হেসে গড়িয়ে পলো
কনে বিছানার 'পর!
হাঃ, হাঃ, হাঃ,!
ভোরটি হলে কয়েদখানায়
আটক হলেন ভায়া,
মাগী তখন নাগর-দোলায়,
—নেই কো হায়াকায়া!
হাঃ, হাঃ, হাঃ,!

তারপর কয়েদীদের একটা গানঃ

টানাপোড়েন সারাজীবন—
লাগল গলায় ফাঁস,
বছর ঘুরে বছর এল,
উঠল নাভিশ্বাস!

আগের মতোই যেন আবার তাদের দুজনকে পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।

প্রাসাদ-তোরণের সামনে জমকালো একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে চলল। একটার পর একটা দরজা। দরজাগুলি পার হয়ে ভিতরের দিককার একটি চত্বরে গিয়ে পেঁাছল তারা। সেখানে আবার আর-একজন তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তারা গিয়ে পেঁাছতেই তিনি তাদের নিয়ে সামনে এগিয়ে চললেন। একটু বাদেই তারা মাঝারি-আকারের একটি ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকেই তারা হকচকিয়ে গেল একটু। শাসনকর্তা সেখানে বসে রয়েছেন।

সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে তারা তাঁকে অভিবাদন জানাল। আগে থাকতেই সর্দার এসব তালিম দিয়ে রেখেছিল। শাহাক আর বারাব্বাসের কিন্তু এতে কোন সায় ছিল না। শাসনকর্তা হলেও তিনি একজন মানুষমাত্র; যতই না কেন শক্তিশালী হোন, দেবতা নন। আর তাই এভাবে যে তাঁর সামনে এসে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানাতে হবে, ভাবতেই যেন সারাটা মন তাদের বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সে যাই হোক, সর্দারের নির্দেশ অমান্য করতেও তারা সাহস পায়নি। মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই পড়েছিল তারা, শাসনকর্তা তাদের উঠে দাঁড়াতে বললেন। ঘরের এককোণে চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন। আদেশ পেয়ে তারা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শাসনকর্তার বয়স প্রায় বছর ষাটেক হবে। শক্তসমর্থ চেহারা; মুখখানা ভরাট, তবে মেদবহুল নয়। চওড়া চিবুকে বেশ খানিকটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠেছে। চাউনিটাও তীক্ষ্ম। তবে ক্রুদ্ধ নয়। না, লোকটার চেহারার মধ্যে ভয় পাবার মতো কিছু নেই। সর্দারের কাছে তিনি শাহাক আর বারাব্বাসের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ঠিক-মতো এরা কাজকর্ম করছে তো? সর্দারের কোন অভিযোগ নেই তো এদের সম্পর্কে? আমতা আমতা করে সে জবাব দিল—না, তার কোন অভিযোগ নেই। তারপরে বলল যে, সবসময়েই সে ক্রীতদাসদের খুব কড়া শাসনে রাখে। উত্তর শুনে তিনি খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকালেন শুধু। তারপর হাতখানাকে একবার সামনের দিকে আন্দোলন করলেন। অর্থাৎ সে এবার যেতে পারে। লোকটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে তখন পালাতে পারলেই বাঁচে।

শাসনকর্তা তখন শাহাক আর বারাব্বাসের দিকে ফিরে তাকালেন। একটার পর একটা তিনি তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোত্থেকে তারা এসেছে, তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কেন, খনির থেকে তারা মুক্তি পেল কি করে, কে তাদের মুক্তিদান করল—এই সব নানান ধরনের প্রশ্ন। কণ্ঠস্বরে কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্রোধ নেই, বরং বেশ খানিকটা মমতা ফুটে উঠেছে। তারপর একসময়ে তিনি তাঁর আসনের থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। শাহাকের কাছে এসে তিনি তাঁর চাকতিখানাকে হাতে তুলে নিলেন। নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে এর উপর একটি ছাপ মারা রয়েছে, সে কি এর অর্থ জানে? শাহাক বলল, জানে। এ ছাপ রোমান রাষ্ট্রের। শুনে তিনি সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন; বললেন—ঠিক; এবং এ-ছাপের অর্থ হল এই যে, রাষ্ট্রই শাহাকের মালিক। কথা শেষ করে চাকতিখানাকে তিনি উলটে ধরলেন। উলটো পিঠে দুর্বোধ্য সেই অক্ষরগুলি খোদাই করা রয়েছে। কৌতূহলভরে সেই লেখার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে—নিচু তবু স্পষ্ট গলায়—উচ্চারণ করলেন 'ক্রীস্টোস্ য়েসাস্'। দুর্বোধ্য সেই অক্ষরগুলির যে তিনি অর্থোদ্ধার করতে পেরেছেন, ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করতে পেরেছেন, শাহাক আর বারাব্বাস তাতে বিস্ময়বোধ করল।

—এ নাম কার? তিনি প্রশ্ন করলেন।

শাহাক বলল—এ আমার ঈশ্বরের নাম। বলতে গিয়ে তার গলা একটু কেঁপে গেল।

—ঈশ্বরের নাম! কই, আগে তো এ-নাম শুনিনি? তা হবেও বা! দেবতা তো আর একজন মাত্র নন, দেবতা অসংখ্য। সবারই কিছু নাম জেনে রাখা সম্ভব নয়। তা শুধু তোমাদের দেশেই বুঝি-এ'র উপাসনা হয়?

—শুধু আমাদের দেশেই নয়, সর্বদেশেই। সকলেরই তিনি ঈশ্বর।

—সকলেরই! এ তুমি বলছ কি? সকলের তিনি ঈশ্বর, আর আমি কিনা তাঁর নাম পর্যন্ত জানিনে? কিছু মনে করো না, তোমার এই দেবতাটি বুঝি একটু গোপনে থাকতেই ভালোবাসেন?

—হ্যাঁ, তাই।

—তা নয় হল, কিন্তু সবারই যদি তিনি দেবতা হলেন তো তাঁর খানিকটা ক্ষমতাও আছে নিশ্চয়ই? সে ক্ষমতা আসে কোত্থেকে?

—ভালোবাসার থেকে।

—ভালোবাসার থেকে?—হবেও বা। তা নিয়ে আমার কিছু বলবার নেই। একটি কথার শুধু জবাব চাই আমি, চাকতির উপরে তুমি তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ কেন?

—তার কারণ তিনিই আমার প্রভু। আবার তার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে গেল।

—বটে, তিনিই তোমার প্রভু? কেন, তুমি কি তবে রাষ্ট্রের ক্রীতদাস নও? রাষ্ট্রই কি তোমার মালিক নয়?

শাহাক কোন উত্তর দিল না। নিচের দিকে তাকিয়ে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শাসনকর্তা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর কণ্ঠস্বরে অল্প-একটু মমতা মিলিয়ে বললেন—যা বললাম তার উত্তর দাও। ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাওয়াই ভালো। বল, রাষ্ট্রই কি তোমার মালিক নয়?

মাথা না তুলেই জবাব দিল শাহাক—আমার ঈশ্বরই আমার প্রভু, আমার প্রভুই আমার মালিক।

স্থির দৃষ্টিতে শাসনকর্তা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার চিবুক-খানাকে তিনি একটু তুলে ধরলেন; জ্বলে-যাওয়া মুখখানিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না।

তারপর বারাব্বাসের কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। তার চাকতিখানাকেও উলটে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—তুমিও বুঝি এই একই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?

বারাব্বাস জবাব দিল না।

—বল, তুমিও কর?

মাথা নাড়ল বারাব্বাস।

—কর না? তবে কেন তোমার চাকতিতে তুমি তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ?

আগের মতোই বারাব্বাস চুপ করে রইল।

—এ যাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ, তিনি কি তোমার ঈশ্বর নন?

অস্ফুট ম্লান বিষণ্ণ গলায় বারাব্বাস বলল—আমার কোন ঈশ্বর নেই।

বারাব্বাস যে একথা বলবে, শাহাক যেন তা কল্পনাও করতে পারেনি। বিস্ময়ে বেদনায় দুচোখে তার তীব্র একটা নৈরাশ্য ফুটে উঠল। শাহাকের দিকে না-তাকিয়েও বারাব্বাস যেন তার দৃষ্টির সেই বেদনাকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল। ও-দৃষ্টি তার মর্মস্থলে এসে বিদ্ধ হয়েছে।

শুধু শাহাকই নয়, শাসনকর্তাও বিস্ময়বোধ করলেন। বললেন—কথাটা আমি ঠিক

বুঝে উঠতে পারছি না। ঈশ্বর যদি তোমার না-ই থাকবে তো এই চাকতির উপরে তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ কেন?

—তার কারণ, আমি বিশ্বাস করতে চাই। মাথা না তুলেই বারাব্বাস জবাব দিল।

অবাক বিস্ময়ে শাসনকর্তা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চেহারা রুক্ষ কঠোর, চোখের নিচে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। এককালে লোকটা অসাধারণ বলশালী ছিল, এখনও তা বুঝতে পারা যায়। চাউনিটা স্থূল, ভাষাহীন। শাহাকের মুখখানাকে একটু ভালোভাবে দেখবার জন্যে শাসনকর্তা তার চিবুক তুলে ধরেছিলেন; বারাব্বাসের বেলায় আর তার দরকার হল না। তেমন কোন ইচ্ছেই হল না তাঁর। কেন? তিনি জানেন না।

শাহাকের দিকেই আবার তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন—একটু আগেই তুমি যা বলেছ, তার ফলাফলটা যে অনেক দূর গড়াতে পারে তা কি তুমি জান? তোমার এই চাকতির উপরে রোমান রাষ্ট্রের অধীশ্বর সীজারের ছাপ মারা রয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি তুমি অন্য-কাউকে তোমার প্রভু বলে ঘোষণা কর, সীজারের বিরুদ্ধেই তাহলে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। সীজারও দেবতাতুল্য। তাঁকে অস্বীকার করে অন্য-এক দেবতাকে তুমি তোমার প্রভু বলে গ্রহণ করেছ, তোমার চাকতির উপরে তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে, সীজার তোমার প্রভু নন, সেই দেবতাই তোমার প্রভু। তাই না?

—হ্যাঁ, তাই। বলতে গিয়ে শাহাকের গলাটা একটু কেঁপে গেল। আগের মতো অতটা আর কাঁপল না।

—এই তাহলে তোমার শেষ কথা, কেমন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এর পরিণামটা যে কি দাঁড়াবে, তা কি তুমি জান না?

—জানি, তাও আমি জানি।

শাসনকর্তা একটু চুপ করে রইলেন। সরলহৃদয় এই ক্রীতদাসের অজ্ঞাত-পরিচয় ঈশ্বরের কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি। সত্যি বলতে কি, সে-ঈশ্বরের পরিচয় তিনি জানেন। সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে তিনি অনেক কথাই শুনেছেন। জেরুসালেমের সেই উন্মাদকে যে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাও তিনি জানেন। 'তিনিই সকলের শৃংখল-মোচন করবেন'—'ঈশ্বরের যারা ক্রীতদাস, ঈশ্বরই তাদের মুক্তিদান করবেন'—না, এ বড় ভয়ংকর বিশ্বাস, কোনরকমেই আর একে উপেক্ষা করা চলে না। সাদাসিধে এই ক্রীতদাসকে এখন বড়ই অসহায় দেখাচ্ছে। কিন্তু না, এদের দয়া দেখানো ঠিক নয়।—

—তোমার এই বিশ্বাসকে যদি তুমি বর্জন কর, তৎক্ষণাৎ তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাতে কি তুমি রাজি?

—না, তা আমি পারব না। শাহাক বলল।

—কেন?

—আমার ঈশ্বরকেই তাহলে বর্জন করা হয়।

—আশ্চর্য! তুমি কি জান না যে এর জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে? যে-বিশ্বাসকে তুমি আঁকড়ে থাকতে চাইছ, তার জন্যে কি তুমি মৃত্যুবরণ করতে পার? এতই কি তোমার সাহস?

শান্ত গলায় শাহাক বলল—আমার প্রভুই তার বিচার করবেন।

—কথাটা কিন্তু খুব সাহসীর মতো শোনাল না। ঠিক করে বল তো, জীবনের কি কোন দাম নেই তোমার কাছে?

—আছে, জীবনকে আমি ভালোবাসি।

—কিন্তু তোমার এই ঈশ্বরকে যদি না ছাড়, কেউই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। প্রাণের মায়া তাহলে তোমাকে ছাড়তে হবে।

—তা ছাড়ব। আমার ঈশ্বরকে আমি ছাড়তে পারব না।

শাসনকর্তা আর কোন পীড়াপীড়ি করলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—তাহলে আর আমার কিছু করবার নেই। বলে তিনি তাঁর টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন। হাতির দাঁতের একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে টেবিলের উপরেই আঘাত করলেন একবার; তারপর আপন মনেই বললেন—তোমার ঈশ্বরও উন্মাদ, তুমিও উন্মাদ!

এবারে প্রহরী আসবে, তাদের বাইরে নিয়ে যাবে। শাসনকর্তা হঠাৎ বারাব্বাসের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তার চাকতিখানাকে হাতে তুলে নিয়ে উলটে ধরলেন, তারপর খাপ থেকে একখানা ছুরি বের করে নিয়ে চাকতির উপরকার 'ক্রীস্টোস্ য়েসাস্' কথাটাকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে দিলেন। দিয়ে বললেন—তুমি তো এ'কে বিশ্বাস কর না। নামটা তাই কেটে দিলাম।

শাহাক এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবারে সে বারাব্বাসের দিকে তাকাল। তীব্র এক অগ্নিশিখার মতোই সে-দৃষ্টি যেন বারাব্বাসের অন্তস্তলে গিয়ে বিন্ধ হল। তার জ্বালা সে কখনও ভুলতে পারবে না।

প্রহরী এসে বের করে নিয়ে গেল শাহাককে। বারাব্বাস দাঁড়িয়ে রইল। সে এখন একা। শাসনকর্তা বললেন যে তার বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। বারাব্বাসকে তিনি পুরস্কৃত করতে চান। এখন থেকে সে এই প্রাসাদেই কাজ করবে। আগের মতো আর তাকে অত খাটতে হবে না।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বারাব্বাস শুধু তাঁর দিকে তাকাল একবার। দু চোখে তার তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠেছে। সে ঘৃণা তীক্ষ্নমুখ তীরের মতো কাঁপছে। কিন্তু সে-তীর ওই নয়নতূণেই আবন্ধ রইল, নিক্ষিপ্ত হল না।

আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে গেল বারাব্বাস।

শাহাককে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হল, অল্প-একটু দূরে একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল বারাব্বাস। তার বন্ধু তাকে দেখে ফেলুক, এ সে চায়নি। কিন্তু ইতিপূর্বে শাহাকের উপর দিয়ে যে অকথ্য অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে তাতে আর তার তখন দেখতে পাবার মতো অবস্থা ছিল না; আত্মগোপন যদি না-ও করত বারাব্বাস, শাহাক তাকে দেখতে পেত কি না সন্দেহ। শাসনকর্তা অবশ্য শুধু ক্রুশবিদ্ধ করবারই আদেশ দিয়েছিলেন, তার আগে আলাদা করে আর-কোন অত্যাচার চালাতে বলেননি। কিন্তু কিছু লাভ হয়নি তাতে; প্রহরীরা ধরেই নিয়েছিল যে, বলতে তিনি ভুলে গিয়ে থাকবেন। ক্রুশবিদ্ধ করবার আগে সকলের উপরেই একদফা অত্যাচার চালিয়ে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। কি জন্যে যে একে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, প্রহরীরা তা কেউ জানত না। জানতে তাদের কোন কৌতূহলও হয়নি। এরকম ব্যাপার তারা হামেশাই দেখে আসছে। দেখে দেখে সেটা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

শাহাকের মাথার অর্ধেকটা সেই আগের মতোই কামিয়ে দেওয়া হয়েছে আবার। বাকি অর্ধেকটা রক্ত-মাখামাখি হয়ে রয়েছে। দৃষ্টি নির্বাক, ভাষাহীন। সামান্যতম সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকলেও যে সে তার নীরব দৃষ্টিতে কি-কথা ফুটিয়ে তুলত, বারাব্বাস জানে। দু-চোখে যন্ত্রণার আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে সে শাহাকের দিকে তাকিয়ে রইল। শীর্ণ দুর্বল তার শরীর, যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। বারাব্বাস দেখতে লাগল। এখান থেকে তার চলে যাবার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে থাকলেও পারত কিনা সন্দেহ। এমনিতেই

শাহাক শীর্ণদেহ। এখন যেন তাকে আরও শীর্ণ, আরও দুর্বল দেখাচ্ছে। এমন লোক কি কোন অপরাধ করতে পারে? বিশ্বাস হতে চায় না। হাড়-পাঁজরা বের-করা বুকের উপরে তার রোমান রাষ্ট্রের ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে। তার অর্থ, শাহাক রাষ্ট্রদ্রোহী। চাকতিখানাকেও খুলে রাখা হয়েছে তার। অন্য-কোন ক্রীতদাসকে তা পরিয়ে দেয়া হবে।

শহরের বাইরে ছোট্ট একটা টিলার উপরে এই বধ্যভূমি। টিলার নিচটা ছোট ছোট গাছপালা আর কাঁটাঝোপে-ঘেরা। তারই একটির আড়ালে বারাব্বাস আত্মগোপন করে রয়েছে। উপরে জনকয়েক প্রহরী। তাছাড়া আর অন্য কেউ নেই। খুব একটা কিছু মারাত্মক অপরাধের জন্যে যখন মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় কাউকে, বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। আজ কিন্তু কেউ আসেনি। তার কারণ, একে তো শাহাককে কেউ চেনে না; তার উপরে এমন কোন অপরাধও সে করেনি যে তাকে দেখবার জন্যে কারুর কৌতূহল হবে।

এখন বসন্তকাল। গত বছর এই বসন্তকালেই তারা তাম্রখনি থেকে মুক্তি পেয়েছিল। নীরন্ধ্র সেই অন্ধকারের থেকে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে এসে যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল শাহাক; মাটিতে বসে পড়ে বিস্ময়ের আবেগে সে চিৎকার করে উঠেছিল, 'তিনি এসেছেন! তিনি এসেছেন! এই তো তাঁর রাজ্য!' সব কথাই মনে পড়ছে বারাব্বাসের। আর কি আশ্চর্য, আজকের পৃথিবীর বুকের উপরেও যেন কে একখানি গাঢ়-সবুজ চাদর বিছিয়ে রেখেছে—বধ্যভূমিতেও ফুল ফুটে উঠেছে। একটু দূরেই সমুদ্র। তার সুনীল জলরাশির উপরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, আর ঘনশ্যাম পথেপ্রান্তরে সূর্যালোক চিকচিক করছে। চোখ ফিরিয়ে নিল বারাব্বাস। এখন মধ্যাহ্ন। চারদিক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, মাছি ভনভন করছে। শাহাকের গায়েও গিয়ে মাছি বসেছে, তাকে ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু হাত নেড়ে যে তাদের তাড়িয়ে দেবে, এমন শক্তিও শাহাকের নেই। ভারি দুর্বল, ভারি নির্জীব দেখাচ্ছে তাকে। এ-মৃত্যু বীভৎস, এ-মৃত্যু কুৎসিত।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মৃত্যুর এই শ্লথ-বীভৎস পদসঞ্চারও যেন বারাব্বাসের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে সে এই মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করছে। এ-যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্তকে সে মনে রাখতে চায়।

কপালের উপরে আর শীর্ণ বাহুমূলে ঘর্মস্রোত বয়ে যাচ্ছে, দুর্বল বুকখানা যেন একটা হাপরের মতন ওঠানামা করছে, মাছিতে মাছিতে সারা দেহ ছেয়ে গেছে, হাতখানা যে একটু নাড়াবে এমন শক্তিও আর নেই। মাথাটা এসে বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে, যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে শাহাক। জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে। এখান থেকেও তার শব্দ শোনা যায়। আর সেই একটানা শব্দ শুনতে শুনতে বারাব্বাসেরও যেন হঠাৎ নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। বারাব্বাসেরও সর্বাঙ্গে যেন অদ্ভুত এক যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এ তৃষ্ণা তার, না শাহাকের? শাহাকের ওই অসহ্য যন্ত্রণাই কি বারাব্বাসের শরীরে এসে সঞ্চারিত হয়ে গেল? আশ্চর্য নয়। দীর্ঘকাল তারা পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ছিল। কিছুই তাই আশ্চর্য নয়। বারাব্বাসের মনে হল, এখনও যেন এক অদৃশ্য শিকল দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ ওই লোকটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কি যেন বলতে চাইছে শাহাক, বলতে পারছে না। ঠোঁট দুখানি তার থরথর করে কাঁপছে। জল চাইছে বোধ হয়। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারল না। বারাব্বাসও না। কিছুই প্রায় শোনা যায় না এখান থেকে। কিন্তু তাতে কি! দৌড়ে সে তার বন্ধুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে; কি চাইছে শাহাক—জিজ্ঞেস করতে পারে। আর-কিছু না হোক, বুকের উপরকার ওই মাছিগুলোকে অন্তত তাড়িয়ে দিতে পারে। অনেক-কিছুই করতে পারে বারাব্বাস, কোন-কিছুই সে করল না। কাঁটাঝোপের আড়ালে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু তার মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে লাগল। ও-যন্ত্রণা শুধু শাহাকের নয়, বারাব্বাসেরও। বারাব্বাসও এখন একই যন্ত্রণা অনুভব করছে, দু-চোখে তার এক তীব্র জ্বালা ফুটে উঠেছে।

আর বেশি দেরি নেই, একটু বাদেই শাহাক মারা যাবে। নিশ্বাস-টানার একটানা শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে, এখান থেকে আর শোনা যায় না। একটু আগেও বুকটা ওঠানামা করছিল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে আসতে স্তব্ধ হয়ে গেল এক-সময়। শাহাক মারা গেল। আজ আর এখানে অন্ধকার নেমে আসেনি, অলৌকিক কোন দৃশ্যের অবতারণা হয়নি। এ-মৃত্যু শান্ত তবু সন্দেহাতীত। আজকের এই প্রহরীরাও ঠিক সেইদিনকার মতোই পাশা-খেলায় মত্ত, কিন্তু সেদিনকার মতো ভয়াবহ কোন-এক তমিস্রা আর আজ তাদের ভয় পাইয়ে দিয়ে গেল না। শাহাক মারা গেছে, তারা তা বুঝতে পর্যন্ত পারেনি। একমাত্র বারাব্বাসই তার সাক্ষী। প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে হঠাৎ মাটির উপরে বসে পড়ল।

আশ্চর্য—। বেঁচে থাকলে বড় সুখী হত শাহাক। কিন্তু তা আর হয় না। সে মারা গেছে।

কার কাছে প্রার্থনা জানাবে বারাব্বাস—কে তার প্রার্থনা গ্রহণ করবে? তার তো ঈশ্বর নেই। প্রার্থনার ভঙ্গিতেই শুধু বসে রইল বারাব্বাস, প্রার্থনা জানাল না।

আর হঠাৎ তার সেই ক্ষতবিক্ষত শ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন মুখখানাকে সে তার দুই হাতের মধ্যে গোপন করে ফেলল। মনে হল সে কাঁদছে।

প্রহরীদের একজন একটু বাদে চেঁচিয়ে উঠল। ক্রুশবিদ্ধ লোকটি যে মারা গেছে তা হয়ত তার নজরে পড়ে থাকবে। শাহাকের মৃতদেহকে তারা ক্রুশের থেকে মাটিতে নামিয়ে আনল। এবারে তাদের ছুটি।

সমস্ত কিছুই আজ লক্ষ্য করে গেছে বারাব্বাস, সমস্ত কিছুই তার মনে থাকবে।

এর কিছুকাল বাদেই শাসনকর্তা তাঁর কাজের থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। বাকি জীবনটা তিনি রোমে গিয়ে কাটাবেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছেন। এর আগে আর এখানকার অন্য-কোন শাসনকর্তা তাঁর মতো এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পত্তি নিয়ে দেশে ফিরতে পারেননি। কিন্তু শুধু নিজের জন্যেই ধনসঞ্চয় করেছেন তিনি, একথা বললে ভুল বলা হবে। এতই দক্ষতার সঙ্গে তিনি এখানকার খনি এবং অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেছেন যে, রাষ্ট্রেরও তাতে প্রচুর লাভ হয়েছে। এ-কাজের কৃতিত্ব অবশ্য তাঁর একার প্রাপ্য নয়, ক্রীতদাসদের সর্দাররাও তার খানিকটা অংশ দাবি করতে পারে। প্রতিটি কাজেই তারা তাদের আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে, দরকার পড়লে অমানুষিক অত্যাচার চালাতেও কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। তা না হলে এখানকার এই প্রাকৃতিক সম্পদকে এত পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যেত কিনা সন্দেহ; স্থানীয় অধি-বাসী আর ক্রীতদাসদের গায়ের রক্তকেও এত মোক্ষমভাবে শোষণ করতে পারা যেত না। কিন্তু একটা কথা—শাসনকর্তার শাসনটাই শুধু কঠোর, নিজে তিনি কঠোর নন। কেউ যদি তাঁকে অত্যাচারী আখ্যা দেয় তো বলতে হবে, আসল মানুষটাকেই সে চেনে না। অধিকাংশ লোকের কাছেই অবশ্য তিনি অপরিচিত, বাস্তবে আর কল্পনায় মেশানো রহস্যময় একটি চরিত্র। এখান থেকে তিনি এবারে বিদায় নেবেন। খনির অন্ধকারে আর ঘর্ম-ক্ষরা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে উদয়াস্ত যাদের পরিশ্রম করতে হয় শুনে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। পরবর্তী শাসনকর্তা হয়ত এতটা নিষ্ঠুর হবেন না। এই আশাতেই কয়েকটা

দিন তাদের আনন্দে কাটবে এখন। শাসনকর্তা কিন্তু আজ ভারি বিষণ্ণ বোধ করছেন। দ্বীপটিকে ছেড়ে যেতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এখানে তিনি সুখে ছিলেন, শান্তিতে ছিলেন।

তাঁর এই বিষণ্ণতার আর-একটি কারণ, কর্মজীবনের এবারে অবসান হল। এখন থেকে শুধু অবসর, আর অবসর। অথচ কাজ করবার স্পৃহা তাঁর এখনও যায়নি। এখনও তিনি বলিষ্ঠ, সক্ষম। কাজ ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। সারা মনে তাই তাঁর আজ এক অদ্ভুত বিষাদ ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু একটু-বা আনন্দও তার সঙ্গে মিশ্রিত। তার কারণ শুধু শাসনকার্যেই নয়, সংস্কৃতির চর্চাতেও তাঁর সমান উৎসাহ। রোমে ফিরবার পর সে-চর্চার পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে, পাঁচজন জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে থেকে চমৎকার সময় কাটবে। জাহাজের পাটাতনের উপরে একখানা আরাম-কেদারায় বসে বসে চুপচাপ তিনি এই চিন্তাই করছিলেন। একটু আগেই সেই বিষণ্ণভাবটা কেটে গিয়ে সারাহৃদয় তাঁর এখন এক অপূর্ব মাধুর্যে ভরে উঠেছে।

নিজের জন্যে এখান থেকে তিনি কয়েকটি ক্রীতদাসও সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তার মধ্যে বারাব্বাসও আছে। বারাব্বাস এখন বৃদ্ধ। তাকে দিয়ে আর বিশেষ কিছু কাজ হয় না। তা সত্ত্বেও তার উপরে শাসনকর্তার খানিকটা মায়া পড়ে গেছে। আর তা ছাড়া বারাব্বাস সেদিন যে বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিল, শাসনকর্তা তাতে তার উপরে খুব সন্তুষ্ট। তার বুদ্ধির পুরস্কার হিসেবেই তাকে তিনি এখন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। এতখানি দয়া, এতখানি সহৃদয়তা—এ যেন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

অনুকূল বাতাস পাওয়া যায়নি, তীরে পৌঁছুতে জাহাজখানার তাই কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। একটানা কয়েক সপ্তাহ দাঁড় টানার পর যখন তারা ওস্টিয়ার বন্দরে গিয়ে নোঙর ফেলল, মাঝিমাল্লাদের হাত-পা থেকে তখন রক্ত ঝরছে। শাসনকর্তা তার ঠিক পরের দিনই রোমে গিয়ে পৌঁছোলেন; মালপত্র আর সঙ্গের লোকজনদের আরও দু-একদিন দেরি হল।

শহরের ঠিক মাঝখানটায় আগের থেকেই তিনি বিরাট এক প্রাসাদ কিনে রেখে-ছিলেন। শহরের এটা অভিজাত অঞ্চল। বাড়িটাও বেশ-কয়েকতলা উঁচু। দেয়ালে দেয়ালে নানান রঙের পাথর বসানো। আসবাবপত্র নিখুঁত। দেখলেই বোঝা যায় যে, মনের মতন করে সব-কিছুকে সাজিয়ে তুলবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করা হয়েছে। ক্রীতদাসরা থাকে একতলায়। বারাব্বাসও তাদের মধ্যে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে। একতলা বাদে অন্যান্য জায়গাগুলো তার এখনও দেখা হয়নি। তবে না দেখলেও সে খানিকটা কল্পনা করে নিতে পারে। তার কাছে অবশ্য এর কোন মূল্য নেই। তাকে এখন এটা-ওটা টুকিটাকি কাজ করতে হয়; কোনটাই কিছু পরিশ্রমের কাজ নয়। রসুইখানার কর্তা যখন রোজ সকালে বাজারে যায়, বারাব্বাস এবং আরও কয়েকজন ক্রীতদাসও সঙ্গে যায় তার। লোকটা একটু রুক্ষ প্রকৃতির। কিন্তু বারাব্বাসের তাতে কি!

ইতিমধ্যেই রোমের অনেকখানি তার দেখা হয়ে গেছে। দেখা হয়ে গেছে বললে ভুল বলা হবে—বাজারে যাবার পথে এটা-ওটা তার চোখে পড়েছে, এইমাত্র। রাস্তাগুলি সরু সরু, সবসময়ে ভিড় লেগে থাকে; হাটে-বাজারে এত গোলমাল যে কান পাতা যায় না। সব জায়গাতেই লোক গিসগিস করছে। সমস্ত ব্যাপারটাকেই বারাব্বাসের যেন কেমন অবাস্তব মনে হয়; মনে হয় এ একটা স্বপ্নমাত্র, একটু পরেই মুছে যাবে। কলকোলাহলে-ঠাসা এই বিরাট জায়গাটাকে সে কখনও সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারল না। রাস্তা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে সে কেমন উন্মনা হয়ে যায়, কোন দিকেই আর-কোন খেয়াল থাকে না। প্রতিটি দেশ থেকেই অসংখ্য নরনারী এখানে এসে ভিড় করেছে,

পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। এত ঐশ্বর্য, এত সমারোহ পৃথিবীর আর অন্য কোথাও নেই। যে-কোন লোকেরই এখানে এসে বিমুগ্ধ হয়ে যাবার কথা। বারাব্বাসের কিন্তু এতটুকুও ভাবান্তর ঘটল না। এত যে অট্টালিকা আর এত দেবালয়—অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও তাদের বিলাসব্যসন ছেড়ে প্রায়ই যেখানে এসে সমবেত হয়—এর কোন-কিছুই তার মনে কোন দাগ কাটতে পারল না। অন্য কেউ হলে চোখ ঝলসে যেত! বারাব্বাসের চক্ষু তবু মৌন, নির্বাক। কোটরগত ওই চক্ষুতে বোধ হয় বাইরের জগতের কোন-কিছুরই কোন ছায়া পড়ে না! সে শুধু দেখে যায়, শুধু দেখে যায়। কোন-কিছুতেই সে বিমুগ্ধ হয় না, কোন-কিছুরই সে তোয়াক্কা করে না। আশ্চর্য এই প্রাসাদপুরীও তার মনে ছায়া ফেলতে পারেনি। বারাব্বাস নিরাসক্ত।

কিন্তু তা-ই বা কি করে হয়? নিরাসক্তই যদি হবে তো রোমের প্রতি তার এত বিদ্বেষ কেন? রোমকে সে ঘৃণা করে।

মাঝে মাঝে এখানে প্রার্থনার মিছিল বেরোয়। বারাব্বাসের কাছে সেটা খুব অদ্ভুত লাগে। লাগাটা কিছু বিচিত্র নয়, তার কারণ নিজে কখনও প্রার্থনা জানায় না, তার ঈশ্বর নেই। রাস্তার একধারে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে, দু-চোখ তার বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কোথায় যায় এরা? কৌতূহলভরে সে এদের পিছু নিয়েছিল। নানা পথ ঘুরে ঘুরে মিছিলটা শেষ পর্যন্ত এক মন্দিরে গিয়ে উঠল। এর আগে বারাব্বাস আর কখনও এখানে আসেনি। ভিতরে ঢুকেই একটা ছবি চোখে পড়ল তার। শিশু-ক্রোড়ে এক মাতৃমূর্তি। মূর্তিটা কার, বারাব্বাস জিজ্ঞেস করেছিল। পাশের লোকটি বলল, দেবী আইসিসের। আর তাঁর কোলে ওই ছেলেটি হল হোরাস। বলেই তার কেমন সন্দেহ হল। কে এই লোকটা, দেবী আইসিসের নাম পর্যন্ত যে জানে না? আমতা-আমতা করে কি-যেন বলতে যাচ্ছিল বারাব্বাস, তার আর অবকাশ হল না। প্রহরীরা তাকে বের করে দিল। স্পষ্টই বুঝতে পারল বারাব্বাস, সবাই তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তাকে পরিহার করতে চাইছে। তার মা যে তাকে ঘৃণাভরে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, জন্মকাল থেকেই যে সে অভিশপ্ত, সবাই যেন তা বুঝতে পেরে গেছে, কারুর কাছেই তা আর গোপন নেই।

রাগে আর দুঃখে চোখের নিচেকার সেই গভীর ক্ষতচিহ্নটি তার তীক্ষ্ণমুখ তীরের মতোই কাঁপতে লাগল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল বারাব্বাস। সারাদিন সে বাড়ি ফিরল না। সমস্ত কিছুই তার ওলটপালট হয়ে গেছে। দূর হও নাস্তিক! নাস্তিক! বারাব্বাস প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। সে যে কোথায় চলেছে, কি করছে, সে জানে না। গভীর রাতে বাড়ি ফিরল বারাব্বাস। আর কেউ হলে এই দেরির জন্যে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। বারাব্বাসকে কেউ কিছু বলল না। তার কারণ মালিক তাকে একটু সুনজরে দেখে থাকেন। বারাব্বাস বলল যে, রাস্তায় বেরিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কারুর কাছেই তা খুব অবিশ্বাস্য মনে হল না। চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল বারাব্বাস। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তার মনে হতে লাগল, 'ক্রীস্টোস য়েসাস' লেখা সেই চাকতিখানার স্পর্শে বুকের চামড়া যেন তার পুড়ে যাচ্ছে।

বারাব্বাস সে-রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। দেখল যে অচেনা কে-একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে যেন তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, আর সেই ক্রীতদাস তার পাশে প্রার্থনায় বসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

—কিসের জন্যে তুমি প্রার্থনা করছ? বারাব্বাস বলল, এ প্রার্থনায় লাভ কি?

—তোমার জন্যেই প্রার্থনা করছি আমি। অন্ধকারের মধ্য থেকে তার উত্তর ভেসে এল। বারাব্বাসের মনে হল গলাটা তার চেনা।

চুপচাপ বসে রইল বারাব্বাস, যেন তার প্রার্থনার কোন ব্যাঘাত না ঘটে। দুই

চোখ তার জলে ভরে উঠল। তারপরই ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। কই, কেউই তো নেই—কারুর সঙ্গেই তাকে শৃংখলাবন্ধ করে রাখা হয়নি। কারুর সঙ্গেই না।

এর কিছুদিন বাদেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার বারাব্বাসের চোখে পড়ল। প্রাসাদের একতলার এক কোণে কে যেন অদ্ভুত একটা চিহ্ন এ'কে রেখেছে। বারাব্বাস জানে, এ-চিহ্ন ক্রীশ্চানদের। এবং ক্রীতদাসদের মধ্যেই যে-কেউ একজন এ-কাজ করেছে, তাতে আর-কোন সন্দেহ নেই। কে এমন দুঃসাহসী—কে? দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চুপচাপ বারাব্বাস সব লক্ষ্য করে যেতে লাগল, কিন্তু সামনাসামনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। বলতে কি জিজ্ঞেস করলে হয়ত সহজেই এর একটা উত্তর পাওয়া যেত। সে-পথে গেল না বারাব্বাস। তার কারণ অন্যান্য ক্রীতদাসদের সঙ্গে তার তেমন মেলামেশা নেই। বড় একটা সে কথাও কয় না কারুর সঙ্গে। অন্যান্যরাও তাই তাকে একটু এড়িয়ে চলে।

এ-শহরে ক্রীশ্চানের অভাব নেই। বারাব্বাস তা জানে। কিন্তু তাদের খ'ুজে বের করতেও সে কখনও খুব উৎসাহ বোধ করেনি। তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি! একদিন হয়ত কোন বন্ধন ছিল, আজ আর নেই। এই ক্রীশ্চানদের ঈশ্বরের নামই সে একদিন তার চাকতির উপরে খোদাই করিয়ে নিয়েছিল। ছুরির আঁচড়ে সে-নাম বাতিল হয়ে গেছে।

রোমের ক্রীশ্চানরা আর আজকাল প্রকাশ্যে কোথাও মিলিত হয় না। যে-কোন মুহূর্তেই তাদের উপরে অত্যাচার আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। প্রার্থনানুষ্ঠান তাই আজকাল গোপনে সম্পন্ন হয়। হাটে-বাজারে এ নিয়ে কানাঘুষোও হয়ে থাকে। বারাব্বাসেরও তা কানে গেছে। ক্রীশ্চানদের সবাই ঘৃণা করে, অবিশ্বাস করে। বহুদিন আগে জেরুসালেমে না কোথায় যেন তাদের ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তাই নিয়ে কানা-কানি করে সবাই। কেউই এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বারাব্বাসের চোখে পড়ল, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজন ক্রীতদাস যেন নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। বারাব্বাসকে তারা দেখতে পায়নি। বারাব্বাসও যে তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তা নয়, সে শুধু ফিসফাস কথা শুনতে পাচ্ছে। লোক দুজনকে সে চেনে।

অ্যাপিয়ান সড়কের ধারে যে আঙুর-বাগান রয়েছে পরদিন সেখানে কি-একটা সভা হবে। তাই নিয়েই এরা আলোচনা করছে। উৎকর্ণ হয়ে সব শুনতে লাগল বারাব্বাস। আরও দু-একটা কথা শুনবার পর বুঝল যে, আঙুর-বাগানে নয়, বাগানের ওদিকে ইহুদী-দের যে-কবরখানাটা রয়েছে সেখানেই সবাই মিলিত হবে। প্রার্থনা করবার আর জায়গা পেল না এরা?—শেষকালে কিনা কবরখানার মধ্যে? আশ্চর্য!—কি করে এমন প্রবৃত্তি হয় এদের?

পরের দিন সন্ধ্যায় ক্রীতদাসদের ঘরে চাবি পড়বার আগেই গা-ঢাকা দিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ধরা পড়লে আর বাঁচতে হত না।

বারাব্বাস যখন অ্যাপিয়ান সড়কে গিয়ে পেঁছুল, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট নির্জন। একজন মেষপালক শুধু বাড়ি ফিরছে। বারাব্বাস তার কাছ থেকে আঙুর-বাগানের নিশানাটা জেনে নিল।

এরপর আর কবরখানাটা খ'ুজে নিতে তার কোন অসুবিধা হল না। রাস্তার উপর থেকে থাক থাক সি'ড়ি নিচে নেমে গেছে, তারপরে সারিসারি কবর। আর দু-দিককার সেই কবরের সারির মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে। উপরে তবু অল্প-একটু আলো ছিল, এখানে তা-ও নেই। যেদিকে তাকায় শুধু অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকার গলিপথের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে সে সামনে এগোতে লাগল। প্রথম-দিককার সারির মধ্যেই নাকি মস্তবড় একটা গহবর রয়েছে, সেখানে এসেই তারা মিলিত হবে। ক্রীতদাস দুজন

অন্তত তা-ই বলছিল। সামনে এগোতে লাগল বারাব্বাস, স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শে সর্বাঙ্গ তার শিউরে উঠতে লাগল।

কিন্তু কই, কোথায় সেই গহ্বর? কোনখানেই তার চিহ্ন নেই। বারাব্বাস হাঁটতেই লাগল। খানিকটা এগিয়ে আবার আর-একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। কোন্ দিকে সে যাবে এখন? ঠিক করে উঠতে পারল না বারাব্বাস। বিমূঢ় হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। সব-কিছুই তার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় তার চোখে পড়ল, বেশ খানিকটা দূরে কবরের ভিতরকার সেই গলিপথের উপরে যেন একটা আলোর রশ্মি এসে পড়েছে। রুদ্ধশ্বাসে সে সেইদিকে এগোতে লাগল।

আর—আশ্চর্য, দু-পা এগোতে-না-এগোতেই আলোটা যেন মুছে গেল হঠাৎ, অদৃশ্য হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ থেমে দাঁড়াল বারাব্বাস। সে কি তবে অন্য-কোন রাস্তায় ঢুকে পড়েছে? দু-পা পিছিয়ে এল সে। কিন্তু না, আলোটা আর দেখা গেল না।

স্তম্ভিত হয়ে বারাব্বাস দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় তারা, যাদের আজ এখানে আসবার কথা ছিল? কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যাবে? না কি, তারা আসেনি?

আর সে নিজেই-বা এ কোথায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে? না, আর এগিয়ে লাভ নেই। যে-পথে এসেছে সেই পথেই সে এখন এই কবরখানার থেকে বেরিয়ে যাবে। ফিরে দাঁড়াল বারাব্বাস। তারপর কয়েক ধাপ উপরে উঠেই সে থমকে দাঁড়াল। দূরে ছোট্ট একটা বাঁকের মাথায়, আবারও সেই আলো জ্বলে উঠেছে। সেই একই আলো, তাতে আর কোন ভুল নেই। রুদ্ধশ্বাসে বারাব্বাস এগোতে লাগল সেইদিকে। ক্রমেই যেন আলোটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আরও উজ্জ্বল—আরও।

তারপর বারাব্বাস যখন তার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, দপ করে আলোটা হঠাৎ নিভে গেল।

হতবুদ্ধি হয়ে গেল বারাব্বাস। চতুর্দিকেই তার অন্ধকার। অন্তহীন মৃত্যু-হিম অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে সে এখন একা দাঁড়িয়ে আছে। যাঁদের আসবার কথা ছিল, তারা কেউ আসেনি। জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। এই মৃত্যুপুরীর মধ্যে সে এখন একা।

মৃত্যুপুরী! শুধু কবর আর কবর। প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি বাঁকে সারি সারি শুধু কবর পাতা। আর এই মৃত্যুপুরীর অধিবাসীরাই তাকে এখন ঘিরে রয়েছে, চারদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। কোন্‌দিকে এখন যাবে সে? কোন্ পথে এগোলে যে এই সমাধির থেকে, এই মৃত্যুপুরী থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, বারাব্বাস জানে না।

মৃত্যুপুরী!—মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করে সে তার পথ হারিয়ে ফেলেছে!—এখান থেকে আর তার মুক্তিলাভের উপায় নেই!—

বারাব্বাস আর ভাবতে পারল না। একটা বীভৎস দমবন্ধ-ভয়ে যেন তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এল। লৌহকঠিন একটা আতঙ্কের সাঁড়াশি দিয়ে যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে। আর হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল সে। একটার পর একটা গলি পেরিয়ে যেতে লাগল, সিঁড়িতে সিঁড়িতে হোঁচট খেতে লাগল। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। যে করেই হোক, যেমন করেই হোক, তাকে মুক্তিলাভ করতে হবে। দেয়ালে দেয়ালে কপাল ঠুকে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে—বারাব্বাসের খেয়াল নেই। উন্মাদের মতো তাড়া-খাওয়া একটা ভয়ার্ত জন্তুর মতো সে সেই অন্ধকার গোলক-ধাঁধার মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। যে করেই হোক তাকে পথ খুঁজে বার করতে হবে।

বহুক্ষণ পরে—কতক্ষণ পরে সে জানে না—হঠাৎ তার গায়ে এক ঝলক বাতাস এসে

লাগল। পথ খংজে পেয়েছে বারাব্বাস। অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় সে সেই মৃত্যুপুরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সে এখন ক্লান্ত। মাঠের উপরে শুয়ে পড়ল সে, শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। আকাশে তারা ওঠেনি; চারদিকেই এখন অন্ধকার নেমে এসেছে। স্বর্গে, মর্ত্যে—সব জায়গায়।

বাড়ি ফিরবার পথে বারাব্বাসের সে-রাতে নিজেকে খুব একা-একা মনে হতে লাগল। একা তো সে চিরদিনই। কিন্তু আজকের মতো এত গভীরভাবে আর কখনও তা সে উপলব্ধি করেনি; বুঝতে পারেনি যে মৃত্যুর পরেও তার সেই নিঃসঙ্গতার অবসান হবে না। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বারাব্বাস পথ হাঁটছে। চোখের নিচে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন, তার বাবা ইলায়াহুর দেওয়া আঘাত। বুকের উপরে একখানা চাকতি দুলছে। ওর উপরে সে একদিন ঈশ্বরের নাম খোদাই করিয়ে নিয়েছিল। নামটা তারপর কেটে দেওয়া। স্বর্গ, মর্ত্য, সব জায়গাতেই সে একা।

নিজের হাতেই সে তার চারপাশে এক ভয়াবহ মৃত্যুপুরী গেঁথে তুলেছে। কি করে সে এখন মুক্তিলাভ করবে?

একবার, মাত্র একবার, তার এই নিঃসঙ্গতার অবসান হয়েছিল। আর-একজনের সঙ্গে সে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু সে-বাঁধন তো শিকলের। শিকল ছাড়া আর অন্য-কিছুর বাঁধনে তাকে কখনও কেউ বেঁধে রাখেনি।

রাস্তাঘাট নির্জন, নিঃশব্দ। নিজের পায়ের শব্দে সে নিজেই মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। শব্দটা তার পায়ের, না তার হৃৎপিণ্ডের? জীবনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। মৃত্যু এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মৃত্যু আর অন্ধকার। আলো নেই। কোনখানেই আর আলো নেই। তারাহীন রাত্রি। আর সেই রাত্রির হৃদয় যেন এক অন্ধকার শূন্যতায় ভরে উঠেছে।

জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল বারাব্বাস। বাতাসটা তার গরম লাগছে। নাকি জ্বর হয়েছে তার, যে-মৃত্যুকে সে সর্বক্ষণ তার শরীরের মধ্যে বহন করেছে, তারই জন্যে নিজেকে তার অসুস্থ মনে হচ্ছে? মৃত্যু! মৃত্যুর থেকে আর নিষ্কৃতি নেই তার; যতক্ষণ সে বেঁচে আছে, থাকবে, এ-মৃত্যুর হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। হৃদয়ের মধ্য থেকেই সেই ভয়াবহ মৃত্যু তাকে তাড়িয়ে ফিরছে, চিন্তার অন্ধকারের মধ্যেও সে এক অসহ্য আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে। বুড়ো হয়ে গিয়েছে বারাব্বাস। তার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। তা সত্ত্বেও এই আতঙ্কের হাত থেকে তার মুক্তি হল না। অথচ কত-কিছুই তো সে চেয়েছিল—কতকিছুই তো সে—

না, না—সে মরবে না! সে মরবে না!

কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, মিলিত হবার জন্যে যারা আজ ওই অন্ধকার মৃত্যুপুরীর মধ্যে গিয়ে সমবেত হয়েছে, কই—তাদের তো কোন ভয় নেই। মৃত্যুকে তারা ভয় করে না। মৃত্যুকে তারা জয় করেছে। তাদের বন্ধন ভালোবাসারই বন্ধন।—পরস্পরকে ভালোবাস—পরস্পরকে ভালোবাস—

বারাব্বাস গিয়ে তাদের সন্ধান পায়নি। সে শুধু সেই অন্ধকারের মধ্যে, চিন্তার কানাগলির মধ্যেই সারাক্ষণ-ঘুরে মরেছে।

কোথায় তারা? পরস্পরকে যারা ভালোবাসে তারা কোথায়?

এই রাতে তারা কোথায়? শহরের সীমানার মধ্যে এসে বারাব্বাসের এখন আরও অসুস্থ লাগছে। এত গরম কেন? চারদিক এত গরম হয়ে উঠেছে কেন? জ্বরাক্রান্ত এই রাত্রিকে তার অসহ্য লাগছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে।—

আর-একটু এগিয়ে মোড় ফিরতেই একটা পোড়া-গন্ধ পাওয়া গেল। থমকে দাঁড়াল বারাব্বাস। তার ঠিক সামনেই একটা বাড়ির একতলা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই।—

আর সেই নির্জন রাস্তা হঠাৎ জনকোলাহলে ভরে উঠল। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে। পাগলের মতো চিৎকার করছে—

—আগুন! আগুন।

এগিয়ে গেল বারাব্বাস। মোড় ফিরে দেখল আর-একটা বাড়িতেও আগুন জ্বলে উঠেছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বারাব্বাস যেন হতভম্ব হয়ে গেল, কোন-কিছুই সে আর বুঝে উঠতে পারছে না।—দূর থেকে হঠাৎ চিৎকার ভেসে এল একটা—

—ক্রীশ্চানরাই আগুন লাগিয়েছে! ক্রীশ্চানরাই!

চারদিক থেকে সে-কথার প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল—

—ক্রীশ্চানরাই আগুন লাগিয়েছে! ক্রীশ্চানরাই!

বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল বারাব্বাস, কোন-কিছুরই সে অর্থ গ্রহণ করতে পারছে না। এ-কাজ ক্রীশ্চানদের...? আর হঠাৎ, যেন একটা বিদ্যুতের ঝলকের মতো, সব-কিছুই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

হ্যাঁ, এ-কাজ ক্রীশ্চানদেরই। ক্রীশ্চানরাই রোমে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। রোমকেই শুধু নয়, সমগ্র পৃথিবীকেই তারা ভস্মীভূত করে ফেলবে।

এতক্ষণে বারাব্বাস সব বুঝতে পারল। বুঝতে পারল যে, এই জন্যেই তারা আজকের ওই প্রার্থনানুষ্ঠানে গিয়ে সমবেত হয়নি। এই পাপ-রোমকে, পাপ-পৃথিবীকে তারা পুড়িয়ে ফেলতে চায়! সেই শুভমুহূর্তই আজ সমাগত! তাদের ত্রাণকর্তাও তাই পুনরাবির্ভূত হয়েছেন!

গলগথায় যাকে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি কিন্তু ফিরে এসেছেন। অত্যাচারিত মানুষকে রক্ষা করবার জন্যেই আজকের এই পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করবেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। এই বহ্ন্যুৎসবের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চলেছেন। স্ব-মহিমায় তিনি পুনরাবির্ভূত। আর বারাব্বাস, নাস্তিক বারাব্বাসই আজ তাঁকে সাহায্য করবে। আজ আর তার ভুল হবে না। না-না,—আর তার কোন ভুল হবে না। অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৌড়ে গেল বারাব্বাস; জ্বলন্ত একখণ্ড কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে পাশের একটা বাড়িতে ছুঁড়ে মারল। চতুর্দিকে সে সেই আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল। ভুল হয়নি! আজ আর বারাব্বাসের ভুল হয়নি। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে, লেলিহান জিহ্বা মেলে দিয়ে একটার পর একটা বাড়িকে গিয়ে গ্রাস করে ফেলছে। আর সেই বিরাট বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে পাগলের মতো বারাব্বাস ছুটোছুটি করে ফিরতে লাগল। বুকে তার ঈশ্বরের নাম খোদাই করা চাকতি। নামটা ওরা কেটে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি, আজ আর তার ভুল হয়নি। ধ্বংসের এই তাণ্ডবের মধ্যেই সে তার প্রভুর ডাক শুনতে পেয়েছে। সমস্ত কিছুকে তিনি ধ্বংস করবেন। সেই শুভমুহূর্তই আজ সমাগত। ছড়িয়ে পড়ছে, চতুর্দিকেই তাঁর ক্রোধের বহ্নি ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু রোমেই নয়, সারা পৃথিবীতেই তিনি আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই বিরাট অগ্নিসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু-চোখ তার একসময় জলে ভরে উঠল। এই তো তাঁর রাজ্য! দেখ, এই তো তাঁর রাজ্য!

ভূগর্ভের আধো-অন্ধকার একটি কারাকক্ষ। অগ্নি-সংযোগের অভিযোগে ধৃত ক্রীশ্চানদের

এই কারাকক্ষে এনে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে বারাব্বাসও আছে। হাতে-নাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তারপর জেরার পর্ব শেষ হবার পর এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে-ও এখন এই ক্রীশ্চানদেরই একজন।

পাথর কেটে কেটে কারাগার তৈরি হয়েছে। দেয়াল, মেঝে—সব স্যাঁতসেঁতে। বাইরে থেকে অল্প একটু আলো আসে। স্পষ্ট করে তাতে কারুর মুখ পর্যন্ত দেখা যায় না। বারাব্বাস তাতে খুশিই। আলো থাকলে, কেউ তাকে দেখতে পেলে বরং তার অস্বস্তির কারণ ঘটত। এককোণে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপরে সে বসে আছে। মনে হয়, অন্যান্যদের দৃষ্টির থেকে নিজেকে সে আড়াল করে রাখতে চাইছে।

সেদিনকার সেই অগ্নিকান্ড নিয়ে প্রায়ই এদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। কি শাস্তি এদের দেওয়া হবে তা নিয়েও। তার থেকে বারাব্বাস বুঝতে পেরেছে, এদের মধ্যে কেউ আগুন লাগায়নি। আসলে সবটাই একটা সাজানো ব্যাপার। ক্রীশ্চানদের উপরে অত্যাচার চালাবার জন্যে একটা অছিলা খোঁজা হচ্ছিল, এতদিনে সেই অছিলা জুটে গিয়েছে। মিথ্যেমিথ্যি এদের উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে তারপর একধার থেকে সবাইকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। ক্রীশ্চানরা যে আগুন লাগায়নি, বিচারকও তা জানতেন। ঘটনাস্থলের কাছে সেদিন একজনও ক্রীশ্চান ছিল না। থাকবেই বা কেন! তাদের উপরে অত্যাচার শুরু করবার জন্যে যে একটা অছিলা খোঁজা হচ্ছে, আগে থাকতেই তা তারা জেনে গিয়েছিল; কবরখানায় তাদের গোপন প্রার্থনানুষ্ঠানের কথাও যে ফাঁস হয়ে গিয়েছে, তা-ও। ক্রীশ্চানদের এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দোষ নেই। তারা নিরপরাধ। কিন্তু তাতে কি! সবাই তাদের উপরে চটা। তাদের শাস্তি হলেই খুশি হবে। ভাড়াটে জনকয়েক লোককে দিয়ে সেদিন চিৎকার করে বলানো হয়েছিল যে ক্রীশ্চানরাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ তা অবিশ্বাস করেনি।

—কিন্তু কে, কে এদের ভাড়া করে জুটিয়ে আনল? অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে-একজন প্রশ্ন করল বুঝি। সে-প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না।

আগুন লাগাবার মতো এমন একটা জঘন্য কাজ, কখনও ক্রীশ্চানরা করতে পারে? রোমকে তারা ভস্মীভূত করে ফেলতে চেয়েছিল, এ-কথা কখনও বিশ্বাস করতে পারে কেউ? প্রভু তাদের মন্ত্র দিয়েছেন, 'পরস্পরকে ভালোবাস।' করুণার তাঁর অবধি নেই। শহরে তিনি আগুন জ্বালিয়ে দেন না, হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেন। তিনি ঈশ্বর, তিনি প্রেমময়। তিনি কেন এই অনিষ্ট করতে যাবেন?

পৃথিবীর তিনি গ্লানিমোচন করবেন, মর্ত্যভূমিতেই তিনি স্বর্গপ্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁরই কথামতো এতদিন তারা সেই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করে এসেছে, এখনও করছে। তিনিই প্রেম, তিনিই আলো! বলে তারা সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইল কয়েকটি। সে-গানের কথা আর সুরের মধ্যে দিয়ে যেন এক শান্ত করুণ মাধুর্য ঝরে পড়তে লাগল। অভিভূত হয়ে গেল বারাব্বাস। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে চুপ করে সে বসে রইল। সারামনে তার এখন সেই বিষণ্ণ শান্তি ছড়িয়ে গেছে।

কারাকক্ষের দরজা খুলে গেল হঠাৎ, কারারক্ষী এসে প্রবেশ করল। বন্দীদের এখন খেতে দেওয়া হবে; আলো আসবার সুবিধের জন্যে দরজাটাকে তাই খুলে রাখা হল কিছুক্ষণের জন্যে। লোকটা ঈষৎ প্রগল্‌ভ, মুখেচোখে একটা রক্তিম আমেজ লেগে রয়েছে। অশ্লীল সব গালিগালাজ করতে করতে এক-এক জনের সামনে সে এক-একটা থালা ছুঁড়ে দিতে লাগল। দরজা খুলে রাখায় বারাব্বাসের গায়ে আলো এসে পড়েছিল; লোকটা তাকে দেখে হেসে উঠল—এই যে, সেই উজবুকটাও এসে জুটে গেছে দেখছি। ওই হতচ্ছাড়াই তো রোমে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর তবু তোরা বলছিস কিনা ক্রীশ্চানদের

এতে কোন হাত নেই? তোরা সব এক-একটা ডাহা মিথ্যুক। ওকে তো সেদিন হাতে-নাতে ধরে ফেলা হয়েছিল। সত্যি-মিথ্যে ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ্। কিরে, চুপ করে রয়েছিস কেন?

মাথা নিচু করে বসে রইল বারাব্বাস। দৃষ্টি তার নির্বাক, কঠিন। চোখের নিচেকার সেই ক্ষতস্থানটা শুধু দপদপ করতে লাগল।

আর-সবাই ততক্ষণে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। কেউই তাকে চেনে না। প্রথমটায় তাকে সবাই সাধারণ একজন কয়েদী বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু একি শুনছে? এ-ও কি ক্রীশ্চান?

—না না, এ সম্ভব নয়। অস্ফুট স্বরে কানাকানি করতে লাগল সবাই।

—কি সম্ভব নয়? কারারক্ষী জিজ্ঞেস করল।

—কিছুতেই ও ক্রীশ্চান নয়। হতে পারে না। ক্রীশ্চান কখনও কারুর অনিষ্ট করতে যায় না।

—যায় না? হেসে উঠল কারারক্ষী—কিন্তু ও নিজেই এ-কথা বলেছে। বিশ্বাস না হয় তো ওকেই তোরা জিজ্ঞেস করে দেখ্। ওকে যারা হাতে-নাতে গিয়ে ধরে ফেলে, তাদের কাছ থেকেই আমি সব শুনেছি। অত কথারই বা দরকার-কি! জেরার সময় ও নিজেই এ-কথা কবুল করেছে।

—তা-ও কি সম্ভব! আমতা আমতা করতে লাগল সবাই; কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি ফুটে উঠল।—ক্রীশ্চান হলে ওকে আমরা নিশ্চয় চিনতাম। এর আগে আর ওকে আমরা দেখিইনি কখনও।

—তার মানে তোরা বলতে চাস যে ও ক্রীশ্চান নয়, কেমন এই তো? দাঁড়া, প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি!

বলে সে বারাব্বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বুকের উপরকার সেই চাকতিখানাকে উলটে ধরে বলল—নে, দেখ্ এসে। কি লেখা রয়েছে দেখে যা। বল্, এ কি তোদের ঈশ্বরের নাম নয়? ও-কি, চুপ করে রইলি যে?

সবাই গিয়ে ততক্ষণে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বারাব্বাসকে। বিস্ফারিত বিস্ময়ে তারা চাকতির উলটো পিঠের সেই অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। অধিকাংশই লিখতে পড়তে জানে না। যারা জানে, একটু বাদেই তাদের কণ্ঠস্বরে একটা চাপা ভয় ফুটে উঠল।

—ক্রীস্টোস য়েসাস—ক্রীস্টোস য়েসাস—

চাকতিখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজয়গর্বে কারারক্ষী ঘুরে দাঁড়াল। ব্যঙ্গভরা গলায় বলল—এবারে? এবারে বিশ্বাস হল তো? আদালতে এই চাকতিখানা দেখিয়ে ও বলেছে যে, সম্রাট ওর মালিক নন, যার কাছে তোরা প্রার্থনা করিস, সেই ঈশ্বরই ওর মালিক। এ-ব্যাটাকে নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। এ আমি একেবারে হলফ করে বলতে পারি। শুধু ওকেই নয়, তোদেরও। তোদেরও ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তোরা অবিশ্যি এই উজবুকটার চাইতে ঢের বেশি সেয়ানা, সহজে তাই কিছু কবুল করতে চাইছিস না। কিন্তু তাতেই কি তোরা রক্ষে পাবি ভেবেছিস? তোদের এই বন্ধুর কথাতেই সব ফাঁস হয়ে গেছে।

বলে একগাল হেসে বেরিয়ে গেল লোকটা। দরজায় কুলুপ পড়তেই সারা ঘরে সেই আধো-অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে সবাই এসে ফের বারাব্বাসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রুদ্ধকণ্ঠে একটার পর একটা তারা প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কে তুমি? কে? সত্যিই কি তুমি ক্রীশ্চান? কোথাকার ক্রীশ্চান? তুমিই কি তাহলে আগুন লাগিয়েছিলে?

নীরবে বসে রইল বারাব্বাস; কোন কথারই সে জবাব দিল না। সারামুখ তার

ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে; কোটরগত সেই চক্ষু দুটি যেন ক্ষোভে আর দুঃখে আত্মগোপন করতে চাইছে।

—ক্রীশ্চান! চাকতির উপরে ঈশ্বরের নামটা যে ও কেটে দিয়েছে, তা বুঝি তোমরা দেখনি? কে যেন প্রশ্ন করল।

—কেটে দিয়েছে! ঈশ্বরের নাম কেটে দিয়েছে? চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

—হ্যাঁ, তাই। কেন, দেখনি তোমরা?

দু-একজন অবশ্য দেখেছে, কিন্তু তার তাৎপর্যটা তারা বুঝতে পারেনি। সত্যিই তো, ক্রীশ্চানই যদি হবে তো নামটা ওভাবে কেটে দিয়েছে কেন?

চাকতিখানাকে একজন ছিনিয়ে নিল হঠাৎ। সবাই তার উপরে ঝুঁকে পড়ল। সেই আবছায়া-অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল যে, ছুরির ফলা দিয়ে আড়াআড়িভাবে চাকতির উপরকার অক্ষরগুলিকে সব কেটে দেওয়া হয়েছে।

—কেন? এ-নাম তুমি কেটে দিয়েছ কেন? বারাব্বাসের উপরে তাদের প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল—কি এর অর্থ? উত্তর দাও—। উত্তর দাও—। ও কি, চুপ করে রইলে কেন? বল—বল!

বারাব্বাস তবু জবাব দিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে বসে রইল। যা-খুশি ওরা করুক, যা-খুশি ওরা বলুক—সে কিছু বলবে না। কোন কথারই সে আজ কোন জবাব দেবে না। আর-সবাই ততক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছে। কে এই লোকটা, ক্রীশ্চান বলে যে নিজের পরিচয় দেয়? কে এ? কি পরিচয় এর? ক্রীশ্চান? অসম্ভব। বারাব্বাসের হাবভাবে তারা বিস্মিত হয়ে গেছে।

অন্ধকার কারাকক্ষের আর-এক কোণে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। কোন ব্যাপারেই এতক্ষণ তিনি কোন কথা বলেননি। কয়েকজন তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বলল। শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে বারাব্বাসের কাছে এগিয়ে এলেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ পুরুষ। বয়সের ভারে একটু-বা ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন। শুভ্র-শ্মশ্রু, শুভ্রকেশ। বলিষ্ঠ, তবু শান্ত। সব চাইতে আশ্চর্য তাঁর চোখ দুটি। শৈশবের বিহ্বলতা আর বার্ধক্যের শান্তি এসে তার মধ্যে পাশাপাশি আশ্রয় লাভ করেছে। নীলাভ সেই চক্ষুর সরোবরে যেন অপূর্ব একটি প্রশান্তি রচিত হয়েছে।

একদৃষ্টিতে তিনি বারাব্বাসের দিকে, তার বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বহুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। মনে হল, বহুদিন বহু বছর আগেকার হারিয়ে-যাওয়া কি-একটা ঘটনা যেন তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে।

—অনেক দিন, অনেক বছর আগে—। ভালো করে আজ আর তা আমার মনেও নেই—

বারাব্বাসের সামনেই তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করলেন! তারপর কি-যেন স্মরণ করে তিনি আপনমনেই মাথা নাড়তে লাগলেন।

বাকি সবাই ততক্ষণে বিস্মিত হয়ে গেছে। তাহলে কি উনি চেনেন? অদ্ভুত এই লোকটাকে উনি চেনেন?

চেনেন-যে তাতে আর-কোন সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা কইতেও শুরু করে দিয়েছেন। কোথায় ছিল সে এতদিন? কিভাবে ছিল? বারাব্বাস সব খুলে বলল তাঁকে। না, সব নয়। কিছু-কিছু অংশ বাদ দিয়ে যতটুকু না-বললেই নয়, সেইটুকুমাত্রই সে তাঁকে জানাল। তিনিও তা বুঝলেন। বুঝলেন যে কিছু-কিছু কথা সে তাঁর কাছে গোপন করে গেল। কিন্তু তাতে কি। যতখানি বলেছে, তাই কি যথেষ্ট নয়? এর আগে আর বারাব্বাস কখনও কাউকে বিশ্বাস করে কিছু বলেনি। এই প্রথম

সে, যতটুকু পারে, আর-একজনের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে প্রায়-অস্ফুট শ্রান্ত গলায় সে সব বিবৃত করে গেল। কথাবার্তার মাঝে মাঝে সে তাঁর শান্ত-করুণ বিষণ্নমধুর মুখখানির দিকে তাকাতে লাগল। তার নিজের মুখও বলিরেখাকীর্ণ। কিন্তু কই, ওঁর মুখের ওই উৎকীর্ণ বলিরেখার মধ্যে যে একটি প্রগাঢ় শান্তি ফুটে উঠেছে, বারাব্বাস তো কখনও তার সন্ধান পায়নি? ওঁর ললাট চিন্তা-কুঞ্চিত, তবু শুভ্রসুন্দর। দাঁত পড়ে গিয়ে দুগালে দুটি গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওঁকে। কথাবার্তার মধ্যে পরিচিত সেই ভাঙা-ভাঙা টানগুলিও ও'র রয়ে গেছে এখনও। কিছুমাত্রও তার পরিবর্তন হয়নি।

কেনই-বা বারাব্বাসের চাকতির উপরে ঈশ্বরের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, আর কেনই বা সে আগুন ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল সেদিন সব কথাই সে তাঁকে খুলে বলল। বলল যে, এই পাপ-পৃথিবীকে ভস্মীভূত করবার জন্যেই সে ক্রীশ্চান-সমাজকে আর তাদের প্রভুকে সেদিন সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। শুনে তাঁর সারামুখে অদ্ভুত একটা বেদনা ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন। ছি-ছি, বারাব্বাস কি ভেবেছিল যে ও আগুন ক্রীশ্চানরাই লাগিয়েছে? কি করে সে ভাবতে পারল? সে কি বুঝতে পারেনি যে, সমস্ত ব্যাপারটাই সীজারের একটা কারসাজি? ক্রীশ্চানদের উপরে নির্যাতন আরম্ভ করবার জন্যে সে একটা অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ভাড়াটে জনকয়েক লোককে দিয়ে শহরে সে আগুন ধরিয়ে দেয়। দোষটা তারপর ক্রীশ্চানদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রীশ্চানদের বারাব্বাস সাহায্য করতে চেয়েছিল, না-জেনে সে আসলে সীজারকেই সাহায্য করে বসেছে।

—তোমার চাকতির উপরে রাষ্ট্রের ছাপ মারা রয়েছে। সীজারই তোমার প্রভু। তোমার সেই মর্ত্যের প্রভুকেই তুমি সাহায্য করেছ যার নাম এখানে কেটে দেওয়া হয়েছে—তাঁকে নয়।

একটুক্ষণ তিনি থেমে রইলেন, তারপর বললেনঃ

—তিনি কখনও কারুর অনিষ্ট করেন না। তিনি করুণাময়। বলে তিনি বারাব্বাসের চাকতিখানাকে আবার হাতে তুলে নিলেন। কেটে-দেওয়া অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু-চোখে তার এক আশ্চর্য বেদনা ছড়িয়ে পড়ল। নীরবে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করলেন। এ চাকতি বারাব্বাসের; যতদিন বেঁচে আছে, এ-চাকতি ওকে বহন করতে হবে। তা তিনি জানেন। কিছু আর তার করবার নেই এখন। কোনভাবেই আর ওকে এখন সাহায্য করবার উপায় নেই। বারাব্বাসের দু-চোখে যে একটি ভীরু নিঃসঙ্গ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর একসময় মনে হল—বারাব্বাসও তা জানে।

—কে ও? কে?

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপরে প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগল।

—কে ও? কি ওর পরিচয়?

জবাব না দিয়ে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে হল প্রশ্নটাকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু তা সম্ভব হল না। বিস্ময়ে কৌতূহলে সবাই ততক্ষণে অস্থির। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতেই হল।

—এ-ই সেই বারাব্বাস! আমাদের প্রভুর জীবনের বিনিময়ে একে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বারাব্বাস! এই সেই বারাব্বাস! এ-ই! এ-ই! কোন-কিছুই যেন তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কেউই না। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে নিরুপায়-বীভৎস এক ক্রোধের বহ্নিতে তাদের চোখ জ্বলতে লাগল।

বৃদ্ধ তাদের শান্ত করলেন। বললেন—এ-ক্রোধ অর্থহীন। লোকটা অসুখী, অশান্তির আগুনে ও এখন দগ্ধ হচ্ছে। আর তাছাড়া, ওকে যে আমরা নিন্দে করব, এমন অধিকার কি আমাদেরই আছে? নেই। আমরাই কি নিরপরাধ? না। অপরাধী আমরাও, ত্রুটিবিচ্যুতির আমাদের অবধি নেই। তা সত্ত্বেও যে ঈশ্বর আমাদের মার্জনা করেছেন, আমাদের এই কলঙ্ক-মলিন জীবনের উপরেও যে তার করুণাবারি বর্ষিত হয়েছে, সে-কৃতিত্ব আমাদের নয়, তাঁর। এ-লোকটির ঈশ্বর নেই; কিন্তু তাই বলেই কি আমরা একে নিন্দে করতে পারি? পারি না।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। যে-হতভাগ্যের ঈশ্বর নেই, বিশ্বাসের অগ্নি-শিখায় যার সর্বপাপ এখনও ভস্মীভূত হয়নি, তার দিকে যেন আর তাদের তাকাবার পর্যন্ত সাহস নেই। ধীরে ধীরে যে-যার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বৃদ্ধও একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে তাদের অনুসরণ করলেন।

একা বারাব্বাস বসে রইল।

সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। বারাব্বাস জানে না। কারাকক্ষের সেই আধো-অন্ধকার নিঃসঙ্গ প্রান্তে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে বসে থাকে। সারাদিন, সারারাত্রি। ওদিকে ওরা গান গাইছে, সারা ঘরে তার সুরঝঙ্কার ছড়িয়ে গেছে। সে-গান প্রত্যয়ের, সে-গান ভালোবাসার। আর সেই প্রত্যয় আর ভালোবাসার মধ্যেই সমস্ত জিজ্ঞাসার ওরা উত্তর খুঁজে পেয়েছে। জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে যে-এক অনন্তজীবনের বেলাভূমি প্রসারিত হয়ে রয়েছে, তা ওরা জানে। জানে, তাই নির্ভয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু তাতে কি! অনন্ত-জীবন ওদের সম্মুখে। তাই নিয়েই ওরা কথা কইছে এখন। মৃত্যুকে আর ওরা ভয় করে না।

ওদের গান, ওদের আলোচনা—সমস্ত কিছুই বারাব্বাস শুনতে পায়। সেও এখন চিন্তামগ্ন। কি হবে তার, কোথায় গিয়ে সে আশ্রয় পাবে—বারাব্বাস ভাবে। মাউণ্ট অব অলিভের সেই লোকটি, প্রভু যাকে পুনর্জীবন দিয়েছিলেন, তার কথা আজ আবার মনে পড়ল। তার সঙ্গে সেই একত্র-আহারের কথাও মনে পড়ল বারাব্বাসের। পুনর্জীবন-লাভের পর আবারও তার মৃত্যু ঘটেছে। অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে সে তার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

অনন্ত জীবন—

যে-জীবন অতিবাহিত করে এসেছে বারাব্বাস, কি অর্থ তার? কতটুকু অর্থ? অর্থহীন, অর্থহীন। না কি—জানে না বারাব্বাস? সে কি করে বলবে!

শুভ্রশ্মশ্রু ওই বৃদ্ধ ওদিকে বসে আছেন। আর-পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। উচ্চারণের মধ্যে গ্যালিলির সেই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা টানটা এখনও বুঝতে পারা যায়। এতটুকুও তার পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু কি আশ্চর্য, কথা কইতে কইতেই হঠাৎ এক-একসময় তিনি নীরব হয়ে যাচ্ছেন। কি যেন ভাবছেন। নিজের জন্মভূমির স্মৃতি, গেনে-সারেটের সমুদ্রতীরের স্মৃতিই হয়ত ওঁকে আজ উন্মনা করে তুলেছে। সেখানে গিয়ে মরতে পারলেই তিনি হয়ত শান্তি পেতেন। কিন্তু না, তা আর হয় না। পথের প্রান্তে প্রভুর সঙ্গে যেদিন তাঁর দেখা হল, তিনি শুধু বলেছিলেন, আমাকে অনুসরণ কর, সেই যে তাঁকে তিনি ঘরের থেকে বাইরে ডেকে আনলেন, তারপর আর ঘরে ফেরা হয়নি। পথে পথেই তিনি তাঁর অনুসরণ করে ফিরেছেন। নীরবে তিনি বসে রইলেন। কৌতূ-ল-বিস্ফারিত ওই চক্ষু আর বলিরেখাকীর্ণ ওই ললাটে তাঁর এক পরম প্রশান্তি ফুটে চ্ছে।

তারপর একদিন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হল তাদের। বন্দীরা সবাই জোড়ে-জোড়ে শৃঙ্খলিত। কিন্তু সব মিলিয়ে সংখ্যাটা বেজোড়, বারাব্বাসকে তাই আর অন্য কারুর সঙ্গে একত্র শৃঙ্খলিত করা হয়নি। ঘটনাচক্রে এই মৃত্যুর মুহূর্তেও সে একা। সবশেষে তাকে নিয়ে আসা হল। যে-ক্রুশটিতে তাকে বিদ্ধ করা হল, সেটিও একেবারে প্রান্তবর্তী।

চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। শহরসুদ্ধ লোক আজ তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যুর সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যেও তাদের বিশ্বাসে এতটুকু চিড় খায়নি। কি-এক পরম আশ্বাসে পরস্পরের সঙ্গে তারা কথা কইছে, পরস্পরের মধ্যে তারা সেই আশ্বাসের আনন্দ সঞ্চারিত করে দিচ্ছে।

বারাব্বাসের সঙ্গেই শুধু কেউ কথা কইল না। তখনও বারাব্বাস একা।

সন্ধ্যার একটু আগেই যে-যার বাড়ি চলে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। আর তাছাড়া বন্দীরাও ততক্ষণে মারা গেছে।

একমাত্র বারাব্বাসই তখনও জীবিত। সন্ধ্যার সেই স্তব্ধ-বিষণ্ন নির্জনতার মধ্যে সে যখন বুঝতে পারল, যে-মৃত্যুকে সে সর্বক্ষণ ভয় করে এসেছে, সেই মৃত্যুই এবারে সমাসন্ন, অন্ধকারের মধ্যে সে তখন বললঃ

—তোমার হাতেই আমার আত্মাকে আমি সমর্পণ করলাম।

মনে হল যেন সেই নিবিড় তমিস্রার সঙ্গেই সে কথা কইছে।

বারাব্বাস মারা গেল।

জ্যাক লণ্ডন

এক টুকরো মাংস

(এ পীস অফ স্টীক)

মেক্সিকানটি

(দি মেক্সিকান)

অনুবাদক

শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ

শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য

বাদামী নেকড়ে

(ব্রাউন উল্‌ফ)

অনুবাদক

শ্রীমতী অনীতা গুপ্ত

লেখক এবং রচনা প্রসঙ্গে

জ্যাক লন্ডন বিশ শতকের প্রথম দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় মার্কিন কথাশিল্পী। তার জীবনের শেষ ষোলটি বছর সৃষ্টিকর্মের দিকে থেকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ। তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাসগুলি এই সময়ের রচনা। মার্কিন কুবের-সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েই জ্যাক লন্ডন তখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তাঁর শিল্পকর্মের খ্যাতি তখন দেশের বাইরেও প্রতিষ্ঠিত।

১৮৭৬ সালের ১২ই জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো শহরে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন শ্রমিক এবং জ্যোতিষী, মা হতেন তাঁর মিডিয়াম। তাঁদের দাম্পত্যজীবন চার্চের সম্মতিযুক্ত হয়ত ছিল না, তবু গভীর ভালোবাসার সংসারেই জ্যাক লন্ডনের জন্ম। শহরতলি এলাকার শ্রমিক-পল্লীর জীবন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। তিনি নিজেও ছিলেন কখনও কৃষকের সহযোগী, কখনও খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা। আঠার বছর বয়সেই জ্যাক লন্ডন একজন দক্ষ শ্রমিক। ১৮৯৭ সালে ক্লনডিকের স্বর্ণসন্ধানীদলে ভিড়েছেন। কিছুদিন কাটল স্যান ফ্রান্সিসকো উপসাগরে জলদস্যুদের দলে। জাপানে গেলেন এক বাণিজ্য-জাহাজে। বেকার ভবঘুরে হিসেবে জ্যাক বাফেলোতে জেল খাটলেন।

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ভিতরে ভিতরে জ্যাকের লেখক-সত্তাকে তৈরি করছিল। অঢেল স্বাস্থ্য ও প্রচুর পেশী-শক্তির অধিকারী জ্যাক অবসর পেলেই প্রচুর বই পড়তেন। এই বই-পড়ার নেশার মূলে আছে নিজের পরিস্থিতিকে জয় করার বাসনা।

তিনি বুঝলেন, আর পাঁচটা পণ্যের মতো পেশী-শক্তিও পণ্য। বুদ্ধিও পণ্য। তফাত এই যে, বেশি বয়সে বুদ্ধি-বিক্রেতার দর কমে না, পেশীর শক্তি-বিক্রেতা চল্লিশের ওপারেই ক্ষয়িত, প্রায় নিঃশেষিত। সুতরাং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যা জেনেছি, লিখতে হবে। বুদ্ধির ব্যাপারী হয়ে উঠতে হবে।

১৮৯৯ সালে কিছু প্রাথমিক ব্যর্থতার পর জ্যাক লন্ডনের গল্পগুচ্ছ ছাপা হল 'ওভারল্যান্ড মান্থলি' এবং 'দি আটলান্টিক' পত্রিকায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা। সমকালের মার্কিন সমাজের বৈষম্য, শ্রমিকদের অন্তরঙ্গ জীবনালেখ্য, অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারির প্রতিক্রিয়া জ্যাক লন্ডনের মতো করে মার্কিন সাহিত্যে আর-কেউ প্রকাশ করেননি। জেলে থাকতেই তিনি হার্বার্ট স্পেন্সার ও চার্লস ডারুইনের মতবাদ ও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। সুতরাং কথাশিল্পী জ্যাক লন্ডনের পথনির্দেশক পেতে দেরি হল না। অভিজ্ঞতা ও অনুভবের সঙ্গে মিলল মনীষার দীপ্তি।

জ্যাক লন্ডনের উল্লেখ্য গল্প-সংকলন ও উপন্যাস—দি সন অফ উলফ (১৯০০) দি কল অফ দি ওয়াইল্ড (১৯০৩), হোয়াইট ফঙ্ (১৯০৬), দি আয়রন হিল (১৯০৮), মার্টিন ইডেন (১৯০৯)। জ্যাক লন্ডনের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় আছে দি পিপল অফ দি অ্যাবিস (১৯০৩), দি ওয়ার অফ দি ক্লাসেস (১৯০৫), হিউম্যান ড্রিফট (১৯১৭)—বই তিনটিতে।

'প্রলেতারি' মঞ্চে জ্যাক লন্ডনের 'মেক্সিকান' গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করতে গিয়েই আইজেনস্টাইন তাঁর প্রযোজক-সত্তাকে আবিষ্কার করেন। ক্রুপস্কায়ার উক্তি থেকে জানা যায়, জ্যাক লন্ডন মহান বিপ্লবী লেনিনের প্রিয় লেখক ছিলেন।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে কেবল ব্যাখ্যা করা নয়, সাহিত্যের মাধ্যমে যাঁরা সেই সমাজকে পালটাতে চান, জ্যাক লন্ডন তাঁদের অন্যতম। ১৯১৬ সালের ২২শে নভেম্বর জ্যাক লন্ডনের মৃত্যু হয়।

এক টুকরো মাংস

পাঁউরুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে প্লেট থেকে ময়দার তরকারির অবশিষ্টটুকু চেঁচেপুঁছে তুলে নিল টম কিঙ্‌। টুকরোটাকে মুখে পুরে ধীরেসুস্থে চিন্তামগ্নভাবে চিবোতে শুরু করল। খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে ওঠার পরেও মনে হচ্ছে খিদেটা মেটেনি। তবু তো বাড়ির মধ্যে ও একাই আজ খেয়েছে। ছেলে দুটোকে আগেভাগে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে—যাতে ওরা খেতে পায়নি বলে চেঁচামেচি না করে। টমের স্ত্রী মুখে কিছু ঠেকায়নি। চেয়ারে বসে স্নেহ-ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শ্রমিক ঘরের মেয়ে টমের বউ। শুকনো রোগা চেহারা, কিন্তু তবু মুখ থেকে লাবণ্যটুকু এখনো পুরো মুছে যায়নি। তরকারির জন্যে ময়দাটা সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছিল। শেষ পুঁজি দুটো আধ পেনি খরচ হয়েছে পাঁউরুটি কিনতে।

জানালার পাশে রাখা একটা অতি রুগ্ন চেয়ারের উপর বসামাত্র চেয়ারটা টমের ভারের প্রতিবাদে ককিয়ে উঠল। মেশিনের মতো অভ্যাসবশত পাইপটা মুখে গুঁজে কোটের পাশ-পকেটে হাত পুরে দিল টম। পকেটে তামাক না পেয়ে তার হুঁশ ফিরল। নিজের ভুলো মনের কথা ভেবে ভুরু কুঁচকে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল। ওর নড়াচড়ার ব্যাপারটাই কেমন মন্থর। যেন নিজের পেশীর ভারে নিজেই কাবু। পাথরের চাঁইয়ের মতো বিশাল দেহের অধিকারী টম কিঙ্‌। সস্তা কাপড়ের ঢলঢলে প্যাণ্টশার্ট-গুলো বহুদিনের পুরোনো। জুতোর তলায় অনেকদিন আগেই সুকতলা মারা হয়েছে, উপরের চামড়াও ছিঁড়ব ছিঁড়ব করছে। দু-শিলিঙ দামের সুতির শার্টের কলারটা ফাটা। সারা জামায় রঙের দাগ। কাচলেও উঠবে না।

কিন্তু এসবই গৌণ। টম কিঙের সত্যিকার পরিচয় পেতে হলে ওর মুখের দিকে তাকাতে হবে। তাহলেই নিঃসন্দেহে বলা যাবে ও একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। চারচৌকো দড়ি-বাঁধা রিঙের মধ্যে জীবনের বেশ কিছু বছর সে পার করেছে, আর তারই দৌলতে তার মুখখানা আজ যোদ্ধা পশুর মতোই চিহ্নিত। সত্যি, মুখখানা দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। তার উপর আবার পরিষ্কার করে দাড়ি কামানোর জন্যে মুখের প্রতিটি রেখা যেন আরও কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রচার করছে। মুখের মধ্যে একটা ক্ষতচিহ্নের মতো কদাকার ঠোঁট দুটো থেকে যেন মাত্রাতিরিক্ত রুক্ষতা ঝরে পড়ছে। ভারী ভারী চোয়াল দুটোয় পাশবিক একটা আক্রোশ জমে আছে। লোমশ ভুরুর তলায় অলস মন্থর ভাবাবেগহীন দুটো চোখ। নিছক পশু হিসেবে সনাক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ওর অনুভূতিশূন্য চোখ দুটো। নিদ্রাতুর চোখ দুটো যেন সিংহের মতো—শিকারী জন্তুর যেমন হয়। কপালের দিকটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে। কদমছাঁট চুলের তলায় এবড়ো-খেবড়ো মাথাটা পাক্কা বদমাইশের মতো দেখায়। নাকটা দুবার ভেঙেছে আর অসংখ্য আঘাতে যথেচ্ছ একটা আকার নিয়েছে। কান দুটো আকারে দ্বিগুণ হয়ে ঠিক ফুলকপির মতো ফুলে আছে। এত অলঙ্কারের পর আবার সদ্য-কামানো মুখে দাড়ির আভাস একটা নীলচে কালো ছোপ ফেলেছে।

মোটের উপর অন্ধকার গলিতে বা নির্জন জায়গায় হঠাৎ ওর মুখোমুখি হলে যে-কেউ ভয় পেতে পারে। কিন্তু তবু টম কিঙ্‌ অপরাধী নয়। আজ অবধি কোন অপরাধই সে করেনি। দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত মামুলি ঝগড়াঝাঁটির কথা বাদ দিলে কারুর কোন অনিষ্ট সে করেনি। গায়ে পড়ে ঝগড়া করাটা অবধি তার স্বভাবে নেই। ও পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। কাজেই ওর চরিত্রের পাশবিক অংশটুকু পেশাদার লড়াইয়ের মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রিঙের বাইরে টম কিঙ্‌ সাদাসিধে মানুষ, কারুর সাতেপাঁচে

নেই। অল্পবয়সে যখন প্রচুর রোজগার করেছে, নিজের ভালোমন্দ বিচার না করেই পাঁচ-জনের জন্যে অঢেল করেছে। কারুর উপর ওর যেমন কোন বিদ্বেষ নেই, তেমনি ওরও কোন শত্রু নেই বললেই চলে। লড়াইটা ওর কাছে একটা ব্যবসা। রিঙের মধ্যেও আঘাত হানে যখন, ধ্বংস করবার জন্যেই হানে। বাক্‌রুদ্ধ করবার জন্যেই হানে। কিন্তু তার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কাজ করে না। এটা সাদাসিধে লেনদেনের ব্যাপার। লোকে যে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখতে হাজির হয় সে তো একজন আরেকজনকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিচ্ছে দেখবার জন্যেই। আজ থেকে কুড়িবছর আগে টম লড়তে নেমেছিল উলুমুলু গজারের বিরুদ্ধে। তার মাত্র চারমাস আগে নিউক্যাসেলের লড়াইয়ে গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। সব জেনেশুনেই টম ওর ভাঙা চোয়ালটাকেই তার আক্রমণের লক্ষ্য করে নবম রাউণ্ডে আবার গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে গজারের উপর তার বিশেষ কোন রাগ ছিল। লড়াইয়ে জেতবার এটাই ছিল সহজ উপায়। না জিতলে টাকা আসবে কোত্থেকে! গজারও এর জন্যে টমের উপর আদৌ বিরূপ হয়নি। এটাই তো খেলা; আর খেলতে যখন ওরা নামে তখন নিয়ম জেনেই নামে।

টম কিণ্ড্ কোনদিনই বেশি কথার মানুষ নয়। জানালার ধারে বসে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সে নীরবে তাকিয়ে ছিল হাত দুটোর দিকে। হাতের উলটো পিঠে শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে আছে। আঙুলের গাঁটগুলো বারবার চোট খেয়ে থেঁতলে যে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে তার থেকেই বোঝা যায় এগুলোকে কোন্ কাজে লাগানো হয়েছে। শিরা-উপশিরার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথা টম কিণ্ড্ জানে না, কিন্তু কেন ওগুলো অমন ফুলে উঠেছে সেটা জানে। ওর হৃৎপিণ্ড বারবার উচ্চ চাপে এবং অত্যধিক মাত্রায় রক্ত সরবরাহ করেছে শিরাগুলোয়। দীর্ঘদিন এই ঘটনা ঘটতে থাকায় শিরা-গুলো এখন আর কোনসময়েই সাধারণ আকার ধারণ করে না। শিরার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে টমের সহ্য-ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। এখন ও অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন ও আর আগের মতো কুড়ি রাউণ্ডের লড়াই চালাতে পারে না। এক রাউণ্ডের পর আর-এক রাউণ্ড, ঢঙ্ ঢঙ্ ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড লড়াই, লড়াই আর লড়াই, মারের বদলা মার, দড়ির উপর আছড়ে পড়া ও প্রতিপক্ষকে আছড়ে ফেলা, আর ওস্তাদের শেষ মার দিতে শেষ রাউণ্ডে দর্শকদের কানফাটা চিৎকারের মধ্যে বারবার ছুটে যাওয়া, বারবার ঘুষির বন্যা বওয়ানো, বারবার মাথা নুইয়ে আঘাত বাঁচানো। কিন্তু এর জন্য তখন তার বিশ্বস্ত হৃৎপিণ্ড সবল ধমনী দিয়ে প্রতিমুহূর্তে তাজা রক্তের বন্যা বওয়াত। সেই মুহূর্তে স্ফীত হয়ে উঠত প্রতিটি ধমনী। আবার প্রয়োজন ফুরোলে আগের আকার ধারণ করত। পুরোপুরি আগের আকার ফিরে পেত বলা ভুল, কারণ যত সামান্যই হোক, দৃষ্টিতে ধরা না পড়ুক, শিরাগুলো কিন্তু প্রতিবারই একটু একটু করে আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিরা-ফোলা থেঁতলানো হাতের দিকে চেয়ে টমের মনে পড়ে যায় তার তরুণ বয়সের সাফল্যের কথা। ওয়েলশের আতঙ্ক নামে পরিচিত বেনি জোন্সের মাথায় ঘুঁষি চালিয়ে সেই প্রথম ওর আঙুলের গাঁট থেঁতলে গিয়েছিল।

খিদেটা আবার মাথা চাড়া দেয়।

'ব্রিমি, একটুকরো মাংসের ব্যবস্থা করা যায় না?' হাতের বিরাট মুঠোটা পাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল টম। তারপর চাপা গলায় একটা অশালীন মন্তব্য করল।

'বার্ক আর সলির ওখানে দু-জায়গাতেই চেষ্টা করেছি।' প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বলল ব্রিমি।

'দিল না?'

'আধ পেনিও না। বার্ক বলল—,' ব্লিমির কথা আটকে যায়।

'থামলে কেন, বল কি বলেছে?' প্রায় হুমকি দেয় টম।

'বলছিল স্যান্ডেলের সঙ্গে আজ রাত্তিরে তোমার লড়াইয়ের কথা জানে, কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক বাকি পড়ে গেছে।'

টমের মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি ছাড়া আর-কোন কথা শোনা যায় না। মনে পড়ে যায়, পোষা বুলটেরিয়ার কুকুরটাকে একদিন ও নাগাড়ে মাংস খাইয়েছে। বার্কও তখন নিশ্চয় যত চায় তত ধার দিতে বিন্দুমাত্র গররাজি হত না। কিন্তু জমানা বদলে গেছে। টম কিঙের এখন বয়স হয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাব-আয়োজিত মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে কোন প্রৌঢ় মুষ্টিযোদ্ধা কখনও দোকানীর কাছ থেকে বেশি ধার আশা করতে পারে না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে ওঠা অবধি একটু মাংস খাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। আজকের লড়াইয়ের জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিং-এর সুযোগ পায়নি টম। অনাবৃষ্টির দরুন এ-বছর অস্ট্রেলিয়ায় যে-কোন ধরনের একটা সাময়িক কাজ যোগাড় করাও শক্ত হয়ে পড়েছে। প্র্যাকটিশ করার মতো সহকারী অবধি নেই টমের। ভাল খাবার তো দূরের কথা, সবসময় পেট-ভরা খাবারও জোটেনি। যখন যেমন সুযোগ পেয়েছে দু-একদিন করে মাটি-কাটার কাজ করেছে, আর প্রতিদিন ভোরবেলা নিয়ম করে দৌড়েছে—যাতে পায়ের জোর না হারায়। তবু দুটো নাবালক সন্তান ও স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার পর একা-একা কোন সঙ্গী ছাড়া প্র্যাকটিশ করা এক দুরূহ কাজ। স্যান্ডেলের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা হবার পরেও দোকানীদের কাছে কোন বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়নি। শুধু 'গেইটি' ক্লাবের সেক্রেটারি তাকে তিন পাউন্ড দিয়েছিলেন। লড়াইয়ে হারলেও এই তিন পাউন্ড তার পাবার কথা। সেইজন্যেই তিন পাউন্ডের বেশি ধার হিসেবে দিতে সেক্রেটারি রাজি হননি। পুরোনো বন্ধুদের কাছ থেকে মাঝে-সাঝে দু-চার শিলিং চেয়ে-চিন্তে এনেছে, এ-বছর খরা না হলে তারা নিশ্চয় আরও বেশি দিতে পারত। স্বীকার না করে উপায় নেই যে সত্যিই ওর ঠিকমতো ট্রেনিং হয়নি। আরও ভালো খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন ছিল, সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সে একজনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে হলে যে-কষ্ট পোয়াতে হয়, বিশ বছরের তরুণকে নিশ্চয় তা হয় না।

'ক-টা বাজল লিজি?' টম জিজ্ঞাসা করল।

লিজি উঠে গিয়ে পাশের বাড়ির লোকের কাছ থেকে সময় জেনে এল।—'আটটা বাজতে পনের।'

'আর দু-চার মিনিটের মধ্যেই প্রথম খেলাটা শুরু হবে। তবে ওটা শুধু যাচাই করে দেখার জন্যে। এরপর হবে ডিলার ওয়েল্শ্ আর গ্রিডলি'র চার রাউন্ডের খেলা। তারপর স্টারলাইট আর একটা নাবিকের মধ্যে দশ রাউন্ড। কাজেই ঘণ্টা-খানেকের আগে আমার ডাক পড়বে না।'

আরও মিনিট দশেক মুখ বুজে কাটিয়ে দিয়ে টম উঠে দাঁড়াল।

'আসলে কি জান লিজি, আমি একেবারেই প্র্যাকটিশের সুযোগ পাইনি।'

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় টম। লিজিকে চুমু খাবার কোন ইচ্ছে প্রকাশ পায় না। এটা টমের চিরকালের স্বভাব। বেরোবার মুখে কোনদিন চুমু খায় না। আজ লিজি কিন্তু দুহাতে টমের গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় জোর করে ওর মাথা নুইয়ে চুমু খেল। বিশাল চেহারার টমের পাশে লিজিকে যেন পুতুলের মতো দেখায়।

'গুড লাক্, টম। জিততে হবেই কিন্তু—' লিজি বলল।

'হ্যাঁ, জিততে হবেই।' ফের একই কথা বলে টম—'এটাই এখন একমাত্র কাজ—জেতা—জিততে হবেই।'

টম হেসে ওঠে। খুশি হবার ভাব দেখাতে চায়। লিজি ওকে আরও জড়িয়ে ধরে। লিজির কাঁধের উপর দিয়ে তাকায় টম। আসবাবহীন ফাঁকা একটা ঘর। টমের নিজের বলতে আছে এই ঘরখানা, লিজি আর তার দুই সন্তান। তাও বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে। সঙ্গিনী আর ছানাদের খাদ্যসংস্থানের জন্যে এই আস্তানা ছেড়ে নিশুতি রাতে অভিযানে বেরোতে হচ্ছে টমকে। বর্তমান যুগের কলকারখানার মজুররাও যন্ত্রের মধ্যে নিজেদের পেষাই করে খাদ্য সংস্থানের জন্যে। কিন্তু টমের পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই প্রাচীন আদিম রাজকীয় ভঙ্গিতে বন্য পশুর মতো লড়াই করে সংগ্রহ করছে ও খাদ্য।

'হারাতেই হবে—হারাতেই হবে—' টম মরিয়া হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। 'জিততে পারলেই তিরিশ ডলার। সব ধার শোধ হয়েও কিছু থেকে যাবে। হারলে একটি কানাকড়িও পাব না। ট্রামে চড়ার পয়সা অবধি না। হেঁটে ফিরতে হবে। চলি তাহলে —জিততে যদি পারি সিধে ফিরে আসব বাড়িতে।'

'আমি জেগে থাকব—', টমের পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল লিজি।

পুরো দুমাইল হেঁটে গেইটিতে পেঁছিতে হবে। টমের মনে পড়ে যায়, একদিন সে নিউ সাউথ ওয়েল্‌শের হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিল। তখন ট্যাক্সি ছাড়া লড়াইয়ের আসরে যাবার কথা ভাবাই যেত না। তা ছাড়া টম জিতবে বলে যারা জব্বর বাজি ধরত, তাদের মধ্যে কেউ-না-কেউ সঙ্গেই থাকত। টমি বার্নস আর ইয়াঙ্কি, জ্যাক জন্‌সন—ওরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসত। টম হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। সবাই জানে বক্সিংয়ের আগে দুমাইল পথ হাঁটা কোন কাজের কথা নয়। টমের বয়স হয়ে গেছে; আর বয়স্ক লোকদের উপর পৃথিবী বড়ই বিরূপ। এখন মাটি-কাটার কাজ ছাড়া ওর আর কিছুই মানায় না, কিন্তু সেখানেও ওর এই ভাঙ্গা নাক আর স্ফীতকায় কান দুটো প্রতিবন্ধক। টম ভাবে কি কুক্ষণেই না সে কোন হাতের কাজ শেখেনি। শিখত যদি শেষ পর্যন্ত কাজেই লাগত। কিন্তু সে-কথা কেউ তাকে বলেনি। অবশ্য বললেও সে উপদেশ কানে নিত না টম। সেদিন পুরো ছবিটাই ছিল রঙিন। সহজলভ্য অর্থ—তীব্র গৌরবময় লড়াই—দুটি লড়াইয়ের মাঝে অফুরন্ত অবসর—উন্মাদ সমর্থকদের ভিড়—পিঠ চাপড়ানি —করমর্দন—পাঁচ মিনিট কথা বলার জন্যে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ—লড়াইয়ের আসরের হর্ষধ্বনি —লড়াইয়ের অন্তিমে ঝড়ের মতো আঘাতবর্ষণ আর রেফারির ঘোষণা—'কিঙের জিত!' পরের দিন সকালে খবরের কাগজে খেলার পাতায় নাম।

সে-সব দিনের কথাই ছিল আলাদা। এখন কিন্তু টম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে যে সে শুধু পুরোনোদেরই সেদিন বাতিল করে দিয়েছে। উঠ্‌তি যৌবন হিসেবে প্রবীণদের তলায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে। কাজেই অবাক হবার কিছু নেই যে কাজ হাসিল করতে তাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। তাদের সকলেরই ছিল স্ফীতকায় হাতের শিরা, থেঁতলানো আঙ্গুলের গাঁট আর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহ—বৃদ্ধ যোদ্ধা। রাশেকাটার্‌স্ বে-র লড়াইয়ের অষ্টাদশ রাউণ্ডে প্রবীণ স্টাউশার বিল্‌কে হারাবার কথা মনে পড়ে যায় টমের। লড়াইয়ের পর ড্রেসিং-রুমে বসে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল বিল। হয়ত বিলেরও বাড়িভাড়া বাকি পড়েছিল। হয়ত তারও বাড়িতে ছিল বউ আর ছেলেমেয়ে। হয়ত সেদিন লড়াইয়ের আগে বিলও একটুকরো মাংস খাবার জন্যে আকুল হয়েছিল। বিল সেদিন লড়াইয়ের আসরে নিদারুণ প্রহার খেয়েছিল। আজ টম বুঝতে পারছে যে কুড়ি বছর আগে সেই দিনটিতে বিল তার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লড়াইয়ের আসরে নেমেছিল। টমের মতো সে শুধু খ্যাতি আর

সহজলভ্য অর্থ কুড়োতে আসেনি। তাই হেরে যাবার পর বিলের কান্নাটাও খুবই স্বাভাবিক।

একটা মানুষের লড়াইয়ের ক্ষমতা সীমিত। এর কোন ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। কেউ একশটা লড়াইয়ের পর ফুরিয়ে যায়, আবার কেউ মাত্র কুড়িটার পরই শেষ। সবটাই নির্ভর করে মানুষটার দৈহিক গঠনের উপর, তার পেশীর তন্তগুলোর উৎকর্ষের উপর। নির্ধারিত সংখ্যক লড়াইয়ের পর তাই কারুর পক্ষেই আর-কিছু করা সম্ভব নয়। বড় কঠোর এই প্রাকৃতিক বিধান। আর পাঁচ জনের চেয়ে টমের ক্ষমতা বেশিই ছিল বলতে হবে। সেই ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে। জান-প্রাণ উজাড় করে লড়াই—হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ফাটিয়ে—ধমনীকে স্ফীত ক'রে। এজন্যেই যৌবনের নমনীয় মাংসপেশীগুলো দড়ির মতো গাঁট পাকিয়ে গেছে। স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। সহ্যশক্তি কমে এসেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ঝিমিয়ে পড়েছে দেহ-মন। হ্যাঁ, আর পাঁচজনের তুলনায় টম অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। তার পুরোনো মুষ্টি-যোদ্ধা-বন্ধুদের কেউই আর টিকে নেই। এক-এক করে সবাই বিদায় নিয়েছে; আর তাদের সেই বিদায়ের আয়োজনে টমও অনেক সময় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবীণদের বিরুদ্ধে তাকে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; আর টমও এক-এক করে সবাইকে অপসারিত করে গেছে। স্টাউশার বিলের মতো কেউ যখন ড্রেসিং-রুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, ও তখন হেসেছে। এখন টম নিজে প্রবীণদের দলভুক্ত। তার বিরুদ্ধে তাই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নবীনদের। আজকের এই স্যাণ্ডেল ছোকরাটা এসেছে নিউজিল্যাণ্ড থেকে। সেখানে নাকি নামও কিনেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেউ তার সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই টমের সঙ্গে এই মুষ্টিযুদ্ধের আয়োজন। স্যাণ্ডেল যদি আজ তাগদ দেখাতে পারে তা হলে আরও নাম-করা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার, আরও বেশি অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবে। কাজেই স্যাণ্ডেল আজ জেতবার জন্যে চেষ্টার কসুর করবে না। অর্থ, খ্যাতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিচ্ছে স্যাণ্ডেলকে। সৌভাগ্য আর স্যাণ্ডেলের মাঝে বাধা বলতে এখন শুধু আছে পুরোনো ঘাঘু টম কিঙ্‌। যে-টমের পাওনা খুব বেশি হলে তিরিশটা মাত্র ডলার—বাড়িওলা আর দোকানীর ধার শোধ করতেই যা খরচ হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই একসময় টমের চোখের সামনে তারুণ্য যেন রক্ত-মাংসের রূপ ধারণ করে। তারুণ্য—মহান তারুণ্য—অজেয় আর উৎফুল্ল—উজ্জীবিত পেশী ও গায়ের রেশম-কোমল চামড়া—অক্লান্ত অবিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস। যে তারুণ্য শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব দেখলেই ফেটে পড়ে হাসিতে। তারুণ্যই বিধ্বংসের দেবতা। পুরোনোকে সে ধ্বংস করে, আর তার সঙ্গেই নিজেকেও তিল তিল করে খুইয়ে ফেলে। ক্রমশ তারও ধমনী আকারে বৃদ্ধি পায়, আঙুলের গাঁটগুলো যায় থেঁতলে এবং একদিন সে-ও পড়ে যায় পুরোনো বাতিলদের দলে। কারণ তরুণ যা তা চিরতরুণই থাকে, শুধু যুগটাই যা পালটে যায়।

ক্যাসেলরিগ স্ট্রীটে পা দিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নিল টম। তিনটি বাড়ির পরেই গেইটি। একদঙ্গল ছোকরা প্রবেশ-পথের মুখেই ভিড় জমিয়েছিল। ওকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। টম শুনতে পেল ওরা বলাবলি করছে, টম কিঙ্‌! এই তো টম কিঙ্‌!

ড্রেসিং-রুমে ঢোকবার আগেই ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা। যুবকটির চোখে-মুখে ধূর্ততার ছাপ। করমর্দন করে বলল, 'কেমন লাগছে বলুন!'

'চমৎকার! পুরোপুরি ফিট।' টম জেনেশুনে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলল। পয়সা থাকলে এখুনি ও একটু মাংস খাবার ব্যবস্থা করত।

ড্রেসিং-রুম ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে হলঘরের মাঝে চৌকো রিঙের কাছে এসে

দাঁড়াতেই অপেক্ষারত জনতা হর্ষধ্বনি করে আপ্যায়ন জানাল। একবার ডানদিকে আর একবার বাঁদিকে ফিরে টমও অভিবাদনে সাড়া দিল। বলতে গেলে সবই অচেনা মুখ। বেশির ভাগই কিশোর। টম যখন প্রথম নাম্ন করেছে তখন এদের অনেকেই বোধহয় জন্মায়ওনি। উঁচু মঞ্চটার উপর একলাফে উঠে এল টম। ঘাড় নুইয়ে দড়ির তলা দিয়ে ঢুকে এক কোণে নিজের জায়গায় চলে এল। ফোল্ডিং টুলের উপর বসল। রেফারি জ্যাক বল্ এগিয়ে এসে করমর্দন করল। বল্ও এককালের পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। অবশ্য দশবছর আগেই সে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। বল্কে রেফারি দেখে কিঙ্ খুশি হয়। পুরোনো দিনের লোক বল্। স্যান্ডেলকে একটু বে-আইনি ভাবে মারধোর করলেও বল্ সেদিকে নজর দেবে না।

এক এক করে ভাবী হেভিওয়েট বক্সাররা রিঙে উঠছে আর রেফারি তাদের পরিচয় পেশ করছে। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই বাজি ধরছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।

বল্ ঘোষণা করল, 'নর্থ সিড্নির বক্সার প্রন্টো আজকের লড়াইয়ের বিজয়ীকে পঞ্চাশ পাউন্ড বাজি ধরে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।'

স্যান্ডেল রিঙের মধ্যে লাফিয়ে উঠতেই দর্শকরা বারবার হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। নিজের জায়গায় গিয়ে বসল স্যান্ডেল। রিঙের বিপরীত কোণ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল টম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে নির্দয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে। বিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে অচৈতন্য আর ধরাশায়ী করার জন্যে তারা প্রত্যেকেই তাদের দেহের শেষ বিন্দু শক্তিকেও উজাড় করে দেবে। কিন্তু স্যান্ডেলও টমের মতো রিঙ-কস্টিউমের উপর সোয়েটার আর ট্রাউজার চড়িয়ে রেখেছে, তাই দেখে বিশেষ কিছু বোঝবার উপায় নেই। সুদর্শন মুখশ্রী—মাথা-ভর্তি কোঁকড়া ঘন হলদে-রঙা চুল। সুপুষ্ট পেশীবহুল ঘাড়টাই তার শক্তিমত্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তরুণ প্রন্টো রিঙের দুপ্রান্তে গিয়ে স্যান্ডেল আর টমের সঙ্গে করমর্দন সেরে নেমে গেল। একের পর এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধারা উঠে আসছে আর তাদের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই মুখগুলো সবারই অপরিচিত কিন্তু যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তারা সরব—দুনিয়ার মানুষের সামনে তাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ—শক্তি আর নিপুণতার জোরে তারা আজকের বিজয়ী যোদ্ধাকে আগামী দিনে পরাস্ত করবেই করবে। আগে হলে টম কিঙ্ মজা পেত, হয়ত বিরক্তিও বোধ করত। লড়াইয়ের আগে এই-সব অনুষ্ঠান দেখে এখন কিন্তু আগ্রহই বোধ করছে সে। অজেয় যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে। যৌবন চিরকালই ঠিক এইভাবে দড়ি গলে লাফিয়ে উঠেছে রিঙের ভিতর, উপেক্ষাভরে ছুঁড়ে দিয়েছে উদ্ধত চ্যালেঞ্জ, আর বার্ধক্যও চিরকাল নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে হার। বৃদ্ধ যোদ্ধাদের মাড়িয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় তরুণরা। অতৃপ্ত অপ্রতিরোধ্য তরুণের স্রোত বৃদ্ধদের দেয় ভাসিয়ে। তারপর একদিন তরুণরাও বৃদ্ধ হয়, তারাও আবার সেই একই পতনের পথের পথিক হয়। চিরজয়ী শাশ্বত তারুণ্য!

প্রেস-বক্সের দিকে তাকিয়ে টম কিঙ্ 'স্পোর্টস্ম্যান' কাগজের মরগ্যান, আর 'রেফ্রি' কাগজের করবেটকে দেখতে পেয়ে ঘাড় নাড়ল। টম এবার দুহাত উঁচু করে ধরতেই তার সহকারী সিড সুলিভান ও চার্লি বেট্স্ গ্লাভস পরিয়ে দিয়ে শক্ত করে ফিতে বেঁধে দিল। স্যান্ডেলের একজন সহকারী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরখ করছিল টমের আঙুলের গাঁটের উপরকার ছোট ছোট ব্যান্ডেজগুলো। ওদিকে টমের একজন সহকারী স্যান্ডেলের কাছে দাঁড়িয়ে একইভাবে নজর রাখছে। স্যান্ডেলের প্যান্টটা টেনে খুলে নিতেই সে উঠে দাঁড়াল। এবার সোয়েটারটা টেনে তুলে নেওয়া হল মাথা ছাড়িয়ে। টম দেখে, তারুণ্য মানুষের রূপ ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুস্থ সবল দেহের গায়ের চামড়ার নিচে মাংসপেশীগুলো জীবন্ত

প্রাণীর মতো খেলা করছে। সারা শরীর জুড়ে শুধু চঞ্চল প্রাণের স্বাক্ষর। টম জানে ওর এই সতেজ প্রাণের নির্যাসের একবিন্দুও এখনও অসংখ্য আঘাতজনিত ক্ষত-মুখ দিয়ে ঝরে পড়েনি। লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে তার তারুণ্য এখনও খেসারত দিতে শুরু করেনি।

ওরা দুজন এবার এগিয়ে আসে মঞ্চের মাঝখানে। ঘণ্টা পড়তেই সহকারীরা ভাঁজ-করা চেয়ার দুটো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্যান্ডেল আর টম করমর্দন সারার পরই ওদের দেহ দুটো যোদ্ধার ভঙ্গি গ্রহণ করল। সূক্ষ্ম কেশের বাঁধন ছিঁড়ে ইস্পাত আর স্প্রিংয়ে-গড়া যন্ত্রের মতো ছটফট করে উঠল স্যান্ডেল। একবার এগিয়ে, একবার পেছিয়ে বাঁ-হাতের ঘুষি মারল চোখে, ডান হাতের ঘুষি পাঁজরে, তারপর প্রত্যাঘাত এড়িয়ে লঘু পায়ে নেচে পিছিয়ে এসেও ফের এগিয়ে এল হিংস্র ভাবে। স্যান্ডেল অত্যন্ত তৎপর আর চতুর। চোখ-ধাঁধানো প্রদর্শনী। দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। টমের কিন্তু ঠাণ্ডা মাথা। অভিজ্ঞ যোদ্ধা টম এমন ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে কতবার যে লড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্যান্ডেলের ঘুষিগুলোর সঠিক মূল্য তার জানা। এই ত্বরিত আক্রমণ মারাত্মক নয়। জানা কথা, স্যান্ডেল প্রথম থেকেই হুটোপাটি করবে। এটা যৌবনের ধর্ম। বিদ্রোহে উন্মাদ। অফুরন্ত ক্ষমতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে যৌবনের দর্পে ফেটে পড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দেয় প্রতিপক্ষকে।

স্যান্ডেল একবার এগোচ্ছে একবার পেছোচ্ছে। একবার এখানে একবার ওখানে। উদ্দীপনা যেন চঞ্চল পায়ে চষে ফেলেছে সারা মঞ্চটা। সাদা চামড়া আর মাংসপেশীর আশ্চর্য মহিমা! দেহটা যেন মাকুর মতো উঠছে, লাফাচ্ছে, পিছলে বেরিয়ে আসছে, আর রচনা করছে আক্রমণের এক চোখ-ধাঁধানো জাল। আক্রমণের পর আক্রমণ—হাজারো আক্রমণ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই। টম কিঙকে ধ্বংস করা। টম কিঙ্—যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যান্ডেল আর তার সাফল্যের মাঝখানে। টম অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় আঘাতগুলো। সে তার করণীয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। টম যৌবন পার করে এসেছে; তাই যৌবনকে চিনতে আর তার বাকি নেই। যতক্ষণ না স্যান্ডেলের খানিকটা দম বেরোচ্ছে কিছু করবার নেই। টম ইচ্ছে করে মাথা নুইয়ে একটা ঘুষি খেল মাথায়। দাঁতে দাঁত টিপে হাসে টম। শয়তানি করেছে ঠিকই কিন্তু খেলার নিয়ম ভেঙ্গে করেনি। নিজের হাতের আঙ্গুলের গাঁট বাঁচাবার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের। তারপরেও কেউ যদি কারুর মাথার উপর ঘুষি কষাতে চায়, নিজের ক্ষতি করে—কেউ বাধা দেবে না। টম ইচ্ছে করলে মাথাটা আরেকটু নিচু করতে পারত, তাহলেই ঘুষিটা ফসকে যেত। টম তা করেনি, কারণ তার মনে পড়ে গিয়েছিল প্রথম জীবনের লড়াইয়ের কথা। মনে পড়ে গিয়েছিল 'ওয়েল্‌শের আতঙ্ক'-এর মাথায় সেই প্রথম আঙ্গুলের গাঁট থেঁতলে যাবার কথা। মাথাটা পুরোপুরি নিচু না করার জন্যে স্যান্ডেলেরও আঙ্গুলের একটা গাঁট খতম হয়ে গেছে। অবশ্য এই নিয়ে স্যান্ডেল এখন মাথাও ঘামাবে না। কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই সে এমনি বীরদর্পে আঘাতের পর আঘাত হেনে যাবে লড়াইয়ের শেষ মুহূর্ত অবধি। কিন্তু একদিন আসবেই যখন একের পর এক লড়াইয়ে নামার ফল ফলতে শুরু করবে। থেঁতলানো গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে তখন অনুশোচনা হবে। মনে পড়ে যাবে টম কিঙের মাথায় ঘুষি মেরে প্রথম আঘাত পাবার কথা।

প্রথম রাউন্ডের পুরো সাফল্যটুকু একা কেড়ে নেয় স্যান্ডেল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার ক্ষিপ্র আক্রমণ উল্লসিত করে প্রতিটি দর্শককে। ঘুষির বন্যায় টমকে দিশাহারা করে দেয়। টম কিছুই করছে না। একবারও পালটা ঘুষি চালায়নি। ও শুধু আঘাত বাঁচাতে নিজেকে আড়াল করেছে, বাধা দিয়েছে, মাথা নামিয়ে নিয়েছে। সরাসরি আঘাত

পেয়ে কখনও আবার ভান করেছে যেন মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শ্লথ ভঙ্গিতে সরে এসেছে। একবারও লাফায়নি বা ঝাঁপিয়ে পড়েনি। শরীরের এক বিন্দু শক্তিও অপচয় করেনি। স্যাণ্ডেলের ফেনিল যৌবন সম্পূর্ণভাবে উপচে না পড়া পর্যন্ত বিচক্ষণ প্রবীণ প্রতিশোধ নিতে সাহস পাবে না। টমের প্রতিটি গতিবিধি মন্থর হলেও সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল। ওর ক্লান্ত অলস চোখের দৃষ্টি ভ্রম সৃষ্টি করে—মনে হয় ও বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আসলে কিন্তু কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। কুড়ি বছরেরও বেশি দড়ি-ঘেরা মঞ্চের ভিতর কাটানোর সুবাদে তার চোখের নজর তৈরি হয়ে গেছে। আসন্ন আঘাতের আশঙ্কায় চোখের পাতা কাঁপে না। শীতল চোখ দুটো শুধু চেয়ে থাকে আর দূরত্বের মাপ নেয়।

প্রথম রাউণ্ডের পর রিঙের কোণে বসে নির্ধারিত একমিনিটকাল বিশ্রাম উপভোগ করছিল টম। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে—হাত-দুটোর ভর রেখেছে পিছনের দড়ির উপর। সহকারীরা তোয়ালে নেড়ে বাতাস করছে আর বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে টম। পেট আর বুক ঘনঘন ওঠা-নামা করছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে টম। কানে আসছে দর্শকদের নানা প্রশ্ন, 'লড়ছ না যে টম?' 'তুমি কি ওকে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'সব পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেছে।' সামনের আসন থেকে একজনকে মন্তব্য করতে শুনল। 'এর চেয়ে তাড়াতাড়ি নড়তে পারে না। স্যাণ্ডেলের ওপর নগদ বাজি ধরছি —টু টু ওয়ান।'

ঘণ্টা পড়তেই দুজনে নিজেদের জায়গা ছেড়ে সামনে এগিয়ে এল। টম যত না এগোয় স্যাণ্ডেল তার তিনগুণ। স্বভাবতই স্যাণ্ডেল ব্যগ্র। টম কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট। এটা তার হিসেবি মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। টমের ট্রেনিং জোটেনি, ভালো করে খাওয়াও হয়নি, কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পাক্কা দু-মাইল হেঁটে এসেছে। ঠিক প্রথম রাউণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবারেও। ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্যাণ্ডেলের আক্রমণ, আর টম কিঙ্ নিষ্ক্রিয়। ক্ষুব্ধ দর্শকরা বারবার জানতে চাইছে টম কেন লড়ছে না। টম শুধুই ভান করছে। যাও-বা দু-একটা ঘুষি মেরেছে তার পিছনে না ছিল গতি, না কোন শক্তি। নিজেকে আড়াল করা আর সরিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছুই করেনি। স্যাণ্ডেল চাইছে লড়াইয়ের মধ্যে ক্ষিপ্রতা আনতে, কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে টম তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না একেবারে। ব্যথাভরা অদ্ভুত এক ধরনের চাপা হাসির আভাস ফুটে উঠেছে টমের আঘাত-জর্জরিত ভাঙ্গাচোরা মুখটায়। এমন ব্যাকুলভাবে নিজের ক্ষমতাকে কয়েদ করে রাখার সামর্থ্য শুধু বয়সের সঙ্গেই আসে। স্যাণ্ডেল মানেই যৌবন—আর যৌবন নিজের শক্তিসামর্থ্যকে এমনি অবহেলাভরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। রিঙের অধিনায়ক কিন্তু টম। একের পর এক তিক্ত সুদীর্ঘ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুবাদে সে অর্জন করেছে তার বিচক্ষণতা। স্থিরদৃষ্টিতে ঠাণ্ডা মাথায় নজর রাখছে টম। মন্থর পদক্ষেপ। স্যাণ্ডেলের সফেন যৌবন উপচে না পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষাই করবে। অধিকাংশ দর্শকই ভাবে যে স্যাণ্ডেলের সঙ্গে টমের কোন তুলনাই চলতে পারে না। বাজির হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তিনে এক। এরই মধ্যে কিন্তু কিছু বিজ্ঞ লোকও আছে। এরা আগে টমের লড়াই দেখেছে। তারা টমের উপরেই বাজি ধরে নিশ্চিন্ত মনে।

যথারীতি তৃতীয় রাউণ্ডের শুরু থেকেই স্যাণ্ডেলের একতরফা আক্রমণ শুরু হয়। তিরিশ সেকেণ্ড পেরোবার পর স্যাণ্ডেলেরই অসাবধানতায় একটা সুযোগ পেয়ে যায় টম। তার চোখ ঝলসে ওঠে আর তারই সঙ্গে তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে আসে ডান হাত। এই তার প্রথম মার—প্যাঁচানো ডান বাহুর কঠিনতা আর আধ-ঘূরন্ত দেহের পুরো ভার সমেত হুক্ করেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা সিংহ যেন আচমকা বাজ পড়ার মতো থাবা

বসিয়ে দিয়েছে। আঘাতটা চোয়ালের ধারে লাগামাত্র গলা-কাটা গরুর মতো লুটিয়ে পড়ল স্যান্ডেল। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে সভয়ে বাহবা জানাল। লোকটা তাহলে একেবারে অচল নয়, ঘুষিটা যা ঝেড়েছে কামারশালের হাতুড়ির মতো!

স্যান্ডেল হতভম্ব হয়ে গেছে। মেঝের উপর একপাক গড়িয়ে উঠে বসতে যায় কিন্তু তার সহকারীরা চিৎকার করে বারণ করে দেয় উঠতে। রেফারির সময় গণনা শেষ না হওয়া অবধি বিশ্রাম নেবার জন্যে উপদেশ দেয়। একটা হাঁটু মুড়ে তার উপর দেহের ভার রেখে বসে স্যান্ডেল, যাতে যে-কোন মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে পারে। রেফারি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এক দুই তিন করে জোরে জোরে গুনে চলে প্রতিটি সেকেন্ড। নয় গোনা হতেই যোদ্ধার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল। টমের আপসোসের অন্ত নেই। ঘুষিটা যদি আর-এক ইঞ্চি ওপাশে চোয়ালের ঠিক ভাঁজটায় পড়ত, পুরো নক্-আউট হয়ে যেত স্যান্ডেল। তিরিশটা ডলার পকেটে পুরে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে পারত। বউ আর বাচ্চারা ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

পুরো তিনমিনিট পার করে রাউন্ড শেষ হবে। স্যান্ডেল এবার তার প্রতিপক্ষকে সমীহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। টমের কিন্তু সেই আগের মতোই মন্থর গতি, ঘুম-জড়ানো দৃষ্টি। রিঙের পিছনে সহকারীদের অপেক্ষা করতে দেখেই টম বুঝতে পারে রাউন্ড শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় সে। লড়াই-টাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে যাতে ক্রমশ সে তার নিজের দিকের কোণটার কাছে এগিয়ে আসতে পারে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে টম তার টুলটার উপর বসে পড়ে। স্যান্ডেলকে কিন্তু কোনাকুনিভাবে হেঁটে পুরো মঞ্চটা পার হয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছুতে হয়। ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু এইরকম অনেকগুলো সামান্য ব্যাপার যখন একসঙ্গে দানা বাঁধে তখন আর তা সামান্য থাকে না। ওই ক-পা বেশি হাঁটতে বাধ্য হয়েছে স্যান্ডেল, ওইটুকু শক্তি বেশি খরচ করেছে, বিশ্রামের অত্যন্ত মহার্ঘ্য একমিনিট সময়ের থেকেও কয়েক সেকেন্ড খোয়া গেছে। প্রতি রাউন্ডের সূচনায় টম অত্যন্ত মন্থরভাবে অগ্রসর হয়েছে আর স্যান্ডেলকে বেশি করে হাঁটিয়েছে। আবার প্রতিটি রাউন্ডের সমাপ্তির সময় দেখা গেছে চতুর টম ঠিক স্ব-স্থানে ফিরে এসেছে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে নিজের টুলে।

আরও দু-রাউন্ড খেলা হয়ে গেছে। টম তার শক্তিব্যয়ে যতটা কৃপণ, স্যান্ডেল ঠিক ততটাই বেহিসেবি। স্যান্ডেল খেলার গতি বাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হলে টম অস্বস্তিতে পড়ে। স্যান্ডেলের অসংখ্য আঘাতের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ্যভেদ করেছে। তবু টম তার শ্লথভঙ্গি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। মাথাগরম ছোকরারা ওদিকে চেঁচিয়ে আসর মাত্ করছে—টমকে লড়তে বলছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে স্যান্ডেল আবার অসতর্ক হতেই টমের ডান হাতের ভয়াবহ ঘুষি এসে পড়ে তার চোয়ালে। আবার রেফারি নয় গোনা অবধি পড়ে থাকে সে। সপ্তম রাউন্ডেই স্যান্ডেলের অতি-উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। বুঝতে পারে এটা তার জীবনের কঠিনতম লড়াই। টম কিঙ্ বুড়ো হতে পারে কিন্তু এ অবধি সে টমের মতো যোদ্ধার সম্মুখীন হয়নি। বুড়ো টম কখ্খনও মাথা গরম করে না, তার আত্মরক্ষার কৌশল নিখুঁত, তার ঘুষির আঘাত যেন মুগুরের ঘা। তাছাড়া তার ডান বাঁ দু-হাতেই ছিল নক্-আউট করার ক্ষমতা। তাহলেও টম কিন্তু বারবার আঘাত হানতে সাহস পায় না। আঙুলের ভাঙা গাঁটগুলোর কথা সে ভোলেনি। শেষ পর্যন্ত লড়তে হলে খুব বুঝে-সুঝে প্রতিটি আঘাত হানা প্রয়োজন। টুলে বসে ওপ্রান্তে স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে টমের মনে হল ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্যান্ডেলের যৌবনকে যদি যুক্ত করা যেত, সেটা নিশ্চিতভাবে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পি-য়ানের জন্ম দিত। কিন্তু মুশকিল এই যে স্যান্ডেল কোনদিনই ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ান

হবে না। তার সে বিচক্ষণতা নেই। একমাত্র তার যৌবনকে বিকিয়েই সে তার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে। তারপর একদিন সে বিচক্ষণতা অর্জন করবে ঠিকই, কিন্তু ততদিনে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে।

যতরকম ভাবে সম্ভব টম সুযোগ নিতে কসুর করে না। সুবিধে পেলেই সে আঁকড়ে ধরছে বিপক্ষকে। আর আঁকড়ে ধরার মুহূর্তে বলতে গেলে প্রতিবারই তার কাঁধটা স্যান্ডেলের পাঁজরে আঘাত করছে। মুষ্টিযুদ্ধের হিসেবে ঘুষির মতোই কার্যকর কাঁধটা। তাছাড়া এতে শক্তির অপচয়ও হয় অপেক্ষাকৃত কম। একবার পাকড়ে ধরতে পারলে টম তার পুরো দেহের ওজনটা ছেড়ে দেয় বিপক্ষের উপর। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে তখন রেফারির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টম যখনই কাঁধ দিয়ে স্যান্ডেলের পাঁজরে গোঁত্তা মেরে ওকে জাপটে ধরে, ওর মাথাটা থাকে স্যান্ডেলের বাঁ-হাতের তলায়। স্যান্ডেল এইরকম সময় তার পিঠের দিক দিয়ে ডান হাত চালিয়ে টমের মুখে আঘাত করে। স্যান্ডেলের এই মারের চাতুর্য দর্শকদের সহর্ষ তারিফ পায়, কিন্তু টমের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না। শক্তির অহেতুক অপচয়। স্যান্ডেলের কিন্তু ক্লান্তি নেই, কোন বিকার নেই। টম মুচকি মুচকি হাসে আর সহ্য করে যায় মারগুলো।

স্যান্ডেল এবার ডান হাতে পরপর ক-বার জোরালো ঘুষি চালায়। দেখে মনে হয় টম দারুণ মার খাচ্ছে। প্রাচীন মুষ্টিযোদ্ধারা কিন্তু তারিফ দেয় টমকেই। স্যান্ডেল যেই ঘুষি চালাতে যাচ্ছে, টমের বাঁ-হাতের গ্লাভ্স্‌টা নিপুণভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে স্যান্ডেলের ডান-হাতের গুলি। ঘুষিগুলো টমের গায়ে এসে লাগছে ঠিকই কিন্তু তার শক্তিহরণ করে নিচ্ছে টমের ওই সামান্য স্পর্শটুকু। নবম রাউন্ডের শুরুতে এক মিনিটের মধ্যে টমের ধনুক-আকার ডানহাতের আঘাতে পরপর তিনবার স্যান্ডেলের অত ভারী দেহখানা লুটিয়ে পড়ল। প্রতিবারই নয় গোনা অবধি পুরো সময়টার সদ্ব্যবহার করে তারপর স্যান্ডেল উঠে দাঁড়িয়েছে। আঘাতে আঘাতে বিহ্বল, দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ক্ষমতা হারায়নি। স্যান্ডেলের আর ক্ষিপ্রতা নেই, আগের মতো আর বেহিসেবি শক্তিক্ষয়ও করছে না। দাঁতে দাঁত টিপে লড়ে যাচ্ছে। তার প্রধান সম্পদ যৌবনের ভাঁড়ার থেকে যথেচ্ছ ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। টমের প্রধান সম্পদ কিন্তু অভিজ্ঞতা। তেজ আর প্রাণ-শক্তিতে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ যোদ্ধা-জীবনের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে ঘাটতিটুকু পূরণ করে নিয়েছে চাতুর্য। নিজের দৈহিক শক্তির অপব্যয় রোধ করার জন্য একটিও বাড়তি অঙ্গসঞ্চালন তো নয়ই, উপরন্তু প্রতিপক্ষকে সেই একই ভুল করতে বাধ্য করার কৌশল জানে টম। হাত পা আর দেহের ছলনাময় ভঙ্গিতে বারবার সে প্রলুব্ধ করছে স্যান্ডেলকে। অহেতুক স্যান্ডেল লাফিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, ঘাড় নোয়াচ্ছে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে প্রতিরোধমূলক ভঙ্গি গ্রহণ করছে। টম ঠিক সুযোগ করে অবসর নিচ্ছে লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, কিন্তু স্যান্ডেলকে একমুহূর্ত নিশ্চেষ্ট থাকতে দিচ্ছে না। এটা পরিণত বয়সের নীতি।

দশম রাউন্ডের শুরুতেই টম বিপক্ষের আক্রমণ রোধ করতে সোজা স্যান্ডেলের মুখের উপর বাঁ-হাতের ঘুষি ঝেড়ে গেল পরপর ক-বার। স্যান্ডেল শেষ পর্যন্ত পালটা কৌশল হিসেবে টমের বাঁ-হাতের ঘুষিগুলো মাথা নুইয়ে এড়িয়ে গিয়ে ডান হাতের হুক্ ঝাড়তে শুরু করল টমের মাথায়।" আঘাতগুলো ঠিক জায়গা মতো না লাগায় কার্যকর হয়নি। কিন্তু প্রথম আঘাতটা লাগার পর অচেতনতার সেই সুপরিচিত কালো পর্দাটা নেমে এসেছিল টমের দু-চোখে, সেই মুহূর্তটিতে বা সেই মুহূর্তের এক ভগ্নাংশ খানেক সময় টম হারিয়ে গিয়েছিল। আঘাত পাবার আগের মুহূর্তে ও দেখেছিল স্যান্ডেল তার মার এড়াতে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে—দেখেছিল অগণিত

দর্শকের মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই অন্ধকার। আবার দৃষ্টি ফিরে পেতেই সেই দর্শকদের মুখ আর স্যাণ্ডেলকে দেখতে পেল টম। এতক্ষণ ঘুমোবার পর যেন চোখ খুলল। তবে সংজ্ঞাহীন মুহূর্তটি তিলমাত্র স্থায়ী হয়েছিল বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বারও সময় পায়নি টম। দর্শকরা দেখে টম টলমল করছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণেই অবশ্য বাঁ-কাধের আশ্রয়ে থুতনি গুঁজে নিজেকে সামলে নেয় টম।

পর পর ক-বার একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে যায় স্যাণ্ডেল। টম শেষ পর্যন্ত বিহ্বলতা কাটিয়ে আত্মরক্ষার এবং পালটা আক্রমণের উপায় বের করে। বাঁ-হাতে ঘুষি মারবার ভণিতা করে আধ-পা পিছনে সরে এসে সম্পূর্ণ শরীরের ওজনটুকু কাজে লাগায়, ডানহাতের আপারকাট্ মারে। সময়ের নির্ভুল বিচারে আঘাতটা সোজা গিয়ে পড়ে স্যাণ্ডেলের মুখের উপর। আঘাতের প্রচণ্ডতা স্যাণ্ডেলকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলে। তার মাথা আর কাঁধে চোট লাগে। পরপর দুবার স্যাণ্ডেলকে একইভাবে ধরাশায়ী করে তারপর দড়ির উপর ফেলে ঘুষির বন্যা বইয়ে দেয়। স্যাণ্ডেলকে একমুহূর্ত অবসর দেয় না সামলে ওঠার—মুহুর্মুহু আঘাতে জর্জরিত করে দেয়। উত্তেজনায় আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে প্রতিটি দর্শক। অবিরাম হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল। কিন্তু অসামান্য শক্তি আর সহ্য-ক্ষমতা স্যাণ্ডেলের। এখনও পায়ের উপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। স্যাণ্ডেলের নক-আউট হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পুলিশের এক ক্যাপ্টেন রিঙের ধারে উঠে আসে লড়াই থামিয়ে দেবার জন্যে। ঠিক এমনি সময় ঘণ্টাধ্বনি রাউণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করে। টলমল করে নিজের জায়গায় ফিরে আসে স্যাণ্ডেল। পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানায় লড়াই বন্ধ করার চেষ্টা করেছে বলে। লড়বার শক্তি আর সামর্থ্য দুটোই তার অটুট আছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সে দুবার লাফিয়ে উঠে সরে আসে পিছনে। পুলিশের ক্যাপ্টেন আর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যায়।

পিঠে ঠেস দিয়ে টুলের উপর হতাশভাবে বসে আছে দমছুট টম। লড়াইটা বন্ধ হয়ে গেলে রেফারি বাধ্য হত টমকে জয়ী ঘোষণা করতে—করকরে ডলারগুলো চলে আসত পকেটে। টম তো আর স্যাণ্ডেলের মতো যশ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে লড়ছে না, ওর লড়াই শুধু তিরিশটা ডলারের জন্যে। আবার একমিনিট অবসর পেয়ে গেল স্যাণ্ডেল, এর মধ্যেই খানিকটা সামলে উঠবে নিশ্চয়।

তরুণের জয় সুনিশ্চিত—কে যেন টমের কানের কাছে গুনগুন করে উঠল। টমের মনে পড়ে গেল স্টাউশার বিল্‌কে হারাবার পর সে-রাতে ও কার মুখে যেন এই একই কথা শুনেছিল। টমের এক অনুরাগী সমর্থক সেদিন ওকে ড্রিঙ্কের আহ্বান জানিয়েছিল। সে-ই বলেছিল কথাগুলো। সে-রাতে টমই ছিল তরুণ আর আজ তারুণ্যের প্রতিমূর্তি বসে আছে তার বিপরীত দিকে। আধঘণ্টা হয়ে গেল লড়ছে টম এবং টমের বয়সটা কম নয়। স্যাণ্ডেলের মতো লড়লে পনের মিনিটের বেশি সে টিকতে পারত না। আসল কথা, দুই রাউণ্ডের মধ্যবর্তী ওই সামান্য অবসরে ওর স্ফীত শিরা আর আহত, ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হচ্ছে না। তাছাড়া দুর্বল শরীর নিয়েই সে শুরু করেছে লড়াই। পা দুটো ভারী ঠেকছে, শিরায় টান ধরতে শুরু করেছে। দু-মাইল পথ হেঁটে আসা ঠিক হয়নি একেবারে। তাছাড়া সেই সকাল থেকে তার মাংস খাবার দুর্নিবার বাসনাটাও মেটেনি। কসাইরা ওকে ধার দিতে রাজি হয়নি মনে পড়তেই একরাশ ঘৃণা মনে উথলে ওঠে। একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে এমন আধপেটা খেয়ে লড়াইয়ে নামা সত্যিই অসুবিধাজনক। একটুকরো মাংস আর এমন-কি ব্যাপার—

কয়েক পেনি তো দাম! কিন্তু সেটুকু জুটলেও আজ হয়ত তিরিশটা ডলার উপার্জন করতে পারত টম।

একাদশ রাউন্ডের ঘন্টা পড়তেই স্যান্ডেল তেড়ে এল। হাবভাবে যতই চাঙ্গা দেখাতে চাক না কেন আসলে কিন্তু তা নয়। টম জানে পুরোটাই ধাপ্পা। মুষ্টিযুদ্ধে মান্ধাতার আমল থেকেই এই ধাপ্পা চালু। স্যান্ডেলের আক্রমণের প্রথম দমকার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে টম ওকে প্রথমে আঁকড়ে ধরেছিল। তারপর বাঁধন আলগা করে মুক্ত করে দিল স্যান্ডেলকে। টম যা চেয়েছিল তাই ঘটল। বাঁ-হাতের ঘুষি মারার ভড়কি দিতেই স্যান্ডেল একপাশে কাত হয়ে হাত ঝাঁকিয়ে ঘুষি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আধ-পা পিছনে সরে মোক্ষম একটি ডানহাতের আপার-কাটে স্যান্ডেলকে ধরাশায়ী করে ফেলল টম। তারপর একমুহূর্তের অবসর নয়—মারের পর মার, হুক ও ড্রাইভ, হরেক রকমের মারে চুর চুর করে দেয় স্যান্ডেলকে। দড়ির উপর আছড়ে ফেলেছে এবার স্যান্ডেলকে। নিজেও আঘাত পাচ্ছে কিন্তু তার বহুগুণ বেশি আঘাত দিচ্ছে। স্যান্ডেল জড়িয়ে ধরলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, জড়িয়ে ধরার প্রয়াস পেলেই আঘাত হানছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলে নিজেই একহাতে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য হাতের ঘুষির আঘাতে দড়ির গায়ে ঠেলে দিচ্ছে। দড়ির উপর ফেলে দিতে পারলে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারবে না—আরও আঘাত করার সুযোগ মিলবে।

ইতিমধ্যে প্রেক্ষাগৃহ উন্মত্ত। প্রতিটি দর্শক টমের হয়ে চেঁচাচ্ছে—'শেষ করে দাও! ওকে শেষ করে ফেল টম্!' লড়াইয়ের অন্তিম পরিণতি আসবে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট নিয়ে, এই তো চায় বক্সিং-আসরের দর্শক।

আধঘন্টা ধরে শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে টম এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়। অকৃপণ ভাবেই সেই শক্তিকে এখন সে কাজে লাগাচ্ছে। এই তার একমাত্র সুযোগ—পারে তো এখনই পারবে। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে টমের শক্তির সঞ্চয়। পুরোপুরি ক্ষমতা হারাবার আগেই স্যান্ডেলকে একেবারে ধরাশায়ী করতে পারবে বলে আশা রাখে টম। আঘাত হেনে চলে। প্রতিটি আঘাত ঠান্ডা মাথায় হিসেব করা। কতটা শক্তি ব্যয় হচ্ছে আর কতটা ক্ষতি করতে পারছে, তারই চুলচেরা বিচার। স্যান্ডেলের মতো একজনকে নক্‌আউট করা যে কি কঠিন তা সে উপলব্ধি করছে এখন। অসামান্য সহ্য-শক্তি তার। এ হিম্মত শুধু তাজা যৌবনেরই থাকে। স্যান্ডেল মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে নাম করবেই। এইরকম কঠিন পেশীতন্তু দিয়েই তৈরি হয় সার্থক যোদ্ধাদের দেহ।

স্যান্ডেল টলমল করে কিন্তু টমেরও পায়ে খিঁচ ধরেছে, গাঁটগুলো বিদ্রোহ করছে। তবু নিজেকে শক্ত করে টম। ভয়ঙ্করভাবে ঘুষি চালায়। প্রতিবার আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে তার জীর্ণ আহত হাত দুটো অশেষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজে কোন আঘাত পাচ্ছে না, তবু স্যান্ডেলের মতোই প্রতিমুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। ঘুষি-গুলো ঠিক জায়গাতেই পড়ছে, কিন্তু ঘুষিতে আর সেই জোর নেই। ঐকান্তিক ইচ্ছা-শক্তির ফসলমাত্র। টম এখন পা ঘষড়ে ঘষড়ে নড়াচড়া করছে। দুর্বলতার লক্ষণটা চোখে পড়ামাত্র স্যান্ডেলের সমর্থকরা চিৎকার করে উৎসাহিত করতে চায় তাকে।

আবার প্রচন্ড রূপ ধরে টম। পরপর দুটো ঘুষি চালায়—বাঁ-হাতের মারটা লাগে একটু উঁচুতে, সোলার প্লেক্সাসে। ডান হাতেরটা এসে পড়ে চোয়ালের উপর। মারে তেমন জোর ছিল না কিন্তু স্যান্ডেল এত দুর্বল, এতই বিহ্বল যে সঙ্গে সঙ্গে সে কাটা ছাগলের মতো লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে শুরু করল। রেফারি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সময় গণনা শুরু করে দিল। দশ সেকেন্ড হাঁকার মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না পারলেই হার। পুরো প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উদগ্রীব নীরবতা। কম্পিত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে টম। মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। সমবেত দর্শকদের মুখগুলো সমুদ্রের

মতো দোল খাচ্ছে—কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে, আর বহুদূর থেকে যেন কানে ভেসে আসছে রেফারির সময়-গণনা—এক—দুই—

এরপরেও যৌবনই একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। স্যাণ্ডেলও উঠে দাঁড়াল। চার গোনা হতেই সে গড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে শুল। অন্ধের মতো দড়িটা ধরার জন্যে ছটফট করতে লাগল। সপ্তম সেকেণ্ডে কোনক্রমে ঘষড়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল। মাতালের মতো কাঁধের উপর মাথাটা এলোমেলো দুলছে। রেফারি 'নয়' হাঁকা মাত্র সিধে উঠে দাঁড়াল স্যাণ্ডেল। আত্মরক্ষার সঠিক ভঙ্গিতে বাঁ-হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, ডানহাতে ঢেকেছে পেট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি সুরক্ষিত করে বেতালা পা ফেলে টমের দিকে এগিয়ে এল স্যাণ্ডেল। আশা করছে টমকে জাপটে ধরে আরও খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্যাণ্ডেল উঠে দাঁড়ানোমাত্র দুবার ঘুষি চালায় টম। দুবারই কিন্তু তার আঘাত গিয়ে পড়ে স্যাণ্ডেলের ভাঁজ-করা হাতের বর্মের উপর। পরমুহূর্তেই স্যাণ্ডেল মরিয়া হয়ে পাকড়ে ধরে টমকে। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় হাত লাগায় রেফারি। টমও চেষ্টা করে মুক্তি পাবার। টম জানে যুবকেরা কত তাড়াতাড়ি সামলে উঠে। স্যাণ্ডেল যদি সামলে ওঠার সময় না পায় টমের জয় সুনিশ্চিত। একটা সোজা আঘাতই যথেষ্ট। স্যাণ্ডেলকে সে যে-প্যাঁচে ফেলেছে জয় তার অবধারিত। মুষ্টিযুদ্ধের রীতি নীতি ও কৌশল—সর্বদিক দিয়েই সে পরাস্ত করেছে স্যাণ্ডেলকে। জট খুলে যাওয়ায় স্যাণ্ডেল এবার দূরে সরে গেছে। টিকে থাকা না-থাকার এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান স্যাণ্ডেল। একটি উত্তম মারে এখুনি ওকে লুটিয়ে ফেলে খেলার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে টম। মাংস খেতে না-পাওয়ার কথাটা আবার খেয়াল হতেই তিক্ততায় ভরে ওঠে সমস্ত মনটা। মাংসটুকু পেলে হয়ত এইমুহূর্তে তার ঘুষিটা ঠিক প্রয়োজন-মতো জোরালো হতে পারত। সমস্ত স্নায়ুর শক্তি একত্র করে টম ঘুষি মারল কিন্তু তাতে না আছে জোর না আছে গতি। স্যাণ্ডেল টলে গেল কিন্তু পড়ল না। কোন রকমে সরে এসে দড়ি ধরে দাঁড়াল। টমও বেসামাল পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষের শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার ঘুষি চালাল। কিন্তু ওর দেহের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আছে শুধু লড়ে যাবার মনোভাব—তাও ম্লান ঝাপসা হয়ে এসেছে ক্লান্তিতে। যে-আঘাতটা চোয়ালের উপর পড়ার কথা সেটা কাঁধের উপর পড়ল। আরও উঁচুতে ঘুষিটা চালাতে চেয়েছিল টম, কিন্তু ক্লান্ত মাংসপেশী তার সেই আদেশ পালন করতে পারেনি। উলটে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই টলমল করে ওঠে, আরেকটু হলেই পড়ে যেত। আবার চেষ্টা করে টম। একার পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট। অপরিসীম ক্লান্তিতে স্যাণ্ডেলের গায়ের উপর আছড়ে পড়ে। স্যাণ্ডেলকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে নিজের পতন রোধ করে।

টম নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না। আর তার করার কিছু নেই। টম ফুরিয়ে গেছে। জয়লাভ করেছে যৌবন। আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকার সময়েই টম অনুভব করে স্যাণ্ডেল শক্তি ফিরে পাচ্ছে। রেফারি ওদের ছাড়িয়ে দেবার পর টম দেখে, সাক্ষাৎ-যৌবন কেমন বলীয়ান হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। প্রথমদিকে স্যাণ্ডেলের ঘুষিতে কোন জোর ছিল না, আদৌ তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু ক্রমেই জোরালো আর নির্ভুল হয়ে উঠেছে তার মারগুলো। ঝাপসা চোখে টম দেখে গ্লাভ্স্-পরা একটা হাত তার চোয়াল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হাত তুলে আঘাত বাঁচাতে চায় টম। কিন্তু মন চাইলেও দেহ পারে না। হাত তো নয়, যেন কয়েক মণ সীসে। এমনিতে উঠতে চায় না হাতটা, তাই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চায়।

গ্লাভস্-পরা হাতটা এসে পড়ল টমের চোয়ালে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার মতো একটা শুধু ঝলক—সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের ওড়না এসে ঢেকে দিল টমকে।

টম চোখ খুলে দেখল সে রিঙের ধারে নিজের জায়গায় বসে আছে। বাণ্ডির সমুদ্র-উপকূলে ঢেউয়ের গর্জনের মতো ভেসে আসছে দর্শকদের চিৎকার। স্পঞ্জে করে তার ঘাড়ে জল দেওয়া হচ্ছে। মুখ আর বুকের উপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে সিড সুলিভান তাকে চাঙ্গা করতে চাইছে। হাতের গ্লাভ্স্ দুটো আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে। স্যাণ্ডেল ওর উপর ঝুঁকে পড়ে করমর্দন করছে। টমকে আজ হারিয়ে দিয়েছে স্যাণ্ডেল কিন্তু তার জন্যে ওর প্রতি একটুও বিরূপ বোধ করে না টম। উৎফুল্লভাবেই করমর্দন করে। আঙুলের চাপে ভাঙ্গা গাঁটগুলো অত্যন্ত পীড়া দেয়। স্যাণ্ডেল এবার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তরুণ যোদ্ধা প্রণ্টোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে, আর বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে একশ ডলার করে দেয়। ম্রিয়মাণভাবে তাকিয়ে থাকে টম। সহকারীরা ওর মুখ থেকে জল মুছে মঞ্চপরিত্যাগের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ক্ষুধার্ত বোধ করে টম। অবশ্য খিদের জ্বালা নয়—একটা অবশ ভাব, জঠরের অভ্যন্তরে একটা দপদপানি যেটা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। টমের মনে পড়ে যায় লড়াইয়ের সেই বিশেষ মুহূর্তটির কথা। স্যাণ্ডেলের তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত বেসামাল অবস্থা। পরাজয়ের গহ্বরে তাকে তলিয়ে দিতে পারত টম অতি সহজেই। মাংসটুকু যদি খেতে পেত—ওই বাড়তি ক্ষমতাটুকু নিশ্চয় থাকত তার। শেষ আঘাতের পিছনে সামান্য একটু ক্ষমতার অভাবই টমের পরাজয় ডেকে এনেছে। শুধু মাংসটুকু খেতে না-পাওয়ার জন্যেই হেরে গেল টম।

দড়ির ফাঁক গলে বেরোবার সময় টমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সহ-কারীরা। তাদের সরিয়ে দিয়ে টম নিজেই মাথা নিচু করে দড়ি পেরিয়ে ভারী পায়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। সহকর্মীরা ভিড় সরাতে লাগল, আর টম তাদের পিছু-পিছু চলল। ড্রেসিং-রুম থেকে বেরিয়ে হলঘরটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে যাবে, পিছন থেকে কয়েকজন ছোকরা বলে উঠল, 'অমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে কেন?'

'বেশ করেছি,' এককথায় উত্তর সেরে সিঁড়ি টপ্‌কে রাস্তায় এসে নামল টম।

মোড়ের মাথায় পাবলিক হাউসের সুইং-ডোরটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। টম দেখল ভিতরে ঝলমল করছে আলো, হাসিমুখে মহিলারা পানীয় পরিবেশনে ব্যস্ত, আজকের লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে, বারের উপর প্রচুর মুদ্রার ঝনঝনানি। কে যেন চেঁচিয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানাল। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল টম; তারপর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে চলল।

পকেটে একটা আধলা নেই। দু-মাইল হেঁটে ফেরা সোজা কথা নয়। সত্যিই বয়স হয়ে যাচ্ছে টমের। ডোমেন্ পেরিয়ে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল টম। ভাবতেই মনটা দুমড়ে যাচ্ছে যে লড়াইয়ের ফলাফল জানবার জন্যে ওরই পথ চেয়ে ওর বউ হাঁ করে বসে আছে বাড়িতে। লড়াইয়ে নক্-আউট হওয়ার চেয়েও ঢের ভয়াবহ এখন ওর সম্মুখীন হওয়া। কি করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পায় না টম।

অত্যন্ত দুর্বল লাগে। সারা শরীর যেন জ্বলছে। হাতের ভাঙ্গা গাঁটগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় মাটি-কাটার কাজ পেলেও একসপ্তাহের আগে কোদাল বা বেলচা চালাতে পারবে না। খিদেটা যেন আগুন হয়ে জ্বলছে পেটের মধ্যে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে। নিজের এই অসহায় অবসন্ন অবস্থায় ভেঙ্গে পড়ে টম। ভিজে ওঠে দুচোখ। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে স্টাউশার বিলকে হারাবার রাতটার কথা। বেচারা স্টাউশার! এতদিনে টম বুঝতে পারছে স্টাউশার কেন সেদিন ড্রেসিং-রুমে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল।

মেক্সিকানটি

১

কেউই ওর ইতিহাস জানত না। বিপ্লবী সংগঠনের লোকেরা তো নয়ই। ওদের চোখে সে এক 'রহস্যময় দেশপ্রেমিক'। আসন্ন মেক্সিকান বিপ্লবের জন্য সে ওদের মতোই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করলেও ওরা কিন্তু ওকে সহজে মেনে নিতে চায়নি। দলের একজনও ওকে পছন্দ করত না। প্রথম যেদিন ও একঘর লোকের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সবাই ওকে গুপ্তচর ভেবেছিল। ডায়াজের গুপ্তচর-বাহিনীর কেনা গোলাম। ভাবাই স্বাভাবিক; কারণ সারা আমেরিকা জুড়ে সামরিক ও অসামরিক বিভিন্ন কারাগারে এখন আটক রয়েছে অসংখ্য কমরেড। তাছাড়া প্রতিনিয়ত আরও বহু কমরেডকেই শৃংখলিত অবস্থায় সীমান্ত পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করার জন্যে।

প্রথম দর্শনে বালকটি ওদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। বালকই বলতে হবে, কারণ বয়স তার আঠার-র বেশি নয় এবং বয়সের তুলনায় চেহারাটা তেমন বড়সড় কিছু নয়। ছেলেটি বলেছিল, তার নাম ফিলিপ রিভেরা। সে বিপ্লবের জন্যে কাজ করতে চায়। ব্যস—আর কোন বাড়তি কথা সে উচ্চারণ করেনি, কোন কৈফিয়ত পেশ করেনি। নীরবে অপেক্ষা করেছিল। তার মুখে হাসির কোন আভাস ছিল না, দৃষ্টিতেও প্রকাশ পায়নি কোন আবেদন। অমন যে ডাকাবুকো পাওলিনো ভেরা সে-ও কিন্তু অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠেছিল। ছেলেটার মধ্যে কি যেন একটা আছে। একটা অবাধ্য ভয়ঙ্কর ভাব—যার হদিস মেলাও ভার। ওর কালো চোখে যেন সাপের দৃষ্টি আর বিষ ঝরে পড়ে। নিরুত্তাপ আগুনের মতো জ্বলে চোখ দুটো। একরাশ তিক্ততার ঘনীভূত রূপ। চক্রান্তকারীদের মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলোতে বুলোতেই তার চোখ পড়েছিল মিসেস সেট্‌বির উপর। ছোটখাট মহিলাটি একমনে টাইপ করছিলেন। এক লহমার জন্যে ওর দৃষ্টি স্তব্ধ হয়েছিল মিসেস সেট্‌বির উপর। তারই মধ্যে ভদ্রমহিলা চোখ তুলে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে সেই অজানা ব্যাপারটা তাঁর কাজ থামিয়ে দেয়। ফের টাইপ শুরু করার আগে তাঁকে আবার চিঠিটা পড়ে নিতে হয়।

পাওলিনো ভেরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আরেলানো আর রামোসের দিকে তাকিয়েছিল। ওদেরও চোখে সেই একই জিজ্ঞাসা। সবাই নীরবে এ ওর দিকে চায়। অবিশ্বাস আর সন্দেহের ভাব প্রকাশ পায় তাদের দৃষ্টিতে। এই রোগা ছেলেটি তাদের কাছে অপরিচিত। একজন অপরিচিতকে আশঙ্কা করার মতো সব কারণই ওর মধ্যে রয়েছে। সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মনে হয় ছেলেটিকে। সৎ সাধারণ বিপ্লবীদের এরা ঠিক চিনতে পারে। এই বিপ্লবীরা ডায়াজ আর তার নৃশংসতাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, কারণ তারা সত্যিই সৎ ও সাধারণ দেশপ্রেমিক। ছেলেটির মধ্যে বাড়তি কিছু আছে, সেটা যে ঠিক কি তা ওরা জানে না। ওদের মধ্যে সবচেয়ে তৎপর ভেরা। ভেরাই এগিয়ে এসেছিল নীরবতা ভঙ্গ ক'রে।

'তাহলে তুমি বলছ বিপ্লবের জন্যে কাজ করতে চাও?' নিষ্প্রাণ শোনাল ভেরার কথাগুলো—'কোটটা খুলে ওই ওখানে টাঙিয়ে রাখ। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এদিকে এস—কোথায় গেল আবার ন্যাতা আর বালতিটা! বড্ড নোঙরা হয়েছে ঘরটা। ঘরটা মুছে ফেল। এ-ঘরটা হয়ে গেলে বাকিগুলোও এক এক করে সাফ করবে, তারপর পিকদানি আর জানালাগুলো তো রয়েইছে।'

'এটা কি বিপ্লবের স্বার্থে?' ছেলেটি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, বিপ্লবের স্বার্থে।' ভেরা উত্তর দিল। শীতল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকে একবার করে তাকাল রিভেরা। তারপর কোটটা খুলে নিল।

'ঠিক আছে।' রিভেরা দুটোর বেশি শব্দ উচ্চারণ করেনি।

এরপর থেকে দিনের পর দিন রিভেরা কাজে এসেছে। ঝাঁট দিয়েছে, মেঝে মুছেছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছে ঘর-দোর। উনুনের ছাই সরানো, কাঠকুটো আর কয়লা বয়ে এনে আগুন জ্বালানোও তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। পার্টির সবচেয়ে উৎসাহী কর্মীরা পর্যন্ত তাদের টেবিলে এসে বসবার আগেই কাজ সেরে রাখে সে।

'আমি কি এখানে শুতে পারি?' একদিন জিজ্ঞেস করল রিভেরা।

বা-বা—চমৎকার! এতদিনে ডায়াজের দালালের স্বরূপ ধরা পড়ল তাহলে! পার্টির বাড়িতে থাকার মানেই হচ্ছে গোপন তথ্যগুলো জেনে ফেলা। কমরেডদের নামের তালিকা আর যে-সব কমরেডরা এখন মেক্সিকোয় রয়েছে তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করা। রিভেরার আবেদন অগ্রাহ্য হল। রিভেরাও আর এই নিয়ে কোন কথা তোলেনি এরপর। ও কোথায় শোয়, কোথায় খায়, কিভাবেই-বা খায়—এ-সব কথা পার্টির কেউই জানে না। আরেলানো একবার ওর হাতে ক-টা ডলার গুঁজে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি রিভেরা। ঘাড় নেড়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভেরাও এরপর পয়সা নেবার জন্যে জোরাজুরি করলে রিভেরা বলেছে, 'আমি বিপ্লবের জন্যে কাজ করছি।'

এযুগে বিপ্লবের জন্যে অর্থেরও প্রয়োজন আছে। আর্থিক অনটন পার্টির চির-সঙ্গী। অভুক্ত অর্ধভুক্ত পার্টি-কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে। চব্বিশ ঘণ্টার দিনটাও যেন বড় ছোট মনে হয় তাদের। তবু মাঝে-মধ্যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যখন মনে হয় মাত্র ক-টা ডলারের জন্যে না বিপ্লবের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এইরকম একটা ব্যাপার প্রথম ঘটে যখন দুমাসের জন্য বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওলা ওদের উৎখাতের হুমকি দেয়। সেদিন এই বিপ্লবের ঝাড়ুদার ফিলিপ রিভেরা—গায়ে যার সবচেয়ে খেলো নোঙরা আর জরাজীর্ণ পোশাক—সেই এনে দিয়েছিল গোনাগুণতি ষাটটা আসল সোনার ডলার। মিসেস সেট্‌বির টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল। এ-রকম ঘটনা আরও আছে।, তাড়াহুড়ো করে টাইপ-করা তিনশটা চিঠি ডাকটিকিটের অভাবে পোস্ট করা যাচ্ছিল না। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব চিঠি—সাহায্যের জন্য আবেদন, সংগঠিত শ্রমিক গোষ্ঠীদের সমর্থন প্রার্থনা, দৈনিকপত্রের সম্পাদকদের কাছে একতরফা খবর না-ছাপার জন্যে অনুরোধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অহেতুক ভাবে কঠোর সাজা দেওয়ার প্রতিবাদ। ভেরার ঘড়িটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সাবেকি আমলের সোনার ঘড়িটা ও বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল। মিসেস সেট্‌বির সোনার আঙটিটাও উধাও হয়ে গেল। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। রামোস আর আরেলানো হতাশায় তাদের লম্বা লম্বা গোঁফে তা দিল। যে-কোন উপায়ে চিঠি পাঠাতে হবে, কিন্তু তা বলে ডাকঘর তো ধারে টিকিট দেবে না! এমনি যখন অবস্থা, রিভেরা একদিন টুপিটা মাথায় দিয়ে গট্‌মট্ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। তারপর ফিরে এসে দুহাজারটা দুসেন্টের টিকিট নামিয়ে রেখেছিল মিসেস সেট্‌বির টেবিলে।

'ও কি ডায়াজের নোঙরা হাত থেকেই চেয়ে আনছে ডলারগুলো?' ভেরা তার কমরেডদের কাছে সন্দেহ ব্যক্ত করেছিল।

সবাই ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। বিপ্লবের ঝাড়ুদার ফিলিপ রিভেরা এখনও প্রয়োজন পড়লেই পার্টির জন্যে সোনাদানা এনে হাজির করছে।

এরপরেও ওরা কিন্তু রিভেরাকে মেনে নিতে পারে না। ওরা ওকে চেনে না, বোঝে না। ওর হালচাল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছুতেই যেন ওর উপর আস্থা রাখা যায় না। অথচ ওকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সে সাহস কারুর নেই।

'রিভেরা বোধহয় অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। একেবারে উদাসী বলে মনে হয়। কি জানি, বুঝতে পারি না কিছু।' আরেলানোর অসহায় উক্তি।

'ও যেন মানুষই নয়।' রামোস বলে।

মে সেট্‌বি বলে, 'ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ওর মনটা। ওর দেহে ছিটেফোঁটা আলো নেই, হাসি নেই, সব জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যতই ওকে মৃত মানুষের মতো মনে হোক আসলে ও ভয়ানক ভাবে জীবন্ত।'

'নরক-যন্ত্রণা ভোগ না করলে কাউকে অমন দেখতে হয় না। অথচ কতই-বা বয়স ওর—বাচ্চা ছেলে।' ভেরা যোগ করে।

এত কথা হয়, তবু ওকে কিন্তু কেউ পছন্দ করে না। একটাও কথা বলে না রিভেরা, কোন প্রশ্ন করে না, কোন মতামত ব্যক্ত করে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শোনে। শীতল চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিটুকু বাদে অনুভূতির চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না। একটা মৃত অবয়ব। উত্তপ্ত উত্তেজিত কণ্ঠে সবাই বিপ্লবের কথা আলোচনা করে। বক্তাদের মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টি বোলায় রিভেরা। বরফের ছুরির মতো ওর দৃষ্টির আঘাত প্রত্যেককে বিচলিত করে।

'ও গুপ্তচর নয়।' মে সেট্‌বির কাছে গোপনে মনোভাব ব্যক্ত করে ভেরা। 'রিভেরা দেশপ্রেমিক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি আমি—আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক। আমি বুঝতে পেরেছি। আমার বুকের ভেতর অনুভব করেছি—অনুভব করেছি মগজ দিয়ে। তবু বলব ওকে আমি বুঝতে পারি না।'

'ভীষণ মাথা গরম।' মে সেট্‌বি বলে।

'জানি।' কথা বলতে বলতেই শিউরে ওঠে ভেড়া—'ওর ওই চোখ দুটো তুলে যখন আমার দিকে তাকায়—ভালোবাসা বলে কিছু নেই। আছে শুধু শাসানি। বুনো বাঘের বর্বর দৃষ্টি। আমি যদি বিপ্লবের কাজে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে কোনদিন দোষী সাব্যস্ত হই, আমি কিন্তু জানি ও আমাকে খুন করবে। হৃদয় বলে ওর কিছু নেই। ইস্পাতের মতো নির্দয় আর শীতল, বরফের মতো কঠিন। প্রচণ্ড শীতের রাতে নির্জন পাহাড়ের চুড়োয় কেউ যখন ঠাণ্ডায় জমে মরে, তখনও তার ওপর চাঁদের মিষ্টি আলো ঝরে। রিভেরাও ঠিক ওই চাঁদের আলোর মতো। ডায়াজ বা তার খুনেদের কাউকে আমি ভয় পাইনে। কিন্তু এই ছেলেটাকে আমি ভয় পাই। সত্যি বলছি, ওকে আমি ভয় পাই। ও যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত।'

এত কথা বলে ভেরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করায় রিভেরাকে বিশ্বাস করে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা অর্পণ করার জন্যে। লস অ্যাঞ্জেলস আর লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওদের তিনজন কমরেডকে গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাদের নিজেদেরই হাতে খোঁড়া কবরের মধ্যে। লস অ্যাঞ্জেলসে দুজন কমরেড মার্কিন কারাগারে বন্দী। সরকারী ফেডারেল বাহিনীর কমাণ্ডার জুয়ান অ্যালভারাডো একটি দানব বিশেষ, বিপ্লবীদের

প্রতিটি অভিসন্ধি সে ভেস্তে দিয়েছে। লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার সক্রিয় বিপ্লবী বা সমর্থকদের সঙ্গে সব যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে।

রিভেরাকে নির্দেশ দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রিভেরা ফিরে এল যখন ফের যোগসূত্র স্থাপন হয়েছে আর জুয়ান অ্যালভারাডো মারা গেছে। আমূল ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় পড়েছিল অ্যালভারাডো তার শয্যায়। এমন নির্দেশ কিন্তু রিভেরাকে দেওয়া হয়নি। দলের কেউ অবশ্য এই নিয়ে তাকে প্রশ্ন করেনি। সবাই শুধু বুঝদারের ভঙ্গিতে চাওয়াচাওয়ি করেছে।

'কি বলেছিলাম!' সেট্‌বিকে বলল ভেরা, 'ডায়াজ যদি কাউকে ভয় করে তো একেই করবে।'

মে সেট্‌বি আগেই বলেছিল রিভেরার রগচটা স্বভাবের কথা। এবার তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কখনও দেখা যায় রিভেরার ঠোঁটটা কেটে গেছে, কখনও গালে কালশিটে, আবার কখনও কান দুটো ফুলে থাকে। পরিস্কার বোঝা যায় যে রিভেরা তার একান্ত নিজস্ব বাইরের জগৎটায় দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বেড়ায়। তার থাকা-খাওয়া-শোওয়া সবই এই জগৎটায়। বিপ্লবীদের সম্পূর্ণ অজানা এই দুনিয়া থেকেই সে সংগ্রহ করে আনে অর্থ। কিছুদিন কাটার পর সাপ্তাহিক বিপ্লবী মুখপত্রের জন্য রিভেরা কম্পোজিটারের কাজ করতে শুরু করল। মাঝে-মধ্যে অবশ্য কাজ করার কোন উপায় থাকে না তার। কখনও আঙুলের গাঁটগুলো কেটে ছড়ে বা ফুলে থাকে, কখনও বুড়ো আঙুল দুটোর ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা, আবার কখনও ডান্ কিংবা বাঁ-হাতটা অকেজোর মতো শরীরের একপাশে নড়বড় করে। অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ পড়ে মুখে।

'বখাটে ছোঁড়া!' আরেলানো বলে।

'নোঙ্‌রা অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে।' রামোস বলে।

'তা না হয় হল, কিন্তু টাকাগুলো পায় কোত্থেকে?' ভেরা জানতে চায়। আজই শুনলাম, এই এখুনি—সাদা কাগজ কেনার বিল মিটিয়ে দিয়েছে—একশ চল্লিশ ডলার।'

'তার ওপর যখন-তখন ডুব মারে। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই বলে না।' মে সেট্‌বির মন্তব্য।

'ওর পিছনে একজন চর লাগালে হয়।' রামোস প্রস্তাব করে।

'আর যাই হোক, আমি অন্তত চর হতে রাজি নই।' সাফ কথা ভেরার। 'তাহলে বোধহয় আমাকে আর জ্যান্ত দেখার সুযোগ পাবে না তোমরা। যে প্রচন্ড তেজ ওর, স্বয়ং ভগবানও যদি পথ জুড়ে দাঁড়ায় তো সহ্য করবে না।'

'ওর সামনে দাঁড়ালে নিজেকে যেন শিশুর মতো লাগে', অকপটে স্বীকার করে রামোস।

'আমার কাছে রিভেরা মানেই শক্তি। একটা আদিম প্রাণ। ক্ষ্যাপা নেকড়ের মতো, ফণা উঁচু-করা সাপের মতো, হুল-ফোটানো বিছের মতো।' আরেলানো বলে।

'আসলে রিভেরা হচ্ছে বিপ্লবের নরমূর্তি,' ভেরা রায় দেয়। 'ও হচ্ছে বিপ্লবের শিখা—বিপ্লবের তেজ ও আদর্শ। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ও কাঁদে না, শুধু নীরবে নরবলি দেয়। ধ্বংসের দূতের মতো নিস্তব্ধ রাতের পাহারা এড়িয়ে ওর চলাফেরা।'

'ওর জন্যে আমার কান্না পায়।' মে সেট্‌বি বলে, 'কাউকে চেনে না ও। সবাইকে ঘৃণা করে। আমাদের সহ্য করে, কিন্তু সে শুধু এক পথের পথিক হিসেবে। এমন নিঃসঙ্গ—একা—' কান্নায় গলা ধরে আসে সেট্‌বির। চোখে ঝাপসা দেখে।

রিভেরার হালচাল ও হাজিরার ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। মাঝে-মধ্যে সপ্তাহ-খানেক আসেই না। একবার তো পুরো একমাস গা-ঢাকা। তবে প্রত্যেকবার ফিরে এসে

বিনা বাক্যব্যয়ে সেট্‌বির টেবিলের উপর সে ঠিক একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দেয়। কখনও আবার দিনের পর দিন পুরো সময়টাই কাটিয়ে দেয় পার্টির অফিসে। আবার কখনও কখনও দুপুরবেলাতেও উধাও হয়ে যায় রিভেরা। এরকম যখন ঘটে সে সাত সকালে এসে হাজির হয়, যায়ও অনেক রাত ক'রে। থ্যাঁতলানো আঙুল বা সদ্য-কাটা রক্ত-ঝরা ঠোঁট নিয়েও কম্পোজের কাজ করতে দেখেছে তাকে আরেলানো মাঝরাতে।

২

শক্তি-পরীক্ষার সময় নিকটতর হয়। বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে পার্টির উপর। পার্টির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। অর্থের প্রয়োজন আগের চেয়ে এখন ঢের বেশি। দেশপ্রেমিকরা তাদের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত হস্তান্তর করে এখন নিঃসম্বল। দিনমজুর আর মেক্সিকো থেকে পলাতক শ্রমিকরা তাদের অকিঞ্চিৎকর মজুরিরও অর্ধেক সমর্পণ করেছে। কিন্তু এতেও প্রয়োজন মিটছে না। রক্ত জল ক'রে, চক্রান্ত ক'রে, বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে আজ সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছনো গেছে। সময়টা অনুকূল। নিক্তির পাল্লায় দুলছে বিপ্লব। এখন প্রয়োজন আরেকটা ধাক্কা—শেষবারের মতো একটা বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস। তাহলেই সাফল্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে পাল্লাটা। মেক্সিকোকে তারা ঠিকই চেনে। একবার যদি বিপ্লব শুরু হয়ে যায়, আপনা হতেই সে-কাজ সম্পূর্ণও হবে। ডায়াজের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে। সীমান্ত-অঞ্চল অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত। একশ বিপ্লবী কর্মী সমেত একজন মার্কিন নেতা শুধু আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আদেশ এলেই সীমান্ত অতিক্রম করে লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ায় অভিযান চালাবে ওরা। কিন্তু ওদের বন্দুক চাই। আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ রয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই বন্দুকের প্রয়োজন। এদের মধ্যে সব রকমের মানুষ আছে—আছে নিছক দুঃসাহসী, ভাগ্যান্বেষী, দস্যু, অসন্তুষ্ট ইউনিয়ান কর্মী, সমাজতন্ত্রী, সন্ত্রাসবাদী, গুণ্ডা, পলাতক মেক্সিকোবাসী, পলাতক ক্রীতদাস, কোর্‌ দি অ্যালেন আর কলোরাডোর শুয়োরের খোঁয়াড়ের বাসিন্দা, চাবুক-খাওয়া খনি-শ্রমিক। এই উন্মত্ত জটিল আধুনিক দুনিয়ার যত দুরন্ত আগাছা সবাই চাইছে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। চারধার জুড়ে এখন শুধু একই রব—বন্দুক চাই—টোটা চাই—বন্দুক চাই—টোটা চাই—

মিশ্র চরিত্রের এই নিঃসম্বল ক্ষুব্ধ জনতাকে একবার সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিতে পারলেই শুরু হয়ে যাবে বিপ্লব। শুল্ক বিভাগ ও উত্তর দিকের প্রবেশ-পথের বন্দরগুলো দখল করে নেওয়া হবে। ডায়াজের পক্ষে সম্ভব নয় আক্রমণ প্রতিরোধ করা। সাহস করে তার সৈন্যবাহিনীকে সে এদিকে পাঠাতে পারবে না। যে-কোন উপায়ে সে দক্ষিণাঞ্চল রক্ষা করতে চাইবে। কিন্তু তবু বিপ্লবের আগুন দক্ষিণাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে। জনগণ বিদ্রোহ করবে। একের পর এক প্রতিটি শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। রাজ্যের পর রাজ্য নতি স্বীকার করবে। তারপর সবশেষে বিজয়ী বিপ্লববাহিনী চারধার থেকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরবে ডায়াজের শেষ দুর্গ মেক্সিকো শহরকে।

কিন্তু অর্থ কোথায়? মানুষের ঠিকানা ওরা জানে—অস্থির উদ্‌গ্রীব যে মানুষগুলো অস্ত্র চালাবে। ওরা জানে কোন্‌ কোন্‌ ব্যবসায়ী অর্থের বিনিময়ে অস্ত্র সরবরাহ করবে। ওদিকে বিপ্লব-বহ্নিকে প্রজ্বলিত করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই পার্টি-তহবিল শূন্য। শেষ ডলারটি পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে, সাহায্যকারী আর অভুক্ত দেশপ্রেমিকদের শুষে শুকনো করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু বিপ্লব এখনও সাফল্য-অসাফল্যের মাঝখানে দোদুল্যমান।

বন্দুক আর টোটা। দীন-দরিদ্র বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করতে হবে। কিন্তু কি করে? রামোস হা-হুতাশ করে তার সম্পত্তি সরকার দখল করে নিয়েছে ব'লে। যৌবনে বেহিসেবি পয়সা-ওড়ানোর কথা স্মরণ করে হাত কামড়ায় আরেলানো। মে সেট্‌বি ভাবতে চেষ্টা করে দল যদি আগে থেকেই আরও হিসেব করে চলত কোন লাভ হত কিনা।

'ভাবতেই কেমন লাগে যে নগণ্য কয়েক হাজার ডলার যোগাড় করতে না পারার জন্যে হয়ত মেক্সিকো স্বাধীন হতে পারবে না।' পাউলিনো ভেরা বলেছিল।

প্রত্যেকের চোখে-মুখে এখন শুধু হতাশা। এখুনি খবর এসেছে ওদের শেষ আশা জোসে আমারিলো নিহত হয়েছে। চিহুয়াহুয়ায় তার খামার-সংলগ্ন খোঁয়াড়ের দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সম্প্রতি ওদের দলে যোগ দিয়েছিল জোসে। অর্থসাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যে করেই হোক এই খবরটা নিশ্চয় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

রিভেরা ঘর মুছতে মুছতেই হাঁটু গেড়ে বসে চোখ তুলে তাকায়। বুরুশটা উঁচু করে রেখেছে। সাবান-গোলা নোংরা জল হাতে লেগেছে।

'পাঁচ হাজারে কাজ হবে?' প্রশ্ন করল রিভেরা।

সবাই বিস্মিত হয়ে তাকায়। ভেরা ঢোক গিলে ঘাড় নাড়ে। মুখ দিয়ে তার কথা সরে না, কিন্তু রিভেরার উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করে না।

'বন্দুকের অর্ডার দিয়ে দিন।' রিভেরা আবার মুখ খোলে—'সময় অল্প। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি পাঁচ হাজার যোগাড় করে আনব। ভালোই হবে, ততদিনে একটু গরম পড়ে যাবে। তাছাড়া আমারও আর করার কিছু নেই।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলার মতো পাপকার্য রিভেরা এ অবধি কোনদিন করেনি।

ভেরা চায় না তার মনে এতটুকু আশা সঞ্চারিত হোক। অবিশ্বাস্য প্রস্তাব! বিপ্লবের কাজে যোগ দেবার পর থেকেই সে বারবার স্বপ্ন দেখেছে আর বারবার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে অতি-প্রিয় স্বপ্নগুলো। বিপ্লবের এই অতি-দরিদ্র ঝাড়ুদারকে সে বিশ্বাস করেও করতে চায় না।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!' ভেরা বলল রিভেরাকে।

'বলছি তো তিন সপ্তাহ লাগবে। বন্দুকের অর্ডার দিয়ে দিন।' বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল রিভেরা। জামার আস্তিন খুলে কোটটা চাড়িয়ে নিল। 'বন্দুকের অর্ডার দিয়ে রাখুন। আমি এখন বেরোচ্ছি।'

৩

অনেক ছোটাছুটি দৌড়োদৌড়ি টেলিফোনের পর কেলির অফিস রাত্তিরবেলা সরগরম হয়ে উঠেছে। ব্যবসা নিয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে কেলি। সময়টা তার ভালো যাচ্ছে না। নিউইয়র্ক থেকে ড্যানি ওয়ার্ডকে নিয়ে এসেছে কেলি, বিলি কার্থির সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে নামাবে বলে। তিন সপ্তাহ বাদেই লড়াই, ওদিকে কার্থি গুরুতর ভাবে আহত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। অবশ্য ক্রীড়া-সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবরটা সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। এমন একটা লোক নেই যে কার্থির বদলে লড়তে পারে। কেলি টেলিফোনের লাইন প্রায় পুড়িয়ে ফেলেছে পূর্বাঞ্চল থেকে যে-কোন একজন ভাল লাইট ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধাকে আনবার ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসে আছে, ওই দিন সময়

দিতে পারবে না। অতি ক্ষীণ হলেও এতক্ষণে আশার একটা আলো দেখতে পেয়েছে কেলি।

'তোমার বুকের পাটা আছে বলতে হবে।' রিভেরাকে এক পলক দেখেই মন্তব্য করল কেলি।

দুচোখ-ভরা তীব্র ঘৃণা রিভেরার, কিন্তু মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই।

'ওয়ার্ডকে আমি কাত্ করে দেব।'

'কি করে জানলে? ওয়ার্ডের লড়াই দেখেছ?'

রিভেরা ঘাড় নেড়ে জানাল দেখেনি।

'ও দুচোখ বন্ধ করে শুধু এক হাতের ঘুষিতেই তোমায় শেষ করে দেবে।'

রিভেরা তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকায়।

'কথা বলছ না কেন?' মুষ্টিযুদ্ধ-ব্যবস্থাপক দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

'আমি ওকে কাত্ করে দেব।'

'কার কার সঙ্গে লড়েছ বল দেখি?' জানতে চাইল মাইকেল কেলি। মাইকেল ব্যবস্থাপকের ভাই। ইয়েলোস্টোন পুলরুমে বক্সিংয়ের আসর বসিয়ে বেশ ভালোই রোজগার করে সে।

রিভেরা তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্নের উত্তর দিল।

পাক্কা খেলোয়াড়দের মতো দেখতে ব্যবস্থাপকের তরুণ সেক্রেটারি অবজ্ঞাভরে হুঃ করে উঠল।

'যাই হোক রবার্টকে তো তুমি চেন।' অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে কেলি বলল। 'ওকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে। ততক্ষণ তুমি বসো। তবে তোমার চেহারা দেখে কোন সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আজেবাজে সাজানো লড়াই দিয়ে দর্শকদের ভোলানো যাবে না। জান তো, রিংয়ের ধারের চেয়ারের টিকিট পনের ডলার করে বিক্রি হচ্ছে।'

রবার্ট ঢুকতেই বোঝা গেল সে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করে এসেছে। লম্বা রোগা মানুষ রবার্ট—কেমন শিথিল ভঙ্গি। এমন কি কথাও বলে টেনে টেনে অবসন্নভাবে।

সোজা কাজের কথা পাড়ল কেলি।

'দেখ রবার্ট, তুমি তো খুব বড়াই করছিলে যে এই খুদে মেক্সিকানটি তোমার আবিষ্কার। ওদিকে কার্থি তো হাত ভেঙে বসে আছে। তা এই খুদে ছোকরা তো আজ সিধে আমার কাছে এসে প্রায় দাবি জানাচ্ছে যে কার্থির জায়গায় তাকে লড়তে দিতে হবে। তুমি কি বল?'

'কোন অসুবিধে নেই।' ধীরে ধীরে বলল রবার্ট। 'ভালোই লড়বে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এখনি বলবে যে ওয়ার্ডকে ও কাত্ করে দিতে পারে।' কেলি খিঁচিয়ে উঠল।

রবার্ট বেশ ভেবেচিন্তে এবার জবাব দিল. 'না, তা বলব না। ওয়ার্ড প্রথমশ্রেণীর রিংয়ের মাস্টার। তা বলে রিভেরাকে ও সহজে কাবু করতে পারবে না। রিভেরাকে তো আমি চিনি। আজ অবধি আমি ওর কোন দুর্বলতা খুঁজে পাইনি। তাছাড়া ওর দুহাতই সমান চলে। যে-কোন জায়গা থেকে ও ঘুম-পাড়ানি মার ঝাড়তে পারে।'

'অত কথা জানতে চাই না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে খেলা জমাবার মতো লড়তে পারবে তো? তুমি তো আজীবন খেলোয়াড় তৈরি করে গেলে। তোমার রায়ের উপর আমার পুরো আস্থা আছে। টিকিটের দাম উসুল হয়ে গেছে বলবে তো দর্শকরা?'

'নিশ্চয়। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডকে ও রীতিমতো বেগ দেবে। তুমি ওকে চেন না। আমিই ওকে আবিষ্কার করেছি। ও বলির পাঁঠা নয়—একটি মূর্তিমান দানব।

ঘূর্ণিঝড়ও বলতে পার। ওয়ার্ডকে রীতিমতো ঘাবড়ে দেবে—দর্শকরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে ওর কীর্তি দেখে। বলছি না ওয়ার্ডকে একেবারে হারিয়ে ছাড়বে, কিন্তু ওর লড়াই দেখেই সবাই বুঝতে পারবে এই স্থানীয় অখ্যাত ছেলেটি উঠ্‌তি যোদ্ধা।'

'বেশ—তোমার কথাই মানলাম।' কেলি তার সেক্রেটারির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ওয়ার্ডকে ফোন কর। ওকে বলেই রেখেছি যে তেমন কারুর খোঁজ পেলে ডাক পাঠাব। ইয়েলোস্টোনেই পাবে। ওখানে এখন ও কেরামতি দেখাচ্ছে।'

রবার্টের দিকে তাকিয়ে কেলি বলল, 'এস—একটু পান করা যাক?'

রবার্ট সোডা-হুইস্কির গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে রিভেরার গল্প শুরু করল।

'একে কি করে আবিষ্কার করেছিলাম সে-কথা তো এখনও বলিইনি। বছর কয়েক আগে সেদিন আমি আখড়ায় প্রেনিকে তালিম দিচ্ছিলাম ডিলানির সঙ্গে লড়াইয়ের আগে তৈরি করার জন্যে। প্রেনি একটি আস্ত শয়তান। ওর শরীরে দয়ামায়া বলে কোন বস্তু নেই। যারাই ওর সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে আসত তাদের একেবারে মেরে-ধরে শেষ করে দিত। ফলে এমন কাউকেই পাচ্ছিলাম না যে স্বেচ্ছায় ওর সহকারী হবে। এই বাচ্চা মেক্সিকান ছেলেটাকে কদিনই ঘুরঘুর করতে দেখছিলাম আশেপাশে। মরিয়া হয়ে ভুখা বাচ্চাটাকেই ধরলাম। দুহাতে গ্লাভ্‌স দুটো একরকম হ্যাঁচকা টানে পরিয়ে দিলাম। কাঁচা চামড়াকে তবু টেনে ছেঁড়া যায় কিন্তু রিভেরাকে নয়। তবু তো না খেয়ে-খেয়ে ওর তখন শোচনীয় অবস্থা। একেবারে দুর্বল শরীর। বক্সিংয়েরও অ-আ জানত না। প্রেনি ওকে একেবারে কিলিয়ে শেষ করে দিল। তবু দুরাউন্ড টিকেছিল। সে চোখে দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। কিচ্ছু না, শুধু খেতে পেত না বলেই এটা ঘটেছিল। এমন মার খেয়েছিল যে দেখে চেনা যাচ্ছিল না। আমি ওকে আধ ডলার দিয়েছিলাম আর পেট পুরে খাইয়েছিলাম। ওর গোগ্রাসে খাওয়াটাও দেখবার মতো। কয়েক দিন বোধহয় পেটে কিছুই পড়েনি। ভেবেছিলাম এরপর আর ব্যাটা ধারে-কাছে ভিড়বে না। কিন্তু পরের দিনই দেখি আবার এসে হাজির হয়েছে। আধ ডলার আর পেট-পুরে খাওয়ার এমনই আকর্ষণ। এমনিভাবে একটা করে দিন পেরোতে লাগল আর রিভেরার দক্ষতাও বেড়ে চলল। রিভেরা জন্মগত মুষ্টিযোদ্ধা, আর ওর সহ্যশক্তি অসীম। হৃদয় বলে কোন বস্তু নেই। একটা বরফের চাঁই। আজ অবধি ওকে কখনও আমি একসঙ্গে এগারটার বেশি শব্দ উচ্চারণ করতে শুনিনি। নিজের কাজটুকু ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।'

'হ্যাঁ—আমি ওর লড়াই দেখেছি।' সেক্রেটারি ছেলেটি বলল। 'আপনার হয়ে অনেক জায়গায় লড়েছে।'

'দ্বিতীয় সারির সবাই ওর সঙ্গে লড়েছে,' রবার্ট বলল। 'ওদের কাছ থেকে লড়াইয়ের কায়দাগুলো ও আস্তে আস্তে রপ্ত করে নিয়েছে। অনেককেই হারিয়েছে। কিন্তু লড়াইয়ে ওর মন ছিল না। আমি ভাবতাম লড়াইয়ের ব্যাপারটাই ও পছন্দ করে না। হাবভাব দেখে তাই মনে হত।'

'গত ক-মাসে ছোট ছোট ক্লাবগুলোয় বেশ কিছু লড়াইয়ে নেমেছে।' কেলি বলল।

'হ্যাঁ। কি যে হয়েছে ওর বলা শক্ত। হঠাৎ যেন লড়াইয়ে মন লেগে গেছে। আগুনের লকলকে শিখার মতো হঠাৎ ছুটে এসে যে কটা স্থানীয় মুষ্টিযোদ্ধা ছিল সবাইকে খতম করে দিয়েছে। টাকাপয়সার প্রয়োজন পড়েছে মনে হয়। কিছু টাকা কামিয়েছে, কিন্তু জামাকাপড়ের ছিরি দেখে বোঝার উপায় নেই। অদ্ভুত ছেলে! কি যে করে কেউ জানে না। কেউ জানে না কোথায় থাকে—কি করে সময় কাটায়। লড়াইয়ের সময়ে হঠাৎ যেমন উদয় হয়, আবার সেদিনের মতো কাজ ফুরোলেই হাওয়া। আবার কখনও কখনও একেবারে কয়েক সপ্তাহ নিপাত্তা হয়ে যায়। কারুর উপদেশ কানে

নেয় না। যদি কেউ ওর ম্যানেজারের কাজ নিতে পারত তার ভাগ্যই ফিরে যেত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রিভেরা কোন পাত্তাই দেয় না। হ্যাঁ—আরেকটা কথা। পাওনা-কড়ির কথা উঠলেই দেখবে শুধু নগদ টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না ও।'

এমন সময়ে পারিষদবর্গকে সঙ্গে করে ড্যানি ওয়ার্ড এসে ঢুকল। ওর ম্যানেজার আর প্রশিক্ষকও এসেছে। ভদ্রতার, অমায়িক ব্যবহারের আর বিশ্বজয়ী ক্ষমতার সুগন্ধ-ভরা একঝলক হাওয়া ছড়িয়ে দিল। শুভেচ্ছার বন্যা, কারুর সঙ্গে ঠাট্টা, কারুর কথার চোখা প্রত্যুত্তর আর সবার জন্যেই মুখভরা হাসি। এটা কিন্তু ওর রপ্তকরা একটা কায়দা—সম্পূর্ণ আন্তরিক নয়। ড্যানি একজন ভালো অভিনেতা। সে জানে এ জগতে চলার পথে ভদ্রতা একটা বড় সম্বল। ভদ্রতার মুখোশের তলায় তার স্বরূপটা কিন্তু ভিন্ন। ড্যানি একজন অতি বিচক্ষণ, চতুর মুষ্টিযোদ্ধা আর হিসেবি ব্যবসায়ী। ওকে যারা চেনে বা ওর সঙ্গে যাদের কারবার, সবাই বলে প্রয়োজন পড়লে মুহূর্তের মধ্যে সত্যিকারের ড্যানি আত্মপ্রকাশ করে। সমস্ত ব্যবসায়িক আলোচনার সময়েই ড্যানি উপস্থিত থাকে। অনেকে তো বলে ড্যানির ম্যানেজার আসলে ওর লাউডস্পিকার ছাড়া আর-কিছুই নয়।

রিভেরার প্রকৃতি একেবারেই ভিন্নরকম। তার ধমনীতে বইছে রেড ইন্ডিয়ান ও স্প্যানিশ রক্ত। এককোণে মুখ বুজে বসে আছে। শুধু কালো চোখ দুটো প্রত্যেকের মুখে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না।

'এই তাহলে সে!' ড্যানি বলল। প্রস্তাবিত প্রতিপক্ষের উপর নজর বুলিয়ে যাচাই করে নেয়। 'এই যে বাহাদুর ছোকরা! কেমন আছ!'

রিভেরার চোখ দুটো যেন বিষ বর্ষণ করে। মুখে কোন কথা নেই। গ্রিঙ্গো মাত্রেই ও অপছন্দ করে, কিন্তু ড্যানির প্রতি এই যে তীব্র ঘৃণা এটা কিন্তু ওর স্বভাব-বহির্ভূত।

'যাঃ বাব্বা'! ব্যবস্থাপকের দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করে বলল ড্যানি। 'তুমি কি বোবা-কালার সঙ্গে আমায় লড়তে বলছ?' হাসির লহরা থামলে ড্যানি আবার খোঁচা মারল, 'দেখলেই বোঝা যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলসের অবস্থা কাহিল। তা না হলে আর এই মালটিকে ছাড়া কিছু জোটাতে পারলে না! কোন্ কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে এটিকে ধরে আনলে?'

'দেখে যাই মনে হোক, ও কিন্তু ভালো লড়ে, ড্যানি।' রবার্ট এগিয়ে আসে রিভেরার সমর্থনে।

'তাছাড়া অর্ধেক টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।' কেলির কণ্ঠে অনুরোধের সুর। 'তুমি আর আপত্তি করো না, ড্যানি। এছাড়া আমাদের আর করার কিছু নেই।'

ড্যানি আবার তাচ্ছিল্যভরে রিভেরার দিকে একবার তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তার মানে খুব সামলে-সুমলে লড়তে হবে, এই তো? অবশ্য আপনা থেকে যদি পটল তোলে তো করার কিছু নেই।'

রবার্ট বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে।

'না ড্যানি, সাবধানের মার নেই।' ড্যানির ম্যানেজার তাকে সতর্ক করে দেয়। কিছু বলা যায় না, সুযোগ দিলে হয়ত ফট্ করে একটা কষিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে—ঠিক আছে—সাবধানই হব।' ড্যানি হাসে। 'প্রথমেই দু-ঘা কষিয়ে দেব, তারপর দর্শকদের খাতিরে সেবাশুশ্রূষা করে যাব। পনের রাউন্ড অবধি চালালেই কাজ হবে তো, কেলি? তারপর কিন্তু ওর বিচালির শয্যার ব্যবস্থা পাকা।'

'ব্যস-ব্যস তাহলেই হল! তবে দেখ, কেউ যেন ধরতে না পারে।' কেলি বলল।

'তাহলে এবার ব্যবসার কথাটা হয়ে যাক!' ড্যানি একটু থেমে মনে মনে হিসেব করে নেয়। 'টিকিট বিক্রির শতকরা পঁয়ষট্টি তো নিশ্চয়। যেমন কথা ছিল কার্থির সঙ্গে।

কিন্তু ভাগাভাগিটা অন্যরকম হবে। শতকরা আশি আমি নেব।' এবার ম্যানেজারের দিকে ফিরে ড্যানি বলল, 'ঠিক বলেছি তো?'

'এই যে—শুনলে তো সব কথা?' রিভেরাকে জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

রিভেরা ঘাড় নাড়ে। ব্যাপারটা আবার বুঝিয়ে বলে কেলি। 'টিকিট বিক্রির পঁয়ষট্টি শতাংশ তোমাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। তুমি তো ফালতু—কেউ চেনেও না। কাজেই এই টাকাটার আশি শতাংশ পাবে ড্যানি আর বাকিটা তুমি। তুমিই বল রবার্ট। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?'

'হ্যাঁ রিভেরা, তোমার আপত্তি করার কোন কারণ নেই। বুঝতেই পারছ এখনও তোমার নাম হয়নি।' রবার্ট বোঝাতে চায়।

'টিকিট-বিক্রির পঁয়ষট্টি শতাংশ মানে কত?' রিভেরা জানতে চাইল।

'পাঁচ হাজার—খুব বেশি হলে আট হাজারও হতে পারে।' মাঝখান থেকে বলে উঠল ড্যানি। 'তোমার ভাগে হাজার বা ষোলশ পড়বে। আমার মতো নামকরা একজনের কাছে মার খাবার জন্যে এতগুলো ডলার—ভালোই বল?'

'না—যে জিতবে পুরোটাই তার।' খুব জোর দিয়ে বলল রিভেরা। রিভেরার কথা শুনে ওদের ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।

কারুর মুখে আর কথা নেই। ড্যানির ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল, 'আহা—কি কথা! বাচ্চা ছেলে উপহার দেবে আমাদের।' কিন্তু ড্যানি অসম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে। 'আজকে থেকে আমি লড়াই শুরু করছি না।' বোঝাতে শুরু করল ড্যানি। 'রেফারি বা এই কোম্পানি সম্বন্ধেও কোন বাজে ধারণা নেই। মাঝে-মধ্যে যে সাজানো ব্যাপারগুলো ঘটে তাও ধরছি না। তবু বলব, আমার মতো বক্সারের কাছে এটা মোটে ভালো ঠেকছে না। আমি কখনও অযথা ঝুঁকি নিই না। কিছু কি বলা যায়, হয়ত হাতটা ভেঙে গেল বা কোন বদমাইশ লুকিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিল, তখন?' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে লাগল ড্যানি।—'জিতি বা হারি ওই আশি আর কুড়ি হিসেবেই ভাগাভাগি হবে। তুমি কি বল হে, মেক্সিকান?'

রিভেরা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

ড্যানি একেবারে ফেটে পড়ল। এতক্ষণে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে।

'হারামজাদা বদমাইশ! নোঙরামি করতে এসেছিস তো! ইচ্ছে করছে এখুনি তোর খুলিটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিই।'

রবার্ট নীরবে উঠে এসে দাঁড়াল বিবদমান দুপক্ষের মাঝখানে।

'যে জিতবে সেই সব পাবে।' বেজার মুখে বলল রিভেরা।

'তোমার এই গোঁয়ার্তুমির কারণটা কি?' ড্যানি জিজ্ঞেস করল।

'কারণ আমি তোমাকে খতম করতে পারি।

ড্যানি প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছিল কোটটা খুলবে ব'লে। কিন্তু ওর ম্যানেজার জানে এটা লোক-দেখানো ভড়কি। কোটটা আর গা থেকে খোলা হল না, তার আগেই সবাই মিলে ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করল। সবাই ড্যানির পক্ষে। রিভেরা শুধু একা দাঁড়িয়ে।

'তুমি একটা আস্ত নির্বোধ!' কেলি এবার বোঝাবার ভার নিল। 'কে তুমি! কে চেনে তোমায়! জানি, গত কয়েক মাস ধরে এই এলাকার বক্সারদের তুমি একে একে হারিয়েছ, কিন্তু ড্যানি হচ্ছে জাত-লড়িয়ে। এই লড়াইয়ের পরই ও চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইয়ে নামবে। কিন্তু তুমি একেবারেই অপরিচিত। লস অ্যাঞ্জেলসের বাইরে কেউ তোমার নাম শোনেনি।'

'শুনবে।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে রিভেরা বলল, 'এই লড়াইয়ের পরেই সবাই শুনবে।'

'তুই কি সত্যিই ভাবিস আমাকে হারাতে পারবি?' ড্যানি ফুঁসে উঠল।

রিভেরা নীরবে ঘাড় নেড়ে জানাল সে পারবে।

'শোন—শোন, অযৌক্তিক কথা বলো না।' কেলি অনুরোধ করে। 'তাছাড়া তোমার নামটা কত প্রচার হবে ভেবে দেখ।'

'আমি টাকা চাই।'

'হাজার বছর চেষ্টা করলেও আমাকে হারাতে পারবি না।' ড্যানি ওকে যেন আশ্বস্ত করতে চায়।

'তাহলে আর তোমার আপত্তির কারণ কি?' পালটা প্রশ্ন করল রিভেরা। 'জেতা যদি এতই সোজা, পুরো টাকাটা পাবার ব্যবস্থা না করার কারণটা কি?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুবই সোজা। তাই করব—পুরো টাকাটাই নেব!' হঠাৎ মনঃস্থির করে চেঁচিয়ে ওঠে ড্যানি। 'ওই রিঙের মধ্যেই তোকে পিটিয়ে খুন করে ফেলে দেব। শুধু-শুধু হাঙ্গামা বাধাবার এই সাজা। কেলি, চুক্তিপত্র তৈরি কর। যে জিতবে সে-ই পুরো টাকা পাবে। খেলার পাতায় খবরটা দিয়ে দিও। প্রেস্টিজের লড়াই বলে ঘোষণা করো। এই ছোঁড়াটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

কেলির সেক্রেটারি লিখতে শুরু করেছিল। হঠাৎ ড্যানি বাধা দিল।

'দাঁড়াও!' রিভেরার দিকে তাকাল ড্যানি। 'ওজন?'

'রিংয়ের ধারে।' রিভেরা উত্তর দিল।

'আজ্ঞে না। বিজয়ী যদি সব পায় তাহলে সকাল দশটায় ওজন হবে।'

'তা হলেই বিজয়ী সবটা পাবে?' রিভেরা প্রশ্ন করল।

ড্যানি ঘাড় নাড়ল। আর চিন্তার কিছু নেই। পুরো ক্ষমতাসমেত লড়াইয়ের আসরে নামবে সে।

'ঠিক আছে, সকাল দশটায় ওজন।' রিভেরা বলল। সেক্রেটারি লিখে নিল।

'তার মানেই কিন্তু পাঁচ পাউন্ড।' রবার্ট সতর্ক করল রিভেরাকে। 'তুমি বোকামি করলে কিন্তু, হারবার ব্যবস্থা পাকা করে দিলে নিজেই। ষাঁড়ের মতো ক্ষমতা নিয়ে রিংয়ে ঢুকবে ড্যানি। এরপর আর তোমার কোন আশাই রইল না জেতবার।'

উত্তরের বদলে রিভেরার চোখে শুধু সুস্পষ্ট ঘৃণা ফুটে উঠল। এই গ্রিঙ্গোকে সে ঘৃণা করে—যদিও তার জাতের মধ্যে সে-ই সেরা সাদা-চামড়ার লোক।

৪

প্রায় সবার অলক্ষ্যে রিংয়ের মধ্যে ঢুকল রিভেরা। গুটিকয়েক দর্শক শুধু এদিক-ওদিক থেকে নিষ্প্রাণভাবে হাততালি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। কারুরই বিন্দুমাত্র আস্থা নেই রিভেরার উপর। রিভেরা ওদের চোখে বলির পাঁঠা আর গুরুদেব ড্যানি তার ঘাতক। তাছাড়া দর্শকরা হতাশও হয়েছে। ড্যানি ওয়ার্ড আর বিলি কার্থির ক্ষিপ্র যুদ্ধ দেখবে আশা করেছিল সবাই। এখন দুধের সাধ মেটাতে হবে ঘোলে। এই ছোঁড়াটা আর কি করবে! ব্যাপারটা ওদের আদৌ পছন্দ হয়নি। তারা ড্যানির হয়ে টু-টু-ওয়ান, এমন কি থ্রি-টু-ওয়ান হিসেবে বাজি ধরছে। আর দর্শকরা যার হয়ে বাজি ধরে তাকেই মনেপ্রাণে সমর্থন করে।

মেক্সিকান ছেলেটি তার নিজের কোণে বসে অপেক্ষা করছে। সুদীর্ঘ মিনিটগুলো যেন আর পেরোতে চায় না; ড্যানি ইচ্ছে করে দেরি করছে। এই কায়দাটা পুরোনো

হলেও তরুণ যোদ্ধাদের কিন্তু আজও অসুবিধায় ফেলে দেয়। এভাবে বসে থাকা মানেই নিজের মনের আশঙ্কা আর বোকা তামাক-খেকো দর্শকদের মুখোমুখি হওয়া। এতে ভয়টা তাদের মনে জাঁকিয়ে বসে। কিন্তু এই প্রথম কায়দাটা বিফল হল। ঠিকই বলেছিল রবার্ট, রিভেরার শরীরে ভয় বলে বস্তুটিই নেই। এত অনুভূতিপ্রবণ আর আবেগদীপ্ত রিভেরা, কিন্তু ভীতিসঞ্চারী স্নায়ুগুলোই যেন তার দেহে অনুপস্থিত।' তার নিজের সহকারীরা পর্যন্ত আসন্ন পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে আবহাওয়াকে গুমট করে তুলেছে, কিন্তু তবু কোন বিকার নেই রিভেরার। কয়েকজন গ্রিঙ্গো আর অপরিচিত লোক রিভেরাকে সাহায্য করছে। এরা মুষ্টিযুদ্ধের দুনিয়ার নোঙ্‌রা তলানি—গৌরবহীন, যোগ্যতাহীন। তাছাড়া তারা পরাজিতের দলে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তাদের।

'খুব সাবধান কিন্তু—' স্পাইডার হ্যাগার্টি সতর্ক করে দেয়। ও রিভেরার দ্বিতীয় সহকারী। 'যতক্ষণ পার লড়াই চালিয়ে যেও। কেলি আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। তা না হলে খবরের কাগজে সাজানো লড়াই বলে খবর ছেপে দেবে। মুষ্টিযুদ্ধের খেলার আরও দুর্নাম রটবে লস অ্যাঞ্জেলসের।'

কথাগুলো নিশ্চয় উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কিন্তু রিভেরা কোন কান দেয় না। পয়সার জন্যে লড়াই করাকে রিভেরা ঘৃণা করে। ঘৃণিত গ্রিঙ্গোদের ঘৃণিত খেলা। হাঁড়িকাঠে যেমন ছাগল মাথা দেয়, ঠিক তেমনিভাবে ওদের প্রশিক্ষণের আখড়ায় শুধু মার খাবার জন্যেই ঢুকেছিল রিভেরা। শুধু দুমুঠো অন্নের প্রয়োজনে। মুষ্টিযুদ্ধে এক অসাধারণ ও জন্মগত নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েও মুষ্টিযুদ্ধকে সে ঘৃণা করে। পার্টিতে যোগ দেবার আগে পয়সার জন্যে সে কোনদিন লড়তে নামেনি, কিন্তু তবু লড়তে নেমে পয়সা সে অত্যন্ত সহজেই উপার্জন করেছে। মানুষের মধ্যে রিভেরাই অবশ্য প্রথম নয় যে অবাঞ্ছিত পেশায় সাফল্য অর্জন করেছে।

কোন বিশ্লেষণের মধ্যে যাচ্ছে না রিভেরা। সে শুধু জানে এই লড়াইটা তাকে জিততে হবে। অন্যথা হলে চলবে না। রিভেরার এই দৃঢ় বিশ্বাসের পিছনে যে প্রচণ্ড শক্তিগুলো কাজ করছে, দর্শকেরা তার খবর রাখে না। ড্যানি ওয়ার্ড লড়ছে পয়সার জন্যে—সেই পয়সার বিনিময়ে সহজ সুখের জন্যে। কিন্তু রিভেরার লড়াইয়ের কারণ-গুলো তার মগজের মধ্যে জ্বলছে—কতকগুলো ভয়ংকর আর জ্বলন্ত চিত্র। রিংয়ের কোণে একা বসে বসে সুচতুর প্রতিপক্ষের দিকে সজাগ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে, আর বাস্তব জীবনের মুহূর্তগুলোর মতোই সত্য হয়ে উঠছে মানসপটের চিত্রগুলো।

রিও ব্ল্যাঙ্কোর সাদা পাঁচিল-ঘেরা জলশক্তি-চালিত কারখানাগুলো দেখতে পায় রিভেরা। দেখতে পায় অনাহারে ক্ষীণদেহ ছ-হাজার শ্রমিক আর সাত-আট বছর বয়সের অসংখ্য শিশুকে। সারাদিন ধরে খেটে মরছে দশ সেন্ট দৈনিক মজুরির জন্যে। দেখতে পায় ঠেলাগাড়িতে করে লাশ বওয়া হচ্ছে। দেখতে পায় রঙ-ঘরের শ্রমিকদের মৃত্যু-চিহ্নিত বীভৎস মাথাগুলো। মনে পড়ে যায় বাবা বলেছিলেন, 'রঙ-ঘর মানেই আত্ম-হত্যার জায়গা।'—একবছর কাজ করা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। ছোট্ট সেই ঘরখানার ছবি ভেসে আসে চোখের সামনে—মা রান্না করছে, ভাঙ্গাচোরা সংসার ঠেলতে হিমশিম খাচ্ছে, আর তারই মধ্যে ঠিক সময় করে রিভেরাকে আদর করছে, ভালোবাসছে। বাবাকেও দেখতে পায় রিভেরা। বিরাট চেহারা, বিশাল গোঁফ, পেশীবহুল বক্ষ, সবার জন্যে বুকভরা ভালোবাসা। হৃদয়টা তাঁর এত বড় যে সবাইকে ভালোবাসার পরেও মায়ের জন্যে, আর ঘরের কোণে যে শিশুটি খেলা করত তার জন্যে ভালোবাসা তার উপচে পড়ত। তখনও ওর ফিলিপ রিভেরা নামকরণ হয়নি। বাবা-মার নাম অনুযায়ী নাম ছিল ফার্নাণ্ডেজ। সবাই জুয়ান বলে ডাকত। পরে ও নিজেই নামটা পালটে নিয়েছে। পুলিশের কর্তা-ব্যক্তিরা ফার্নাণ্ডেজ নামটাকে ঘৃণা করে।

জোয়াকুইন ফার্নান্ডেজ! বিশাল দেহ, অনন্ত ভালোবাসা। তখন বোঝেনি রিভেরা, কিন্তু আজ পিছন দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারছে। রিভেরা দেখতে পায়, তার বাবা ছোট্ট ছাপাখানাটায় বসে টাইপ বসাচ্ছে। আগোছালো টেবিলটার সামনে বসে একনাগাড়ে দ্রুত লিখে যাচ্ছে কি-সব হিজিবিজি। সেই সব অদ্ভুত সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়ে যায়। অন্ধকারে গোপনে চোরের মতো আসত মজুররা বাবার সঙ্গে দেখা করতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা বলত। রিভেরা তখন তার বিছানায় শুয়ে থাকলেও সবসময় ঘুমিয়ে থাকত না।

স্পাইডার হ্যাগার্টির কথাগুলো যেন কোন্ সুদূর থেকে তার কানে ভেসে আসে, ‘প্রথমেই সরে দাঁড়ানো চলবে না। কেলি বলে দিয়েছেন। ভালমতো মার খাও, তবে পয়সা।’

দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এখনো নিজের জায়গায় বসে আছে রিভেরা, কিন্তু ড্যানির পাত্তা নেই। চালবাজিরও একটা সীমা আছে!

রিভেরার মানসচক্ষে আরও অনেক স্মৃতি ছবির মতো ধরা পড়ে। সেই ধর্মঘট—ধর্মঘট না বলে লক্-আউট বলাই ভালো, কারণ রিওব্যাঙ্কোর শ্রমিকরা তখন পুয়েব্লোর ধর্মঘটী ভাইদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। খিদের জ্বালা, পাহাড় চষে বুনো বেরি ও গাছ-গাছড়ার শেকড়-বাকড় যোগাড় করে পেট ভরানো, আর তারপর সবার পেট কামড়ানি আর অসহ্য যন্ত্রণা! তারপর সেই দুঃস্বপ্নের রাত—গুদামঘরের সামনে ফাঁকা মাঠ, হাজার হাজার ভুখা শ্রমিক, জেনারেল রোজালিও মার্টিনেজ ও পরফিরিও ডায়াজের সৈন্যবাহিনী, মৃত্যুবর্ষী রাইফেলের নিরন্তর গর্জন। শ্রমিকদের তাজা খুন ঝরিয়েই তাদের সমস্ত অপরাধ ধুয়ে সাফ করে দেওয়া। সেই রাত! সেই রাতেই ও দেখেছিল ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে লাশের গাদা চলেছে ভেরাক্রুজের দিকে—সমুদ্রের হাঙরদের খাদ্য হতে। মৃতদেহের ভয়াল স্তূপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে রিভেরা তার বাবা-মায়ের ছিন্নভিন্ন দেহ দুটির খোঁজ পেয়েছিল। মায়ের কথা আরও ভালো করে মনে আছে। মুখটা শুধু বাইরে বেরিয়েছিল, দেহটা চাপা পড়েছিল ডজনখানেক লাশের নিচে। সেই মুহূর্তে আবার গর্জে উঠেছিল পরফিরিও ডায়াজের সৈন্যদের রাইফেলগুলো। রিভেরা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েছিল জমির উপর। শিকারীর চোখে ধুলো দিয়ে পাহাড়ী চিলের মতো সরে গিয়েছিল।

সমুদ্র-গর্জনের মতো প্রচণ্ড একটা শব্দ কানে এল রিভেরার। প্রশিক্ষক ও সহকারীদের পিছনে নিয়ে ড্যানি ওয়ার্ড এগিয়ে আসছে দর্শকদের মধ্য দিয়ে। জনপ্রিয় নায়কের নিশ্চিত বিজয় জেনেই দর্শকরা উন্মত্ত চিৎকারে ফেটে পড়ল। সবাই ওকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, সবাই ওর পক্ষে। এমন কি ড্যানি যখন কায়দা করে রিংয়ের দড়ি গলে ভিতরে লাফিয়ে ঢুকল, রিভেরার সহকারীরা পর্যন্ত কিঞ্চিৎ খুশি না হয়ে পারেনি। অবিরাম হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে ড্যানির মুখখানা। ড্যানি যখন হাসে, তার মুখের প্রতিটি রেখা হাসতে থাকে। এত হাসিখুশি লড়িয়ে সচরাচর দেখা যায় না। তার মুখখানা সৌজন্য আর মিত্রতার একখানি সচল বিজ্ঞাপন। প্রত্যেকে ওর পরিচিত। দড়ির এপাশ থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। যারা দূরে রয়েছে প্রশংসা করার সুযোগ না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, ‘সত্যি ড্যানি! পার বটে।’ পুরো পাঁচমিনিট ধরে শুধু অভ্যর্থনা চলে। রিভেরা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। দর্শকরা তার অস্তিত্বই স্বীকার করছে না। স্পাইডার হ্যাগার্টির ফুলো মুখটা ঝুঁকে পড়ে রিভেরার উপর।

‘ঘাবড়ে যেও না।’ সতর্ক করে দেয় স্পাইডার। ‘নির্দেশগুলো মনে থাকে যেন। টিকে থাকতে হবে। শুয়ে পড়লে চলবে না। শুয়ে পড়লে কিন্তু ড্রেসিং-রুমে আমরা তোমায় পিটিয়ে তক্তা বানাব। বুঝেছ তো? লড়তেই হবে।’

দর্শকদের হাততালি শুরু হয়ে গেছে। ড্যানি রিং পেরিয়ে রিভেরার দিকে এগিয়ে

আসছে। দুহাত একত্র করে রিভেরার ডানহাতটা ধরে ঝাঁকায়। সহৃদয়তায় উদ্বেল ড্যানির হাসিমাখা মুখখানা রিভেরার মুখের খুব কাছেই রয়েছে। ড্যানির খেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় পেয়ে দর্শকরা চেঁচিয়ে উঠে তাকে তারিফ জানায়। ভাইয়ের মতো তার বিপক্ষকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ড্যানির ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে। দর্শকরা ধরে নেয় অশ্রুত শব্দগুলো নিশ্চয় শ্রুতিমধুর। আবার হর্ষধ্বনি করে ওঠে সকলে। ইতর শব্দগুলো শুধু রিভেরাই শুনেছে।

'শোন্ রে, মেক্সিকান ছুঁচো!' খুশি আর হাসিভরা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে ওঠে ড্যানি। 'তোর কত তেল আছে আজ দেখব।'

রিভেরা একটুও নড়ে না। উঠেও দাঁড়ায়নি। ওর দুচোখে জমাট ঘৃণা।

'উঠে দাঁড়া শালা কুত্তা!' পেছনে রিংয়ের ওধার থেকে কারা যেন চেঁচায়।

তার অ-খেলোয়াড়ি ব্যবহারের জন্যে 'সিটি' মেরে আওয়াজ দিয়ে ধিক্কার জানায় জনতা। তবু নির্বিকার বসে আছে রিভেরা। ড্যানি নিজের দিকে ফিরে আসার সময় আরেকবার হর্ষধ্বনি ওঠে।

ড্যানি পোশাক ছাড়তেই সবাই আনন্দে 'উঃ!' 'আঃ!' করে ওঠে। নিখুঁত শরীর খানা। স্বাস্থ্য, ক্ষমতা আর নমনীয় মাংসপেশীর সজীবতায় পূর্ণ। নারীদেহের মতো ফর্সা আর মসৃণ তার গায়ের চামড়া। ওখানেই সব লাবণ্য, সহ্য-ক্ষমতা আর শক্তির ভাণ্ডার। ড্যানি তার প্রমাণও রেখেছে বেশ কয়েক গণ্ডা লড়াইয়ে। স্বাস্থ্য-চর্চার সব মাসিক পত্রিকাতেই তার ছবি ছাপা হয়।

স্পাইডার হ্যাগার্টি রিভেরার মাথা দিয়ে সোয়েটারটা টেনে খুলে নিতেই একটা গোঙানির মতো আওয়াজ ওঠে চারধারে। রঙটা কালো বলে রিভেরাকে আরও রোগা দেখাচ্ছে। ওরও পেশীবহুল চেহারা, কিন্তু ড্যানির মতো চটক নেই। দর্শকরা যেটা খেয়াল করে দেখেনি সেটা ওর বুকের মাংসপেশী। তার দেহের সুদৃঢ় তন্তু ও মাংস-পেশীর ঐক্যবদ্ধ তাৎক্ষণিক ক্ষিপ্রতার কথা দর্শকদের জানবার উপায় নেই। তারা বুঝতেও পারেনি যে অতি সূক্ষ্ম কতকগুলো স্নায়ু সারা দেহ জুড়ে জাল বিছিয়ে রিভেরাকে এক অসামান্য যুদ্ধযন্ত্রে পরিণত করেছে। দর্শকদের চোখে রিভেরা শুধু খয়েরি চামড়াওয়ালা আঠার বছরের এক বালক। শরীরটাও তার বালকেরই মতো। ড্যানি চব্বিশ বছরের পুরুষ—শরীরটাও তার পুরুষেরই মতো। তাদের এই বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে দুজনে যখন রেফারির শেষ নির্দেশ শোনার জন্যে রিংয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

রিভেরা লক্ষ্য করে সাংবাদিকদের পিছনে বসে আছে রবার্ট। আরও বেশি মদ খেয়েছে আজ। আরও আস্তে আস্তে কথা বলছে।

'ঘাবড়িয়ো না রিভেরা।' জড়িত কন্ঠে বলতে থাকে রবার্ট। মনে রেখো—ও কখনও তোমাকে খুন করতে পারবে না। শুরুতেই ও তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিন্তু তাতে বিচলিত হয়ো না। নিজেকে শুধু আড়াল করো, এড়িয়ে যেয়ো জাপটে ধরো। তোমাকে এমন কিছু আঘাত করতে পারবে না। শুধু ভেবো, তোমার উপর কেউ ঘুষি চালিয়ে হাত পাকাচ্ছে। যেমন হত আখড়ায়।'

রিভেরার লক্ষণ দেখে বোঝা গেল না কথাগুলো তার কানে ঢুকেছে কিনা।

'খুদে শয়তান। মুখে একটি কথা নেই।' রবার্ট তার পাশের ভদ্রলোককে বিড়বিড় করে বলল, 'চিরকালই এমনি!'

এই প্রথম রিভেরা ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে চাইল না। হাজার হাজার বন্দুকের ছবি ভেসে উঠে তার দৃষ্টি অবরোধ করেছে। রিংয়ের কাছের বহুমূল্য আসন থেকে শুরু করে যতদূর দৃষ্টি যায় প্রতিটি দর্শকের মুখ যেন এক-একটি বন্দুক। মেক্সিকোর রৌদ্রস্নাত

সুদীর্ঘ সীমানা-রেখার ছবিটা দেখতে পাচ্ছে রিভেরা। ওই সীমানা-বরাবর অপেক্ষা করছে অসংখ্য পোড়-খাওয়া মানুষ। অপেক্ষা করছে শুধু বন্দুকের জন্যে।

রিভেরা তার নিজের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। সহকারীরা ক্যানভাসের টুলটা নিয়ে দড়ি গলে বেরিয়ে গেছে। চৌকো রিংয়ের অপর কোণে ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি। ঘণ্টা পড়তেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। খুশির অট্টরোলে ঘর কাঁপিয়ে তোলে দর্শকরা। তারা কখনও এমন আশাব্যঞ্জকভাবে কোন লড়াই শুরু হতে দেখেনি। কাগজে ঠিকই লিখেছিল। প্রতিহিংসার লড়াই। দুজনের মধ্যেকার দূরত্বের তিন-চতুর্থাংশ পার করে একাই ছুটে এল ড্যানি। মেক্সিকানটাকে একেবারে শেষ করে ফেলার ইচ্ছেটা আদৌ গোপন থাকেনি। একটা নয়, দুটো নয়, এক ডজন ঘুষি হাঁকিয়ে ক্ষান্ত হয়নি ড্যানি। ঘুষির ঘূর্ণিঝড় তুলেছে। ধ্বংসের তাণ্ডব। হতচকিত রিভেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঘুষির বন্যায়। যেখান যেখান থেকে, যে-যে ভাবে ঘুষি চালানো যায়, তার কোনটাই বাকি রাখেনি বক্সিং-শিল্পের কলাকার। মারের চোটে দড়ির গায়ে আছড়ে পড়ে রিভেরা। রেফারি ছাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আবার মার খেয়ে দড়ির উপর এসে পড়ে সে।

এটা লড়াই নয়—নিষ্ঠুর নরহত্যা। পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের আসর ছাড়া অন্য যে-কোন জায়গা হলে এই এক মিনিটের মধ্যেই দর্শকের সব উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে যেত। ড্যানি সত্যিই তার ওস্তাদি দেখাচ্ছে—অপূর্ব জলুস। দর্শকরা এত নিশ্চিত, এত উত্তেজিত তারা, পক্ষপাতিত্ব এমনভাবে তাদের উপর জাঁকিয়ে বসেছে যে কেউই খেয়াল করেনি যে মেক্সিকান ছেলেটি এখনও নিজের পায়ে ভর রেখেই দাঁড়িয়ে আছে। রিভেরাকে তারা ভুলেই গেছে। ওকে তারা দেখতেই পাচ্ছে না। ড্যানির মানুষখেকো আক্রমণের তলায় একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে রিভেরা। এক মিনিট, দেখতে দেখতে দুমিনিট পেরিয়ে গেল। এতক্ষণে দুজনে একটু সরে দাঁড়াতে দর্শকেরা রিভেরাকে দেখতে পেল। ঠোঁট কেটে গেছে, নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। দড়িতেও রক্ত লেগেছে, আর সেই দড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে রিভেরার পিঠটায় রক্তের ডোরা-কাটা। একটা জিনিস কিন্তু দর্শকদের নজরে পড়েনি। রিভেরা একটুও হাঁপাচ্ছে না, আগের মতোই তার দুচোখে সেই নিরুত্তাপ আগুন। প্রশিক্ষণের আখড়ায় বহু উঠতি চ্যাম্পিয়ানই তার উপর এইরকম নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ লড়াই-পিছু আধ ডলার থেকে শুরু করে ফি-সপ্তাহে পনের ডলার অবধি উপার্জন করেছে শুধু প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। কঠিন পথে কঠিন শিক্ষায় শিক্ষিত রিভেরা!

এবার একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। হঠাৎ থেমে গেল চোখ-ধাঁধানো দাপাদাপি, ঝটাপটি। একা দাঁড়িয়ে আছে রিভেরা। ড্যানি, হ্যাঁ—অবিসংবাদিত ড্যানিই উল্টে পড়ে আছে। চৈতন্য ফিরে পাবার প্রয়াসে কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীরটা। টলমল করে পড়ে যায়নি ড্যানি, বিনা কারণে লুটিয়ে পড়েনি। অকস্মাৎ মাঝ-আকাশে গুলিবিদ্ধ হবার মতো রিভেরার ডান হাতের হুক্ ওকে ধরাশায়ী করেছে। রেফারি এক হাতে রিভেরাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভূলুণ্ঠিত বীরের উপর ঝুঁকে পড়ে সেকেণ্ড গণনা শুরু করে। পেশাদার বক্সিংয়ের আসরের রীতি-অনুযায়ী সরাসরি নক্‌ডাউন আঘাত হানতে পারলেই দর্শকরা অভিনন্দন জানায়। আজ কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটল। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা। নীরব উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই সেকেণ্ড গণনা লক্ষ্য করছে। একা রবার্টের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর নীরবতা ভঙ্গ করল।

'বলেছিলাম না—ওর দুহাতেই সমান চলে!'

পঞ্চম সেকেণ্ডে ড্যানি গড়িয়ে উপুড় হল। সাত সেকেণ্ড গোনা হতেই দেখা গেল হাঁটুর উপর ভর রেখে বসেছে, যাতে নয় গোনা হলেই এবং দশ গোনার আগেই

খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে। দশ উচ্চারণ করার সময় তার হাঁটু যদি মেঝে ছুঁয়ে থাকে তাহলে ধরা হবে সে উঠতে পারেনি—অর্থাৎ পরাজিত। ওর হাঁটু দুটো মেঝের সংস্পর্শ ত্যাগ করামাত্র ধরা হবে সে উঠেছে এবং সেই মুহূর্তেই তাকে আবার মেরে শুইয়ে দেবার ন্যায্য অধিকার আছে রিভেরার। রিভেরা কোন সুযোগ ছাড়তে চায় না। মেঝে থেকে হাঁটু ওঠামাত্র ঘুষি চালাবে। ড্যানির চারদিকে চক্কর মারে রিভেরা, কিন্তু ওদিকে রেফারি আবার ড্যানি আর রিভেরার মাঝখানে প্রদক্ষিণ শুরু করে দিয়েছে। রিভেরা জানে রেফারি ইচ্ছাকৃতভাবে সেকেণ্ড গণনা প্রলম্বিত করছে। সব ব্যাটা গ্রিঙ্গো তার বিরুদ্ধে, এমন কি রেফারিও বাদ নেই।

রেফারি 'নয়' হাঁকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ভাবে রিভেরাকে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দেয়। এই সুযোগে উঠে দাঁড়ায় ড্যানি। তার ঠোঁটের কোণে আবার হাসি ফুটে ওঠে। কিছুটা কুঁজো হয়ে হাত দিয়ে মুখ আর তলপেট ঢেকে ড্যানি কোনক্রমে রিভেরাকে জাপটে ধরে। খেলার নিয়ম অনুযায়ী এই আলিঙ্গন ছাড়িয়ে দেওয়াই রেফারির কর্তব্য। রেফারি কিন্তু তা করেনি। ডুবন্ত মানুষের মতো রিভেরাকে আঁকড়ে ধরেছে ড্যানি। এক-একটা মুহূর্ত পেরোচ্ছে, আর সেই সঙ্গে ক্রমশ হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করছে। রাউণ্ডের শেষ একমিনিট দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। কোনক্রমে এই রাউণ্ডটা টিকে যেতে পারলে পুরো একমিনিট অবসর পাবে। ড্যানি টিকেও গেল শেষপর্যন্ত। চরম বিপর্যস্ত অবস্থাতেও মুখে তার হাসি লেগে ছিল।

'ও হাসি মুছে যাবার নয়।' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। দর্শকরা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসল।

'হারামজাদার ঘুষি যা না, ভয়ঙ্কর।' টুলে বসে হাঁসফাঁস করতে করতে ড্যানি তার প্রশিক্ষককে বলল। সহকারীরা দ্রুতবেগে তার পরিচর্যা শুরু করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় রাউণ্ডে ঝিমোনো খেলা একেবারেই জমল না। চতুর ড্যানির অভিজ্ঞতাও কম নয়। শুধু মার বাঁচিয়ে বা এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে গেছে। প্রথম রাউণ্ডের বিবশ-করা আঘাতের জের কাটাবার জন্যে সময় নিচ্ছে। চতুর্থ রাউণ্ডে আবার নিজমূর্তি ধরল ড্যানি। আত্মবিশ্বাস বেশ খানিকটা চিড় খেয়েছে, কিন্তু তবু সুস্বাস্থ্যের দৌলতে সে তার শক্তি ফিরে পেয়েছে। ড্যানি কিন্তু আর তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে না। বন-মানুষের ক্ষমতা এই মেক্সিকান ছোঁড়াটার। সেজন্যেই ড্যানি এবার তার শিক্ষাকে কাজে লাগাচ্ছে। কি কৌশলে, কি দক্ষতায়, কি অভিজ্ঞতায় ড্যানির তুলনা নেই। মারাত্মকভাবে কোন আঘাত হানতে না পারলেও অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে একের পর এক আঘাতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ও ক্রমশ দুর্বল করে দিতে চাইছে। রিভেরা একটা ঘুষি চালায় তো ও চালায় তিনটে, কিন্তু তার কোনটাই লড়াই জেতার মতো নয়। একটা বিচ্ছিন্ন আঘাত হিসেবে কার্যকর না হলেও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে জয়-পরাজয় নির্ধারণে এর অসীম গুরুত্ব। রিভেরাকে এখন শ্রদ্ধার চোখে দেখছে ড্যানি। ছোঁড়াটার ডান-বাঁ দুটো হাতই সমান চলে। বিস্ময়কর ক্ষমতা ওর সর্ট আর্ম কিক্‌গুলোর।

লড়াই চলাকালীন রিভেরা আত্মরক্ষার পদ্ধতি হিসেবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর স্ট্রেট লেফ্‌ট মার চালাতে শুরু করল। বারবার আক্রমণের পর আক্রমণে সে স্ট্রেট লেফ্‌ট মেরে ড্যানিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। বারবার চোট লাগছে চোখে আর নাকে। ড্যানির প্রতিভা কিন্তু বহুমুখী, এজন্যেই সে চ্যাম্পিয়ান হতে চলেছে। ইচ্ছামতো যে কোন সময় সে লড়াইয়ের পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিতে পারে। ড্যানি এবার ইন্‌-ফাইটিং পদ্ধতিতে খুব কাছ থেকে আঘাত হানতে শুরু করে। ইন্‌-ফাইটিংয়ের শয়তানিতে ড্যানি সিদ্ধ-হস্ত। তাছাড়া এর ফলে রিভেরার স্ট্রেট লেফ্‌ট মারগুলোও এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে।

বারবার অগণিত দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ে। উল্লাস চরমে পৌঁছয় যখন ড্যানি কৌশলে নিজেকে বন্ধন-মুক্ত করে ঊর্ধ্বমুখী আপারকাট মেরে রিভেরাকে একেবারে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে। রিভেরা এক হাঁটুর উপর ভর রেখে সেকেন্ড গণনার যতদূর সম্ভব সুযোগ নিতে চায়। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, রেফারি এক-একটা সেকেন্ড পেরোবার আগেই এক দুই গুনে চলেছে।

সপ্তম রাউন্ডে ড্যানি আবার সেই নৃশংস ইনসাইড আপারকাট ঝাড়ল। রিভেরা শুধু টলে গিয়েছে, কিন্তু অরক্ষিত অসহায়তার মুহূর্তেই ড্যানি তাকে আরেক ঘুষির আঘাতে একেবারে দড়ি গলিয়ে ফেলে দিল। নিচে দৈনিক কাগজের সাংবাদিকদের মাথার উপর গিয়ে পড়ল রিভেরা। সাংবাদিকরা তাকে ঠেলে তুলে দিল দড়ি-ঘেরা মঞ্চের বাইরের দিকের কিনারার উপর। রিভেরা ওইখানেই একটা হাঁটুর উপর ভর রেখে বসল। রেফারি যেন কোনক্রমে সময়টা পার করে দেবার জন্যে দ্রুত আওড়ে চলেছে—এক, দুই। দড়ির ভিতরে মঞ্চের উপর অপেক্ষা করছে ড্যানি। এই দড়ি গলেই রিভেরাকে মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। রেফারি কিন্তু মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে ড্যানিকে কোন বাধা দেয়নি বা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়নি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে প্রতিটি দর্শক।

'ওকে শেষ করে দাও ড্যানি! খতম করে দাও ওকে।' চিৎকার করছে লোকে। সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার যেন নেকড়ের পালের রণসঙ্গীতের মতো লাগে।

ড্যানি চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু নয় গোনা অবধি অপেক্ষা না করে, আট গোনা মাত্র রিভেরা অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দড়ি গলে ভিতরে ঢুকেই জাপটে ধরল ড্যানিকে। সক্রিয় হয়ে উঠল রেফারি। জোর করে টেনে ছাড়িয়ে দিল রিভেরাকে। আবার তার মার খাবার ব্যবস্থা পাকা করে দিল। একজন দুর্নীতিপরায়ণ রেফারির পক্ষে যে যে সুবিধে দেওয়া সম্ভব, তার সবগুলোই ড্যানিকে দেওয়া হয়েছে।

রিভেরা কিন্তু টিকে গেল। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে। গ্রিঙ্গোমাত্রেই ঘৃণার পাত্র এবং এরা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে, এরই মধ্যে ওর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বারবার ঝলসে উঠছে হরতালের পর রিও ব্ল্যাঙ্কো ছেড়ে আসার সময় দেখা যাত্রা-পথের দুধারের ভয়াবহ আর কদর্য চিত্রগুলো—মরুভূমির বুক-চেরা ঝকঝকে রেললাইনে, আমেরিকার পুলিশবাহিনী, জলাধারের সামনে ভবঘুরেদের ভিড়, জেলখানা। একই সঙ্গে রিভেরা দেখছে উজ্জ্বল গৌরবময় সুমহান বিপ্লব রক্ত-রঙে তার দেশকে আদিগন্ত রাঙিয়ে দিচ্ছে। বন্দুকগুলো তো তার চোখের সামনেই ভাসছে। দর্শকদের ঘৃণ্য মুখগুলো এক-একটা বন্দুক। এই বন্দুকের জন্যেই তার লড়াই। সে এখন নিজেই বন্দুক! সে নিজেই বিপ্লব! পুরো মেক্সিকোর হয়ে লড়ছে সে।

দর্শকরা ক্রমশই রিভেরার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কেন সে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে না? সেই তো তাকে হারতেই হবে, তাহলে এই জেদ কেন? হাতে গোনা দু-চারজন শুধু রিভেরার সম্বন্ধে আগ্রহী। জুয়াড়ী দর্শকদের এই নির্দিষ্টসংখ্যক সংখ্যালঘু অংশ চিরকালই বেশি ঝুঁকি নিয়ে বাজি ধরে। রিভেরার পক্ষে তারা দশে-চার বা তিনে-এক হিসেবে বাজি ধরেছে।

রিভেরা ক-রাউন্ড টিকবে তার উপরেও প্রচুর বাজি ধরা হয়েছে। সাত রাউন্ড এমন কি ছ-রাউন্ড টিকবে না বলেও অনেকেই বাজি ধরেছিল। যারা এই বাজিতে জিতে নিশ্চিন্ত হয়েছে তারাও প্রিয় মুষ্টিযোদ্ধাকে উৎসাহিত করতে লেগে গেল।

রিভেরার কিন্তু পরাজয় স্বীকারের কোন লক্ষণ নেই। অষ্টম রাউন্ডে আরেকবার আপারকাট মারার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে ড্যানি। নবম রাউন্ডে আবার স্তম্ভিত করে

দিল রিভেরা। আলিঙ্গন-আবদ্ধ অবস্থায় ছিল দুজনে। হঠাৎ ত্বরিত গতিতে রিভেরার নর্তকের মতো নমনীয় দেহটা যেন পিছলে গিয়ে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে বেরিয়ে এল। দুই দেহের মধ্যবর্তী স্বল্প পরিসরের মধ্যেই রিভেরার ডানহাতটা কোমরের কাছ থেকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল। ধরাশায়ী ড্যানি সময়-গণনার পুরো সদ্ব্যবহার করে তবে উঠল। দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত। ড্যানিকে তার নিজের প্যাঁচেই কাত করে দিয়েছে। তার বিখ্যাত রাইট আপারকাট তার উপরেই প্রয়োগ করেছে রিভেরা। 'নয়' হাঁকার পর-মুহূর্তে রিভেরা কিন্তু কোন চেষ্টাই করল না ড্যানিকে আবার কাবু করার। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রেফারি বাধা দেবার জন্যেই মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ রিভেরা যখন ওঠবার চেষ্টা করছিল অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রেফারি তখন ধারে-কাছেও ছিল না।

দশম রাউন্ডে রিভেরা দুবার রাইট আপারকাট চালিয়েছে। কোমরের কাছ থেকে হাত চালিয়ে ড্যানির চিবুকের উপর ঘুষি ঝেড়েছে। মরিয়া হয়ে ওঠে ড্যানি। মুখের হাসিটা মেলায়নি কিন্তু। আবার সে বেধড়ক ঘুষি চালাতে শুরু করে। নেচেকুঁদে যতই দাপট দেখাক না ড্যানি, রিভেরার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। উলটে রিভেরা এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যেই ঠিক ঠাহর করে তিনটি মোক্ষম আঘাতে পরপর তিনবার ধরাশায়ী করেছে ড্যানিকে। ড্যানি আর আগের মতো তাড়াতাড়ি সামলে উঠতে পারছে না। একাদশ রাউন্ডে দেখা গেল ড্যানির অবস্থা কাহিল। একাদশ থেকে চতুর্দশ রাউন্ড ড্যানির জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায়। একেবারে খোলসের মধ্যে ঢুকে কোনরকমে নিজেকে আড়াল করে যাচ্ছে আত্মরক্ষার তাগিদে। শক্তি পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখন শুধু কোনরকমে সময় কাটিয়ে যাওয়া। তাছাড়া সফল মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষে যত রকমের বে-আইনি পদ্ধতি জানা সম্ভব সে-সবই সে প্রয়োগ করছে। কৌশল আর তার বাকি নেই। কখনও জাপটে ধরার সময় এমনভাবে ধাক্কা মারছে যেন ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত, কখনও রিভেরার গ্লাভস-পরা হাতটা চেপে ধরছে নিজের শরীর আর হাতের মধ্যে, কখনও রিভেরার নাকের উপর গ্লাভস চেপে দম বন্ধ করে দিতে চাইছে। আলিঙ্গন-আবদ্ধ অবস্থাতেই ড্যানির রক্তাক্ত ও হাসিমাখা ঠোঁট দুটো বারবার অশ্রাব্য অকথ্য নোংরা কথা ছুঁড়ছে রিভেরার কানে। দর্শক থেকে শুরু করে রেফারি পর্যন্ত প্রত্যেকেই ড্যানির পক্ষে, ড্যানিকেই সাহায্য করছে। দর্শকরা জানে ড্যানি এখন কি চাইছে। এই অপরিচিত বিস্ময়ের হাতে কাবু হয়ে ড্যানি এখন শেষ ভরসা হিসেবে একটি মোক্ষম ঘুষি কষিয়ে ওস্তাদের শেষ মার দেবার কথা ভাবছে। ড্যানি প্রায় যেচে মার খাচ্ছে, ভাঁওতা দিচ্ছে, সরে যাচ্ছে পিছনে। সবের পিছনেই কিন্তু তার একটাই উদ্দেশ্য—একটা সুযোগ পাওয়া—একটা ছিদ্র—তাহলেই ও তার দেহের সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে ঘুষিটা ঝাড়বে। খেলার মোড় ঘুরিয়ে বাজিমাত করবে। ড্যানি চায় নাম-করা বক্সারদের মতো পরপর ডানহাত আর বাঁ-হাত চালিয়ে তলপেট আর চোয়ালের উপর মোক্ষম ঘুষি কষিয়ে খেলার দান উলটে দিতে। সে সামর্থ্য ড্যানির আছে। লোকে বলে যতক্ষণ ড্যানি নিজের পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ তার হাতের জোরও পুরোমাত্রায় বজায় থাকে।

দু-রাউন্ডের মধ্যে অবসরের সময় রিভেরার সহকারীরা তার দিকে মোটেই নজর দিচ্ছে না। তোয়ালেগুলো বেশ কায়দা করেই নাড়ানো হচ্ছে কিন্তু রিভেরার দমছুট ফুসফুসে বাতাস পৌঁছুচ্ছে না। স্পাইডার হ্যাগার্টি তাকে উপদেশ দিচ্ছে কিন্তু রিভেরা জানে ওকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। প্রত্যেকে ওর বিরুদ্ধে। চারপাশ থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা ওকে ঘিরে রেখেছে। চতুর্দশ রাউন্ডে আবার ড্যানিকে ধরাশায়ী করে রিভেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। হাত দুটো নিচে পায়ের পাশে নামিয়ে রেখেছে। রেফারি এক দুই করে সেকেন্ড গুনছে। ওদিকের কোণ থেকে কিছু সন্দেহজনক গুঞ্জন কানে আসে রিভেরার। মাইকেল কেলিকে দেখে রবার্টের কাছে এগিয়ে এসে মুখ নিচু করে কানে কানে

কথা বলতে। ক্ষুধার্ত বিড়ালের মতো শ্রবণ-শক্তি রিভেরার। ছেঁড়া ছেঁড়া দু-চারটে কথা ঠিক শুনতে পেয়েছে। আরও শুনতে চায় রিভেরা। ড্যানি উঠতেই কায়দা করে লড়াইয়ের স্থান পরিবর্তন করে নেয়। ড্যানিকে জাপটে ধরে দড়ির উপর এসে পড়ে।

'যে করেই হোক—' মাইকেলকে বলতে শোনে। রবার্ট ঘাড় নাড়ছে। 'যে করে হোক ড্যানিকে জিততেই হবে। না হলে সর্বনাশ। আমার অনেক টাকা—নিজের টাকা —বাজিতে লাগিয়ে বসে আছি। পনের রাউণ্ডেও যদি টিকে যায় তো ব্যস—একেবারে শেষ হয়ে যাব। ও তোমার কথা শুনবে। যা হোক করে বোঝাও।'

রিভেরার চোখের সামনে আর স্মৃতিচিত্র ভাসছে না। এরা এবার তাকে টোপ খাওয়াতে চাইছে। আবার ও ড্যানিকে ধরাশায়ী করে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়ায় এই ফাঁকে একটু বিশ্রাম নিতে। রবার্ট উঠে দাঁড়িয়েছে।

'ব্যস—ব্যস, আর কি হবে মেরে! নিজের দিকে চলে যাও।' রিভেরাকে বলল রবার্ট।

কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে রবার্ট। যেমন হামেশা সে বলত মুষ্টি-যুদ্ধের আখড়ায়। রিভেরা শুধু ঘৃণাভরে রবার্টের দিকে একবার তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন ড্যানি ওঠে। বিশ্রামের সময় হতেই কেলি আসে রিভেরার কাছে। রিভেরাকে অনেক করে বোঝাতে চায়।

'কি মুশকিল—ছেড়ে দাও না।' নিচু গলায় রুক্ষ স্বরে কথা বলছে কেলি। 'তোমাকে সরে দাঁড়াতে হবে রিভেরা। আমার কথা শুনে দেখ—তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পরের বার ঠিক সুযোগ দেব ড্যানিকে হারাবার। কিন্তু এবার নয়, আর লড়ো না।'

রিভেরার দৃষ্টিতেই বোঝা যায় যে কথাগুলো সে শুনছে। কিন্তু হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

'কি হল, কথা বলছ না যে?' কেলি রেগে উঠল।

'হারতে তোমাকে হবেই।' স্পাইডার হ্যাগার্টি যোগ করল। 'এমনি না হলেও রেফারি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। কেলি যা বলছে শোন—সরে দাঁড়াও।'

'সরে দাঁড়াও, লক্ষ্মীটি,' অনুনয় করতে লাগল কেলি, 'আমি তোমাকে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করব।'

রিভেরা উত্তর দেয় না।

'সত্যি বলছি—আমার কথা শুনে দেখই না, লক্ষ্মীটি!'

ঢঙ করে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অশুভ কিছুর আশঙ্কা চেপে ধরে রিভেরাকে। দর্শকরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। ব্যাপারটা যাই হোক, সেটা এই রিংয়ের মধ্যেই ঘটবে, রিভেরাকে জড়িয়েই ঘটবে। • ড্যানি যেন আবার তার আগের নিশ্চিন্তভাব ফিরে পেয়েছে। যেরকম দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, ভয় পায় রিভেরা। একটা শয়তানি চাল আছে এর পিছনে। ড্যানি ছুটে আসে কিন্তু রিভেরা তার মোকাবিলা করে না। একপাশে সরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। ড্যানি আসলে একটা আলিঙ্গনের মধ্যে যেতে চাইছে। এর পিছনে বদমাইশি আছে। রিভেরা পিছু হটে, গোল হয়ে ঘোরে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! শেষ অবধি তাকে আলিঙ্গনে ধরা পড়তে হবেই। ওদের মতলবটা কি তখনই জানা যাবে। মরিয়া হয়ে সে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি ঘটাতে চায়। রিভেরা এমন ভাব দেখায় যেন সে আলিঙ্গনে ধরা দিতে চায়। ড্যানি ছুটে আসে। তাদের দেহ দুটো স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে রিভেরা হরিণের মতো তড়াক করে পিছনে সরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ড্যানির সহকর্মীরা ও-কোণ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ফাউল—ফাউল!'

রেফারি ফাউল বলে ঘোষণা করতে যাচ্ছিল কিন্তু রিভেরা ওদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে। সে ড্যানির দেহ স্পর্শ অবধি করেনি। ফাউল বলবে কি ক'রে! কি করবে

ভেবে না পেয়ে রেফারি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দর্শকদের মধ্য থেকে তীক্ষ্ন সরু কণ্ঠে একটি কিশোর চেঁচিয়ে ওঠে, 'ডাহা জোচ্চুরি!' এরপর আর রেফারির কিছু করার থাকে না।

ড্যানি এবার খোলাখুলি গালিগালাজ করতে শুরু করেছে। জোর করে ধরতে চাইছে রিভেরাকে। রিভেরাও নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। রিভেরা ঠিক করে ফেলেছে আর ও ড্যানির দেহে কোন ঘুষি মারবে না, তাহলেই ওরা ফাউল ঘোষণা করে দেবে। এতে তার জেতবার সুযোগ অর্ধেক কমে গেল, তবু তাকে যদি জিততে হয়, একমাত্র মুখে আঘাত করেই জিততে পারবে। সামান্যতম সুযোগ দিলেই ওরা ফাউল ডেকে রিভেরাকে পরাজিত করবে। ড্যানির হাবভাবে একেবারে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ছে সেকথা। দু-রাউন্ড ধরে ড্যানি নাগাড়ে রিভেরাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। রিভেরা তবু কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। ডজন-ডজন ঘুষি সহ্য করে যাচ্ছে, তবু আলিঙ্গনে আটকে পড়তে চাইছে না। শেষবেলায় ড্যানির এই মন-মাতানো অপূর্ব আক্রমণ দর্শকদের উন্মাদ করে দিয়েছে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। আসল ব্যাপারটা তারা কিছুই বোঝেনি। তাদের প্রিয় যোদ্ধা শেষপর্যন্ত সত্যিই জিততে চলেছে এইটুকু দেখেই তারা সন্তুষ্ট।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তারা রিভেরাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে—'লড় না শালা হলদেমুখো শয়তান! এগিয়ে আয় না হারামি! বুকের পাটা দেখি!' একই সঙ্গে ড্যানিকে তারা উৎসাহিত করে, 'ছেঁড় না, ওকে শেষ করে দাও। একেবারে শেষ করে ফেল।'

এই আসরের মধ্যে একমাত্র কারুর যদি মাথা ঠাণ্ডা থাকে তো সে রিভেরার। তার দেহে ফুটন্ত রক্ত বইছে। তার মতো তীব্র ক্রোধ জ্বালা ঘৃণা এই অগণিত দর্শকের মধ্যে একজনেরও নেই। তবু ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো দশ হাজার কণ্ঠের সম্মিলিত ক্রুদ্ধ গর্জনও তার কাছে যেন খরগ্রীষ্মে গাছের শীতল ছায়ার মতো। এর চেয়ে হাজারো গুণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে বাস্তব জীবনে।

সপ্তদশ রাউণ্ডে সুযোগ পেল ড্যানি। একটা জবরদস্ত ঘুষি খেয়ে টলে গেল রিভেরা। তার হাত দুটো অসহায়ের মতো ঝুলে পড়ল। টলমল করতে করতে পিছনে সরে গেল। ড্যানি ভাবে এই তার সুযোগ। রিভেরা তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। রিভেরা কিন্তু ভান করছিল। ড্যানি অসতর্ক হতেই সোজা একটি ড্রাইভে তার মুখের উপর সজোরে আঘাত হানল। ড্যানি ধরাশায়ী হল। আবার উঠে দাঁড়াতেই ঘাড় ও চোয়ালের উপর ডানহাতের নিচু করে মারা ডাউন-চপে ফের শুইয়ে ফেলল ড্যানিকে। পরপর তিনবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কোন রেফারির পক্ষেই এই মারকে ফাউল ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না।

'বিল! এই বিল!' কেলি আকুলস্বরে ডাকে রেফারিকে।

'কিছু করার নেই। হাত-পা বাঁধা।' রেফারিও দুঃখিত স্বরে বলল।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ড্যানি তবু বীরের মতো বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। রিংয়ের কাছে কেলি এবং আরও অনেকে পুলিশ পুলিশ বলে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় লড়াই থামিয়ে দেবার জন্য। ড্যানির সহকারীরা কিন্তু তবু তোয়ালে ছুঁড়ে লড়াইয়ের সমাপ্তি স্বীকার করে নিতে রাজি নয়! রিভেরা দেখল হোঁতকা পুলিশ অফিসার দড়ি গলে মঞ্চের ভিতর ঢুকল। রিভেরা বুঝতে পারে না এর অর্থ কি। গ্রিঙ্গোদের এই খেলায় প্রতারণার আর অন্ত নেই। ড্যানি উঠে দাঁড়িয়ে বেসামাল অসহায় অবস্থায় টলমল করছে। রেফারি আর পুলিশ ক্যাপ্টেন রিভেরার দিকে হাত বাড়াবার মুহূর্তে ঘুষিটা চালিয়ে দিল রিভেরা। আর লড়াই থামাবার দরকার হবে না, কারণ ড্যানি আর উঠবে না।

'কই গোন!' রেফারিকে লক্ষ্য করে মোটা ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠল রিভেরা।

গোনা শেষ হলে ড্যানির সহকারীরা তাকে টেনে তুলে নিয়ে গেল নিজের জায়গায়।
'কে জিতল বল!' রিভেরা দাবি জানায়।
অনিচ্ছুকভাবে রিভেরার গ্লাভ্‌স্‌-পরা হাতটা উঁচু করে তুলে ধরল রেফারি।

কোন অভিনন্দন নেই রিভেরার জন্যে। একাই সে ফিরে এল মঞ্চের উপর নিজের কোণে। সহকারীরা তখন তার বসার জন্যে টুলটা অবধি পাতেনি। দড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রিভেরা। অন্তরের সব ঘৃণাটুকু এসে ভিড় করেছে তার দুচোখে। এদিক থেকে ওদিক—প্রত্যেকের মুখের উপর দিয়ে ঘৃণার নজর বুলিয়ে গেল। দশ হাজার গ্রিঙ্গোর কাউকেই বাদ দেয়নি। হাঁটু দুটো দেহের ভার সইতে পারছে না আর, ঠকঠক করে কাঁপছে। ক্লান্তিতে চোখ বেয়ে নামছে অশ্রুধারা। বমি বমি মাথা ঘোরা ভাবের জন্যে গ্রিঙ্গোদের ঘৃণ্য মুখগুলো আগু-পিছু টলছে। তখন মনে পড়ে গেল রিভেরার, এইগুলোই তো বন্দুক! এই বন্দুক তো এখন তারই। বিপ্লব চলবে।

তার একটু দেরি হয়ে গেল। কারণ শিশির-ভেজা ঘাসের জন্য পা-ঢাকা জুতো পরে নিতে হল তাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখতে পেল, তার স্বামী অপেক্ষা করছে, বাদামের কুঁড়ির ফুটে-ওঠা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে তন্ময়। লম্বা লম্বা ঘাসের উপর দিয়ে ফলের গাছগুলোর চারপাশে সে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলল।

'নেকড়েটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

কুঁড়িদের সৃষ্টি-রহস্যের দার্শনিক ও কাব্যিক জগৎ থেকে নিজেকে যেন সজোরে বিচ্ছিন্ন করে নিল ওয়াল্ট আরভিন। উত্তর দিল—'এই তো ছিল কিছুক্ষণ আগেও।' চারদিকটা দেখে নিয়ে সে বলল, 'একটা খরগোশের পেছনে ছুটতে দেখেছিলাম তখন।'

ছিমছাম জায়গাটা ছেড়ে সরু পথটা ধরে যাবার সময় সে ডাকল, 'নেকড়ে, নেকড়ে, এদিকে আয়, নেকড়ে।' সরু পথটা গিয়ে পড়েছে লাক্ষা-ঘেরা ম্যানজানিটা জঙ্গল ছাড়িয়ে শহরতলির পথে।

আরভিন দুহাতের আঙুল ঠোঁটের ফাঁকে পুরে সুতীক্ষ্ম শিস দিল। দুহাত কানে দিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গি করল।

'দোহাই! একজন কবির সুর বাঁধা অনেক সূক্ষ্ম। তুমি এমন বিশ্রী শব্দ করছ! আমার কানের পর্দা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'হে অরফিউস!'

'বলতে যাচ্ছিলাম তুমি একজন রাস্তার আরব।' সে কর্কশভাবে কথাটা বলে ফেলল।

'কবিত্বের জন্য কারুর বাস্তববোধ কমে না, অন্তত আমার পক্ষে তো নয়। এমন ব্যর্থ প্রতিভা আমার নয় যে সে কেবল পত্র-পত্রিকায়ই রত্ন-মাণিক্য বিকোতে পারে।'

অন্যমনস্কতার ভান করে সে বলে চলল, 'আমি সুরুচিসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ নই, নাচঘরের কোকিলকণ্ঠ গায়কও নই, কেন? না, আমি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন লোক। আমার সঙ্গীতে এমন কোন খাদ নেই যাতে তার রূপান্তর আমি ঘটাতে পারি না। যেমন করেছি দেখ—ফুলে-ছাওয়া কুটির, সুন্দর পাহাড়-ঘেরা মাঠ, লালগাছের ঝোপ, সাঁই-ত্রিশটি গাছের ফলবাগান, কালজাম গাছের সুদীর্ঘ এবং স্ট্রবেরি গাছের নাতিদীর্ঘ সারি, আধ মাইলের মধ্যে ঝরনার কলধ্বনি। আমি হলাম সৌন্দর্য-ব্যবসায়ী, সঙ্গীতের সদাগর। প্রিয়ে ম্যাজ, আমি খুঁজি উপযোগিতা। পত্রিকার সম্পাদকদের ধন্যবাদ, আমি গান গাই, সে-গান আমার লোহিত-কুঞ্জে পশ্চিমা বাতাসের দীর্ঘশ্বাস হয়ে ফেরে, সে-গান শ্যাওলা-ঢাকা পাথরের উপর দিয়ে জলের কলতান হয়ে বয়ে যায়, সেই ধ্বনি আমার কাছে সঙ্গীত হয়ে দেখা দেয়। আমি গান গাই, ফের আমি সেই সঙ্গীতের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটাই।'

'ও-হ্ তোমার সব সঙ্গীতের রূপান্তর যদি এমন সার্থক হত!' হেসে ফেলল সে।

'নাম করে বল যে কোন্‌টা হয়নি।'

'তোমার লেখা সেই দুটি সুন্দর সনেট, যার বদলে কেনা হল এমন একটা গরু যে নাকি এই শহরের সবচেয়ে ওঁচা দুধেল গাই।'

'কিন্তু গরুটি দেখতে সুন্দর।'

'সে মোটেও দুধ দিত না কিন্তু', বাধা দিল ম্যাজ।

'তবু সে কি দেখতে সুন্দর ছিল না?' সে জোর দিয়ে বলল।

'কিন্তু এখানে উপযোগিতা ও সৌন্দর্যের ভরাডুবি।'—ম্যাজ উত্তর দিল।

'আরে ঐ তো নেকড়ে!'

ঝোপে-ঢাকা পাহাড়ের দিকটায় একটি ঝোপ নড়ে উঠল, আর তখনই দেখা গেল পাহাড়ের খাড়া গায়ের কিনারে, চল্লিশ ফুট উপরে একটি নেকড়ের মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত। তার আঁকড়ে-থাকা সামনের পা দুটোর ধাক্কায় একটা নুড়ি ছিটকে পড়েছিল তাদের পায়ে, সে কান খাড়া করে তীক্ষ্ম চোখে তাই দেখছিল। তারপর সে দৃষ্টি ফিরিয়ে, মুখ হাঁ করে যেন হাসতে হাসতে তাদের কাছে নেমে এল।

স্বামী-স্ত্রী চিৎকার করে উঠল, 'এই যে নেকড়ে, আমাদের প্রিয় নেকড়ে।'

সেই শব্দ শুনে তার কান দুটো ওঠা-নামা করল, গন্ধ শুঁকল কোন অদৃশ্য হাতের সোহাগের। তারা দেখল সে ঘন ঝোপের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। তারা এগিয়ে চলল। কিছু পরে সরু পথটা ঘুরে এসে, নুড়ি ও ঝুরো মাটির এক ছোটখাট স্তূপের মধ্যে সে তাদের সঙ্গ ধরল। তার মধ্যে দেখানোপনা কিছু ছিল না। স্বামীর কাছ থেকে কানের চারপাশে চাপড় খেয়ে, স্ত্রীর কাছ থেকে আর কিছুক্ষণ সোহাগ কেড়ে তাদের আগে আগে সরু পথ ধরে সে চলল নেকড়ের মতোই অনায়াস ভঙ্গিতে।

চেহারার ধরনে, গায়ের লোমে সে ছিল একটি বড় বুনো নেকড়ে। কিন্তু সে যে যথার্থ নেকড়ে নয় তা বোঝা যায় তার গায়ের রঙে এবং দাগে—যাতে তাকে কুকুর বলে অতি সহজে চেনা যায়। নেকড়ের রঙ কখনও তার মতো হয় না। তার রঙ বাদামী, ঘন বাদামী, লালচে বাদামী, বাদামী রঙের যেন এক গভীর ষড়যন্ত্র। পিঠ ও কাঁধের রঙ উজ্জ্বল বাদামী, পাশে এবং তলপেটের দিকে কিছুটা হলদেটে হয়ে গেছে, সেই হলুদ রঙও বাদামীর ছোঁয়ায় কালচে। গলার দুই থাবার এবং চোখের দুপাশের সাদা রঙ ঘন, নিশ্ছিদ্র বাদামীর সংস্পর্শে অনুকূল। চোখ দুটি বাদামী এবং সোনালী রঙের, জোড়া পোখরাজের মতো।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কুকুরটিকে খুব ভালোবাসে। হয়ত তার কারণ ওকে ভালো না বেসে পারা যায় না। এই পাহাড়ী কুটিরে রহস্যজনকভাবে কোথা থেকে এসে সে যখন উদয় হল তখন কাজটা অতি সহজ ছিল না। পায়ে ঘা, অনাহারে ধুঁকছে; তাদের জানালার কাছে, প্রায় নাকের ডগায় সে একটা খরগোশ মেরে ফেলে পালিয়ে গেল কালোজাম গাছের ঝোপের কাছে ঝরণার ধারে, সেখানে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওয়াল্ট আরভিন এই অনাহূতের খোঁজ করতে গেল, যন্ত্রণায় সে তখন গজরাচ্ছে; একটি বড় পাত্রে রুটি ও দুধ নিয়ে সন্ধিস্থাপন করতে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাজ, তাকে দেখেও সেইভাবে গজরেছিল সে।

দারুণ বেয়াড়া কুকুর ছিল সে। তার কাছে এলে রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করত, পিঠে হাত রাখলেও চটে যেত। দাঁত বের করে পিঠের লোম খাড়া করে ভয় দেখাত। ঝরণার ধারে সে শুয়ে থাকত, ঘুমোত, খেত—খাবার দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে যাবার পরে। শরীর খারাপ হলে হয়ত সে কিছুদিন সেখানে থাকল। তারপর কয়েকদিনের মেয়াদে শরীর ভালো হতেই আবার অন্তর্ধান।

হয়ত এখানেই আরভিন ও তার স্ত্রীর সঙ্গে তার সব সম্পর্কের ইতি হত। সেই সময় রাজ্যের উত্তরাংশে যাবার ডাক এল আরভিনের। অরেগন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝামাঝি রেলপথে একলা যাবার সময় সে দেখতে পেল তার বেয়াড়া অতিথিটিকে। মালগাড়ি যাবার রাস্তা ধরে সে চলেছে; বাদামী রঙ, নেকড়ের মতো দেখতে, দুশ মাইল পথ হেঁটে চলেছে, ধুলোমাটি মেখে পরিশ্রান্ত, তবু ক্লান্তিহীন।

আরভিন কবি, আবেগপ্রবণ। পরের স্টেশনে সে নেমে পড়ল, এক কসাইয়ের দোকান থেকে কিনে নিল এক টুকরো মাংস, শহরের উপকণ্ঠে ধরে ফেলল ঐ ভবঘুরেটিকে। ফেরার পথে তারা মালগাড়িতে এল, নেকড়ে আবার ফিরে এল পাহাড়তলির কুটিরে। এক সপ্তাহ তাকে বেঁধে রাখা হল। তাকে ভালোবাসতে শেখানো হল কিন্তু খুব সাবধানে। সে যেন গ্রহান্তরের জীব। সোহাগের কথা শুনলেই সে গর্জে ওঠে, কিন্তু কখনও ঘেউ ঘেউ করে না। যতদিন সে তাদের সঙ্গে ছিল, কখনও সে কুকুরের মতো ডাকেনি।

তাকে জয় করা ছিল একটা সমস্যা। আরভিন সমস্যা ভালোবাসে। একটা ধাতুর ফলকে লিখল—ওয়াল্ট আরভিন ও গ্লেন এলেনের কাছে ফিরিয়ে দেবেন; কাউণ্টি সোনোমা, ক্যালিফোর্নিয়া। একটা গলাবন্ধে এটা আটকে কুকুরের গলায় বেঁধে দেওয়া হল। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, তৎক্ষণাৎ সে হাওয়া হয়ে গেল। একদিন বাদে মেনডোসিনো প্রদেশ থেকে তারবার্তা এল। কুড়ি ঘন্টায় সে একশ মাইল দৌড়েছে উত্তরের দিকে, যখন তাকে ধরা হল তখনও সে দৌড়োচ্ছিল।

ওয়েলস কার্গো এক্সপ্রেসে করে সে ফিরে এল। তিন দিন তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, চতুর্থ দিনে তাকে ছেড়ে দিতেই আবার সে হাওয়া হয়ে গেল। এবার ধরা পড়ার আগেই সে অরেগন ছাড়িয়ে পালায় উত্তরের দিকে। মনের মধ্যে বদ্ধমূল তাগিদ আছে তার উত্তরের দিকে যাবার। সনেট বিক্রির টাকা খরচ করে আরভিন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল উত্তর-অরেগন থেকে। বলল, এটা ওর গৃহমুখী প্রবৃত্তি। আর-একবার এই বাদামীরঙের ভবঘুরেটি ধরা পড়ে চালান যাবার আগেই ক্যালিফোর্নিয়ার অর্ধেকটা, অরেগনের সমস্তটা এবং ওয়াশিংটনের সমস্তটা চষে বেড়িয়েছে। আশ্চর্য দ্রুত গতিতে সে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমদিনের দৌড়ে সে প্রায় দেড়শ মাইল পথ পার হয়েছিল। গড়পড়তায় প্রায় একশ মাইলের মতো সে চরে বেড়িয়েছে ধরা পড়ার আগে। সবসময় সে রোগা ক্ষুধার্ত এবং বুনো হয়ে ফিরে এসেছে। 'চল' মনে হলেই আবার সে ছুটে পালিয়েছে উত্তরের দিকে—কেন, কিসের তাগিদে কেউ বলতে পারে না। খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের পর সে সমস্তটা শক্তি ব্যয় করে এইভাবে ঘুরে বেড়িয়ে।

একবছর এই ব্যর্থ পলায়নের পর এই কুটিরে থাকাটাকেই সে মেনে নিয়েছে, যেখানে সে প্রথম এসে একটা খরগোশ মেরেছিল আর ঘুমিয়েছিল ঝরনার ধারে। এরপরও অনেক সময় পার হয়েছে, তারপর স্বামী-স্ত্রী ওকে আদর-সোহাগ করতে পেরেছে। সত্যি করেই এটা একটা মস্ত বড় জয়, তারা দুজনেই কেবল তার গায়ে হাত দিতে পারত। অসম্ভব খুঁতখুঁতে ও অমিশুক স্বভাবের ছিল সে। তাদের বাড়ির কোন অতিথি তাকে কায়দা করে উঠতে পারত না। কেউ এগিয়ে গেলে চাপা গর্জন করে সম্ভাষণ জানাত। কাছে যাবার মতো দুঃসাহসিকতা যদি কেউ দেখাত, তবে তার মুখ হাঁ হয়ে যেত, দাঁত বেড়িয়ে পড়ত, চাপা গর্জন হয়ে উঠত ভয়ঙ্কর, এত ভয়ঙ্কর যে ডাকাবুকো লোককেও ভয় পাইয়ে দিত। সাধারণ কুকুরের তর্জন-গর্জন-শোনা চাষাদের কুকুররাও তার হাঁক-ডাক শুনলেই ভয় পেত, নেকড়ের গর্জন তো তারা কখনও শোনেনি।

সে ছিল পূর্ব-পরিচয়হীন; ওয়াল্ট ও ম্যাজকে দিয়েই তার জীবন-ইতিহাসের শুরু। দক্ষিণ থেকে সে এসেছে, কিন্তু কার কাছ থেকে সে পালিয়ে এসেছে তার হদিস তারা পায়নি। তাদের নিকটতম প্রতিবেশিনী মিসেস জনসন দুধের যোগান দিত, বলেছিল ওটি ক্লনডাইক জাতের কুকুর। সেই দূর প্রদেশে অনাবাদী জমিতে লাঙল চালায় তার ভাই, সুতরাং এ বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ।

তারা এই নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করেনি। তবে নেকড়ের কানের ডগা একসময় ঠাণ্ডায় সাংঘাতিকভাবে জমে গিয়েছিল, পরে তারাও সেটা সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলতে পারে নি সাময়িক পত্র-পত্রিকা অথবা সংবাদপত্রের পাতায় আলাসকান জাতীয় কুকুরের

যে-ছবি বের হয়, তাকে অনেকটা সেরকম দেখতে। তারা তার অতীত ইতিহাস নিয়ে অনেক সময় চিন্তা করে। উত্তরদেশীয় জীবন সম্পর্কে তারা যা শুনেছে যা পড়েছে, তা নিয়ে তার সেখানকার জীবন সম্পর্কে তারা জল্পনা-কল্পনা করেছে। উত্তরদেশ এখনও তাকে টানে, একথা তারা জানে। অনেক রাতে তারা শুনেছে, সে কাঁদছে। উত্তুরে বাতাস যখন ঠাণ্ডার কামড় দেয়, তখন নিদারুণ এক অস্থিরতা তার মধ্যে দেখা দেয়, সে শোকার্ত হয়ে আর্তনাদ করতে থাকে। তারা বোঝে এটা হল নেকড়ের কান্না। কিন্তু সে কখনও ঘেউ ঘেউ করে না, তেমন বড়-কিছু ঘটেওনি, যার ফলে কুকুরের ডাক ডাকতে পারে।

তাকে বশে আনবার সময় বহুবার তারা আলোচনা করেছে, কার কুকুর সে হতে পারে। অনেকেই দাবি করেছে তাদের কুকুর বলে। তার কোন সহৃদয় হাবভাব দেখে ঘোষণা করেছে নিজেদের বলে। এর মধ্যে পুরুষমানুষদের সঙ্গেই সে ভালো ব্যবহার করত। এটা স্পষ্ট হল যে স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। ম্যাজের জামার ঘের কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। তার দুলুনি দেখলেই তার গায়ের লোম সন্দেহে খাড়া হয়ে উঠত। ঝোড়ো বাতাস যেদিন বইত, ম্যাজ তার কাছে এগুতেই পারত না।

অথচ ম্যাজই তাকে খাওয়াত। রান্নাঘরের কর্ত্রী ছিল সে, তারই কৃপায় সেই পবিত্র স্থানে নেকড়ে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিল। এ-সব হতে পেরেছিল ম্যাজের পোশাকের বাধা পেরোতে পেরেছিল বলেই। ওয়াল্ট চেষ্টা করে করে তাকে শিখিয়েছিল তার লেখার সময় পায়ের কাছে শুয়ে থাকতে। তাকে আদর করতে গিয়ে, তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা সময় নষ্ট হত। সম্ভবত পুরুষমানুষ বলেই ওয়াল্ট শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পেরেছিল। যদিও ম্যাজ বলত, সিকি মাইল দূরে রয়েছে ঝরনার কলতান; অন্তত পথে দুবার লালঝোপের মধ্য দিয়ে পশ্চিমা বাতাসের যে দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেছে ওয়াল্ট সেই সব সঙ্গীতের রূপান্তর সাধনায় নিমগ্ন রয়েছে। নেকড়ে একলাই থেকেছে তার পছন্দ-অপছন্দের মেজাজ নিয়ে।

সরু পথটা দিয়ে খাড়া নামার সময়ে মিনিট পাঁচেক চুপ করে থাকার পর ওয়াল্ট বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এবার আমি ট্রায়োলেট শুনতে পেয়েছি। পোস্টঅফিসে একটা চেক এসে পড়ে রয়েছে। তা দিয়ে ব্যবস্থা হবে ভালো ময়দা, এক গ্যালন ম্যাপল সিরাপ আর তোমার জন্য নতুন একজোড়া পা-ঢাকা জুতো।'

'মিসেস জনসনের কাছ থেকে তার সুদর্শনা গরুর সুস্বাদু দুধ। জান তো আগামীকাল মাস পয়লা,' ম্যাজ যোগ করল।

ওয়াল্ট অজ্ঞাতসারে ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে বলল, 'কিছু মনে করো না। এবার আমার একটি নতুন সুন্দর গাই হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে ভালো দুধেল গাই।'

সে সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল, 'কখন লিখলে?' তার কন্ঠে তিরস্কারের সুর— 'আমায় দেখাওনি যে বড়!'

একটা শুকনো গুঁড়ি হাত তুলে দেখিয়ে সে উত্তর দিল, 'পোস্ট-অফিসে যাবার পথে এমন একটি চমৎকার জায়গায় বসে পড়বার জন্য লেখাটি আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

ফার্ন গাছের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি ছোট্ট ধারা, শ্যাওলা-পিছল পাথরের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে তাদের পায়ের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে। দূরের উপত্যকা থেকে ভেসে আসছে মেঠো পাখির মিষ্টি গান। তাদের চারপাশ ঘিরে, আলো-ছায়ার মধ্যে এদিক-ওদিক উড়ছে হলদে বড় বড় প্রজাপতি।

ওয়াল্ট তার লেখা পড়ছিল মৃদু স্বরে। এমন সময় নিচে থেকে একটি শব্দ শোনা

গেল। নুড়ির উপর ভারী পা ফেলে এগিয়ে আসার শব্দ। ওয়াল্ট তার পড়া শেষ করে স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাল অনুমোদনের আশায়। তখনই সরু পথের বাঁকে দেখা গেল একটি লোককে। আ-ঢাকা মাথা, ঘর্মাক্ত কলেবর। একহাতে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে, অন্য হাতে ধরা একটা নতুন টুপি, মাড়-দেওয়া শক্ত কলার খুলে রেখেছে গলায়। শক্ত সুঠাম দেহ। সদ্য-তৈরি কালো পোশাক ভেদ করে ফুটে উঠেছে তার দেহের পেশী।

ওয়াল্ট তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'উষ্ণ দিন আজ!' দেশীয় অভ্যর্থনা রীতিতে আস্থা ছিল ওয়াল্টের। তার সদ্‌ব্যবহার করতে কখনও সে ভুলত না।

লোকটা থামল এবং মাথা নাড়ল। কিছুটা কুন্ঠার সঙ্গে সে বলল, 'আমার ধারণা আমি ঠিক উষ্ণতায় ধাতস্থ নই। বরং শূন্য ডিগ্রি আবহাওয়ায় অভ্যস্ত বেশি।'

ওয়াল্ট হেসে বলল, 'এদেশে তেমন আবহাওয়া পাবেন না।'

লোকটা উত্তর দিল, 'সে কথা বলবেন না। আমি তার প্রত্যাশায় আসিনি। আমার বোনের খোঁজে এসেছি। আপনি জানেন, এখানে সে থাকে। তার নাম মিসেস উইলিয়াম জনসন।'

'আপনিই কি তার সেই ভাই যিনি ক্লনডাইকে থাকেন? যাঁর কথা অনেক শুনেছি?' ম্যাজ উচ্চস্বরে বলল। কৌতূহলে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

লোকটা বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমিই সেই। আমার নাম মিলার, স্কিফ মিলার। তাকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছে আছে।'

ম্যাজ উঠে দাঁড়িয়ে সিকি মাইল দূরে খাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আপনি পায়ে-চলা পথে এসেছেন। ঐ যে লাল ঝোপ দেখছেন, ওখানে সরু রাস্তাটার ডানদিকে মোড় নেবেন, তার বাড়ি যাবার এই হল সোজা পথ। আশা করি ভুল করবেন না।'

'ধন্যবাদ,' বলে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আনাড়ির মতো থমকে গেল সেখানে। সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে খোলাখুলিভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে। বিহ্বলতার মধ্যে ডুবে গেল সে।

ম্যাজ বলল, 'ক্লনডাইকের গল্প শুনতে আমাদের ইচ্ছে। যাব নাকি একদিন আপনার কাছে, বোনের কাছে যখন থাকবেন? তার চেয়ে ভালো হয় যদি আপনি আসেন আমাদের কাছে, খাওয়াটা এখানেই আমাদের সঙ্গে সারবেন।'

বিড়বিড় করে যন্ত্রবৎ সে বলল, 'ধন্যবাদ।' তারপর সহজ হয়ে আরও বলল, 'আমি বেশিদিন থাকব না। আবার উত্তরে চলে যাব। আজ রাতের ট্রেনেই। সরকারের সঙ্গে সেইভাবেই চুক্তি আছে।'

ম্যাজ বলল যে এটা মোটেই ভালো হল না।

শুনে লোকটি যাবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করল। ম্যাজের মুখের থেকে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারল না। সে বুঝতেই পারল না যে তার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে বিহ্বল ভাব। এবার ম্যাজ অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠল।

যখন ওয়াল্ট স্থির করল মানসিক চাপ হালকা করার জন্য সে কিছু বলবে, এমন সময় দেখা গেল নেকড়েকে। নেকড়ে-সুলভ ভঙ্গিতে পা ফেলে আসছে, ঝোপের মধ্যে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল।

স্কিফ মিলারের মন থেকে বিহ্বলতা মিলিয়ে গেল। তার সামনের ঐ সুন্দরী রমণী সরে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। তার চোখ শুধু দেখছে কুকুরটিকে। তার মুখে ফুটে উঠল পরম বিস্ময়। 'আরে একি অবাক কাণ্ড!'—খুব আস্তে মৃদুভঙ্গিতে সে উচ্চারণ করল কথাগুলো। ম্যাজ দাঁড়িয়ে রইল, তাকে ছেড়ে সে অন্যমনস্কভাবে বসে পড়ল কাঠের গুঁড়ির উপরে। তার গলার স্বর শুনে নেকড়ের কান দুটো নিচু হল, তার মুখ বিস্ফারিত

হল আনন্দে, ধীর পায়ে লাফাতে লাফাতে সে অপরিচিত ব্যক্তির কাছে এগিয়ে এল, তার দুই হাতের গন্ধ শুঁকল, তারপর তার জিভ দিয়ে সে হাত দুটি চাটতে শুরু করল।

স্কিফ মিলার কুকুরের মাথায় আদর করতে লাগল। ধীরভাবে মৃদু গলায় আবার বলল, 'আরে,—এ না হয়েই যায় না!'

পরমুহূর্তে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমার ভীষণ আশ্চর্য লাগছে।'

ম্যাজ হালকাভাবে বলল, 'আমাদেরও খুব আশ্চর্য লাগছে। আমরা নেকড়েকে কখনও কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে ভাব জমাতে দেখিনি।'

লোকটি জিজ্ঞেস করল,—'আপনারা একে নেকড়ে বলছেন কেন?'

মাথা নেড়ে ম্যাজ বলল,—'আমি বুঝতে পারছি না আপনার প্রতি ও এমন সহৃদয় হল কেন? একমাত্র কারণ হতে পারে আপনি ক্লনডাইকের লোক। আর আপনি জানেন হয়ত ও হল ক্লনডাইক দেশের কুকুর।'

অন্যমনস্কভাবে মিলার বলল,—'হ্যাঁ, তাই।' সে কুকুরটার সামনের পা দুটোর একটা তুলে ধরল এবং পায়ের থাবাটি ঝুঁকে দেখল, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিল, বলল,—'কি নরম! অনেকদিন ও উঁচু-নিচু জায়গায় হাঁটেনি।'

ওয়াল্ট সহসা বলে উঠল, 'আপনাকে ওভাবে আদর করতে দিচ্ছে দেখে আমার অবাক লাগছে।'

স্কিফ মিলার উঠে দাঁড়াল। ম্যাজের প্রতি সেই বিহ্বল ভাব আর নেই। কারবারী লোকদের মতো সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'কতদিন ধরে ও আপনাদের সঙ্গে আছে?'

ঠিক সেইসময় কুকুরটি গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠল, গা ঘষতে লাগল আগন্তুক মানুষটির গায়ে। মুখ বিস্ফারিত হল, ঘেউ ঘেউ শব্দে ডেকে উঠল। সেই কুকুরের ডাকে ভীষণ জোর, কিন্তু সেটা কুকুরেরই আনন্দের ডাক।

'এটা আমার কাছে নতুন,' মন্তব্য করল স্কিফ মিলার।

ওয়াল্ট ও ম্যাজ পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। আশ্চর্য ঘটনা। নেকড়েটা শেষ পর্যন্ত ডেকে উঠল!

ম্যাজ বলল, 'এই প্রথম ও ডাকল।'

মিলার নিজে থেকেই বলল, 'আমিও এই প্রথম শুনলাম।'

ম্যাজ তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। লোকটা পরিহাসপ্রিয় বটে! সে বলল, 'নিশ্চয়, কারণ আপনি তো ওকে পাঁচমিনিট হল দেখছেন।'

স্কিফ মিলার তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল। ম্যাজের কথায় যে-ছলনা ছিল, মুখে তার চিহ্ন আছে কিনা দেখল।

সে ধীরে ধীরে বলল, 'আমার মনে হয়েছিল আঁপনারা বুঝতে পেরেছেন, আমার সঙ্গে ভাব জমাবার ভঙ্গি দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন ও আমার কুকুর। ওর নাম নেকড়ে নয়, ওর নাম ব্রাউন।'

'ওয়াল্ট!' ম্যাজ তখুনি চিৎকার করে উঠল

ওয়াল্ট তখুনি প্রস্তুত হল বাধা দিতে।

'আপনি জানলেন কি করে যে ও আপনার কুকুর?' সে দাবি জানাল।

'ও যে তা-ই,' উত্তর হল।

'আপনার অনুমানমাত্র,' ওয়াল্ট বেশ জোর দিয়েই বলল।

ধীরে আত্মমগ্নভাবে স্কিফ মিলার তাকাল তার দিকে, তারপর ম্যাজের দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি কি করে জানলেন যে উনি আপনার স্ত্রী? আপনি ঠিক বলবেন, সে তা-ই। আমি বলব, এ আপনার অনুমানমাত্র। এ-কুকুর আমার। আমি একে লালনপালন করেছি, বড় করেছি। দেখুন আমি আপনাদের কাছে প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

'ব্রাউন' বলে স্কিফ মিলার ডাকল। তার গলার স্বর তীক্ষ্ম। শব্দ শুনে কুকুরের কান দুটো নিচু হল আদরের ভঙ্গিতে।

কুকুরটা ডান দিকে বেঁকল। 'এখন থাম!' কুকুরটা আদেশমতো বেঁকে না গিয়ে সামনের দিকে সোজা এসে থামল।

সগর্বে মিলার বলল, 'শিস দিয়ে এসব করাতে পারি। ও আমার শেখানো কুকুর।'

ম্যাজ শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ওকে নিয়ে যাবেন না তো?'

লোকটা মাথা নাড়ল—'ক্লনডাইকের সেই দুর্গত অঞ্চলে?' সে মাথা নেড়ে আরও বলল—'ও-হ্, এর মতো খারাপ জায়গা আর হয় না। আমাকে দেখুন। সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানুষ, তাই না? কিন্তু কুকুর? সেই নিদারুণ কষ্ট, বুকভাঙ্গা পরিশ্রম, অনাহার! তুষার! ও-হ্, আমি তা জানি।'

বিষণ্নভাবে মিলার নিজে থেকেই বলল, 'একদিন তো 'ক্ষুদে মাছ' নদীর উপর তাকে আমি প্রায় খেয়েই ফেলেছিলাম, যদি না সেদিন একটা হরিণ পেতাম। সেদিন ও বেঁচে গেছে।'

'আমি হলে আগেই মরে যেতাম,' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাজ।

মিলার ব্যাখ্যা করে বলল, 'এখানকার ব্যাপার অন্যরকম। আপনাদের এখানে কুকুর খেতে হয় না। আপনাদের চিন্তা ভিন্ন, অন্যভাবে আছেন। কখনও আপনাদের সেরকম অবস্থা হবে না। সুতরাং সে-সব ব্যাপার আপনারা বুঝবেন না।'

ম্যাজ সহৃদয়ভাবে বলল, 'সেটা অবশ্য সত্যি। ক্যালিফোর্নিয়াতে কুকুর খাওয়া হয় না। এখানে তাকে রেখে যান না কেন? এখানে ও সুখে আছে। কখনও তার খাওয়ার অভাব নেই; ঠাণ্ডায় এবং কষ্টে ভোগে না। এখানকার জীবন ভব্য ও সুন্দর। মানুষই বলুন আর প্রকৃতিই বলুন, কোনটাই এখানে বন্য-বর্বর নয়। ও কখনও চাবুকের বাড়ি খাবে না। আবহাওয়া সম্পর্কেও বলতে পারি এখানে কখনও তুষারপাত হয় না।'

স্কিফ মিলার হেসে বলল, 'ক্ষমা করুন, এখানে কিন্তু গ্রীষ্মকালে আগুনের মতো গরম।'

ম্যাজ আবেগভরে তখনও বলে চলেছে—'কিন্তু আপনি তো উত্তর দিলেন না যে সেখানকার জীবনে আপনি ওকে কি দিতে পারেন?'

উত্তর হল—'মাটিকাটা, যখন আমার তাই জোটে। বেশির ভাগ সময় তা-ই করতে হয়।'

'অন্য সময়?'

'ঐ মাটিকাটা।'

'অন্য কাজ কি কিছু নেই?'

মিলার অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিল, 'কাজ? কাজের কি সীমা আছে? অনবরত কাজ, দুর্ভিক্ষ, তুষারপাত, যতরকম কষ্ট আছে। ও আমার সঙ্গে গেলে এ-সবই সহ্য করবে। কিন্তু এসব ওর পছন্দ। এতে ও অভ্যস্ত। সেই জীবন ওর জানা আছে। এরই মধ্যে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে। আপনি সেসব জানেন না। আপনি জানেন না কার সম্পর্কে আপনি কি বলছেন। যে-জীবনের সঙ্গে সে যুক্ত, সেই জীবনে সে থাকতেই ভালোবাসে।'

ওয়াল্ট শক্ত গলায় ঘোষণা করল, 'ও যাবে না সেখানে। সুতরাং এই নিয়ে আর আলোচনা করার কোন দরকার নেই।'

স্কিফ মিলারের ভ্রূ কুঁচকে উঠল, কঠিন জেদের রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল কপালে, সে কৈফিয়ত চাইল, 'তার মানে?'

'আমি বলছি ও যাবে না। এটিই স্থিরনিশ্চিত। আমি বিশ্বাস করি না ও

আপনার কুকুর। হয়ত আপনি কখনও ওকে দেখে থাকবেন, হয়ত ওর মালিকের হয়ে ওকে দিয়ে আপনি কখনও সখনও এট-ওটা করিয়েছেন। আলাসকান জাতের কুকুরেরাও এমন আজ্ঞাবাহী হয়। এতে প্রমাণ হয় না ও আপনার কুকুর। আলাসকার যে-কোন কুকুর ওরই মতো বাধ্য হয়, যেমন ও হয়েছে আপনার। আলাসকান জাতের কুকুরের মতোই ও অত্যন্ত মূল্যবান কুকুর। কুকুরটাকে পাবার জন্য আপনার এই ইচ্ছার পিছনে রয়েছে এই একমাত্র কারণ। যা হোক, আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, ও আপনার সম্পত্তি।'

স্কিফ মিলার শক্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। জেদের আভাসটা কপালে আর-একটু জোর হয়ে ফুটল। কালো কোটের তলায় পেশীবহুল শরীরটা নিয়ে কবির পাতলা শরীরের শক্তি পরিমাপ করতে চেষ্টা করল সে। চূড়ান্ত কথাটি বলবার সময় ক্লনডাইকের লোকটির মুখে ফুটে উঠল ঘৃণার অভিব্যক্তি—'আমার চোখে এখানে এমন তো কিছু পড়ছে না যা কুকুরটিকে এখান থেকে নিয়ে যেতে আমাকে বাধা দিতে পারে।'

ওয়াল্টের মুখ লাল হয়ে উঠল, তার কাঁধ ও বাহুর পেশী শক্ত হয়ে উঠল। তার স্ত্রী শঙ্কিত ও ব্যাকুল হয়ে এই বিবাদের মধ্যে বলে উঠল, 'মিস্টার মিলারের কথাই হয়ত ঠিক। ওঁকে আমার ভয় লাগছে। নেকড়ে নিশ্চয় ওকে চেনে। দেখলে না 'ব্রাউন' বলে ডাকতেই কেমন সাড়া দিল। ও সর্বক্ষণ মিস্টার মিলারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। আর কারুর সঙ্গে এমন করে না। আর কিভাবে ও ডেকে উঠল। আনন্দেই ও অমন করেছিল। সন্দেহ নেই যে মিস্টার মিলারকে দেখেই ওর আনন্দ হয়েছে।'

ওয়াল্টের শক্ত পেশী শিথিল হয়ে গেল। হতাশাভরে কিছুটা কুঁজো হয়ে গেল সে। বলল, 'তোমার কথাই হয়ত ঠিক ম্যাজ, ও নেকড়ে নয়, ও ব্রাউনই আর ও মিস্টার মিলারের।'

'সম্ভবত মিস্টার মিলার ওকে বিক্রি করবেন, আমরা ওকে কিনে নিতে পারি।'

স্কিফ মিলার মাথা নাড়ল। তার লড়ে যাবার ভাবটা আর নেই। ওদের সহৃদয়তায় সে-ও নরম হল। প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গিকে নরম করে সে বলল, 'আমার পাঁচ-পাঁচটি কুকুর রয়েছে। ও হচ্ছে তাদের দলপতি। তারাও ঐ আলাসকান জাতের। তাদের কিছুই শেখাতে পারিনি। ১৮৯৮ সালে আমি পাঁচহাজার ডলার প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তাদের জন্য দিতে চাওয়া হয়েছিল। তখন কুকুরের ছিল চড়া দাম। যা হোক চড়া দামের কারণ তারা নয়, দামের কারণ হল গোটা দলটার জন্য। ব্রাউন ছিল ঐ দলের মধ্যে সবার সেরা। সে বছর শীতে বার হাজার ডলার আমি ফিরিয়ে দিয়েছি, নিইনি। তখনও তাদের বিক্রি করিনি, এখনও করছি না। বরং আমি চাইছি একদঙ্গল কুকুর। তিনবছর ধরে আমি তার চেষ্টা করছি। ও যখন হারিয়ে গেল, তখনই আমি অসুবিধায় পড়লাম।—না, দাম নিয়ে কি হবে? কিন্তু ও—ওকে আমি ভালোবাসি, মারাত্মক ভালোবাসি, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। ক্ষমা করবেন।—কিছুক্ষণ আগে যখন ওকে দেখলাম, আমার চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভাবলাম আমি স্বপ্ন দেখছি। ভাগ্যিস্ এটা সত্য! আমি ওর ধাই-মার মতো—রোজ রাতে আমি ওকে বিছানায় শুইয়ে গরম কাপড় ঢাকা দিয়ে দিতাম। ওর মা ছিল না, যখন আমার কফি খাবার দুধ জুটত না, সে সময় দু-ডলারে একপাত্র জমাট দুধ কিনে এনে আমি ওকে খাওয়াতাম। ও মাকে জানত না, চিনত শুধু আমাকে। রোজ আমার আঙ্গুল চাটত। দেখুন আমার ডান আঙ্গুলে এখনও দাগ আছে।'

স্কিফ মিলার বলার ঝোঁকে তর্জনী তুলে দেখাল।

'এই যে এই আঙ্গুলটা,' বলল সে। তার মালিকানার অভিজ্ঞান, স্নেহ-বন্ধনের চিহ্ন। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার প্রসারিত আঙ্গুলের দিকে।

ম্যাজ বলল, 'কিন্তু কুকুরটা, ওর দিকটা একটু দেখবেন না?'

স্কিফ মিলার বিব্রত হল।

ম্যাজ জিজ্ঞেস করল, 'ওর সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন?'

উত্তর হল—'আপনি কি জানেন আপনি কি বলতে চাইছেন?'

ম্যাজ বলতে লাগল, 'এ ব্যাপারে ওর একটা পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। ওর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। কিন্তু আপনি ওর দিকটা দেখছেন না। আপনি ওকে বেছে নেবার সুযোগ দিচ্ছেন না। আপনার মাথায় একথা ঢুকছে না যে ক্লনডাইকের চেয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ওর বেশি পছন্দ হতে পারে। আপনার নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথাই আপনি বেশি ভাবছেন। ওকে মনে করছেন যেন ও একবস্তা আলু অথবা একগাদা খড়।'

বিষয়টার উপর যেন নতুন আলোকপাত হল। দেখা গেল মিলারও এদিকটা মনে মনে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছে। ম্যাজ তার দোনামনা ভাবের সুযোগ নিল। সে জোর দিয়ে বলল, 'আপনি যদি সত্যি ওকে ভালোবেসে থাকেন, তবে ওর সুখেই আপনার সুখ হবে।'

স্কিফ মিলার তখনও মনে মনে ভাবছে। ম্যাজ উল্লাসে একটা চোরা চাউনি ছুঁড়ল স্বামীর দিকে। স্বামীটিও সানন্দ সম্মতি জানাল।

'আপনার মতলবটা কি?' অকস্মাৎ জানতে চাইল ক্লনডাইকের লোকটি।

এবার ম্যাজের বিব্রত হবার পালা। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আপনি কি মনে করেন ও ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকতে চাইবে?'

সে মাথা নেড়ে বলল, 'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

স্কিফ মিলার মনে মনে আবার ভাবতে শুরু করে দিল। যদিও এবারে তার ভাবনাটা এল সোচ্চার পর্যায়ে, বিচারকের দৃষ্টিতে বিতর্কের বস্তু ঐ জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে—'ও খুব ভালো কাজের, ও আমার অনেক কাজ করে দিত, কখনও আমার সময় নষ্ট করেনি। আনাড়ী দলকে বাগে আনানোর ব্যাপারে ও ওস্তাদ। দলের ও মাথা। কথা বলা ছাড়া ও সব কাজ পারে। ও বোঝে ওর সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ও বুঝতে পারছে যে ওর সম্পর্কে আমরা কথা বলছি।'

কুকুরটা স্কিফ মিলারের পায়ের কাছে শুয়েছিল। মাথাটা থাবার উপর নামানো। কান দুটো খাড়া—সে শুনছে, উৎসুক চোখ দুটো দ্রুত ঘুরছে, ওদের কথা ঠোঁট থেকে খসামাত্র তার শব্দ অনুসরণ করবার চেষ্টা করছে।

'ওর এখনও অনেক কিছু করার আছে। আগামী বছরগুলোর জন্য ওকে দরকার হবে। আমি ওকে ভালোবাসি, মারাত্মক ভালোবাসি।'

একবার দুবার কথা বলার জন্য স্কিফ মিলার মুখ খুলল, কিন্তু কিছু না বলেই মুখ বন্ধ করল। তারপর সে বলল, 'আচ্ছা, আমি কি করব বলছি আপনাদের। আপনার কথার কিছু গুরুত্ব আছে। সত্যি ওকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, আজ ও সুখের আশ্রয় পেয়েছে, ওর দিক থেকে অবশ্যই অধিকার আছে বেছে নেবার। আচ্ছা, ওর উপরই, ছেড়ে দেওয়া যাক ও কোথায় যাবে। আপনারা এখানেই বসে থাকুন। আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি, স্বাভাবিকভাবেই চলে যাব। যদি ও থাকতে চায় থাকবে, যদি আমার সঙ্গে যেতে চায় যাবে। আমি বলব না আমার সঙ্গে চল, আপনারাও বলবেন না ফিরে এস।'

হঠাৎ ম্যাজের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'দেখবেন, আমি পিছন ফিরলে কিন্তু আপনারা কোন কারচুপি করবেন না।'

'আমরা কারচুপি করব না,' ম্যাজ বলল। স্কিফ মিলার তার আশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, 'মেয়েদের ধাত আমার জানা আছে, তাদের মন নরম, তাদের মনে যখন আঘাত লাগে, তখন কোন মতলব ভাঁজে, হাতের তালু জড়ো করে জাহাজের খোলের তলাটা দেখে নেয় এবং শয়তানীর মতো মিথ্যে কথা বলে।'

ম্যাজ কাঁপিতে কাঁপিতে বলল, 'আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।'

সে উত্তর দিল, 'আমি ধন্যবাদ দেবার মতো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ব্রাউনের সম্পর্কে এখনো কিছু স্থির হয়নি। তবে আমি এখন যাই? আস্তে আস্তে যাব। একশ গজ দূরে চোখের আড়াল হয়ে যাওয়াটা হয়ত ঠিক হবে না।'

ম্যাজ রাজি হল। বলল, 'আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে ওর উপর আমরা কোন জোর খাটাব না।'

'তবে আমি এখন যাচ্ছি,' স্কিফ মিলার এবার সাধারণ ভঙ্গিতে বিদায় নিল।

তার গলার স্বরের হেরফের হতে শুনেই নেকড়ে দ্রুত মাথা তুলল, দ্রুততর গতিতে উঠে দাঁড়াল। স্বামী-স্ত্রী তখন হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। পিছনের পা দুটোর উপর ভর রেখে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ম্যাজের পিছনে তার সামনের থাবা দুটি তুলে দিল, আর ঐ অবস্থাতেই স্কিফ মিলারের হাত চাটতে শুরু করল। স্কিফ মিলার যখন ওয়াল্টের করমর্দন করল, নেকড়ে তখন সব ভারটা ওয়াল্টের উপর দিয়ে দুজনের হাত চাটল।

'ব্যাপারটা কিন্তু চড়ুইভাতি নয়,' ক্লনডাইকের লোকটি শেষ কথা বলে পিছন ফিরে সরু পথটা ধরে আস্তে আস্তে চলে গেল।

কুড়ি ফুট দূর পর্যন্ত নেকড়ে তাকে যেতে দেখল—উৎসুক প্রত্যাশায় যে মানুষটি হয়ত আবার ফিরে আসবে। তারপর দ্রুত চাপা কান্নায় সে ছুটে গেল তার পিছনে। তার নাগাল পেতেই তার হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল, তাকে থামাবার জন্য মৃদু তাড়না করতে লাগল।

এতে ব্যর্থ হয়ে নেকড়ে ছুটে এল ওয়াল্ট আরভিনের কাছে, তার কোটের হাতা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টানতে লাগল চলে-যাওয়া মানুষটির দিকে।

আস্তে আস্তে তার এই উদ্বেগ আকুলতা দ্রবীভূত হল। সে দুদিকেই থাকতে চায় —নতুন পুরনো দুই প্রভুর কাছেই, আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকল। উত্তেজিত হয়ে সে পায়ের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়াল। স্নায়বিক চাঞ্চল্যে বারকয়েক লাফা-লাফি করল, গা মোচড় দিল, কি করবে স্থির করতে না পারার যন্ত্রণায় এদিক-ওদিক করল, কি যে চায় বুঝতে পরল না, দুজনের কাকে সে বেছে নেবে, সুতীব্রভাবে গোঙাতে আর হাঁপাতে লাগল সে। হঠাৎ সে মাজা ভেঙ্গে বসে পড়ল, নাক উপরে তুলে শরীর ঝাঁকিয়ে মুখ বন্ধ করতে আর মুখ খুলতে লাগল। প্রতিবারেই তার মুখ ক্রমশ বিস্ফারিত হচ্ছিল। প্রত্যেকটি ঝাঁকুনিতে তার গলায় শ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল, এই কষ্ট ক্রমশ বাড়ছিল। এই খিঁচুনি আর শ্বাসকষ্টের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার গলার স্বর কাঁপতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে প্রবল বেগে বায়ু বেরিয়ে এল তার হৃৎপিণ্ড থেকে। মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করতে পারে এমন মৃদু কিন্তু গভীর শব্দ—গর্জন করে ওঠবার আগে স্নায়ু ও পেশীর প্রাথমিক ক্রিয়া এগুলি। প্রবলবেগে গর্জন করে ওঠবার আগে তার বিস্ফারিত মুখ বন্ধ হয়ে গেল, আবেগ প্রশমিত হল, চলে-যাওয়া মানুষটির দিকে সে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল। আবার মাথা ঘুরিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে দেখল ওয়াল্টকে। তার আবেদন ব্যর্থ হল, কোন উত্তর এল না। কি করবে তার কোন নির্দেশ সে পেল না।

সামনে সরু পথের বাঁকের মুখে তার পুরাতন মনিবকে দেখে পুনরায় সে উত্তেজিত হল, মৃদু আর্তনাদ করে সে পায়ের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়াল, নতুন মতলব তার মাথায় এল, তার মনোযোগ গেল ম্যাজের দিকে। এর আগে পর্যন্ত তাকে সে অগ্রাহ্য করেছে, দুই প্রভু তাকে নিরাশ করেছে, বাকি রয়েছে ম্যাজ। সে তার কাছে গিয়ে তার কোলে মাথা ডুবিয়ে দিল, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তার হাতে নাকের গুঁতো লাগাল—এটা তার আদর কাড়বার পুরনো কৌশল। সে তার কাছ থেকে সরে এসে শরীর দোমড়াতে মোচড়াতে

লাগল খেলার ছলে, লম্ফ ঝম্প করল, পিছনের পা তুলে লাফাল, পিছনের পা দুটো অর্ধেক তুলে সামনের থাবা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগল। সমস্ত শরীর নিয়ে সে যুদ্ধ করছে,—চোখ ঘোরানো, কান নাড়ানো, লেজ মোচড়ানো, এসব কিছুর মধ্য দিয়ে একটা কাজই সে করবার চেষ্টা করছিল—তার মনের অব্যক্ত কথাটি প্রকাশ করতে।

তারপর সে নিরস্ত হল—এই দুই মানুষের নিরুত্তাপ ভাব তাকে হতাশ করেছে, এরা কখনও এমন ছিল না। কোন সাহায্য কোন প্রত্যুত্তর সে পেল না। তারা তাকে আমল দিল না, যেন দুটি মৃত প্রাণী।

সে ফিরে তাকাল, নীরবে দেখতে লাগল তার পুরাতন মনিবকে। স্কিফ মিলার তখন বাঁকের মুখে ঘুরছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে, সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না, সামনের দিকে মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছে—আস্তে আস্তে, যন্ত্রবৎ, তার পিছনে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে তার যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

এইভাবে সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। নেকড়ে তার ফেরার জন্য প্রতীক্ষা করল, বেশ কিছুক্ষণ নীরবে পাথরের মতো শান্ত ও স্থির হয়ে সে প্রতীক্ষা করল—আগ্রহে ও প্রত্যাশায়।

একবার সে ডেকে উঠল, আবার প্রতীক্ষায় রইল। তারপর সে লাফাতে লাফাতে ফিরে গেল ওয়াল্টের কাছে। তার হাতের গন্ধ শুঁকল, তার পায়ের কাছে বসে পড়ল ঝুপ করে, তাকিয়ে রইল সরু পথটার দিকে, যার বাঁকটা এখন ফাঁকা।

জলের ছোট্ট ধারাটা শ্যাওলা-ঢাকা পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ যেন তার কলকল শব্দ দ্বিগুণিত হল। মেঠো পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। বড় বড় হলদে প্রজাপতি সূর্যের আলোতে খেলা করছিল, তারা ঝিম-ধরা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, ম্যাজ তার স্বামীর দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল।

কয়েক-মুহূর্ত পরে নেকড়ে পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াল; তার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল কি তার সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছে। সে বিন্দুমাত্র দৃকপাত করল না স্বামী-স্ত্রীর প্রতি। সরু পথটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে তার মন স্থির করে ফেলেছে। তারা বুঝতে পারল, পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

আস্তে আস্তে সে দৌড়তে শুরু করল, ম্যাজ ঠোঁট কোঁচকাল কোন সোহাগের শব্দ উচ্চারণ করার জন্য। তাই ইচ্ছে হল তার, কিন্তু পারল না। সে দেখল তার স্বামী কঠিন ভঙ্গিতে তাকে লক্ষ্য করছে। তার কুঞ্চিত ঠোঁট শিথিল হল। অস্ফুটভাবে সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। নেকড়ে তখন টেনে দৌড়োতে শুরু করেছে, বড়সড় লাফ দিয়ে সে ছুটল, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, তার নেকড়েসুলভ লোমগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে। সরু পথের বাঁকের কাছটা দ্রুত সে পার হয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।
